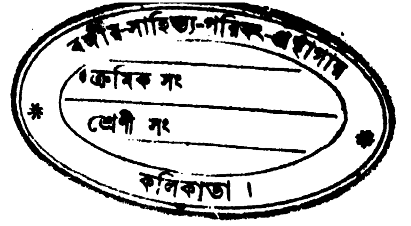


প্রতিভা

ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল

সম্পাদিত

৪র্থ বর্ষ

১৩২১

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি এল কর্ত্তৃক

ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ হইতে

প্রকাশিত।

সূচিপত্র

প্রতিভা, ১৩২১ সন, ৪র্থ বর্ষ

ত

দ

ন

প



প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ   বৈশাখ ১৩২৭   ১ম সংখ্যা

রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আধুনিক কালে তাঁহাদেরই প্রতিভা বলে সম্পাদিত ; অর্থাৎ এক কথায়, প্রাচ্যদিগের এ বিষয়ে গৌরব করিবার কিছুই নাই। উক্তরূপ সিদ্ধান্তের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে এবং উহা অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না সে প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু প্রতীচ্যগণ নিজেদের জ্ঞান-গৌরব ঘোষণায় যতই একদেশ-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখান না কেন, একটি বিষয়ের জন্য তাঁহারা যে প্রাচ্যজাতিসমূহের নিকট ঋণী, তাহা অম্লানভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। সে বিষয়টি 'রঞ্জন-বিদ্যা'।

রঞ্জন কলার উৎপত্তি

কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের প্রবৃত্তি কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রবৃত্তি হইতেই রঞ্জন-কলার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মানবজাতির সভ্যতা-লোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নানা-প্রকার বৃক্ষপত্র পুষ্প বল্কল বা মূলের কাথ এবং বিভিন্ন প্রকার ফলের রস দ্বারা অস্থায়ী (fugitive) রঞ্জন কার্য্য সম্পাদিত হইত, এবং উহা গৃহকার্য্যের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। গৃহস্থ ললনাগণ সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্র-বয়নের ন্যায় স্ব স্ব পরিবারের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি স্বহস্তে রঞ্জিত করিতেন। এখনও নিউ জীল্যাণ্ডের (New Zealand) "মেওরিদের" মধ্যে এবং অন্যান্য আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে উক্তরূপ রঞ্জনপ্রথা প্রচলিত আছে। কালে রং স্থায়ী করিবার জন্য রঞ্জন উপকরণের সঙ্গে রঙ্গবন্ধকারী (mordant) রূপে লৌহ বা ফিটকারি সংযুক্ত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। এই রূপে অতি প্রাচীন কালেই রঞ্জন-কলার সৃষ্টি হইয়াছে।

রঞ্জন শিল্পের উৎপত্তি

কিন্তু রঞ্জন-কলা প্রকৃত শিল্পরূপে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করে। বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে স্থায়ীভাবে রঞ্জন করিবার বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং রঞ্জিত বস্ত্রাদি ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ও সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হোমর, ষ্ট্রেবো হেরোডোটাস প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকগণও এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেবতাদিগের মধ্যে কেহ সর্ব্বদা পীতবর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন বলিয়া পীতাম্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন ;

কেহ নীলবর্ণের পোষাকে শোভিত হইতেন বলিয়া নীলাম্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আজীবন পীতবর্ণ কৌপীন পরিধান করিতেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি, বর্ণের স্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতার জন্য, পশ্চিমে পারস্য ও আরব হইতে পূর্ব্বে শ্যাম ও মলয়দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এসিয়ার সমগ্র দক্ষিণাংশেই আদৃত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে ভারতবর্ষের রঞ্জিত বস্ত্রাদি আরববণিকদিগের দ্বারা পারস্য ও আরব উপসাগরের পথে ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশে প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ এবং মিশর দেশে বিশেষ লাভজনক একটি ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন উপকরণসমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় রঞ্জন-প্রণালী অনুকরণ করিয়া মিশরীয়গণ নিজেরা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মিশরীয়গণ কি কি উপায়ে রঞ্জন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রঞ্জন-বিদ্যা বা রঞ্জনশিল্প কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; পক্ষান্তরে প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক দেশে অল্পাধিক মাত্রায় রঞ্জন কলার জ্ঞান ছিল। প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রঞ্জন ব্যবসায় যখন যে দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে॥

খৃষ্ট জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ফিনিসিয়া দেশের টায়ার (Tyre) নামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জনপদ হইতে এক প্রকার বেগুনী রং আবিষ্কৃত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই টাইরিয়েন পারপ্ল (Tyrian Purple) নামে চতুর্দ্দিকে সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। উক্ত রঙ্গের ব্যবসায়ে অনতিকাল মধ্যেই টায়ার একটী সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠে, এবং টায়ার ও সিডন (Sidon) নামক নগরদ্বয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সমৃদ্ধি এবং ধনগৌরবে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ার আদর্শ স্থান ছিল। প্লিনি বর্ণনা করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় টায়ার নগরে এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে ঐ স্থানে তৎকালে সাধারণ লোকের বাসের কোনও সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না।

এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে রঞ্জনশিল্পের উন্নতি।

প্লিনি এবং তৎসমসাময়িক লেখকগণ টাইরিয়েন পারপ্ল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবার প্রণালী সুবিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিশরে শক্তিরূপিণী আইসিস (Isis) দেবী ও ভৈরব অসাইরিস (Osiris) দেবের মন্দিরের সেবাইৎগণ নিজেদের পদমর্য্যাদা প্রকাশের জন্য টাইরিয়েন পারপ্ল দ্বারা রঞ্জিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে যখন রোমকগণ পূর্ব্বদেশ-সমূহ জয় করেন, তখন রাজকীয় বিধান অনুসারে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্য মধ্যে একমাত্র রাজপরিবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অপর সকলের পক্ষে 'টাইরিয়েন পারপ্ল' দ্বারা রঞ্জিত পোষাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে রঞ্জন শিল্পের অধঃপতন

উক্ত কঠোর রাজবিধানই টাইরয়ান পারপ্ল শিল্পের অবনত এবং লুপ্ত হইবার অন্যতম কারণ। টায়ারের বণিকগণ নিজেদের অধীত বিদ্যা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। এইরূপে ক্রমে ফিনিসীয়দের অধঃপতনের সঙ্গে উক্ত শিল্প সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত হইয়া যায়। প্লিনিবর্ণিত পন্থানুসরণে বহুচেষ্টায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ "টাইরিয়ান পারপ্ল" দ্বারা বস্ত্র-রঞ্জন প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাস এই বিশ্রুত রঙ্গ ঔজ্জ্বল্য এবং স্থায়িত্ব উভয়

হিসাবেই আধুনিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-সাধ্য রঙ্গসমূহ অপেক্ষাও নিম্নতর স্তরের। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঔজ্জ্বল্য এবং স্থায়িত্ব হিসাবে টাইরিয়ান পারপ্‌ল অতি নিম্নস্তরের রঙ্গ হইয়াও প্রাচীন কালে এতটা কি প্রকারে প্রতিপত্তি এবং প্রসার লাভ করিল, এ প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে তৎকালীন সভ্যজগতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বহির্বাণিজ্যের অবস্থার বিষয় মনে করিতে হইবে। সে সময় দক্ষিণ এসিয়ার বহির্বাণিজ্য যেরূপ অনেকটা আরব বণিকদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, ভূমধ্য-সাগর-কূলস্থিত দেশসমূহের বাণিজ্যও সেইরূপ অনেকটা ফিনিসিয় বণিকদের আয়ত্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় স্বদেশজাত পণ্যের প্রচলনে যে তাহারা সমধিক চেষ্টা করিবে ইহা অতি স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, ২৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন সভ্যজগতে ভারতবর্ষ এবং চীন ব্যতিরেকে অন্য কোনও দেশে প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রঞ্জন-শিল্পের প্রচলন ছিল না। কাজেই গ্রীস ও মিশর দেশের অতি সন্নিকট-বর্ত্তী টায়ার নগরে আবিষ্কৃত একমাত্র রঙ্গ ফিনিসিয় বণিকদের হস্তে যে আশাতীত প্রতিপত্তি লাভ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি সে সময়ে গ্রীক, রোমক্ প্রভৃতির নিকট বিশেষ সহজ-লব্ধ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণী যেরূপ রঞ্জন-শিল্পের কেন্দ্রস্থান, খৃষ্টজন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসিয়া দেশের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। উক্ত কারণেই টায়ার নগরের রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে এ স্থলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।

পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে যাহারা রঞ্জিত পোষাক পরিধান করিতেন তাঁহারা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দৃষ্ট হইতেন, এবং কেবল বিশিষ্ট উপলক্ষেই রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। অগাষ্টাইন যুগের রোমক লেখকগণের রচনা হইতে প্রমাণিত হয়, যে তৎকালে রঞ্জিত বস্ত্রাদির মহার্ঘতা নিবন্ধন সাধারণ লোকে উহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

টমসন (Thomson) এবং সাঙ্ক (Schunk) নামক পুরাতত্ত্ব-সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকদ্বয় মিশর দেশীয় প্রাচীন শবাধারে সংরক্ষিত শবের পরিধান-বস্ত্রের রাসায়-নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিশরবাসিগণ নীল ও মঞ্জিষ্ঠা (Alizarin) দ্বারা বস্ত্র রঞ্জন প্রণালী অবগত ছিলেন। ঐ শবসমূহ (mummy) যে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বের তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত বস্ত্রাদি মিশর দেশেই অথবা ভারতবর্ষে রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আফ্রিকায় নানা প্রকার বন্য নীলগাছ পাওয়া গেলেও তথাপি অতি প্রাচীনকালে মিশরবাসিগণ কোনও প্রকার রঞ্জনপ্রণালী জানিতেন না। এমন কি কোনও রঙ্গের বিষয়ও তাঁহারা অবগত ছিলেন না। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন-উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রণালীর অনুসরণে রঞ্জন-কার্য্য শিক্ষা করিতেন। *

প্রাচীন মিশরে রঞ্জন-শিল্প

ফিনিসিয় এবং আলেকজেণ্ড্রিয় বণিকগণ দ্বারা ক্রমে রঞ্জন উপকরণসমূহ এবং রঞ্জন প্রণালী গ্রীসে নীত এবং প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু গ্রীস বা রোমে কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে রঞ্জন-কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহার কোনও বিবরণ পাইবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপ যে বর্ব্বরতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিঘাতে তৎকালীন পাশ্চাত্য রঞ্জন-

মধ্যযুগে ইউরোপে রঞ্জনশিল্পের অধঃ-পতন

* Encyclopædia Brittanica—দশম সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা।

শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং রোমক বা গ্রীকদিগের এ বিষয়ে যাহা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল, কালে তাহাও বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে ডুবিয়া যায়। কিন্তু ইটালিদেশে, বিশেষতঃ সিসিলিতে, রঞ্জনশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই।

পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী মধ্যে পশ্চিম এসিয়ার রঞ্জন শিল্পের অবস্থা

নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তবাসী ইহুদীগণ রঞ্জন ব্যবসায়টা তাহাদের নিজস্ব বা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা কোনও মতেই তাহাদের রঞ্জন প্রণালীর বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিত না। মিসেস্ মেরিফিল্ডের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পরিব্রাজক, ইহুদি-বৈষ্ণকুল-তিলক, টুডেলা (Tudela) নিবাসী বেঞ্জামিন (Benjamin) স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন ১১৬০ হইতে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জেরুজালেমে (Jerusalem) ভ্রমণ করিতে যান, তখন ঐ নগরে মাত্র ২০০ জন ইহুদি বাস করিত। তাহারা সকলেই পশমী বস্ত্রাদির রঞ্জনের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল এবং উহা সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের করায়ত্ত ছিল। বেকমেন (Beckman) প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐ সময়ে ইটালির রঞ্জন ব্যবসায় ইহুদীদিগের (Israelites) অধিকারে ছিল। ক্রমে সিসিলীয়াদের নিকট হইতে ইটালিবাসীগণ রঞ্জনপ্রণালীসমূহ পুনরায় শিক্ষা করেন। সিসিলি হইতেই ইউরোপে রঞ্জনশিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভেনিসের বণিকগণ প্রাচ্য রঞ্জন-দ্রব্যসম্ভার আমদানী করিয়া পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। ঐ সময় হইতে রঞ্জনশিল্প অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। ফ্লোরেন্স (Florence), ভেনিস (Venice) প্রভৃতি নগরে রঞ্জন ব্যবসায়িদের নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে রঞ্জন শিল্পের পুনরুদ্ধার

প্রায় ঐ সময়েই রুমেলেই (Rucellai) নামক জনৈক ফ্লোরেন্সনিবাসী বৈজ্ঞানিক পশ্চিম এসিয়ার উপকূলজাত সামুদ্রিক আগাছা বিশেষ হইতে অরচিল (Orchill) নামক বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করেন। ইটালি হইতে ক্রমে জার্ম্মাণী ফ্রান্স ও ফ্লান্ডার্স (Flanders) রঞ্জনশিল্প বিস্তৃত হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্ওয়ার্ড একদল শিল্পী আনাইয়া লণ্ডন নগরে রঞ্জনব্যবসায়ের একটি কোম্পানি স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করেন।

ফরাসী দেশের জাতীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণী পাওয়া যায়। এই

রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণী

হস্তলিখিত পুথিসমূহের অধিকাংশ গুলিতে সাধারণ চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি, চিত্রকরের রঙ্গ প্রস্তুত এবং তাহাদের প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। অবশ্য ২।১ খানা পুথিতে রঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী এবং তাহাদের ব্যবহারও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আলক্রীয়াস (Alchreus) লিখিত পুথিখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে ঐ পুস্তকখানা অন্ততঃ ১৪১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং উহার কিয়দংশ তাহারও ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। আলক্রিয়াস্ ব্রেজিল কাষ্ঠ (Brazil wood), অরচিল, নীল, কারমেস (Kermes) প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জনপ্রণালীর বিবরণ লিপি-

বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎব্যতিরেকে উক্ত পুথিতে রং পাকা করিবার জন্য ফিটকারি ও লৌহ, শির্কাম্ল, এবং কষারিণ (Tannin) প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ আছে। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ হইতে রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে ইউরোপে প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে তৎকালে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৫৪৮ সনে রসেটি (Rosetti) ভেনিস্ হইতে তৎকালীন রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে এক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেরিফিল্ড (Merrifield) তৎপ্রণীত প্রাচীন রঞ্জন পদ্ধতি (Ancient Practice of Dyeing) নামক গ্রন্থে বোলগ্না (Bologna) নগরস্থ সেণ্ট সেলভেটর ধর্ম্মমন্দিরে সংরক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুবাদ করিয়াছেন।‡ ঐ সমস্ত হস্তলিখিত পুথিতে আলক্রিয়াস বর্ণিত রং সমূহ ছাড়া ওয়াড (Woad), বাগাদন বা বাগাডেল (Bagadon or Bagadel) নামে অভিহিত ভারতবর্ষজাত নীল, চন্দনকাষ্ঠ, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, প্রভৃতি কতকগুলি রংএর বিশেষ উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিল্পিগণ বহু প্রকার রংএর ব্যবহার জ্ঞাত ছিলেন।

রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদি

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বভারতে গমন করিবার পথের আবিষ্কারের ফলে রঞ্জন ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এই সময় হইতে পূর্ব্বভারতজাত নানা প্রকার নূতন রঙ্গ ইউরোপে আমদানী হয় এবং রঞ্জন কাষ্ঠের (dye-woods) ব্যবসায় ইটালিয়াদের নিকট হইতে পর্টুগিজ ও স্পেনীয়দের হাতে যায়। কারণ পূর্ব্বভারতজাত পণ্যাদি পশ্চিম এসিয়ার পথে প্রেরিত না হইয়া, উত্তমাশা অন্তরীপের পথে সোজা ইউরোপের প্রেরিত হইতে থাকে। প্রতি বৎসর অধিকতর পরিমাণে প্রাচ্য শিল্পসম্ভার ইউরোপে আমদানী হইতে আরম্ভ করে।

ক্রমে ইউরোপে রং উৎপন্নকারী বৃক্ষের (Dye plants) চাষ আরম্ভ হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ও হলণ্ড দেশে ওয়াড (woad) এবং মঞ্জিষ্ঠা (madder) উভয়ের আবাদ আরম্ভ হয়। ওয়াড নীল উৎপন্নকারী এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ। মঞ্জিষ্ঠা একপ্রকার ভারতবর্ষীয় লতা; উহার মূল হইতে সুন্দর লাল রং (Alizarin) পাওয়া যায়। স্পেনীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া ওলন্দাজগণও রঞ্জন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

আমেরিকা আবিষ্কারে রঞ্জনশিল্পের উন্নতি

১৫১৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়গণ মেকসিকোতে উপনীত হইয়া তদ্দেশস্থ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কচিনিল (Cochineal) নামক এক প্রকার জৈব রঞ্জন-উপকরণের (Animal dye) ব্যবহার দেখিতে পান, এবং পরীক্ষার জন্য অচিরেই উহা ইউরোপে প্রেরণ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে কচিনিল সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন কারমেস রংএর ন্যায়; কাজেই শিল্পিগণ কচিনিল হইতে কোনও নূতন রং আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কিন্তু কচিনিল হইতে কারমেস অপেক্ষা দশগুণ অধিক রং পাওয়া যাইত, এবং এই কারণেই কচিনিলের ব্যবহার ইউরোপে দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ড্রেবেল (Drebble) নামক জনৈক ওলন্দাজ রাসায়নিক ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন যে, কচিনিলের সঙ্গে টিনদ্রব মিশ্রিত করিয়া লইলে পশম অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এই সময় নবাবিষ্কৃত আমেরিকাতে লগ্‌কাষ্ঠ (Logwood) নামে এক

* Manuscript of John Le Byone No 6741 (French National Library).

‡ Mariegola del Arte de Tentori.

প্রকার কাষ্ঠ পীত রংএর জন্য ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত রংএর অস্থায়িত্ব নিবন্ধন প্রত্যক্ষ ভাবে রঞ্জনকার্য্যের (Direct dyenig) জন্য লগকাষ্ঠের ব্যবহার শীঘ্রই উঠিয়া যায়, এবং কেবল মাত্র অন্যান্য রংএর সহিত সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার বেনক্রফ্ টই (Bancroft) লগকাষ্ঠ এবং তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য পীত রংএর পরিবর্ত্তে আমেরিকা হইতে Quercitron Bark নামক একপ্রকার কাষ্ঠের প্রচলন করেন। Quercitron Bark অনেকটা কণ্টকি কার্য্যের ন্যায়। প্রায় এই সময় হইতে রঞ্জনকার্য্যের জন্য খয়েরের ব্যবহারও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে রঞ্জনশিল্পের উন্নতি চেষ্টা

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি (Royal Society) রঞ্জনশিল্পের সাহায্যার্থ তৎকালে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন *। দশ বৎসর পর ফরাসী মন্ত্রী কলবার্ট (Colbert) প্রচলিত রঞ্জন-প্রণালীর সমূহের উন্নতিকল্পে, শিল্পীদিগের পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করেন। ঐ সময় হইতে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট রঞ্জনশিল্পের উন্নতি চেষ্টায় সর্ব্বদাই বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ১৭০৮ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে সমস্ত ফরাসী রাসায়নিক রঞ্জনশিল্পটাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিল্পে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হেলট (Hellot), মেকিয়ার (Macquer), বারথেলো (Berthelot) শেভরিউল (Chevreul) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্য রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি এবং ইউরোপে প্রাশিয়ান ব্লু (Prussian Blue)—১৭১০ খৃঃ, ইনডিগো একসট্রাক্ট (Indigo extract)—১৭৪০ খৃঃ, সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid)—১৭৭৪ খৃঃ, মরেক্সাইড (Maurexide)—১৭৮৮ খৃঃ, পিকরিক এসিড (Picric acid) -- ১৭৮৮, কার্ব্বনেট অব্ সোডা—১৭৯৩ খৃঃ, ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) —১৭৯৮ খৃঃ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ঔষধির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনশিল্প অতিক্রত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে টমাস্ হেনরি (Thomas Henry), হোম (Home), বেনক্রফ্ট (Bancroft) এবং ফরাসি দেশে ডেমবরণে (Dambourney), গণফ্রেবিল (Gonfreville) প্রমুখ বহু রাসায়নিক মৌলিক গবেষণা দ্বারা রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঞ্জনকার্য্যের জন্য কেবলমাত্র প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণই ব্যবহৃত হইত। ঐ সময়ে কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হয় এবং রঞ্জনশিল্পে এক নূতন যুগ আনয়ন করে। কারণ কৃত্রিম রংসমূহ ক্রমে প্রাকৃতিক রং সমূহের স্থান অধিকার করিতে থাকে এবং এই অল্প কাল মধ্যেই প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণ সমূহের ব্যবহার এক প্রকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ সমূহের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইউরোপে বিভিন্নবর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য কি কি প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহৃত হইত এবং কি কি উপায়ে উহারা সংগৃহীত হইত, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণ দেওয়া গেল।

কৃত্রিম রং আবিষ্কারের পূর্ব্বে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক রং সমূহের বিবরণ

রক্তবর্ণ—আক্সাইড্ অব টিন (Oxide of Tin) সহযোগে কচিনিল দ্বারা পশমী বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সার্দ্ধ দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উক্ত রঞ্জন প্রণালী প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই প্রকার রঞ্জন-কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা এবং শিল্পকৌশলের প্রয়োজন হইত।

অলক্তবর্ণ (Crimson) :—ফিটকারি (Alum)

সহযোগে কচিনিল ব্যবহৃত হইত।

আতাম্র (Pink) বা পদ্মবর্ণ (Rose-Red):—কচিনিল দ্বারা সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য কখনও কখনও কচিনিলের পরিবর্ত্তে লাক্ষা ব্যবহৃত হইত। লাক্ষা দ্বারা রঞ্জন-প্রণালী সর্ব্বতোভাবে কচিনিলের ব্যবহারের মত। লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয়গণ যদিও আমেরিকা আবিষ্কারের পর কচিনিলের নাম জ্ঞাত হন এবং মেক্সিকো (Mexico) হইতে কচিনিল আমদানী করিয়া প্রথম ব্যবহার করিতে থাকেন, ভারতবর্ষে কিন্তু বহুপূর্ব্বেই কচিনিলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'রসার্ণব' এবং 'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে "ইন্দ্রগোপ" বা "ইন্দ্রগোপক" নামে কচিনিলের উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থই তান্ত্রিক রসগ্রন্থ। ডাক্তার রায়ের মতে 'রসার্ণব' দ্বাদশ শতাব্দীর এবং "রসরত্নসমুচ্চয়" ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রঞ্জনকার্য্যের জন্য কচিনিল ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে "কচিনিলের" ব্যবহার

রক্তবর্ণ:—কচিনিল দ্বারা পশম (wool) সুন্দররূপে রঞ্জিত হইলেও কার্পাসের cotton) উপর উহা ব্যবহার করা যায় না। কার্পাস বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইলে মঞ্জিষ্ঠা (madder) ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস-বস্ত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত ফিটকারি সহযোগে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। * মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে তুর্কি এবং গ্রীসে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী একমাত্র তুর্কি এবং গ্রীকরাই জানিতেন এবং ঐ ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই হস্তে ছিল। উক্তরূপ রঞ্জিত কার্পাস-বস্ত্র একমাত্র পূর্ব্বদেশ হইতেই পাওয়া যাইত বলিয়া উহা টার্কি রেড (Turkey Red) বা এড্রিয়ানোপল রেড (Adrianople Red) নামে অভিহিত হইত এবং বর্ত্তমান সময়েও প্রথমোক্ত নামেই প্রচলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বহু প্ররোচনায় কয়েকজন গ্রীক-শিল্পী ফ্রান্সে গমন করিয়া মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী তথায় প্রবর্ত্তিত করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গভর্ণমেণ্ট মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালীর বিবরণ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করেন। কয়েক বৎসর পর পেপিলন (Papillon) নামক জনৈক ফরাসি শিল্পীর নিকট হইতে বহু অর্থব্যয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উক্ত রঞ্জন-প্রণালীর বিষয় অবগত হন। পরবর্ত্তীকালে এই ব্যবসায় ইংলণ্ডে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

ভারতবর্ষে রঞ্জন-কার্য্যের জন্য মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার

কপিশবর্ণ (Brown): —পিচ কাষ্ঠ (Peach wood) সপান কাষ্ঠ (Sapan wood) এবং লিমা কাষ্ঠ (Lima wood) কপিল বর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত। ঐ কাষ্ঠসমূহ সাধারণতঃ মধ্য আমেরিকা, পূর্ব্বভারতদ্বীপপুঞ্জ এবং পেরু হইতে সংগৃহীত

*Encyclopædia Brittanica—নবম সংস্করণ সপ্তম খণ্ড, ৫৭৬ পৃষ্ঠা—"From very remote times the Hindus have possessed a process for dyeing a brilliant and extremely permanant Red upon cotton fabrics by means of madder. This process travelled westward through the Levant into Turkey and Greece."

হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠজাত রং সমূহ সূর্য্যালোকে অস্থায়ী বলিয়া উহাদের ব্যবহার অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। সপানকাষ্ঠ বঙ্গদেশে 'বকম' কাষ্ঠ নামে পরিচিত। বকম কাষ্ঠ অতি প্রাচীন কাল হইতে রঞ্জনকার্য্যের জন্য এ দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'বকম' কাষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে 'বকম' কাষ্ঠ ইউরোপে রঞ্জনকার্য্যের জন্য প্রেরিত হইত।* তামিল ভাষায় বকমকাষ্ঠের নাম "সপ্পূ"। "সপ্পূ" শব্দ হইতেই সপান শব্দ হইয়াছে।

কার্পাস্ বস্ত্র কপিসবর্ণে রং করিবার জন্য খয়েরও ব্যবহৃত হইত। উক্ত কারণে গড়ে প্রতিবৎসর ৩৬, ৯৬, ১০৬৲ টাকা মূল্যের খয়ের ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত। খয়ের পশমী বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উপযোগী নহে। কিন্তু অধুনা সৈনিকদের পোষাকের নিমিত্ত পশমের উপর খাকি রং করিবার জন্য তুথ্যাক (Copper Sulphate) সহযোগে খয়ের ব্যবহৃত হইতেছে।

কপিশ-পাটলবর্ণ (Brownish pink): —কেম-কাষ্ঠ (Cam wood) বার কাষ্ঠ (Bar wood) এবং সেণ্ডারস্ (Sanders wood) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। নানা কারণে উহাদের ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত কাষ্ঠ সাধারণতঃ আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত হইত।

সেণ্ডার্স কাষ্ঠ রক্তচন্দনের ভাষান্তরিত নাম মাত্র। রক্তচন্দন কাষ্ঠ বহুকালাবধি রঞ্জনকার্য্যের জন্য এ দেশে ব্যবহৃত হইতেছে এবং পূর্ব্বে উক্ত কার্য্যের জন্য প্রচুর পরিমাণ কাষ্ঠ প্রতি বৎসর ইউরোপে প্রেরিত হইত।*

পীতবর্ণ:—পীতবর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং উক্ত কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ কুসুম ফুল, তুত্ জাতীয় পূর্ব্বভারতদ্বীপপুঞ্জজাত একপ্রকার বৃক্ষ কাষ্ঠ (old fustic) এবং আমেরিকার উত্তর প্রদেশস্থ দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের বল্কল (Quercitron Bark) ব্যবহৃত হইত। এস্থলে কণ্টকিকাষ্ঠ ও হরিদ্রার নামও উল্লেখযোগ্য।

পিঙ্গলবর্ণ (Orange):—পিঙ্গলবর্ণে রেশমী বস্ত্র রঞ্জনের জন্য লটকান (Arnotto) ব্যবহৃত হইত। লটকানের আদিস্থান আমেরিকা, কিন্তু বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে লটকানের আবাদ চলিয়া আসিতেছে‡ এবং প্রচুরপরিমাণে লটকান প্রতি বৎসর এ দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রেরিত হইত।

আরক্তনীলবর্ণ (purple)—লৌহসংযোগে মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা কার্পাস রঞ্জিত হইত। পশম এবং রেশম রং করিতে হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অরচিল ব্যবহৃত হইত।

নীলবর্ণ:—নীল (Indigo) দ্বারা সম্পাদিত হইত। ভারতবর্ষকে নীলের জন্মভূমি বলা যাইতে

* Sir George Watt.—The Commercial-Products of India, Page 195—"Balkan wood yields a valuable red dye, which before the days of aniline was exported very largely from India to Europe."

*Sir George Watt—The Commercial Products of India :—"In former years the great use of the wood of this species was as a dye and large shipments were made annually from Madras to Europe, where it was employed as a colouring agent in Pharmacy, for dyeing, leather and staining wood.............It dyes cloth a beautiful Salmon-pink."

‡ Buchanan Hamilton—Statistical Account of Dinajpur (1883) P. 155. "The Bixa (লটকান) an American plant is now rapidly spreading over Bengal".

পারে। অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে নীলের ব্যবহার জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতেই ইয়ুরোপে নীলের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

হরিৎ বর্ণ (Green) :—উনবিংশ শতাব্দির মধ্য পর্যান্ত প্রকৃত হরিৎবর্ণের কোনও রঞ্জন উপকরণ ইউরোপীয়দের জানা ছিল না। হরিৎ-বর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করিতে হইলে পীত ও নীল রং একত্র মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। ঐ সময়ে হরিৎ বর্ণের কতকগুলি কার্পাস বস্ত্র চীনদেশ হইতে ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। ফরাসিগণ বর্ণ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং জানিতে পারেন যে ঐ হরিৎ রং নীল এবং পীত রংএর সংমিশ্রণ জাত নহে, পরন্তু তৎকালে ইয়ুরোপে অজ্ঞাত লো-কাও (Lo-kao) নামক চীনদেশজাত একপ্রকার মূল্যবান রঞ্জন-উপকরণ। পরে কতকটা লো-কাও সংগৃহীত হইয়া ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ফরাসি রাসায়নিকগণ উহা দ্বারা সুন্দররূপে রঞ্জনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পে হরিৎ রংএর অভাব।

কৃষ্ণবর্ণ :—পূর্ব্বে নীল, পীত এবং লোহিত এই তিন রংএর সংমিশ্রণে কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত। প্রকৃত পক্ষে তিনবার রং করিতে হইত, কাজেই সময় এবং ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত প্রণালী ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে হরিৎ কিংবা তৎজাতীয় কোনও প্রকার কষায়িণ (Tannin) উপকরণ লৌহ সংযোগে এবং কখনও কখনও বা ২।৩ প্রকার বন্ধকারি (mordant) সহযোগে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে কষায়িণ উপকরণের অভাব নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের হরিতকিই এ দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ স্থলে নীল অথবা কালো রং করার জন্য মধ্য-আমেরিকাজাত লগ্‌কাঠ নামক একপ্রকার কাষ্ঠের (Log wood) ব্যবহারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কৃত্রিম রং (Artificial dye-stuffs) প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইয়ুরোপীয় শিল্পীগণ রঞ্জন উপকরণ সমূহের জন্য ভারতবর্ষ বা আমেরিকার অনেকটা মুখাপেক্ষী ছিল, এবং অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালীসমূহই অনুসরণ করিত।

পূর্ব্ববর্ণিত তালিকা হইতে আরও দেখা যায় যে, ইয়ুরোপীয় শিল্পীগণ অত্যল্পসংখ্যক রঞ্জন উপকরণের ব্যবহারমাত্র জ্ঞাত ছিল। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ এ স্থলে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য শিল্পীগণ ভারত জাত কুম্‌কুম্ এবং কুসুম ফুল ব্যতিরেকে পুষ্পজাত অন্য কোনও রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার জানিতেন না। অথচ পুষ্পবহুল ভারতবর্ষে বহুকালাবধি পলাশ ফুল, গেন্দা ফুল, শেফালিকা, কুম্‌কুম্, শিমুল ফুল, মান্দার ফুল, জবা ফুল, কুসুম ফুল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ফুল বস্ত্রাদি রং করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।*‡

ইয়ুরূপে পুষ্পজাত রংএর ব্যবহার।

* দেশীয় রঞ্জন-উপকরণ সমূহের বিবরণ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার আশা রহিল।—প্রবন্ধ লেখক

‡ Agricultural Ledger. 1908. No 2. 'Dyes from Flowers' by I. H. Burkill Page 9—"It is difficult to ascertain from the literature available if and where flower petals are used for dyeing in foreign countries as in India. Europe of course has used for long saffron and safflower, both of which come from the East ; and China and Japan have had a trade with

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পার্কিন (W. H. Porkin) মভিন (mauvine) নামক প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুতের পর হইতে রঞ্জনশিল্পে এক অভিনব নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং উক্ত শিল্প অতি দ্রুতভাবে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট মভিনের প্রস্তুত প্রণালী পার্কিন পেটেণ্ট (Patent) করেন, কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ কেহই আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হওয়াতে, পার্কিনপ্রস্তুত প্রথম কৃত্রিম রং মভিন তৎকালে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। অবসর পাইয়া ভারগুই (Verguin) নামক জনৈক ফরাসি রাসায়নিক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মেজেণ্টা প্রস্তুত করেন এবং লায়ন্‌স (Lyons) নগরস্থ রেণার্ড ফ্রাইরেসের (Renerd Frires) কারখানায় অংশিদাররূপে ব্যবসায়ে প্রচলিত করিবার জন্য মেজেণ্টা প্রস্তুত করিতে থাকেন। পার্কিন-প্রস্তুত মভ (mauve) বা মভিন এবং মেজেণ্টা একই জিনিষ, উহাদের রাসায়নিক স্বরূপ বা প্রকৃতিতে কোনও প্রভেদ নাই। মেজেণ্টা নামের ইতিহাসটা কৌতূহলপ্রদ। যে দিবস ভারগুইন মেজেণ্টা প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ দিন মেজেণ্টা (Magenta) নামক ভূক্ষেত্রে ফরাসি এবং অষ্ট্রীয়দের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের নামানুসারেই নূতন রংএর নাম মেজেণ্টা রাখা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নেটেনসন (Natenson) এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হফমেন (Hoffmann) জার্ম্মাণিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে এবং স্বাধীনভাবে মেজেণ্টা প্রস্তুত করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিকলসন (Nicholson) গ্রিয়ার্ড (Griard) এবং ডিলেয়ার (De Laire) মেজেণ্টা প্রস্তুতের অভিনব সহজ উপায় আবিষ্কার করেন, এবং ঐ বৎসরেই শেষোক্ত রাসায়নিক মেজেণ্টা হইতে রোজেনিলিন ব্লু (Rosaniline Blue) নামক প্রথম "কৃত্রিম নীল রং" প্রস্তুত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লথ (Lauth) প্রথম কৃত্রিম কমলা রং (methyl violet) নিকলসন প্রথম কৃত্রিম কমলা রং (Phosphine), এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লাইটফুট (Lightfoot) প্রথম কৃত্রিম কাল রং (Aniline Black) ও চেরপিন (Cherpin) প্রথম কৃত্রিম সবুজ রং (Aldehyde Green) প্রস্তুত করেন।

প্রথম কৃত্রিম রং

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পার্কিন (W. H. Perkin) আধুনিক রঞ্জনশিল্পের প্রবর্ত্তক বা জন্মদাতা। এবং যাঁহারা এই নবশিশুর সূতিকাগারে ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হফমেনের (Hoffmann) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মেজেণ্টা প্রস্তুতের সূত্র প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, কারণ এ সময় হইতে শিল্পীগণ প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম রংসমূহের ব্যবহার আরম্ভ করেন। কৃত্রিম রংসমূহের আবিষ্কারে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হফমেন (Hoffmann) বলিয়াছিলেন, "এখন হইতে আর প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা রঞ্জন উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অল্পদিন মধ্যেই ইংলণ্ড রং প্রস্তুত ব্যাপারে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে; এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত কৃত্রিম রংসমূহ অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইবে; হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে নীলের (Indigo)

কৃত্রিম রং সমূহ সম্বন্ধে হফমেনের ভবিষ্যদ্বাণী

Europe in the flower-buds of 'Sophora Japonica' which contain a yellow dye; but beyond these three which are in no way obscure products, it is not improbable that in various countries of the world, flowers which are of no account in the European Art of dyeing, have been or are used as in India."

আদিস্থান ভারতবর্ষে কৃত্রিম নীল, কচিনিলের কেন্দ্রস্থান মেক্সিকোতে কৃত্রিম লাল রং বা কুসুমফুলের দেশ জাপান চীনে কৃত্রিম পীত রং এবং সম্প্রতি অন্যান্য যে দেশ হইতে যে রং আমদানী হইয়া থাকে সেই সেই দেশে তাহারই অনুরূপ কৃত্রিম রং সমূহ পণ্যরূপে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে।" হফমেনের দাম্ভিকতাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যে বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হইয়াছে রঞ্জনশিল্পসংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যক্তিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

১৮৬২ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে মার্টিয়াস্ কর্ত্তৃক (Martius) বিস্‌মার্ক ব্রাউন নামক (Bismark Brown) বাদামী রং, মার্টিয়াস ইয়োলো (Martius yellow) নামক পীত রং, পেলাটিন অরেঞ্জ (Palatin Orange) নামক পিঙ্গল রং, এবং ক্লেভেল (Clavel) কর্ত্তৃক মেগডেলা রেড্ (Magdela Red) নামক লাল রং প্রস্তুতের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর মধ্যেই শত শত কৃত্রিম রং প্রচলিত হইয়া পড়ে।

এ স্থলে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ এ যাবৎ যে সমস্ত কৃত্রিম রং প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা কেবল মাত্র পশমী বা রেশমী বস্ত্রাদিই সুন্দররূপে রঞ্জিত হইত, পরন্তু কোনও প্রকার রং বন্ধকারির সাহায্য ব্যতিরেকে কার্পাস বস্ত্রাদি রঞ্জন করা যাইত না এবং উহাদের কোনটিই বিশেষ স্থায়ী রং (fast dye) ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, এ পর্য্যন্ত রাসায়নিকগণ কোনও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া রং প্রস্তুত করিতেন না। তাহারা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেন;

১৮৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রং প্রস্তুত প্রণালী।

কাজেই কি ভাবে যে কোনও একটি রং প্রস্তুত হইত তাহার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, এবং কি প্রকার পন্থানুসরণে কি প্রকার রং পাওয়া যাইবে তাহা পূর্ব্বে বলিতে পারিতেন না।

কৃত্রিম রংসমূহের প্রস্তুতের আদি ভূত (starting substance) খনিজ কয়লার অন্তর্ধূম বিপক্ক (Destructive distillation) দ্বারা প্রাপ্ত বেনজিন (Bengene) নামক উদ্বায়ী তৈল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেকিউল (Kekule) বেনজিন পরমাণুর অন্তর্গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। কেকিউলের মত (Benzene Theory) প্রবর্ত্তনের পর প্রত্যেকটি পূর্ব্বাবিষ্কৃত কৃত্রিম রংএর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং কৃত্রিমরং-প্রস্তুতকারকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবদ্ধ প্রণালী অনুসরণে নির্দ্ধারিত রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ইচ্ছানুরূপ রং প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রাবী (Graebe) ও লিবারমেন (Liebermann) কৃত্রিম উপায়ে এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করেন।

প্রাকৃতিক রংএর প্রথম সংশ্লেষণ।

এলিজেরিন মঞ্জিষ্ঠামূলজাত প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণ। পর বৎসর উক্ত রাসায়নিকদ্বয় ও পার্কিন সমবেত হইয়া কৃত্রিম এলিজেরিনের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

রঞ্জনশিল্পের ইতিহাসে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ চিরস্মরণীয়। উক্ত বৎসরে বায়ার (Bayer) কৃত্রিম উপায়ে প্রথম নীল (Indigo) প্রস্তুত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বটিগার (Bottiger) কঙ্গো রেড (Congo Red) নামক নূতন একশ্রেণীর একটি রং প্রস্তুত করেন।

১৮৮০-৯০ মধ্যে রঞ্জনশিল্পের অবস্থা

উক্ত রং দ্বারা কোনও প্রকার রং-বন্ধনীর সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্পাস অতি উজ্জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর মধ্যে কঙ্গো রেড্ শ্রেণীর শতাধিক রং প্রস্তুত হইয়াছে এবং সহজে ও অল্প ব্যয়ে কার্পাস বস্ত্ররঞ্জনের পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ১৮৮৭ সনে গ্রিন (Green) প্রিমুলিন (Primuline) নামক একটি রং প্রস্তুত করেন। প্রিমুলিন প্রস্তুত প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। যে যে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে রংটি প্রস্তুত হইবে তাহাদিগকে বস্ত্রতন্তু মধ্যে একত্র করা হয়, অর্থাৎ বস্ত্রতন্তু মধ্যেই রংটি প্রস্তুত হয়। ঐরূপ ভাবে রংটি প্রস্তুত হওয়ায় উহা বস্ত্রতন্তুমধ্যে সুদৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে এবং ধৌত করিলে বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় অপসৃত হয় না; অর্থাৎ রংটি অত্যন্ত পাকা বা স্থায়ী হয়। পরে এই শ্রেণীর আরও বহু রং প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেণিতে "Badische Anilin and Soda Fabrik" কোম্পানী কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রচলিত করেন এবং ঐ সময় হইতে কৃত্রিম নীল প্রাকৃতিক নীলের স্থান

কৃত্রিম নীল

অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ১৯০১ সন হইতে কৃত্রিম নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাকৃতিক নীলকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছে। রঞ্জনব্যবসায়ীদের হিসাবে, বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে গন্ধকাণু সমন্বিত এক শ্রেণীর রংএর (Sulphur colours) আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু উহাদের কোনটিরই রাসায়নিক স্বরূপ এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহারা ততটা মূল্যবান নহে। ১৯০১ সন হইতে কৃত্রিম নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃত্রিম নীলকে পরাভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি টাকা মূল্যের রং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। উহার ⅘ অংশই জার্ম্মেণিতে প্রস্তুত হইতেছে। বাকি ৭ কোটি টাকার কৃত্রিম রং ইংলণ্ড ফ্রান্স সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রস্তুত হয়। ১৯১০ সনে জার্ম্মাণি হইতে ১৫ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের কৃত্রিম রং বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। জার্ম্মেণির এক একটি কৃত্রিম রং প্রস্তুতের কারখানা এক একটি ক্ষুদ্র নগরবিশেষ। রং প্রস্তুতকারক বিখ্যাত বাডিষা কোম্পানিতে (Badische Anilin and Soda fabrik) ১৯৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য রাসায়নিক, যন্ত্রাদি পরিচালনের জন্য ৯৫ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৭০৯ জন কেরাণী এবং ৭৫০০ সাধারণ শ্রমজীবী দৈনিক কাজ করিয়া থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ১৯০০ সনের ২০শে অক্টোবর জর্ম্মান রসায়নিক সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবনির্ম্মিত হফ্‌মেন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনদিবসে বৈজ্ঞানিকদিগের এক সভা আহূত হয়। সভায় কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারক অধ্যাপক বায়ার (Bayer) এবং বাডিষা কোম্পানির অধ্যক্ষ ডা[illegible]র ব্রাঙ্ক ও (Dr Brunck) উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার ব্রা[illegible] ঘোষণা করেন যে,ঐ পর্য্যন্ত বাডিষা কোম্পানি কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের চেষ্টায় ৯ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এত টাকা উদ্যমেই ব্যয়িত হইলেও তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না, কারণ তাহার ধ্রুব আশা ছিল যে, অচিরকাল মধ্যেই অতি সুলভে এবং সহজে কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবেন। বৈজ্ঞানিক পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ডাক্তার ব্রাঙ্কের আশা সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কখনও কোনও দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না, বা কোনও শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ইংলণ্ডও এই সময় সত্য মত উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই রসায়নশিল্প আজ সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মানদের আয়ত্ত। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডেই প্রথম পার্কিন (Perkin) কর্ত্তৃক কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়; কিন্তু তৎকালে ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ পার্কিনকে কোনও প্রকার আর্থিক সাহায্য বা উৎসাহিত করেন নাই, কারণ কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। উৎসাহ ও চেষ্টায় জার্ম্মান রসায়নিকগণ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন, এবং এক্ষণে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পকে তাহাদের জাতীয় শিল্প বলিয়া ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময় একমাত্র জার্ম্মানিতেই সহস্রাধিক রাসায়নিক কৃত্রিম রং সম্বন্ধে নানা প্রকার মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবসায়ের কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ সেই ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জিত হইতেছে

রঞ্জনশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা।

রঞ্জনব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য এবং যাহাতে উক্ত শিল্পসম্বন্ধীয় আবিষ্কার-সমূহ সকলে জানিতে পারেন তজ্জন্য রঞ্জনশিল্পসংবাদবাহক বহু পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ সমূহ ও তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য গ্রন্থগুলির অধিকাংশই জার্ম্মান ভাষায় লিখিত—কিন্তু এ যাবৎ অনেকগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তক সাহায্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিও অতি সহজেই সুচারুরূপে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারে। লিড্‌স নগরে (Leeds) বস্ত্রব্যবসায়ীগণ সুবৃহৎ রঞ্জনাগার স্থাপন পূর্ব্বক বিখ্যাত কয়েক জন রাসায়নিককে উচ্চ বেতনে রঞ্জনশিল্পের উন্নতিকল্পে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাহাদের আর কোনও কার্য্য

নাই। জার্ম্মাণিতে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের অনেক কারখানায় বিংশত্যধিক বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক বহু শিষ্যসহ নিত্য নূতন রং আবিষ্কারের জন্য এবং প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালী সমূহের উন্নতি-চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত দুটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে আধুনিক রঞ্জনশিল্পের উন্নতিকল্পে কি প্রকার প্রবল চেষ্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।

রঞ্জনশিল্পে বৈজ্ঞানিক

যাহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আধুনিক রঞ্জন শিল্প বর্ত্তমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পার্কিনের নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে যাইয়া ঘটনাক্রমে প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইংলণ্ডে হফ্‌মেন (Hoffmann) মেলডলা (Meldola), গ্রিন (Green), নেক্ট (Knechet) প্রমুখ রাসায়নিকগণ, এবং জার্ম্মানিতে লিবারমেন (Liebermann), নিট্‌জকি(Nietzki), বেয়ার (Bayer), বটিগার (Bottiger), সুলট্‌জ্ (Schultz), গ্রিস (Griess), উইট (Witt), কেরো (Caro), কনিগ (Konig), লেভিনষ্টেইন (Levinstein), এনসাজ (Anochutz), ওলার (Oehler), কিরকফ (Kirchoff), লিমপেক (Limpach), গ্রাবা (Graebe), গোল্ড স্মিড্‌ট (Goldschmidt), ফিসার (Fischer), নেথেনসন (Nathenson), লাউথ (Lauth), হিউমেন (Heumann), সেণ্ডমায়ার (Sandmeyer), স্রবা (Schraube), প্রমুখ বহু রাসায়নিকের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও ইংলণ্ডেই প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়, জার্ম্মেনগণ এ বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম মনোযোগ দেন, এবং বিগত ৪০। ৫০ বৎসরের চেষ্টায় বর্ত্তমানে তাহারা রঞ্জনশিল্পে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে, সুদূর ভবিষ্যতেও যে অন্য কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিবে সেরূপ আশা করা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। যত্ন এবং অধ্যবসায়ের বলে বৈজ্ঞানিক

আধুনিক রঞ্জন-শিল্পে জার্ম্মেণির স্থান।

উপায়ে ক্ষুদ্রতম শিল্পেরও কতদূর উন্নতি সাধিত হইতে পারে ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জার্ম্মান রাসায়নিকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, হয়ত কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পটা অনাদরে এবং উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মাতৃক্রোড়েই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, এবং রসায়ন-ইতিহাসের কোনও কোণে উল্লিখিত থাকিয়া, "মধ্যযুগে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের চেষ্টা"র ন্যায়, "প্রকৃতিকে জয় করিবার পার্কিনের নিষ্ফল প্রয়াস" নামে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণের পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইত।

ইউরোপে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, জার্ম্মান রসায়নিকগণ প্রতিদিন একটি নূতন রং প্রস্তুত না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। প্রবাদের মূলে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। বিগত ৩০। ৪০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৯০ হাজার কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য সকলগুলিই যে পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষণে সমর্থ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে দুই সহস্রাধিক কৃত্রিম রং রঞ্জনশিল্পে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহাদের অধিকাংশই জার্ম্মেণিতে প্রস্তুত। জার্ম্মাণ শিল্পীগণ কামধেনুর মত যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কৃত্রিম রং অনায়াসে প্রস্তুত করিতেছেন।

রঞ্জনশিল্পে যন্ত্রাদির প্রচলন।

পূর্ব্বে শিল্পীগণ হাতে হাতে রঞ্জনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনকার্য্যের জন্য নানা প্রকার কল ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে রঞ্জন সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত কার্য্যই যন্ত্রাদি সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।* এই সমস্ত যন্ত্রাদির প্রচলনই আধুনিক পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ। যন্ত্রাদির প্রচলনে শিল্পীগণের বহু সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ, উহাতে সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ হয় অথচ একটি কারখানায় বহুলোকের দরকার হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রঞ্জনকার্য্যও অধিকতর সুচারুরূপে সাধিত হয়। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে কোনও রঞ্জনব্যবসা চালাইতে হইলে হাতে রঞ্জন করিয়া প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি

---

* যথা— 1. Journal of the Society of Dyers & Colourists.
2. Dingler's Polytechnisches Journal.
3. Zeitschrift fier farben and Textile-chemie.

সাহায্যে আধুনিক রঞ্জনপ্রণালীসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধেই এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে সামান্য উল্লেখ ব্যতিরেকে রঞ্জন শিল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষে উক্ত শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অত্যল্পই বলা হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রঞ্জনশিল্প বা দেশীয় রংসমূহ দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থাদিতে কিছুই বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নানাদেশীয় বৈদেশিক পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি হইতে মধ্যে মধ্যে দেশীয় রঞ্জনশিল্প এবং তৎকালে প্রচলিত রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তরূপ বিবরণী হইতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিবিগর্হিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নানা প্রকার দেশীয় রং এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। *

দেশীয় রঞ্জন শিল্পের ইতিহাসের অভাব

পূর্ব্বোক্তরূপ বিবরণের অভাবের কারণ এই যে এ দেশে পূর্ব্বে রঞ্জনবিদ্যাটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বংশানুক্রমে "রংরাজ" নামক এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্ত্রাদি রঞ্জন করাই "রংরাজ"দের ব্যবসায় ছিল। "রংসাজ" নামে আর এক শ্রেণীর লোক নৌকা, পালকি প্রভৃতি কার্য্যের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি রঞ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। যাহারা নীল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিত। তাহারা "নীলগার" নামে পরিচিত ছিল।

দেশীয় রঞ্জন শিল্পের অবস্থা

* এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলা পাঠ করিতে পারেন। (1) "A Manual of dyeing" by Knecht Rawson and Lowenthal, (2) "Dyeing of Cotton Fabrics" by Frankland Beech. (3) "Dyeing of Woollen Fabrics" by Frankland Beech.

* ভারতীয় রঞ্জনশিল্প এবং রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায় এরূপ কোনও প্রাচীন গ্রন্থের নাম পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও জানা থাকে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।—লেখক

উক্ত শ্রেণীসমূহের লোক ছাড়া অন্য কেহ রং এর কাজ করা হেয় এবং অপমানসূচক মনে করিত। উহারাও নিজেদের অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে অন্য কাহারও নিকট প্রাণান্তেও কিছু ব্যক্ত করিত না। জাতিগত সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া পাশ্চাত্য সর্ব্বজনীনতার ন্যায় উদারতা লইয়া ভারতবাসীগণ কখনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন নাই। শিল্প ও ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে এই ঢাকা নগরেই যাহারা মহিষ শৃঙ্গের ও হস্তিদন্তের শিল্পে ব্যাপৃত, তাহারা বংশানুক্রমে উক্ত কাজেই লিপ্ত আছে এবং 'খন্দেকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা হুকার নল প্রস্তুতের ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহারা "নইচাবন্দ", এবং যাহারা শাল 'রিপু' এবং পরিষ্কার করে তাহারা বংশানুক্রমে "শালকর" নামে পরিচিত। অথচ "খান্দেকার" "নইচাবন্দ" বা "শালকর" নামে কোনও জাতি নাই। উহারা ব্যবসায়িক সম্প্রদায়মাত্র। ঐরূপ প্রকৃত পক্ষে রংরাজ নামে কোনও জাতি ছিল না। রঞ্জনশিল্পটা অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় উহাদের নিকট হইতে কোনও রূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইত না।

আজ কাল পাশ্চাত্যদেশসমূহে যেরূপ এক একটী রঞ্জন শালায় শত শত লোক নিযুক্ত থাকিয়া কল ও যন্ত্রাদি সাহায্যে রঞ্জন কার্য্য সম্পাদিত করিতেছে, সেরূপ ভাবে পরিচালিত শিল্প এ দেশে কখনও ছিল না। প্রত্যেক নগরে এবং বড় বড় গ্রামে "রঙ্গরাজেরা" স্থানীয় ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি রঞ্জন করিত। প্রয়োজনাধিক রঞ্জিত বস্ত্রাদি স্থানান্তরে প্রেরিত হইত বা পাইকারগণ কর্তৃক রপ্তানী হইত। এই সমস্ত কারণে দেশীয় রঞ্জন প্রণালী সমূহের কোনও উন্নতি হয় নাই। দ্বিসহস্র বা তদূর্দ্ধ কাল পূর্ব্বেও যে প্রণালীতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত বর্ত্তমান সময়েও অনেকটা সেই সেই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়া থাকে। "রঞ্জন বিদ্যাটা" অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হওয়া ভারতীয় রঞ্জনশিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ।

দেশীয় রঞ্জন শিল্পের অবনতির প্রথম কারণ।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল কৃত্রিম রংসমূহের আবিষ্কারের পর ক্রমে তাহাও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

তাহার কারণ দেশীয় রংসমূহ অপেক্ষা কৃত্রিম রং সমূহ সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। দেশীয় রংসমূহের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও পুস্তকাদি নাই। পক্ষান্তরে পুস্তকাদি সাহায্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কৃত্রিম রংসমূহের সাহায্যে রঞ্জনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। অনেক সময় কৃত্রিম রংসমূহের টিন বা বাক্সের সঙ্গেই উহা দ্বারা কিরূপে বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হয় তাহার বিশদ উপদেশ দেওয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে প্রয়োজন বোধ করিলে রংপ্রস্তুতকারকগণ ক্রেতৃগণের কারখানায় বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া রঞ্জন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য বণিকগণ দেশীয় রঞ্জনশিল্পের ধ্বংস কল্পে যতপ্রকারে হয় সহায়তা করিয়াছেন। তাহারা কৃত্রিম নীল (Artificial Indigo) এবং এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশীয় রংসমূহের অনুকরণে কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। এমন কি, অনেক স্থলে নামটি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে গাভীকে আম্রপত্র খাওয়াইয়া পরে এই গাভীর মূত্র হইতে এক প্রকার পীত বর্ণের রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা "পীউরি" নামে প্রচলিত। সম্প্রতি উক্ত "পিউরির" অনুকরণে "Peori dye" নাম এক প্রকার কৃত্রিম রং বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। *

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের ধ্বংস

(২) নীল এবং মঞ্জিষ্ঠা (Alizarin) ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক রংগুলা কৃত্রিম রং সমূহ অপেক্ষা স্থায়িত্ব হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট ;—বিশেষতঃ পীত এবং হরিত বর্ণের দেশীয় রং গুলি অত্যন্ত অস্থায়ী। বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াটসন (Dr. Watson) শিবপুরে অবস্থান কালে কয়েকটি আদর্শ কৃত্রিম রং এবং প্রচলিত দেশীয় রং সমূহের স্থায়িত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশীয় রংগুলি স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রং সমূহ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। †

কৃত্রিম রং প্রচলনে দেশীয় রংসমূহের কি ভীষণ অবনতি হইয়াছে দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১। নীল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণ। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নীলের চাষ মোটেই হয় না। পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় ফুলবেরিয়া লক্ষ্মীপুর, আটিগ্রাম, সুয়াপুর প্রভৃতি বহুস্থানে নীল কুঠি ছিল। এক্ষণে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ সমূহ অতীত গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের গবেষণার উপাদান প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪,৭৪,৫৯,১৫৩ টাকার এবং ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ৫,৩৫,৪৫, ১১২ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। কৃত্রিম নীল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯৬ সন হইতে নীলের ব্যবসায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৯-১০ সনে মাত্র ৩৫,১৪,১৫৪ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে।*

কৃত্রিম রংএর প্রচলন হেতু দেশীয় রংসমূহের অধঃপতন।

অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর মধ্যে নীলের রপ্তানি ষোড়শাংশের একাংশে পরিণত হইয়াছে। আগামী ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে নীলের চাষ ভারতবর্ষ হইতে বোধ হয় এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৯০৫-৬ সনে ১,১২,২৪৩ টাকার কৃত্রিম নীল জার্ম্মাণি হইতে এ দেশে আমদানি হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় ৩৩টি নীলকুঠী ছিল ও একলক্ষ বিঘা জমিতে নিয়মিত নীলের চাষ হইত এবং প্রতি বৎসর অন্তত ২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত। †

দেশীয় নীলের ব্যবসায়ের অবনতি

নীলের ন্যায় পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে কুসুমফুলও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬,৫০,৮২৭, টাকা মূল্যের কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশ হইতে ফুলের ব্যবসায় এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর

---

* Sir George Watt,—Commercial Products of India P. 345. "Nothing is left undone that could expedite the complete overthrow of the Indigenous crafts"

† E. R. Watson, Asiatic Society of Bengal (Memoirs) 1907.

* Statistics of British India, Fourth Issue 1911. Part II.

† Taylor's Topography of Dacca (১৮৪০ খৃঃ) ১৬৩ পৃষ্ঠা

হংকং ও জাপানে অতি অল্প পরিমাণ ফুল প্রেরিত হইয়া থাকে মাত্র। কৃত্রিম রংসমূহের প্রতিযোগিতা নিবন্ধন কুসুমফুলের মূল্য গত ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে পূর্ব্ব মূল্যের এক পঞ্চমাংশে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঢাকা জেলা কুসুমফুলের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী নদীর উভয় কূলস্থিত ভূখণ্ডে প্রচুর পরিমাণ কুসুমফুল উৎপন্ন হইত। বিলাসপুর এবং পাটের গোটা কুসুমফুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮২৪-২৫ সনে ২,৯০,৬৭৬॥ ১০ মূল্যের ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল,—উক্ত পরিমাণের ¾ অংশ ঢাকা জেলায় উৎপন্ন। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বেও ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় কূলে অসংখ্য কুসুমফুলের ক্ষেত্র দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমান সময়ে সে নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য আর দেখা যায় না। †

কুসুম ফুলের ব্যবসায়ের অবনতি।

পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রঞ্জন-শিল্পের জন্মস্থান প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ রংএর পরিবর্ত্তে বহু টাকা মূল্যের কৃত্রিম রং অধুনা প্রতি বৎসর আমদানী হইতেছে। ১৯০৯-১০ সনে আমরা ১, ১০,৯১,০১৪ টাকা মূলের কৃত্রিম রং বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়াছি। কৃত্রিম রংসমূহের প্রচলনের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে অল্লাধিক আন্দোলন হইয়াছে—কিন্তু পরিণামে তাহাতে বিশেষ কোনও ফল দর্শে নাই।

ধ্বংসোন্মুখ দেশীয় রঞ্জনশিল্পের রক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিভিন্নপ্রদেশপ্রচলিত দেশীয় রং ও রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে * বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় রঞ্জন উপকরণ, রঞ্জন শিল্প, ও রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকাদির অভাব নাই।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের রক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নোক্ত দুই প্রকার পন্থার একটি অবলম্বন করিতে হইবে। (১) দেশীয় রং দ্বারা রঞ্জনপ্রণালীসমূহের উন্নতি সাধিত করিয়া উহাদিগকে প্রচলিত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রংগুলি প্রাকৃতিক রংসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রাকৃতিক রংসমূহের মধ্যে এ যাবৎ নীল এবং এলিজেরিন মাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের রাসায়নিক গঠন, প্রকৃতি এবং উহাদের দ্বারা প্রকৃত রঞ্জনপ্রণালীও নির্দ্ধারিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রংএর সমবেত তালিকায় স্থায়িত্ব হিসাবে নীল ও এলিজেরিন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, যদি অন্যান্য দেশীয় রংগুলির রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি নির্দ্ধারিত এবং তাহাদের দ্বারা প্রকৃত রঞ্জনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহারাও স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রং সমূহের উচ্চে স্থান পাইবে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতেও যে আমরা বৈজ্ঞানিক মার্গে ততটা অগ্রসর হইতে পারিব সেরূপ কল্পনা করাও ধৃষ্টতামাত্র। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত দেশীয় রংগুলির অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্জ রংসমূহ সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মেণিতে কষটেনেষকি (Kostenscki) ও ইংলণ্ডে এ, জি, পারকিন (A. G. Perkin) প্রমুখ রাসায়নিগণ উহাদের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা।

(২) রঞ্জন কার্য্যের জন্য কৃত্রিম রং ব্যবহার করিতে হইবে। এদেশে কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুতের কোনও কারখানা নাই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও যে স্থাপিত হইবে সেরূপ আশাও অতি অল্প। কাজেই ইয়ুরোপ হইতে কৃত্রিম রং আনাইয়া ব্যবসায়ে চালাইতে হইবে। দেশে একটি রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্ব্বক কৃত্রিম রং দ্বারা সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়া ব্যবসা চালাইলে, কিরূপ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধান্তরে পূর্ব্বে § আলোচনা করা হইয়াছে।*

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সরকার

† Taylor's Topography of Dacca (১৮৪০) ১৩৩-৩৫পৃষ্ঠা।

* ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রঞ্জনশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করার আশা রহিল।

§ প্রতিভা ১৩২০ সন বৈশাখ "রঞ্জনশালা স্থাপন"

* এই প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

সেরগঙ্গ বা শিরগঙ্গা পাখী *

এই পাখীকে কেহ কেহ সেরগঙ্গ বা সেরগং কহে। কেহ বা শিরগঙ্গা বলে।

শিরগঙ্গা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের শরীরের বর্ণ হরিদ্রাভ নীল। দূর হইতে বেশ চক্‌চকে দেখা যায়। ঠোঁট লাল। ঠোঁটের উভয় পার্শ্ব শক্ত এবং ধারাল। এই পাখীর মাথার উপরের কতিপয় পালক গাঢ় হরিদ্রাভ নীল। দূর হইতে 'জাহ্নবীর ফেনলেখার' মত দেখা যায়। জানি না কোনও ভাবুক কবি এই জন্যই ইহার নাম শিরগঙ্গা রাখিয়াছেন কি না? মাথার এই টোপটায় শিরগঙ্গার সৌন্দর্য্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল। তাহার চারি পার্শ্বে লাল একখানা সরু চামড়ার বেষ্টন। এই ভ্রুযুগলে চক্ষুর সৌন্দর্য্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই লাল ভ্রুর চতুর্দ্দিকে কাল পাখার বেষ্টনী। ইহাদের পা দুইটী অপেক্ষাকৃত মোটা। কুসুম রঙের পা দুইটীর মধ্যে ঈষৎ সবুজ বর্ণের আঙ্গুল। আঙ্গুলে চারিটী পর্ব্ব। নখ বক্র এবং তীক্ষ্ণাগ্র। লেজের পাখার মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে। এই পালকগুলির উপরের দিকের রঙ্‌ যতটা গাঢ় নীচের দিকের রঙ্‌ তেমন নয়, অনেকটা ফিকে এবং শ্বেতাভ। উড়িবার সময় ইহারা ক্রমে পাখার ঝাপ্টা দিতে দিতে একবার উপরের দিকে একবার নীচের দিকে কখন সরল, কখন বা বক্রগতিতে উড়িয়া যায়।

শিরগঙ্গা কখন কখন লোকালয়ের সান্নিধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইহারা ফড়িং, তেলাপোকা, প্রভৃতি ও নানাবিধ কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেক সময় উড্ডীয়মান ফড়িং বা কীট, তীর বেগে ছুটিয়া ধরিতে শিরগঙ্গ খুব তৎপরতা প্রদর্শন করে।

শিরগঙ্গের আর এক ওস্তাদী আছে। সে সব পাখীর বুলিতেই ডাকিতে পারে। গৃহপালিত শিরগঙ্গ কখনও কাকের স্বরে ডাকিয়া অন্যান্য কাককে উৎকণ্ঠিত করে, কখন বা শালিকের মত শব্দ করে, কখন বা দয়েল কিম্বা ফিঙ্গার মত শীষ দিয়া থাকে। ইহাদের শব্দানুকরণ ক্ষমতা এমন আশ্চর্য্য যে, যে জাতীয় পক্ষীর শব্দের অনুকরণে ইহারা যখন ডাকে, সেই জাতীয় পক্ষীই তাহাতে প্রতারিত হয়। অপর জাতীয়ের স্বরবৈচিত্র্য বা স্বরের কম্পন কিম্বা কোনও ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া শিরগঙ্গ আপন বুলি ছাড়িতে কসুর করে না। এত শক্তি থাকাতেও শিরগঙ্গকে মানুষের বুলি বলিতে শোনা যায় নাই। বহু চেষ্টায়ও ইহাদের মুখে "রাধা কৃষ্ণ" বুলি বা ময়না, টিয়া, শালিক প্রভৃতির মত মানুষের স্বরে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া যায় নাই।

শিরগঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে উচ্চ গাছে বাসা নির্ম্মাণ করে। গাছের কোটরে বা খোড়লে খড়, কুটা, শুষ্ক অথচ নরম পাতা ইত্যাদি বিছাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মাঘ মাসেই ইহাদের গর্ভ ধারণের সময়। তিন মাস কাল গর্ভ ধারণের পর বৈশাখ বা কখন কখন জ্যৈষ্ঠ মাসে শিরগঙ্গ আপন বাসায় ডিম্ব প্রসব করে। ইহারা তিন চারিটীর অধিক ডিম্ব প্রসব করে না। ইহাদের ডিম্ব শালিকের ডিম্বের মতই বড়। পনর হইতে পঁচিশ দিন তা দিবার পর ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কখন কখন পক্ষিণী ফাল্গুন মাসেও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই সকল ডিম্ব হইতে বৈশাখ মাসেই ছানা হয়। সাধারণতঃ বৈশাখের শেষ ভাগ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত শিরগঙ্গের ছানা দৃষ্ট হয়। ছানাগুলি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোটরে থাকিয়াই মা বাপের সংগৃহীত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* গায়ক পাখী

* শিরগঙ্গ পাখী শ্রীহট্ট অঞ্চলে দৃষ্ট হয়।—লেখক

ভাটিয়াল গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২২

দাদা, জিজ্ঞাসিয়ে দেখ চাই
কার রমণী কাল জলে যায়।
ধীরে ধীরে যায় গো রাধে হীরার কলসী কাখে,
মাজা চিকন হেইলে ডুইলে যায়।
আগে পাছে পঞ্চদাসী, মধ্যে রাধা রাই রূপসী,
চন্দ্রবদন কেমন দেখা যায়।
মাজা—কটি।
দেখ চাই—দেখ দেখি।

২৩

ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য পাগল, ভগবানও তেমনই ভক্তের জন্য উতলা; তাই কৃষ্ণ সুবলসখাকে বলিতেছেন:—

ও সুবল রে গুণের ভাই রে সুবল,
আমায় শীঘ্র এনে দেখা রে সুবল
ব্রজেশ্বরী রাধা।
হস্ত দিয়ে দেখ রে সুবল আমার হৃদয়ে,
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে আনল আমার অন্তরে।
আনল—অনল।

২৪

কৃষ্ণ রাধার উদ্দেশে বলিতেছেন:—

ওগো উন্মাদিনী রাই,
প্রেমডোরে বাঁধব তোরে, কাইল সকালে যদি লাগুর পাই
কি ক্ষেপে জল ভরতে গো আইলা এত সকালে,
রূপ দেখিয়ে ভুইলে গো রইলাম, দিলে না মানে।
সজনী তোর হাতে গো ধরি শোন বলি তোরে,
এনে দেও মোর প্রাণের গো প্রিয়া মরণের কালে।
পদিলে—অন্তরে

২৫

সুবল বল বল, চল যাই—কেমন আছে,
কমলিনী রাই।
ওরে তার কারণে বৃন্দাবনে সুবল,
রাই বইলে বাঁশী বাজাই।
গেলাম রাইয়ের মান সাধিতে
ধরলাম রাইয়ের চরণেতে,
তবু রাইয়ের মান ভাঙ্গিল না;
আমায় দিল আশা, দিল দাগা রে—
সুবল আমার আর পিরীতের কার্য্য নাই।
শ্রীগুরুর চরণ ভরসা—
হৃদিরামের মনের আশা—
চল আমরা ব্রজধামে যাই।
একবার এনে দেখাও তারে রে সুবল
আমি জন্মের মত দেইখে যাই।

প্রকৃত প্রেমিক-ভক্তের সঙ্গে তাহার প্রাণারামের এই রূপই মান অভিমান সাধাসাধি—পায়ে ধরাধরি এবং ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি হয় বটে। কিন্তু সেই মনচোরের বাঁশী ত নীরব থাকিতে পারে না,—সে সংসার-বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে "রাই ব'লে" বাজিতে থাকে, অনন্তের এমনই আকর্ষণ!

হৃদিরাম—এই গানটির রচয়িতা।

২৬

অরূপের রূপ প্রাণে অনুভব করিয়া মন পাগল হইয়া উঠিয়াছে—সংসারের জ্বালা ত আর সহ্য হয় না—উপায় কি? তাই রাধা বলিতেছেনঃ—

রূপসাগরে ডুব্‌ল নয়ন উপায় কি বল না।
ঘরের জ্বালা কাল ননদী দেয় সদা যাতনা।
কাঁচাসোনা নীলবরণ, রমণীর মন করে হরণ,
মন চলে না গৃহে যেতে—উপায় কি বল না।
কালিন্দী যমুনার ঘাটে, রূপসী সব দেখলাম তাতে,
কাখের কলসী ভূমে থুইয়ে, মন চলে না গৃহে যেইতে
উপায় কি বল না।

কাঁচাসোনা নীলবরণ—এখানে বোধ হয় "কাঁচাসোনার" চলচল ভাবটার সঙ্গে উপমা দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

———

২৭

রাধা সখীদিগকে কৃষ্ণদর্শনে আহ্বান করিতেছেন! সে মনোমোহনরূপ একা দেখিয়া যে আশ মেটে না—অন্যকে তাহার ভাগ না দিলে যে প্রাণের তৃপ্তি হয় না তাই রাধার এ আহ্বান ঃ—

তোরা কে কে যাবি জল ভরিতে চল গো অবলা,
কদমতলায় নট গো বর ডাকৃছে চিকন কালা গো।
শ্যামের গলে মোহনমালা, হাতে মোহনবাঁশী গো।
আমি মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে না পারি গো,
আমার গৃহে যাইতে মন চলে না আমি যাব
কদমতলা গো।
ওগো পিরীত কইরে যে জন মরে, আগো সফল
জনম তার গো।
আরি সহিতে না পারি জ্বার গো—শ্যাম পিরীতের
জ্বালা গো।

"নট গো বর" এরূপ কোন একটি শব্দের মধ্যভাগে "গো" শব্দের প্রয়োগ ভাটিয়াল গানে প্রায়ই দেখা যায়।

———

২৮

রাধিকা কৃষ্ণভাবে বিভোরা—সে তাঁহাকে দেহ প্রাণ সব সমর্পণ করিয়াছে।

দেহ প্রাণ সঁপিলাম গো যার লাগি ও বঁধুরে।
পদের উপর পদ থুইয়া, কদম্ব হেলান দিয়া,
বাজাও বাঁশী রাধার নামটি লইয়ারে।
ঝাড়িয়া মাথারই চুল, খোপায় দিতাম চম্পা ফুল,
খোপার উপর ভ্রমরা গুঞ্জরে।
গোকুলের যত নারী সবই তোমার আজ্ঞাকারী,
বঁধু তোমার লাগি আমার চিত্ত বাঁধারে।

———

২৯

রাধা কহিতেছেন—"সখি, এতদিন বেশ ছিলাম, কিন্তু যে অবধি সেই মনচোরকে দেখেছি সে অবধি আমার প্রাণে একি ভয়ঙ্কর জ্বালার উদ্ভব হইয়াছে?"—

নিদাগাতে দাগ লাগাইল প্রাণ বঁধু কালিয়া
আরে প্রেমজ্বালায় প্রাণ যায়।
বল সজনী প্রাণ সজনী বংশীর ধ্বনি শুনা যায়,
ওগো কদম্বেরি ডালে বংশী বাজায় শ্যামরায়।
হাইটা যাইতে পাড়ার লোকে যত মন্দ ব'লে যায়
(ও প্রাণ সই প্রাণ সই গো)
ওগো লোকের মন্দ পুষ্প-চন্দন—
অলঙ্কার পরেছি গায়।

———

৩০

প্রাণবঁধু কালিয়া—
ও বঁধুরে আমি অতি রাঙ্গা রে পতি—
কদম্বেরি ফুল,
তুমি নি রাখিবা বঁধু রাধার জাতি কুল।
ও বঁধু রে আকাশেতে ওঠে রে তারা
আস্তে যায় ঘেরিয়া ;
যাইবার কালে নিঠুর বঁধু না চাহিলা ফিরিয়া
(সুজন বঁধু)

আমি ত "কদম্ব ফুলেরই" মত অমল সুন্দর পরিমলপূতা। তবে হে আমার প্রাণেশ্বর আমার জাতি কুলের দিকে না চাহিয়া তুমি চলিয়া যাইবে ইহা কি সম্ভব? কিন্তু হায় তাহাই যে হইল! বঁধু, আকাশের তারারই মত তুমি আমার নিকট উদিত হইয়াছিলে, আবার সে যেমন মেঘের কোলে অন্তর্হিত হয় তুমিও তেমনি চলিয়া গেলে! তোমাকে "সুজন" বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এমনি "নিঠুর" তুমি, যে "যাইবার কালে" একাবর ফিরিয়াও চাহিলে না।

———

৩১

এখন আমার কি অবস্থা একবার এসে দেখ:—
সময় ছাড়িয়া রইলা রে শ্যাম গুণমণি,
আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুইরা ফিরি—হইয়াছি
পাগলিনী রে।
পুরুষ ভ্রমর জাতি, আগে ত না জানি,
প্রেম কইরে ছেইড়ে গেল কইরে কলঙ্কিনী রে।
সোহাগে সোহাগে প্রেম শিখাইয়াছি আমি,
এত কষ্ট দিবা বইলে আগে ত না জানি রে।

———

৩২

কৃষ্ণ-বিরহে হতাশ হইয়া এখন রাধা বলিতেছেন:—
ওগো কালার পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই,
আর যাব কই!
না জাইনে কঠিনের সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম,
আর যাব কই!
যার জন্যে পাগলী হইলেম সেবা কই আর আমি কই,
পান খাইয়া চুনে মইলেম—মনে ছিল কাঁচা দই।

———

৩৩

এবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান ছাড়িয়া একবার পল্লীগ্রামের গৃহস্থালীর একটি অপ্রীতিকর চিত্র গানে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই দেখাইব। এই গানটি শ্বশুরগৃহে ননন্দা প্রপীড়িত হতভাগিনী বধূর উক্তি। কত গৃহে এইরূপ "বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল" উৎপীড়নের অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর লয়? গানটি এই:—

আমি নন্দের জ্বালায় বাঁচি না,
কাল যমে আমায় নিল না!
দেইখে যাও গো বইন সকলে,
এত খিট্‌কাল কার বাড়ীতে
নিত্যাই খিট্‌কাল ভাল লাগে না!
ওগো নন্দে ভাল কইতে মন্দ বোঝে গো!
বাপ ভাইয়ে দিছেন বিয়া,
সুখের কামাই খাব গিয়া,
সুখ হবে তার দুখ্‌ই গেল না!
নন্দ=ননদ।
বইন=ভগিনী।
খিট্‌কাল=অন্যায়=অতৃপ্তি-জনিত নিন্দা।
কামাই=রোজগার।

———

৩৪

সংসারের জীব প্রকৃতির একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অসাড়বৎ চলিতে থাকে। নিম্নলিখিত গানটিতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ব্বাগ্রে পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সংসার-সাগরের উজান দিকে নৌকা ভাসাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আগের নাইয়া বড় ভাল,
ভাটা ছাইড়া উজান ধর—পড়বি না ঘোলায়।
আরে প্রেমনদীর কুলে বইসে, তুমি শরীল জুড়াও
প্রেম বাতাসে,

আরে ভাটাও গেল, জোয়ারও গেল, কোন সন্ধানে
যাইবা রে তুমি।
গুরুগোসাই কোনরঙ্গে আমার বেঁধেছে ঘরখানি—
বন্দে বন্দে যোরা,
মহাজনের মাল ভরিয়ে প্রেম নদীতে বইসে আছ রে
তুমি।

ঘোলায়—ঘূর্ণাজলে।

একদা বর্ষার সময় কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গবীর কেদার-জননীর সমাধি-মঠ-সংলগ্ন পদ্মাতীরে নৌকায় শুইয়া ছিলাম। গভীর নিশীথে ভগ্ননিদ্র হইয়া শুনিতে পাইলাম নাবিককণ্ঠে সারিন্দাসহযোগে গীত হইতেছে :—

ওরে দয়াল তোমায় ডাইকা সানাল (ঈশ্বর)
না পাই কূল রে ;
ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।
ওরে তোমার নামের গুণেরে দয়াল,—
দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।
তোমার বালক রে দয়াল,
ডাইকা সানাল না পায় কূল রে ;
তোমার নামের গুণে রে দয়াল
ফিরিয়া ত লইও রে।
তোমার আসন, তোমার বসন রে দয়াল,
সানাল ফিরিয়া ত লইও রে।
ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।
আগে যদি জানতাম রে ভাই, মাঝির এতই চোট্,
ওরে তবে কি রে দিতাম বা'গা তেমাল্লার উপর—
আরে মাঝি বাইয়া যাও রে,
মাঝি বাইয়া যাও রে——এলাহ্ দরিয়ার মাঝে
আমার ভাঙ্গা নাও
আরে মাঝি বাইয়া যাও রে।

মুগ্ধচিত্তে গানটি শুনিলাম। গানের সুরে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল——মানসনেত্রে দেখিলাম ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন উথলিয়া উঠিয়াছে—দেখিলাম

"বিদ্যুৎ চমকে ত্রাশি,' হাহা করে ফেন রাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্রহাসি জড়প্রকৃতির।"
আর সেই তরলগরলভরা উন্মাদিনী—
"রোষে, ত্রাশে উর্দ্ধশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,'
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল।"

সেই ভীষণ তরঙ্গমালার উপরে এক অসহায় তরণী "কলার খোলার', মত আন্দোলিত হইতেছে। কর্ণধার হতাশ হইয়া অসময়ের কাণ্ডারীকে প্রাণের অন্তস্থল হইতে আহ্বান করিয়া বলিতেছে "দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।" সেত "বালক" মাত্র, তাহার কি ক্ষমতা যে এ ভয়ঙ্করী পদ্মার গ্রাস্ হইতে নৌকা রক্ষা করে? হে "দয়াল, তোমার নামের গুণে" তুমি "কাণ্ডারী হও"। তাহার যাহা কিছু সবই "দয়াল, তোমার", তুমি এ সব "ফিরিয়া ত লইওরে।" হায় আগে যদি সে জানিত যে "মাঝির এতই চোট" তবে কি সে "তেমাল্লার উপর"—তিন তালা দালানের সমান উঁচু ঢেউয়ের উপর নৌকা, ধরিত? কিন্তু এখন আসিয়া পড়িয়াছে, আর উপায় নাই। তাই সে ভগবানকে ডাকিয়া নিজের মনকে বলিতেছে "মাঝি, বাইয়া যাও রে।" এই "এলাহ—প্রকাণ্ড—পার কূলহীন—"দরিয়ার মাঝে" তাহার এই "ভাঙ্গা নাও" ইহা কি রক্ষা পাইবে? সে "দয়াল" কে "কাণ্ডারী" হইবার জন্ম ডাকিয়াছে। তিনি অবশ্য শুনিবেন—অবশ্য এ তরী কূলে ভিরাইয়া দিবেন—তাই সে পুনরায় তাহার মনকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে "আরে মাঝি, বাইয়া যাওরে।"

কিন্তু এ উদাস করা গানে শেষটা যে সেই ভব-সমুদ্রের কথাই মনে পড়ে। আকুল কণ্ঠে ডাকিতে ইচ্ছা হয় "দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।" এই "এলাহ দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙ্গা নাও" লইয়া ইহার ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সেই "দয়ালের" উপর

পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া মনুকে বলিতে পারা যাইবে কি "আরে মাঝি, বাইয়া যাওরে ?" *

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

ভারতে মূর্ত্তিপূজার আদিযুগ

(উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে পঠিত)।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পদার্থগঠিত, যাবতীয় স্থূল অবয়ব যেরূপ ক্রমশঃ পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে মানসগ্রাহ্য ভাব-পরম্পরাও তেমনি বিন্দুরূপে প্রথম দর্শন দিয়া বিরাট হইতে বিরাটতর রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পরিণতি কোথায় এবং উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা চিরদিন রহস্যের অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছে, থাকিবেও,—কিন্তু প্রথম দর্শন কবে দিল তাহা চেষ্টা করিলে বাহির করা যাইতে পারে, সন তারিখ ঠিক না মিলিলেও মোটামোটি সময়টা নির্দ্ধারণ বোধ হয় অসম্ভব নাও হইতে পারে।

পরিদৃশ্যমান জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, অনাদি জীব-প্রবাহ এক অনন্ত শক্তিময় সত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত ও পরিরক্ষিত, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক পুরুষঃ—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মনিগণা ইব" ইত্যাদি ইত্যাদি একই মহাভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেই মহাভাব এই যে, এক মহাসত্তা জগৎ ব্যাপিয়া তিষ্ঠিতেছে—তিনি আছেন—যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সেই সত্তা হইতে উদ্ভূত ও তাহার অনুগত।

এই বিষয়ে অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে আমি আলোচনার জন্য যে বিষয়টি লইয়াছি তাহার পক্ষপাতহীন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিব; তাহাতে হয়ত এমন অনেক প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইবে যাহা আমার নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের বিরোধী এবং যাহা ভক্তের নিকট শুনিতে মোটেই শ্রুতি-মধুর হইবে না। তাহার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাদের ক্ষমা ও ধৈর্য্য ভিক্ষা করিয়া রাখিতেছি।

এই যে অস্তি-ভাবটি ইহা যুগে যুগে মানুষকে শান্তি দিয়া আসিয়াছে, অথবা যুগে যুগে এই ভাবটিকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়া ধরিয়া মানুষ মনে করিয়া আসিতেছে যে সে শান্তি পাইতেছে। কিন্তু তবুও ইহা একটি ভাবমাত্র; ইহারও উৎপত্তি, প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি আছে। সমস্ত ভাবের মত এই ভাবেরও উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা ঠিক করা যায় না, এবং এই ভাবের বর্ত্তমান অবস্থাকেই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করা সমীচীন নহে। এই ভাবটির প্রকাশ ও বিকাশের ইতিহাসই জগতের ধর্ম্মের ইতিহাস।

মানব-সমাজে এই ভাবটী যখন প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল তখন ইহার বর্ত্তমান আকৃতি ছিল না। নদীর যেমন যে কোনস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উজান যাইয়া

---

* আমি বহুদিন হইতে "ভাটিয়াল গান" সংগ্রহ করিতেছি; কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাকে সহরে থাকিতে হয় বলিয়া আমার সংগ্রহকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ "প্রতিভার" পাঠকবর্গ যে যাহা পারেন দেশের এই লুপ্তপ্রায় গানগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া যেন "প্রতিভা" সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রতি প্রবন্ধেই সংগ্রহকারীর নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের কতকগুলি গানসংগ্রহে আমার বন্ধু বিক্রমপুর হাসারানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন, বি, এ মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। কয়েকটি গান লালমোহন দে নামক জনৈক মাঝির নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছি।—প্রবন্ধ লেখক।

অবশেষে আমরা নদীর উৎপত্তিস্থানের ঝরণা কয়টির নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তেমনি ধর্ম্মেরও বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে উজান বাইতে বাইতে দূর অতীতের এমন এক সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিব যে সময়ের কথা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। সে কোন সময়?

ধর্ম্মভাব মানুষের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; মানুষ আবার ককেসিয়, মোঙ্গলীয়, সেমিটিক ইত্যাদি নানা জাতিতে বিভক্ত।

ধর্ম্মের ইতিহাসই যাহার আলোচ্য ধর্ম্মের সত্যাসত্য তাহার বিচার্য্য না হইলেও চলে। ধর্ম্মের ককেসিয় ধারার আদি প্রকাশ আর্য্যদের আদিম সাহিত্য-চেষ্টা ঋগ্বেদের মধ্যে। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই তাহা কি আর্য্যদেরই নিজের সম্পত্তি না অন্য কোন সবদর জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ন্যাস তাহা তাহা জানা যায় না। আর্য্যদের নিজের সম্পত্তি হইলেও হইতে পারে কারণ ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই উহাই ধর্ম্ম-ভাবের সনাতন আদিম মূর্ত্তি। আর্য্যেতর জাতির মধ্যেও যখনি ধর্ম্মভাব প্রথম দেখা গিয়াছে তখনি এই মূর্ত্তি লইয়াই দেখা গিয়াছে।

এই মূর্ত্তিটি কি? এই মূর্ত্তিটি—জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে যাহা কিছুর সঙ্গে দৈনিক জীবন-যাত্রায় মানবের পরিচয় হয়, তাহাতেই একটি দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তার কল্পনা এবং তাহাতে মানবের শক্তির অতীত শক্তির অর্থাৎ দেবত্বের আরোপ। ঋগ্বেদে এইরূপ দেবতার অভাব নাই। অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, ইন্দ্রদেবতা, সূর্য্যদেবতা, বিষ্ণুদেবতা ইত্যাদি। ধর্ম্মের এই পর্য্যন্ত প্রকাশ সমস্ত আদিম ধর্ম্মেই এক। কিন্তু যে দিন আর্য্যঋষিগণ জ্ঞান-নেত্রে সহসা এই সত্য দেখিতে পাইলেন যে অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবসত্তা নহে, এক মহাদেবসত্তারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে আর্য্যধর্ম্মের স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইল, ককেসিয় জাতির ভারতীয় শাখার সাধনা বিশ্বের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। অন্যান্য জাতি এমন কি ককেসিয় জাতির অন্যান্য শাখাও যখন অগ্নিকে, বায়ুকে, জলকেই চরম জানিয়া প্রথম তাহাদের কল্পনামূর্ত্তি ও পরে তাহাদের বাস্তবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইতেছিল, উপনিষদযুগের আর্য্যগণ তখন গভীর অরণ্যতলে 'বৃক্ষইবস্তব্ধদিবি' পরমজনের মহিমায় বিভোর হইয়া গাইতেছিলেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

উপনিষদ যখন নবলব্ধ মহাসত্যের আবেগে পুলক-কম্পিতকণ্ঠে সুখসুপ্ত ভারতবাসীকে ডাকিতেছিল "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত," তখন সেই মহাবাণী কি নিদ্রাতুর সকলের কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বায়ু, বরুণ, অগ্নিকে চরম বলিয়া জানে এমন লোকেরও অভাব ছিল না। তাহারা তাহাদের দেবতার রূপকল্পনা করিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইতেছিল। বেদে সেরূপ কল্পনা এতই স্পষ্ট যে তাহা বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত বাস্তবমূর্ত্তিতে কেন যে পরিণত হয় নাই তাহা এক মহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ আশে পাশে মূর্ত্তিপূজার ত অভাব ছিল না!—৫০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে মিশর আইসিস ওসাইরিসের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, আসিরিয়া কেলডিয়া ও তাহার কিঞ্চিৎ পরেই সামাস ইষ্টর, মিলিট্টার মন্দির গড়িয়া তুলিতেছিল। নীলনদ ও ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের বাতাস যে পূর্ব্ব দিকে বাহত না একথা কিছুতেই বলা যায় না; কিন্তু কই, সেই বাতাস ত সিন্ধু সরস্বতী গঙ্গায় তরঙ্গ তুলিতে পারে নাই! উপনিষদ-বেদান্তের প্রভুত্বের ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই কিন্তু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণের যজ্ঞবেদী অহরহঃ রক্তে প্লাবিত হইতেছিল। এমনি

সময় শাক্যসিংহের আবির্ভাব। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জীবে দয়া, কর্ত্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠা আর মধ্যপথ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই সেই বিচারকে মোটেই প্রাধান্য দিলেন না,—উপনিষদ-বেদান্তের প্রভুত্বের মূল শিথিল হইয়া গেল। কল্পনাকে এতকাল খর্ব্ব করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন ভক্তি কল্পনাকে সহায় করিয়া জ্ঞানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

খৃষ্টপূর্ব্বা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গৌতম বুদ্ধ বিশ্বে তাহার মহাবাণী প্রচার করিয়া তিরোহিত হন। খৃষ্টপূর্ব্বা চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে মহাবীর আলিকসন্দর প্রবল প্রভঞ্জনের মত আসিয়া পশ্চিম ভারতের উপর পতিত হন। এই দুই শত বৎসরে বুদ্ধের বাণী ভারতের জনসাধারণের উপর কি কাজ করিয়াছে তাহা অবগত হইতে হইলে আলিকসন্দরের ভারত-বিজয় কাহিনী সাবধানে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আলিকসন্দরের সৈন্যসমূহ আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল। তাহারা কয়ন (Koinos) নামক অধ্যক্ষকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আলিকসন্দরকে জানাইল যে যদিও তাহারা পার্থিব শত্রুকে ভয় করে না, তবু দৈববিপৎপাতের আশঙ্কায় তাহারা আর অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ। আলিকসন্দর অনিচ্ছার সহিত তাহাদের মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কতদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন রাখিবার জন্য বিপাশার অপর তীরে দ্বাদশটি বেদী নির্ম্মিত করাইলেন এবং তাহা দ্বাদশজন শ্রেষ্ঠ দেবতার নামে উৎসর্গ করিলেন। আলিকসন্দর ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য দিগ্বিজয়ে আসিয়া এই বেদীর পূজা অর্চনা করিতেন, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এরূপও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে তখনও দেবতার উদ্দেশে পূজা অর্চনা ইত্যাদি স্থলী বা বেদীতে নিষ্পন্ন হইত। নবপ্রকাশিত ভাস কবির প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ নাটকেও বাসবদত্তার যক্ষিণীপীঠে পূজা দিতে যাইবার কথাই আমরা অবগত হইতে পারি।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে ভারতে ধর্ম্মের অবস্থা এই—বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্বও আলোচনা করিতেছেন, এ দিকে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নীচে বা বেদীতে পূজাও আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শন বরহাট স্তূপে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে।

মৌর্য্যবংশের পতনের পর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সুঙ্গদের অধিকার কালে বরহাটস্তূপ নির্ম্মিত হয়। স্তূপ বলিতে আমরা সচরাচর বৌদ্ধস্তূপ বলিয়াই বুঝি এবং এই স্তূপটিও যে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে অবতারের কোনদিনও অভাব হয় নাই। যুগে যুগে অবতার বা আদর্শ চরিত্রের মানবগণ অভ্যুত্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে আদেশ করিয়াছেন—"মানবগণ এই পথে চল তোমাদের জীবন সার্থক হইবে"। তাহাদের ভৈরববাণী সমাজের মধ্যে একটা সাময়িক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু আমাদের দেশের জলবায়ুর কি গুণ, দুই তিনশত বৎসর যাইতে না যাইতেই লোকসকল বলিয়াছে, আমরা মূর্ত্তি গড়িয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা আরম্ভ করিয়া দেই, তুমি দুই হাতে আমাদেরে মুক্তি বিতরণ করিতে থাক"। আমাদিগকে দেশে যতগুলি ধর্ম্ম উত্থিত হইয়া পুনরায় পতিত হইয়াছে সকলগুলিরই পতনের পূর্ব্বলক্ষণে এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বরহাটস্তূপ নির্ম্মিত হয়, বুদ্ধ তাহার তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। এরি মধ্যে কিন্তু বুদ্ধের পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বরহাট স্তূপে দেখা যায়—বুদ্ধের মূর্ত্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের আসন, বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ, যে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বটবৃক্ষ, এই সমস্তই দেবতার মত পূজা পাইতেছে। মানুষ ও অতিমানুষ ভক্তগণ বুদ্ধের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই সমস্ত আসন পদচিহ্ন ইত্যাদির চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া অবনত শিরে পূজা প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান মর্ম্মই এই যে কঠোর আত্মচেষ্টায় মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। অশোক তাহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই মূল সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি পাহাড়ের গায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—"ছোট বড় যেই হও আত্মোন্নতির চেষ্টা কর।" ধম্মপদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্চতম সূত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। গম্ভীর স্বরে মানবসাধারণকে ডাকিয়া বলিয়াছে—"মানবগণ ভীত হইও না, আমরাই পাপের পিচ্ছিল পথে পদস্খলিত হই, আমরাই দুঃখের নিষ্ঠুরচক্রে নিষ্পিষ্ট হই। আমরাই আবার পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াই, আমাদেরই চতুর্দ্দিকে আবার পবিত্রতার দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। আমরা নিজেই নিজের বিনাশকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, আর কাহারও বিনাশ করিবার বা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। পথ আমাদেরই চলিতে হইবে বুদ্ধগণ কেবল আগে আগে পথ দেখাইয়া লইয়া যান।" ব্যক্তিকে এমন প্রাধান্য বোধ হয় আর কোন ধর্ম্ম দেয় নাই, কিন্তু এই নিঃসহায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লইয়া কয়টি লোক সমাজের পথে চলিতে পারে? তাহারা চায় সস্তায় মুক্তি, তাহারা চায় বুদ্ধের পথ দেখান নহে, বুদ্ধের হাতে ধরিয়া ঘাড়ে করিয়া ভবসাগরের পারে লইয়া যাওয়া। তাই আমরা বুদ্ধের নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরেই দেখিতে পাই যে আত্মোন্নতির কঠোর চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বরহাট স্তূপের নির্ম্মাতাগণ বুদ্ধের শূন্য আসনের পূজা আরম্ভ করিয়াছে,—শূন্য আসনে কি করিয়া অচিরেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল তাহা পরে দেখাইতেছি।

শিল্পীগণ বুদ্ধের আসনের পূজা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু পিতৃপিতামহগণ যে দুই একটি দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। এখানে সেখানে' এ কোণে সে কোণে সিংহদ্বারের শীর্ষে সেই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি দুই এক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল, উদীয়মান পৌরাণিক ধর্ম্মে তাহাদের প্রভাব কমিতেছিল, অন্তিম অবস্থায় বরহাটস্তূপে মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াও তাহারা আসর জমাইতে পারিলেন না।

প্রসন্নহাস্যোদ্ভাসিতাননা বিকশিতকমলকরা করিকরোত্থিত কুম্ভের জলে অভিষিচ্যমানা একটি দেবী মাত্র বরহাটস্তূপে সম্মানের আসন পাইয়াছেন,—তিনি বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী শ্রীদেবী। বরহাট স্তূপে এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য ভাস্কর্য্য নিদর্শনেও শ্রীদেবীকে সিংহদরজার উপরে যেরূপ প্রকাশ্য ও সম্মানের স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হয় যে এই সুষমাময়ী দেবী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের পূর্ব্বে এবং পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় দেবী ছিলেন। শ্রীর মূর্ত্তি বরহাট, সাঁচি ভিলসা, অমরাবতী ইত্যাদি সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে খোদিত আছে। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর শেষে শ্রী উদীয়মান গুপ্তরাজাদের কুলদেবীরূপে পূজা প্রাপ্ত হন, ক্রমে রাজকীয় মুদ্রায় ও টাকায় শ্রীর মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে আবিষ্কৃত শেষ গুপ্তরাজাদের আমলের শাসনগুলিও শ্রীমুদ্রাযুক্ত। শ্রীর এমনি প্রভাব ছিল যে বিদেশী রাজা আজিজলস্ পর্য্যন্ত ভারতের একাংশ অধিকার করিয়া শ্রীর

*কলিকাতার যাদুঘরে বরহাট স্তূপের অনেক অংশ আনিয়া রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই প্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শন দেখিয়া আসা উচিত।—লেখক।

মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া মুদ্রা প্রচারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (Cunningham's Stupa of Bharhut p. 117) এবং জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের জননী ত্রিশলা পর্য্যন্ত মহাবীরকে গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্বে পদ্মাসনোবিষ্টা করিকরধৃত কুম্ভের জলে অভিষিচ্যমানা শ্রীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। (Stevenson's Kalpa-sutra S. 44-45) ভারতের কি গৌরবের দিনই ছিল, যে দিন শুভ্রতোয়া সরস্বতীর তীরে তীরে শারদপুর্ণিমার নির্ম্মল জ্যোৎস্না প্লাবনে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পূজা হইত।

শ্রীদেবী কিরূপে যে ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থানে আপনার আসন স্থাপন করিলেন তাহা ঠিক নিরূপণ করা কঠিন। ইহার মধ্যে অনেক রহস্য লুকাইয়া আছে বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতে বিষ্ণুপুরাণে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও শ্রীর জন্মকাহিনী বিবৃত আছে। বিষ্ণুপুরাণে কাহিনীটি যে ভাবে লিখিত আছে তাহাতে নানা সন্দেহ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের অষ্টম অধ্যায়ে পরাশর মৈত্রেয়কে ব্রহ্মার রুদ্রসর্গ বলিতেছেন; তাহাতে বলিয়াছেন যে ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মৈত্রেয় এই কথা শুনিয়াই তাহাকে জেরা করিলেন। "মৈত্রেয় কহিলেন, লক্ষ্মী অমৃত মন্থন সময়ে ক্ষিরাব্ধিতে উৎপন্না শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না কি রূপে বলিতেছেন?" এই প্রশ্নে কিছু বিব্রত হইয়া পরাশর ব্যাক্যজাল বিস্তার পূর্ব্বক যে উত্তর দিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে বিশ্বচরাচরের মধ্যে বিষ্ণুই পুরুষ এবং লক্ষ্মীই প্রকৃতি। মৈত্রেয় কি মনে করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আমাদের ত মনে হইতেছে যে মৈত্রেয়ের প্রশ্নের যে উত্তর পরাশর দিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন। পরাশরও বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে তাহার উত্তরটি ঠিক প্রাসঙ্গিক হয় নাই, তাই পরের অধ্যায়ে লক্ষ্মীর ক্ষিরোদ মন্থনে জন্মকাহিনী মৈত্রেয়কে শুনাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরের অধ্যায়ে কাহিনীটির এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে—পরাশর কহিলেন, "হে মৈত্রেয়, তুমি এ স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে এই শ্রী সম্বন্ধে ইতিহাস আমি মরিচীর নিকট শুনিয়াছি শ্রবণ কর।" কাহিনীটি সকলেই জানেন তবু এইখানে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

দুর্ব্বাসা এক বিদ্যাধরীর নিকট হইতে একটি সন্তানক পুষ্পের মালা চাহিয়া লইয়া ঐরাবতে চড়িয়া দেবরাজ যাইতেছেন দেখিয়া মালাটি তাহাকে দিয়াছিলেন। ইন্দ্র মালাটি লইয়া হাতীর মাথার উপরে রাখেন এবং নির্ব্বোধ হাতী শুঁড় দিয়া টানিয়া সেই মালা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দেন যে তুমি লক্ষ্মীছাড়া হও। দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া দেবগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন এবং অসুরগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলেন। তিনি তাহাদিগকে ক্ষিরোদ সিন্ধুর উত্তরতীরে স্থিত বিষ্ণুর শরণ লইতে পরামর্শ দিলেন। বহু স্তবস্তুতির পরে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া ক্ষিরোদসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক অমৃত আহরণ করিয়া তাহার পান দ্বারা বল সংগ্রহ করিতে দেবতাদিগকে পরামর্শ দিলেন এবং এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য অমৃতের লোভ দেখাইয়া অসুরগণের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। "দেবদেব এইরূপ বলিলে সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান হইলেন।" অবশেষে দেবাসুরের যত্নে ক্ষিরোদ-সমুদ্র মথিত হইল এবং তাহা হইতে যথাক্রমে সুরভি (হবিধাম) উৎপন্ন হইল। তাহার পরে বারুণী দেবী উৎপন্ন হইলেন, তাহার পরে পারিজাত তরু, তাহার পরে অপ্সরা, তহার পরে অমৃত তাহার পরে বিকশিতকমলস্থিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী উত্থিত হইলেন। দিগ্‌গজগণ হেমকুম্ভের জলে তাহাকে স্নান

করাইয়া দিলেন, মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্তে তাহার স্তব করিলেন, সর্ব্বদেবতার সমক্ষে তিনি যাইয়া হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করিলেন। স্ত্রীরূপধারণ করিয়া বিষ্ণু দানবদিগকে প্রতারিত করিলেন—অমৃতপানদৃপ্ত দেবগণ দানবদিগকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।”

কাহিনী শেষ করিয়া পরাশর মৈত্রেয়কে বুঝাইলেন যে ভৃগুর পত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী দেবদানবের যত্নে অমৃত মন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হন।

এই কাহিনীটির মধ্যে গুরুতর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে। সকলেই জানেন আর্য্যগণের এক শাখা ভারতবর্ষে আসে, আর এক শাখা বর্ত্তমান পারস্য তুরস্কে চলিয়া যায়। সুরউপাসকগণ ভারতবর্ষে আশ্রয় করে, এবং অসুরউপাসকগণ পারস্য তুরস্কে আবাস স্থাপন করে। বেদে যেমন অসুরগণ নিন্দিত, তেমন জেন্দ আবেস্থায় আবার সুরগণ নিন্দিত। আর্য্যজাতির এই দুই শাখার মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না, ভারতে যেমন প্রবল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আসিরিয়া অর্থাৎ অসুর-উপাসকদিগের দেশেও সেরূপ প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই দেশের অসুরবানীপাল অসুরনাজিরপাল প্রভৃতি রাজগণের নাম বিখ্যাত। পাশাপাশি স্থিত এই দুই রাজশক্তির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইত।

ক্ষিরোদসমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে দেখা যায় যে অসুররাজশক্তি যখন অত্যন্ত প্রবল তখন কোন বিপুল কার্য্য * সম্পাদনের জন্য দুই রাজশক্তি সন্ধিবদ্ধ হয়। ক্ষিরোদসমুদ্রের উত্তরতীরে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমানে যাহাকে আমরা আরব সমুদ্র বলিয়া জানি তাহা হইলে পূর্ব্বে ক্ষিরোদ সমুদ্র বলিয়া খ্যাত ছিল তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। এমন কি পালরাজাদের সময়েও এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। (দেবপালদেবের তাম্র-শাসন ১৫শ শ্লোক)। এই সমবায়ের ফলে আর্য্যগণ মাখন (হবির্ধাম সুরভি) মদ (বারুণী) গন্ধদ্রব্য (পারিজাত) অমৃত, অর্থাৎ অমৃতোপম ঔষধি সমূহ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। নাগগণ সে সর্প নহে, এক জাতীয় মানুষ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। নাগগণ সুরাসুরের এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিল এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজটা বোধ হয় তাহারাই করিয়াছিল। এই বিপুল কার্য্য উপলক্ষে লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা হইয়াছিল, এই স্থান হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ লক্ষ্মীর পূজা শিখিয়া আসেন এবং পূর্ব্বপরিচিত ভৃগুর স্ত্রী খ্যাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং বেদের শ্রীসূক্তে স্তুত শ্রীর সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া নূতন দেবীকে গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বরহাট স্তূপ এবং অন্যান্য স্তূপে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ক্ষিরোদ-মন্থনে নাগগণের উপস্থিতির বিষয় অবগত হইলাম। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথের কথা হইতে আভাস পাইয়াছি যে ক্ষিরোদ মন্থনে লক্ষ্মীপূজার প্রচার নাগগণই করিয়া ছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতের যক্ষগণ আদিশিল্পী, এবং তাহাদের পরেই নাগগণের স্থান। বরহাটস্তূপ নির্ম্মিত করিতে নাগ ও যক্ষগণই নিযুক্ত হইয়াছিল তারানাথের কথা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে। তাহাই যদি হয় তবে বরহাট স্তূপের লক্ষ্মীমূর্ত্তি নাগগণেরই কীর্ত্তি এবং ক্ষিরোদ-মন্থনে তাহারাই লক্ষ্মীপূজার প্রচার করিয়াছিল বলিয়া আভাস পাইতেছি।

বরহাটস্তূপের দ্বিতীয় শিল্পী যক্ষগণও স্তূপে তাহাদের দেবদেবীগণের মূর্ত্তি আঁকিয়া যাইতে ত্রুটী করে নাই। স্তূপের চারি দরজায় চারিজোড়া যক্ষদম্পতি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক যক্ষদম্পতির নীচে প্রাচীন

* এই বিপুলকার্য্যটি একটা প্রকাণ্ড জলা যায়গার জল বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া যায়গাটিকে লক্ষ্মীর জন্মস্থান অর্থাৎ চাষের উপযুক্ত ভূমি করিয়া তোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ সহ ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রাহ্মীলিপিতে তাহাদের নাম লেখা আছে। কুবেরকে যক্ষরাজ বলা হইয়াছে। যাক্ষিণীদিগের মধ্যে সুদর্শনা যাক্ষিণীর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অঙ্কিত বলিয়া হ্যাবেল সাহেব প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (Indian Sculpture and Painting).

যক্ষের পূজা যে এক সময়ে ভারতবর্ষে খুব বেশী প্রচলিত ছিল নানাস্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির তীব্বতীয় সংস্করণে লিখিত আছে যে কুবের যক্ষ শাক্যদের কুলদেবতা ছিলেন (Asiatic Researches Vol 20 p 300)। সেই পুস্তকেই লিখিত আছে যে বৈশালীর অধিবাসীগণ যক্ষের এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নগরের সিংহদরজায় স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিল। (Seiefner's Tibetan Jales from Khahgayur Rapson's translation Page 81) ভাস কবির প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকে বাসবদত্তার যক্ষিণী পীঠে পূজা দিতে যাইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বরহাটস্তূপ ছাড়াও যক্ষপূজার ভাস্কর্য্য নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পাটনাতে দুইটী মনুষ্যপ্রমাণ যক্ষের মূর্ত্তি মৃত্তিকা নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া তোলা হইয়াছিল। পাটনার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট টিটলার মূর্ত্তি দুইটীকে কলিকাতা যাদুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি দুইটী এখনও তথায়ই আছে।

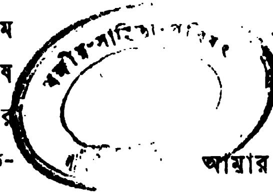
মূর্ত্তিপূজার আদিযুগের আর একটী দেব ও দেবী মাত্র উল্লেখযোগ্য, একটী সূর্য্য ও অপরটী পৃথিবী। ভারতবর্ষের সূর্য্য পূজার ইতিহাস বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য বেদের একজন প্রধান দেবতা। বেদমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্যেরই স্তব। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের বরণীয় জ্যোতিঃকে ধ্যান করা হইয়াছে; তাহাতে সূর্য্যের মূর্ত্তিকল্পনার লেশমাত্রও নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাস্কর্য্য-নিদর্শনগুলিতে সূর্য্যের যে মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা বিদেশের আমদানী নির্ণয় করা কঠিন। গ্রূণউইডেল (Grunwedel) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে সূর্য্য মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সূর্য্যের বেশভূষায় কিন্তু আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহা বিজাতীয়। সূর্য্যের পায়ে বুটজুতার মত এক রকম লম্বা জুতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহাই সূর্য্যের বিদেশ হইতে আগমনের বিশেষ প্রমাণ। সূর্য্যপরে উপানৎ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। সেই সব আলোচনার সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সূর্য্যপদের উপানৎ সূর্য্যেরই একটী বিশেষত্ব। অন্য কোন দেবতার পদে এইরূপ অদ্ভুত ধরণের উপানৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক মাত্র এইটীকেই অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে যে সূর্য্যমূর্ত্তি বিদেশ হইতে আসিয়াছে। যদিও অধিকাংশ সূর্য্যমূর্ত্তির পায়েই এই রকম উপানৎ দেখা যায়, তবুও উপানৎশূন্য সূর্য্যমূর্ত্তিও একেবারে বিরল নহে। বেণ্ডাল (Bendall) সাহেবের "নেপাল" নামক গ্রন্থে একটী সূর্য্যমূর্ত্তির ছবি আছে, তাহার পায়ে উপানৎ নাই। মূর্ত্তির নিম্নস্থ লিপি হইতে জানা যায় যে মূর্ত্তিটী ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। প্রাচীনতম সূর্য্য মূর্ত্তি বুদ্ধগয়ার অশোকের সময়ের প্রস্তরবেষ্টনীর মধ্যে দেখা যায়। সেই মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্য্য আরূঢ়। তাহার দুইদিকে দুইটী স্ত্রী মূর্ত্তি আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় পদে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দণ্ডায়মানা। পরবর্ত্তী সূর্য্যমূর্ত্তিগুলিতেও এই স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যপত্নীদ্বয় সারথী অরুণ, লেখনী মস্যাধারহস্ত শ্মশ্রুল দণ্ড ও মুক্তআসধারী পিঙ্গল, পরবর্ত্তী যোজনা। বুদ্ধগয়ার সূর্য্য রথের মধ্যে এমন ভাবে দাড়াইয়া আছেন যে রথের গর্ভে তাহার পদদ্বয় অদৃশ্য। প্রাচীনতম সূর্য্য মূর্ত্তিগুলির পদদ্বয় প্রায়ই এরূপ রথগর্ভে অদৃশ্য। বোধ হয় সূর্য্যের পদদ্বয় অদৃশ্য করিয়া খোদিত করিবার প্রথা

এইরূপে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই প্রথা যখন দৃঢ়-মূল হইল তখন শিল্পশাস্ত্র সূর্য্যের পাদদ্বয় অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু শিল্পীগণ দেখিল যে পদশূন্য সূর্য্যের মূর্ত্তি কিছুতেই মনোরম করিয়া গঠিত করা যায় না। শিল্পশাস্ত্রের নিষেধ এবং শিল্পীর সৌন্দর্য্যপ্রবণতাই বোধ হয় সূর্য্যপদের উপানৎ ও তদ্‌বিষয়ক কাহিনীগুলির জন্ম দিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে উল্লিখিত আছে যে শকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এ দেশে প্রথম সূর্য্য পূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন বোধ হয় এই কাহিনীর মূলে সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতবর্ষের কল্পনা বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ শকরাজা কণিষ্কের মুদ্রায় যে সূর্য্য মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সপ্তাশ্ব অথবা দণ্ড পিঙ্গল ইত্যাদির কোন চিহ্নমাত্রও নাই। সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা হয়ত শকদ্বীপ হইতে আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া সূর্য্যের মূর্ত্তি নূতন করিয়া কল্পিত ও গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে পৃথিবীদেবীর সম্মানও কম ছিল না। পীপ্‌রাহা হইতে যে সব প্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইখানা স্বর্ণপাতের উপর পৃথিবীদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পরলোক-গত ডাক্তার ব্লকের মতে এই প্রাচীন জিনিষগুলি ৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বুদ্ধগয়া নামক পুস্তকে ২০নং ছবিতে পৃথিবীদেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি অবশ্য পীপ্‌রাহা মূর্ত্তির অনেক পরিবর্ত্তী কালের। এই মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে পৃথিবী এক কূর্ম্মপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া মস্তকে ছত্র এবং পার্শ্বদেশে এক জন অনুচর। পৃথিবী দেবী বোধ হয় বেশী দিন পূজা পান নাই; কারণ পরবর্ত্তী ভাস্কর্য্য নিদর্শনে আমরা পৃথিবীদেবীর সাক্ষাৎ আর বড় বেশী পাই না।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষণ রাজা কণিষ্ক আসিয়া ভারতের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া বসেন। কণিষ্ক তাহার সঙ্গে গ্রীস্ পারস্য আসিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের মূর্ত্তিপূজা লইয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরাৎ বুদ্ধমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক, গণেশ, শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিল। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজার দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। কাজেই মূর্ত্তি পূজার আদি যুগের ইতিহাস আমরা এই খানেই শেষ করিতে চাই।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।



প্রণব

আমার বুকে তোমার আসন,
তোমার বুকে বাণী;
রিক্ত-পাণি বাণীর বুকে
শুভ্র বীণাখানি।
বীণার বুকে ছন্দে গানে
উথ্‌লে উঠে সুর;
সুরের বুকে কুণ্ডলিনী
ওঙ্কার মধুর।
জাগ্‌বে যে দিন মহাফণী
উর্দ্ধ-ফণা হয়ে—
ভূমানন্দে মরব "আমি"
সপ্ত লোক লয়ে।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর নগরে ভারতের গৌরব পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতা পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রের বিদ্যারম্ভ ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়সেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বল্প-কাল মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলে তাঁহাকে দেশীয় প্রথানুসারে কলাপ ব্যাকরণের সূত্র-গণ-অভিধান (অমরকোষ) প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে দেওয়া হয়। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বলে তর্কালঙ্কার মহাশয় অল্পকাল মধ্যেই সে সকল কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। এইবার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রের প্রতিভা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার পাঠের সুব্যবস্থার জন্য নিজের ছাত্র-দিগের মধ্যে দুইজনকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নাম রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ও গোলোক ন্যায়ালঙ্কার। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুতর ছাত্রকে অন্নদান সহকারে বিদ্যাদান করিতেন। তৎকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বলিয়া সে দেশে পরিচিত ছিলেন। পিতৃ-নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখনকার নিয়ম ছিল যে যাঁহারা স্মৃতি-শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য কামনা করিতেন তাঁহারা ন্যায়-শাস্ত্রের ব্যাপ্তিবাদ ও শব্দখণ্ডের অন্ততঃ কতকখানা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া লইতেন। সেই নিয়মানুসারেই তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যাপ্তিবাদ পাঠের জন্য পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ 'ইটাগ্রতলা' গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় সেনাধন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হন এবং সেখানে ভাষাপরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপ্তিবাদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করতঃ পিতৃসমীপে উপনীত হন। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের টোলে তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতার নিকটে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তৎসহ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন। কাব্য এবং অলঙ্কারে তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠেও তিনি তেমনই নিত্য নূতন প্রতিভার পরিচয় প্রদানে পিতৃশিষ্যগণের, বিশেষতঃ পিতৃদেবের, বিশেষ প্রীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরের নিকটবর্ত্তী 'জালকাটা' গ্রামের পণ্ডিত স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণের 'ধাতুসূত্র' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া আসেন। তৎপর পিতৃসমীপে কয়েক বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতৃদেবের আদেশক্রমে বিক্রমপুর "কোড়াপাড়ার" প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের অবশিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শন করিয়া তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পরম যত্নের সহিত স্থান দান করেন। সেখানে নবীন গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধীত শাস্ত্রের পুনরালোচনা, নবনব পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপ্রণালীর উদ্ভাবন এবং শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্যের নব প্রবর্ত্তনা দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর সমাজে অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়া উঠেন এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিচারসভায় অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও গৌরব-ভাজন হইয়া উঠেন। সে সময়ে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে প্রচলিত অনন্যসুলভ পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও স্মার্ত্তসন্দর্ভের স্থানবিশেষের সংযোজনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি

বিশেষ বিবেচনার সহিত সংগৃহীত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় দেশে প্রত্যাগত হন।

এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও পুত্রদের জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন কৃতদার, তিনি কোন রকমে সংসারভার নামাইয়া রাখিয়া ভারতের বিদ্যাতীর্থ নবদ্বীপে চলিয়া যান। তখনও নবদ্বীপের প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। একদিকে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, স্বর্গীয় হরমোহন চূড়ামণি, স্বর্গীয় শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। অন্যদিকে দেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা নবদ্বীপের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপে সেই বারদ্বয়-অধীত স্মৃতিশাস্ত্র লইয়াই ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত কাল স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন ততদিনে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা করিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন "একাবিদ্যা সুশিক্ষিতা" তাই আবার নূতন উদ্যমে অধীতস্মৃতির পুনরালোচন এবং সর্ব্বত্রদুর্ল্ভ প্রাচীনস্মৃতির আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিভা দর্শনে প্রীত হইয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে যত্নের সহিত 'বাদার্থ' পড়াইতে আরম্ভ করেন। এক দিকে নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির গভীর আলোচনা, অন্যদিকে "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" "ব্যুৎপত্তি বাদ" প্রভৃতি বাদার্থগ্রন্থের ভাষাকাঠিন্য ভেদ করিয়া নিগূঢ়ার্থ গ্রহণ, সহজ প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় এইবার প্রাচীন স্মৃতির দুর্ল্ভগ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। "হারলতা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্যে লিপিবদ্ধ করিয়া আনেন। এই সময়ে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের নিকটও তর্কালঙ্কার মহাশয় ন্যায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র কিছু কিছু অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধাগুণে সে সকল শাস্ত্রেও তিনি প্রবিষ্ট হইয়া উঠেন। অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপ হইতে প্রশংসার সহিত "তর্কালঙ্কার" উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি নবদ্বীপে ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে প্রচলিত সমস্ত 'মতামত' ও ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেরপুর আসিয়া তিনি স্থানীয় জমিদারদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা উপার্জ্জন করতঃ তাঁহাদেরই আনুকূল্যে নিজগৃহে এক বৃহৎ চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে নানা দেশীয় ছাত্রগণে চতুষ্পাঠী পূর্ণ হইয়া গেল। এইবার পিতৃসঞ্চিত ধনের ব্যয় আরম্ভ হইল। নানাশাস্ত্রের গ্রন্থরাশি ক্রয় করা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনের ব্রত হইল। তিনি একদিকে যেমন নূতন নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত রাত্রিতে সে সকল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে সেরপুর যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে অক্লান্তভাবে আলোচনা করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় নব্যন্যায়েরও মৌলিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিদ্যার উন্নতিকল্পে সেরপুরের শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহায্যকারীদিগের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী স্বয়ং সুপণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম সর্ব্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে ও আনুকূল্যে "চারুবার্ত্তা" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সেরপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই পত্রে নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

তাঁহার তাৎকালিক বাঙ্গালা রচনা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ধারাবাহিক রূপে ভারতবর্ষের শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে কতিপয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। পরে সেগুলি পুস্তকাকারে "শিক্ষা" নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন হইতেই সংস্কৃত কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। "আনন্দ তরঙ্গিণী" নামক একটী সুললিত স্তোত্র তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা। "সতীপরিণয়" তাঁহার প্রথম মহাকাব্য, তৎপর "চন্দ্রবংশ" নামক আর একখানি মহাকাব্য লিখেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে "কৌমুদী সুধাকর" নাটক, গোভিল গৃহ্যের 'ভাষ্য' এবং 'তত্ত্বাবলী' প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

যে বৎসর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রথম সৃষ্টি হয় সেই বৎসরই তাঁহার একজন ছাত্র নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং তাহার পর বৎসর আর একজন ছাত্র প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হন। জনশ্রুতি এইরূপ, স্মার্ত্তের ছাত্র ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্যায়রূপে পরীক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক নিগৃহীত হন। কিন্তু পর বৎসরই সেই ছাত্রটী ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া হরকুমার ঠাকুরের প্রদত্ত কেয়ূর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের চতুষ্পাঠী হইতেও ব্যাকরণ কাব্য ন্যায় স্মৃতি পদার্থ অলঙ্কার এবং মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু ছাত্র অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন। দেশের চতুষ্পাঠীর জন্য তাঁহাকে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, এবং দুর্লভগ্রন্থ সংগ্রহ ব্যাপারেও পিতৃসঞ্চিত অর্থ অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল। "অধিকরণমালা" "বিষ্ণুপুরাণ" প্রভৃতি তখনকার দিনে এ দেশে অপ্রাপ্য অনেক গ্রন্থ তর্কালঙ্কার মহাশয় বহুব্যয় ও প্রয়াস স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনস্রোত অন্য পথে ধাবিত হইবার উপক্রম করিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সর্ব্বজনসুবিদিতপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল এই তিন জন গুণগ্রাহী মহাত্মার দৃষ্টি একটা সাধারণ সংক্রান্তির ব্যবস্থা উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাদেরই যত্নে তিনি গোভিলের ভাষ্য সম্পাদনে নিযুক্ত হন। ভাষ্য দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তর্কলঙ্কার মহাশয়কে কলিকাতা আহ্বান করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া গুণগ্রাহী পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধীনে সংস্কৃতকলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পর হইতেই তাঁহাকে প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতে হইত, এবং কলেজবিভাগেও এম্ এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াইতে হইত। সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ করিয়াও তর্কলঙ্কার মহাশয় পিতৃপ্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সেখানে পরমবন্ধু প্রতাপ বাবুর প্রদত্ত বাড়ীতে নিজে বাস করিতেন এবং স্বতন্ত্র বাসস্থান ভাড়া করিয়া দিয়া দশ বার জন ছাত্রকে অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ছাত্রগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতা আসার পরেও তাঁহার বহু ছাত্র সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর অনেক গ্রন্থের সংস্করণ করেন। তাহাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ চতুর্দ্দশবর্ষ রাজকার্য্য সম্পাদনের পর "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া তিনি কার্য্যে অবসর গ্রহণ করেন। অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের ফেলোসিফের লেকচর প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর কাল অসীম পরিশ্রম সহকারে সমস্ত

দর্শনের সার সংগ্রহ করতঃ প্রবন্ধাকারে বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত করেন। সেই প্রবন্ধগুলি পাঁচখণ্ডে মুদ্রিত হইয়া "ফেলোসিফের লেকচর" বা "হিন্দুদর্শন" নামে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এইকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণ কালেও তিনি বহুবিধ মৌলিক গ্রন্থ ও টীকা প্রণয়ন করেন। ইদানীং তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায়ই কাতর থাকিতেন। রুগ্নাবস্থাতেও শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই। চিকিৎসকগণ অধ্যাপনা বন্ধ রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন কিন্তু তিনি তাহা পারিতেন না। তিনি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও সাধ্যমত শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বেই ৺কাশীধাম চলিয়া যান। সেখানে গিয়া ক্রমশঃ জ্বরশোথ, অজীর্ণ ও অরুচি প্রভৃতিতে বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁহারই উপদেশ মত তাঁহাকে মণিকর্ণিকাতে নেওয়া হয়। সেখানে তিন দিন বাস করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ১৩১৬ সনের ২০শে মাঘ বুধবার বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ভারতের উজ্জ্বলরত্ন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মনালে পাদপীঠের পার্শ্বে চন্দনচিতায় নশ্বর দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। তাঁহার চিতাপার্শ্বে বহুতর গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার শব দাহ করিবার জন্য পাদপীঠের স্থান বিনা মাশুলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অপরাহ্নে চিতাবহ্নি নির্ব্বাণ হইলে কাশী প্রবাসী একদল বাঙ্গালী বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোকসঙ্গীত গান করিতে করিতে নগ্নপদে শ্মশান ভূমিতে সমাগত হন, এবং সাশ্রুনেত্রে চিতাভূমি প্রদক্ষিণ করতঃ ললাটে চিতাভস্ম লেপন করিয়া মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় দুটী পুত্র দুটী কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র ও পৌত্রী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বকৃত বিত্ত-সম্পত্তিও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে সামান্য নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় সৎসাহসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। বিনয় ও সদব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বসমাজে বিশেষ প্রশংসিত ছিলেন। তাঁহার মত জ্ঞানানুরাগ অতি অল্প লোকেরই দেখা গিয়া থাকে। সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার সময়ে একবার তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি এক বৎসরের জন্য বিদায় নিয়া ৺কাশীধামে চলিয়া যান, এবং সেখানে পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী প্রভৃতির সঙ্গে বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং মীমাংসা দর্শনেরও বিশেষ আলোচনা দ্বারা গূঢ় রহস্য অবগত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজে বলিয়াছেন তাহার মত পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এরূপ ছাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সরস্বতীও সাধনার অনুরূপ সিদ্ধিই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর ৫।৬ মিনিট পর বঙ্গের অলঙ্কারপণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় প্রভৃতি মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়াছিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আক্ষেপ করিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন "এরূপ ব্যক্তি বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই"।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আজিও অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। তিনি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "স্মৃতি চন্দ্রালোক" যদি সম্পূর্ণ হইত, তবে একদিন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের সুবর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিত কি না তাহা কে বলিতে পারে?

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সৌভাগ্যও তাঁহার প্রতিভা-

রই অনুরূপ ছিল। তাঁহার রচিত "কৌমুদী সুধাকর" নামক দৃশ্যকাব্য রাজধানী কলিকাতাতেই তাঁহার জীবদ্দশায় অভিনীত হইয়া পণ্ডিত সমাজের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবিকুলতিলক ভবভূতির ন্যায় তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া, বলিতে হয় নাই "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী"! কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সকল দেশের সকল সুধীসমাজেই তাঁহার সমান প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত "বৈশেষিকভাষ্য" "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" ও গোভিলভাষ্যাদি দর্শনে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যে সকল অনুকূল সমালোচনা করিয়াছেন, এবং তৎকালের বড় বড় পণ্ডিত 'মোক্ষমূলর' প্রভৃতি যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক পণ্ডিত-সমাজের গৌরবের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে করি। জীবদ্দশায় এরূপ উচ্চতম সম্মান অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরেজী জানিতেন না, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় পরীক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত পরীক্ষকের কার্য্য সম্পাদন করিতেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ এ যাবৎ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষাসম্পর্কিত কাগজপত্র তিনি নিজহাতে 'সেনেটে' লইয়া যাইতেন। ইদানীং অসুস্থ-দশায় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমত্যনুসারে বিশ্বস্ত ছাত্র দ্বারা তাহা সুরক্ষিত ভাবে 'সেনেটে' পাঠাইয়া দিতেন।

তিনি একান্ত পরোপকারী ও বিনয়ী ছিলেন। একজন যুবককে দেখিয়াও তিনি দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিতেন এবং বাসার সদর দরজা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে ফিরিতেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি এত প্রবল ছিল যে তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেকটী কার্য্য যথা-সাধ্য শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মত আস্তিক লোক বর্ত্তমান সমাজে বিরল। তিনি নিজের ধর্ম্ম ও আচারকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ধর্ম্ম ও আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অতিবড় ধনবান্ চির-বান্ধবগণকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না,—সাময়িক স্বার্থের মন্দিরদ্বারে নিজের বিবেকটীকে কখনও বলিদান করিতেন না। এ সকল বিষয়ে তাঁহার জীবনে অনেক-বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমরা সময়ান্তরে এই মহাপুরুষের অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণাবলীর যথাশক্তি আলোচনা করিব ইচ্ছা রাখি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান ও অবসর নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বদেশানুরাগও একান্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রায় জীবনের অধিকাংশ সময় স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার মধ্য-বয়সে ময়মনসিংহ সহরে একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে ময়মনসিংহ বারের সর্ব্বপ্রধান উকীল স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বর্ত্তমান বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহোদয় প্রভৃতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শুভ চেষ্টার সহযোগী ছিলেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও সে সময়কার মাননীয় ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের সাহায্যাঙ্গীকার ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিপুষ্ট চেষ্টা অনেকটা সফলতার দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনও অপ্র-কাশ্য কারণে সেই চেষ্টা সে বারে ব্যর্থ হইয়া যায়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও তর্কালঙ্কার মহাশয় ময়মনসিংহ সংস্কৃত কলেজের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশের উন্নতি কল্পে আরও অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত উল্লেখ করিবার এ স্থান নহে! আমরা সেই মহাপুরুষের অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্র বিশ্লেষণের উপযুক্ত শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই। যদি কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁহার জীবনচরিত সং-কলন করেন সে সকল কথা সংসমাজে অবশ্যই প্রচারিত হইবে। আমরা দীর্ঘকাল সেই ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি-

য়াছিলাম। সেই অবসরে তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি আমরা সাধ্যমত তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিব। ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহার জীবনচরিত সংকলন করিবেন আমাদের এই ক্ষীণ চেষ্টা দ্বারা যদি তাঁহাদের এতটুকুও সাহায্য হয় তবে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমরা নিম্নে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করিলাম। এই সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি। ভগবান্ আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন কিনা জানি না।

তালিকা

১। গনেশ স্তোত্রম্
২। ঈশ্বর স্তোত্রম্
৩। গুরু স্তোত্রম্
৪। দুর্গা স্তোত্রম্
৫। শিবস্তোত্রম্
৬॥ বিষ্ণু স্তোত্রম্
৭। ব্রহ্ম স্তোত্রম্
৮।। গঙ্গা স্তোত্রম্
৯। কালী স্তোত্রম্
১০। সরস্বতী স্তোত্রম্
১১। ভাবপুষ্পাঞ্জলিঃ
১২। আনন্দতরঙ্গিণী
১৩। যুবরাজ প্রশস্তিঃ
১৪। বীর প্রশস্তিঃ
১৫। রস শতকম্
১৬। প্রবোধ শতকম্
১৭। সতী পরিণয়ম্ (মহাকাব্য)
১৮। চন্দ্রবংশম্ (মহাকাব্য)
১৯। কৌমুদী সুধাকরম্ (দৃশ্যকাব্য)
২০। অলঙ্কার সূত্রম্
২১। কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া (বৈদিক ব্যাকরণ)
২২। বেদ প্রামাণ্যম্
২৩। তত্ত্বাবলী
২৪। কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাবিভাগঃ
২৫। বৈশেষিক ভাষ্যম্
২৬। মীমাংসাসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ
২৭। চন্দ্রসংক্রান্তি নির্ণয়ঃ
২৮। গোভিলগৃহ্যসূত্র ভাষ্যম
২৯। গৃহ্যসংগ্রহ ভাষ্যম্
৩০। শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্যম
৩১। উদ্বাহ চন্দ্রালোকঃ
৩২। ঔর্দ্ধদেহিক চন্দ্রালোকঃ
৩৩। শুদ্ধিচন্দ্রালোকঃ
৩৪। আহ্নিক চন্দ্রালোকঃ
৩৫। ব্যবহার চন্দ্রালোকঃ
৩৬। দায়ভাগ চন্দ্রালোকঃ
৩৭। কর্ম্মপ্রদীপ টীকা প্রভা
৩৮। অনুভূতি প্রকাশ টীকা।

বাঙ্গালা গ্রন্থ।

৩৯। শিক্ষা
৪০। সত্যবতী (চম্পূ)
৪১। ফেলোসিফের লেক্‌চর (১ম বর্ষ)
৪২। ঐ ২য় বর্ষ
৪৩। ঐ ৩য়বর্ষ
৪৪। ঐ ৪র্থ বর্ষ
৪৫। ঐ ৫ম বর্ষ

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

আমার বক্তব্য বিষয় বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা। আমি এ বিষয়ে কতকগুলি ভাব ও বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু লিখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া ঐগুলিকে বেশ সাজাইতে পারি নাই। সুতরাং সাধারণ ভাষায় ভাব ও বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণীগুলি এখন প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু উহাদের সুন্দর সুন্দর ঘাটগুলি এবং বাঁধান চারিটী ধার দেখিলে মনে হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পানীয় জলের পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে অজ্ঞ কিম্বা উদাসীন ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গে বিশুদ্ধ জলের বিশেষ সম্পর্ক। মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ জলের পবিত্রতা রক্ষা হেতু নানা শাস্ত্রবিধি প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি। তত্ত্বজ্ঞ মনু ঋষির নিষেধবিধি এই যে

নাপ্‌সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠিবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫৬।

মল, মূত্র, থুতু, রক্ত, বিষ, কিম্বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ জলে ফেলিবে না।

শঙ্খ লিখিত প্রায়শ্চিত বিবেকের কঠোর শাস্তিবিধি এই যে

রেতো মূত্র পুরীষাণি উদকে কৃত্বা ত্রিরাত্রো
পোষিতঃ "ইদমাপঃ প্রবহতঃ" ইতি জপেৎ

রেত মলমূত্র জলে ত্যাগ করিলে শাস্তি স্বরূপ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া "ইদম আপঃ প্রবহতঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

শঙ্খ পুনঃ পুনঃ জল অশুচিকারীর শাস্তিবিধান করিয়াছেন। যথা ঃ—

ক্ষিপ্ত্বা অপ্সৌ অশুচি দ্রব্যং তৎএব অম্ভসি মানবঃ মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাৎ।

আবার বলিয়াছেন যে—

অপ্‌স্বপ্সৌ বা মেহতঃ তপ্তকৃচ্ছ্রঃ ভবেৎ।

জলে অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একমাস ব্রত করিতে হইবে। তিনি জলে প্রস্রাবকারীর তপ্তকৃচ্ছ্র নামক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের স্বাস্থ্যতত্বের অনেক প্রাচীন রীতি প্রচলিত আছে। গ্রাম সহর সর্ব্বত্রই বাসস্থানগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী, জলনিকাশের জন্য খালগুলির অবস্থা খাদ্যাখাদ্য, ও অন্যান্য ব্যবস্থার মূলে আমাদের অতীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য আমি এই বিষয়ে সরকারী রিপোর্টগুলি পাঠ করি। তাহাতে সাধারণতঃ দেখা যায়, পশ্চিম বাঙ্গলা অপেক্ষা পূর্ব্ববাঙ্গলার স্বাস্থ্য ভাল। এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর। ঢাকা জিলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি কিম্বা জন্মমৃত্যুর হার এবং জ্বর কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগুলির প্রকোপ আলোচনা করিলে এ বিষয়টী বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। মারাত্মক ব্যাধিগুলির আক্রমণ ও সেই হিসাব কম। সুতরাং ঢাকা জিলার লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৮৮১ খৃঃ অঃ ঢাকা জিলায় ২০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ৩০ বৎসরে ৯০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দশ বৎসর পরে ২৩ লক্ষ, দ্বিতীয় দশ বৎসর পরে ২৬॥ লক্ষ এবং তৃতীয় দশ বৎসরে জনসংখ্যা ২৯॥ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দশ বৎসর লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে শতকরা ১৯, ১৫ এবং ১৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় শতকরা ৬৪ জন হিসাবে বাড়ি-

য়াছে। এই সময়ে ময়মনসিংহে ৬৬, বাখরগঞ্জে ৩২ জন, ত্রিপুরায় ৩৭৫ জন, পাবনায়, ৮ জন, বর্দ্ধমানে ৯ জন, দিনাজপুরে ৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নদীয়া, যশোর প্রভৃতি জিলায় লোকসংখ্যা শতকরা ৫ হইতে ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই পার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পরেই ঢাকার স্থান। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে ইহার জনসংখ্যা কেন পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধি পায় নাই, সে বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত, খাদ্যদ্রব্যে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শীতের আতিশয্য প্রভৃতির সহিত জন্মমৃত্যুহারের তারতম্য হইয়া থাকে। যে বৎসর ঢাকা জিলায় বর্ষা বেশী হয়, সেই বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা কমে। ইহার কারণ এই যে বর্ষার জলে সমস্ত ময়লা ধুইয়া যায় এবং অতিরিক্ত আর্দ্র কিম্বা জলমগ্ন ভূমিতে মেলেরিয়ার কীটাণু জন্মিতে পারে না। ঈষদুষ্ণ আর্দ্র ভূমিই রোগকীটাণুর জন্ম ও বাসস্থান। সুতরাং বর্ষাকালই বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর সময়। উহার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে বর্ষার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে ম্যালেরিয়া জ্বর ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়টাকে যমাষ্টক বলে। চলিত কথায় যমের দুয়ার খোলা থাকে বলা হয়। লোকেরা নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলেরায় মড়ক এই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ বর্ষান্তে ঢাকা জিলায় পুষ্করিণী, খাল ডোবাগুলির অবস্থা অতি জঘন্য হইয়া থাকে। নদীর স্রোতের সঙ্গে উহাদের আর যোগ থাকে না। উহাদের ধারে পায়খানা থাকে। জলে বাঁশ কাঠ প্রভৃতি পচে। এমন কি কোন কোন পুকুরের ধারে দুই একটা পায়খানাও দেখা যায়। লোকেরা এই জলে নিজেরা স্নান করে, গরু কুকুর স্নান করায়, আবার এই জল পানের জন্য ব্যবহার করে; সুতরাং কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়া বিচিত্র কি? ইহার উপর কখন গরম হাওয়া কখনও ঠাণ্ডা হাওয়ায় দরুণ শারীরিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ থাকে না। ফলে লোকেরা অতি সহজেই রোগবীজে আক্রান্ত হয়। এই কারণে শীতগ্রীষ্মের সঙ্গম সময় কার্ত্তিক ও ফাল্গুন চৈত্র মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়।

ঢাকা জিলায় বসন্তের মারী বিশেষ হয় না। কিন্তু এখানে যক্ষ্মা ও কাশির ব্যারাম কলিকাতা ও হাবড়া ভিন্ন অন্যান্য জিলা অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আরো একটা গুরুতর কথা এই যে ঢাকা জিলায় আত্মহত্যার সংখ্যা ও হার, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বেশী। পুরুষের দ্বিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা জিলার ২০০ শতাধিক লোক আত্মহত্যায় মারা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মৃত্যুর হারও অত্যধিক। প্রত্যেক চারিটী শিশুর মধ্যে একটী ১ বৎসর মধ্যেই মারা যায়। শিশুমৃত্যুর হার বিগত ত্রিশ বৎসর একই ভাবে চলিয়াছে। পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দ্দি কাশি এবং আতুর ঘরের কুবন্দোবস্ত প্রভৃতি শিশুমৃত্যুর কারণ। তন্মধ্যে পেটের অসুখ কিম্বা দুধহারা রোগই সর্ব্বপ্রধান। পৈত্রিক ও মাতৃক দুর্ব্বলতাহেতুও কতক শিশু মারা যায়।

ঢাকাজিলায় প্লেগের ব্যারাম নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে—যে সকল ইন্দুরের শরীরে প্লেগের মাছি কিম্বা পিসু থাকে, ঐরূপ ইন্দুর খোলার ঘরের চালে বাস করে। এখানে খোলার ঘরের সংখ্যা খুব কম, সুতরাং ঢাকা জিলায় সে ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঢাকাজিলায় বন্যা, জলমগ্ন, ঝঞ্ঝাবাত, প্রভৃতি আকস্মিক কারণেও অপমৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গরপড়তায় হাজার করা মৃত্যুর হার ২৫ হইতে ৩০ জন কিন্তু জ্বর, কলেরা, বসন্ত ও আত্মহত্যা এইসকল কারণে মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বপেক্ষা বেশী। তন্মধ্যে ম্যালিরিয়াজ্বরই সর্ব্বপ্রধান। গত সনের সরকারী মৃত্যু তালিকায় প্রকাশ ঢাকাজিলায় হাজার করা ১৬ জন অর্থাৎ মোট মৃত্যু-

সংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী জররোগে মারা গিয়াছে। আড়াই জন কলেরা রোগে, আশি জন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। মাণিকগঞ্জ সবডিবিসন উহার প্রধান আক্রমণস্থল। তথায় বিগত ৪ বৎসর যাবৎ জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কম। ১৯০৮ সনে হাজার করা ১৬ জন, ১৯০৫ সনে ২৩ জন, এবং ১৯০১ সনে ২২ জন লোক জররোগে মারা গিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে কেন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম ছিল তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। ঢাকাজিলায় ম্যালেরিয়াজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা সমগ্র প্রদেশ অপেক্ষা সামান্য কম।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার কম। শতকরা ৮ জন পুরুষ বেশী মারা যায়। অর্থাৎ যে স্থলে ১০০ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় সে স্থলে ১০৮ জন পুরুষ মরে। বঙ্গদেশের দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার হিন্দু মুসলমানের হার অপেক্ষা কম। কিন্তু ঢাকা জিলায় সবই সমান।

জন্মের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ঢাকাজিলায় হাজার করা জন্মের হার প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪২। আশ্বিন—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই জন্মসংখ্যা অত্যধিক। ১৮৯২-১৯০১ দশ বৎসরের গড়পরতার হিসাবে এ বিষয়টা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ফেব্রুয়ারীতে তিন জন (২.৯৮) মার্চ্চে সোয়া তিন (৩.৩১), এপ্রিলে পোনে তিন (২.৭১), জুলাইয়ে আড়াই (২.৩৯), আগষ্টে পোনে তিন (২.৭২), সেপ্টেম্বরে পোনে তিন, অক্টোবরে সাড়ে তিন (৩.৪১), নবেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৪১), ডিসেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৫০), জানুয়ারীতে সোয়া তিন (৩.২৫), মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ (৩৫.৬) অর্থাৎ মার্চ্চ, অক্টোবর, নবেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে জন্মসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসই অন্যান্য পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষের গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। সে সময় খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ তখন কম থাকে। এই সময় সকলে সর্ব্বাপেক্ষা সুখে কাটায়। বসন্তের আগমনে মলয়হিল্লোল সকলের হৃদয়ে নূতন বল, নূতন আশা, নূতন ভাব জাগাইয়া তোলে। প্রকৃতি বসন্তের অনুরাগে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। বৃক্ষগুলি মনোহর পুষ্পপত্রে সুশোভিত হয়। মনুষ্য পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই প্রেমে বিভোর হইয়া উঠে। মহাকবি কালিদাস "কুমার সম্ভবে" ধ্যাননিরত শিবের তপোভঙ্গ করিবার জন্য কামদেবকে পত্নী রতি ও সহচর বসন্ত সহ উপস্থিত করিয়াছেন। পুষ্পবাণের আঘাতে আসক্তিহীন ধ্যাননিরত মহাদেবও অস্থির হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক বসন্ত কালেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থা গর্ভধারণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল থাকে। এই জন্যই আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে জন্মসংখ্যা সব চেয়ে বেশী। আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস স্বাস্থ্যকর হওয়াতে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসেও জন্মসংখ্যা বেশী। অবশিষ্ট মাসগুলি বিশেষতঃ বর্ষাকাল গর্ভধারণের পক্ষে প্রতিকূল। এখানে একটা বিষয় অনুসন্ধান করা যাইতে পারে যে কি কারণে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মন্ত্রের ব্যবস্থাকার হিন্দুশাস্ত্রমতে গর্ভধারণের অনুকূল মাসগুলি অর্থাৎ মাঘ ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

যেমন কয়েকটী বিশেষ মাসে জন্মসংখ্যা বেশী, তেমনি কতকগুলি বিশেষ স্থানেও জন্মের হার খুব বেশী। এবিষয়ে মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ ভারতে সর্ব্ব প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বিহারে মুঙ্গের জিলায় জন্মের হার অত্যধিক। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, নদীয়া মালদহ ও মুরশিদাবাদ জিলায় জন্মের গড়পরতা সব-চেয়ে বেশী—হাজার করা ৪০ হইতে ৪৪ জন। ঢাকাজিলায় বিগত পাঁচ বৎসরে হাজার লোকের সন্তানের সংখ্যা ছেলে ১৮টী ও মেয়ে ১৭টী মোট ৩৫টী।

কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা দুইই বেশী। ফলে এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক পাঁচ হাজার অধিক। কলিকাতা সহরে জন্মের হার অত্যন্ত অল্প, মাত্র হাজারকরা ১৯টী। গ্রামে জন্মের হার সহরের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার কারণ এই নয় যে সহরগুলি শিশুজন্মের প্রতিকূল স্থান কিন্তু সহরের গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা প্রসবের সময় গ্রামে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামের জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর ঢাকা জিলায় জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা হাজার করা ৫—১০ জন বেশী। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বিশেষতঃ রায়পুরা থানায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী। আমার মনে হয় মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে জন্ম সংখ্যা বেশী।

স্বাস্থ্যনীতি পালন করিলে বহু ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং জর্ম্মানি দেশীয় বিগত অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যবিবরণ আলোচনা দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে জ্বর বসন্ত কলেরা রোগগুলি নিবারণযোগ্য; অর্থাৎ এই ব্যাধিগুলি ব্যক্তিগত, কিন্তু পুরুষানুক্রমিক নহে; সাবধানতা দ্বারা ঐগুলিকে অনেকাংশে নিবারণ করা যায়। কলিকাতা ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মৃত্যু তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় যে কলিকাতায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যুর হার পার্শ্ববর্ত্তী হাবড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলার হার অপেক্ষা হ্রাস পাইতেছে।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কলেরা ও বসন্ত রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। মৃত্যুর হার প্রায় বঙ্গদেশেরই মত ছিল। হাজারকরা প্রতি বৎসর ৩০জন লোক মারা যাইত। তখনও লণ্ডনে বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তার পার্শ্বে ডোবাতে পচা কুকুর বিড়াল দেখা যাইত। গরীব লোকেরা রাস্তার কল হইতে জল সংগ্রহ করিত। দিবসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কলে জল পাওয়া যাইত। এক ঘণ্টার জন্ত অফিসের মেয়েরা জলসংগ্রহের জন্য ছুটী পাইত। তখন রাস্তার কলের নিকট পাত্রহস্তে মেমদের ভিড় জমিয়া উঠিত। টেমস্ নদীর জল এত ময়লা যে উহা দ্বারা কোন কাজ করা যায় না। অনেক কাজই কুয়ার জলে সাধিত হইত। কুয়াগুলি প্রায়ই গির্জ্জার নিকট ছিল। গির্জ্জাস্থিত কবরখানা হইতে গলিতপদার্থ কুয়ার জল দূষিত করিত। লোকে দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া আমাদেরই মত পীড়ায় ভুগিত। কিন্তু ইংরাজজাতি বড় বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ। তাহারা যখনই বুঝিতে পারিল যে নানাপ্রকারে নিবারণযোগ্য ব্যারামে বহুসংখ্যক লোক মারা যাইতেছে, তখন উহারা পূর্ণউদ্যমে ব্যাধিগুলি নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল. উহার ফলে ইংলণ্ডের মৃত্যুহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে। এখন হাজারে ১৪জন মারা যায়। উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ পানীয়জল ও নির্ম্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থাহেতু ইংলণ্ডে আর বসন্ত ও কলেরা রোগ দেখা যায় না। ঐগুলি তথায় শব্দবিশেষে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা এখন অধিকতর সুস্থ হওয়াতে তাহাদের জীবনীশক্তি ও কার্য্যশক্তি অনেক বাড়িয়াছে। বিগত ৬০বৎসরের স্বাস্থ্যবিবরণ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা বর্ত্তমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Hygine) উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূলধর্ম্ম এই যে স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালন করিলে লোকেরা অধিকতর সুস্থ অধিকতর কর্ম্মঠ ও অধিকতর দীর্ঘজীবী হইবে এবং জরা অধিকতর বিলম্বে আসিবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী ও আমেরিকার লোকেরা এখন এই সকল অমূল্য ফলগুলি ভোগ করিতেছে।

আমাদের প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। এডেন, মলয়, সিংহল প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রচলিত হওয়াতে তথাকার লোকের মৃত্যুর হার কমিতেছে।

আমাদের দেশে যদিও স্বাস্থ্যবিবরণ অত্যন্ত আধুনিক এবং উহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে কোন মতের মীমাংসা করা

যায় না, তথাপি আমাদের জানা দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া আমরাও কলেরা বসন্ত, জররোগগুলি কোন কোন স্থানে নিবারণ করিতে পারিয়াছি। বঙ্গদেশের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সহরে কলেরা রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হেতু কলেরার প্রকোপ বহু পরিমাণে কমিয়াছে। বিগত ২০বৎসরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কলেরায় মৃত্যুর হার সরকারি রিপোর্ট হইতে উল্লেখ করিতেছি।

	১৮৯০	১৮৯৫	১৯০০	১৯০৭	১৯০৮	১৯১২
ঢাকা	২.৫	৭.০০	২.০০	১	১.২৫	৩.৫
নারায়নগঞ্জ	১০	১৫.০০	১১.	৩.৫	১.২০	৩.২১

অর্থাৎ পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে কলেরায় মৃত্যুর হার ঢাকার চতুর্গুণ ছিল। কিন্তু ১৯০৮ সনে নারায়ণগঞ্জে জলের কলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হওয়ায়, ঐ বৎসর হইতেই নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর হার ঢাকা অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। শুনা যায় গত বৎসর জলের কল হওয়ায় বরিশালেও পূর্ব্বের ন্যায় কলেরার প্রকোপ হয় নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা দ্বারা কলেরার আক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বসন্তব্যারাম নিবারণ করিবার জন্য গোবীজের টিকার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যাহাদের টীকা হয় নাই ঐরূপ রোগীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০জনের উপর। যাহাদের একবারমাত্র টিকা হইয়াছে, সেইরূপ রোগীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৩০-৩৫ জন। যে সব বসন্ত রোগীদের দুইবার টিকা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা ৫-৭ জন। যাহাদের তিনবার কিম্বা ততোধিক বার টিকা হইয়াছিল তাহারা বসন্তে আক্রান্ত হইলে শতকরা ১ জনের ও অনেক কম মারা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ম্যালেরিয়া জরই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। উহাতে অর্দ্ধেক হইতে দুই তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। মেলেরিয়া জর স্থানবিশেষে হয়। কোন কোন স্থান ইহার অনুকুল ও কোন কোন স্থানে ইহার প্রতিকূল। ম্যালেরিয়া জরের অনেক রোগী বৈদ্যনাথ গিরিধি মধুপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিশেষ ভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি ম্যালেরিয়ার কারণ স্বরূপ কীটাণু ও তৎবাহী মশার সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। এইমাত্র বলিতে চাই যে ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানগুলি নানা উপায়ে স্বাস্থ্যপ্রদ করা যায়। দুই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের ঢাকা সিভিল ষ্টেষণ হওয়ার পূর্ব্বে 'রমণা' অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থান ছিল। ঐ স্থানের অধিবাসীরা বলে যে বৈশাখ মাস হইতে বর্ষা পর্য্যন্ত, চলিত কথায় যখন গজারি গাছের ফুল ফোটে, তখন ঘরে ঘরে লোকেরা জরে ভুগিত। কিন্তু এখন জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়াতে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা রমণা ঢাকাসহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছে। আমি তিন বৎসর রমণায় ছিলাম। আমার বাড়িতে ১২।১৪জন লোক থাকিতেন। এই তিন বৎসর আমাদের কাহারও জর হয় নাই। অধিকন্তু তিন জন যাহারা ম্যালেরিয়া জর নিয়া রমণার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন, তাহারা রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

রমণার স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ৬।৭ বৎসরে যত উন্নতি লাভ করিয়াছে, ঢাকায় অন্যান্য অংশ উয়ারি প্রভৃতি স্থান উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা ও জঙ্গল পরিষ্কৃত না করাতে সেরূপ উন্নত হইতে পারে নাই। কলিকাতা নানা উপায়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইতেছে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কম।

	১৯১২	১৯০৫	১৯০১	১৮৯০
কলিকাতা—	৩.১৬	৫	৭	৮
২৪ পরগণা—	১৬	১৮.৭০	১৬	১৬

বিগত ২০বৎসরে ২৪ পরগণা জিলায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হারসমভাবেই আছে কিন্তু কলিকাতা ক্রমশঃ কমিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদেরই চেষ্টা দ্বারা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানগুলিকে আমরা প্রভূত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর করিতে পারি। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার বেণ্ট্‌লি কয়েকজন দেশীয় ডাক্তার সহ মেলেরিয়া জ্বর নিবারণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমাতে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের মুক্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উঁহার সবিশেষ ফল এখনও জানা যায় নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে আরো ভাল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কুইনাইন দ্বারা কীটাণু বিনাশ করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ নিবারণের ব্যবস্থা অনেক ভাল।

ম্যালেরিয়াকীটাণু মশা দ্বারা মানুষের শরীরে আসে। যাহাতে মশা জন্মিতে না পারে সেইজন্য জঙ্গল পরিষ্কার এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। কারণ জঙ্গলেই মশা বাস করে, আবদ্ধ জলে মশা জন্মে। মশা বিনাশ করিলে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু আর মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি অর্দ্ধ সরকারী আফিসগুলির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। উহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট উন্নতিকর কার্য্য সাধন করেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট আংশিক ব্যয়ও বহন করেন। স্বাস্থ্যবিভাগ (Sanitary Board) সেনিটারী কমিশনারের সাহায্যে ও পরামর্শে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করে। ইহার সমস্ত ব্যয়ভারই গবর্ণমেণ্ট বহন করেন। বর্ত্তমান সময়ে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সরকারী বেসরকারী লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের উভয়ের সাহায্যই দরকার। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মেণী সব দেশেই গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সাহায্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং আমাদেরও গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশ ও বোম্বে নগরীতে সাধারণের টাকাতে অধিকাংশ উন্নতি করা হইয়াছে। বম্বের ধনীগণ হাসপাতাল জলের কল প্রভৃতি হিতকর ব্যাপারের জন্য অকাতরে অর্থদান করেন। আমাদের ঢাকাজিলায় স্বনামধন্য মিটফোর্ড সাহেব হাসপাতালের জন্য, দানবীর গণি মিয়া আসানুল্লা নবাব সাহেবদ্বয় জলের কল বৈদ্যুতিক আলো প্লেগ হাসপাতাল, ইতিমখানা প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। মুন্সিগঞ্জে জলের কলের খঁরচ ভাগ্যকুলের জমিদারগণ বহন করিয়াছেন। কিন্তু এই সব দানে সহরের উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক, ২৯॥ লক্ষের মধ্যে ২৮|লক্ষ লোক, গ্রামে বাস করে। গ্রামগুলি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। ধণীগণ সহরে চলিয়া যাওয়াতে ঐগুলি হতশ্রী হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর দীঘিগুলি ভরিয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সস্তায় মজুর পাওয়া যায় না বিধায় ঐ পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করা হয় না। ইহার উপর ঢাকা জিলার গ্রামগুলি অতি নীচু, সর্ব্বদা ভিজা স্যাঁৎস্যাতে থাকে—সুতরাং কলেরা ও মেলেরিয়ার আবাস স্থান। দেশের লোক অগ্রসর হইয়া গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায়, জঙ্গল পরিষ্কার ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে, জ্বর বসন্ত কলেরার প্রকোপ নিবারিত হইবে। সকলেই সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারিবে।

শ্রীবিলাস চন্দ্র দাস।

ষষ্ঠী ব্রত

(১)

ত্রিপুরা জেলায় চলিত কথায় এই ব্রতের নাম ষষ্ঠী ব্রত, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে জামাই ষষ্ঠী বলিয়া থাকে। এই ব্রতের দেবী অরণ্য-ষষ্ঠী, সুতরাং অরণ্য ষষ্ঠীর পূজাই এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে অরণ্য-ষষ্ঠীর পূজা হয়। পূজার আগের দিন পরিবারের মেয়েরা বাঁশের 'করুল' বা শালুকার (শটীর) ডিগের (ডগা) সঙ্গে ফুলের কুঁড়ি, কড়মচা, ধান, দুর্ব্বা, গোছা গোছা করিয়া বাঁধিয়া লয়। ধানগুলি রঙ্গিন কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটুলি করিয়া গোছার সঙ্গে বাঁধা হয়, এবং হলদে রঙ্গের সূতা ও হলদে রঙ্গের কাপড়ই সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই গোছাগুলিকে 'বানা'র 'মোঠা' কহে।

একটা কাঠের পিঁড়ি বা জলচৌকীর উপর ষষ্ঠী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। সাধারণতঃ মেয়েরাই এই ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তি তৈয়ার করে। মূর্ত্তিতে শিল্প জ্ঞানের একান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠী দেবীর কোলে সাতটি ছেলে, আসনে একটি গোটা কলার কাঁদি, এবং একটি মাটির বাছুর তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। আবার দুটি কাঁঠাল পাতায় কতগুলি মাটির তৈয়ারি 'শৈল' মাছের পনার সহিত কড়মচা কাটিয়া আসনে দেওয়া হইয়া থাকে। পরে আসনটি হলদে রঙ্গের এক টুকরা নেকরা দিয়া ঢাকিয়া পাশে একটি 'বানা'র 'মোঠা' রাখিয়া দেওয়া হয়।

ব্রতের দিন সকালে পরিবারের সকল স্ত্রীলোক প্রত্যেকে একটা বিচুনের (ব্যজনী) মধ্যে বানার মোঠা, আম, কলা, গোটা গুপারি লইয়া গাছ 'বেড়িতে' যায়। গাছ বেড়ার অর্থ, সূতা দিয়া গাছকে সাতবার বেড়িয়া দেওয়া। সাধারণতঃ কাষ্টমালী, কাঁটাল, বাঁশ, কিংবা চেলা গাছই বেড়া হইয়া থাকে।

গাছ বেড়ার পরে সকলেই পুকুরে নামিয়া স্নান করে। একটা ঝাকিতে করিয়া বিচুন ও অন্যান্য সকল দ্রব্য ঘাটে লইয়া যায়। জলে-নামিয়া 'বিচুন' ধুইয়া নাভিতে জল দেয় ও 'ষাট্' করিয়া থাকে। তখন অন্যান্য জিনিস-গুলিও বিচুনের উপর থাকে।

স্নানের পর গাছ বেড়া হয়। তখনও গাছের উপর বিচুনের জল দিয়া 'ষাট্' করে। 'ষাট্' করার অর্থ ষাট্ বলা। 'ষাট্' করার পর গাছটাকেও একটা মোঠা দিয়া আসে। এইরূপে ব্রতের পর উপযুক্ত আত্মীয় স্বজনকে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা যথ.যথ রূপে 'ষাট্' করিয়া থাকে।

স্নানের পর ঝাঁকি সহ সকল জিনিষ ষষ্ঠীর সম্মুখে পূজার ঘরে সাজাইয়া রাখা হয়।

গাছ বেড়ার সময় গাছের নীচে বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। পরে উপযুক্ত রূপে ষষ্ঠী দেবীর পূজা হয় *

পূজার পর ব্রতের কথা বলিতে বলিতে মেয়েরা রঙ্গিন সূতায় ফুলের পাঁপড়ি, দূর্ব্বা ও ফুলের কুঁড়ি বাঁধিয়া কতগুলি মালা গাঁথে। ব্রতের কথায় যখনই 'ষাট্' কথার উল্লেখ হয়, তখনই মালায় এক একটি গিরো পড়ে। এই রূপ মালা গাঁথাকে ষাট্ বাঁধা কহে।

(২)

কথা

এক গৃহস্থ বৌ'র এক ছেলে, ও ছেলের এক বৌ। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন গৃহস্থ বৌ গাছ বেড়িতে গেল, ছেলের বৌ বলিল, "আমি আসি।" গৃহস্থ বৌ খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। এই অবসরে ছেলের বৌটা কলা বাগান হইতে একটা কলার 'ডিগ্' নখে

---

* ষষ্ঠীং কনকগৌরবর্ণাং, দ্বিভুজাং, নানালঙ্কার-ভূষিতাং, বামক্রোড়ার্পিত পুত্রিকাং, মার্জ্জারোপরি সংস্থিতাং, বিন্ধ্যবাসিনীং, স্কন্দষষ্ঠীং।

কাটিয়া আনিল, এবং ব্রতের উপকরণের 'আগ্' লইয়া বেশ করিয়া খাইল। কলা পাতাটি মুড়িয়া একটা গাইকে খাওয়াইল। বাড়ীতে 'কালী' ও 'ধলী' দুটি বিড়ালী ছিল, দৈ-মাখা হাতটি এই বিড়ালী দুটিকে দিয়া চাটাইল।

শাশুড়ী ঘরে ফিরিয়া দেখিল, পূজার সমস্ত আয়োজনেরই আগ্ খাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। বুঝিল বৌ-ই এই কাজ করিয়াছে, তাহাকে খুব গালাগালি দিল, "ছুচি, আমি আমার যাদুরে 'বানা' দিতে পারলাম না, দূর(অ) তুই আমার বাড়ী থাক্যা।" গালাগালি দিয়া বৌকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। বৌ লেবু বাগানে আশ্রয় লইল। তার সুন্দর একটি ছেলে হইল। হওয়া মাত্রই ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া ছেলেটিকে লইয়া গেল, বৌ মায়ার প্রভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কয়েক দিন পরে গাইটার একটা বাছুর হইল, কিন্তু বাছুরটা পাওয়া গেল না। যে কলাগাছের ডিগ কাটিয়া আনিয়াছিল, সেই গাছটার একটা কাঁদি হওয়া মাত্রই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া সমস্ত হরণ করিয়া লইলেন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন বৌ এইরূপ করিতে লাগিল, এবং প্রতি বৎসরই একটি ছেলে, একটা বাছুর, এক কাঁদি কলা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। সাত বৎসর গেল, সাতটি ছেলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী লইয়া গেলেন। পর বৎসর শাশুড়ী এত রাগিয়া গেল যে, বৌকে গালাগালি দিয়া একেবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। "পোড়া কপালী, তোর পেটে হয় ছুঁয়ে দেখ না, যা তুই আমার বাড়ী থাক্যা।"

ষষ্ঠীর ব্রতের দিন গাছ বেড়া দেখি্তে দেখি্তে বৌ চলিতে লাগিল। গ্রাম ছাড়াইয়া বনে পড়িল ও বনের পথে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষষ্ঠীঠাকুরাণী মন্দিরে বসিয়া আছেন—পাশে সাতটি ছেলে, সাতটি কলার কাঁদি, সাতটা বাছুর। ষষ্ঠীর গায়ে 'খশ্ পাচড়া'। দেখিয়া বৌ "খৈট পাচড়াগুলি" টিপিতে ও গালিতে লাগিল। ষষ্ঠীর বড় আরাম বোধ হইল। আধ বোজা চোখে ষষ্ঠী বলিলেন, "আমার খৈট্ পাচড়া কে গাল, আইও রাণী পুত্রবতী অইঅ।" ষষ্ঠী দেবী তিন বার এই বর উচ্চারণ করিলেন। তখন বৌ দেবীর সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিল, "মা, তোমার বরে আমার পুত্র অইব, কিন্তু তুমি যে আমার সাত পোলা নিছ হেইগুলি ফিরাইয়া দেও।" ষষ্ঠী চোক মেলিয়া দেখিয়া বৌকে গালাগালি দিতে লাগিল,

"তুই ছচা খাইবি, ডগা খাইবি,
তুই কেমনে পুত পাইবি।"

অনেক অনুনয়ের পর দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যদি তুই 'ষাট্' মানাইয়া নিতে পারছ ত নে। পথ্(অ) যাইতে যাইতে সাত পোলা তেইল্যার তেলের হাঁড়ি ভাঙ্গব তেইল্যা বেডা কিছু না কইব, ষাইট, ষাইট কইয়া কোল্(অ) লইব (এখানে ষাটের গিরো)। আউল্লার (হাল চাষী) ক্ষেত পাড়াইয়া যাইব 'ষাইট্......লইব'। এই রকম অইলে তুই পুত পাইবি। সাত পোলারে বাড়ীত্ নিয়াই তখন তখন বিয়া করাইবি।"

ষষ্ঠীর কথা শেষ হইলে ছেলেরা বলিতে লাগিল, বাড়ীত্ গিয়াই পাটে উঠ্ব—যা চাই তখন তা দিবা না অইলে ঢইল্যা পড়ব। নদীর এপার থাক্যা বুকের দুধ গাইল্যা দিবা, হেই পারে আমার মুখ্(অ) পরব। ঘর্(অ) গিয়া মাসীর রাম-লক্ষণ শঙ্খ ভাইঙ্গা ফালায়াম্, মাসী কিছু না কইব, ষাইট্......লইব। পিশির শাড়ী ছিরা ফালায়াম্ পিশি কিছু না কইব......লইব। তোমার শাশুরীরে এই হগল কথা জিজ্ঞাসা কৈরা আইও, যদি অয় তবে নিতা পারবা।"

বৌ বাড়ী আসিয়া সকল বিষয়ের উপায় ও বন্দোবস্ত

করিল। "আউল্লাকে টেকা দিল, তেইল্যা বেডারে টেকা দিল। খেয়ার মাঝিরে কৈয়া রাখল, আমি যখন দুধ গাইল্যা দেই তখন তুমি "ছেওৎ"*দিয়া জল ছিচ্যা দিবা, পোলার মুখে জলের ফোটা পরলে কৈবা দুধ পরছে"

এক ছেলে বলিল, "আমাকে হৈলের পোনা আর লাল হাগের অম্বল পাট্ (অ) তুইল্যা দিবা।" আর এক ছেলে বলিল, "আমারে তপ্তা পুলি দিবা।" তৃতীয় ছেলে বলিল, "আমারে বার বছরের জল দিবা।"......ষষ্ঠ ছেলে বলিল, "দিদিমার নাট কাট্তে দিবা।" সপ্তম ছেলে বলিল, "বৌ আমাকে ষাট্ করবে।"

গৃহস্থ-বৌ স্বীকৃত হইয়া ছেলে লইয়া ষষ্ঠীর পুরী হইতে বাহির হইল। চাষীর ধান ক্ষেত ভাঙ্গিল, চাষী— যাট্ ষাট্ বলিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তেলীর তেলের ভাঁড় ভাঙ্গিল, তেলী বলিল,

"গেছে গেছে তেলের মাইট।
তবু আমার ষাইট্ ষাইট্॥"

বৌ ছেলে লইয়া বাড়ী আসিল। বিবাহের আয়োজন হইল। ছেলেরা তখনই পাটে উঠিল। ছেলেদের কথা মত সকল কাজ করা হইল। দিদি মা নাকের উপর একটি পিঠালীর নাক বসাইয়া নাতির কাছে গেল, নাতি ধারাল ছুড়ি দিয়া নাক কাটিয়া ফেলিল, দিদি মা ষাইট্ ষাইট্ করিলেন। সপ্তম ছেলে বলিল, "বৌ আমারে ষাইট্ করুক।" বৌ বলিল, "স্বামীকে কে কবে ষাট্ করে— লাজের কথা।" অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বৌ স্বীকার করিয়া বলিল,

জিউক প্রভু কুলের নন্দন
যার পস্সাদে পিন্দমু সিন্দুর চন্দন।"

পরে ঘটা করিয়া সকলে ষষ্ঠীর পূজা করিল ও সকলকে বানা দিল। এইরূপে ষষ্ঠীর পূজা মর্ত্তে প্রচারিত হইল।‡

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

---

*সেচনী

‡ ত্রিপুরা জেলায় বারেদের মধ্যে ষষ্ঠীর বানা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আশীতিপর বৃদ্ধ জামাতা ষষ্ঠীর দিন শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়— প্রাপ্তি বার আনা মূল্যের একখানা ধুতি ও 'বানা'। লেখক।

দোবে মহারাজ

"জীতে রহো"—পায়ে লাগি
দোবে মহারাজ!
আট্টা সাট্টা মালকোচা
গাল পাট্টা খোঁচা খোঁচা
গর্ব্বিত গুম্ফের গোছা
শ্রবণে বিরাজ
গলা ভরা সোনাদানা—
মুণ্ডমালা সাজ
মোটা সোটা মস্ত মর্দ্দ
মুণ্ডিত মস্তক অর্দ্ধ
তালুতে সালুর ফর্দ্দ
পালোয়ানী-তাজ
লাল লম্বা লাঠি কাঁধে
দোবে মহারাজ!
সুপ্রভাতে লোটাহস্ত
কাণে গোঁজা ডাল আস্ত
বিজয়ী জবরদস্ত
মস্ত মহারাজ!
চরণে "নাগরা" রাজে
রণে সে নারাজ!
যুদ্ধক্ষেত্রে উর্দ্ধনেত্র
দোবে মহারাজ!
চানা-ভুট্টা-খোট্টা-খাদ্য
প্রচুর পূজার পাদ্য
প্রলয়ের ঢোল বাদ্য
প্রমত্ত আওয়াজ!
চন্দনে চর্চ্চিত-অঙ্গ
দোবে মহারাজ!
হামেসা হরষ চিত্ত
ন'গণ্ডা নগদ বিত্ত

সুদের তাগিদ নিত্য
ঝিঠেকড়া ঝাঁজ,
নিত্য নাকে নেয় নস্য
চাষী যত চির বশ্য
"কর্জ্জপত্র মিদং কস্য"—
পাকা পোক্ত কাজ।
"বধোঽবধঃ"—অধমর্ণ
গুয়াপানে গালপূর্ণ
কোটাভরা কড়া চূর্ণ
কটিতে বিরাজ
সন্ধ্যা হ'লে সিদ্ধিপান
ফাগুনে ফাগুর গান
"ছ্যাড়-রে-রে-"ছাড়ে তান্—
গান্ধারে দেরাজ
আজু রাম-রঘু বীর
আবিরে বিরাজ।
আজু,
ফাগুন আগুন হানে
জিউ কাঁদে পিউতানে
"লছমিয়া"—জাগে প্রাণে—
পিয়া পেশোয়াজ
মিঠি-মিঠি চিঠি ভেজে
দোবে মহারাজ।
শ্রীকুলচন্দ্র দে

প্রেমের বসন্ত

(জালালুদ্দিন রুমী হইতে)

বসন্তে জনমে যাহা নিদাঘ পবনে তাহা
শুষ্ক বৃন্তহীন,
প্রেমের গোলাপ ব্যাগে সুচির বসন্তে জাগে
ফুটন্ত নবীন।
দেহের বায়সে ভরা এ জড় শীতের রাজ্যে
সবি অন্ধকার,
চির চন্দ্রালোকে হেথা কোয়েলে ডাকায় শুধু
প্রেমের "বাহার"।
শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কার্য্যবিধি—

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত। ঢাকা শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ উত্তম। ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই, সি, এস, মহোদয় এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। মিঃ দে বহু বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমবায়-সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ভূমিকাতে সমবায়-সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তিনি সুচারুরূপে এবং বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে সমবায়-সমিতি বিষয়ক কোন গ্রন্থ এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। জ্যোতিশ বাবু এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়া সাহিত্যের সেই অভাবটা মোচন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনই এই বিষয়ে প্রথম পথ দেখাইলেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আজ ১০ বৎসর হইল সমবায়-সমিতির আন্দোলন আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে, এবং আন্দোলনের গোড়া হইতেই তিনি গভর্ণমেন্টের এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি সব লিখিয়াছেন এবং সেই জন্য অতি বিশদভাবে তিনি বিষয়গুলি বুঝাইতে পারিয়াছেন। সমিতি সংগঠন প্রণালী, সমিতির অর্থ সংগ্রহের উপায়, সমিতির কার্য্য-পরিচালন-পদ্ধতি, ঋণদান, ঋণগ্রহণ, আমানত হিসাবপত্র রক্ষণ প্রণালী প্রভৃতি সব বিষয়ই তিনি সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে

কয়েকটী আদর্শ সমিতির আমূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মোটের উপর, সমবায়-ঋণদান-সমিতি বিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় তথ্য এই পুস্তক হইতে অবগত হইতে পারা যায়। সমবায়-সমিতির আইনও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হী।

২। সেবা,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বরিশাল শাখা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বরিশালবাসার সাহিত্যসেবার পরিচয়। তত্রত্য সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত সাতটি প্রবন্ধে এই গ্রন্থের কলেবর গঠিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নাম 'পরলোক,' 'দার্শনিক পরলোকবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব,' 'জন্মান্তর ও কর্ম্ম,' 'আত্ম-দর্শন,' 'আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা,' 'অসমীয়া ভাষা,' 'কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ'। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সুলিখিত। আত্ম-দর্শন প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরাজি অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে সকল পরিষৎশাখা দ্বারা স্বতন্ত্র পত্রিকা পরিচালিত হয় না, তাহাদের কার্য্যপরিচয় এরূপভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইহাতে সম্পাদক দেবকুমার বাবুর সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার শক্তির আরও একটি পরিচয় পাইলাম। তবে বরিশাল শাখার আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, তাহাতে পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজের উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

৩। অরুন্ধতী,—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। অতুল বাবু এক শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় যথার্থ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বালকবালিকারা যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ও পুরাতন পুণ্যকাহিনীগুলির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠে, তজ্জন্য অতুল বাবু অনেকগুলি গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। যথোপযুক্ত ভাবে পরিবর্জ্জন ও দেবতা-বিষয়ক স্তোত্রাদি সংযোজন দ্বারা এই শ্রেণীর গ্রন্থের কার্য্যকারিতা ও উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি করিয়া অতুল বাবু তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিকে এই শ্রেণীর বাঞ্ছনীয় গ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানির বাহ্য দৃশ্যও সরল সৌন্দর্য্যে মনোহারী হইয়াছে।

৪। সনেট পঞ্চাশৎ,—শ্রীপ্রথম চৌধুরী প্রণীত। মূল্য আট আনা। সনেট বলিলে যে ছোট কবিতা বুঝায়, কেবল চতুর্দ্দশপদী বলিলে সেই অর্থ প্রকাশিত হয় না। এই চৌদ্দটি পংক্তিতে মিল ও ভাবগুলি এক বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়মে সজ্জিত থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় রচিত চতুর্দ্দশ পংক্তির কবিতাগুলি অনেক সময়ই সনেট হয় না। চৌধুরী মহাশয় ইটালীয় কবি পেত্রার্কার ধরণে লিখিত এই সনেটগুলি প্রকাশিত করিয়া নব্য কবিযশঃপ্রার্থীগণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সনেট কয়টির পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে, বাহ্যাকৃতি ও অন্তরবস্তু এই উভয়ের সামঞ্জস্যে গঠিত সনেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্থির ধারণা জন্মিবে। সনেট পঞ্চাশতের অনেক সনেটেই পেত্রার্কার সনেটের ভাবের জোয়ার ভাঁটার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বাঙ্গালার যমুনা' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'বীরবলের' ন্যায় সাহিত্য-রসিকের সম্মুখে মতপ্রকাশ দুঃসাহসের কার্য্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ভাবের এই অগ্রসার ও পুনরাবর্ত্তনের প্রকাশে ক খ খ ক, ক খ খ ক, গ ঘ ঙ, গ ঘ ঙ, এইরূপ মিল গঠিত আদর্শের সনেটই সম্যক উপযুক্ত এবং এই আদর্শের সনেটই শিক্ষার্থীর অধিক উপকারে আসিত। নবম ও দশম পংক্তিতে মিল দিলে, 'বীরবলের' ন্যায় সুকৌশলী শিল্পীর হাতে না পড়িলে শেষের চারি লাইন ছাড়া ছাড়া বোধ হইবে, এবং সনেটের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। অ।

ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

(শ্রীযুক্ত রমনীমোহন দাস এম্ এ মহাশয়ের ইংরাজি নোটস্ হইতে সংগৃহীত।)

গড়জরিপার দুর্গ

(১)

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অংর্গত টাউন সেরপুর নামক স্থানের ৮ মাইল উত্তরে গরজরিপায় একটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহাতে স্থাপত্যবিদ্যার বাহাদুরি বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু ইহা আকারে অতি বৃহৎ। তিনটি প্রাচীর এই দুর্গটিকে বেষ্টন করিয়া ছিল। সকলের বাহিরের প্রাচীর ও মধ্যের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পরিখা, এবং মধ্যের প্রাচীর ও সকলের ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে আর একটি পরিখা। দুর্গের চারিদিকে চারিটি দ্বার। পূর্ব্বের দ্বারের নাম "কামদুয়ারী"; পশ্চিমেরটির নাম "পানিদুয়ারী"; দক্ষিণেরটির নাম "শ্যামশেখরদুয়ারি" এবং উত্তরেরটির নাম "খিরকিদুয়ারী"। পানিদুয়ারির পাশে দুইখানি প্রস্তর পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা ঐখানের দুয়ারের অংশবিশেষ। উহা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ভিতরের পরিখার দক্ষিণ ও পশ্চিমস্থ অংশদ্বয়ের মধ্যে নৌকার আকৃতি একটী দ্বীপ ছিল; উহাকে "ডিঙ্গা" বা "কোষা" বলিত। পূর্ব্বোক্ত ভূমিকম্পে উহাও লুপ্ত হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে অনেক গুলি দীঘি ছিল; তন্মধ্যে "মতিমিঞার তালাও" নামক দীঘিটি বিশেষ পরিচিত। দীঘিগুলি এখন প্রায় ভরিয়া গিয়াছে।

ভিতরকার প্রাচীর দ্বারা ১,১৭০ বিঘা ভূমি পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর এখন নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উচ্চতা সকল স্থানে সমান নহে। উচ্চতা ২৫ ফুটের কম কোথাও নয়; ৪৩ ফুট পর্য্যন্তও আছে। পরিবেষ্টিত স্থানের দৈর্ঘ্য ন্যূনপক্ষে ৭০ ফুট, অধিক পক্ষে ৮০ ফুট। এই প্রাচীরটির পরিধি ৩১/২ মাইল। যে সব পরিখা এখনও আছে, মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের বিস্তার ১৫০ হইতে ৩০০ গজ পর্য্যন্ত।

কথিত আছে যে, প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে দীলিপ নামক একজন সর্দ্দার এই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া গারো এবং অন্যান্য পর্ব্বতবাসিগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ শার রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৭ খৃঃ অঃ) মজলিস্-শা হুমায়ুন নামক এক সেনাপতি দীলিপ সামন্তকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি গড়জরিপায় মুসলমানেরাই রাজত্ব করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পটকানোয়ারের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মানসিংহ কিছুকাল এই গড়জরিপার দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। দুর্গমধ্যে মজলিস শা হুমায়ুনের সমাধি-প্রস্তর-লিপি এখনও আছে। ঐ সমাধি-শিরে আর একখানি প্রস্তর ছিল। উহাতে তাম্রা আরবি অক্ষরে একলিপি উৎকীর্ণ ছিল। সেরপুরের ভূতপূর্ব্ব জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উহা এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে প্রেরণ করেন। ব্লকম্যান সাহেব উহার যে ইংরেজী অনুবাদ করেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

"করুণাময় ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর দেবতা নাই; মহম্মদ সেই ঈশ্বরের দূত (prophet.) * * * হে ঈশ্বর, মহম্মদকে দয়া করুন; এবং ভগবানের মনোনীত আলি এবং পবিত্র-হৃদয় ফতেমা এবং * * * হোসেন এবং * * * হাসেন তাঁহার আশিষ প্রাপ্ত হউন। * * * * এই কালের নরপতি শেইফল দোনেজা ওয়াদ্দিন আবদুল ফেরোজ শার আদেশে নির্ম্মিত। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। পবিত্র রমজানের ৮ তারিখে

এই খিলান সম্পূর্ণ করা হইল।”

প্রস্তর-ফলকখানির পাঠ সর্ব্বত্র উদ্ধার করা যায় না; কতগুলি শব্দ কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলকখানি ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট প্রশস্ত। ফলকের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ মধ্যে খলিফাকুলের প্রথম চারিজনের এক এক জনের নাম উৎকীর্ণ আছে। বামের দুই চতুষ্কোণ এবং দক্ষিণের দুই চতুষ্কোণ এক একটি লম্বরেখা দ্বারা সংযুক্ত, এই লম্ব রেখার গায়ে কিছু লেখা আছে; কিন্তু উহা একেবারেই পড়া যায় না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইবার কিছুকাল পূর্ব্বেও ফলকখানি আস্ত ছিল; কিন্তু অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি হস্তী উহার উপর পদ স্থাপন করায় উহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়াছে। ব্লকম্যান সাহেব যে লিপির অনুবাদ করিয়াছেন, আরবি ভাষায় উহা চারি ছত্র মাত্র।

ভিতরকার প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অনেকদিন হইল সেরপুরের জমিদার রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের নিষ্কর ভোগাধিকারে আছে। ঐ প্রাচীরের বহির্ভাগের জমি গভর্ণমেণ্টের খাসদখলে; উহাও সম্প্রতি উক্ত রায় বাহাদুরকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রাচীরের অনেক স্থান পড়িয়া গিয়াছে ও বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের উপর এখন প্রজারা ঘরবাড়ী করিয়াছে। পরিখাগুলির অধিকাংশ স্থান ভরিয়া গিয়াছে এবং তথায় চাষ হইতেছে। সমস্ত দুর্গের স্থানের পরিমাণ ৩,৩০০ বিঘা; উহাতে এখন ১৯০৩ খৃঃ (অঃ) শতাধিক হিন্দু ও মুসলমান পরিবার বাস করিতেছি।

(২)

কিশোরগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

কিশোরগঞ্জের এই মন্দিরের ৩১ টি চূড়া। ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গৃহগুলির নাম জলটঙ্গি (গ্রীষ্মাবাস) রাসবাড়ী, দুর্গামন্দির এবং শিবমন্দির। ইহা ব্যতীত আরো কয়টি ক্ষুদ্র গৃহ আছে।

যখন এ প্রদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মসলিনের ব্যবসা খুব চলিতেছিল, সেই সময়ে ব্রজকিশোর পরামাণিক নামক এক ব্যক্তি কিশোরগঞ্জে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ইনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের এই মন্দির এবং তৎসন্নিকটস্থ গৃহগুলি নির্ম্মাণ করান। তিনি তিন্ন চারিটি দীঘিও খনন করান। ইহার একটি ২৬০ গজ লম্বা এবং ১৪৩ গজ প্রশস্ত। এইটি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে, যে উনসত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, সেই মন্বন্তরের সময় লোকদিগকে কেবল মাত্র আহার দিয়া তাহাদের দ্বারা এই দীঘিগুলি খনন করান হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত জলটঙ্গি গৃহ ত্রিতল; উহা পূর্ব্বোল্লিখিত বড় দীঘির মধ্যস্থলে নির্ম্মিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং তৎসংশ্লিষ্ট গৃহগুলি ৯,২১৬ বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া ছিল। সবগুলি গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের এক উচ্চস্থানে একখানি প্রস্তর ফলকে সংস্কৃত শ্লোক লিখিত ছিল; উহা এখন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রোথিত।

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ নিয়োগী।



প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ — ২য় সংখ্যা

অন্ধ্র নৃপতিগণের কালনির্ণয়

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

রাজা শালিবাহন এই নাম আমাদের দেশে অনেকের নিকটই সুপরিচিত। ইহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরাজয়-সাধন, এবং শকজাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত করিয়া শকাব্দ প্রতিষ্ঠাই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান ও বিচারফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শালিবাহন বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, একটি রাজবংশের উপাধি মাত্র। ইতিহাসে ও পুরাণে যে পরাক্রান্ত রাজবংশ অন্ধ্ররাজবংশ নামে বিখ্যাত তাহারই অপর নাম শাতবাহন, এবং এই শাতবাহন শব্দই কালক্রমে লোকমুখে শালিবাহনে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে আরও একটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। শাতবাহন বা শালিবাহন যে কোন রাজবংশের নাম লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, এবং উক্ত বংশের কার্য্যকলাপ সমুদয় শালিবাহন নামধেয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এই ধারণা লোক-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে। বস্তুতঃ, শালিবাহন রাজার সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহার অধিকাংশই মোটামুটি অন্ধ্রবংশের সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

সকলেই জানেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে রাজবংশের কালনির্ণয় একটি বিষম সমস্যা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে কয়েকটি মূল-সূত্র পাওয়া যায়, এবং তদবলম্বনে এই কার্য্য অনেক সহজ-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ভাগবত, এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শেষভাগে ভবিষ্যবর্ণন বলিয়া একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে উত্তরকালে মগধে কোন বংশ কত কাল রাজত্ব করিবেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্য বংশ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে সুঙ্গ ও কাম্ববংশ যথাক্রমে ১১২ ও ৪৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিলে মগধ রাজ্য অন্ধ্রগণের হস্তগত হয়। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক, সুতরাং এই অন্ধ্রগণ যে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ সুপ্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী কালে এই রাজবংশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পাঠকবর্গ অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি সর্ব্বসাধারণের নিকট ইঁহারা তত সুপরিচিত নহেন, ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। আমার মূল বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে অন্ধ্রজাতির প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইলে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা, এই

নিম্নে অতি সংক্ষেপে সুপরিচিত হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে দেখিতে গেলে অন্ধ্রগণের সম্বন্ধে দুইটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। প্রাচীনকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণই দাক্ষিণাত্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী হইতেও ইহা জানা যায়, এবং সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের ইতিহাসও ইহার প্রধান সাক্ষী। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রশক্তিসঙ্ঘের মধ্যে অন্ধ্রগণই প্রথমে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া এই চির প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করেন। আমাদের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা অগৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে যে আশ্চর্য্য সমাজগত ও ধর্ম্মগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ ঘটনা তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য কেবল আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াই আসিতেছিল, ততদিন উভয়ের মধ্যে "জেতাজিত বিষভাব" বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ ঐক্য সাধনের পক্ষে বিষম অন্তরায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অন্ধ্রগণ যখন নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিলেন যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবেও দাক্ষিণাত্য উপহাসের স্থল নহে, তখন এই বাধা দূর হইয়া মিলনের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বর্ত্তমান কালের রুষ-জাপান যুদ্ধ এবং পরবর্ত্তীকালে জাপানের সহিত ইউরোপের সখ্যভাব ইহার তুলনীয় ঘটনা।

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে অন্ধ্ররাজগণ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন সেই সময়েই পঙ্গপালের ন্যায় বিদেশীয় শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। কাশ্মীর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ গ্রীক, শক পার্থিয়ান প্রভৃতির দ্বারা অধিকৃত হয়; এবং ইহারা দাক্ষিণাত্যেও অগ্রসর হইতে এই সঙ্কট সময়ে অন্ধ্রবীর গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি থাকে। ইহাদের গতিরোধ করেন, এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া মালব ও গুজরাটে ইহাদিগকে পরাভূত করেন। এই অন্ধ্ররাজগণের বাহুবলে বহুকাল পর্য্যন্ত বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ইহাও এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এই বিদেশীয়গণের হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্য রক্ষা করিতেই শেষ অন্ধ্ররাজগণের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়, এবং ইহারই ফলে তাঁহাদের ধ্বংস-সাধন হয়। যদিও শকজাতি তখন দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের প্রথম প্রবল বেগ প্রতিহত হওয়াতে তাহারা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই হিসাবে অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্রকে আমরা ফ্রান্সের চার্লস্ মার্টেলের সহিত তুলনা করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, অন্ধ্ররাজগণের মুদ্রার উপর অর্ণবপোত অঙ্কিত আছে; ইহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রবল নৌশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ধর্ম্ম এবং ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও অন্ধ্রগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল। কিন্তু গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই বৌদ্ধ বিপ্লবের হস্ত হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে উৎপীড়িত করেন নাই, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাহাতে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের হিসাবে তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয় কি না বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার বিচার করিবার স্থল নহে; কিন্তু বর্ত্তমানে যাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি, তাহার নিমিত্ত আমরা অন্ধ্রগণের নিকট কি পরিমাণ ঋণী তাহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য বিষয়েও অন্ধ্রগণের বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হয়। হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট যে সপ্তশতী গ্রন্থকে নীতিমালার অক্ষয় ভাণ্ডার বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাও অন্ধ্ররাজ হাল-বিরচিত। এই অন্ধ্র-রাজ-সভাতেই কাতন্ত্র ব্যাকরণ ও বৃহৎকথা লিপিবদ্ধ হয়।

"পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি" নামক গ্রন্থ ও টলেমি লিখিত বিবরণ হইতে ইউরোপ আফ্রিকার সহিত দাক্ষিণাত্যের যে বিপুল বাণিজ্য সমৃদ্ধির বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও এই অন্ধ্রগণের রাজ্যকালের ঘটনা।

এই অন্ধ্ররাজগণের সময়ে "নিগম সভা" প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের নগরী-সমূহ স্বায়ত্ত-শাসন উপভোগ করিত। যে ব্যাঙ্ক প্রথা (Banking system) ইউরোপে সমুদ্ভূত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস এই অন্ধ্র-রাজ্যে আমরা তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই। গন্ধবণিক বা তৈলবণিকের ব্যাঙ্কে লোকে টাকা জমা রাখিত এবং প্রতি বৎসর যথা নিয়মে ইহার সুদ হইতে ধর্ম্মকার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ব্যতীত শিল্পকলারও এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

যে অজন্তা গুহা লইয়া আজ আমরা পৃথিবীর সমক্ষে গর্ব্ব করি তাহা অন্ধ্ররাজগণ কর্ত্তৃক আরব্ধ হয়। কাণেড়ীর যে চৈত্য মন্দির কারুকার্য্যের কুশলতায় ফাগু‌র্শন ও বার্গেশ সাহেবের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল তাহাও এই সময় নির্ম্মিত। এই অন্ধ্ররাজগণের রাজ্যকালে নির্ম্মিত সুন্দর শিল্পকলাশোভিত শত শত বিচিত্র গুহা-মন্দির সকল এখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। যতদূর বলা হইয়াছে আশা করি তাহাতে সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে যে, অন্ধ্রগণের ইতিহাস ভারতবর্ষের পক্ষে নগণ্য নহে।

এই অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে তাঁহারা কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহারই আলোচনা করিব।

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাকাল খৃঃ পূঃ ৩২১ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। পুরাণোক্ত উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে ইহার (১৩৭+১১২+৪৫)=২৯৪ বৎসর পরে, (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে) কাম্ববংশের ধ্বংস ও অন্ধ্রবংশের অভ্যুদয় বলিয়া নিরূপিত হয়।

এই হিসাবে অন্ধ্রবংশের উৎপত্তি কাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে বলিয়া অনুমিত হয়। এসম্বন্ধে কোন গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু যেরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী পাওয়া যায় তাহাতে আপাততঃ পুরাণোক্ত এই কাহিনী ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়। এ সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অন্ধ্রবংশ ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। যদি ইঁহাদের উৎপত্তি কাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ইঁহারা ৪৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ জয় করেন। এলাহাবাদ স্তম্ভ (অনুশাসন) লিপিতে তৎকর্ত্তৃক বিজিত রাজ্যসমূহের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অন্ধ্ররাজ্যের কোন উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৪৩০ খৃঃ অব্দের বহু পূর্ব্বেই অন্ধ্রবংশের রাজ্য শেষ হইয়াছিল।

২। পুরাণে অন্ধ্র বংশের প্রত্যেক রাজার যে রাজত্বকাল দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে, উক্ত বংশের অন্যতম রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই বংশ প্রতিষ্ঠার ৩০৫ বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদি এই বংশের প্রতিষ্ঠাকাল খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গৌতমীপুত্রের রাজ্যলাভ কাল ২৭৮ খৃঃ অঃ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, গৌতমীপুত্র শকক্ষত্রপ নহপনের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সুবিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমি

তৎপুত্র পুলুমায়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। নহপনের রাজ্যকাল ১২৪ খৃঃ অব্দ এবং টলেমি আনুমানিক ১৫০খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং গৌতমীপুত্রের রাজ্যকাল ১২৪ ও ১৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী। অতএব ২৭৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সিংহাসনারোহণ অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, খৃঃ পূঃ ২৭ বর্ষে অন্ধ্রগণ রাজ্যলাভ করেন বলিয়া যে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়।

এমতাবস্থায় অন্ধ্ররাজগণের রাজ্যকাল নিরূপণে দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ পুরাণের বর্ণনায় কোন আস্থা স্থাপন না করিয়া স্বাধীনভাবে অন্ধ্রগণের কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পরেই মৌর্য্য সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে; সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, তৎকালে প্রান্তরাজ্যসমূহ মৌর্য্যরাজগণের অধীনতাপাশ হইতে ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এই যুক্তি অনুসারে আঃ খৃঃ পূঃ ২২০ বর্ষে ইঁহারা অন্ধ্ররাজত্বের আরম্ভকাল বলিয়া নির্ণয় করেন।

ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এ বিষয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণের ন্যায় তিনি পুরাণোক্ত বর্ণনা একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধানে যত্নপর হইয়াছেন। ১৮৭৪ সালে ভিয়েনা নগরে প্রাচ্য মহাসম্মিলনের (Oriental Congress) অধিবেশনে তিনি প্রথমে তাঁহার মত প্রতিপাদন করেন, পরে উহাই সুসংস্কৃত আকারে তাঁহার সুবিখ্যাত "দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে" স্থান লাভ করিয়াছে।

পুরাণ অনুসারে অন্ধ্রবংশে ৩০ জন রাজা ছিলেন, এবং তাঁহারা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু বায়ুপুরাণে একটি শ্লোকার্দ্ধে লিখিত হইয়াছে যে, "অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বে চ শতং চ বৈ"। ইহা হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রগণ তিন শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বায়ুপুরাণে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে যে, ৩০জন অন্ধ্ররাজা ৪১১ বৎসর রাজত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণে যে রাজগণের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ১৭জন মাত্র রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ২৭২ বৎসর।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্ধ্রগণের রাজ্যকাল সম্বন্ধে পুরাণে দুইটি বিভিন্ন প্রবাদ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবাদ অনুসারে এই বংশের ৩০জন রাজা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে ১৮ কি ১৯ জন রাজা ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। আমরা জানি যে, অন্ধ্রগণের দুইটি বিভিন্ন রাজধানী ছিল যথা, প্রতিষ্ঠান ও ধনকটক। ভাণ্ডারকরের মতে অন্ধ্রবংশীয় রাজা ধনকটকে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানপুরীতে প্রতিনিধিরূপে শাসন করিতেন। পরে রাজার মৃত্যু হইলে তিনি ধনকটকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানপুরীতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। ভাণ্ডারকর বলেন যে, বায়ুপুরাণে কেবলমাত্র ধনকটকে যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সমুদয় পুরাণে ৩০ জন অন্ধ্ররাজা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ লিখিত আছে তাহা ধনকটক ও প্রতিষ্ঠান এই উভয় স্থানের রাজগণের নাম ও তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি মাত্র। প্রতিষ্ঠান পুরীর অনেক রাজপ্রতিনিধি ধনকটকের রাজার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কখনও ধনকটকে রাজা হন নাই, এবং তাঁহাদের নাম ও রাজ্যপরিমাণ এই কারণে বায়ুপুরাণের তালিকাভুক্ত হয় নাই। এই জন্যই বায়ুপুরাণের মতে রাজসংখ্যা ১৮ ও রাজত্বকাল ৩০০ বৎসর, এবং পুরাণোক্ত সাধারণ প্রবাদ অনুসারে রাজ-সংখ্যা ৩০ ও রাজত্ব-পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর।

ভাণ্ডারকর মহাশয় যখন উপরোক্ত মত লিপিবদ্ধ করেন তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাণোক্ত কাহিনীতে কোনই আস্থা স্থাপন করিতেন না। এই জন্যই ভাণ্ডারকর মহাশয় পৌরাণিক বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং এই হিসাবে তাঁহার চেষ্টা নিতান্ত সম্মানার্হ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তিনি যে মতবাদ প্রচারিত করিয়াছেন আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। এ বিষয়ে কয়েকটি মাত্র সাধারণ আপত্তির উল্লেখ করিব।

১। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের সমগ্র মতবাদের প্রধান ভিত্তি এই যে, প্রতিষ্ঠানপুরী ও ধনকটকে অন্ধ্র রাজবংশের দুইটি বিভিন্ন রাজধানী ছিল, এবং একই সময়ে এই দুই স্থানে দুই জন রাজা রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। টলেমি প্রতিষ্ঠান পুরীকে পুলুমায়ীর রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, ধনকটকের ন্যায় প্রতিষ্ঠানপুরীও অন্ধ্রবংশের অন্যতম রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী কালে অযোধ্যা শ্রাবস্তী প্রভৃতিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী ছিল। ইহাতে এমন প্রমাণিত হয় না যে, একই সময়ে দুই জন রাজা দুই রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। এ বিষয়ে ভাণ্ডারকরের অন্যতর প্রমাণ পুলুমায়ীর রাজত্বে খোদিত ২৬নং নাসিক শিলালিপি। ইহাতে অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্রের মাতা বালশ্রীকে "মহারাজ-মাতা মহারাজপিতামহী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাণ্ডারকর বলেন যে, ইহাতে অনুমিত হয় যে, গৌতমীপুত্র ও তাঁহার পুত্র একই সময়ে রাজত্ব করিতেন, অন্যথা "মহারাজমাতা, মহারাজপিতামহী" ইহার বিশেষ কোন অর্থ হয় না, কারণ প্রায় প্রত্যেক মহারাজপিতামহীই তো মহারাজমাতাও বটেন। এ যুক্তি যে তাদৃশ বলবতী নহে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায়; কারণ যদিও অধিকাংশ স্থলেই মহারাজের পিতামহী মহারাজমাতাও বটেন, তথাপি অনেক স্থলেই পিতামহীর জীবিতাবস্থায় পৌত্রের রাজত্ব লাভ হয় না। সুতরাং যে পিতামহী পুত্র ও পৌত্র উভয়কেই মহারাজ পদবীতে আদর দেখাইয়াছেন তিনি স্বভাবতঃই গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি মহারাজ-মাতা ও মহারাজপিতামহী আর যে লিপিকর বালশ্রীকে উক্ত বিশেষণে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মনে এরূপ কোন বিশেষত্ব প্রকাশের ভাব নাও থাকিতে পারে, যাহা সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা হয়ত তাহাই মাত্র সে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল যে, যে প্রধান ভিত্তির উপর ভাণ্ডারকরের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক; কারণ সম্প্রতি নাসিকের নিকটবর্ত্তী জোগালথম্বি নামক স্থানে যে ধনভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভাণ্ডারকরের মতবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ভণ্ডারকরের যুক্তি অনুসারে, কেবলমাত্র যে সমস্ত রাজগণ ধনকটকে রাজত্ব করিতেন তাঁহাদেরই নাম বায়ু পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি অন্ধ্র-রাজত্বের ইতিহাস গঠন করিয়া দেখাইয়াছেন যে,গৌতমী-পুত্র প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তিনি এইটিই বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কারণ তাঁহার হিসাবে গৌতমীপুত্র ১৩৩ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদি ধরা যায় যে,গৌতমীপুত্র প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন, তাহা হইলে তৎপুত্র পুলুমায়ী টলেমির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন,অথচ টলেমি পুলুমায়ীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাণ্ডারকর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,গৌতমীপুত্র ও পুলুমায়ী একই কালে যথাক্রমে ধনকটক ও প্রতিষ্ঠানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু জগলথাম্ব নামক স্থানে যে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গৌতমীপুত্রের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহার অনেক মুদ্রায় প্রথমে নহপনের নাম অঙ্কিত ছিল, পরে

তৎস্থানে গৌতমীপুত্রের নাম অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং নাসিক প্রভৃতি অঞ্চলে গৌতমীপুত্র যে রাজত্ব করিতেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ডাক্তার ভাণ্ডার করের মতবাদ আমরা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারি না।

বিশেষতঃ, কোন বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবেও ভাণ্ডার করের মত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় আছে। প্রায় সমুদয় পুরাণকারের মতে অন্ধ্রবংশীয়েরা ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা ধনকটকে ও প্রতিষ্ঠান নগরে যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন এই উভয়ের রাজ্যকালের সমষ্টি,—অথচ তিনি বলেন যে, উভয়েই এক কালে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজগণের রাজ্যকাল ও তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিগণের শাসনকালের সমষ্টিকে মোট বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজত্বের পরিমাণ কাল বলিয়া গণ্য করিলে ইহার অনুরূপ গণনা হইবে। কোন সাধারণ বোধশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ গণনা করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে, এবং পুরাণকারগণের যে সাধারণ বোধশক্তি ছিল, বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে আমি তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাণ্ডারকর মহাশয়ের উদ্যমের বিশেষত্ব এই যে তিনি ইউরোপীয়গণের মত পুরাণকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহারই সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা ইতিহাস গঠনে যত্নবান ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব প্রাচীন ইতিহাস গঠনে এই প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত, এবং আমাদের বিশ্বাস পুরাণে যাহা আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয় তাহারই সাহায্যে অন্ধ্রগণের প্রকৃত কাল নির্ণয় হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন পুরাণের উক্তির বিশেষ অসামঞ্জস্য এই যে, প্রায় সমুদয় পুরাণে অন্ধ্রগণের রাজ্যকাল ৪৫৭ বৎসর বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বায়ুপুরাণের একটি শ্লোকার্দ্ধে, তাঁহারা তিন শত বৎসর রাজত্ব করিবেন এইরূপ একটি উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাগবৎপুরাণকারও যে এইরূপ একটি ঘটনা অবগত ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

আমাদের বিবেচনায় অন্ধ্রজাতির ইতিহাস একটু আলোচনা করিলেই এই পরস্পরবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। সকলেই জানেন অন্ধ্রগণ দাক্ষিণাত্যের একটি সুপ্রসিদ্ধ জাতি। মহারাজ অশোকের শাসনলিপি প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিলেন, এবং পুরাণ হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহারা কালক্রমে মগধের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, অশোকের মৃত্যুর পর কোনও সময়ে তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা এতদূর বৰ্দ্ধিত হয় যে, তাঁহারা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, যে সময় তাঁহারা স্বাধীন হন, ঠিক সেই সময় বা তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহারা মগধ আক্রমণ ও অধিকার করেন। বরং ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভ ও মগধ অধিকার এই উভয়ের মধ্যে কিছু দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া পুরাণোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান হইবে বলিয়া মনে হয়। পুরাণকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, মগধের রাজবংশ বর্ণনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মৌর্য্য, সুঙ্গ, কাণ্ব এই সমস্ত রাজবংশেরই মগধে উৎপত্তি ও ধ্বংস। সুতরাং ইহাদের বর্ণনা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজা যখন শেষ কাণ্ব রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন অন্ধ্ররাজ্যের বর্ণনা, মগধ রাজ্যের ইতিহাসলেখকের পক্ষে সমস্যার বিষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মগধ রাজ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে অন্ধ্রদের রাজত্ব

কাম্বদের পরেই আরম্ভ সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্ধ্রগণের মোট রাজত্বকাল লিখিতে হইলে মগধ বিজয়ের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের রাজত্বকাল গণনা না করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় পুরাণে মগধ রাজ্যের কালপরিমাণসূচক যে দুইটি সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই সমস্যারই পরিচায়ক। তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে যে অন্ধ্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য আরম্ভ করেন, তখন হইতে তাঁহাদের স্থিতি পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর এবং মগধ বিজয়ের পর হইতে তাঁহাদের রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত কালপরিমাণ ৩০০ বৎসর।

আমাদের অনুমান যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে এই উভয় সংখ্যার বিয়োগফল, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ হইতে অন্ধ্রগণের মগধ বিজয় পর্য্যন্ত কাল-পরিমাণই ইহার প্রমাণ। এই দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল ১৫৭ এবং সুঙ্গ ও কাম্ববংশের রাজত্ব পরিমাণের সমষ্টিও ১৫৭। সুতরাং আমাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, যে সময় পুষ্পমিত্র শেষ মৌর্য্য রাজাকে নিহত করিয়া মগধে সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, ঠিক সেই সময়েই দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রগণ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করেন। পরে যে ১৫৭ বৎসর সুঙ্গ ও কাম্ববংশ মগধে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অন্ধ্রগণ দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন; পরে কাম্ববংশের ধ্বংস হইলে মগধ অধিকার করিয়া ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে যতটুকু বিবরণ আমরা অবগত আছি ইহার সহিত এই সিদ্ধান্তের এত দূর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় যে, অন্য প্রমাণাভাবেও নিশ্চিত ঘটনা না জানা পর্য্যন্ত আমরা এই অনুমানকেই ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। অন্তর্বিদ্রোহে মৌর্য্যবংশের ধ্বংসের পরেই যে মগধ সাম্রাজ্যের অধীন দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে, ইহা কেবল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা নহে, ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। পশ্চিমে যবন সৈন্য (গ্রীক-বাকট্রিয়ান) সিন্ধু পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, এবং পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক গ্রীকবীর ডিমেট্রিয়াস গ্রীক ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাই অবন্তী এই সময়ে স্বাধীন হয়, এবং কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ রাজ্যও ঐ সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখিতে পাই বিদর্ভ রাজ্যও সম্প্রতি অর্থাৎ পুষ্পমিত্রের সময়ে স্বাধীন হইয়াছে, কারণ বিদর্ভরাজকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিমিত্র এক স্থলে বলিয়াছেন 'অচিরাধিষ্ঠিত রাজ্য-শত্রুঃ'। বিশেষতঃ অন্ধ্ররাজ্য যে পুষ্পমিত্রের সময়ে স্বাধীন ছিল, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণও আমরা মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রাপ্ত হই। উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্কে অগ্নিমিত্রের শ্যালক বীরসেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে যে তিনি নর্ম্মদা তীরে (বিদর্ভ) সীমান্ত দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং ইহাতে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে গোদাবরী-তীরে অন্ধ্ররাজ্য যে তৎকালে স্বাধীন ছিল এই তথ্য প্রমাণিত হয়। এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, যখন পুষ্পমিত্র সৈন্যদর্শনব্যপদেশে শেষ মৌর্য্য রাজা বৃহদ্রথকে নিহত করেন, তখন এই অন্তর্বিদ্রোহানলে সমগ্র সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া গ্রীক যবনগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং তাহাতেই মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়; এবং সুযোগ বুঝিয়া সামন্ত প্রদেশ-সমূহ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে। গার্গী সংহিতায় কয়েকটি শ্লোকও আমাদের অনুমান সমর্থন করে।

"ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালং মথুরাং তথা
যবনো দুষ্ট বিক্রান্তঃ প্রাপ্স্যতি কুসুমধ্বজম্।
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দ্দমে প্রথিতে হিতে
অকুলা বিষয়াঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ"।

এই শেষ পংক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রীক আক্রমণের ফলে বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে মগধ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, পুরাণে

যাহা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়, এই অনুমানে তাহার সামঞ্জস্য সাধিত হয়; অর্থাৎ, মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেই (আঃ খৃঃ পূঃ ১৮৪ বর্ষে) অন্ধ্ররাজগণ স্বাধীনতা লাভ করেন, পরে ১৫৭ বৎসর পরে কাম্ববংশের শেষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধ অধিকার করেন। ইহার ৩০০ শত বৎসর পরে মগধ সাম্রাজ্যের লোপ হয়। তবে শেষ ৫২ বৎসরে যে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন তাঁহারা অতিশয় ক্ষীণবল ছিলেন। পুরাণে তাঁহাদিগকে শ্রীপর্ব্বতীয় অন্ধ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,এবং তাঁহারা মূল বংশের শাখা। বায়ুপুরাণে ইঁহাদের উল্লেখ নাই; বায়ু পুরাণকার এই জন্য মোট রাজত্ব-পরিমাণ ৪১১ বৎসর ধরিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণে ইঁহাদিগকে অন্ধ্র-বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং মোট রাজত্ব-পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর লিখিত হইয়াছে। এই উভয় গণনায় যে ছয় বৎসরের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অন্ধ্র বংশের এই শাখার রাজ্য প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরও অন্ধ্রবংশের শেষ রাজা ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপে বায়ুপুরাণ ও অন্য পুরাণের বিরোধ মীমাংসা করা যাইতে পারে।

উপরে যে মতবাদ লিপিবদ্ধ হইল তাহা সুনিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা এখনও সমর্থিত হয় নাই। তবে পুরাণের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, এবং ঘটনাগত প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে ইহা সমর্থিত হয়। এমন কি পুরাণে যাহা আপাতবিরুদ্ধ বর্ণনা বলিয়া মনে হয়, এবং এ পর্য্যন্ত যাহার কোন সুমীমাংসা হয় নাই, এই মতবাদের দ্বারা তাহারও সুন্দর সামঞ্জস্যবিধান হয়। আর মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে আধুনিক কালে অন্ধ্রগণের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরোক্ত মতবাদ কোন অংশে তাহার বিরোধী নহে। ইহার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, পুরাণকার অন্ধ্রবংশের প্রথম রাজাকেই কাম্বরাজার পরাজয়কারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত মতবাদ সমর্থিত হউক বা নাই হউক, পুরাণকারের এ বচনটি যে ভ্রমাত্মক তাহা ভাণ্ডারকরের মতবাদ খণ্ডনের সময় উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার ভ্রমের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক। অন্ধ্রগণ কর্ত্তৃক কাম্বরাজ নিহত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন, ইহা জানা ছিল, এবং অন্ধ্ররাজগণের নামের তালিকাও লিখিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে, লোকে যখন বিস্মৃত হইল যে, অন্ধ্রগণ দাক্ষিণাত্যে বহুকাল রাজত্ব করিবার পর মগধ জয় করেন, তখন স্বভাবতঃই প্রথম অন্ধ্ররাজ কাম্বরাজার পরাজয়কারী বলিয়া উল্লিখিত হইলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা অন্যত্র পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি যে, পুরাণ বা এতদ্দেশীয় অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থোক্ত কাহিনীগুলি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া, আধুনিক কালের আবিষ্ক্রিয়ার সহিত তাহার যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ইতিহাস রচনা করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও মাত্র তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

কিশোরী

গো কিশোরী প্রিয়া মোর পলিত ধরারে আজি তুমেছ
কিশোরী

জীর্ণ জগতের যত অবসন্ন জীর্ণ কথা দিয়াছ পাশরি'।
জরার জড়তা গেছে নিত্যদৃষ্ট ম্লান গ্লানি সবে গেছে দূর,
সবি যেন রাঙা রাঙা কচি কচি টল টল পেলব মেদুর।
পুরাণ সঙ্গীত মাঝে আজি মোর প্রাণে বাজে অভিনব তান,
শুকান জীবন-নদী বন্যায় উথলি আজ বহিছে উজান।
নূতন আলোকে হেরি আজি সবি অভিনব লাবণ্য-চঞ্চল,
এক গাল হাসি হেসে, ভালে টিপ, ধরা যেন বেঁধেছে কুন্তল।
কিশোরী দেবীর মোর সভক্তি আহ্বানে আজ পুণ্য
আয়োজনে

জীর্ণ ভগ্ন দেবালয়ে দেবতা জাগিল, 'তব শঙ্খ ঘণ্টা-স্বনে।
কত বর্ষ পুষ্পহীন উদ্যানে ফুটিল মোর অশোক-বকুল
পূরবী ভুলিয়া ঐ আবার সাহানা গায় বিহগ ব্যাকুল,
বিবাহের রঙ্গে সেজে মাতে আজি যাহা কিছু বিবর্ণ মলিন
ধরায় বসন্ত জাগে অসময়ে সরোবরে নলিনী-নলিন।
পুরাণ অলির গান ফুল-হাসি নদী-তান সবি লাগে ভাল
মদির স্বপন সুপ্ত জগতে জাগিল মোর প্রভাতের আলো।
আজিকে যৌবন-লক্ষ্মী মানবের দ্বারে দ্বারে জাগাল জীবন,
অভিসারে রসাবেশে পুলক রোমাঞ্চে আজি ভরিল ভুবন।
কার গৃহ-লক্ষ্মী হতে প্রকৃতি বালিকা করে সীমন্তে সিন্দুর
উদ্বাহ আঙিনা তলে দাঁড়ায়েছে সালঙ্কারা হাসিয়া মধুর।

শ্রীকালিদাস রায়।

ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

গড়জরিপার দুর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

আটিয়ার মস্‌জিদ্‌।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে বাজইদ্ খাঁর পুত্র সৈয়দ খাঁ পানী নামক পানিগোত্রের এক জন আফ্‌গান টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটিয়া নামক স্থানে একটি বড় মসজিদ নির্ম্মাণ করান। আটিয়া সৈয়দ খাঁ পানির জায়গীরের প্রধান নগর ছিল। ঐ মস্‌জিদের পবিত্রতা ও খ্যাতির কারণ এই যে, উহা পীর সাহানশা বাবা আদম কাশ্মীরির সমাধির উপর সংস্থাপিত। মস্‌জিদের সম্মুখে দ্বারের উপরে একখানি প্রস্তরেতে আরবী ভাষায় যে লিপি আছে, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

(১) সা নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে অনেক সমৃদ্ধ মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(২) সৈয়দ খাঁ পানিও একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি যেন ইহার জন্য পরলোকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

(৩) যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমার প্রাণের ভিতরে বলিল "কে এই সৈয়দ জুলাহয়া রাজ্রা" হে সৈয়দ, ঈশ্বর তোমাকে ইহ পর-লোকে আশীর্ব্বাদ করুন।

---

* (শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস এম্ এ মহাশয়ের ইংরাজী নোটস্ হইতে সংগৃহীত।)

ইহাতে হিজরি তারিখ পাওয়া যায় (খৃঃ অঃ ১০৬৯-) । যখন এই বড় মসজিদটি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন এক ব্যক্তি ইহার স্থানে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। রোসন খাতুন চৌধুরী নামক একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভগ্ন বড় মসজিদই পুনরায় নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করেন। অতএব ঐ আরব্ধ ছোট মন্দির আর প্রস্তুত হয় না। বড় মসজিদের প্রস্তর লিপি পাঠে জানা যায় যে, সাহীনশা বাবা আদম কাশ্মীরি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর প্রাণবলীলা সংবরণ করেন। এই শিলালিপিতে ইঁহাকে " বাবা কাশ্মীরি," না বলিয়া " বাবা কাশ্মীর " বলা হইয়াছে; এটা নিশ্চয়ই ভুল। "বাবা কাশ্মীর" কথা হয় না। এই মসজিদের সন্নিকটে বঙ্গে প্রচলিত রীতিতে নির্ম্মিত একটি পুরাতন মসজিদ আছে। লোকেব সংস্কাব যে উহা সুলতান গায়েস উদ্দীন আজম সা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নিকটে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি সমাধির ধ্বংসাবশেষ আছে; লোকে বলে উহা সুলতানের সমাধি।

সৈয়দ খাঁ পান্নি মোগল সম্রাটের সেনা বিভাগে চাকরি করিতেন। কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপে তিনি সম্রাট আকবরের নিকট হইতে আটিয়া পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইনিই করটিয়া জমীদার বংশের স্থাপয়িতা।

(৪)

আগর সিন্দূর গ্রামে মস্‌জিদ।

ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমায় ব্রহ্মপুত্রতীরে আগর সিন্দুর গ্রামে একটি অতি সুন্দর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মসজিদের সম্মুখ ভাগে ও কুলুঙ্গি একত্র বেষ্টন করিয়া যে সকল কারুকার্য্য আছে তাহা অতি মনোহর। ইহার ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ গুম্বুজ আছে। এবং চারি কোণে অষ্টপার্শ্ব বিশিষ্ট চারিটি স্তম্ভ আছে। মসজিদটির অনেক স্থানে প্রাচীর ফাটিয়া গিয়াছে এবং উহা অশ্বচ্ছায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সম্মুখের দ্বারের উপর প্রস্তর ফলকে তোগ্রা আরবি অক্ষরে এই লিপি খোদিত আছে —

"আল্লা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ তাঁহার দূত prophet). আল্লা বলেছেন যে, যে আল্লাতে এবং পরজীবনে বিশ্বাস করে সে ই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। মহম্মদ বলেছেন যে, যে পৃথিবীতে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করে আল্লা তাহার জন্য স্বর্গে ৬০ খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। পৃথিবীর রাজগণের শিরে মুকুট স্থাপনকারী (the bestower of crowns on the kings on the world) রাজাধিরাজ, চন্দ্রকলার দ্বিতীয় অধীশ্বর (the second Lord of the two horns) সাজাহান বাদশা গাজীর রাজত্বকালে ১০৬২ হিজরি সনের (১৬৪০ খৃষ্টাব্দের) রবিউল আউল মাসে মীরুর পুত্র সাদির তত্ত্বাবধারণে আল্লার মেহেরবানিতে এই মসজিদ্ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল।

স্থানীয় লোকে এই মস্‌জিদের অত্যন্ত সম্মান করে। আকবরের রাজত্বকালে যে বারভুঁঞা বাঙ্গলাদেশ শাসন করিতেন ইসাক খাঁ তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। পূর্ব্ব বর্ণিত মসজিদের নিকটে যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে লোকে বলে যে, উহা ইসাখাঁর আদেশে নির্ম্মিত। এই স্থানে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা মানসিংহের সহিত ইসাকখাঁর এক যুদ্ধ হয় এবং মান্‌সিংহ পরাভূত ইসাকখাঁকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। নিকটেই মাটির একটি উঁচু ভিটি আছে। প্রবাদ এই যে, মানসিংহ এখানে দোলোৎসব করিয়াছিলেন.

(৫)

বোকার নগরের দুর্গ।

বোকার নগর যে এককালে বেশ বড় নগর ছিল তার প্রমাণ এই যে; উহা রেনেল সাহেবের হিন্দুস্থানের ম্যাপে সুনিরূপিত আছে। মুসলমান রাজত্বকালে ইহার সমৃদ্ধি ও খ্যাতি ছিল। বোকার নগর

প্রায় কতকটি স্থান জুড়িয়া একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। চারিটি ইষ্টক স্তূপ আছে; লোকে বলে ওগুলি দুর্গপ্রাচীরের চার কোণের প্রহরীদের আবাস-কক্ষ ছিল। কৃষকেরা এখনো দুর্গসীমার মধ্যস্থ ভূমি চষিতে চষিতে ভূমিতলে গুলিগোলার ভগ্নাবশেষ পায়। বৃদ্ধেরা বলে, তাহারা বাল্যকালে দুর্গপ্রাচীরের অংশ বিশেষ দেখিয়াছিল। এই প্রাচীরের শেষ নিদর্শন গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ভূমিকম্পে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোকারনগর যে মুসলমান রাজত্বকালে একটী বড় নগর ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। যতটা স্থানকে বোকারনগর বলে উহা এখনো নিম্নলিখিত পল্লীগুলিতে বিভক্ত—(১) বালুরচর, (২) পাঠানটোলা, (৩) ফকীরটোলা, (৪) পিয়াদাটোলা, (৫) মহাজনটোলা, (এই খানে সন্ন্যাসী ও রাজপুতেরা বাস করিত), (৬) পটুয়াটোলা, (৭) কায়স্থটোলা, (৮) ত্রিশঘর, (৯) মহল্লাগড়পাড়া, (১০) চকপাড়া, (১১) মহল্লা অষ্টঘর, (১২) মহল্লা বাইশঘর, (১৩) মহল্লা নিরিকপুর, (১৪) মহল্লা মামুদনগর, (১৫) মমিরপুর, (১৬) মিছিরকান্দা, (১৭) মহল্লা কাজিপাড়া, (এখানে এখনো কয়েক ঘর কাজি বাস করেন), (১৮) মহল্লা ছোটঘর। এই নগরে অনেক পটুয়া (ইহারা ডাগা, খালর প্রভৃতি প্রস্তুত করে), অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী কামার, বাজী প্রস্তুতকারী হাউইকর, দরজি (ইহাদের তিন ঘর এখনো আছে) এবং স্বর্ণকার বাস করিত। বোকারনগরের দরজিরা এখনো এই প্রদেশে তাহাদের নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত।

পরগণা ময়মনসিংহের বর্ত্তমান জমিদারগণের জমিদারীর স্থাপনকর্ত্তা রাজসাহী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ জেলায় আসিয়া প্রথমে বোকারনগরে বাস স্থাপন করেন। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার সময়ে বোকারনগরে এ প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তার রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, এই বোকারনগরের দুর্গ ব্রহ্মপুত্রের তীরে সংস্থাপিত ছিল; তখন তা হলে ব্রহ্মপুত্রনদী এই স্থান ঘেষিয়া বহিত। সে কালের নিদর্শন স্বরূপ এখনো এখানে একটি জীর্ণ মস্‌জিদ আছে। উহার ছাদের কেন্দ্রে একটি বড় গুম্বুজ, এবং চারিকোণে চারিটি ষট্‌পার্শ্ববিশিষ্ট স্তম্ভ। এই মসজিদের অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। ইহার প্রাচীর সকল ভেদ করিয়া অনেক ছোট ও বড় বটের গাছ জন্মিয়া ইহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে নানাবিধ কারুকার্য্যের চিহ্ন এখনো লক্ষিত হয়। সম্মুখের দেয়ালে নানাবর্ণের কাচ বসান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বারের উপর ফারসী ও আরবী ভাষায় এক খানি লিপি খোদিত আছে। উহার এই কথাগুলি এখনো পড়িতে পারা যায়—"লাইলাহিলাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা ... ... আবু বোকার ... সাজাহানের রাজত্বকালে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদের নিকটে একটি দীঘি ছিল। এখন উহা ভরিয়া গিয়াছে। নিকটেই একটি দরগা আছে। প্রবাদ এই যে, এখানে নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামক একজন পীর বাস করিতেন ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এই দরগা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে এক মাস কাল ব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। এই মেলার সময়ে দরগাতে প্রতিদিন ২০।২৫ টাকার সিন্নি দেওয়া হয়। দরগাতে যে কাহার সমাধি তাহা কেহই নিশ্চিত বলিতে পারে না। এই স্থানে একটি ইটের পুলের ভগ্নাবশেষ এখনো আছে। লোকে বলে সন্ন্যাসীরা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোকার নগরে এখনো কয়েক জন সন্ন্যাসী থাকেন।

প্রবাদ এই যে, সম্রাট আকবরের সময়ে খাজে ওসমান খাঁ নামক উহার একজন উজীর নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী ১২৮ জন অনুচর সহিত এই স্থানে

আইসেন। তিনি এই স্থান বোকাকোচ, নামক পার্ব্বত্য সর্দারের পালনাধিকারে দেখিতে পান। ওসমান খাঁর সৈন্যসামন্ত দেখিয়া বোকা পলায়ন করে। স্থানটি তিনি অধিকার করিয়া লন। বোকার নাম অনুসারেই স্থানের নাম বোকারনগর হয়, এবং ওসমানের অনুচরগণ এখানে বসতি স্থাপন করে। ওসমান খাঁ এখানে অল্পকাল থাকেন, পরে দিল্লিতে চলিয়া যান। তাঁহার স্থানে সুকীল খাঁ নামক একব্যক্তি তহশীলদার হইয়া বোকারনগরে আইসেন। এই সুকীল খাঁই পূর্ব্ব বর্ণিত মসজিদ ও দীঘি করেন। তাঁহার নাম অনুসারে দীঘির নাম হয় "সুকীল খাঁর তলব।"

(৬)

চারিপাড়ায় রাজবাটি।

ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বভাগে হাজরাদি পরগণায় চারিপাড়া গ্রাম। ইহা রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী ছিল। ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে এই কিংবদন্তি আছে যে, বিজয়রাম দাসলস্কর নামক একব্যক্তি রাঢ় দেশ হইতে চারি পাড়ায় আগমন করেন। নবরঙ্গ নামক তাঁহার পুত্র অল্পকাল মধ্যে মহা সমৃদ্ধ ও বলশালী হইয়া এইখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন; চারিপাড়া রাজধানী হয়। অন্য এক বিবরণ এই যে, নবরঙ্গ রাঢ় দেশের এক রাজা ছিলেন; সেখানে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে ও সপরিবারে ময়মনসিংহে আসিয়া চারিপাড়ায় রাজ্য স্থাপন করেন। কতগুলি প্রমাণ প্রয়োগে ইহা একরূপ নিরূপিত হইয়াছে যে, নবরঙ্গ রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সময়ে জীবিত ছিলেন।

এই পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সরকার বাজুহাপ্রাপ্ত ইসফ খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ প্রবল ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইঁহার শত্রুতা আরম্ভ হয়। কথিত আছে যে, এই বিবাদে নবরঙ্গ সপরিবারে নিহত হন। রাজার একটি স্ত্রী কোনরূপে শত্রু শিবির হইতে পলায়ন করেন। তিনি সে সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে; ইহার দ্বারা বংশ রক্ষা হয়। এই বংশের শেষপুরুষ বাবু গিরিশচন্দ্র রায় সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার পৌত্রপুত্র এখন নাবালক। চারিপাড়ার রাজধানী অতি সমৃদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়; উহা ২।৩ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। উহা একটি দীঘির পশ্চিম তীরে সংস্থাপিত ছিল। নিকটে বনাবৃত একটি উচ্চভূমি আছে; অনুমিত হয় যে, এই খানে দুর্গ ছিল। রাজা নবরঙ্গ রায়ের চার ভুঁঞা বা সেনাপতি তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চারিজনের সংস্রবে স্থানের নাম চারিপাড়া হয়।

নবরঙ্গ অনেকগুলি দীর্ঘিকা খনন করান; তার মধ্যে তিনটিই খুব বড়। উহাদের নাম ও পরিমাণ নীচে দেওয়া গেল—

(১) কাটার দীঘি ... বর্গ পরিমাণ, ৩৫ বিঘা,
(২) নয়া দীঘি ... বর্গ পরিমাণ, ২৩ বিঘা,
(৩) সংসার দীঘি ... বর্গ পরিমাণ, ১৮ বিঘা।

রাজা নবরঙ্গ রায়ের জামাতা সংসার রায়ের নাম অনুসারে শেষোক্ত দীঘির নাম হয়।

চারি পাড়ার রাজ বাটির ½ মাইল উত্তরে গোপীনাথ জির মন্দির। এই বিগ্রহকে ভোগবেতালের গোপীনাথ বলিত। যে সরোবরের তীরে রাজবাটি এবং যে পুষ্করিণীর তীরে মন্দির একটি খাল দ্বারা এই দুইটি সংযুক্ত ছিল। রাজা নবরঙ্গ সরোবরের ঘাটে নৌকায় উঠিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে গোপীনাথজীর মন্দিরের সোপানে নামিতেন।

(৭)

মদন পুরের সমাধি।

নেত্রকোনা হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে মদনপুর গ্রাম, ইহা খুব জনাকীর্ণ। এই গ্রামে শা সুলতান রুমির

প্রসিদ্ধ সমাধি। ইঁহাকে রুমি বলা হয়, কেন না জনশ্রুতি এই যে ইনি রুম বা কনষ্টান্টিনোপল হইতে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় মুসলমানেরা এই সমাধির অত্যন্ত সম্মান করে। ইহার রক্ষার জন্য ইহার চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া একটি ইটের দেয়াল আছে। সপ্তাহে দুই দিন মুসলমান যাত্রীরা এখানে সিন্নি দিতে আসে। যাত্রীগণ নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া প্রতি পদক্ষেপে সেলাম করিতে করিতে সমাধির দ্বারে উপস্থিত হয়; পরে সিন্নি দিয়া আবার সেলাম করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হয়। সমাধির রক্ষকগণ যাত্রীদিগের দানে বৎসরে ৪৫ হাজার টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

প্রবাদ এই যে, মদন কোচ নামক স্থানীয় এক শাসনকর্ত্তার নামানুসারে এই গ্রামের নাম মদনপুর হয়। এই সময়ে এ প্রদেশ কোচ রাজ কামতাপুরের (কোচবিহারের) অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে যে, শা সুলতান রুমি কেবলমাত্র ৩৯ জন অনুচর লইয়া মদনপুর আক্রমণ করেন। মদন কোচ যুদ্ধ না করিয়াই পলায়নপর হন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে নিজের ধন সম্পত্তি একখানি নৌকায় তুলিয়া ঐ নৌকা মদনসাগর নামক দীঘিতে ডুবাইয়া রাখিয়া যান। ঐ দীঘি এখনো আছে। প্রায় একশত বৎসর হইল ইসাক ফকীর নামক একব্যক্তি ঐ গুপ্তধন পাইবার আশায় ঐ দীঘির জল সেচিয়া ফেলাইয়াছিল। সে কিছু পাইয়াছে কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সমাধির দ্বারের উপরে আরবি অক্ষরে খোদিত আছে—

"১০ই রবিয়ল আউল, ৪৪৫ হিজরি।"

এই তারিখে রুমি না কি পরলোক গমন করেন। ইঁহার কোন কোন অনুচরের বংশধরগণ এখনো এখানে আছে। ইহাদিগকে "খাদিমী ফকীর" বলে। ইহারা কিছু নিষ্কর জমি ভোগ করে।

(৮)

ভোগ বেতালের গোপীনাথের মন্দির।

ভোগ বেতাল গ্রাম কাতিয়াদি পুলিশ ষ্টেশনের সন্নিহিত। প্রধান মন্দিরটি বলরামের। ইহার শীর্ষ ভাগে ৩টি খিলান ও ৩টি চূড়া। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ৩টি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ, একটি ভোগঘর, দ্বিতীয়টিতে রাস এবং তৃতীয়টিতে ঝুলন যাত্রা হয়। মন্দিরের পশ্চিমে আর একটি দ্বিতল গৃহ; সে গৃহে বৈশাখের অক্ষয়া তৃতীয়ার দিনে চন্দন যাত্রা উৎসব হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি দ্বিতল গৃহ ইহার নাম "পঞ্চরত্ন দ্বিতল"। দ্বারের উপরে এই কথা খোদিত আছে— "সচীরাম সাহা, সাগরদি, ১১৯৭ সন।" হয়তো এই ব্যক্তি এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দক্ষিণে আরো একখানি গৃহ আছে; উহাতে উৎসব কালে দুধ জাল দেওয়া হয়। এই সকল ব্যতীত যাত্রিগণের জন্য একখানি পাকা বড় ঘর আছে। ইহার সম্মুখে একটি মাঠ। উহাতে দোলমঞ্চ; এইখানে দোলোৎসব হয়। মঞ্চের গায়ে এই কথা গুলি খোদিত আছে— "বলরাম গোপীনাথ ঠাকুরের পাদপদ্মে উৎসৃষ্ট। কাতিয়াদি নিবাসী শ্রীজগন্নাথ পোদ্দার, ১২৩৪ সন। রথযাত্রার দিনে ঠাকুরকে রথে তুলিয়া এইস্থান হইতে আছমতিয়া নামক গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়; আবার রীতি অনুসারে ৯ দিন পরে ফেরৎ আনা হয়। আছমতিয়া পর্য্যন্ত রাস্তা ৫০ ফুট প্রশস্ত এবং ½ মাইল লম্বা। গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মূর্ত্তিই প্রধান। ইহাদের উভয়ের মাথায় সোনার মুকুট আছে। শ্রীকৃষ্ণ-মুকুটের চূড়াও সোনার। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি রূপার; মাথায় সোনার মুকুট ও গায়ে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার। আজ চারশত বৎসর হইল এই গোপীনাথের মন্দির বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরের দেবোত্তর বাৎসরিক আয় এখন এক হাজার টাকা। রথ যাত্রার দিনে এখানে মেলা হয়; তখন ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলা ও

ময়মনসিংহের নানা স্থান হইতে প্রায় ১০ হাজার লোক এখানে সমবেত হইয়া থাকে।

(৮)

হাবাতনগর গ্রামে শ্যামসুন্দরের মন্দির।

হাবাতনগর গ্রাম কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী। কথিত আছে যে, গোঁসাই ব্রজবল্লভ নামক এক চৈতন্যভক্ত ব্যক্তি এই গ্রামে এই মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দির-পার্শ্বে তাঁহার সমাধি আছে। হিন্দুরা এই সমাধির বহু সম্মান করিয়া থাকে। ইহাতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ইহার দ্বারের উপরিভাগে নিম্ন-লিখিত শ্লোক উৎকীর্ণ আছে :—

ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
ঐরাবতগজারূঢ়ো বরাজোনমস্তুতে॥
জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এবচ।
পৌলস্ত্যঃ পুলহাশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রাবারণঃ॥
শকব্দা ১৬৩৫। সন ১১৩৮। ২ চৈত্র।

শ্যামসুন্দরের মস্তকে সোনার মুকুট ও গাত্রে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার। ঝুলনের সময়ে এখানে বড় মেলা হয়। শ্যামসুন্দরের দেবোত্তর সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ৬ হাজার টাকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ও সমসাময়িক সেরপুর।

(২)

যে কোনও একজনকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার বংশ, সমাজ, পিতা, মাতা, পরিবারবর্গ ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় করিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহার জীবনের কোন্ কোন্ অংশ ও ক্রিয়ার সঙ্গে, তাহার জীবনের নিত্য-সহচর দেশ কাল সমাজ, তাহার জীবনের ভাব ও ধারণার ধারা প্রবর্ত্তক পরিবারবর্গ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণ সকলের নিদানভূত—পরন্ত জীবন-দাতা জনকজননীর প্রভাব, কতটুকু কি ভাবে সংক্রমিত হইয়া আসিয়া তাহার বর্ত্তমান জীবনে অন্যান্য পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সহযোগে ক্রম বিকাশ লাভ করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে আমরা যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়-গুলির প্রতি উদাসীন থাকি তবে এই ক্রমবিকাশের স্তরটীকে যথা যথ ভাবে ধরিয়া লইতে পারি না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একটী সামান্য মানুষের মধ্যেও তাহার বংশ, সমাজ, দেশ, কাল ও পারিবারিক প্রভাব, লক্ষ্য করিয়া থাকেন, পিতা মাতার শুক্র-শোণিত-সম্ভূত সন্তানে তাঁহাদের একখানি সজীব আলেখ্যই থাকিয়া যায়। অবস্থার বৈলক্ষণ্যে অনেক স্থলে তাহা স্পষ্টতঃ লক্ষিত না হইলেও অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু এড়াইতে পারে না। আমরা মহাপুরুষ দিগের জীবন চরিত পাঠ করিয়া বিস্মিত হই। তাঁহাদিগের অলৌকিক প্রতিভা, অসামান্য গুণ-গৌরব, অসাধারণ মনস্বিতা ও উদারতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকি, ভাবি, একটী জীবনে অত সামান্য কালের মধ্যে মানুষ কি করিয়া এত উন্নতি করে? কি করিয়া এরূপ উদারতা, মহত্ব, ত্যাগশীলতা, ও মহানুভাবতার অধিকারী হইয়া জগতের শিক্ষাগুরু পদ অলঙ্কৃত করে? কিন্তু যদি আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই মানুষ যে কোনও প্রকার উন্নতি করুক না কেন, তাহার সমুদায় উন্নতির বীজ, সমুদায় গুণ-গরি-মার উপাদান, সমুদায় সৎক্রিয়ার প্রেরণী শক্তি, সে কেবলই নিজে উপার্জ্জন করিয়া লয় নাই, স্থূল ভাবেই হউক আর সূক্ষ্মভাবেই হউক্ সে তাঁহার বংশ, সমাজ, পরিবারবর্গ, মাতা পিতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে

উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। বংশ, সমাজ ও মাতাপিতা প্রভৃতির পুরুষপরম্পরাগত দোষগুণ অথবা স্বোপার্জ্জিত দোষগুণের স্থূল বা সূক্ষ্মধারা তাহার জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সে জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক, তাহাদের নিকট ঋণী, তাহাদেরই মূলধন ব্যবসায় বুদ্ধির-সহযোগে আজ অতটুকু বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এবং তাহারই আয় হইতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য কিছু কিছু বিতরণ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক জনকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বিশেষতঃ যাঁহাকে বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত আগ্রহ, যাঁহাকে বুঝিতে পারিলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, যাঁহাকে বুঝা আমাদের একান্ত আবশ্যক এবং না বুঝিলে নিজে-দেরই যথেষ্ট ক্ষতি এবং অপরাধের সম্ভাবনা, সেই মহা-পুরুষ,—যিনি আমাদের জন্য তাঁহার চিরজীবনের শ্রম-লব্ধ বিদ্যামার্জ্জিত অনন্ত জ্ঞানরত্ন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাবিনয়-ভূষিত আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, —যাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষেই হিন্দুগণের আদর্শ ও অনুকরণীয়, এবং যিনি সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত নীরব ধ্যানে দেশ ও সমাজ মাতৃকার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী ক্রিয়ার সহিত মুখ্য ও গৌণভাবে দেশের সর্ব্ব সাধারণের যোগ গ্রন্থি রহিয়াছে, সেই মহাত্মা দেবকল্প-তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত লোকের জীবন চিত্রের বিশ্লেষণ করিতে হইলে কেবল তাঁহাকে লইয়া আলোচনা করি-লেই চলিবে না, তাঁহার মাতা, পিতা, বংশ, সমাজ, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদিগকে একটু পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। মহাপুরুষদিগের জীবনীর সংকলন কেবল সৎসাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। ইঁহাদের জীবনী আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ, বিশ্ব মানব-সাহিত্যের অপরিহার্য্য পরিচ্ছেদ।

কাজেই আমরা আজ যাঁহাকে বুঝিতে চাহিতেছি, তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতেই চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহা-শয়ের এবং তাৎকালিক সেরপুর সমাজের অতি সামান্য দুই চারিটী চিত্র প্রদর্শিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের বংশধর শাণ্ডিল্যগোত্র রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের পিতা পৈতৃক বাসস্থান (ময়মনসিংহ) মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী মানকোন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেরপুর নগরে অতি সামান্য ভাবেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিল, সেইটী একমাত্র পুত্র রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় পিতৃ-বিয়োগে সাংসারিক হইয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অনন্যসেই মনোযোগ ও অধ্যবসায়-বলে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার জন্য বিষয় সম্পত্তি বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই, এমন কি তাঁহাকে বিবাহ পর্য্যন্তও করাইয়া যাইতে পারেন নাই। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অতুল প্রতিভা-বলে স্থানীয় জমিদারবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি একান্ত সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে তাঁহাদেরই যত্নে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন, তাঁহা-দেরই বিদ্যানুরাগে চিরজীবন চতুষ্পাঠী রক্ষা করিতে সমর্থ হন, এবং তাঁহাদেরই বদান্যতা গুণে বাড়ী-ঘর বিত্ত-বিভব সমস্ত সংস্থাপন করিয়া যান।

ময়মনসিংহ সেরপুর অতিপ্রাচীনকালের উন্নত জনপদ। এইস্থানে বহু জমিদার, তালুকদার, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জমি-দারগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে বিদ্যানুরাগী, সৎক্রিয়ান্বিত, দাতা ও পণ্ডিত-প্রতিপালক। তাঁহারাই উক্ত জেলায় অতি প্রাচীন জমিদার, ইঁহাদের দেবত্র, ব্রহ্মত্র ও পত্তনী দেওয়া তালুক অপরিসংখ্য; প্রত্যেক গৃহে দেবতা ও

অতিথি-পূজা, প্রত্যেক গৃহে বিদ্বান্ ও কলাবিদ্‌গণের নৈমিত্তিক সম্মিলন, প্রত্যেক গৃহে সদাচার ও ধর্ম্মপ্রাণতা এবং প্রত্যেক গৃহেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অবৈর সংস্থিতি তৎকালে সেরপুরকে অতিবড় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়া ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যেও কতিপয় মেধাবী ও মনস্বী, সেরপুরের মুখ উজ্জ্বল করিতে ছিলেন। সেই সময়েই পণ্ডিত রাধাকান্তের অভ্যুদয়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দরিদ্রতার মধ্যেই নিজের সম্মানের আসনটী অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। দরিদ্র যুবক, সহসা দূর হইতে আসিয়া স্থানীয় প্রশংসিত পণ্ডিতগণের প্রতিভা একটু ম্লান করিয়া দিতেছেন দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্যও না কি কোন কোনও মহাত্মা (?) চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু তৎকালে আড়াই আনির বড় হিস্যার জমিদার স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী মহোদয়ের জন্য তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই মহাত্মা বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম্, এ, মহোদয়ের পিতামহ। ইঁহারা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে পণ্ডিত-প্রতিপালক। শ্রীযুক্ত গোপাল দাস বাবুর পিতা সংস্কৃতানুরাগী স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার চৌধুরী মহোদয়ও তর্কালঙ্কার মহাশয়কে চিরকাল সাহায্য করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সময়ে সেরপুরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-গণের সমাদর ছিল। তাঁহাদের গুণগ্রামের যথার্থ বিচার হইত, এবং গুণানুসারে পণ্ডিতগণ পুরস্কৃতও হইতেন। একথা বলিলে বোধ হয় মিথ্যা বলা হইবে না যে, তাদৃশ গুণগ্রাহী ভূম্যধিকারিগণের সাহায্যে নিশ্চিন্তচিত্তে পণ্ডিতগণ যেরূপ শাস্ত্রানুশীলনের সুযোগ পাইতেন এবং যেরূপ আত্মমুখী দৃষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হইতেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের সেরূপ অবস্থা নহে। এবং সেই জন্যই মনে হয় বিগত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং তাঁহাদের জীবনের ধারা স্বতন্ত্র ও স্পৃহনীয়। যাহা বলিতে ছিলাম, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপক্ষের চেষ্টায় অনেক সময়ে নিজের প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ করিতে পারিতেন না, কিন্তু স্বয়ং বিদ্বান্ নবকুমার চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়া দিতেন, এবং সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন।

ইতিমধ্যে সেরপুর নগরে পাবনার কাওয়া খোলা নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় নিমাই শিরোমণি মহাশয় আহূত হন, এবং দিগ্‌বিজয়ী শিরোমণি মহাশয়ের আগমনে সেরপুর আনন্দমুখর হইয়া উঠে। সভায় বিচার হইবে, শাস্ত্র সমালোচনা হইবে, এইজন্য পণ্ডিত-সমাজ অতিমাত্র ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের একান্ত আগ্রহ ও অভিলাষ যে, এই সুযোগে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিয়া লইবেন। ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত একটী ব্যবস্থা লইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মত-দ্বৈধ উপস্থিত হয়। অনুপনীত ব্রাহ্মণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে গায়ত্রী পাঠ করিতে পারে কি না এই নিয়া মত-দ্বৈধ হয়। পণ্ডিত-কেশরী শিরোমণি মহাশয়কে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিপক্ষের সহিত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিচারে প্রবৃত্ত হন। অনেকক্ষণ বিচার হইয়াছিল। সভাগৃহ ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ দর্শক মণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, স্থানীয় জমিদারগণ সাগ্রহচিত্তে বিচার-ফল দর্শনের জন্য এক দিকে বসিয়াছেন। নেতা নবকুমার চৌধুরী মহাশয় আজ সন্দিগ্ধ চিত্ত, কিছু উন্মনস্ক। তিনি সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। আজ এই মহতী সভায় তাঁহার শ্রদ্ধার দেবতাটী কি ভাবে সাধারণের নিকট গৃহীত হইবেন, কিরূপ সম্মানে সম্মানিত হইবেন অথবা ঘোর অপমানই বা লাভ করিয়া চিরকালের জন্য

তাঁহার মুখ মলিন ও ধারণা ভ্রান্ত করিয়া তুলেন এসকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় একান্ত আচ্ছন্ন। বহুক্ষণ বিচারের পর সভাপতি বা মধ্যস্থ শিরোমণি মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জয় ঘোষণা করিলেন।

তিনি মুক্তকণ্ঠে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। সভার সকল শ্রেণীর শ্রোতা পরম আনন্দিত হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সকলের সমস্বরে ধন্যবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন. তিনি আজ কৃতকৃত্য, তাঁহার জীবনের একটী প্রধান চাপ আজ নামিয়া গেল. তাঁহার প্রতিভা-সমুজ্জল চক্ষু আনন্দ-বাষ্পে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভগবানের পদে লুটাইয়া পড়িলেন। আর যে মহাত্মা এই দরিদ্র, বিদেশাগত ব্রাহ্মণ যুবকটীকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, যাঁহাকে তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং অধিক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া গৌরব বোধ করেন, আজ তাঁহার সেই শ্রদ্ধার দেবতাটী সভামধ্যে এতাদৃশ সম্মান ও পূজা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দ ও শ্রদ্ধায় একেবারে অভিভূত হইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে জল, হৃদয়ে আনন্দ ও শ্রদ্ধার তীব্র উচ্ছ্বাস, দেহে সাত্বিক ভাবের পূর্ণ পরিস্ফূর্ত্তি। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে সাদরে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, ইতিমধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

এই দিন হইতে নবকুমার চৌধুরী মহাশয় আরও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন তিনি কি রত্ন পাইয়াছেন। এবার সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় চৌধুরী মহাশয়কে জানাইলেন তিনি আর এদেশে বাস করিতে চাহেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অকারণ-শত্রুতাকারী অভিমানী পণ্ডিতগণ বিশেষ ভাবে অপদস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের স্থান মর্য্যাদা ও পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রায় চূর্ণ হইয়াছে, এখন আর এখানে থাকিয়া বিবাদ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি ৺ কাশীধাম যাইবেন প্রস্তাব করিলেন।

বলা বাহুল্য চৌধুরী মহাশয় এপ্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে বিশেষভাবে নিজস্ব করিয়া লইবার জন্য এবং সংসারের বন্ধনটী আরও সুদৃঢ় করিয়া দিবার জন্য সেরপুর বাগরাখমা গ্রামে (সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের) বাসের উপযোগী বাড়ী ঘর প্রস্তুত করাইয়া দেন, এবং বহুতর জমাজমি প্রদান করেন। বাড়ীর সম্মুখে একটী বড় রকম পুকুর কাটাইয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতি মধ্যেই কালীগানিগ্রামে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে বিবাহ করাইলেন। ইঁহারই গর্ভে ভারতের উজ্জল রত্ন চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় সুশীলা পত্নী ব্রহ্মময়ী-দেবীর সংসার-নৈপুণ্যে বিশেষ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রচর্চ্চা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নবকুমার চৌধুরী মহাশয় নয় আনির বাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গৃহেই একটী চতুষ্পাঠী করিয়া দেন। চৌধুরী মহাশয় ধানের বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করিয়া দিয়াছেন। এই বার দুই হিস্যা মিলিত হইয়া চতুষ্পাঠীর মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দশটী টাকা মাসিক বৃত্তি করিয়া দিলেন, এবং সমগ্র সেরপুরে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে গীতাবৃত্তি সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া এইবার দূরদেশের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়নের জন্য আসিতে লাগিলেন। তিনি ছাত্র নিয়াই সর্ব্বদা থাকিতেন। জমিদারগণ তাঁহাকে একান্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাহায্য করিতেন সত্য কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য করিয়া তাঁহাদের মোসাহেবী করিতেন না। তিনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন কিন্তু স্তুতিপাঠক ছিলেন না। তিনি বড়লোক দিগের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হন নাই। আত্মসম্মানবোধটী তাঁহার বড়ই প্রবল ছিল। তিনি সকলের পক্ষেই "অধৃষ্য শাধিগম্য" ছিলেন। দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া ছাত্র পড়াইতেন, এবং নিজের ভক্তি বিশ্বাস অনুসারে দেবতার্চ্চন ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন।

এইবার জলকষ্ট উপস্থিত হইল, চৌধুরী মহাশয় প্রতিশ্রুতি পালনের বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন এবং দুই চারি কথা বেশ শুনাইয়া দিলেন। অবিলম্বে চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় পদ্মমৈত্র মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং পুকুরের স্থান দেখিবার জন্য আসিলেন। স্থান নির্ব্বাচিত হইল, পুকুর কাটানও আরম্ভ হইয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পুকুর কাটা শেষ হইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় এক দিন বিকালবেলা পুকুর দেখিবার জন্য আসিলেন এবং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে মৃদু হাস্যে বলিলেন "সিদ্ধান্ত-বাগীশ, আর কি অভিলাষ? এইবার আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কেমন?" সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আপনাদের অনুগ্রহে আমার সমস্তই হইয়াছে—আমি একান্ত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত।"

চৌধুরী মহাশয় আবার বলিলেন. "তবু কিছু চাই কি না?" এইবার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই, আপনি যদি নিতান্তই আমার আকাঙ্ক্ষা জানিতে চাহেন, তবে আমি অবশ্যই বলিতে বাধ্য। আমার একান্ত অভিলাষ যে, এই সম্মুখের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পুকুরটী উৎসর্গ করি।" চৌধুরী মহাশয় উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, "সিদ্ধান্ত-বাগীশ, আমি যোগবলে আপনার সকল আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারি, তাই আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করিলাম, আচ্ছা, এই সংক্রান্তিতে পুকুর উৎসর্গ করিবেন।" চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন, যথা সময়ে তাঁহার প্রেরিত সমস্ত আয়োজনে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যতটুকু অনুষ্ঠান করিবেন ভাবিয়াছিলেন কার্য্যতঃ তাহার অধিক বেশী হইয়া গেল। এই কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার নবকুমার চৌধুরী মহাশয় বহন করিলেন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখনও বহুলোকে সেই ব্রাহ্মণের গৃহ পরিপূর্ণ। অপরাহ্নকালে চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সানন্দহৃদয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবারও মৃদু হাস্যে চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিদ্ধান্তবাগীশ, আর কি চাই? কিছু অভিলাষ হইতেছে কি?" সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটু বিষণ্ণমুখে বলিলেন. "হাঁ হইতেছে বটে, কিন্তু অসময়ে। পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।" "তবু শুনিতে বাধা কি?" "বাধা নাই আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে আজ রাত্রেই এই পুকুরের জল দিয়া একটী কালীপূজা করি।"

এই কথা বলিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রকৃতই এক জন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, ধর্ম্মে অচলা মতি ছিল। অকৃত্রিম বন্ধু নবকুমার চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটী পূর্ণ করিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত তৎক্ষণাৎ কালীপূজার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। 'কুমার' আনাইয়া প্রতিমা গড়া-ইতে আদেশ করিলেন, চারিদিকে 'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এ যাবৎ সস্ত্রীক জলগ্রহণও করেন নাই. দেখিতে দেখিতে পূজার আয়োজন হইয়া গেল, প্রতিমাও প্রস্তুত হইল। রাত্রিতে যথাকালে সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় স্বয়ং পূজার আসনে বসিলেন। পতি-প্রাণা ভার্য্যা ব্রহ্মময়ী দেবী নিজহস্তে সমস্ত সাজাইয়া দিলেন। এবং দেবীর ভোগ রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা হইয়া গেলে সদলবলে সকলের সহিত প্রসাদ পাইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কৃতার্থ হইলেন। ততোঽধিক কৃতার্থ হইলেন ভক্তের সর্ব্বকার্য্যে পরম-সহায় চৌধুরী মহাশয়। এরূপ শত শত দৃষ্টান্তে সের-পুরের ভূম্যধিকারিগণের সহৃদয়তা গুণগ্রাহিতা ও দানশীলতার সমর্থন করা যাইতে পারে। তখনকার সেরপুরের অবস্থা আমরা যে রূপ শুনিতে পাই তাহা বাস্তবিকই আজকালকার দিনে দুর্লভ।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে জমিদারগণ মন্ত্রণাকার্য্যেও প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সেই নির্ভীক্, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ যুবকের কথা অনেক সময় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। শুনা যায় নবকুমার চৌধুরী মহাশয় একবার না কি সেরপুরের সমস্ত ব্রহ্মত্রা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কি কারণে জানি তিনি তথাবিধ বিত্ত-ভোগীদিগের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, এ সকল ব্রহ্মত্রা পারিতোষিক। ব্রহ্মণগণ এখানে বাস করিতেন, অন্ন-বস্ত্রের অভাব নিবৃত্তির জন্য জমিদারগণ সাময়িক সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু চিরকালই তাঁহারা উহা যথেচ্ছ উপভোগ করিবেন বা দান বিক্রয় করিবেন এরূপ হইতে পারে না, পরন্তু যাঁহারা এখানে থাকিয়া উপভোগ করিতেছেন না তাঁহারা মোটেই উহা পাইতে পারেন না।" এ সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রতাপের প্রাবল্যে ব্রহ্মত্রা-বিত্তভোগী অনেকেই বিত্তচ্যুত হইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ব্রহ্মত্রা বাজেয়াপ্ত হইয়া গৃহদেবতার সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হয়, তখনও আত্মভোগের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না। বহুলোকে বহুপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়াও নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যে বাধা দিতে পারেন নাই। অনেকে ভয়েই সম্মুখীন হইয়া কোনও কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নির্ভীকচিত্তে চৌধুরী মহাশয়কে যথেষ্ট স্পষ্ট কথা শুনাইলেন, এবং জেদ করিয়া বহু সম্পত্তি ছাড়াইয়া লইলেন। জনশ্রুতি এইরূপ অর্দ্ধাংশের ও বেশী সম্পত্তি আবার সেই সকল ব্রাহ্মণকেই তিনি দেওয়াইয়াছিলেন।

এরূপ পণ্ডিত এবং এরূপ জমিদার হয় কি? আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কথাই বেশীর ভাগে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু সেরপুরের সকল জমিদারই অল্প বিস্তর রকমে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সেরপুরের জমিদার মণ্ডলীর একটী অসাধারণ গুণ ও মহত্ত্ব, তাঁহারা চিরকাল গুণবানের সম্মানকারী ও আশ্রিত-বৎসল। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনেও এ দৃষ্টান্তের অভাব দেখিতে পাই নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রথম পুত্র। তিনি ছোট কাল হইতেই পিতামাতার বিশেষ আদরের ছিলেন। নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহাকে একান্ত ভাল বাসিতেন ও "চূড়ামণি" বলিয়া ডাকিতেন। জানি না কোন্ সর্ব্বশক্তিশালিনী ঐশী শক্তির প্রেরণায় শিশু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভামণ্ডিত মুখখানি দেখিয়াই চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষের ভাবি চূড়ামণিত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, শিশুকালে তাঁহার একবার খুব জ্বর হয় এবং প্লীহা হয়, তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। বাঁচিবার ভরসা ছিল না। চৌধুরী মহাশয় নিজের গৃহচিকিৎসক নিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় ভাল করিয়া দেখিলেন। চৌধুরী মহাশয় সাশ্রুনেত্রে গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন "চূড়ামণি" ভাল হইবে ত?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "হাঁ, ভাল হইবে।" এইবার চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শিক্ষা মত বলিলেন, "চূড়ামণি, তুমি বল রোজ একবারের বেশী আহার করিবে না।" কবিরাজ মহাশয়ও তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। প্লীহা হইলে সাধারণতঃ ভোজন-স্পৃহা না কি বেশি হইয়া থাকে, তর্কালঙ্কার মহাশয় বেশী মাত্রা আহার করিতেন এবং পাঁচ সাত বার খাইতে বসিতেন। চৌধুরী মহাশয় আবার বলিলেন, "চূড়ামণি, কবিরাজ যতদিন পর্য্যন্ত দুবার পাতে বসিতে না বলিবেন ততদিন এক বার পাতে বসিতে হইবে, তুমি স্বীকার কর।"

প্রতিভাশালী তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। রোগের প্রভাবে তীব্র বুভুক্ষার জ্বালা কি প্রকারে জুড়াইবেন? ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন

"অবশ্য একবারই পাতে বসিব, কিন্তু বসিব বাবার সঙ্গে, উঠিব মা'র সঙ্গে।"

উপস্থিত সকলে বুঝিলেন বালকটী সহজ নহে। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তর্কালঙ্কার মহাশয় রক্ষা পাইলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একান্ত ধর্ম্মভীরু, শাস্ত্রবিশ্বাসী এবং পবিত্রস্বভাব ছিলেন। ভগবানের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, প্রাণে আনন্দের উৎস ছুটিত, তর্কালঙ্কার মহাশয় এ সকল পিতৃ-গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গল্প করিয়াছেন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এক বার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ৺ জগন্নাথ দর্শন করিতে যান। এক দিন সহরে একটী ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে সহসা এক জন ময়লাবাহী মেথর তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহারই দিকে সেই ময়লাবাহী মেথর ধীরে ধীরে আসিতেছে, তাহার মাথায় ময়লার হাঁড়ি, শরীরের কোনও কোনও স্থানে ময়লার অংশ লাগিয়া রহিয়াছে, মাথার উপর মাছি 'ভন্ ভন্' করিতেছে। সে হৃষ্টমনে জগন্নাথের প্রসাদী পিষ্টক খাইতে খাইতে তাঁহার কেবল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি মুহূর্ত্তে দেখিলেন সেই মেথর ভুক্তাবশিষ্ট পিষ্টকখানা তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছে, মুহূর্ত্তে তাঁহার আপাদমস্তক বিদ্যুৎ সাড়া দিয়া গেল, এবং ভক্তপ্রধান সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় জাতিধর্ম্ম, সমাজ, আজীবনের সংস্কার, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর ঘৃণা ও তিতিক্ষার কথা বিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা গ্রহণ করিলেন,—এ হেন প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন বলিয়া জগন্নাথের চরণে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় বাহী প্রেমাশ্রু-ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিলেন। এই গল্পটী বলিবার সময় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রোমাঞ্চ হইত। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিত, এহেন ধর্ম্মপ্রাণ প্রতিভাশালী মহাত্মার পুত্র তর্কালঙ্কার মহাশয় এত বড় হইবেন না ত কে হইবে? শুনিয়াছি তাঁহার জননী ব্রহ্মময়ী দেবীও অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন, অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সর্ব্ববিধ উন্নতিকামী নবকুমার চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে বহু জমি ব্রহ্মাত্র এবং "চাপির ভিটা" প্রভৃতি তালুক প্রদান করিলেন। এখন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, বহুতর ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেশের মধ্যে বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ৺কালীমোহন তর্কভূষণ, ৺ গোলোক চন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার, ৺ ভোলানাথ তর্কবাগীশ ও ৺ রাম মোহন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় পিতৃদেবকে একান্ত ভয় করিতেন, সেই জন্যই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিজের ছাত্র বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ও ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে পুত্রের পাঠ শিখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র দুই কন্যা। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তর্কালঙ্কার মহাশয়,আর তিন ভাই রামচন্দ্র,শিবচন্দ্র ও রঘুনাথ,ও বামাসুন্দরী ও বরদা সুন্দরী। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুত্রদিগকে উপযুক্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অল্পবয়সেই মারা যান। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রামচন্দ্রও বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন। তিনি দুইখানি কি এক খানি বাঙ্গলা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গল্প করিয়াছেন উহার কবিপ্রতিভা না কি সবিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। রামচন্দ্র অধ্যাপনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট চাকুরী লইলেন। ময়মনসিংহ সদরে জজের পেশ্কার হইলেন। মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতেন। তখনকার জজ সাহেবগণ রামচন্দ্রকে দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। রামচন্দ্রের অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাঠ সৌকর্য্যের নিমিত্ত প্রায় একশত পঁচিশ খানা সংস্কৃত পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি এসকল পুস্তক অবসর মত

লিখিতেন, তাঁহার হাতের অক্ষর মুক্তার মত ছিল। তিনি বিষয় সম্পত্তিরও অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তীর্থযাত্রা উদ্দেশে সপরিবারে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যান। তখন তাঁহার শেষ বয়স। তিনি মুর্শিদাবাদে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করেন। তিনি বলিতেন, "আমি যেন ছাত্রের হাতে অগ্নি-সৎকার লাভ করি।" তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। তখনও সঙ্গে দুই একটী ছাত্র ছিলেন। তাঁহারাই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া ছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষাটী আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন। দারুণ ব্যাধির যন্ত্রণায় যখন অস্থির হইতেন, ছাত্র আসিয়া একটু বাতাস করিলেই যেন কত আরাম বোধ করিতেন! তাঁহার ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছাত্রগণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। এ বৃত্তিটীও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। এইরূপ বহু গুণ আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যে দেখিতে পাই, যাহা তাঁহার নিতান্তই স্বোপার্জ্জিত নহে। বংশানুরূপ চরিত্র, সমাজ ও দেশ কালের অনুরূপ চিন্তা শক্তি, এবং পিতা মাতার হৃদয়ের বৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি ও প্রতিভা লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত জন্মান্তরের শুভাদৃষ্ট এবং ইহজন্মের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি তাঁহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার পুত্রের জীবনটী নিজের ত্যাগ, মহত্ত্ব, প্রতিভা ও সদাচারের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। আর আজ তাঁহার সেই পুত্রের একটী মাত্র জীবন, পৃথিবীর অনন্ত নরনারীর জীবনধারা গঠনের উপযুক্ত সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এ সামগ্রী-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ যাঁহারা তাঁহাদের নিকট পৃথিবী চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

আয়ুর্ব্বেদে—অস্ত্রচিকিৎসা।

চাঁদসী প্রচলনমতে

ব্রণ বিজ্ঞান

প্রদাহিত স্থানে পুঁজ উৎপন্ন হইয়া কোন গঠনাবলীর মধ্যে জমা হইলে তাহাকে ব্রণ বলে। পুঁজের চারিদিকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির একটী আবরণ এবং তাহার চারিধারে শুধু মাংসাঙ্কুরের প্রাচীর বিদ্যমান থাকে।

ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি কোষ ও মর্ম্ম এই আটস্থানের দোষে এক বা পরস্পরের আশ্রয়ে ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সব স্থানের মধ্যে ত্বক ভেদ করিয়া যে সব ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সুখসাধ্য; অবশিষ্ট স্থানোৎপন্ন ব্রণ, বিশেষতঃ যাহার আকার অস্বাভাবিক অর্থাৎ গোল নহে তাহা কষ্টসাধ্য। ব্রণ দুই প্রকার—সদ্য ও পুরাতন। তন্মধ্যে পুরাতন ব্রণ পুরাতন প্রদাহ স্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

সদ্য ব্রণ—সদ্য ব্রণ ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুক। এর মধ্যে বাতজ ব্রণ বিষমভাবে ও বিলম্বে, পিত্তজ ব্রণ অপেক্ষাকৃত দেরিতে, কফজ ব্রণ সত্বরই পাকিয়া থাকে। সান্নিপাতিক ব্রণ কোথায়ও বিলম্বে কোন স্থানে সত্বর ও আগন্তুক ও রক্তজ ব্রণ পিত্তজ ব্রণ সদৃশ পাকিয়া থাকে।

লক্ষণ—বাতজ ব্রণে নানা প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু কোনটাই বেশী সময় স্থায়ী হয় না। সচরাচর ছেদন, ভেদন, তাড়ন, আকুঞ্চন, শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শ-শক্তির অভাব, এবং ছাই, কপোত, অরুণ বা কৃষ্ণ বর্ণ হয়।

পিত্তজ ব্রণ, নীল, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ, রক্ত,

কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট হয়; বিশেষতঃ ব্রণ পাকিবার সময়, শরীরে অগ্নিনিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, এবং গলিয়া গেলে ক্ষতে ক্ষারদগ্ধবৎ জ্বালাপোড়া বিদ্যমান থাকে।

কফজ ব্রণ—চুলকানিযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শীতল ও স্নিগ্ধ, শ্বেত ও পাণ্ডু বর্ণ, এবং স্তব্ধ ভাব যুক্ত।

সান্নিপাতিক ব্রণে এই তিন প্রকার ব্রণের লক্ষণাবলি মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং বর্ণ ও বেদনাদির হঠাৎ পরিবর্তন হয়, ভয়ানক জ্বালাপোড়া বিদ্যমান থাকে, রোগী অল্পসময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ব্রণ দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

রক্তজন্য ব্রণে পিত্তজ ব্রণের লক্ষণাবলিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্রাব—ব্রণের আশ্রয়স্থানের মধ্যে ত্বকে ব্রণ উৎপন্ন হইলে কাচা মাংসের গন্ধবিশিষ্ট ঈষৎ পীত বর্ণ জলের মতন পঁজ নিঃসৃত হয়। মাংস মধ্যে ব্রণ জন্মিলে ঘৃতের ন্যায় ঘন সাদা পিচ্ছিল পুঁজ নিঃসৃত হয়। শিরাগত ব্রণ হইলে অস্ত্র করা মাত্রই অত্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, অথবা জলনালীর জলনির্গমের মতন লালা বা শ্লেষ্মা সদৃশ পিচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ পুঁজ ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ধারে নির্গত হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে স্নিগ্ধ ঘন রক্ত মিশ্রিত পুঁজ বা নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মার মতন পুঁজ বাহির হয়। অস্থিগত ব্রণ হইলে অস্থি অসার হইয়া পড়ে, এবং ঝিনুক ধোয়া জলের মতন স্নিগ্ধ স্রাব বা রক্ত মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। সন্ধিগত ব্রণ ভাল রকম উত্থিত হয় না, বা টিপিলে তাহা হইতে বিশেষ কোন স্রাব হয় না, কিন্তু গমন, আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোষদেশগত ব্রণ হইলে তাহা হইতে রক্তমূত্র, পুরীষ, পাতলা পুঁজ বা রস নিঃসৃত হয়। মর্ম্মদেশগত ব্রণ হইলে সেই মর্ম্ম যে জাতীয় স্রাবও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ইহাই স্রাবের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বাতাদি দোষের প্রকারভেদে স্রাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

বাতজ ব্রণ হইলে স্রাব কিছু ঠাণ্ডা ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। দধিমণ্ড, ক্ষার, জল বা মাংস ধৌত জলের মত স্রাবের বর্ণ হইবে।

পিত্তজন্য ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং গোমেদ, গোমূত্র, ছাই অথবা সাদা বর্ণ বিশিষ্ট, কষায় বা মধুর রসযুক্ত।

কফজন্য ব্রণ হইলে স্রাব শীতল, এবং নবনীত, মজ্জা, চাউলের গুঁড়া বা বরাহচর্ব্বি সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থলে হিরাকষ বা নারিকেল জল সদৃশ স্রাবও নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রক্তজন্য ব্রণ হইলে পিত্তজ ব্রণবৎ স্রাব হয়, অধিকন্তু আমিষ গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তবে কাঞ্জী, যকৃৎ, মুগের যুষ, কাকুড়ের রস সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাবই সচারাচর হইয়া থাকে।

সাধ্য, অসাধ্য, দোষ-দুষ্য ও স্থানের প্রকারভেদে চিকিৎসাকালে এই সব ব্রণ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য। যথা কালে প্রতিকার না হইলে সুখসাধ্য ব্রণও অসাধ্য হয়, অথবা রীতিমত চিকিৎসা হইলে অসাধ্য ব্রণও অনেক স্থলে আরাম হইয়া থাকে। রোগী যুবা, দৃঢ়-শরীর, ক্লেশসহিষ্ণু ও বলবান হইলে হস্ত, পদ, ললাট, গণ্ড, স্কন্ধ, স্ফিক (পাছা) ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ ও মুখমধ্যে জাত ব্রণ সুখসাধ্য।

রোগী বৃদ্ধ বা কৃশ, ভীরু, অল্পপ্রাণ হইলে, এবং উপস্থ, কর্ণ, কোষ, উদর, সন্ধি, চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, জঠর, সেচনী, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, বগল, স্তন ও অস্থিজাত ব্রণ কষ্টসাধ্য। মধ্যেমুখ ভগন্দর, সেচনীস্থানে, অস্থিগত ব্রণ এবং ব্রণের উপর ব্রণ হইলে ব্রণ কষ্টে আরাম হয়। প্রমেহ, মধুমেহ, শর্করামেহ, কুষ্ঠ, বিষাক্ত রোগীর ব্রণ

কষ্টসাধ্য। ব্রণ বিসর্পিত হইলে বা সফেন পুঁজ-রক্ত বাহির হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য।

বাতকুণ্ডলী, অষ্টিনা, দন্তবেষ, উপকুশ, কণ্ঠ, সান্ধু উরুক্ষত ব্রণগ্রন্থি ও মূত্রাশয় পাকাশয় আমাশয় ও ফুসফুস জাত ব্রণ যাপ্য, অর্থাৎ সহজে প্রাণ নাশক হয় না; কিন্তু চিকিৎসায় আরাম হয় না। যে ব্রণ কঠিন গোশৃঙ্গবৎ উন্নত দূষিত রুধির বা পাতলা পিচ্ছল আইস ধোয়া জলের মত স্রাব যুক্ত স্নায়ুজাল সমন্বিত (টিউমার) সেই ব্রণ অসাধ্য। ক্ষীণমাংস ব্যক্তির অধিক পুঁজ ও রক্ত বাহী ব্রণ হইলে বা ব্রণের চারিদিকে শোথ ও মাংসের বুদ্‌বুদ্ জন্মিলে বা অরুচি, অপাক, শ্বাস, কাশ, জ্বর, প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকে বা কণ্ঠে শব্দবাহী ব্রণ হইলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকের হাড় ভাঙ্গিয়া মগজ দৃষ্ট হইলে এবং সঙ্গে কাশ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। পাকাশয় হইতে তুষধোয়া জল এবং আমাশয় হইতে কলাইর জল ও রক্তাশয় হইতে ক্ষারজলবৎ স্রাব হইলে ব্রণ অসাধ্য।

পক্কাপক্ক—সচরাচর প্রদাহের পচ্যমান অবস্থা আরম্ভ হইলে তিন দিন মধ্যেই পুঁজ উৎপন্ন হয়। প্রদাহের মধ্যের গলনকার্য্য শেষ হইলেই ব্রণ সুপক্ক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই সময়ে প্রদাহের লক্ষণাবলি কমিয়া যাইবে, অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে মধ্যে পুঁজের ঢেউ অনুভব হইবে। এই অবস্থায়ই অস্ত্র করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। নচেৎ পুঁজ ব্রণ-প্রাচীরের সুস্থ মাংস ধ্বংস করিয়া পুঁজ ও গহ্বরের আকার বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অস্ত্রের পরে ক্ষত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ব্রণের উপরিভাগের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং শেষে এই পাতলা চামড়া নীচের মাংসের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না।

দ্বিতীয়তঃ—পুঁজের স্বাভাবিকগতি নিম্ন দিকে। কাজেই নিম্নগতি হইয়া কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া সেখানেও একটী গ (কেভীটী) উৎপাদন করে, এবং উপরের মুখ দ্বারা সামান্য পুঁজ বাহির হইয়া অবশিষ্ট পুঁজ উক্ত গর্ত্তেই আবদ্ধ থাকে। তখন সেখানেও অস্ত্র করিয়া পুঁজ নিঃসরণের পথ সরল করিয়া দিতে হয়। আর যদি যথা কালে এই পুঁজ নিঃসরণের বন্দোবস্ত না হয়, তবে সেখান হইতে অন্যত্র গতি হইয়া নালী বৃদ্ধি করিতে থাকে অথবা পুঁজ জমা থাকায় পুঁজের উত্তেজনায় রোগীর জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং কালে এই জ্বরই ক্ষয়কারী জ্বর রূপে পরিণত হইয়া রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে, এবং উপসর্গাদি বৃদ্ধি পাইয়া রোগী মৃত্যু-মুখেও পতিত হয়।

তৃতীয়তঃ—প্রদাহের নিকটবর্ত্তী যদি কোন স্বাভাবিক গহ্বর বা মূত্রাশয় (কিড্‌নি) ফুস্ ফুস্ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভাবনা; হইলে, ব্যারাম কষ্টসাধ্য হয়, অনেক স্থলে অসাধ্যও হইয়া পড়ে। অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হইলে, অস্থি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে এবং এই অস্থি প্রায়ই আর স্বাভাবিক হয় না।

চতুর্থতঃ—যদি কোন রক্তবাহী শিরা বা শিরামর্ম্ম বিদ্যমান থাকে তবে পুঁজে ঐ শিরা ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় অস্ত্রের পর হঠাৎ এমত রক্তস্রাব হইতে থাকে যে, রোগী ২।১ দণ্ড মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট কালেই ব্রণ বিদারণ পূর্ব্বক পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। রোগী বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু ও ভীরু হইলে, ভেদক ঔষধ দ্বারা ব্রণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিবে। সোলা বা পলিতা দ্বারা মুখ বড় করিয়া চিকিৎসা করিবে। অনেক অজ্ঞ বৈদ্য এই প্রকার রোগীকে ঔষধ দ্বারা ব্রণ ফাটাইয়া দিবে বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অথবা ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও অর্থশোষণ করে। ইহারা প্রকৃতই কুবৈদ্য। ভেদক

ঔষধ ব্যতীত এমত ঔষধ নাই যাহাতে ব্রণ ফাটিতে পারে, তবে যে তাহারা অনেক স্থলে বাহাদুরী লইয়া যায় তাহা তাহাদের কৃতিত্ব নহে। সময়ের বিলম্বে স্বতঃই পুঁজ বৃদ্ধি হইয়া বা পুঁজ বৃদ্ধিকারক ঔষধ বা পুল্টিসে পুঁজ বৃদ্ধি হইয়া ব্রণের উপরের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং পুঁজের চাপে আপনা হইতেই ব্রণ ফাটিয়া যায়। অপর পক্ষে অনেক বৈদ্য প্রদাহের পচ্যমান অবস্থাই পাকা ভ্রমে, অথবা রক্তজ ব্রণের রক্তের তরঙ্গকেই পুঁজের ঢেউ মনে করিয়া অস্ত্রোপচার (অপারেশন) শেষ করিয়া থাকেন। ইহা পক্ক ব্রণকে ত্যাগ করা অপেক্ষাও বিপদজনক। পক্ক ব্রণ ত্যাগ করিলে অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়া রোগী মারাও যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কিন্তু কাচা ব্রণ কাটিলে প্রায় সর্বত্রই অল্পাধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রদাহের আক্রমণ অবস্থায় তাহার উপরে অস্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় প্রদাহ আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনর্থক কতগুলি রক্ত বহির্গত হইয়া যাওয়াতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ব্রণ যদি বাত, অথবা পিত্তজ বা সান্নিপাতিক হয়, অথবা রোগী যদি বাতপিত্তপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয় তবে ব্রণ সাংঘাতিক ভাবে বিসর্পিত হইয়া পড়ে। রোগীর মধু মেহ শর্করামেহ বা নিরক্তাবস্থা থাকিলে অস্ত্রোপচার করিবার চোটে রোগী মারা যাইতে বাধ্য হয়। বিসর্পিত হউক বা না হউক প্রদাহের যে বিস্তৃতি ঘটাবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই, এবং সচারাচর এই স্থলেই প্রায় নালী দেখা যায়। এই জন্যই

"যো স্রেক্তা তমজ্ঞানঃ যো বা পক্ক মুপেক্ষতে"

অস্ত্র চিকিৎসা।

অস্ত্র ক্রিয়া আট প্রকার (শশ্রুতদেব)। যে রোগে যে ক্রিয়া আচরণীয় তাহা সেই সই রোগ বর্ণন কালে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। ব্রন চিকিৎসায় ভেদক ও বিশ্রাব্য ক্রিয়াই আচরণীয়।

অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে ন্যাকরা, গরম জল, শীতল জল, কষায় দ্রব্যের জল, তুলা, ঔষধ যন্ত্র যন্ত্র, সলাকা সংগ্রহ করিয়া রোগী পশ্চিম মুখে ও চিকিৎসক পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অস্থি ধমান মর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথা নিয়মে অস্ত্র করিবে।

ভেদক ক্রিয়া। ব্রণে যদি পুঁজ উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, বিশেষতঃ ফুসফুস, উদর-গহ্বর, বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি বড় জাতীয় ব্রণ বা যে ব্রণের চারিদিকের প্রাচীর অনুভব হয় না সেই সব স্থলে বোমা যন্ত্র দ্বারা ব্রণ ভেদ করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।

বোমা ঠিক সরল ভাবে ধরিয়া তাহার ফাটা দিক নিজের দিকে রাখিয়া, ব্রণের যে স্থান পাতলা বলিয়া অনুভব হইবে সেই স্থলে বোমা বসাইয়া দিবে। বোমা ব্রণ-গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে একটুকু জোরে সম্মুখের দিকে চাপ দিলেই ব্রণ-বস্তু বোমার ফাক দিয়া বাহির হইবে। মধ্য হইতে রক্ত বা মাংস ধোয়া জলবৎ পদার্থ বা চালিতার বিজল সদৃশ পুঁজ বাহির হইলে কথনও ব্রণে অস্ত্র করিবে না। সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া ২।৪ দিবস ব্রণ পাকান পুলটীশ, প্রলেপ দিয়া পুনরায় অস্ত্র করিবে। আর সুস্থ অথবা দূষিত পুঁজ দোষের প্রকোপ অনুসারে যে বর্ণেরই বাহির হউক না কেন অস্ত্র করিবে।

বিশ্রাব্য ক্রিয়া। ক্ষিপ্র-হস্ততাই অস্ত্র চিকিৎসকের প্রধান গুণ। অতএব অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক ব্রণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে "হোগল পাতি" যন্ত্রের ফলক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জোরের সহিত ধারণ করিয়া মাংসপেশীর লম্বা লম্বি ভাবে, ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এবং উক্ত অস্ত্র দক্ষিণে কিম্বা বামে চাপ দিয়া ধরিলে অস্ত্রের পার্শ্ব দিয়া পুঁজ বাহির হইবে, অস্ত্রের পার্শ্বদিয়া পুঁজ বাহির না হওয়া পর্যন্ত ব্রণ প্রাচার কাটা সমীচিন নহে। উক্ত প্রকারে পুঁজ বাহির হইলে ভিষক আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে ব্রণ-প্রাচীর কাটিয়া দিবে। এই সময়ে ব্রণের পার্শ্বস্থ অথবা নিম্ন প্রাচীর আহত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে

হইবে। ব্রণ-প্রাচীর আহত হইলে নূতন প্রবাহ আরম্ভ হইবে, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আধুনিক চিকিৎসকগণের এদিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া অনেক কুফল ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)
শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

বাসনা ও সংযম

বাসনা বন্যার সম প্রবল প্রবাহে
ভাসাইয়ে নিয়ে যায় মানব-জীবন,—
সংযম ঋষির হেন নিশিদিন চাহে
হৃদি তার করে দেয় পবিত্র শোভন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিরহী

আমার এ ক্ষুধাতুর ক্ষুদ্র হিয়া মাঝে
শিথিল কামনা আজি মরিছে গুমরি,
অতীত স্বপন রাশি অপরূপ সাজে,
আকুল পরাণখানি রয়েছে আবরি।
লো প্রেয়সি! প্রবাসিনি! বাজে কি পরাণে
এ সুদূর প্রবাসীর ব্যথিত নিশ্বাস!
নিভৃত ভবন মাঝে জাগে কি স্মরণে
পিপাসিত অন্তরের সলাজ আভাষ?
মনে কি পড়ে না আজ, হে প্রিয়া আমার
বিরহীর বিদায়ের তপ্ত আঁখি-জল?
বাতায়নে মুখখানি বিষাদ-আঁধার!
করুণ আকুল দিঠি বেদনা-বিভল?
—এ প্রবাসে, এ বিজনে বৃথা ভাবি হায়,
নয়নের জল শুধু নয়নে মিশায়!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস

এবারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। একই সময়ে এই চারি শাখার যুগপৎ অধিবেশন হওয়ায় কাহারও ভাগ্যেই একাধিক শাখার কার্য্য প্রণালী দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। সাহিত্য বলিতে ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সমস্তই বুঝায় এবং যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান গতি-প্রকৃতি প্রভৃতির বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সমুদয় বিভাগের সম্বন্ধেই কিছু কিছু সংবাদ রাখিতে অভিলাষী। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে এপর্য্যন্ত কেহই সম্মিলনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে যত্নবান হন নাই। তাঁহার মতে,

সাহিত্যক্ষেত্রের একনিষ্ঠ সাধকগণ সমুদয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শিত করিবার সুযোগ প্রদান করা সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য। এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ কথিত এই মহান উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাধারণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্যে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা জানিবার কোন সুযোগ এবার সম্মিলনীতে দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিবার যে একমাত্র সুযোগ ছিল আমরা বুদ্ধির দোষে তাহা হারাইয়াছি।

গত বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু যাহাতে বর্ত্তমান বৎসরের অসাধু দৃষ্টান্ত চিরস্থায়ী না হয় প্রত্যেকেরই তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এবৎসরের যুগপৎ অধিবেশনের কুফলও যাহাতে যথাসম্ভব মন্দীভূত হয় তাহারও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে ঐতিহাসিক বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিলাম। যাঁহারা ঐতিহাসিক বিভাগে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহারা যাহাতে এই বিভাগের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারেন ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

২৯শে চৈত্র শনিবার ইতিহাস শাখার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণ মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইবে, এবং অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, সুতরাং বর্ত্তমানে এবিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধান-প্রণালী বিশদরূপে বিবৃত করেন। এবিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নাই, অথচ যে সমস্ত উপাদানে এই ইতিহাস গঠিত হইতে পারে তাহার যে নিতান্ত অভাব একথা স্বীকার করা যায় না। উপাদান অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু এই উপাদান হইতে প্রকৃত ইতিহাস সংগঠন বড় সহজ সাধ্য নহে। কেবল ইট, কাঠ থাকিলেই যেমন গৃহ প্রস্তুত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি-বিদ্যার প্রয়োজন, এমন কি গৃহের উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রধাণতঃ এই স্থপতি-বিদ্যার উপরেই নির্ভর করে সেইরূপ ইতিহাসের উপাদান হইতে প্রকৃত ইতিহাস সংগঠন করিতে হইলেও একটি বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন। কিরূপে সেই বিশেষ বিদ্যাটি অধিগত হইতে পারে পূজনীয় মৈত্র মহাশয় অতি সুন্দর প্রণালীতে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে চতুর্দ্দিকেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক উৎসাহী যুবক অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইতিহাস গঠনোপযোগী অনেক উপাদানও সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ স্থলেই এই সমুদয় উপাদানের প্রকৃত ব্যবহার হইতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় মৈত্র মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণটিতে এই প্রকার ইতিহাস-গঠন প্রণালী সুচারুরূপে বিবৃত করিয়া বঙ্গদেশের একটি মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে ফ্লিণ্ডারস (Klinders) ও পেট্রি (Patrie) প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন,

এদেশে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু যুবক মাত্রকেই আমরা মৈত্র মহাশয়ের অভিভাষণটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সভাপতির অভিভাষণ সমাপ্ত হইবার পর প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হয়। এবারে ইতিহাস শাখায় পাঠের জন্য বহু-সংখ্যক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ও বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি একযোগে তন্মধ্যে ১৭ কি ১৮টি পাঠোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমে রায় সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "বৌদ্ধ জাতক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঈশানবাবু সুবৃহৎ বৌদ্ধ জাতক মালার বঙ্গানুবাদে ব্যাপৃত আছেন। প্রায় শতাধিক জাতক উপাখ্যান ইতিমধ্যেই অনূদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। 'জাতক' পাঠের আবশ্যকতা কি, ইহা পাঠ করিলে নূতন কি কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত জাতকের কাল নির্ণয় সম্বন্ধেও তিনি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। এই অংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের পুনরাবৃত্তি মাত্র, নূতন কোন যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে কোন নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা একেবারেই নাই। জাতক পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যেও নূতনত্ব কিছুই নাই। দশরথ জাতক, বভেরু জাতক প্রভৃতি দ্বারা রামায়ণের রচনাকাল, ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারা যায় তাহা সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু এই ভূমিকা অংশ বিশেষ মূল্যবান না হইলেও প্রস্তাবিত জাতকের অনুবাদ যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

অতঃপর শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুমার বক্ত্রিয়ার গ্রীক রাজগণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুরেন্দ্র বাবু যে বিষয়টি নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহা বঙ্গ সাহিত্যে এক প্রকার নূতন। বীরবর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় বিজিত রাজ্য সমূহ তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি গণের করগত হয়। এশিয়ার অন্তর্গত যে সমুদয় স্থান আলেকজাণ্ডার জয় করিয়াছিলেন তাহা সেলুকস নামক সেনাপতির রাজ্যভুক্ত হয়। হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তর স্থিত, অকশাস্ (Oxus) ও জ্যাকজারটেস্ (Jaxertes)নামক তটিনীদ্বয় বিধৌত বক্ত্রিয়া নামক প্রদেশ তাহার অন্যতম। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভূভাগ সেলুকসের বংশধরগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রীক রাজগণ এই প্রদেশে পরাক্রম সহকারে রাজত্ব করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আলেকজাণ্ডারের অনুকরণে ভারতবর্ষে অভিযান করেন, এবং পাঞ্জাব আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশ বহুকাল তাঁহাদের শাসনাধীনে থাকে। এমন কি সুদূর গুজরাট প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের রাজ্য কিছুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত ভারবর্ষের প্রান্ত প্রদেশে এই গ্রীক রাজ্যের অবস্থান ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। এই দুই প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে, পরস্পরের ভাববিনিময় ও সভ্যতার আদান প্রদান কিরূপ সম্পাদিত হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে এই উভয় সভ্যতার মধ্যে যে পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার নানা বিভাগে যে গ্রীক প্রভাব স্পষ্টরূপে বিদ্যমান, তাহা এই সংস্পর্শেরই ফল। আলেকজাণ্ডারের স্বল্পকালস্থায়ী অভিযান সমধিক বিখ্যাত হইলেও তাহাতে এই প্রকার ভাববিনিময়ের কোন সুযোগ বর্ত্তমান ছিল না। বক্ত্রি-

য়ার গ্রীক রাজগণ তিনশত বৎসর ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশে বাস করার নিমিত্তই এই প্রকার ভাব-বিনিময় সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ভাবে দেখিতে গেলে বক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজগণের ইতিহাস আমাদের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুমার এই বিষটি নির্ব্বাচন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় লোকের নিকট হইতে আমরা যাহা আশা করি প্রবন্ধটি তদনুরূপ হয় নাই। পার্সি গার্ডনার ও রেপসনের (Percy Gardner's Catalogue of Greek and Scythic coins in the British Museum,এবং Rapson's Indian coins এই দুই) সুপরিচিত গ্রন্থে যাহা আছে তদতিরিক্ত তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হইল না। কানিংহাম (Cunningham) কর্ত্তৃক নিউমিসমেটিক ক্রণিকল্এ (Numismatic Chronicle) প্রকাশিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধাবলী, উইলসনের এরিয়ানা এন্টিকোয়া (Wilson's Ariana Antiqua) এবং টমাস, রেপসন, মেসন প্রভৃতির (Thomas, Rapson, Masson, Raoul Rochette) প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে যে সমুদয় সমস্যার উদয় হয়, তাহার বিবৃতি ও বিচার করিলে অনেক নুতন তথ্য অবগত হওয়া যায়।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কালিদাসের জন্মস্থান" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "গৃহস্থে" প্রকাশিত "কালিদাসের জন্মস্থান" শীর্ষক একটি উৎকট প্রবন্ধ যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধের নাম শ্রবণে মনে আতঙ্কের সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যেরূপ উদ্ভট প্রমাণ সহকারে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, নবদ্বীপই কালিদাসের জন্মভূমি, তাহা পুরাতত্ত্ব আলোচনাকারীগণের প্রতি শ্লেষ প্রসূত অথবা বিকৃত মস্তিষ্কের ফল স্বরূপ তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মাননীয় কাশিমবাজারের মহারাজ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার ষ্ট্রস্ (Dr. Stross) এই উভয়ের নামযুক্ত হওয়ায় পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের অপরূপ সিদ্ধান্ত উল্লিখিত দুই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্গত তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এ বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করায় বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে বাঙ্গালা দেশ যে কালিদাসের জন্মভূমি ছিল এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই, বরং উজ্জয়িনী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান তাঁহার জন্মস্থান ছিল এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনাক্রমে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না, কারণ গ্রন্থের এ অংশ অপরিহার্য্য, কবির ইচ্ছা প্রসূত নহে। পূর্ব্বদিক বিজয় বর্ণনায় বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, সুতরাং কবিকে বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশের অবতারণা করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশের বিজয় বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন, "বঙ্গান্ উৎখায় তরসা" ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, বঙ্গদেশ কবির জন্মস্থান নহে। কারণ "উৎখায়" এইরূপ নিদারুণ বাক্য স্বীয় জন্মভূমির প্রতি প্রয়োগ করা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু মেঘদূত কবির কল্পনা প্রসূত কাব্য। ইচ্ছা হইলে তিনি অনায়াসেই বঙ্গদেশের একটী সুন্দর বর্ণনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন। যক্ষকে রামগিরির পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত কোন পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারিত। সুতরাং যে মেঘদূত কাব্যের ঘটনা ও স্থান প্রভৃতি পৌরাণিক কোন বর্ণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া কেবল মাত্র কবির ইচ্ছায় নির্ণীত হইয়াছে, তাহার ঘটনা-স্থানের সমাবেশ দ্বারাই কবির জন্মস্থান নিরূপণ করিতে হইবে মেঘদূতে উজ্জয়িনীর যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় উহাই কালিদাসের জন্মস্থান। তৎপরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, কালিদাস শৈব বা

কালীভক্ত ছিলেন তাঁহার গ্রন্থ ও কালিদাস এই নামই তাহার প্রমাণ, এবং তিনি নানাবিধ প্রমাণ সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন যে, উজ্জয়িনীই কালীর প্রথম পূজাস্থান।

মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় "কালিদাসের জন্মস্থান" হইলেও "কালিদাসের জন্ম সময়" সম্বন্ধেই তিনি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে,এই আলোচনা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অগৌরব ও অপযশের বিষয় হইয়াছে। তিনি যে সমুদয় প্রমাণ বলে কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। অথচ কালিদাসের জন্ম সময় যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে হইতেই পারে না, মন্দাসোর (Mandasor) শিলালিপির আবিষ্কারের পর তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সুপরিচিত তথ্যটি বিস্মৃত হইয়া তিব্বত ও সিংহল হইতে আহরিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে তর্কজালের উপর তর্কজাল বিস্তার করিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন যে, কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, (১) কালিদাস পাণ্ড্য ও সিংহল দেশের মধ্যে সংগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন; ষষ্ঠ শতাব্দীর অনতি পূর্ব্বে ঐরূপ একটি সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল; (২) কালিদাস মেঘদূতে যে দিঙ্নাগের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; (৩) নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং এই তিন দিক হইতেই বিচার করিয়া দেখিলে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পাণ্ড্য ও সিংহল দেশ বহু প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ; অন্ততঃ অশোকের সময় যে এদুটি সুপরিচিত রাজ্য বর্ত্তমান ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে, সুতরাং বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ উভয়ের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুরূপ ঘটনা খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্ব্বেও সংঘটিত হইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি যুক্তি সম্বন্ধে "প্রতিভাতে" প্রকাশিত ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ১৩২০, ১৯৫ পৃষ্ঠা। আমাদের বিবেচনায় কালিদাসের জন্ম সময় সম্বন্ধে মাত্র দুইটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে——

(১) কালিদাসেরজন্ম সময় পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে পারে না।

(২) কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে একটা প্রবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর শ্রীযুত গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, কিন্তু উহা এত ক্ষীণস্বরে পঠিত হইল যে, উহার কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করা একেবারে অসাধ্য হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ "প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও মৌর্য্যশিল্প" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক মানব গৃহ্যসূত্র, শাঙ্খায়ণ গৃহ্যসূত্র, পানিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মন্দিরের উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, মন্দির নির্ম্মাণ প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। অতঃপর তিনি মৌর্য্য-শিল্পের বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু যাঁহারা এই শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি করেন সেই মগধবাসীগণের প্রকৃতির কিছু পরিচয় না পাইলে তাঁহাদের শিল্পের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এই নিমিত্ত রমাপ্রসাদ বাবু প্রথমে মগধবাসীগণের প্রকৃতির বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিবাসীগণ হইতে মগধবাসীগণের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যভাব লক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নানা বিভাগে এই স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন—যেমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

তাঁহার মতে নন্দবংশীয় মগধরাজগণই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য, এমন কি তাহার কল্পনা পর্য্যন্ত কেহ কখনও করেন নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর এই উক্তিটি লইয়া সভায় অনেক বিচার বিতর্ক ও আলোচনা হয়। এবিষয় বিস্তারিত পরে লিখিত হইবে।

ধর্ম্ম বিষয়েও মগধবাসীগণের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি এই মগধ মনীষারই পরিচয় এবং চিরকালই ধর্ম্ম বিষয়ে এই স্বাতন্ত্র্য হেতু মগধবাসীর প্রতি শাস্ত্রকারগণের প্রবল বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ নানা বিভাগে মগধবাসীগণের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া লেখক অবশেষে মগধ হইতে উদ্ভূত মৌর্য্য শিল্পের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার মতে এই শিল্পে গ্রীক প্রভাব অপেক্ষা আসিরীয় ও পারস্যের প্রভাব অধিকতর ভাবে বিদ্যমান।

যদিও রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য মৌর্য্য শিল্পের পরিচয় প্রদান অথাপি ইহার যে অংশে তিনি মগধবাসীগণের একটি স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের ভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন আমাদের নিকট সেই অংশই অধিকতর মূল্যবান বোধ হয়। আর শিল্প সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যে দুইটি কথার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। ফার্গুসন (Fergusson) প্রমুখ যে সমুদয় ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষের শিল্পকলার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মৌর্য্যবংশের রাজ্যকালকে ভারত-শিল্পের জন্মসময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ইহার প্রতিবাদ করেন, এবং এই প্রতিবাদের ফলে ফার্গুসনকে তাঁহার মত কিয়ৎ পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা এইরূপ আভাষ পাই যেন তিনিও রাজেন্দ্র লালের মতের পরিপোষক। তবে এবিষয়টি তাঁহার প্রবন্ধে তেমন সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নাই। ভারত শিল্প সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শিল্পকে ধর্ম্মানুযায়ী বিভাগ করিয়াছেন, যথা বৌদ্ধ শিল্প, জৈন শিল্প, ব্রাহ্মণ্য শিল্প ইত্যাদি। কিন্তু এই বিভাগটি আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শিল্প চিরকালই ভারতবর্ষীয় শিল্প। তাহাকে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি পৃথক পৃথক কোঠায় (water-tight Compartment) বিভাগ করিয়া লইলে তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা মহাভ্রমে পতিত হইব। বর্ত্তমান কালে দুই এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিতও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধেও আমরা এইরূপ মতের আভাষ পাই।

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাকবি ভাসের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কি উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায় এতৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। মহাকবি ভাসের সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে (Indian Antiquary) ষ্টেন (Sten Konow) মুদ্রারাক্ষসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ভাসের কালনির্ণয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাস খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। ভাস গ্রন্থাবলীর আবিষ্কারক শ্রীযুত গণপতি শাস্ত্রী উক্ত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তাঁহাকে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ জৈসওয়াল খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কান্বরাজ নারারায়ণের সময়ে ভাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করেন।* এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে (Journel of the Royal Asiatic Society) এবিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

* Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. IX No 7. July 1913.

শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী কাশীপ্রসাদ জৈস্ ওয়ালের মত সমর্থন করেন। কাশীপ্রসাদের যুক্তি ব্যতিরেকে প্রমথ বাবু নূতন যে যুক্তি দুইটীর অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—(১) কোন কবির যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে এবং কবি-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে অন্ততঃ তিন চারশত বৎসর দরকার; সুতরাং কালিদাস যে ভাবে ভাসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভাসকে কালিদাসের তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক ইহাই বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণের মত, সুতরাং খুব সম্ভব ভাস খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) ভাস তাঁহার বালচরিত গ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন ক্রমে কংসবধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমথ বাবু অনুমান করেন যে, ইহাতে প্রকারান্তরে কাম্বগণ কর্ত্তৃক সুঙ্গরাজের বধ বিবৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার একটি প্রধান যুক্তি এই যে, উক্ত গ্রন্থে কৃষ্ণের নামের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই নারায়ণ এই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রকারান্তরে কাম্বরাজ নারায়ণ সূচিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ এ বিষয়ের বিচার বিতর্ক করিবার স্থল নহে। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত দুইটি যুক্তির কোনটিই বিশেষ বলবতী নহে। যে যুক্তিবলে তিনি ভাসকে কালিদাসের তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিপন্ন করিতে চাহেন ঠিক সেই যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, কালিদাস কবি বাণের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত ছিলেন। কারণ বাণের সময়ে কালিদাসের যশ সুদূর দাক্ষিণাত্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অথচ প্রমথ বাবু স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক। অতএব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে কালিদাসের যশ ব্যাপ্তির পক্ষে অনধিক দুইশত বর্ষই যথেষ্ট এই হিসাবে ভাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করা অন্যায় হয় না।

প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় যুক্তিটি আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি আমরা প্রকৃত বুঝিয়া থাকি তবে বলিতে হইবে এ যুক্তিটির কোন ভিত্তিই নাই। বালচরিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে কৃষ্ণ কচিৎ নারায়ণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন সত্য কিন্তু গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যে স্থলে তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে সে স্থলে উক্ত শব্দের সার্থকতা আছে—যেমন কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই তদ্দর্শনমানসে আগত নারদ বলিতেছেন, "তদ্ ভগবন্তং লোকাদিমনিধনমব্যয়ং লোকহিতার্থে কংসবধার্থং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতং নারায়ণং দ্রষ্টুমিহাগতোঽস্মি" এ স্থলে দেবর্ষি নারদ সদ্যোজাত শিশুকে নারায়ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া নারায়ণ এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে যে স্থলে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন তত্তৎস্থলে গ্রন্থকার তাঁহাকে দামোদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র, রাজা কংস কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতেছেন, "অয়ং স দামোদরঃ" (৬১ পৃঃ)। কংসবধের পর কৃষ্ণ বসুদেবের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "তাত দামোদরোঽহমভিবাদয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি (৬৪ পৃঃ), শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবু শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাসকে কাম্ববংশীয় নরায়ণের সমকালবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না, কারণ ভাসের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত যে দুইটি কথা আমরা জানি, পূর্ব্বোক্ত অনুমান তাহার বিরোধী। সে দুইটী কথা এই—প্রথম তাঁহার ভরত বাক্য—"ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্ মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।" কাশী প্রসাদ ও স্বীকার করেন যে, এই শ্লোকে ভাস তদানীন্তন রাজাকে লক্ষ্য করিয়াছেন—

"The benedictory verse refers to the

reigning ('our') Soverign. (J. A. S. B. 1913 P. 264).

সুতরাং এখন প্রশ্ন এই যে, কাম্বরাজ নারায়ণ উক্ত শ্লোকের লক্ষ্যভূত হইতে পারেন কি না। আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্ভব নহে, কারণ কাম্বরাজগণের প্রভাব কদাচ সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হয় নাই। যতদুর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, কাম্বরাজগণের রাজ্য মগধের সীমা অতিক্রম করে নাই। সুতরাং "সাগরপর্য্যন্তা হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলা" এই বিশেষণ কাম্বরাজ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সংস্কৃত কবিগণ, চিরকালই অতিশয়োক্তির পক্ষপাতী; বিশেষতঃ রাজার মহিমা বা রাজ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে; কিন্তু যদি ইহাই হয় তবে কবির উচ্ছ্বাস বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাধা পাইল কেন? তাহাও বিচার করিবার বিষয়। চিরাগত প্রথা মত সসাগরা ধরণীর অধিপতিরূপে বর্ণনাই তাহা হইলে খুব স্বাভাবিক হইত। সুতরাং অধিক সম্ভব যে, কবি এখানে প্রকৃত ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন। আর কবি ভাসের লিখন-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালের কবিগণেব ন্যায় কৃত্রিমতা, অতিশয়োক্তি, অনুপ্রাস-বাহুল্য প্রভৃতি দোষে দুষ্ট নহে। তাঁহার লেখা স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বর বিহীন। কবির এই প্রকৃতিও আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। *

আর ভাস সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত অপর যে একটি কথা আমরা জানি তাহাও ইহার সমর্থন করে। সেটী এই যে, ভাসের গ্রন্থোক্ত একটি শ্লোক চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এস্থলে কে কাহার নিকট ঋণী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পুস্তকে অপর গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা খুব স্বাভাবিক, এবং এরূপ বহু উদ্ধৃত শ্লোক উক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন নাটকে এরূপ ভাবে শ্লোক উদ্ধৃত করা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; বিশেষতঃ ভাসের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে ইহা আরও অস্বাভাবিক।

ভাসের সময় সম্বন্ধে যদি কোন অস্থায়ী (Provisional) সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তবে গণপতি শাস্ত্রী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ ভাস চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। *

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাশীপ্রসাদ যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার একটি নাটকের প্রাচীন পাত্র মন্ত্রী রুমন্বৎ শ্রমণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার অশোকের পরবর্ত্তী কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। অশোকের বহু পূর্ব্ব হইতেই অন্ততঃ মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল, এসম্বন্ধে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়। বৌদ্ধগণের প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি, এবং অশোক লিপিতে বৌদ্ধগ্রন্থের নামোল্লেখ

* "Bhasa's language is absolutely free from the *karya* artificiality which we find as far back as the time of the Rudradaman Inscription (second cetury A. C.). There is not the slightest efforts for alliteration ; the very thing seems to be almost unknown to the author. He never used long *samasas*. Also his conceits are never far-fetched. Further, he discloses grammatical archaisms which would appear as erroneous or almost as erroneous to one familiar with the classical *karya* (J. A. S. B. 1913 P. 261).

* কাশীপ্রসাদের এই মন্তব্য হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভাসের সময় "সংস্কৃত কাব্যের" সময় অপেক্ষা বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী। এক শত কি দুই শত বৎসর ব্যবধানে কোন সাহিত্যের এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

প্রভৃতি ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত। ভগবান বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই মগধের নানা স্থানে বিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার শিষ্য-সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিকগণেরও ইহাই মত।

(২) ভাসের গ্রন্থে সমাজের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে. তৎকালে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থেরা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগের চিত্র বলিয়াই মনে হয়, দৃষ্টান্ত যথা—মগধের রাজমাতা ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের চিত্র ইহাও যেরূপ সম্ভব যৎকালে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্বে) অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে তৎকালের চিত্র হওয়াও সেইরূপ সম্ভব।

(৩) কাশীপ্রসাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে, অশোকের রাজ্যসীমা বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল, এবং অশোকের লিপিতে প্রায়শঃ সমগ্র ভারতবর্ষ এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ভাসের রাজার রাজ্য "হিমবৎ বিন্ধ্যকুণ্ডলা" সুতরাং ভাষ অশোকের পরবর্ত্তী; কিন্তু এই যুক্তিবলে ভাষকে অশোকের পরবর্ত্তী না ধরিয়া অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করাই অধিকতর সঙ্গত। যখন মৌর্য্য সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে নাই, এ তখনকারই কথা। ইহাই স্বভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়।

আমাদের বিবেচনায় কাশীপ্রসাদের কোন যুক্তিই বলবতী নহে, এবং অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমীচীন গণ্য করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে অধিক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

প্রমথ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত গণপতি রায় "যবদ্বীপে হিন্দু সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক "সামন্তরাজ লোকনাথ" নামক প্রবন্ধে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করেন। এই তাম্রশাসনখানি বহুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর এম্, এ, মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ঘটনাক্রমে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত ইহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তগত হইয়াছিল, এবং এই সুযোগে রাধাগোবিন্দ বাবু ইহার পাঠোদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

রাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ বা অনুবাদ কিছুই দেন নাই। ইহা হইতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায় কেবল তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

লোকনাথ নামক কোন সামন্তরাজ, অনন্তনারায়ণের মন্দির স্থাপন, ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের জন্যে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত সুব্বুঙ্গ বিষয়স্থিত এক অটবী-ভূখণ্ড ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ইহাই আলোচ্য তাম্রশাসন-খানির সার মর্ম্ম। লোকনাথের রাজ্য কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। তাঁহার সময় নির্দ্ধারণকল্পে বর্ত্তমান লিপির অক্ষরই একমাত্র সহায়। ডাক্তার ব্লক (Bloch) এই শাসনের লিপিকাল নবম দশম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, রাধাগোবিন্দবাবুর মতে ইহা সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত। যতদিন রাধাগোবিন্দবাবু এই শাসনের প্রতিকৃতি প্রকাশিত না করেন ততদিন এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা অসম্ভব। তবে রাধাগোবিন্দ বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই শাসনের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে লিপিকাল-

বিষয়ে তাঁহার অনুমানই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হইল।

এই তাম্রশাসনের সংলগ্ন মুদ্রায় উৎকীর্ণ একটি পংক্তিতে লিখিত আছে "কুমারামাত্যাধিকরণস্য"। মূল শাসনখানি যে অক্ষরে লিখিত মুদ্রার এই অক্ষরগুলি তাহা অপেক্ষা বহু প্রাচীন। রাধাগোবিন্দ বাবুর মতে ইহা উত্তর ভারতীয় গুপ্ত নরপতিগণের সমসাময়িক। লোকনাথকে গুপ্তরাজগণের সমকালে প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার করিতে দেখিয়া লেখক অনুমান করেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ গুপ্তরাজগণের সামন্ত ছিলেন।

লোকনাথ সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ বাবু যে ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় তাহার সুযোগে সামন্তরাজ লোকনাথ স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীজীবধারণ নামক নৃপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি লোকনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ দুইটি কারণ যথাক্রমে (১) লোকনাথের, প্রভাব ও অভ্যুদয় (২) তৎকালীন সার্ব্বভৌম নরপতি প্রদত্ত শ্রীপট্ট প্রাপ্তি। এই সার্ব্বভৌম নরপতি কে ঠিক জানা যায় না। তবে ইনি দ্বিতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়সাধনকারী আদিত্যসেন হইতে পারেন রাধাগোবিন্দ বাবু এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শাসন সম্পাদনের সময় সম্বন্ধে লিখিত আছে "চতুশ্চত্বারিংশৎ সংবৎসরে ফাল্গুন মাসে"। ইহা কাহার প্রচলিত সংবৎসর তাহার উল্লেখ নাই। লেখকের মতে ইহা হর্ষবর্দ্ধন প্রবর্ত্তিত সংবৎসর।

এই তাম্রশাসনে দানগ্রহণকারী শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে তাহা কুলশাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের আলোচ্য।"

রাধাগোবিন্দ বাবুর ন্যায় লোকের এই মন্তব্যটিতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কুলশাস্ত্রজ্ঞগণের প্রতি এই অনাবশ্যক 'খোঁচা' টুকু না দিলে তাঁহার প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইত না, বরং এই টুকু দেওয়াতে ইহার গুরুত্ব নষ্ট হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা এই ত্রিপুরা শাসনের পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে লোকে বিশেষ ভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞগণও সম্ভবতঃ তাহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আদিশূর-কাহিনীর সহিত ইহার অসামঞ্জস্য কোথায়, ইহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাম্রশাসনেই এমন একটি কথা রাধাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে আদিশূর কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে "দ্বিজসত্তমেরা"ও শূদ্রাণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের সমাজে যে আচার ব্যবহার চলিতেছে, এবং আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মগণ যে আচার ব্যবহারের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রখ্যাত, তাহাদের সহিত উল্লিখিত আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান হয় কি? লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে বর্ত্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, সমসাময়িক লোকনাথের (সপ্তম শতাব্দীর?) বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাণী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য আচার অনুসন্ধানও সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপতি ও তৎকর্ত্তৃক আনীত বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন পঞ্চব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে অসাম-

গুস্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। ভবিষ্যতে প্রতিবাদ-কশার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না; আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, আলোচ্য তাম্রশাসনখানির কোন উক্তির সহিত আদিশূর কাহিনীর কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

রাধাগোবিন্দ বাবুর পর কুমার শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ কুমার রায় উত্তর বঙ্গের প্রত্নসম্পৎ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমেই লেখক ধীমান ও তৎপুত্র বিৎপাল নামক দুইজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্কর কর্ত্তৃক বরেন্দ্রভূমে প্রতিষ্ঠিত চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে দুইটি অভিনব শাখার পরিচয় প্রদান করেন। লেখকের মতে বরেন্দ্রের এই শিল্পশাখার প্রভাব নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে বিস্তৃত হয়। অতঃপর উত্তরবঙ্গের মধ্যে যে সকল স্থান প্রত্নসম্পদে পূর্ণ তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া লেখক প্রবন্ধ শেষ করেন। বাণ-নগর যোগিগুম্ফা, পাঁচবিবি, মঙ্গলবারি হাট, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, বিজয়নগর প্রভৃতির বিবরণ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকটই মূল্যবান বিবেচিত হইবে।

অতঃপর যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হয় তন্মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরের "একডালা দুর্গ" ও শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর "বিক্রমপুর" নামক প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উভয় প্রবন্ধই "প্রতিভাতে" প্রকাশিত হইবে সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। বীরেন্দ্র বাবু ঢাকার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান একডালা নামক গ্রামেই সুবিখ্যাত একডালা দুর্গ বর্ত্তমান ছিল ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নলিনী বাবু বিক্রমপুরের মধ্যে প্রত্নসম্পদ পরিপূর্ণ কয়েকটি স্থানের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, মগধের নন্দরাজগণই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপূর্ব্বে সাম্রাজ্যের কল্পনাও ভারতবর্ষে কেহ কখনও করেন নাই। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ বাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করেন। প্রতিপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, বেদ, পুরাণ প্রভৃতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, যতদিন পর্য্যন্ত কোন শিলালিপি দ্বারা ইহাদের উক্তি সমর্থিত না হয় ততদিন আমরা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী তর্কের সূত্রটি একটু ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি বলেন যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেই যেরূপ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয় তাহা প্রাচীনকালে থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানে সাম্রাজ্য (Imperialism) বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্ত্তক চাণক্য অথবা চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের (Imperialism) অর্থ অপরের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন, এ জিনিষটি ভারতবর্ষে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেই প্রথম দৃষ্ট হয়। পরিশেষে সভাপতি বলেন, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই জয় হইয়াছে। সাম্রাজ্য (Imperialism) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মগধবাসীগণ কর্ত্তৃকই উদ্ভূত হইয়াছে তবে অপরবিধ সাম্রাজ্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ইতিহাস শাখার সভাপতি মহাশয় যে ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। অধিকাংশ স্থলেই সভাপতি, প্রবন্ধের ও তাহার পাঠকের নাম ঘোষণা করেন মাত্র, কিন্তু অক্ষয় বাবু অধিকাংশ স্থলেই প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে বা পরে, আলোচিত বিষয়ের আবশ্যকতা কি, এবং তাহার কোন অংশে বিচার বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া বিষয়টি সাধারণের পক্ষে সুগম করিয়া দিয়াছেন। এবারে ইতিহাস শাখার আর একটি বিশেষত্ব পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা। যে যে স্থলে পঠিত প্রবন্ধের আলোচনা সুফলপ্রদ হইতে পারে সভাপতি মহাশয় সেই সেই স্থলে আলোচনা আহ্বান করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে এই আলোচনা বিশেষ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

মহাকবি ভাস *

মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় মহাকবি কালিদাস ভাসকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্লক-বিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য" হইতেই ইহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। †

হর্ষ চরিতে ভট্ট বাণও ভাসের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—

সূত্রধার কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপাতকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥

ভাসের নাটকাবলী সূত্রধার কর্ত্তৃক আরব্ধ (নান্দী-হীন),ও সজ্জাবহুল এবং তিনি দেবকুলের ন্যায় যশপতাকা দ্বারা কীর্ত্তিমান হইয়াছেন।

সুতরাং ভারতে ভাসের নাম অপরিচিত নহে, কিন্তু কবিগুরু কালিদাস যাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই প্রথিতযশা প্রাচীন কবির নামের অস্তিত্ব এযাবৎ ছায়া-কঙ্কালকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পণ্ডিতপ্রবর গণপতি শাস্ত্রী দশখানি হস্তলিখিত অপ্রকাশিত নাটিকার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই রূপকগুলি মালয়ালাম অক্ষরে তালপত্রে লিখিত; এবং শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন এই প্রতিলিপিগুলি ৩০০ বৎসরেরও প্রাচীন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পদ্মনাভপুরের সন্নিকটে মনলিকর মঠে ১০৫ খানি লিখিত তাল পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এক একটি পত্রে দশটি করিয়া পংক্তি, এবং গ্রন্থগুলি ৩০০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বের হইলেও প্রথম দশ বারখানি পত্রের কয়েকটি শব্দ ব্যতীত সমগ্র প্রতিলিপির আর কোনও অংশই বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। এই ১০৫টি তালপত্রে দশখানি রূপকের প্রতিলিপির আবিষ্কার হইয়াছে, যথা,—

১. স্বপ্নবাসবদত্তা। ২. প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ। ৩. পঞ্চরাত্র। ৪. চারুদত্ত। ৫. দূত ঘটোৎকচ। ৬. দূতবাক্য। ৭. অবিমারক। ৮. বালচরিত। ৯. মধ্যমব্যায়োগ। ১০. কর্ণভার। ১১. উরুভঙ্গ।

তন্মধ্যে দূতবাক্য নামক রূপকখানির কতিপয় পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রতিলিপিকার রূপকখানি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে আবিষ্কৃত অন্য প্রতিলিপি হইতে এই গ্রন্থের নামোদ্ধার হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগে এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

এই প্রতিলিপিগুলির উদ্ধারের অল্পকাল পরেই অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক নামীয় আরও দুইখানি নাটক শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। এই দুটি নাটকও সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোল্লিখিত দশখানি রূপকের অনুরূপ।

এইরূপে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী তেরখানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিয়া সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নচর্চ্চার রাজ্যে এক নূতন সত্যের আলোক আনয়ন করিয়াছেন। এই সকল নাটক দেখা দূরে থাকুক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এযাবৎ ইহাদের নামও শ্রবণ করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহার মঠে "মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণের" সঙ্গে ভারতের বহু অমূল্য রত্নের ধ্বংস হইয়াছে, সেই সকল রত্নের পুনরুদ্ধার স্বপ্ন-কল্পনা, এই দ্বাদশটি লুপ্ত রত্নেরও যে আর উদ্ধার হইবে এরূপ আশা কেহই করেন নাই, সুতরাং ইহাদের অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ভারত-জননীর গৌরব-মুকুটের কয়েকটি প্রণষ্ট মণির পুনরুদ্ধার মাত্র।

কালিদাসের সময়ে ভাসের নাটকাবলীর বহুল প্রচলন ছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় ভাসের নামোল্লেখই ইহার অকাট্য প্রমাণ। শূদ্রকের সময় ভাসের নাটকের প্রচার নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা মৃচ্ছকটিকের আদর হইত না। মৃচ্ছ-

---

* পণ্ডিতগণপতি শাস্ত্রী লিখিত ভাস গ্রন্থাবলীর উপোদ্‌ঘাত অবলম্বনে।

† প্রথিতযশা কবি ভাস সৌমিল্লক প্রভৃতির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া আমি লিখিতেছি ইত্যাদি।

কটিকে মৌলিক রচনা নাই, একথা বলা যায় না, তবে ইহার বেশীর ভাগই "চারুদত্ত" নাটকের অনুকরণ, বা উপকরণের সমষ্টি মাত্র। অতএব দেখা যায়, কালিদাসের পর হইতে ভাসের নাটকাবলীর লুপ্তি আরম্ভ হয়। ইহার কারণ কি? আমরা দেখিব ভাসের কবিত্ব, ভাব-প্রকাশ রচনা-চাতুর্য্য, বাক্যশ্রী, রসপ্রবাহ প্রভৃতি ঋষি-প্রতিভার সহিত তুলনীয়। সুতরাং হীনমূল্য বলিয়া ভাস-কাব্য লুপ্ত হয় নাই। আবার ভাস-প্রণীত গ্রন্থাদিতে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই বলিয়াই এগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির গর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে একথাও স্বীকার করা যায় না, কারণ রঘুবংশ, শিশুপাল বধ প্রভৃতি কাব্যেও কবির নামোল্লেখ নাই। তবে আমরা দেখিতে পাই যে, গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" ও আচার্য্য ব্যাড়ির "সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থও অসার নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। ভাস-কাব্যাদির বেলায়ও এইমাত্র বলা যাইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে এত দিনে বহু শ্লাঘ্য কবি নাম মাত্রে পরিচিত হইয়া থাকিতেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এই গ্রন্থগুলি যে ভাস-প্রণীত তাহার প্রমাণ কি? গ্রন্থেত ভাসের নামোল্লেখ নাই? আমরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই প্রয়াস পাইব।

শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থগুলির কয়েকটি বিশেষত্ব আছে,এবং ইহাদের রচনা সাদৃশ্য,ভাষা-বিন্যাস প্রভৃতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, এগুলির রচয়িতা একই কবি। এমন কি কয়েকটি বাক্য ও শ্লোক বিন্দুমাত্র রূপান্তর গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে, যথা—

"এবমার্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে, কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে; অঙ্গ, পশ্যামি।" এই অংশটি প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, চারুদত্ত, অবিমারক, প্রতিমা নাটক এবং কর্ণভার ব্যতীত অন্যান্য সকল নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার,

"ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

—হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরি যাহার কুণ্ডল স্বরূপ, যে মহীমণ্ডল সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আমাদের রাজা একচ্ছত্র অধিপতি রূপে তাহার সুশাসন করুন।—

এই ভরত বাক্য স্বপ্নবাসবদত্তা ও বালচরিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক ও অভিষেক নাটকে

"ভবন্ত্বরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

—সমগ্র পৃথিবী হইতে রাজসিক ভাব বিদূরিত হউক, শত্রুমণ্ডলী প্রশমিত হউক। আমাদের রাজা এই নিখিল ভুবন সম্যক শাসন করুন।—এই শ্লোকটির উল্লেখ আছে, এবং এই শ্লোকের দ্বিতীয়াংশটুকু পঞ্চরাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞা, পঞ্চরাত্র, প্রতিমা ও স্বপ্ন নাটকের মঙ্গল শ্লোকে নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রীগণের নামোল্লেখ আছে—

"উদয়নবেন্দু সবর্ণাবাসবদত্তা বলৌ বলস্য ত্বাম্।
পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্॥

—যাঁহার ভুজ যুগল উদয় কালীন নূতন চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় গৌরবর্ণ, যাঁহার ভুজ সুরাপানে অধিকতর বলদৃপ্ত, লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সুসমৃদ্ধ ও বসন্তের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় শ্রীসম্পন্ন সেই বলদেব তোমার রক্ষা বিধান করুন।" স্বপ্নবাসবদত্তা।

"পাতু বাসবদত্তায়ো মহাসেনোঽতি বীর্য্যবান্।
বৎস রাজস্তু নাম্না সশক্তির্যৌগন্ধরায়ণঃ॥"

—যিনি স্বয়ং বাসবের কল্যাণ বিধাতা, যিনি বিপুল সেনা-বলে বলীয়ান, যিনি শক্তিমান ও যুগনিয়ামক এবং যিনি রাজ-বৎসল সেই ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

নিম্নলিখিত শ্লোকটি চারুদত্ত ও বালচরিতের প্রথম অঙ্কে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ
অসৎ পুরুষ সেবেব দৃষ্টি র্নিষ্ফলতাং গতা॥"

—অন্ধকার লিপ্ত অঙ্গ,অঞ্জনবর্ষী (অন্ধকার ?) আকাশ ও অসৎ পুরুষের সেবার ন্যায় দৃষ্টি (?) নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে।"

—কি জানি বলেন এই চিন্তায় আমার হৃদয় শঙ্কিত হইতেছে।—

এই অংশটুকু স্বপ্ননাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে এবং অভিষেক নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রহিয়াছে।

"ধর্ম্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা"—ধর্ম্মানুসারে অন্যের স্নেহাধীন হইলে—এই কথাটিও প্রতিমা নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে এবং অভিষেক নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও অনেক শ্লোক বিভিন্ন নাটকে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, এই নাটকগুলি একই কবির রচিত। এখন ভাসই যে ইহাদের রচয়িতা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করা যাইবে।

আচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তকে আমরা স্বপ্নবাসবদত্তার নামোল্লেখ পাই। স্বপ্নবাসবদত্তা মহাকবি ভাস প্রণীত এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। রাজশেখর শুক্তিমুক্তাবলীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"ভাস নাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভুন্ন পাবকঃ॥"

—পরীক্ষার্থ ভাস-নাটকাবলী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও স্বপ্নবাসবদত্তা কখনও ভস্মীভুত হইবে না।

আবার এই সকল আবিষ্কৃত নাটকের প্রথমে নান্দী নাই। সাধারণতঃ নাটক নান্দী পাঠের পরে আরম্ভ হইয়া থাকে—"নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ।" কিন্তু এ সকল নাটক "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ"—এই বলিয়া আরব্ধ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ভট্ট বাণ ভাসের নাটক বর্ণনায় বলিয়াছেন—"সূত্রধার কৃতারম্ভৈঃ"—এই বিশেষণ ধরিয়া লইলেও এইগুলি যে ভাসের নাটক তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

আর 'স্বপ্ননাটক' স্বপ্নবাসবদত্তার সঙ্কুচিত আকার বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যইতে পারে। স্বপ্ন নাটকে বৎসরাজকর্ত্তৃক বাসবদত্তার স্বপ্নদর্শনই বর্ণিত আছে। ইত্যাদি কারণে এই লব্ধ নাটকগুলি ভাসপ্রণীত বলিয়াই স্থির হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়াছিলেন যে, স্বপ্নবাসবদত্তার কোন কোন অংশ কীট-দষ্ট হওয়ায় দুষ্পাঠ্য হইয়াছে, এবং চারুদত্ত ও কর্ণভার অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং তিনি এই সকল নাটকের পূর্ণ-কলেবর প্রতিলিপির উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে কৃতকার্য্যও হইলেন। মহীশূরের পণ্ডিত অনন্তাচার্য্যের নিকট তিন স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা নাটকের পূর্ণ প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত অনন্তাচার্য্য এই প্রতিলিপিগুলি কেরল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বপ্ননাটকের শেষে "স্বপ্নবাসবদত্তা সমাপ্তা"—এই কয়টি কথা লিখিত আছে। সুতরাং স্বপ্ননাটক ও স্বপ্নবাসবদত্তা যে অভিন্ন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতিজ্ঞা নাটকের অন্তেও প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ এই সম্পূর্ণ নামটি লিখিত রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ভাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভাস কালিদাসের পূর্ব্বের লোক। এখন কথা হইতেছে তিনি কালিদাসের কতকাল পূর্ব্বের লোক? কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে অবন্তীর বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণকে উদয়নের বৃত্তান্ত বর্ণনে পটু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"প্রাপ্যাবন্তীমুদয়ন কথা কোবিদগ্রামবৃদ্ধান্"। কিন্তু ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণ বাল্যকালে উদয়নকে দেখিয়াছিল, এবং তাহারা উদয়নের কথা সুন্দররূপে

বর্ণনা করিতে পারিত। এইরূপ অর্থ করিলে ভাসকে কালিদাসের অল্প পূর্ব্বের লোক বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে।

ভামহাচার্য্য ধ্বন্যালোক প্রণেতা আনন্দবর্দ্ধনের বহু পূর্ব্বের লোক। আনন্দবর্দ্ধন খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক। ভামহ তদীয় কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম অধিকরণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শরচ্ছশাঙ্ক গৌরেণ বাতাবিদ্ধেন ভাবিনি!
কাশপুষ্পলবেনেদং সাশ্রুপাতং মুখং মম॥"

—শরৎকালীন শশাঙ্কের ন্যায় গৌরবর্ণ বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের রেণু আমার চক্ষুকে অশ্রুময় করিয়াছে।

প্রতিজ্ঞা নাটক হইতে বহু অংশ ভামহের কাব্যালঙ্কারে স্থান লাভ করিয়াছে।

কথা এই যে, ভামহ কালিদাসের বহু পূর্ব্বের লোক, কারণ, ভামহ, মেধাবী, রামশর্ম্মা প্রভৃতি কবিও অশ্মকবংশ, রত্নাহরণ প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে কবি-সম্রাট কালিদাস বা তদীয় একটি কাব্য-রত্নেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার ভামহ 'যুক্তাযুক্ত বিচার' পরিচ্ছেদে মেঘমালাকে প্রেম-সন্দেশ-দূতত্বে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস বোধ হয় তাই আচার্য্য প্রবরের উপদেশ মনে করিয়া মেঘদূতের প্রথমে "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরূতাং' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যক্ষ যে মেঘকে দৌত্যে বরণ করিল ইহার সমর্থনাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

সুতরাং আমরা দেখিলাম ভামহ কালিদাসের বহু পূর্ব্বের লোক। আবার ভামহ বৎসরাজকে বহু প্রাচীনকালের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং "প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধান্' বাক্যদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, গ্রামবৃদ্ধগণ তাহাদেরই গ্রামের উদয়নের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে উৎসাহী, কারণ সাধারণতঃ বৃদ্ধগণ গল্পপ্রিয়।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, কালিদাস ভাসকে "প্রথিতযশা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি ভাস-নাটকগুলিকে বহুপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'

—পুরাতন হইলেই সমস্ত ভাল হয় না, আবার নূতন হইলেই সমস্ত নিন্দনীয় হয় না।—এই বাক্যাংশ হইতে ইহা বুঝা যায় যে, ভাস-কবির যশ ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া কালিদাসের সময় চরম শীর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। যদি ইহাই এই বাক্যাংশের অর্থ হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাস-কবি ও কালিদাস কবির মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভাস কালিদাসের বহু পূর্ব্বের লোক এবং উদয়ন তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব কালিদাসের অল্প পূর্ব্বে ভাসকে স্থাপিত করা সমীচীন নহে।

ভামহ তদীয় কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে কথা-বিচার উপলক্ষে "বৃহৎকথা"র উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু দণ্ডী তাঁহার "কাব্যাদর্শে" এই উপলক্ষে "বৃহৎকথা"র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভামহের সময়ে "বৃহৎকথা"র আবির্ভাব হয় নাই। ভামহের পরে গুণাঢ্য ইতিহাস, স্বপ্নবাসবদত্তা, কাব্যগ্রন্থ, লোক-কাহিনী (Folk-lore) প্রভৃতি হইতে এই সকল কৌতুকময়ী কথা সংগ্রহ করিয়া "বৃহৎকথা" নামে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গুণাঢ্য শালিবাহন বংশীয় (অন্ধ্র বংশীয়) হাল নৃপতির সমসাময়িক। হাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক; সুতরাং ভামহ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, সুতরাং ভাস ভামহের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে ভাসকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী (?) বলিয়া দেখা যায়। বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য বা কৌটিল্য) খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক, তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সমসাময়িক। চাণক্য তদীয় কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, এটি প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়—

"নবং শরাবং সলিলস্য পূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্
তৎ তস্য মা ভূন্নরকং চগচ্ছেদ্ যো ভর্ত্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন
যুধ্যেৎ।"

—যে ব্যক্তি অন্নদাতার জন্য যুদ্ধ না করে তাহার জলপূর্ণ শরাও সুসংস্কৃত দর্ভময় উত্তরীয় আর ঘটে না, এবং সে নিরয়গামী হইয়া থাকে।

এখন তর্ক হইতে পারে কোন গ্রন্থকার কাহার নিকট ঋণী? প্রথমতঃ, নিজের কথায় অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা হয় না, কৌটিল্য সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতেছেন, সুতরাং অন্যের কথা বলিয়া সৈন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাই স্বাভাবিক। উদ্ধৃত শ্লোকটি তৃতীয় সংখ্যক। প্রথম অংশটি (এস্থলে উদ্ধৃত হয় নাই) শ্রুতি স্থানীয় দ্বিতীয় শ্লোকটি (উদ্ধৃত হয় নাই) স্মৃতি স্থানীয়, সুতরাং তৃতীয়টি যে আর্থশাস্ত্রকারের ইহা বিশ্বাস্য নহে। আবার শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত অংশটির পরে কৌটিল্য "অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ" বলিয়া দুটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের হইলে এই কথা বলার তাৎপর্য্য কি? এখন কথা হইতে পারে উদ্ধৃত শ্লোকটি ভাসের নাও হইতে পারে। একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যেরূপ স্থলে এই শ্লোকটি প্রতিজ্ঞা নাটকে উল্লিখিত আছে সে স্থলে ছন্দ প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখিলে শ্লোকটি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করা যায় না। যশস্বী কবিগণ অন্যের শ্লোক সাধারণতঃ উদ্ধৃত করেন না, বিশেষতঃ নাটকাদি গ্রন্থে, এবং উদ্ধৃত করিলেও কোন না কোন প্রকারে বুঝাইয়া দেন শ্লোকটি পরকীয়, কিন্তু এস্থলে বিন্দু মাত্রও সেই রূপ ইঙ্গিত নাই।

প্রতিমা নাটকের পঞ্চমাঙ্কে মেধাতিথির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মেধাতিথি মনুর টীকাকার মেধাতিথি নহেন। তিনি মহর্ষি মেধাতিথি, কারণ ইঁহার নাম অন্যান্য ঋষিগণের নামের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা— মনু, মহেশ্বর, বৃহস্পতি, প্রচেতা। সুতরাং ভাস মনুর টীকাকার মেধাতিথির পরবর্ত্তী লোক নহেন।

এই সামান্য প্রবন্ধে ভাসের কবিত্বের সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রয়াস করা ধৃষ্টতা, বিশেষতঃ প্রবন্ধ লেখক এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, ভাসের কবিত্ব শক্তির আলোচনা লেখকের সাধ্যাতীত। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব, পাঠকগণ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

পদ্মাবতীর সহচরীগণ বাসবদত্তাকে বনপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। উদয়ন এ পথে আসিতেছেন। বাসবদত্তা মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন। যৌগন্ধরায়ণ বলিতেছেন—

"পূর্ব্বং ত্বয়াপ্যভিমতং গতমেব মাসী—
চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজয়েন ভর্ত্তুঃ।
কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা
চক্রারপংক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপংক্তিঃ॥

—এরূপ ভাবে এখানে আসা পূর্ব্বে আপনিও অনুমোদন করিয়াছেন, মহারাজের বিজয় লাভের পর আপনি আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবেন। চক্রনেমির ন্যায় জগতের কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যপংক্তিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা নাটকের এক স্থলে শ্রমের ফল অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করিবার জন্য কবি বলিতেছেন—

"কাষ্ঠাদগ্নির্জায়তে মথ্যমানাদ্।
ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি॥

সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং।
মার্গারব্ধাঃ সর্ব্বযত্নাঃ ফলন্তি॥

—ঘর্ষণ করিলে কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, খনিত হইলে মৃত্তিকা হইতে জল উঠিয়া থাকে, উৎসাহী মানবের অসাধ্য কিছুই নাই। যত্নের সহিত আরব্ধ চেষ্টার ফল-লাভ হইবেই হইবে।

মহাসেন বরের গুণ বর্ণনা করিতেছেন—

"কুলং তাবচ্ছ্লাঘ্যং প্রথমমভিকাঙ্ক্ষে হি মনসা
ততঃ সানুক্রোশং, মৃদুরপি গুণো হ্যেষ বলবান্।
ততো রূপে কান্তিং, ন খলু গুণতঃ স্ত্রীজন-ভয়াৎ
ততো বীর্য্যোদগ্রং নহি ন পরিপাল্যা যুবতয়ঃ॥

—আমি প্রথমতঃ বরের কুলই শ্লাঘ্য বলিয়া মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। তারপর স্নেহ,কারণ, স্নেহ মৃদুগুণ-সম্পন্ন হইলেও প্রভাবশালী। অতঃপর বরের রূপ-লাবণ্য আমার প্রার্থনীয়, মনে করিবেন না রাণীর ভয়ে আমি কান্তির পক্ষপাতী—কান্তিও একটি গুণ। সর্ব্বশেষে বরের পক্ষে আমার কামনার বস্তু উগ্রবীর্য্য, নতুবা রমণীকে রক্ষা করা যায় না।

কন্যার মাতার মানসিক অবস্থা বর্ণনটি কেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর—

"অদত্তেত্যাগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্ম্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ॥"

—কন্যা এখনও পাত্রস্থা হয় নাই ইহা ভাবিলে লজ্জা হয়। কন্যা পাত্রস্থা হইয়াছে ইহা ভাবিলেও মনে দুঃখ হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মানুরোধে কন্যা অন্যের স্নেহাধীন হইলেও ইহা জননীর ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে দোষ নাই—ভাগ্য সর্ব্বত্রই বলবান্—

"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ
কো বা ন সিধ্যতি মমেতি করোতি কার্য্যম্।
যত্নৈঃ শুভৈঃ পুরুষতা ভবতীহ নৃণাং
দৈবং বিধানমনুগচ্ছতি কার্য্যসিদ্ধিঃ॥"

—যত্ন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি না হইলে কি দোষ? এই কার্য্য আমার অবশ্য করিতে হইবে এই ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কার কার্য্য সিদ্ধি না হইয়া থাকে? বিশেষ রূপে চেষ্টা করিলে পুরুষকারের অনুরূপ ফল-লাভ হইবেই হইবে। কার্য্যসিদ্ধি দৈবের বিধান অনুসরণ করিয়া থাকে।

কালিদাস শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কের একটি সুন্দর শ্লোক ভাসের অনুকরণে লিখিয়াছেন—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি পয়ো যুষ্মাস্বপীতেষু যা
না দত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবং।
আদ্যে বঃ কুসুম-প্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম॥"

—তোমরা জলপান না করিলে যে প্রথম জল পান করিত না, ভূষণপ্রিয়া হইলেও তোমাদের প্রতি স্নেহ বশত যে পল্লব চয়ন করিত না, তোমাদের ফুল হওয়ার সময় হইলে সকলের আগে যার আনন্দ হইত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে তোমরা অনুমতি কর।

অভিষেক নাটকের এই শ্লোকটিও পাঠ করুন—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান্ নচ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমা
সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্॥'

—ভূষণপ্রিয়া হইলেও রাবণমহিষী মন্দোদরী যে অশোকবনের প্রতি স্নেহ বশত পল্লব চয়ন করিতেন না, সতত প্রবাহিত মলয়ানিলও ইন্দ্রজিতের ভয়ে যে বনে প্রবাহিত হইত না; যে বনের তরুণ বৃক্ষগুলি কখনও কর-স্পৃষ্ট হয় নাই, শক্র-শত্রু ইন্দ্রজিতের সেই সাধের অশোকবন আজ ভগ্ন এই কথা জানাইয়া দাও।

এই দুটি শ্লোকের যে ভাব-সাদৃশ্য আছে এমন নহে। 'প্রিয়মণ্ডনাপি', 'স্নেহাৎ', 'পল্লবান্', 'সেয়ং', প্রভৃতি মধুরপদগুলিও কালিদাস ভাস হইতে ধার লইয়াছেন।

আরও দেখুন—

"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধা কৃতা॥"

—চন্দ্রলেখা আকাশে ও সলিলে যেরূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে সেইরূপ বসুদেব-পত্নী দৈবকীর প্রাণটি সূতিকাগৃহে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে ও দেহখানি কারাগৃহের দিকে নীত হইতেছে।

কালিদাসের এই শ্লোকটি পড়ুন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

বায়ুর বীপরীত দিকে নীয়মান রেশমী পতাকার ন্যায় রাজার শরীরটি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু মনটি অস্থির হইয়া পশ্চাৎ দিকেই ধাবিত হইতেছে।

কালিদাসের—

"বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ॥"

—পশুসকল আশ্রমে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এই বিশ্বাসে কোলাহল শুনিয়াও পলাইতেছে না।—

মহাকবি ভাসের নিম্নোক্ত পংক্তিটির সামান্য রূপান্তরিত আকার—

"বিস্রব্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগত প্রত্যয়াঃ।"

—হরিণগুলি আশ্রমে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এইরূপ জাতবিশ্বাস বশত অচকিত ভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে।

সমান্তর ও সদৃশ শ্লোকাবলী সাবধানে পাঠ করিলে ঈদৃশ বহু শ্লোক কালিদাসের গ্রন্থ হইতে খুঁজিয়া লইতে পারা যাইবে। ভবভূতির গ্রন্থাবলীতেও ভাসের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। উত্তর রামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ীর কথাগুলি স্বপ্ন বাসবদত্তার প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারীর কথাগুলির ছায়া মাত্র।

মৃচ্ছকটিকের বহু শ্লোকের ভাষা ও ভাব চারুদত্ত নাটক হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে—

"যাসাং বলির্ভবতি মদ্‌গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিভক্তপুষ্পঃ।
তাস্বেব পূর্ব্ববলিরূঢ়যবাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ।"
চারুদত্ত—প্রথমাঙ্ক

—পূর্ব্বে আমার গৃহের বাড়ান্দায় হংস-সারস প্রভৃতি পক্ষী পুষ্পরাশি দুরীভূত করিয়া যে সকল সজ্জিত বলি খাইয়া ফেলিত সেই সকল বলি-শেষ হইতে উৎপন্ন যবাঙ্কুরে এখন কীটমুখভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি পতিত হইতেছে।—

মৃচ্ছকটিকের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির সহিত তুলনা করুন—

যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ।
তাস্বেব সংপ্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥

—পূর্ব্বে আমার গৃহের বাড়ান্দায় হংস সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল যে সকল বলি ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিত সেই সকল বলিশেষহইতে উৎপন্ন তৃণাঙ্কুরে কীটমুখভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি এখন পতিত হইতেছে।

আরও দেখুন—

"মার্জারঃ প্লবনে বৃকোঽপসরণে শ্যেনো গৃহালোকনে
নিদ্রা সুপ্তমনুষ্যবীর্য্যতুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ।
মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্‌ দেশ ভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটে চ তিমিরং বায়ুস্থলে নৌর্জলে॥"
(চারুদত্ত নাটক)

(তস্কর) উল্লম্ফনে মার্জ্জার, পলায়নে বৃক, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি অবলোকনে শ্যেন, সুপ্ত মনুষ্যের ক্ষমতা বিচারণে নিদ্রা, দ্রুতগমনে সর্প, শরীরের বর্ণাদি পরিবর্ত্তনে মায়া, বিভিন্নদেশের ভাষায় বাগ্মী, রাত্রিকালে প্রদীপ, সঙ্কটে তিমির, স্থলে বায়ু ও জলে নৌকা।

এবং

"মার্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গৃহালুঞ্চনে
সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা, সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপ শরীরবেশরচনে বাগ্‌ দেশ ভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটেষু ডুডুমো, বাজী স্থলে, নৌর্জলে॥"

(তস্কর) অতিক্রমে মার্জ্জার, পলায়নে মৃগ, গৃহাবলোকনে শ্যেন, সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্য নির্দ্ধারণে কুক্কুর, দ্রুত গমনে সর্প, বিভিন্নরূপ ও বর্ণ সজ্জায় মায়া, বিভিন্নদেশের ভাষায় বাগ্মী, রাত্রিকালে প্রদীপ, সঙ্কটকালে বৃক, স্থলে অশ্ব ও জলে নৌকা। (মৃচ্ছকটিক)।

চারুদত্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্কে—

"বিপদগ্রস্ত সর্ব্বাঙ্গী, সংভ্রমোৎফুল্ল লোচনা।
মৃগীব শরবিদ্ধাঙ্গী কম্পসে, চানুকম্পসে॥"

—বিপদে তোমার সর্ব্বশরীর শিথিল, প্রেমাবেগে লোচন যুগল উৎফুল্ল, সুতরাং শরবিদ্ধ মৃগীরন্যায় কম্পান্বিত কলেবর, আবার চক্ষু দুটিতে অনুকম্পা-কটাক্ষ।

এবং মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে—

"বিষাদগ্রস্ত সর্ব্বাঙ্গী সংভ্রম ভ্রান্ত লোচনা।
নীয়মানা ভুজিষ্যাত্বং, কম্পসে নানুকম্পসে॥"

—ওগো বারবিলাসিনি, তোমাকে লইয়া যাইতেছে বলিয়া বিপদে তোমার সর্ব্বশরীর শিথিল কিন্তু প্রেমাবেগে লোচনযুগল চঞ্চল, তুমি কম্পিত হইতেছ আবার কম্পিত হইতেছও না।

এরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক ভাসকৃত চারুদত্ত নাটকের এক নূতন সংস্করণ মাত্র। বস্তুতঃ শূদ্রক ভাসের চারুদত্ত অবলম্বন করিয়াই মৃচ্ছকটিক লিখিয়াছিলেন। শূদ্রক যে ভাসের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকে নাট্যকারের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু 'চারুদত্তে' এরূপ কোনও প্রস্তাবনা নাই। বাস্তবিক পরবর্ত্তী যুগেই প্রস্তাবনায় নাট্যকারের নাম ও নাট্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মৃচ্ছকটিককে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে বিষম ভুল করা হইবে। তবে কবি শূদ্রক যে বহু রসাত্মক শ্লোকাদি মৃচ্ছকটিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানিকে নূতন ভাবে সাজাইয়াছেন ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। কবি শূদ্রক কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কি না বলা যায় না, তবে তিনি যে, বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তিতে শূদ্রকের উল্লেখ আছে—"শূদ্রকাদি রচিতেষু প্রবন্ধেষু ভূয়ান প্রপঞ্চো দৃশ্যতে।"

মহাকবি ভাসের কবিত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। ভাস-নাটক যেমন প্রাচীন তেমনই গুণবহুল। ভাসের ভাব-প্রকাশ-কৌশল অতুলনীয়, ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর, মনোমুগ্ধকর, ধীর-গম্ভীর ও উদ্দাহী। ফলতঃ এইরূপ ভাষা অন্যূন সহস্র বৎসরের প্রাচীন পুস্তকে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্ম বর্ণনায় ভাস সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া কবি ভাস রস-বর্ণনায় অপটু নহেন, এবং বাগ্‌বাহুল্য ভাস-নাটকে আদৌ স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

মনের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করার জন্য যেখানে যে কথাটির প্রয়োগ দরকার ভাস ঠিক তাহাই করিয়াছেন, তাঁহার নাটকে একটিও বাহুল্য-কথা নাই, এবং অর্থ-প্রতিপত্তির জন্য যে কথাটির দরকার ঠিক সেই কথাটিরই প্রয়োগ রহিয়াছে নিঃশ্বাস বায়ুর ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে নাটকগুলি ভাসের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে—কোনও স্থলে একটু অস্বাভাবিকত্ব বা কৃত্রিম সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, ছন্দ-লালিত্যে ও পদ-বিন্যাসে ভাস-নাটক ঋষি-সূক্তির ন্যায় চিত্তোল্লাসী।

নবাবিষ্কৃত ভাস নাটকের সাহায্যে এক ঐতিহাসিক সত্য অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী মগধ রাজের নাম লইয়া এত দিন বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং অনেকে উদয়কেই অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভাসপ্রণীত স্বপ্ন নাটকে দেখিতে পাই মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের পরিণীতা মহিষী, এবং দর্শকের পরে উদয় মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং উদয়ের সময়েই রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

আবার স্বপ্ননাটকের ভরত বাক্য হইতে তৎকালীন সাম্রাজ্য-সীমার উপলব্ধি হয়। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে সাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও উত্তর দক্ষিণে-হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরির পাদমূল্য পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই হিসাবে দেখা যায় ভাস চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের মধ্যবর্ত্তী কারণ, অশোকের রাজ্য সীমা- বিন্ধ্য গিরি লঙ্ঘন করিয়াছিল।

ভাস-প্রণীত দূত ঘটোৎকচ উরুভঙ্গ প্রভৃতি নাটক মহাভারতের ঘটনাবলী লইয়া রচিত। অনেকে মনে করেন মহাভারত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দী ও খ্রীষ্টিয় পঞ্চ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছে। যদি ভাসকে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ভাস প্রায় খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক হইয়া দাঁড়ান। তাহা হইলে যাঁহারা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দী মহাভারতের রচনা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের মতবাদ অনেকটা অসার হইয়া পড়ে।

আশা করি বর্ত্তমান সময়ে কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি ভাস-দত্ত উপাদানের বলে ইতিহাসের এই সকল জটিল সমস্যার বিচার-ভার গ্রহণ করিবেন।

ভাসের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সার।

১। স্বপ্নবাসবদত্তা—বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনী-পতি মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। পরে প্রণষ্ট-রাজ্য উদয়নের পক্ষে সিদ্ধাদেশ হয় যে, মগধ-রাজ-দুহিতা পদ্মাবতীর সহিত রাজার পরিণয় হইলে তিনি পুনরায় রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিবেন। সুতরাং প্রভুভক্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রচার করিয়া দেন যে, গ্রাম-দাহে রাণী বাসবদত্তা পুড়িয়া মরিয়াছেন এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও রাণীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এদিকে যৌগন্ধরায়ণ মহিষীকে স্বীয় ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া ও স্বয়ং ব্রহ্মচারী সাজিয়া মহিষী বাসবদত্তাকে মগধ-রাজ-ভগিনী পদ্মাবতীর নিকট ন্যাস স্বরূপ রাখিয়া যান। পরিশেষে পদ্মাবতীর সহিত রাজার পরিণয় হয় এবং লব্ধ-গৌরব উদয়নের সহিত রাণী বাসবদত্তারও মিলন ঘটে। এই নাটকে কবি পদ্মাবতী-চরিত্রকে অতি উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন।

২। প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ—বৎসরাজ এক দিন গজ-মৃগয়া করিতে নাগবনে গিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী-পতি প্রদ্যোত তাঁহার হস্তে স্বীয় তনয়াকে দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। একদিন দৈবক্রমে উদয়নের সহিত রাজকুমারীর দেখা হয়, এবং ফলে উভয়ের প্রণয় সঞ্চার হয়। এদিকে বৎসরাজ-মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সহিত রাজাকে স্বকীয় রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বকীয় বহুলোক উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করেন। তাহারা ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে ও নগরে বাস করিতে থাকে এবং মন্ত্রী স্বয়ং উন্মত্ত বেশে উজ্জয়িনীতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া একদিন রাজা উদয়ন রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এদিকে যৌগন্ধরায়ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লোকজন সহ বন্দী হন। কিন্তু উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেন মন্ত্রীর নীতি-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে পরিতুষ্ট এবং স্বকীয় দুহিতার অনুরূপ বরলাভে প্রীত হইয়া যৌগন্ধরায়ণকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এবং কৌশাম্বী নগরে সসম্মানে পাঠাইয়া দেন।

৩। বাল চরিত—ইহাতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কংসগৃহে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। কংসভয়ে ভীত বসুদেব যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দগোপ হস্তে কৃষ্ণকে প্রদান করেন ও যশোদার কন্যাকে লইয়া আসিয়া ইহাকেই স্বীয় সন্তান বলিয়া কংসের বিশ্বাস উৎপাদন করেন।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে কৃষ্ণের গোপালয়ে বাস, পুতনা বধ,

শকট দানব নিধন, যমলার্জ্জুন কথা, কালীয় দমন, কংস-বধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

৪। পঞ্চরাত্র—যজ্ঞাবসানে দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণকে দক্ষিণা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে আচার্য্য বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবদিগকে অৰ্দ্ধরাজ্য ফিরাইয়া দাও, ইহাই আমার দক্ষিণা।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "যদি পঞ্চ-রাত্রির মধ্যে অজ্ঞাতবাসকারী যুধিষ্ঠিরাদির কোন সংবাদ আইসে তবেই ধর্ম্মরাজকে অৰ্দ্ধরাজ্য দিব।" তৎপরে দুর্য্যোধনের গোগৃহ-যাত্রা, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন কর্তৃক কুরু সৈন্যের পরাজয়, বিরাট-গৃহে যুধিষ্ঠিরাদির আত্মপ্রকাশ এবং বিরাট রাজকন্যা উত্তরাকে পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিমন্যুর সহিত উত্তরার পরিণয় কার্য্য বিরাট গৃহে হইবে অথবা হস্তিনায় হইবে।" শকুনি বলিয়া উঠিল, "সেই খানে, সেই খানে।" দ্রোণ বলিলেন, "দুর্য্যোধন, পঞ্চরাত্র এখনও শেষ হয় নাই, যুধিষ্ঠিরাদির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অতএব স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অৰ্দ্ধরাজ্য প্রদান কর।" দুর্য্যোধন অৰ্দ্ধরাজ্য দিতে স্বীকার করিলেন এবং সকলে প্রসন্ন হইলেন।

[এখানে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত এক আশ্চর্য্য বিরোধ দৃষ্ট হয়।]

৫। অবিমারক—সৌবির রাজকুমার অবি-মারক ঋষিশাপে চণ্ডালরূপ প্রাপ্ত হইয়া পিতার সহিত কুন্তিভোজনগরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি স্বীয় মাতুল রাজা কুন্তিভোজের কন্যাকে মত্তহস্তীর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। পরে উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রেমের সঞ্চার হয় ও বিচ্ছেদ ঘটে। পরিশেষে আবার সংগোপনে উভয়ের মিলন হয়। শাপাবসানে নারদ সকলের পরিচয় প্রদান করেন।

৬। মধ্যম ব্যায়োগ—(১অঙ্ক) ভীমসেন এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে ঘটোৎকচের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

৭। দূতবাক্য—পাণ্ডবের দূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের সভায় গমন করেন। ইহাই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়।

৮। দূতঘটোৎকচ—অভিমন্যুর মৃত্যুতে দুঃখিত শ্রীকৃষ্ণ ঘটোৎকচকে দূতস্বরূপ যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রেরণ করেন।

৯ কর্ণভার—কর্ণ ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করেন।

১০। উরুভঙ্গ—গদাযুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হয়।

১১। চারুদত্ত—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক চারু-দত্তের রূপান্তর মাত্র।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

—

আলোচনা

ময়নামতির গান

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস মহাশয় প্রতিভা চৈত্র সংখ্যায় ভবানী দাসের ময়নামতির গান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, আমি এখানে একটিমাত্র বক্তব্য বলিয়া তাঁহাদের আলোচনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব—অন্যান্য কথা ময়নামতির গানের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ভূমিকা সত্বরই প্রকাশিত হইবে। বক্তব্যটি এই যে, দুইখানা পুথির পাঠ মিলাইয়া ময়নামতির গানের পাঠোদ্ধার হইয়াছিল। পাঠোদ্ধার কার্য্য সম্পূর্ণ বৈকুণ্ঠ বাবু করিয়াছেন আমার তাহাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। সম্পাদন কার্য্য সম্পূর্ণ আমি করিয়াছি, তাহাতে যাহা দোষ ত্রুটী হইয়াছে তাহাতে বৈকুণ্ঠ বাবুর কিছুমাত্র হাত নাই। সম্পাদন সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহায্য না পাওয়ায় বৈকুণ্ঠ বাবুর উদ্ধৃত পাঠ লইয়া সময় সময় কিছু গোলমালে পড়িতে হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ বাবুর বাস গ্রাম কুমিল্লা ময়নামতি পাহাড়ের প্রায় সংলগ্ন। আমি কিছুদিন কুমিল্লায় প্রবাসীমাত্র ছিলাম কাজেই সম্পাদনে বৈকুণ্ঠ বাবুর সান্নিধ্য পাইলে সম্পাদন সম্পূর্ণাঙ্গ হইত। এখন মোহিনী বাবু ও আবদুল করিম মহাশয়দ্বয়ের আলোচিত অংশগুলির পুনরালোচনা করা যাউক।

(১) "শঙ্খছড়ামাটি"কে আমি শঙ্খবসান গৃহতল অর্থে নিয়াছি আলোচক দ্বয় তাহাকে শঙ্খচাইল নামক গ্রামের নাম বলিয়া বুঝিতে চাহেন। যাহারা ভৌগোলিক নামগুলির প্রাচীন কাল হইতে ক্রম পরিবর্ত্তনের কিছুমাত্র খবর রাখেন তাহারা "শঙ্খে" "শঙ্খে" মিল দেখিয়া কখনই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন না। শঙ্খচাইল ময়নামতির পাহাড় হইতে কতদূর? শঙ্খচাইল নামে একটা গ্রাম কুমিল্লা জেলার সীমার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াই অমনি মানিকচান্দের বাড়ী পাইয়াছেন বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠা সমীচীন হয় নাই। ময়নামতির মূড়া হইতে স্ত্রীলোকের এক দৌড়ের পথ যদি শঙ্খছড়া নামে কোন গ্রাম মূড়ার আধ মাইলের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তবেই মোহিনী বাবু তাহাকে মানিকচান্দের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেন। যেখানে শঙ্খছড়া শব্দটি আছে সেই কয়টি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি:

> তোর বাপের ঘর ছিল সঙ্কছড়া মাটি
> তাহাতে বিছাইল পুনি গঙ্গাজল পাটি।

"পুনি" শব্দটির মানে আশা করি সমালোচকদ্বয় জানেন। তাহা জানিয়াও এরূপ অসাবধানতার পরিচয় দেওয়া বিস্ময়ের বিষয়। ময়নামতি স্বামী মানিকচন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন তাই তাহাকে মহা সমাদর করিয়া বসাইতেছেন। গৃহতল শঙ্খবসান তাহাই যথেষ্ট শীতল ও মসৃণ ছিল—তাহার উপরেও রাজার মন ভুলাইবার জন্য ময়নামতি গঙ্গাজল নামক বিখ্যাত শীতল পাটি বিছাইয়াছিলেন। এই হইতেছে এই লাইন দুইটির সোজা অর্থ। এই বিষয়ে আর অধিক লিখা বাহুল্য বিবেচনা করি। একটু চিন্তা করিলেই আলোচক মহাশয় দ্বয় আমার অর্থ সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। ময়নামতি ও মানিকচান্দের যে ভিন্ন বাড়ী ছিল তাহা ঠিকই, কিন্তু সে দাম্পত্য জীবনের শেষ অবস্থায়। শেষ অবস্থায় ময়নামতি তাহার জপতপ সাধনা লইয়া পৃথক ভাবে বাস করিতেন। তাহার প্রমাণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। কনিকা বা কলিকানগরকে কলিকা পুর বলিয়া স্থির করাও বোধ হয় ঠিক হয় নাই। কলিকাপুরে কি ময়নামতির বাড়ীর চিহ্ন আছে না ময়নামতির স্মৃতি সংশ্লিষ্ট অন্য কিছু আছে? আমাদের মতে বর্ত্তমানে ময়নামতির টিলা বলিয়া পরিচিত স্থানটিই প্রাচীন কালের কলিকানগর ছিল।

(২) বাসর শব্দের দুই অর্থ—কেলিগৃহ ও দিবস। যে কোন অভিধানে এই অর্থ আছে—

অবশ্য মরিবা তুমি আমরার বাসরে
সপ্তদিনের বাসি মরা করিব তোমারে।

এইখানে বাসর শব্দের অর্থ "আমাদের দিনে" "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে"—ইহা ছাড়া অন্য অর্থ অসম্ভব।

সাচা নি আসিব যম বাড়ির ভিতর
তবে লোহাএ বান্ধিব পুনি আমার বাসর।

এখানে বাসর অর্থ কেলিগৃহ—লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসর স্মরণ করুন। এরূপ সামান্য সামান্য শব্দের প্রকৃত মানে ত পড়িবা মাত্রই বুঝা যায়—তাহা নিয়া করিম সাহেবের মত আজীবন প্রাচীন সাহিত্যের আলোচক কেন যে গোলমালে পড়িয়াছেন তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

(৩) তরাজু মানে প্রকৃতই নিক্তি—আমার "ছুঁড়ি" মানে ভুল হইয়াছে—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

(৪) "জৈতা" শব্দটি সংস্কৃত "জতু" শব্দ হইতে আসিয়াছে। জতু মানে লাক্ষা—এই জতু দিয়াই পাণ্ডবদের দাহের নিমিত্ত ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। জতু শব্দ ভাষায় "জৈতা" হইয়া সহজদাহ্য পদার্থ মাত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। জৈতা শব্দটির পাকাটি অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে। পাকাটির আটনি ও পাকাটির ছাউনি আলবান্ধা ঘর যাঁহারা দেখিতে চাহেন তাঁহারা একবার ঢাকা জেলার পানের বরোজগুলি দেখিয়া যাইবেন।

(৫) চারিবর্ণ লাগিল খণার কারবার
ভাঙ্গ খাই সিদ্ধাএ লাগিল ঢুলিবার।

এখানে বর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কি না আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আলোচক দ্বয়ের এই জিজ্ঞাসা "আজগুবি" ও "হাস্যকর" বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রশ্ন পাইলে যাহারা তাহার উত্তর দিবার অধিকারী তাহারা স্থির মস্তিষ্কে তাহাই দিতে চেষ্টা করেন। আলোচক মহাশয়দ্বয় বৈশ্য (?) গোপীচান্দের বাড়ীতে চারি বর্ণ কাজ করিতে আসিবে কেন তাহা ভাবিয়া না পাইয়া এক লিপিকর প্রমাদের ধুয়া ধরিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইত যে, "চরিবর্ণ" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ যে হাড়িফার জন্য বসুমতী খাট পাতিয়া দেয় এবং যমের পুত্র মেঘনাল ছত্র ধরে তাহার অধীনে চারিবর্ণ খাটিবে তাহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। একাদশ শতাব্দীর ঘোর তান্ত্রিকতা ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের মহাবিপ্লবের দিনে তাহা খুবই সম্ভব ছিল। তাহার জন্য লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; আর তিন স্থানে প্রাপ্ত তিনখানা পুস্তকে যে শব্দ পরিষ্কার রূপে বর্ণ বলিয়া লেখা আছে তাহাকে লিপিকর প্রমাদ বলা দুঃসাহসিকতা।

(৬) যশী শব্দের মানে আমি যশস্বী করিয়াছিলাম এবং তাহাই সঙ্গত ও পাঠমাত্র বোধ্য মানে। আলোচকদ্বয় এখানেও লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়া যশী মানে জ্যোতিষী করিতে চান। প্রাচীন পুস্তকের আলোচনায় কল্পনাকে আর একটু খাট করা ভাল—বন্ধুজনের অনুরোধ। আলোচক দ্বয়ের মন্তব্য "পাঞ্জি দেখিয়া হাতে খড়ি লইয়া গণনা করা গণকের কর্ম্ম, যশস্বীর তাহাতে কোন হাত নাই।" অদ্ভুত মন্তব্য আমিও আলোচকদ্বয়ের ভাষায় বলিতে পারি "হাস্যকর ও আজগুবি।" গণক শুধু কি যশস্বী হইতে পারে না? যশস্বী গণককে শুধু তাহার বিশেষণটি দ্বারা উল্লেখ করিলেই কি অপরাধ হয়?

(৭) আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে এক যায়গাতে শিঙ্গাতে ফু দিবার পুর্ব্বে ধর ধর উচ্চারণ করিয়া, অন্য যায়গায় যশ যশ উচ্চারণ করিয়া এবং অন্য আর এক যায়গায় ধর্ম্ম ধর্ম্ম উচ্চারণ করিয়া সিঙ্গাতে ফু দেওয়া হইয়াছে। আলোচক দ্বয়ের প্রাপ্ত পুস্তকে ধোও ধোও করিয়া ফু দেওয়া হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের ধোও ধোওই শুদ্ধ আর অন্য সমস্তগুলিই লিপিকর প্রমাদ এমন বায়না যদি তাঁহারা ধরেন তবে আমি নাচার।

(৮) "ঘিরি" শব্দটী (আমার পুস্তকে "ঘিরি" আছে আলোচক দ্বয়ের পুস্তকে "গিরি" আছে—গিরি ঘিরিরই পূর্ব্ববঙ্গীয় সংস্করণ বলিয়া বোধ হয়) ঘরণী মানে করিয়াছি, তাহা না কি হাস্যজনক। স্থানটির অর্থ এই—মানিকচান্দ বলিয়াছিল, ময়নামতি তুমি আমার স্ত্রী—আমার অধীনে থাকিবে—আমি কি তোমার ঘরের ঘরণী যে আমার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে পাইবে!

(৯ "চারি বধূর দুগ্ধ খাইয়া" কথাটি যে একটি মিষ্টি মধুর রকমের হাস্য উপহাস তাহা বোধ হয় অস্ত্র চিকিৎসা বিনাও বুঝা যায়। সন্ন্যাসের নিয়ম এই যে, স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ময়নামতি সটান একাদশ দ্বাদশ বৎসরের বালিকাগণের মাই চক্ চক করিয়া পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গোপীচাঁদকে সন্ন্যাস যাত্রায় গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতেছেন এরূপ কল্পনা কি করিয়া অলোচক দ্বয়ের মনে স্থান পাইল? তাহারা আবার সুধীগণকে একথা গম্ভীর ভাবে বিচার করিতে আহ্বান করিয়াছেন! সুধীগণ হাসিয়া খুন হইয়া গেলে লেখক দ্বয় যে খুনের দায়ে পড়িবেন!

(১০) কেন্দা কি কেঙ্গা আসল পুথিতে আছে তাহার মীমাংসা করিতে এখন পারিলাম না, কারণ পুথিগুলি হাতের কাছে নাই। কিন্তু আলোচকদ্বয়ের উদ্ভিদ তত্ত্ব বিচারে একটু ভুল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ কেয়া বা কেতকী গাছের ফল কাঁঠালের মত নহে। লেটোন নামক এক প্রকার কচু জাতীয় কাঁটাসঙ্কুল গাছের ফলই কাঁঠালের মত— লেটোন গ্রাম্যবালিকাগণ মাটির ভাত মাটির ব্যঞ্জন রাধিয়া খেলা করিতে মাছ স্বরূপ ব্যবহার করে। লেটোনের ফলকে কেয়া কাঁঠাল বলে, এবং তাহা ঠিকই অখাদ্য।

(১১) "আপন সুক্য" বলিয়া যে কথাটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মূলে "আগল সুক্য" বলিয়া ছিল—ছাপা খানার ভূত উহার রূপান্তর ঘটাইয়াছে। "আগল সুক্য" মানে আমি করিয়াছি—"অলক্ষ্মী—যে আপনার সুখ আগে দেখে।" ইহা আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে করি।

সর্ব্বশেষে—"তরাজু" এবং "সর্ব্বজএ" কথা দুটির ঠিক মানে এবং "সর্ব্বজএ" কথাটির ঠিক বানান ধরিয়া দিবার জন্য আলোচকদ্বয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টশালী।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ আষাঢ় ১৩২১ ৩য় সংখ্যা

বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ *

একটী জাতির উন্নতি সংসাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথমতঃ, বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের (Eugenics) সাহায্যে এরূপ সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে জাতির মধ্যে উত্তরোত্তর সুযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং অযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Envionment) এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দক্ষতার উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমোক্ত উপায়টী সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের মূলভিত্তি বংশক্রমের নিয়মের (Law of Heredity) উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। বংশক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে এখনও বাদানুবাদ আছে বটে কিন্তু স্থূলতঃ নিম্নলিখিত কথাটী অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সুস্থ, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোকের বংশেই সচরাচর সুস্থ, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোক জন্মিয়া থাকে, এবং কয়েকটী পীড়াবিশেষ দ্বারা আক্রান্ত, নির্ব্বোধ ও চরিত্রহীন লোকের বংশে প্রায়ই তদনুরূপ লোক জন্মিয়া থাকে। এখন সমাজ যদি আপনার হিত আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শেষোক্ত অযোগ্য লোকগণ যথাসম্ভব অল্পসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত যোগ্য ব্যক্তিগণ যথা সম্ভব অধিকসংখ্যক সন্তান জন্মাইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে, বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনই (Selection through marriage) বংশোৎকর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কয়েকটী ষ্টেটে (state) বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের অনুমোদিত কয়েকটী আইন প্রণীত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি প্রশংসাপত্র লইতে হয় যে, তাহাদের কোনও কঠিন রোগ নাই, বুদ্ধির ও চরিত্রের কোনও বিশেষ দোষ নাই, এবং তাহারা সন্তান পালনে সক্ষম। ইহাদ্বারা সমাজের মহোপকার সাধিত হইবে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আমেরিকায় উন্মাদাদি রোগ, মদ্যপান এবং নানারূপ অপরাধীর সম্বন্ধে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্বাস্য সেন্সস বিবরণ (Census) সংগৃহীত হয় আমাদের দেশে সেরূপ হয় না। এই সেন্সস বিবরণ হইতে আমেরিকানেরা

* কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

জানিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের দেশে উন্মাদ এবং একেবারে বুদ্ধিহীন (imbecile) লোক এবং যে সকল লোকের চরিত্রে এমন বিষম ত্রুটি আছে যে, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ লোকের (habitual criminals) সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে ; এত আইন কানুন, এত স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা, এত শিক্ষা বিস্তার কিছুতেই ইহার প্রতীকার হইতেছে না। এখন তাহারা সমাজের এই বিষম রোগের এক বিষ-বড়ীর ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহারা চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই প্রকৃতির অযোগ্য লোকেরা বিবাহদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে। কেন না ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, চরিত্রের এবং বুদ্ধির সকল মৌলিক দোষ (innate defects) বংশানুক্রমে পিতা মাতা হইতে সন্তানে সংক্রামিত হয়।

এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে কিন্তু সে দেশে মহা আন্দোলন চলিতেছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে কোনও প্রাচীন লোক পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্বাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ করেন না। অপরিণতবুদ্ধি যুবক ও যুবতীগণ আপনাদের স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়া থাকে—কাজেই তাহারা গবর্ণমেণ্টের এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত আইনটিকে একটা জুলুম বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

আমাদের দেশে প্রাচীন অভিভাবকগণ নানাদিক বিবেচনা করিয়াই পাত্র-পাত্রী ঠিক করিয়া দেন কাজেই ওরূপ একটা আইনের বিরুদ্ধে এদেশে তেমন আন্দোলন হইবার কথা নহে। তবে অনেকে সামাজিক কোনও বিষয়ে সরকারী আইন মাত্রেই অন্যায্য বিবেচনা করেন,সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ইতিহাসে দেখা যায় হিন্দু রাজগণ বিবাহাদি অনেক সামাজিক ব্যাপারেও আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রাচীনকালের রাজাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেদিন পর্য্যন্ত পেশোয়াগণ সমাজ-সংস্কার কার্য্যে রাজশক্তির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। * কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কোনও আইন করিতে স্বভাবতঃই ভয় পান, কেন না লোকে মনে করিতে পারে যে, তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

মুসলমান আমলে, হিন্দুরাজার অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি রূপে অনেক সামাজিক আইন চালাইয়া ছিলেন। সেই সকল আমলের জোরেই হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছে। না হইলে সমস্ত বাংলা দেশ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিত।

কিছুকাল হইতে দেশে আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি এমন নূতন ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তজ্জন্য সম্প্রতি হিন্দুসমাজের আইনগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন করিবে কে ? বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণগণের আর সেরূপ আধিপত্য নাই। কাজেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণ বণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রবীণ ও বিদ্বান লোকগণ সমবেত হইয়া যদি একটী মহতী সভা আহ্বান করেন তাহা হইলে সেই সভা কালোপযোগী অথচ ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন পূর্ব্বক হিন্দুজাতির উন্নতি সত্বর সংসাধিত করিতে পারেন। তবে আমাদের বর্ত্তমান আলস্য-বিজড়িত সমাজদেহে অতটা শক্তি আছে কি না তদ্বিষয়ে বিষম সন্দেহ আছে।

যাহা হউক সমবেত ও বিধিবদ্ধ ভাবে না হইলেও সমাজ-সংস্কারদ্বারা সমাজরক্ষার চেষ্টা যে মাঝে মাঝে দেখা যায় না এমত নহে। যাহারা এই সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের কার্য্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় (১) পুরাতন শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাঁহারা তাহারই অনুসরণ করিতে চান. দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ব্যবস্থার পার্থক্য হওয়া উচিত তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন। কিম্বা (২) কেহ কেহ ইউরোপীয় গণের অন্ধ অনুকরণ করিতে থাকেন—ভারত-

বর্ষ ইউরোপ নহে ইহা তাঁহারা ভাবেন না। (৩) কেহ কেহ হয়ত কেবল মাত্র দয়াদ্বারা প্রণোদিত হইয়া অথবা ন্যায়ের (justice) প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু সমাজ এমনই একটী জটিল সমস্যা যে কেবল মাত্র ভাবুকতায় তাহার বিশেষ কোনও উপকার করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মত সহিষ্ণু ও সাবধান ভাবে সমাজের উপর নানা অবস্থার ও ব্যবস্থার ঘাত প্রতিঘাত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে পরীক্ষা স্বরূপে সমাজের (experimentally) উপর নূতন নূতন ব্যবস্থার ফলাফল কিরূপ হয় তাহা দেখিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ আমেরিকা ও জর্ম্মাণীতে পদার্থবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক বিষয় সকল অধ্যয়ন করিবার জন্যও সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) নামে একটী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত কত দিনে হইবে বলা কঠিন। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান এই সমাজ বিজ্ঞানের একটী প্রধান শাখা।

কয়েক বৎসর হইতে আমি বিশেষভাবে হিন্দুসমাজের সম্পর্কে বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের মূল ব্যবস্থাগুলি বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু পরে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অনেক প্রথা সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ,কায়স্থ প্রভৃতি জাতিগুলি এত উপজাতিতে (subcastes) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রীর অসদ্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু বিবাহে কিরূপ ভাবে পাত্রী ও পাত্র নির্ব্বাচন করিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইবে তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে কেবল এই সম্পর্কে একটা কথা বলিতে চাই। বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ হইলেও আপাততঃ কিছুকাল গবেষণাদ্বারা ইহার আবিষ্কৃত সত্যগুলি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত করা প্রয়োজন। কিন্তু সে কার্য্যের জন্য আমরা কি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর নির্ভর করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? আমরা আমাদের সমাজের বিষয় অধ্যয়ন করিয়া কি নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে পারিব না? বিশেষতঃ এই কার্য্যের জন্য হিন্দুসমাজের যে সুবিধা রহিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের তাহা নাই। প্রথমতঃ, আমাদের কুলগ্রন্থ প্রভৃতি বংশবিবরণ থাকায় আত্মীয়-স্বজনগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখার জন্য অনেক খবর পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহসম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার যেরূপ শক্তি আমাদের আছে তাহাদের তাহা নাই, কেন না সেখানে অভিভাবকগণ আপনাদের বিবেচনা অনুসারে পাত্রপাত্রীকে বিবাহবদ্ধ করিতে পারেন না। এখন একটা বিষয় মীমাংসা করিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কয়েক পুরুষ বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান পাত্রের সহিত বুদ্ধিমতী ও চরিত্রবতী পাত্রীর মিলন সাধন করিলে সে বংশে লোকোত্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ—দার্শনিক নিজ (Nietzsch) যাহাদিগকে প্রতিভাশালী (great geniuses বা Supermen) নামে অভিহিত করিয়াছেন সেইরূপ ব্যক্তিগণ জন্মিবে কি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন যদি প্রাচীন নবদ্বীপে আগমবাগীশ মহাশয়ের পুত্রের সহিত চৈতন্যদেবের কন্যার বিবাহ হইত, এবং এই বিবাহে যে কন্যা উৎপন্ন হইত তাহার সহিত নিত্যানন্দের পুত্রের বিবাহ হইত, তাহা হইলে সেই বিবাহের সন্তানগণ প্রতিভাশালী (Supermen) হইত কি না। ইহা মীমাংসা করিবার প্রধান উপায় বর্ত্তমান কালে একটী সামাজিক পরীক্ষা (social experiment) করিয়া দেখা ঐরূপ বিবাহের ফল কিরূপ হয়। ঐরূপ পরীক্ষা সম্পাদন করিবার শক্তি পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজের অধিক আছে। কি উপায়ে সমাজে প্রতিভাবান লোক (আমি "genius" এর কথা বলিতেছি,

বুদ্ধিমান বা "talented" লোকের কথা বলিতেছি না) উৎপন্ন করা যায় তাহা যদি আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গকে শিখাইতে পারি, সেটা কি আমাদের কম গৌরবের বিষয় হইবে? দুঃখের বিষয় বংশোৎকর্ষবিজ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে এ দেশে যথাযথ ধারণা না থাকায় কোনও ব্যক্তি সামাজিক বিষয় লইয়া পর্যাবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে হইলে কাহারও নিকট আশানুরূপ সাহায্য না পাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন।

আর একটা কথার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সন্ন্যাস বা চিরকৌমার্য্যের সহিত বিবাহের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে তুলনা করিয়া দেখা যাক। এক জন চিরকুমার যেরূপ সমাজের উপকারার্থে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন এক জন বিবাহিত লোকে সেরূপ পারেন না; কেন না তাহাকে স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন জন্য অনেকটা শক্তি ব্যয়িত করিতে হয়। সে দিন এনসাইক্লপিডিয়াতে (Encyclopaedia Biritannicaতে) খৃষ্টান মিশনারিগণের বিবরণ পড়িতেছিলাম। তাহাতে দেখিলাম শিক্ষাপ্রচার, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি মিশনের কাজ প্রায় অর্দ্ধেক রোমান ক্যাথলিক পাদরিগণ করিতেছেন, তাঁহারা অবিবাহিত। অর্দ্ধেক কাজ করিতেছেন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরিগণ, তাঁহাদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিলেও অর্দ্ধেকের অধিক অবিবাহিত। ইহাতেই বুঝা যায় বিবাহিত লোকের পক্ষে স্বার্থত্যাগ করিয়া লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করা কত কঠিন। যাঁহার নিজের সন্তান নাই, তিনি ইচ্ছা করিলে সমাজের সমুদায় বালক বালিকাকে তাঁহার সন্তানস্থানীয় করিতে পারেন।

কিন্তু চিরকৌমার্য্যের বিরুদ্ধে বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের এক মহা আপত্তি আছে। চিরকুমার যদি সুযোগ্য ব্যক্তি হন তাহা হইলে তাঁহার বংশ না থাকায় উত্তরকালে সমাজ কতকগুলি যোগ্য ব্যক্তি লাভে বঞ্চিত হইবে। কাজেই এই এক উভয় সমস্যায় পড়া গেল —

না যাইলে রাজা মারে, যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণ আদেশে যথা মারীচ কুরঙ্গ॥

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সমস্যার উত্তরে বলিতেছেন যে, সমাজ যখন যোগ্য ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিগণের সন্তানদ্বারা লাভবান হইবে তখন সেই সন্তানগণের লালনপালনের ভার সমাজেরই নিজের উপর নেওয়া উচিত। কিন্তু সমাজের এতটা কর্ত্তব্য বোধ কবে হইবে বলা যায় না, কাজেই ততদিন পর্য্যন্ত ইহার কোনও মীমাংসা হইবে না। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হিন্দু সমাজের প্রথাতেই এই সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মীমাংসা রহিয়াছে। হিন্দুগণ ভাই, ভাইপো প্রভৃতি মিলিয়া একত্র একান্ন পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ অধিক উপার্জ্জন করে, কেহ অল্প উপার্জ্জন করে, কিন্তু সকলেই সমান সুখে সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করে। এখন এইরূপ একটী পরিবারের এক জন লোকে যদি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কোনও লোক-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে কিংবা অধিক উপার্জ্জনের আশায় কোনও বিপদসঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্রের জন্য চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। পরিবারের অন্যান্য উপার্জ্জনক্ষম আত্মীয়গণ তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন। আজকাল ওকালতি প্রভৃতি পুরাতন নিরাপদ রাস্তায় চলিয়া অনেকেই কিছু রোজগার করিতে পারিতেছেন না, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন, রসায়নিক কারবার ও নানারকম কলকারখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নূতন ও বিপজ্জনক রাস্তায় চলিতে বাধ্য হইতেছেন। অনেক স্থলে এই সকল সাহসী ও উদ্যোগী যুবক বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাহিতেছেন না, কেন না পূর্ব্বকার হিন্দু একান্ন পরিবার দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইতেছে। যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা ভাবেন না, পরন্ত ভবিষ্যতে সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে তদ্বিষয়েও চিন্তা করেন, তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই এই বিষয়টীর অবতারণা করিলাম।

সুবিধার ন্যায় একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক অসুবিধাও আছে। প্রধান অসুবিধা এই যে, যদি পরিবারভুক্ত কোনও লোক কুচরিত্র হয় তবে তাহাদ্বারা সমস্ত পরিবারের অমঙ্গল সাধিত হয়। এইরূপ স্থলে বাড়ীর কর্ত্তার উচিত সেই ব্যক্তিকে পরিবার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া। অবশ্য বলা বাহুল্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে কর্ত্তা ও গৃহিণীর উপর, কর্ত্তাগৃহিণী ভাল লোক না হইলে একান্ন পরিবার এক দিনও টিকিবে না।

যাহা হউক, একান্ন পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। আমি কেবলমাত্র ইহাই দেখাইতে চাই যে, চিরকৌমার্য্য ও বিবাহের সনাতন বিরোধ, সুপরিচালিত হিন্দু একান্ন পরিবার প্রথা-দ্বারাই মীমাংসিত হইতে পারে। এই একটা দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে হিন্দুসমাজের বিষয় অধ্যয়নদ্বারা আমরা এমন অনেক সত্য আবিষ্কার করিতে পারিব যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের নিকট শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রভাত

উষার কিরণদীপ্ত খণ্ড মেঘ-পথে
সুরবালা নামি আসে হেমকুম্ভ মাথে
আলোক-প্রবাহ বহি'; আবেগচপল
উছলে তটিনীবারি ছল্ ছল্ ছল্
অঙ্গের পরশ লভি',—ক্ষুব্ধ বক্ষ টুটে
মর্ম্মের হরষ যত পুষ্প হয়ে ফোটে
কনককমল সম সর্ব্বদেহে তার,
তারি পানে মেলি মুগ্ধ নয়ন আমার
বিস্ময়ে রহিনু চাহি'।
এস অয়ি বালা!
আমার অন্তরখানি করি দাও আলা
নীরব নয়নপাতে, স্বর্ণ তুলি দিয়া
আঁধার এ মর্ম্মগেহ দাও উজলিয়া।
তোমার লাবণ্য-গলা নিখিল গগন
বহা'ক্ হৃদয়ে মোর আলোক-প্লাবন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বৈশ্যজাতির পুরাতত্ত্ব

বৈশ্য জাতিকে আর্য্যজাতির নিম্নস্তর রূপেই আমরা আমাদের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে বর্ণিত দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত পুরাতত্ত্বের সন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, একসময়ে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারী ছিলেন।

বৈশ্যজাতির পূর্ব্বোক্ত পুরাতত্ত্বের মূলতত্ত্ব তাঁহাদের জাতীয় নাম হইতেই উদ্ধার করা যাইতে পারে। বৈশ্য যেমন তাঁহাদের জাতীয় নাম তেমনই 'বিশ' ও 'অর্য্য'ও তাঁহাদের জাতীয় নাম। 'বিশ' সম্বন্ধে এইরূপ অভিধান আছে—"দ্বৌ বিশৌ বৈশ্য মনুজৌ।" ইহার অর্থ—'বিশ' শব্দ 'বৈশ্য' ও 'মনুষ্য' এই উভয়ার্থেরই বাচক। 'অর্য্য' শব্দ সম্বন্ধে অভিধানে উক্ত হইয়াছে, "অর্য্যঃ স্বামী বৈশ্যয়োঃ", —ইহার অর্থ,'অর্য্য' স্বামী ও বৈশ্য এই উভয়কেই বুঝায়।

'বৈশ্য' শব্দ 'বিশ্' ধাতু হইতে জাত। 'বিশ্' ধাতুর অর্থ প্রবেশকরা। এই 'বিশ' ধাতু হইতে একদিকে যেমন গাত্রাবরণবাচক 'বেশ' শব্দ গঠিত হয় তেমনই গৃহবাচক 'বেশ্ম' শব্দও গঠিত হয়।

'বেশ' শব্দের দ্বারা যেমন একদিকে বৈশ্য শব্দের মূলার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে তেমনই বেশ্ম শব্দের দ্বারাও অপরদিকে ইহার মূলার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে।

গাত্রাবরণের মধ্যে প্রবেশ করে বা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে 'বিশ্' ধাতুর ইহাই ব্যুৎপত্তি হয়। এই ব্যুৎপত্তি-টীকে পুরাতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া লইলে আমরা

ইহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। মানবজাতির উন্নতির ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মানবজাতির বর্ত্তমান উন্নতি এক-দিনে বা একবারে হয় নাই। এই উন্নতি বহুকালে ও ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। মানবজাতির গাত্রাবরণ ও বাসগৃহ আবিষ্কার করিতে বহু সময়ই লাগিয়াছিল। এমন জাতি পৃথিবীতে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, আবার এমন সভ্যজাতির কথাও জানা যায় যাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে না জানিয়া গর্ত্তে বাস করিত। 'বেশ' ও 'বাসের' আবিষ্কার প্রথম ইঁহাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়াই ইঁহাদের 'বৈশ্য' নাম হইয়াছে। ইহাই আমাদের নিকট ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

বাসগৃহের সহিত 'বিশ' বা বৈশ্যের সম্বন্ধ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। *

গৃহার্থক 'বিশ্‌' শব্দের অনুরূপ শব্দ যে আমরা পাশ্চাত্য প্রাচীন আর্য্য ভাষা সকলে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছি তাহাতেও 'বেশ' বা বাসগৃহের সহিত 'বিশ্‌' বা বৈশ্য জাতির অতি প্রাচীনকালে যে যোগ ছিল এবং এই যোগমূলেই যে তাঁহাদের এই নাম হয়, তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়।

এক সময়ে আর্য্যগণ 'বিশ্‌' নামেই পরিচিত হইতেন। পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) বলেন, "তখনও (ঋগ্বেদের সময়ে) কোন জাতিভেদ বর্ত্তমান ছিল না। লোক সকল তৎকালপর্য্যন্তও একই সমষ্টীভূত ছিল এবং একই বিশ্‌ নাম ধারণ করিত।"†

এই অংশ আর, সি দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদানুবাদে দৃষ্ট হয় (১৮ পৃঃ)।

ঐতিহাসিক ডাক্তার হাণ্টারের মতেও সমগ্র আর্য্য ঔপনিবেশিকগণই এক সাধারণ বিশ্‌ নামে পরিচিত ছিলেন।‡

'বিশ্‌' শব্দ এই প্রকারেই আর্য্য সাধারণ নাম হইতে মনুষ্য সাধারণের নামে যে পরিণত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অভিধানে অনুসন্ধান করিলে আমরা 'বিশ্‌' শব্দকে মনুষ্য মাত্রেরই বাচক দেখিতে পাই, যথা, "বৌবিশৌ বৈশ্য মনুজৌ॥" বিশ্‌ শব্দ বৈশ্য ও মনুষ্য উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। আমরা রাজার যে "বিশাম্পতি" একটী নাম প্রাপ্ত হই তাহাতে 'বিশ্‌' শব্দ স্পষ্টই লোকমাত্রই বুঝায়। বেদে এই অর্থেই 'বিশ্‌পতি' (ঋগ্বেদ ৬।১। ৮) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যই বৈশ্য জাতির বিশেষ ধর্ম্মরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়, যথা—

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥" ৯০
মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়।

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ কল্পনা করিলেন।"

আর্য্যজাতির প্রথম ইতিহাসের আলোচনা হইতে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন

---

*"Vaisya comes from a Sanskrit root, which is found in many Aryan tongues—Sanskrit vesa, a house ; oikos, Greek ; Vicus, Latin, veihs, Gothic ; wich, German." Cyclopaedia of India by Balfour.

†There are no castes as yet ; the people is still one united whole and bears but one name, that of Visas." Indian Literature p 38. Translation রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদে উদ্ধৃত (১৮ পৃঃ)

‡"Dr. Hunter says the Vaisya caste, litrally the Vis or body of the Aryan settlers were in ancient times the tillers of the soil. "Imp. Gaz. Cyclopaedia of India by Balfour.

"ডাক্তার হাণ্টার বলেন বৈশ্যজাতি মূলতঃ বিশ্‌ বা সমগ্র আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ পুরাকালে ভূমিকর্ষণকারী ছিলেন।

আর্য্যগণ আদি অবস্থায় পশুপালনদ্বারাই জীবন যাপন করিতেন।*

ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণই আছে যে, আদি আর্য্যগণ ভ্রমণশীল পশুরক্ষক (জাতি) ছিলেন।

বৈশ্যদিগের পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মের নির্দ্দেশদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে যে আদিম আর্য্যজীবনের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহাদ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রাচীনত্বের প্রমাণও পাওয়া যায়।

বৈশ্যজাতির অপর একনাম 'অর্য্য'। এই 'অর্য্য' শব্দ 'ঋ' বা 'অর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই 'অর' ধাতু মূলে কর্ষণার্থক ছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং 'অর্য্য' শব্দ যে আদিতে 'কৃষক' বুঝাইত তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মহর্ষি মনু বৈশ্যজাতির যে কৃষিধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্য্য শব্দের কৃষিকার্য্যের সহিত তাহারও বিলক্ষণ সুসঙ্গতিই হয়। কৃষিকার্য্য বর্ত্তমানে বিশেষ সম্মানের বিষয় না হইলেও ইহা এক সময়ে যে বিশেষরূপেই মর্য্যাদাজনক ছিল তাহা 'অর্য্য' শব্দের অপর শ্রেষ্ঠ অর্থদ্বারাও প্রমাণিত হয়। ধনিক বৈশ্যদিগের যে আমরা শ্রেষ্ঠী ও তদপভ্রষ্ট 'শেঠ' উপাধি দেখিতে পাই তাহা শ্রেষ্ঠ শব্দ হইতেই উৎপন্ন, ও ইহারই অর্থপ্রকাশক। আমরা রোমানদিগের বিশেষ সমৃদ্ধির সময়েও যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ক্ষেত্রকর্ষণ ছাড়িয়া আসিয়া দেশের অধিনেতৃত্ব করিতে দেখিতে পাই তাহাতেও কৃষিকার্য্য যে সমাজে হেয় ছিল না তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

যে 'আর্য্য' নামের দ্বারা আমাদের আদিপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন, এবং যে আর্য্যদিগের বংশধর বলিয়া আমাদের নিজের পরিচয় প্রদান করিতে আমরা পরম গৌরব মনে করিয়া থাকি সেই আর্য্য নামটী বৈশ্যদিগের 'অর্য্য' নাম হইতেই যে স্বার্থে গঠিত হইতে পারে তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহার সাধারণ অধিকার আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বৈশ্য জাতি বর্ত্তমান সমাজে অপর অপর আর্য্য জাতিদিগের ন্যায় উচ্চপদস্থ না হইলেও এক সময়ে ইঁহারাই আর্য্য সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড ছিলেন। তাহাতেই ইঁহাদের জাতীয় নামে আর্য্যদিগের পুরাতত্ত্বের যেরূপ নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপর কোনও আর্য্য জাতির নামেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* "There is good reason for believing that the primtive Aryans were named herdsmen" The Origin of the Aryans by Isaac Taylor. p 43.

তুচ্ছ

পিক ও কাক

পিক বলে—"থাকি আমি বসন্তের দেশে"
কাক কয়, "মহাশয়! আমি বার মেসে!"

শূন্য ও এক

শূন্য কহে, "এক তোর কোন গুণ নাই,
ডাহিনে থাকিয়া তোরে আমি যে বাড়াই!"
এক বলে, "ধন্য তুমি—জীতে রহো বাপা!
আমা বিনা বঁধু তুঁহু, শুধু শূন্য—ফাঁপা!"

অনুরাগ

দিবসে সরোজ হাসে সরসীর বুকে,
নিশি দিবা পদ্মবিভা ষোড়শীর মুখে—
মৃণাল আসন তাই নাহি মনে লাগে,
রক্ত গণ্ডে ফোটে পদ্ম সদ্যঃ অনুরাগে!

স্মৃতি

আমি যে দেখেছি তারে রাখালের সাজে
নিত্য সে বিনোদ রূপ জাগে চিত্ত মাঝে!
মথুরার রাজা—সে গো গোকুলের শ্যাম
তমালের তাজা পাতে লিখা তার নাম।
ব্রজ ছেড়ে গেছে বটে চড়ে' দিব্য রথে,
আজো সে চাকার দাগ আঁকা আছে পথে!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

স্বপ্ন বাসবদত্তা

মহাকবি ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ।

উদয়ন, বৎসরাজ

যৌগন্ধরায়ণ, রাজমন্ত্রী

বসন্তক (বিদূষক), রাজার নর্ম্মসচিব

ব্রহ্মচারী, লাবাণক গ্রামাগত জনৈক অন্তেবাসী

কাঞ্চুকীয়, রাজ-ভৃত্য

সংভষক
ভট } পদ্মাবতীর দাস-দ্বয়

স্ত্রীগণ।

বাসবদত্তা, উদয়নের প্রথমা মহিষী ও উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতের কন্যা

আবন্তিকাবেশিনী (অবন্তী-দেশীয়া রমণীর বেশধারিণী), ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তা

পদ্মাবতী, মগধরাজ দর্শকের ভগিনী

তাপসী। মধুকরিকা ও পদ্মিনিকা, পদ্মাবতীর সখী ও পরিচারিকা

ধাত্রীদ্বয়, পদ্মাবতীর উপমাতা ও বাসবদত্তার উপমাতা

বিজয়া, বৎসরাজ-গৃহে প্রতিহারী

স্থাপনা

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার। যাঁর বাহুদুটি দেখতে প্রতিপদের নূতন চন্দ্রের মত সুন্দর গৌরবর্ণ, সুরাপান কল্লে যাঁর বাহুতে অধিকতর বলের সঞ্চার হয়, লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাবে যাঁর বাহুদুটি সমৃদ্ধি সম্পন্ন, এবং যাঁর বাহু বসন্তের কমনীয়তায় চির নবীন সেই বলদেব তোমার রক্ষা বিধান করুন।

আচ্ছা, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে এরূপই বলা যা'ক। একি! আমি এদিকে বলব মনে কচ্ছি, ওদিকে কি একটা শব্দের মত শুনচি না? রসো, দেখছি।

(নেপথ্যে) মশায়রা সরে যান, সরে যান।

সূ। হাঁ, বুঝতে পেরেছি। যে সব পরিচারক মহারাজকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তারা রাজকুমারীর সঙ্গে তপোবনে যাচ্ছে, আর তপোবনের পথ থেকে লোক জন সব সরে যেতে বলছে।

প্রথম অঙ্ক

দুজন ভটের প্রবেশ।

ভটগণ। মশায়রা, সরুন সরুন।

পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধরায়ণ ও আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তার প্রবেশ।

যৌ। (কান পাতিয়া) কি! এখান থেকেও লোক জন তাড়িয়ে দিচ্ছে। যারা বনের ফল খেয়েই সন্তুষ্ট-চিত্ত, এবং আশ্রমে থেকেই সুখী, যারা গাছের বাকল পরেই পরিতুষ্ট, যারা ধীরমতি ও সকলে যাদের পূজা করে কে তাদিগকে ত্রাসিত কচ্ছে! সৌভাগ্যে গর্ব্বিত হয়ে, বিনয় বিসর্জন দিয়ে কোন পামর, কার আজ্ঞায় এই শান্ত তপোবনটিকেও লোকালয় করে তুলছে? এ উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ কি?

বা। আর্য্য, কারা তাড়িয়ে দিচ্ছে?

যৌ। যারা এমন ক'রে লোক হাঁকিয়ে দিচ্ছে তারা নরাধম।

বা। আর্য্য, আমি এ কথা বল্‌ছি না, আমি বল্‌ছি আমাকেও তাড়িয়ে দিবে না কি?

যৌ। ভদ্রে, যে সকল দুর্দ্দৈব ভবিষ্যতে ঘটবে বলে আমরা ভয় করি, সে গুলিও এম্‌নি ভাবেই তাড়িত হ'য়ে থাকে।

বা। আর্য্য, পথ হেঁটে আমি কাতর হই নাই; কিন্তু এই অপমানটা আমার বড় লাগছে।

যৌ। ভদ্রে, এ রকম যে একটা কিছু হবে তা ত আপনি পূর্ব্বেই মনে ভেবে রেখেছেন, এখন আর এ বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা।

এখানে আসাটা ত পূর্ব্বেই আপনি স্বীকার করেছেন। মহারাজ বিজয়-লক্ষ্মী ফিরে পেলে আবার আপনিও গৌরব ফিরে পাবেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, চক্র-নেমির ন্যায় মানুষের ভাগ্যেরও পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে—তা ত আপনি জানেন।

ভটদ্বয়। সরুন, সরুন, মশায়রা, সরে যান।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ।

কাঞ্চু। সম্ভষক, লোক সব তাড়িয়ে দিও না।

দেখ, যারা আশ্রমে থাকে তাদের কটু বলা উচিত নয়, এতে রাজার কলঙ্ক হয়, এ সব মনস্বী মুনি লোক-গঞ্জনা এড়াবার জন্যই বনে এসে বাস কচ্ছেন।

ভটদ্বয়। আর্য্যের নিষেধ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

যৌ। এ লোকটার আগমন শুভসূচক ব'লে বোধ হচ্ছে। আর্য্যে, আসুন আমরা এর কাছে যাই।

বা। আচ্ছা, চলুন।

যৌ। (অগ্রসর হইয়া) ওগো মশায়, বলি এরা সব লোক তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন?

কা। তপস্বী—

যৌ। (আত্মগত) তপস্বী সম্বোধনটা সম্মানসূচক বটে কিন্তু অনভ্যস্ত বলে আমার ভাল লাগছে না।

কা। তপস্বী, শুনুন। এই যে দেখছেন, ইনি আমাদের মহারাজ দর্শকের ভগিনী, নাম পদ্মাবতী। মহারাজের মার সঙ্গে আশ্রমে দেখা কত্তে এসেছিলেন। এখন তাঁরই আদেশ মত রাজগৃহে ফিরে যাবেন। কিন্তু আজ তিনি এই আশ্রমে থাকবেন মনে কচ্ছেন। আপনারা তীর্থসলিল, সমিধ্, কুসুম ও দর্ভাদি ইচ্ছানুসারে বন থেকে সংগ্রহ করে আনুন। ধর্ম্ম রাজকুমারীর প্রাণ সদৃশ, তপস্বিদের ধর্ম্মাচরণের যাতে বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত না হয় তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। শুধু তাই নয়, এটা এদের কুলব্রত।

যৌ। (স্বগত) বটে, ইনিই মগধরাজকুমারী পদ্মাবতী! ইনিই আমাদের মহারাজের মহিষী হবেন বলে পুষ্পকভদ্রাদি সিদ্ধাদেশ করেছিলেন! হাঁ, তাই হবে, কারণ লোকের উপর হিংসার ভাব বা স্নেহের ভাবটা সঙ্কল্পানুসারেই হ'য়ে থাকে। ইনি আমাদের রাণী হবেন শুনে তাঁকে আমার একান্তই আপনার ব'লে মনে হচ্ছে।

বা। (স্বগত) রাজমহিষী হবেন শুনে তাঁকে আমারও ভগিনীর মত ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরিজন ও পরিচারিকা সহ পদ্মাবতীর প্রবেশ।

চেটী। রাজকুমারী, এদিকে আসুন, এই আশ্রম।

পট পরিবর্ত্তন—তাপসী উপবিষ্টা।

তা। রাজকুমারীর শুভাগমনে আমাদের আশ্রম ধন্য হ'ল।

বা। (স্বগত) ইনিই রাজকুমারী। যেমন কুল, তেমনই রূপ।

পদ্মা। আর্য্যে, অধিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

তা। বৎসে, চিরজীবী হও। তপোবন অতিথি জনের আপন বাড়ীর মত মনে ক'রো।

পদ্মা। আর্য্যে, ঠিক বলেছেন। আপনার স্নেহ-সৌজন্যে একান্ত অনুগৃহীত হ'লেম।

বা। (স্বগত) এঁর কেবল যে রূপই মধুর তা নয়, কথাগুলিও বড় মধুর।

তা। (বাসবদত্তার প্রতি) ভদ্রে. ইনি রাজার ভগিনী, এখনও বিয়ে হয় নি।

চেটী। উজ্জয়িনীর রাজার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব ক'রে মহারাজ প্রদ্যোত দূত পাঠিয়েছেন।

বা। (স্বগত) বাঃ! তা হ'লে ইনি ত এখন আমার আত্মীয় হলেন।

তা। আহা, কেমন সুন্দর রূপ! আবার তুই রাজার বংশও খুব ভাল।

পদ্মা। (কাঞ্চুকীয়ের প্রতি) আর্য্য, এখানে কেউ কিছু চান এমন কি কোন তপস্বী আছেন? একটু খুঁজে দেখুন না?

কা। আচ্ছা. রাজকুমারীর যেমন ইচ্ছা। হে, আশ্রমবাসী তপস্বিগণ আপনারা শুনুন—আপনাদের ধর্ম্মকার্য্য দেখে ধর্ম্মের প্রতি মগধরাজকুমারীর একান্ততা আরো বেড়ে উঠেছে, তিনি ধর্ম্ম লাভের জন্য আপনাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন। আপনাদের কার কি চাই একটু অনুগ্রহ করে বলুলে রাজকুমারী একান্ত বাধিত হবেন। ধর্ম্ম রাজকুমারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। যদি কারও কিছু বাসনা থাকে বলুন,তা পূর্ণ করে তিনি ধন্য হবেন। যদি কারও কলসের প্রয়োজন থাকে, যিনি যেমন কাপড় পরেন তেমন কাপড়ের যদি কারও প্রয়োজন থাকে. যার দীক্ষা হয়েছে এমন কারও যদি গুরু দক্ষিণার অভাব থেকে থাকে দয়া ক'রে বলুন। অনুগ্রহ ক'রে একবার বলুন, আজ কার কি জিনিষের দরকার।

যৌ। বাঃ! বেশ একটা উপায় হয়েছে দেখছি। ওগো, আমি একজন প্রার্থী আছি।

পদ্মা। আমার তপোবনে আসাটা আজ ভাগ্যে সার্থক হ'ল!

তা। এ আশ্রমে ত কারও কোন অভাব নেই, এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন আগন্তুক।

কা। মশায়, আনার কি চাই বলুন।

যৌ। এই যে দেখছেন ইনি আমার ভগিনী। এর স্বামী বিদেশে। আমার প্রার্থনা রাজকুমারী কিছুকাল একে তাঁর কাছে রাখেন। অর্থে আমার প্রয়োজন নাই. ভোগ বিলাসে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি কাপড় চাই না, জীবন-ধারণের জন্য আমি গেরুয়া ধরেছি। কিন্তু দেখলুম এই রাজকুমারী বড় ধীর-প্রকৃতি, ধর্ম্মপ্রচারে তাঁর একান্ত যত্ন, তাই আমার বিশ্বাস ইনিই আমার ভগিনীর চরিত্র রক্ষা কত্তে পারবেন।

বা। (স্বগত) হায়! আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ আমাকে এখানেই রেখে যেতে চাচ্ছেন। তবে আমার ভরসা আছে তিনি বিশেষ না ভেবে কোন কাজই করবেন না।

কা। এই ভার গ্রহণ করা বড় বিষম. কেমন ক'রে এই ন্যাস স্বীকার করব! অর্থ দানকরাটা সুখকর, প্রাণধারণকরা সুখকর, তপস্যা করাটাও সুখকর,এবং আর আর সব কাজ করাই সুখকর কিন্তু ন্যাস রক্ষা করা বড় কষ্টকর।

পদ্মা। আর্য্য, প্রথমে কার কি চাই এইরূপ ঘোষণা ক'রে দিয়ে এখন ত আর বিচার করা চলে না। ইনি যা বলছেন তাই করুন।

কা। রাজকুমারী. এ আপনার যোগ্যরূপ কথাই বটে।

চেটী। সত্য এত ভালবাসেন রাজকুমারী? আপনি চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন।

তা। ভদ্রে, চিরজীবী হও।

কা। আচ্ছা আপনি যা বলছেন তাই হবে। মশায়, রাজকুমারী আপনার ভগিনীর রক্ষার ভার নিলেন।

যৌ। রাজকুমারীর বড় অনুগ্রহ, আমি একান্ত কৃতার্থ হলেম। বৎসে, রাজকুমারীর নিকট যাও।

বা। (স্বগত) হায়রে অদৃষ্ট! না গিয়ে আর উপায় কি?

পদ্মা। আসুন, আসুন, এখন তো আপনি আত্মীয় হলেন।

তা। আহা, কেমন সুন্দর রূপ! এও রাজকুমারী হবে।

চেটী। হাঁ, আপনি যা বলছেন ঠিক; এ নিশ্চয়ই সুখে লালিত হয়েছে।

যৌ। উঃ! অর্দ্ধেক ভারের লাঘব হল। মন্ত্রীদের সঙ্গে যে রকম পরামর্শ হয়েছিল ঠিক তাই হ'ল। আমাদের মহারাজ যখন আবার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, আর যখন মগধের রাজকুমারীর সঙ্গে মহারাজের বিয়ে হবে, তখন মহিষী পদ্মাবতীই আমার সাক্ষী হবেন। তিনিই বলবেন যৌগন্ধরায়ণ বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী!

যে সকল সিদ্ধাদেশিক মহারাজের ভবিষ্যৎ বিপত্তি জ্ঞান চক্ষে দেখেছিলেন তাঁরাই বলেছেন পদ্মাবতী বৎসরাজের মহিষী হবেন। তাঁদের সিদ্ধ বাক্যের উপর বিশ্বাস করেই আমি এ কাজ কল্লুম। দৈব সিদ্ধবাক্য কখনও অতিক্রম কত্তে পারে না, এটা একটা পরীক্ষিত সত্য।

জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। (ঊর্দ্ধদিকে দেখিয়া) তাইতো, দুপুর হয়েছে, বড় ক্লান্ত হয়েছি। এখানেই একটু বিশ্রাম করি। (পরিক্রমণ করিয়া) এ যেন তপোবন হবে ব'লেই বোধ হচ্ছে।

হাঁ, এ নিশ্চয়ই তপোবন। এখানে কেউ কাকে হিংসা করবে না এই বিশ্বাসে হরিণগুলি স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, একটুও চকিত হচ্ছে না। বৃক্ষগুলি ফল-ফুলে ভরে আছে, কেউ নষ্ট কচ্ছে না। চারদিকেই যথেষ্ট অচষা যায়গা পড়ে আছে, কপিল ও গোধন সকল দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে। আর তপোবনের বহুস্থানথেকে ধূম উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

আচ্ছা, দেখা যাক্, ঢুকেই পড়ি। (প্রবেশ করিয়া) একি! (কাঞ্চুকীয়কে দেখিয়া) এরূপ লোক ত আশ্রমে থাকে না। (অন্য দিকে দেখিয়া) আবার তাপসীও ত এখানে রয়েছেন। তাহ'লে আর যেতে দোষ নেই। সর্ব্বনাশ! একি! আবার স্ত্রীলোকও যে রয়েছেন দেখছি।

কাঞ্চু। মশায়, অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ুন। এ আশ্রম, এখানে সকলেরই সমান অধিকার।

বা। সর্ব্বনাশ!

পদ্মা। ও—উনি পরপুরুষ দেখেন না। দেখতে হবে তাঁর এ ব্রত যাতে রক্ষা হয়।

কাঞ্চু। আমরা আগে এসেছি, আপনাকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কত্তে হবে।

ব্রহ্ম। (মুখ ধুইয়া) বাপরে! এতক্ষণে ক্লান্তি দূর হল।

যৌ। মশায়, আপনি কোথা থেকে এলেন। কোথা যাবেন, আপনার থাকাই বা হয় কোথায়?

ব্রহ্ম। বল্‌ছি শুনুন, আমি রাজগৃহ থেকে এলুম, বৎসরাজ্যে লাবাণক নামে একটা গ্রাম আছে, আমি সেখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করি।

বা। কি! লাবাণকের নাম বলছে না! এই নাম শুনে আমার কষ্ট যে নূতন হ'য়ে উঠছে।

যৌ। তবে কি আপনার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে?

ব্রহ্ম। না, এখনো হয় নি।

যৌ। তবে লাবাণক ছেড়ে এখন এখানে এলেন যে?

ব্রহ্ম। সেখানে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

যৌ। কি রকম দুর্ঘটনা!

ব্রহ্ম। সেখানে রাজা উদয়ন বাস করেন।

যৌ। হাঁ, রাজা উদয়নের নাম শুনেছি বটে। কি হয়েছে তাঁর?

ব্রহ্ম। অবন্তীর রাজকুমারী বাসবদত্তা তাঁরই প্রিয়তমা মহিষী।

যৌ। হাঁ, তারপর।

ব্রহ্ম। মহিষীকে লাবাণকে রেখে রাজা হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন, একদিন হঠাৎ আগুন লেগে সমস্ত গ্রাম পুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মহিষীও পুড়ে মরলেন।

বা। (স্বগত) মিছে কথা, হতভাগিনী এখনও বেঁচে আছে।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। রাণীকে বাঁচাতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যৌ। মন্ত্রীও ঝাঁপিয়ে পড়লেন! তারপর!

ব্রহ্ম। তারপর রাজা ফিরে এসে, সব কথা শুনে, উভয়ের বিয়োগ-দুঃখে একান্ত কাতর হ'য়ে নিজেও আগুনে পুড়ে মরতে গেলেন! কিন্তু মন্ত্রী বিশেষ চেষ্টা ক'রে তাঁকে নিবারণ কল্লেন।

বা। (স্বগত) আমি জানি আমার প্রতি আর্য্য-পুত্রের স্নেহ অসীম।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর রাণীর শরীরের যে সকল অলঙ্কার পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আলিঙ্গন ক'রে রাজা মূর্চ্ছিত হলেন!

সকলে। মূর্চ্ছিত হলেন! কি সর্ব্বনাশ!

বা। (স্বগত) আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

চেটী। রাজকুমারী, ইনি কাঁদছেন।

পদ্মা। এঁর মনটি বড়ই কোমল।

যৌ। হাঁ, আমার ভগিনীর হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা স্বভাবতই বড় বেশী। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর ধীরে ধীরে রাজার আবার জ্ঞান হ'ল।

পদ্মা। ভাগ্যে আবার জ্ঞান হল। মূর্চ্ছিত হ'লেন এ কথা শুনে আমার হৃদয়ও যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

যৌ। তারপর।

ব্রহ্ম। তারপর রাজা ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর হয়ে গেল। কিছুকাল পরে হঠাৎ উঠে, "হা বাসবদত্তা! হা অবন্তী-রাজকুমারী! হা প্রিয় শিষ্যে!" এরূপ কত কি ব'লে করুণ ভাবে বিলাপ কত্তে লাগলেন। আর বেশী বলব কি এখন আমার মনে হয়—

চক্রবাকীর বিরহে চক্রবাকও মহারাজের মত এত কাতর হয় না, আর পৃথিবীতে অন্য এমন কোনও প্রাণী নাই যে প্রিয়ার বিরহে মহারাজ উদয়নের মত এত অস্থির হ'য়ে পড়ে। যে পত্নীকে স্বামী এত ভালবাসেন সে-ই স্ত্রীকুলে ধন্য, সে পুড়ে ম'রেও স্বামীর স্নেহে অমর হ'য়ে থাকে।

যৌ। আচ্ছা, রাজাকে আবার প্রকৃতিস্থ করবার জন্য মন্ত্রী কোনও চেষ্টা করেন নি?

ব্রহ্ম। হাঁ, রাজার রুমণ্বান নামে এক মন্ত্রী আছেন, রাজাকে প্রকৃতিস্থ কত্তে তিনি বিশেষ যত্ন করেছেন। কি আর বলব, মন্ত্রীও শোকাভিভূত হ'য়ে রাজার ন্যায় অন্ন মুখে তুলছেন না, সর্ব্বদা চক্ষের জলে তাঁর বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, কেঁদে কেঁদে তাঁর মুখমণ্ডল ক্ষীণ হয়ে গেছে, রাজার ন্যায় তিনিও অঙ্গ-সংস্কার, বেশ-বিন্যাসাদি ছেড়ে দিয়েছেন। আর দিন নেই—রাত নেই—কেবল রাজার শুশ্রূষা কচ্ছেন। ঈশ্বর না করুন যদি রাজা ম'রে যান, তবে মন্ত্রীও নিশ্চয় ম'রে যাবেন।

বা। (স্বগত) আর্য্যপুত্র ভাগ্যে ভাল লোকের হাতে পড়েছেন। এটাও আমার একটা পরম সৌভাগ্য।

যৌ। (স্বগত) হায়! মন্ত্রী রুমণ্বানের, পর কি গুরুতর

দায়িত্ব। এখন আমার দায়িত্বের অনেকটা লাঘব হয়েছে। কিন্তু রুমণ্বানের উপর যে ভার প'ড়েছে তা বড় বিষম! রাজার ভার যার উপর, রাজ্যের সকলের ভারও তারই উপর। (প্রকাশ্যে) ব্রহ্মচারী ঠাকুর, এখন ত রাজা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন?

ব্রহ্ম। তা আমি জানি না। "হায়! এখানেই তার সঙ্গে হেসেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার সঙ্গে বসেছি, এখানেই আবার তার সঙ্গে রাগ করেছি"—এসব কথা ব'লে রাজা মর্ম্মভেদী বিলাপ কচ্ছিলেন, মন্ত্রী অতি কষ্টে এই অবস্থায়ই তাঁকে নিয়ে লাবাণক থেকে বেড়িয়ে গেলেন। রাজা চ'লে গেলে পর নক্ষত্র-চন্দ্র না থাকলে আকাশের যেমন দশা হয় সে গ্রামেরও সেইরূপ দশা হ'ল। তখন সেখানে আর কে থাকে! আমিও বেড়িয়ে পড়লুম। তারপর কি হ'ল বলতে পারি না।

তাপসী। আগন্তুকও এমনি ভাবে যে রাজার গুণ গান করে সে রাজা বাস্তবিকই গুণবান।

চেটী। দিদিমণি, রাজা কি আবার বিয়ে করবেন?

পদ্মা। ঠিক আমার মনের কথাটিই বলেছ।

ব্রহ্ম। তবে এখন আসি।

উভয়ে। আসুন, ভগবান আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

ব্রহ্ম। আশীর্ব্বাদ করুন ভগবান যেন তাই করেন।

যৌ। রাজকুমারীর আদেশ হ'লে আমিও যেতে পারি।

কাঞ্চু। রাজকুমারী, আপনার আদেশ হ'লে ইনিও যেতে পারেন।

পদ্মা। আর্য্য, বলে দিন তাঁর ভগিনীর জন্য আর যেন তিনি উৎকণ্ঠিত না হন।

যৌ। আমার ভগিনী সাধুজনের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে, আর উৎকণ্ঠিত হব কেন? এখন তবে আসি।

কাঞ্চু। আচ্ছা আসুন, আবার যেন দেখা পাই।

যৌ। হাঁ, নিশ্চয়ই পাবেন।

কাঞ্চু। ভিতরে যাওয়ার সময় হয়েছে।

পদ্মা। আর্য্যে, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

তাপসী। বৎসে, অনুরূপ বর লাভ কর।

বা। আর্য্যে, আমিও আসি।

তাপসী। স্বামীর সঙ্গে তোমার শীঘ্রই মিলন হ'ক।

বা। আপনার আশীর্ব্বাদে একান্ত অনুগৃহীত হলেম।

কাঞ্চু। রাজকুমারী, এদিকে আসুন—

পাখীগুলি আপন আপন বাসায় ফিরে যাচ্ছে, মুনিরা দিনের শেষে অবগাহন কচ্ছেন, অগ্নি-শিখা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, সমস্ত আশ্রম যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সূর্য্য দূরে সরে পড়েছেন। তাঁর কিরণজাল হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি এখন রথ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি অস্তশিখরে প্রবেশ কচ্ছেন।

প্রবেশক

চেটীর প্রবেশ।

চেটী। কুঞ্জরিকা, রাজকুমারী পদ্মাবতী কোথায়? কি বলছ, মাধবীলতাকুঞ্জের পাশে কন্দুক নিয়ে খেলছেন? আচ্ছা, তবে তাঁর কাছেই যাই। এই যে রাজকুমারী! মাথায় চুলের চূড়া, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম—কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে এদিক পানেই আসছেন—বাঃ, রাজকুমারীকে এখন বড়ই চমৎকার দেখাচ্ছে! আচ্ছা, সামনেই যাওয়া যা'ক্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে বাসবদত্তা ও
পরিচারিকা সহ পদ্মাবতীর প্রবেশ।

বা। সখি, লও এই তোমার কন্দুক।

পদ্মাবতী। না, এখন আর খেলে কাজ নেই।

বা। সখি, কন্দুক নিয়ে এতক্ষণ খেলেছ যে তোমার হাত দুখানি বড় লাল হ'য়ে গেছে। বোধ হচ্ছে এ আর কারুর হাত।

চেটী। দিদিমণি, প্রাণ ভ'রে খেলে নিন্, খেলে নিন্। কুমারী বয়সই খেলার কাল, এই সুন্দর ও সুখের কাল আর বেশী দিন থাকছে না।

পদ্মা। (বাসবদত্তার প্রতি) আর্য্যে, আমাকে কি ঠাট্টা করবেন ভাবছেন?

বা। না সখি, আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—চারদিকেই যেন তোমার বরের মুখ দেখ্‌ছি।

পদ্মা। আচ্ছা, যান্ আপ্‌নি এখান থেকে। আর ঠাট্টা ক'রে কাজ নেই।

বা। সখি, তুমি মহাসেন মহিষীর পুত্র-বধূ হবে বোধ হচ্ছে।

পদ্মা। মহাসেন কে?

বা। উজ্জয়িনীতে প্রদ্যোত নামে এক রাজা আছেন, তাঁর এত সৈন্য-বল যে তাঁর নাম হয়েছে মহাসেন।

চেটী। সেই রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'ক এটা ভর্ত্তৃ-দারিকার আদবে ইচ্ছে নয়।

বা। তবে কার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া রাজকুমারীর ইচ্ছে?

চেটী। উদয়ন নামে বৎসদেশে এক রাজা আছেন, দিদিমণি সেই রাজাকেই বিয়ে করবেন।

বা। (স্বগত) কি! আর্য্যপুত্রকেই বরণ কত্তে চাচ্ছে! (প্রকাশ্যে) কেন?

চেটী। রাজকুমারীর তাঁর উপরই মন গিয়েছে।

বা। (স্বগত) আমিও তাঁরই স্নেহে উন্মাদিনী হয়েছি।

চেটী। দিদিমণি, যদি সেই রাজা দেখ্‌তে কুৎসিত হয়?

বা। না, না, কুৎসিত হবে কেন? সেই রাজা দেখতে বেশ ভাল।

পদ্মা। আর্য্যে, আপনি কি করে জানলেন?

বা। (স্বগত) আর্য্যপুত্রের প্রতি অনুরাগের দরুণ একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছি। কি বলব? হঁ্যা, হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সখি, উজ্জয়িনীর লোকেরা সকলেই এরূপ ব'লে থাকে।

পদ্মা। তা হবে। উজ্জয়িনীর সকলেই তাঁকে জানে কি না! সকলের চক্ষে সুরূপ হওয়া সৌভাগ্যের কথা।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধা। রাজকুমারী, সুখী হ'ন। আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেছে।

বা। কার সঙ্গে হ'ল?

ধা। বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে।

বা। সে রাজা তা হ'লে কুশলে আছেন?

ধা। হঁা, তিনি নিরাপদে রাজগৃহে এসেছেন এবং রাজকুমারীকে তিনিই বিয়ে করবেন বলেছেন।

বা। কি সর্ব্বনাশ! তিনি নিজেই বলেছেন!

ধা। এখানে এমন সর্ব্বনাশের কথাটা কি হ'ল?

বা। না তেমন সর্ব্বনাশের কথা কিছু নয়, তবে মহিষী বাসবদত্তার শোকে তিনি পদ্মাবতীকে তাচ্ছিল্য কত্তে পারেন ত?

ধা। একি কখনও হ'তে পারে ! যাঁরা মহাপুরুষ শাস্ত্র আলোচনা কল্লে শীঘ্রই তাঁদের মন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে থাকে।

বা। রাজা নিজেই কি রাজকুমারীকে বরণ করেছেন !

ধা। না, রাজা স্বয়ং রাজকুমারীকে বরণ করেন নি। তিনি কোন কাজে এখানে এসেছিলেন. আমাদের মহারাজ তাঁর বংশ, বিদ্যা, বয়স আর রূপ দেখে ভুলে গিয়ে রাজকুমারীকে তাঁর হাতেই দিতে চাইলেন।

বা। (স্বগত) তাই বল। তা হ'লে এবিষয়ে আর্য্যপুত্রের কোন দোষ নেই।

আর এক জন চেটীর প্রবেশ।

চেটী। আর্য্যে, শীগ্‌গির আসুন; আজই ভাল নক্ষত্র। রাণী মা বল্‌লেন আজই কৌতুক মঙ্গল কত্তে হবে।

বা। যতই তাড়াতাড়ি হচ্ছে, ততই আমার হৃদয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ধা। রাজকুমারী, তবে চল আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

চিন্তা করিতে করিতে বাসবদত্তার প্রবেশ।

বা। চারদিকেই বিয়ের আমোদ—বিয়ের গোলমাল। অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় পদ্মাবতীকে ফেলে আমি একলা এই প্রমদ বনে চলে এসেছি। দেখি এখানে মনের কষ্টের খানিকটা লাঘব হয় কি না। হায় ! এমন পোড়া অদৃষ্ট কার হয় ! আর্য্যপুত্রও পরের হ'ল। এখানে একটু বসি। চক্রবাকীই ধন্য, চক্রবাকের বিরহে সে বাঁচে না। কিন্তু তা ব'লে আমি আত্মহত্যা করব না। আর্য্যপুত্রকে দেখবার আশায়ই বেঁচে থাকব।

পুষ্পহস্তে চেটীর প্রবেশ।

চেটী। আবন্তিকা গেলেন কোথায় ? এই যে, চিন্তায় একেবারে শূন্যহৃদয় হ'য়ে প্রিয়ঙ্গু গাছের তলে শিলার উপরে ব'সে আছেন। দেখে বোধ হচ্ছে যেন পূর্ণিমার চাঁদটি মেঘে ঢেকে গেছে। আচ্ছা, একবার কাছেই যাই। আর্য্যে আবন্তিকে, আপনাকে আমি কতক্ষণ থেকে খুঁজ্‌ছি।

বা। কেন ?

চেটী। রাণী মা বল্‌লেন আপনার জন্ম উচ্চ বংশে, আপনার হৃদয়ও স্নেহে ভরা, তার উপর আবার আপনি নানা কাজে পটু—তাই আপনাকেই কৌতুক মঙ্গলের মালা গেঁথে দিতে হবে।

বা। কার জন্য।

চেটী। রাজকুমারীর জন্য।

বা। (স্বগত) হায় ! এও আমার কত্তে হ'ল ? হা ঈশ্বর ! তুমি এতই নিষ্ঠুর !

চেটী। আর্য্যে, এখন আর অন্য ভাবনা ভাববার অবকাশ নেই। বর এই মণিভূমিতে চান কচ্ছেন। শীগ্‌গির গাঁথুন।

বা। (স্বগত) অন্য কিছু আর ভাবতে পাচ্ছি কৈ ? (প্রকাশ্যে) ওগো, বর কেমন দেখলে ?

চেটী। হাঁ, রাজকুমারীকে ভালবাসি ব'লে, আর আমাদের মনে ভারি কৌতুহল হয়েছিল ব'লে বর খুব ভাল করেই দেখেছি।

বা। বলি, কেমন দেখ্‌লে ?

চেটী। কি আর বল্‌ব, এমনটি আর আগে কখনও দেখি নি।

বা। তবে দেখতে ভালই ?

চেটী। মনে হয়, যেন ধনু-শর ছাড়া মদন ঠাকুর নিজে।

বা। আচ্ছা থাক্, আর শুনে কাজ নেই।

চেটী। কাজ নেই কেন ?

বা। পরপুরুষের রূপের কথা শুন্তে নেই।

চেটী। তা হ'লে শীগ্‌গির মালাটা গাঁথুন।

বা। নিয়ে এস। (স্বগত) হায় আমি কি হতভাগিনী! এই মালা গাঁথাও আমার কপালে ছিল। ওগো, এই ওষুধের নামটা কি ?

চেটী। এটার নাম অবিধবাকরণ।

বা। (স্বগত) হাঁ, তা হ'লে এ অনেক বার গাঁথতে হবে। এতেআমারও ভাল, পদ্মাবতীরও ভাল। (প্রকাশ্যে) এই ওষুধটার কি নাম ?

চেটী! এটার নাম সপত্নী-মর্দ্দন।

বা। এ গাঁথ্‌তে নেই।

চেটী। কেন ?

বা। রাজার আগের রাণী ত ম'রে গেছে, এটা গাঁথবার আর দরকার কি ?

অপর একজন চেটীর প্রবেশ।

চেটী। আর্য্যে, শীগ্‌গির করুন। বর এতক্ষণ সধবাদের সঙ্গে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় ঢুকছেন।

বা। এই যে হয়েছে, নাও না!

চেটী। আমাকে আবার কাপড় আনতে হবে। আমি চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

বা। এই যে চাকরাণীরা সব চ'লে গেল। হায়, কি সর্ব্বনাশ! আর্য্যপুত্রও পরের হ'ল! (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) যাই, গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকি—দেখি যদি একটু ঘুম আসে, তাহ'লেও দুঃখের খানিকটা লাঘব হ'তে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র *

ভারতবর্ষীয় আইন ব্যবসায়ীদিগের নিকট অতি সুপরিচিত এক বিচক্ষণ ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারী আর্থার এভলন এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই তন্ত্রের আরও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সংস্করণই বর্ত্তমান সংস্করণের সহিত তুলনার যোগ্য নহে। ইহা এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় প্রকাশক কোম্পানী দ্বারা ইউরোপেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার ছাপা, কাগজ প্রভৃতি যে উৎকৃষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। মূল্যও তদনুরূপ অধিক। সচরাচর আইন-পুস্তকের যেরূপ উচ্চ মূল্য ধার্য্য করা হইয়া থাকে এই গ্রন্থেরও সেইরূপ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহাতে মূল তন্ত্রখানা প্রকাশিত হয় নাই। যদি দেবনাগরী অক্ষরে মূল গ্রন্থ এই সঙ্গে প্রকাশিত হইত তবে বর্ত্তমান সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই।

এই অনুবাদ উৎকৃষ্ট এবং যথাসম্ভব মূলানুগত কেবল এইমাত্র বলিলে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করা হয় না। এই গ্রন্থের একটু বিশেষত্ব আছে। অদ্য আমরা তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা এই যে প্রথম অনূদিত ও প্রকাশিত হইল তাহা নহে। তন্ত্রশাস্ত্র না হউক, অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র ইতিপূর্ব্বে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতই প্রকাশিত করিয়াছেন।

সার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষার 'আবিষ্কারের' পর হইতেই বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের তাদৃশ সৌভাগ্যলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। তন্ত্রশাস্ত্র নিতান্ত দুষ্ট হেয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই ধারণাই এতকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। আর্থার এভলন সাহেবই তন্ত্রশাস্ত্রকে সেই অপবাদ হইতে মুক্ত করিতে সর্ব্ব প্রথম প্রয়াসী হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি হিন্দু মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকর্ত্তৃক প্রচারিত হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের আরও পার্থক্য আছে। আর্থার এভলন সাহেব কোন পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার লইয়া এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর ন্যায় এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিয়াছেন। ইউরোপীয় সুধীবর্গের অনেকের গ্রন্থেই এই গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপ এবং ভারতের পার্থক্য ঢের। ইউরোপ এবং ভারত একই গ্রহে অবস্থিত হইলেও একের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত অপরের প্রাকৃতিক অবস্থার সাদৃশ্য যেমন সামান্য সেইরূপ ইউরোপীয়ান ও ভারতবাসী একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও একের মানসিক প্রকৃতির সহিত অপরের মানসিক প্রকৃতির ঐক্যও সেইরূপ অল্প। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের চিন্তা ও সংস্কার আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা, চিন্তা ও সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং ইউরোপীয়েরা আমাদিগের শাস্ত্র, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য যখনই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই অলক্ষিত ভাবে তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজেদের সংস্কার ও ধারণা আমাদিগের শাস্ত্র গ্রন্থাদির উপর আরোপ করিয়া বসেন এবং যে মাপকাঠীদ্বারা তাঁহারা নিজেদের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম ও সমাজের বিচার করিয়া থাকেন সেই মাপকাঠীদ্বারাই আমাদিগেরও বিচার করেন। আমি ইউরোপীয় সুধীবর্গকে নিন্দা করিবার জন্য এরূপ বলিতেছি

* Luzac & Co. 46, Great Russel Street, London, W. C. মূল্য ৮৲ আট টাকা।

তেছি তাহা নহে। আমাদিগের শাস্ত্র, ধর্ম্ম, বা সভ্যতা জানিবার ও বুঝিবার জন্য তাঁহাদিগের যে আগ্রহ তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও চেষ্টার ফল সর্ব্বদা নির্দ্দোষ হয় না। মানুষ নিজের আজন্ম সংস্কার বা ধারণা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং নিজের সংস্কার বা ধারণার সহিত সামঞ্জস্য রহিত কোন বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বীয় পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করাও স্বাভাবিক। অতি কঠোর শিক্ষা ব্যতীত এই দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।

তা ছাড়া, ইহার মধ্যে আরও একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। মনস্তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা জানেন যে, সামঞ্জস্য-জ্ঞানই প্রথম হয়, পার্থক্য-জ্ঞান পরে হইয়া থাকে। একই শ্রেণীর পরস্পর বিভিন্ন দুই পদার্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা প্রথমে তাহাদের সামঞ্জস্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। বিচারশক্তির উন্মেষ না হইলে তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারি না। শিশু সকল রমণীকেই মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকে। পরে বয়োবৃদ্ধি হইলে, বালক বুঝিতে পারে যে, নিজের মাতার সহিত অপর রমণীর পার্থক্য কোথায়। সুতরাং কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অপরিজ্ঞাত সভ্যতা বা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, নিজেদের শাস্ত্র বা সভ্যতার সহিত উহার পার্থক্য কোথায়। সেই পার্থক্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগের সেই অপরিচিত শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পরিশুদ্ধ ধারণা হইয়াছে এরূপ মনে করা অন্যায়। তদ্ভিন্ন, নিজেদের সভ্যতার সহিত যাহা কিছু বিভিন্ন তাহাই নিন্দনীয় এই ধারণা লইয়া যদি কোন বিষয় আলোচনা করা যায় তবেও সেই বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন অপরিচিত বা বৈদেশিক শাস্ত্র বা সভ্যতা আলোচনা করিতে হইলে যাঁহারা সেই সেই শাস্ত্র বা সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন সমালোচককে তাঁহাদের আসনেই নিজকে বসাইতে হয়। তাঁহাদের চক্ষু দিয়াই তাঁহাদের শাস্ত্র দেখিবার আবশ্যকতা হয়। তবেই সেই সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা বা জ্ঞান জন্মিতে পারে, নচেৎ না। তারপর কোন শাস্ত্রের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে হয়, কর। কিন্তু আগে বুঝিতে চেষ্টা কর, তারপর মতামত প্রকাশ করিও।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় চক্ষুদ্বারাই ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা করেন, এবং নিজেদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কার ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভালমন্দ বিচার করিতেই বিশেষ আগ্রহশীল। আলোচ্য শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাঁহাদের সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না, এবং ভারতীয় শাস্ত্র যে পরিমাণে ইউরোপীয় শাস্ত্রের বা মতামতের অনুরূপ সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং যে পরিমাণে পৃথক সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট বলিয়া গণনা করেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিজেদের সংস্কার কিরূপে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে আরোপ করিয়া থাকেন তাহা বুঝাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক এবং দার্শনিক টেইন ম্যাক্সমূলারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।*

* Here close by us, is poor Mr. Maxmuller who, in order to acclimatise the study of Sanskrit was compelled to discover in the Vedas the worship of a moral God, that is to say, the religion of Paley and Addison. (Taine's History of English Literature. Vol. II, p. 479.)

তাৎপর্য্য—সংস্কৃতের আলোচনা ইউরোপে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে ম্যাক্সমূলার সাহেব বেদে এক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের আবিষ্কার করিতে, অর্থাৎ, পেলি, বা এডিসনের ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা টেইন ম্যাক্সমূলার অপেক্ষাও একটা জাতির সঙ্কীর্ণতার প্রতিই অধিক ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার মনোগত ভাব এই যে, ইংরেজ পাঠক এরূপ সংকীর্ণ যে, তাঁহারা যদি বেদে তাঁহাদের দার্শনিক বা লেখকদিগের অনুমোদিত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের (moral God) আভাস না পান তবে তাঁহারা কিছুতেই সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না। ম্যাক্সমূলার এই জন্যই বাধ্য হইয়া বেদে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, বেদে বাস্তবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরের (moral God) উল্লেখ আছে কি না, এবং উল্লেখ না থাকিলে ম্যাকসমূলার সাহেব প্রকৃত পক্ষে বেদে তাহা আরোপিত করিয়াছেন কি না, সে কথার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে সম্বন্ধে আমি এখানে কোন মতামত প্রকাশ করিব না। আমি কেবল এই কথাই বুঝাইতে চাই যে, ইউরোপীয়েরা এই রূপ নিজেদের সংস্কার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের উপর আরোপ করিয়া থাকেন, এবং সেই কারণেই তাঁহাদের অতুল অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম অনেক সময় নিরর্থক হইয়া যায়।

আর্থার এভলন সাহেব এইরূপ নিজের সংস্কার তন্ত্রের প্রতি আরোপ করেন নাই। তিনি ভারতীয় চক্ষু দ্বারাই ভারতীয় শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে (preface) তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সরল সংস্কৃতে রচিত। তথাপি সে গুলির অনুবাদ করিতে হইলে তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও সাধন-প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটী কাজ চালাইবার উপযোগী জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যাহারা জাতি, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তন্ত্রের সহিত সুপরিচিত এবং যাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট প্রাপ্ত শাস্ত্রের প্রতি এখনও শ্রদ্ধাবান তাহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে পর্য্যন্ত নিজেদের চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া না যায় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতীয় চক্ষুদ্বারাই ভারতীয় শাস্ত্র দেখিতে যত্নবান হইবেন। অতীতকালে এবং এমন কি বর্ত্তমান কালেও হিন্দুশাস্ত্রের যে হাস্যজনক ব্যাখ্যা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা আবশ্যক। †

আর্থার এভলনের গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমি ঐ গ্রন্থের এক বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, গ্রন্থকার অনুবাদের পুরোভাগে স্বরচিত এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। উহা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে ভূমিকায় বোধ হয় গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথম মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের রচনা কাল নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করিয়াছেন। ভিতরের এবং বাহিরের প্রমাণের (internal and external evidence) অনুবলে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাণপ্রিয় অস্ত্র, 'হয়তঃ,' 'বোধ হয়' প্রভৃতির সাহায্যে সম্ভবতঃ তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মহানির্ব্বাণতন্ত্র নিতান্ত আধুনিক, অর্থাৎ, হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, না হয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। তারপর বোধ হয় তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের

†The Tantras generally are written in comparatively simple Sanskrit. For their rendering, however, a working knowledge of their terminology and ritual is required, which can only be fully found in those to whom it is familiar through race upbringing and environment, and in whom there is still some regard for the ancient inheritence. As for others, they must learn to see through the Indian eye of knowledge until their own has been trained to its lines of vision. In this way we shall be in the future spared some of the ridiculous presentments of Indian beliefs common in the past and even now too current. Preface p. xvi

সম্প্রতি এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডিত্যের ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন; সর্ব্বশেষে বোধ হয় তিনি তন্ত্রশাস্ত্র যে নিতান্ত কুসংস্কারাপন্ন ও বীভৎস তৎসম্বন্ধে এক লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা ঝাড়িয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়াছেন। আমার এরূপ অনুমান করা যে নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ সাধারণ (average) ইউরোপীয় সমালোচক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এইরূপই করিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন আর্থার এভলনের বই হস্তগত হইল দেখিলাম যে, আমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। গ্রন্থকার পরপদক্ষুণ্ন পথে একেবারেই বিচরণ করেন নাই। তিনি সময়ও নির্দ্দেশ করেন নাই; মহাযানের সহিত সম্বন্ধেরও বিচার করেন নাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও নিতান্ত অবান্তর ভাবে। তিনি গালাগালিও দেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে সাবধানে শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূমিকাতে† তিনি তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও সাধন-প্রণালী ও ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যায়ও তিনি স্বকপোলকল্পিত মত প্রচার করিতে যত্ন করেন নাই। যেখানে তান্ত্রিক-দিগের মধ্যেই মতভেদ আছে সেখানে তিনি অতি সন্তর্পণে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের গুরু শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী মহানির্ব্বাণতন্ত্রের যে এক অমূল্য টীকা লিখিয়াছেন গ্রন্থকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্য্যে প্রধানতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। 'বৃদ্ধ' জগমোহন তর্কালঙ্কারের অতিরিক্ত টীকাও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিত হইত না। অধ্যাপকও শিষ্যবর্গ উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। শাস্ত্র লিখিত হইবার প্রথা প্রচলিত হইবার পরও শাস্ত্রের ব্যাখ্যারও অধিকাংশ কণ্ঠগতই থাকিয়া যাইত। শিষ্যগণ গুরুপরম্পরায় তাহা প্রাপ্ত হইতেন। এভলন সাহেব লিখিয়াছেন যে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই পরম্পরাগত শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিজের চেষ্টায়ই তাহা লাভ করিতে হইবে। * কোন লিখিত গ্রন্থ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত আর্থার এভলন সাহেব শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ স্বামী ও জগমোহন তর্কালঙ্কারের ন্যায় নিতান্ত আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামতও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন — এবং আজকাল বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয় কে?— তাঁহারা সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যার ভ্রম দেখাইতে না পারিলে নিজেদের পাণ্ডিত্য (scholarship) নিরর্থক হইল বলিয়া মনে করেন। ইহাতে শাস্ত্রের যে কদর্থ প্রচারিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ভাল কি মন্দ তাহা আমি বিচার করিতে চাহি না। উহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কি না তাহাও আমি বলিব না। আমার বক্তব্য এই যে, যে প্রণালীতে তিনি ইহার আলোচনা করিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রণালী। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের জন্য উৎকৃষ্টতর প্রণালী আর নাই। ভাক্ত বৈজ্ঞানিকতার দোহাই দিয়া যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ করিতেছেন, স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই করিতেছেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

---

† ভূমিকার ৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

* There are however some matters in the shastras or its accompanying oral tradition which he must, if disposed thereto, find out for himself. Preface p. xv.

জীবন-মৃত্যু

জীবনের মাঝে মৃত্যুর বাসা
মৃত্যু জীবনে রাজে,
মৃত্যুর মাঝে জীবনের আশা
জীবন-মৃত্যুর মাঝে।
সীমার মাঝারে মরণের খেলা,
অসীমে নাহি ত ঠাঁই ;
দোঁহার মিলনে কোথায় সে যে
ভাবিয়া না তারে পাই।
একেরে ছাড়ি' অপরের দেখা
কভু ত' হ'তে না পারে,
হৃদয় হইতে প্রীতিরে কাড়ি'
কোথায় রাখিব তারে ?
মৃত্যু বলিয়া সীমানা টানিলে
ফুরা'য়ে যায় কি কাজ ?
(তাই) মৃত্যুর মাঝে জীবনের আশা
জীবন মৃত্যুর মাঝ!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

দুই বন্ধু

(সেখ সাদী)

দুই বন্ধু দৈবযোগে নদী মাঝে পড়ে'
নিরুপায় হ'য়ে ভেসে গেল কিছু দূরে।
নিকটে নাবিক যবে উদ্ধারিতে এল,
"হেথা যাও"—এক বন্ধু তরা ঠেলে দিল—
"ওই মোর বন্ধু ডুবে, আগে লও তুলে,"
বলিতে বলিতে নিজে ডুবে গেল জলে!

শ্রীঅবনী মোহন চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদে—অস্ত্রচিকিৎসা

চাঁদসী প্রচলনমতে

ব্রণ বিজ্ঞান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবিষ্ট হোগলপাতিদ্বারা ব্রণ-প্রাচীর উপরে ও নিম্ন দিকে কর্ত্তিত হইলে, তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ব্রণ-গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অঙ্গুলি না গেলে সলাকা প্রবেশ করাইয়া দেখিতে হইবে, কোন দিকে গহ্বরের পরিমাণ বেশী আছে, (এই সময়েও ব্রণ-প্রাচীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) এবং যে দিকে গহ্বর বেশী আছে সেই দিকে এমত ভাবে কাটিয়া দিতে হইবে যেন অস্ত্র-মুখ ঢালু হয়, তবেই ব্রণের মধ্যস্থ পুঁজ-রক্ত স্বাভাবিক নিয়মে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। ব্রণের উপরিভাগের যে যায়গা পাতলা হইয়া যায় বা টোব ধরিয়া উঠে, সেই স্থলই গহ্বরের ঢালু দিক, ইহাই সাধারণ নিয়ম, এবং সেই স্থলেই প্রবল অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হয় ; কিন্তু বাতজ ব্রণে সচরাচরই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বায়ুর শক্তিতে হয়তো ব্রণ-গহ্বরের উপর দিক টোব ধরিয়া উঠিয়াছে, অথবা একাধিক স্থল এই প্রকারে টোব ধরিয়াছে এবং তাহার মধ্যে পুরু মাংস-পেশীর প্রাচীর বিদ্যমান আছে ; কিন্তু যে স্থলে অস্ত্র হইলে ঢালু হইতে পারে, যে স্থল ভয়ানক পুরু, অস্ত্র করিলে অতিরিক্ত রক্ত-স্রাব হইবে, অথবা শিরা বা মর্ম্মাদি আহত হইবার একান্তই সম্ভব এই প্রকার স্থলে যে যে স্থলে টোব ধরিয়াছে সেই সেই স্থলে অস্ত্র করিয়া সলাকা দিয়া দেখিতে হইবে কোন দিকে ব্রণের গহ্বর বিদ্যমান আছে ; এবং যদি এই অস্ত্রে ঢালু না হইয়া থাকে, তবে সলাকার মাথায় হোগলপাতি বা এরসেম লেন-চেট দ্বারা বা বোমা যন্ত্র দ্বারা নিম্ন প্রাচীর-গাত্রে সরু ছিদ্র

করিয়া দিয়া পলিতা বা রবারের নল দ্বারা পুঁজ বাহির করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহা ভিষকের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। স্ফোটকের একাধিক স্থলে অস্ত্র করা আবশ্যক হইলে প্রত্যেক অস্ত্রই মাংস-পেশীর লম্বালম্বি ভাবেই করিতে হইবে। আরাআরি ভাবে কখনও কোন স্থলে অস্ত্র করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে মাংস-পেশী কাটিয়া যাইতে পারে, অথবা শিরা বা স্নায়ু কাটিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা ক্ষতে তীব্র যন্ত্রণা হইতে পারে। অধিকন্তু ক্ষত সকালে পুরিয়া উঠে না, একটী উন্নত মাংস-পিণ্ড জন্মিয়া থাকে।

অস্ত্র-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অতি লঘু হস্তে চাপ দিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিবে। পুঁজ বাহির করিতে জোরে চাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগী দুর্ব্বল, বা অধিক দিনের ব্রণ বা বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ আদি অধিক পুঁজ-বিশিষ্ট ব্রণের পুঁজ প্রথম দিনে সম্পূর্ণ নিঃসৃত করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে রোগীর শরীরের রক্তের গতি সেই দিকে হইয়া রক্তাশয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ পুরাতন বড় ব্রণের পুঁজ এক কালীন সকল বাহির করিয়া দিলে রোগী ক্ষয়কাশে পরে আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভব, এবং এই অবস্থায় এই প্রকারে জ্বর হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। যথা-রীতি পুঁজ বাহির করিয়া একখণ্ড পাতলা ন্যাকরা আবশ্যক মতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে করিয়া ক্ষতের মুখে সলা-দ্বারা ছিপির মতন করিয়া রাখিবে। ন্যাকরা যাহাতে ব্রণ-গহ্বর মধ্যে বেশী না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গহ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ন্যাকরা দিলে পুঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায় ও অনেক স্থলে নুতন করিয়া প্রদাহ আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ অস্ত্রের পর দিবসই, প্রকৃতির শক্তিতে ব্রণ গহ্বরের চারি দিকের সুস্থ মাংসদ্বারা ব্রণ-গহ্বর অনেক পূর্ণ হইয়া যায়। ন্যাকরা মধ্যে দিলে, এই মাংস আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং ধ্বংস হইয়া যায়।

রক্তস্রাব—অস্ত্রের মুখে পাতলা ন্যাকরাই ব্যবহার কর্ত্তব্য, কেন না পাতলা ন্যাকরায় রক্তাদি যে প্রকার বন্ধ হয় মোটা বা মারাদি সংযুক্ত ন্যাকরায় তত সহজে বন্ধ হয় না। আর যদি হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ কোন ধমনী বা শিরা ছিন্ন হইয়া যায় তবে প্রথম ন্যাকরাদ্বারা জোরে চাপ দিয়াই বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু না হইলে জারিত লৌহ, হিরাকষ, ফটকারী চূর্ণ ইত্যাদি সঙ্কোচক ঔষধ ন্যাকরায় মাখিয়া বণ্ডেজ করিয়া দিবে; এবং উক্ত ঔষধের জলদ্বারা সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। ছাগল্লাদির পাতা, বিষল্যা করণীর পাতা, দুর্ব্বার মাইজ ইত্যাদি যে সব গ্রাম্য রক্তরোধক ঔষধ প্রচলিত আছে তাহাতেও এই সব স্থলে ভাল কাজ হইয়া থাকে। চীৎকার দিলেও বেশ ফল হয়।

ন্যাকরার চাপ দিয়া জলপটী পুরু করিয়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে পারিলেই ভাল হয়। রক্তরোধক সকল ঔষধই উত্তেজক, রোগীর বায়ু চড়া করিয়া দেয় কিন্তু একটুকু মোটা জাতীয় শিরা অথবা ধমনী যদি ছিন্ন হইয়া যায় তবে এই সব ঔষধে প্রায়ই রক্ত বন্ধ হয় না। সেই স্থলে শিরা ছিন্ন হইলে ক্ষতের নিম্ন দিকে এবং ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতের উপরের দিকে জোরে একটী বন্ধন দিয়া দিতে হইবে। সূক্ষ্ম ধারে পিচকারীর মত ছিটিয়া রক্ত বাহির হইলে শিরা, এবং দোমাইয়া দোমাইয়া বোকনা বোকনা রক্ত বাহির হইলে ধমনী ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই প্রকার বন্ধন দিলে ও যদি কোন কাজ না করে তবে ধমনী বা শিরার মুখ পাইলে তাহা বাঁধিয়া দিবে, আর যদি সঙ্কুচিত হইয়া মাংস-পেশীর মধ্যে বসিয়া যায় তবে যে স্থল দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তথায় গ্রেণ দুই কাওয়াইনের তুলা লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যদি সে স্থলেও না হয় তবে উত্তপ্ত লৌহ সলাকা দ্বারাই দগ্ধ করিয়া দিবে।

বণ্ডেজ—অস্ত্রের পর জল পটীই বাঁধিয়া রাখিতে

হইবে। এনটীসেপটীকের বন্ধন প্রণালী সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইতে পারে না। সুস্থ ও সবল ও নির্দ্দোষ শরীর না হইলে, বা রোগী রক্তদুষ্টি গরমি, মধুমেহ, কুষ্ঠ আদি বিষে দুষিত হইলে, এই প্রণালীতে কোনই কাজ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা ভারতের প্রকৃতির ও দরিদ্র পল্লীর সম্পূর্ণই অনুপযোগী। সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদে পূর্ব্ব বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালীই সমর্থন করিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তবে এনটীসেপটীক চিকিৎসা প্রণালীও আয়ুর্ব্বেদের প্রথম সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া দেখা যায়। যাহা হউক অস্ত্রের পর রক্তপুঞ্জ বন্ধ হইয়া গেলে ক্ষতোপরি পুরু গদি দিয়া বেণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইবে! এবং ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিবস বেণ্ডেজ খুলিয়া কাচা মলমের পটী দিতে হইবে। যদি অস্ত্রকালীন প্রাচীরাদি আহত হইয়া থাকে বা দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রদাহ না কমিয়া চারি দিকের লাল ভাব বিদ্যমান থাকে এবং ব্রণ-গহ্বর সঙ্কুচিত হইয়া না যায়, তবে আবশুক বোধে দুই তিন দিনও জলপটী রাখা যাইতে পারে, বা তোকমা,তিল, বেতাগাদি ব্রণ-সঙ্কোচক পুলটীশ আদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে সচরাচর প্রায় সর্ব্বদাই এই স্থলে কাচা মলমের পটীতেই বিশেষ ফল দর্শে। পুলটীশ আদি দিতে হইলে ক্ষত মুখের ন্যাকরা বাহির করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কাচা মলমের পটী দিলে অস্ত্র-মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিতে হইবে এবং মলমের পটী মাত্র কাটামুখ ও প্রদাহিত স্থানের উপর বসাইয়া দিতে হইবে, মধ্যে পূরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এনটিসেপটিক ভাবের চিকিৎসায় সকল স্থলেরই মলম বা ঔষধের পটীর উপর পান, বা কলাপাতা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রদাহ কমিয়া ব্রণ গর্ত্তে সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে, কাটা মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিয়া কষার জল দ্বারা (নিম, বট) ধৌত করিয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঔষধ দিতে হইবে। ধোয়ার সময় ফিট্‌কারি, তুত ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতের মধ্যে জোরে জল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ন্যাকরায় করিয়া জল দিবে এবং অতি সন্তর্পণে ভিজা ন্যাকরা দিয়া ক্ষতের মধ্যের রক্ত পুঁজ পুছিয়া ফেলিবে। উৎপন্ন মাংস-অঙ্কুর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রণে সামান্য পুঁজ আদি থাকিলে এক বেলা বেণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিলেও চলিতে পারে। অপর পক্ষে পুঁজের মাত্রা বেশী হইলে দুই তিন বারও বেণ্ডেজ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। অস্ত্রের পর দুই তিন দিন কাচামলমের পটী, পরে ক্ষতে পচা থাকিলে কাইটমলম বা ঘায়ের তেল, এবং সুস্থ হইয়া উঠিলে গোল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এ বিষয় বিস্তারিত ক্ষত রোগ বর্ণনকালে লিখিত হইবে। এই প্রকার চিকিৎসায় ব্রণ পুরিয়া না উঠিলে নালী ঘায়ের চিকিৎসা অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

ব্রণরোগীর কর্ত্তব্য—দিবা নিদ্রা, গম্য স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ, দীর্ঘ সময় উপবেশন বা শয়ন, মাদক দ্রব্য সেবন বা অনিষ্ট চিন্তা, রাত্রি জাগরণ যান বাহনে গমন নিষিদ্ধ।

পথ্য—রোগী দুর্ব্বল হইলে উত্তেজক ঔষধ, দুগ্ধ,মাংস, মৎস্য, ডাইল, ভাত ইত্যাদি বলকারক খাদ্য পথ্য। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য ও তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। গমের ছাতু পিষ্টক, গরম জল বিশেষ উপকারক। উত্তেজনা জন্য জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও স্নান আহার স্বাভাবিক অবস্থার মতই করিতে হইবে।

শ্রীকেশব চন্দ্র দাস।

প্রেমের কবর

বাদশাহের "হেনার বাগান" আজ পরিপূর্ণ.—ফুলের গন্ধে, আর বুলবুলের গানে। হাস্‌না গাছের হাজারো আঁখি এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে চাঁদের আলোর গোপন মন্ত্রে। বাগানের আলো-ছায়ার মখমল মোড়া স্থানের উপর মৃদু পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—তরুণ শাহ্‌জাদা; গায়ে তাহার সোনার বুটা দেওয়া ফিরোজা রঙের কুর্তা. পায়ে সোনার জরি মোড়া চটী; কটীতে হীরার ধারের মিশরী ছুরি, মুখে বেদনা-মাখা কেমন চিন্তান্বিত ভাব। খানিক পরে বাগানের এক কোণে কুঞ্জ-অন্তরালে একটী ক্ষুদ্র মর্ম্মর বেদিকার উপর শাহ্‌জাদা উপবেশন করিলেন।

চাঁদ রজত জ্যোৎস্নায় দিগন্ত প্লাবিত করিয়া বনের মাথার উপর আসিল। শাহ্‌জাদা লক্ষ্যহীন দৃষ্টে তাহাই দেখিল। কাণ্ড বুলবুল কুঞ্জবনে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্ন-ভোর পাখীর দু'একটী মধুস্বর রাত্রির পাণ্ডুর মুখে চুম্বন-ধ্বনির মতো বজিয়া উঠিতেছিল। শাহ্‌জাদা উঠিলেন না, সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কত-ক্ষণ পরে কি চিন্তায় তাহার মুখ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল —একদিনের ছবি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। সে এমনি নির্জ্জন রাত্রি,—বনান্তরালে চাঁদ এমনি হেলিয়া পড়িয়াছিল।

* * * *

শাহ্‌জাদা বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন,দেখিলেন —ইরাণী বাঁদী বালিকা আনার কলি তাহার উৎফুল্ল কুসুম-গুচ্ছ তুল্য হৃদয়-অর্ঘ্য উদ্যান-কোণে মর্ম্মর বেদিকায় লুটাইয়া দিয়া ঘুমাইতেছে! চুম্বন-ওষ্ঠ পাথরে মিলাইয়া বালিকা যেন একান্ত আগ্রহে এই পাষাণ বেদিকাকেই আপনার প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে! মর্ম্মর বেদিকার চতুর্দ্দিক সৌরভসিক্ত অজস্র পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

বালিকার বসন্তকোমল একটী বাহু ঝুলিয়া পড়িয়াছিল—শাহজাদার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে দেখিলেন কোমল হাতে একখানি কাগজের খণ্ড। কাগজ-খণ্ডে একটি কবিতা।

"গুফ্‌তাম আজ এশকে বুঁতা আয়
দিলচে হাসেল্ কারদাই।
গুফ্‌ত মারা হাসেলে জুজ লাল
হায়ে ধার নিস্ত॥"

শাহ্‌জাদা এই কবিতায় বালিকার আকুল হৃদয়ের মর্ম্ম-বেদনা ছত্রে ছত্রে—অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিলেন। কে এই বালিকার প্রাণ-পুষ্প-অর্ঘ্যের দেবতা!

শাহ্‌জাদা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই কবিতার নিম্নে এই কয়েকটী কথা লিখিলেন,—

"পেশ আহলে দিদা ফারকে
দারগুল ও দারখার নিস্ত।"

শাহজাদা প্রত্যহ উদ্যান-প্রান্তে এই নির্জ্জন মর্ম্মর পাথরে উবেশন করিতেন। অপরাহ্ণ রবির সুবর্ণ আভা বৃক্ষকুঞ্জের মধ্য দিয়া আসিয়া শাহজাদার তরুণ মুখে কমনীয় রূপের জ্যোতি মাখাইয়া দিত। বালিকা এখানে আসিয়া প্রত্যহ বাদশাপুত্রের হাতে বৈকালিক শরবৎ ও মিষ্ট আনার-রস প্রদান করিয়া যাইত। স্বচ্ছ কাচের-পাত্রে ঈষৎ-রক্ত আনারের রস, বৈকালিক রশ্মির রক্তিম লালিমা ও শাহজাদার রক্তিম মুখের হাস্য-দীপ্ত কমনীয় জ্যোতি মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিত—প্রেম-দেবতার তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

এই বালিকা প্রত্যহ নিশীথ নীরবতার মধ্যে এই মর্ম্মর বেদিকার পাদমূলে একান্তে বসিয়া সমগ্র হৃদয়ের প্রেম-পরিপ্লুত নয়ন-বারি দ্বারা কোন দুর্লভ প্রেমদেবতার তপস্যা করিত কেহ জানিত না।

একদিন নিশীথ-নির্জ্জনতার মধ্যে রূপোন্মত্ত রাজভৃত্য দিলদার বালিকার প্রণয় ভিক্ষা করিল, বালিকা তীব্র স্ফুলিঙ্গের মতো বলিয়া উঠিল, "কুকুর,

আমি বিবাহিতা—আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা। বাদশাহকে বলিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড হইবে।”

দিলদার ঘৃণায় ও ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার দর্প চূর্ণ করিবার সংকল্প মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া তাহারই পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর সে কখনো এমন হীন সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইবে না। সজল নয়নে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বালিকার দয়ার পাত্র হইয়াছিল।

* * * *

আজ আনার স্বপ্নে দেখিল, তাহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমদেবতা প্রার্থিত বর লইয়া শিয়রে আসিয়া দণ্ডায়মান।

আনার কলি প্রেম-পুলকে জাগরিত হইয়া যাহাকে দেখিল, তাহা তাহার স্বপ্ন-কল্পানারও অতীত ; দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ ও আধস্বপ্নজড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কে তুমি ? স্বর্গের দেবতা!

শাহজাদা বিস্ময়-জড়িত ও কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আমি স্বর্গের দেবতা নই, আনার। আমি শাহজাদা।” আনার অধিকতর বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বলিল, “তুমি স্বপ্ন—সেই সত্য হোক। আমার স্বর্গের দেবতা যেন কখনো এমন ভাবে ধরা দিতে না আসে।”

শাহজাদা বিস্ময়াম্বিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কে তোমার স্বর্গের দেবতা আনার! কাহার জন্য তোমার এ প্রেম-রাত্রি-জাগরণ ?” আনার আকুলকণ্ঠে উত্তর করিল, “স্বর্গের দেবতা!—কেমনে বলি শাহজাদা, যদি তিনি আজ আমার শিয়রে আসিয়া না দাঁড়াইতেন,—তিনি যদি সেই মর্ম্মের গোপন হর্ম্ম্যে, তিনি যেখানে বিরাজিত সেখানেই থাকিতেন,—তবে তাঁহার সম্মুখে মন খুলিয়া—হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিতাম,—কে সে স্বর্গের দেবতা! বলিতে হয়, বাঁদীর ধৃষ্টতা শাহজাদা ক্ষমা করিলে বলিতে হয়,—আমার স্বর্গের দেবতা, বেহেস্তের মালিক আজ আমার সম্মুখে!” শাহজাদা প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আনার, এ তোমার স্বপ্ন নয় তো ?” আনার অশ্রুপূর্ণ আনতনেত্রে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, “শাহজাদা যদি এ সত্য স্বপ্নও হইত, তবু আমি সুখী। ইহার বেশী বাঁদী আশা করিতে পারে না। জাগ্রতে—স্বপ্নে—আমার একই দেবতা। হে বেহস্তের মালিক! স্বপ্ন এবং সত্য উভয়ই আমার নিকট সমান। জাগ্রতে আমার দেবতা দূরের হইলেও স্বপ্নে তিনি আমার একান্ত আপনার।”

শাহজাদা সস্নেহে আনারের হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, “তোমার মতো নির্ম্মল প্রেমের রাজ্য দীন-দুনিয়ার অধীশ্বরেরও প্রার্থনীয়। তুমি সত্যই আমার!”

শাহজাদা আনারের গণ্ডে একটী রক্তিম চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

পরদিন ইরাণী বাঁদী আনারকলি শাহজাদার একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী নাদিরা বেগম নামে পরিচিত হইলেন।

* * * *

দিলদার আনিয়া শাহজাদাকে একখানি পত্র দিল।

“যদি এতকালের ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া না থাক তবে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ‘হেরামের’ বাহিরের উদ্যানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও,—ওমর।”

দ্বিপ্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাছের ছায়া বাগানের বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। কতক্ষণ পর শাহজাদা দেখিলেন, অপাদমস্তক “বোরকায়” আবৃত কে একজন অন্তঃপুরের প্রান্তবর্ত্তী দরজা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বাগানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। তখন কে একটী যুবক কুঞ্জবনের প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া সেই “বোরকা” ঢাকা মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তখন “বোরকার” মুখাবরণ অপসারিত হইল, যেন মেঘের মধ্য হইতে পূর্ণ চন্দ্র ফুটিয়া বাহির হইল।

কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর “বোরকা” আবৃত করিয়া মহিলাটী দ্রুত অন্তপুরের দিকে অগ্রসর হইল। অপর

মনুষ্য মূর্ত্তিটী মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

শাহজাদার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত খেলা করিতেছিল; তিনি তাড়াতাড়ি উদ্যান কানন হইতে বাহির হইয়া মহিলার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন।

"কে তুমি এই নিশীথ অভিসারে পাপিয়সী?"

এই কণ্ঠস্বরে মহিলা কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্কুচিতা হইয়া পথের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

"বল কে তুমি—বল, এখনই তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব"—শাহজাদা গর্জ্জিয়া এই কাথাগুলি বলিলেন।

মহিলা 'বোরকা' ঈষৎ উন্মোচন করিয়া বিষাদ মিশ্রিত করুণ কণ্ঠে বলিল, "শাহজাদা, আমি নাদিরা।" শাহজাদা, বজ্রকঠোরকণ্ঠে বলিলেন, "নাদিরা! সত্যই তুমি পাপীয়সী নাদিরা! নিশীথ নির্জ্জনে কোন প্রেমাস্পদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়াছিলে?"

নাদিরা করুণকাতরকণ্ঠে বলিল, "শাহজাদা, এ আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" "এই চক্ষু যেখানে সাক্ষী সেখানে প্রতারণার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।" শাহজাদা কঠোরকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিলেন।

আনারের ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহা কেমন অস্ফুট চীৎকারের মতো নির্গত হইল। শাহজাদা বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "সয়তানী, চুপ কর; স্বীয় অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখ। প্রায়শ্চিত্ত এখনই হোক।" শাহজাদা কটিহইতে ছুরি উন্মোচন করিলেন। উদ্যত মুষ্টির মধ্যে থাকিয়া ছুরিখানা ঝকমক্ করিয়া উঠিল, শাহজাদা দুই পদ অগ্রসর হইলেন, তারপর দুই পদ পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "না, কলঙ্কিনীর শোণিতে এ হস্ত মলিন করিব না। এই খানেই তোর জীবন্ত সমাধি হোক—তা হলেই প্রকৃত দণ্ড হইবে।"

সেই খানেই নাদিরাবেগম শোকে দুঃখে স্বামীর অবিশ্বাসে ও ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল।

শাহজাদার ভৃত্যেরা সেই খানেই নাদিরা বেগমের কবর খনন করিয়া তাঁর সমাধি দিল।

* * * * *

তারপর এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। অমল জ্যোৎস্না-স্রোতে আজো সমস্ত উদ্যান পরিপ্লাবিত। শাহজাদার হৃদয় আজ শূন্য,—কেবল মাত্র শূন্য নহে—বিচূর্ণ। তিনি "হেনা" কুঞ্জের পার্শ্বস্থ বেদিকায় উপবেশন করিয়াছিলেন। "হেনার" সুরভি শ্বাস—তা'ও আজ তিক্ত, বুলবুলের প্রেম কাকলী অর্থশূন্য এবং চাঁদের জ্যোৎস্না শীর্ণ মলিনতার বিশুষ্ক ছবি।

এমন সময় শাহজাদা দেখিতে পাইলেন, কবরের কাছে কে একজন অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, নূতন কবরের উপর রাশিকৃত পুষ্প সম্ভার সজ্জিত করিয়া একটী যুবক একান্ত মনে কি প্রার্থনা করিতেছে।

শাহজাদা নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু যুবক কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; একান্ত মনে প্রার্থনায় রত রহিল। শাহজাদা ক্ষণেককাল স্তব্ধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক উঠিয়া ঊর্দ্ধনয়নে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "খোদা! ভগ্নীকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিও। এই নিষ্ঠুর ভ্রাতার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়, বলিয়া দেও, প্রভু!" শাহজাদা অগ্রবর্ত্তী হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,

"কে তুমি?—কাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছ?"

যুবক মস্তক তুলিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল,

"দেবীর পূজা করিতেছি, তিনি এখন স্বর্গলোকে। শাহজাদা, এ হতভাগ্যই এই দেবী প্রতিমাকে হত্যা করিয়াছে!"

শাহজাদা সংশয়পূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি!—তাহাকে হত্যা করিয়াছ কেমনে!"

"আমি ছাড়া তাহার অন্য আশ্রয় কিছুই ছিল না।

পিতৃ মাতৃহীন দুই ভাই ভগিনী এই স্বর্ণভূমি হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলাম—আমি বাদশাহের সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করি। অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইল দুঃখিনী আনার। আমি ভগ্নী-ঘাতক পাপিষ্ঠ ওমর।"

ওমরের অবিরল অশ্রুধারা কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছিল।

"ওমর, আমিই তোমার প্রেমময়ী ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ। হায় খোদা! কি কঠোর শাস্তি দিলে আমাকে!" শাহজাদার কণ্ঠ শোকাবেগে নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অবনত হইয়া কবরের মৃত্তিকা চুম্বন করিতে লাগিলেন। কোকিলের কণ্ঠ—হেনার গন্ধ কোন অভূতপূর্ব্ব বেদনা-ভারে আপ্লুত হইয়া শূন্য আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছিল। কতক্ষণ পরে তিনি ওমরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই ওমর, তুমি এখানে আমিরের পদ গ্রহণ করিয়া অবস্থান কর।"

ওমর কাতরকণ্ঠে বলিল, "শাহজাদা, আর আমার ধন গৌরবের বিন্দুমাত্র অভিলাষ নাই। এখন কোথাও নির্জ্জনে ঈশ্বরধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিব। শুধু এই প্রার্থনা বৎসরান্তে এই দিনে আসিয়া যেন এই প্রেমের কবর দর্শন করিতে পারি এই অনুমতি করুন।"

* * * * *

কত বিজন সন্ধ্যা, কত নীরব রাত্রি শাহজাদাকে শোকতপ্তঅশ্রুপাতে এই কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতে দেখিয়াছে, ইয়ত্তা নাই।

পরে শাহজাদা এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড "মকবারা" নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে একখানা তুষার-ধবল মর্ম্মর প্রস্তরে প্রাণের এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন,

"আগর্ মন্ বাজ বাইনাম্ রিউ ইয়ার-ই-খেশ রা।
তা কেয়ামৎ শুক্র্ গোয়াম্ কির দিগার-খেশ রা॥"

—হায়! যদি ক্ষণেকের তরে
আর একবার ফিরে,
পাইতাম দেখা কভু (সেই) হারান সখার!
খোদা! রাখিতাম হৃদে করি
এই কৃতজ্ঞতা ভরি
শেষ বিচারের দিন যবে আসিত আমার।

লাহোরের "গুল বাগের" সন্নিকটে আনার কুঞ্জের এক পার্শ্বে একটী বিশাল সমাধি-গুম্বজ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইহারই অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে একখানি সুদৃশ্য তুষার-ধবল মর্ম্মর প্রস্তরে যত্নে খোদিত এই কয়টি কথা অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

আলোচনা

ভাটিয়াল গান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

প্রতিভার ১৩২১ সনের বৈশাখের সংখ্যায় কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তন্মধ্যে শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত মহাশয়ের সংগৃহীত কতিপয় ভাটিয়াল গান দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। যোগেন্দ্র বাবু যে এমন 'ভাবের' গান গুলি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি তিনি ক্রমশঃ এই শ্রেণীর গান সংগ্রহ করিয়া অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

আমি সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, অন্য কথায়, গান জানি না একথা বলাই মোটের উপর যুক্তি যুক্ত। আর, প্রবন্ধ লিখা সম্বন্ধেও আমার বিদ্যা বুদ্ধির তদ্রূপই অভাব। তবে যে আমি প্রবন্ধ বিশেষ সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহাতে আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল মাত্র নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে কোন সত্য বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ যাহাতে সাধারণের নিকট ঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার কথঞ্চিৎ চেষ্টা মাত্র।

আমি যোগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত সকলগুলি গান সম্বন্ধেই যে কিছু মতামত প্রকাশ করিব তাহা নয়; মাত্র একটী গান সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

"ওরে দয়াল তোমায় ডাইকা সানাল ইত্যাদি"

এই সঙ্গীতটীর "সানাল" শব্দের অর্থ কোন ভাষায় ঈশ্বর কি না তাহা আমি জ্ঞাত নাহি। তবে যতদুর বুঝিতে পারি বাঙ্গালা অভিধানে বোধ হয় "সানাল" শব্দের অর্থ ঈশ্বর হয় না, অথবা অভিধানে "সানাল" শব্দটীই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। আমি আরবি বা ফার্সী ভাষা কথনও আলোচনা করি নাই, সুতরাং উক্ত কোন ভাষায় যদি "সানাল" শব্দ ঈশ্বর অর্থ বোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ বিষয় যোগেন্দ্র বাবু হয়তো জানিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। "সানাল" শব্দের অর্থ যদিও কোন ভাষায় ঈশ্বর হয়, তবু আমি বর্ত্তমান সঙ্গীতটীতে "সানাল" অর্থ ঈশ্বর করা সঙ্গত মনে করি না, যে হেতু, এই অর্থে উক্ত সঙ্গীতটীর ভাব সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হইবে না। আমি এই সঙ্গীতটী কয়েক বার কোন কোন ভক্ত ফকীর এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের মুখে গীত হইতে শুনিয়াছি। এই গানটী সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট একটু তথ্য সংগ্রহ করিতেও প্রয়াস পাইয়াছি।

গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যে পথে প্রত্যহ ষ্টিমার যাতায়াত করে তৎপার্শ্বের একটী ষ্টেশনের নাম মইনট। ষ্টেশনটী রাজখাড়া ষ্টেশনের কিছু "উজানে" অবস্থিত; গোয়ালন্দ হইতেও বেশী দুরবর্ত্তী নয়। মইনট্ মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। এই মইনট ষ্টেশনের নিকট দিয়া ষ্টিমার গমন কালে ষ্টিমার হইতে "নরুল্লাপুর" নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এক বৎসর অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে আমি ষ্টিমার যোগে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে আসিতেছিলাম। তখন ষ্টেশনের অনতিদুরে উক্ত নরুল্লাপুর গ্রামে একটা জনতা আমার নয়ন গোচর হইল। আমি আরও দেখিলাম যে, ঐ স্থানটীকে সুন্দর সুন্দর পতাকা ও কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে; সুতরাং স্বভাবতঃ আমার মনে বিষয়টা ভালরূপে অবগত হইবার ঔৎসুক্য জন্মিল। আমি ষ্টিমারের কোনও কোনও আরোহীর নিকট এ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে আমি জানিতে পারিলাম, উপরোক্ত নরুল্লাপুর গ্রামে "সানাল" ফকার নামে জনৈক মুসলমান সাধক বাস করিতেন। তিনি আপন শিষ্যদিগকে লইয়া ঐ সময় একটী মেলা মিলাইতেন। অর্থাৎ তিনি স্বীয় মতাবলম্বী ধর্ম্মানুরাগী লোকসহ ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্ম সঙ্গীত ইত্যাদি উপায়ে কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন। উক্ত "সানাল" ফকীর এখন জীবিত নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র এখনও স্বর্গ-গত ফকীর সাহেবের স্মরণ ও সম্মানার্থ প্রতি বৎসর সেই মেলা মিলাইয়া থাকেন; এবং এখনও এই মেলায় শত শত ভক্ত একত্র হইয়া স্বর্গীয় ফকীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং আধ্যাত্মিক ভাবের 'ফকীরী' সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতা দিগকে বিমোহিত করেন। আমি যখন ষ্টিমারে আরোহী বিশেষের নিকট "সানাল" ফকীরের মেলার বিষয় শ্রবণ করিলাম, তখন, আমার পূর্ব্ব পরিচিত কয়েকটী ভক্তের কথা মনে হইল, এবং তাঁহাদের নিকট সময় সময় "সানাল" ফকীরের নাম শুনিয়াছি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকের মুখেই এইরূপ ফকীরী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অনেক সময় এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিয়াছি; তাহাও তখন আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইল।

এখন দেখা যায় যে, উল্লিখিত "ওরে দয়াল ইত্যাদি" সঙ্গীতটিতে যে "সানাল" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যোগেন্দ্র বাবু যাহার অর্থ ঈশ্বর করিয়াছেন, সেই "সানাল" শব্দ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর অর্থ জ্ঞাপক নয়। এই "সানাল" শব্দে পূর্ব্বোক্ত "সানাল" ফকীরকেই বুঝায়। সানাল ফকীরই বলিতেছেন, "ওরে দয়াল, আমি সানাল" তোমাকে ডাকিয়া কুল পাই না। এই অর্থ গ্রহণ করিলে বোধ হয় সমস্ত সঙ্গীতটীর অর্থও পরিষ্কার হয়।

তার পর, যোগেন্দ্র বাবু এই গানটীর সহিত অপর একটী গান একত্র করিয়া লইয়াছেন।

"আগে যদি জান্‌তাম" হইতে শেষ পর্য্যন্ত গানটী অন্য একটী গানের অংশ মাত্র। 'কাণ্ডারী হইও রে' পর্য্যন্তই পূর্ব্ব সঙ্গীতটীর শেষ।

আমার যতদুর মনে হয়, তাহাতে শেষোক্ত সঙ্গীতটী এই—

"মাঝি বাইয়া যাও।
আগে যদি জান্‌তাম রে ভাই মাঝী * এতই চোর
তবে কি দিতাম্ রে যাগা তেমাল্লার উপুর।
মাঝী বাইয়া যাও।
ঘরখানা—তোর ভাঙ্গারে চুরা
দুয়ার কেন বান্দ,
আরে আপনি মরিয়া যাইবা, কার লাইগা কান্দ।
মাঝী বাইয়া যাও।"

আমার বোধ হয় এই সঙ্গীতটীর আরো দুই একটী "অন্তরা" আছে। কিন্তু সকলগুলি 'অন্তরা' আমার ঠিক মনে হয় না। সংগ্রহকারী যোগেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিলে হয়তো সম্পূর্ণ সঙ্গীতটী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

এখানে ইহাও বলা অনাবশ্যক হইবে না যে, উপরোক্ত গান দুইটীর সুর বোধ হয় এক নয়। আমি দুইটী গান একই লোকের মুখে বিভিন্ন সুরে গীত হইতে শুনিয়াছি। অবশ্য উভয় সুরই ভাটিয়াল সুরেরই অন্তর্গত। যোগেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিলে বোধ হয় সুর দুইটী সম্বন্ধেও ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তিনি শেষোক্ত গানটীর অর্থাৎ 'মাঝী, বাইয়া যাও' এই গানটীর প্রথম পংক্তিতে লিখিয়াছেন, "মাঝীর এতই চোট"; কিন্তু আমি সেই স্থলে 'মাঝী 'ত চোর' শুনিয়াছি, আমার ইহাও মনে হয় যে, ঐস্থানে "মাঝী এতই চোর" হওয়ায় সম্ভাবনাটাই অধিক। পদ্যে 'চোট' এবং 'উপুর' এই দুইটী শব্দের মিল হয় না। 'এতই চোর' এবং "তেমাল্লার উপুর" হইলেই পদ্যাংশে অনেকটা মিল লক্ষিত হয়। তিনি প্রথম সঙ্গীতটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সহিত শেষোক্ত সঙ্গীতটীর অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই উহার প্রথম পংক্তিতে "মাঝির এতই চোট" লিখিয়া থাকিবেন। যোগেন্দ্র বাবু "তেমাল্লার উপুর" কথাটীর অর্থ "তিন তালা দালানের সমান উঁচু ঢেউয়ের উপর" এরূপ করিয়াছেন। আমার মনে হয় "তেমাল্লার উপুর" অংশের অর্থ ঐরূপ না করিয়া "অতি যত্নের সহিত ও সংগোপনে" করিলেই ভাল হইত। এইরূপ অর্থ করিলে গানটী সম্পূর্ণরূপে অন্য আকার ধারণ করিবে। শেষোক্ত সঙ্গীতটীর প্রথম দুই পংক্তি যদি এইরূপ হয়—

"আগে যদি জান্‌তাম রে ভাই, মাঝী এতই চোর, †
তবে কি দিতাম্ রে যাগা তেমাল্লার উপুর?"

তবে ইহার অর্থ নিম্নোক্ত রূপ হওয়াই সঙ্গত।

সঙ্গীতটীর রচয়িতা একজন সাধক। তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বা ভগবানকেই মাঝী বা চালক বলিতেছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, ভগবানের প্রতি মন দেওয়ার পর হইতে তাঁহার সাংসারিক বিষয়ের প্রতি আসক্তির হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আকাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই; সুতরাং এই সময়টা তাঁহার পক্ষে একটা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন মাঝী অর্থাৎ ভগবান যেন তাঁহার মন চুরি করিয়াছেন এবং তিনি আর তাঁহার মনকে সংসারের দিকে সহজে আনিতে পারেন না।

* "মাঝী" স্থলে "সাধু" শব্দের প্রয়োগেও এই গানটি বিক্রমপুর অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

প্রঃ—সঃ।

† "সাধু এতই চোর" এই পাঠ ধরিলে অর্থ প্রতিপত্তির কোনই গোল হয় না। আগে যদি জানিতাম যারা সাধু বলিয়া পরিচিত তারা ধর্ম্মধ্বজী তবে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতাম না, এবং তাহাদের উপদেশ মত কার্য্য করিতাম না।

প্রঃ—সঃ।

কাজেই তিনি ভগবানকে নিজস্ব জানিয়া মুখে তাঁহার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এই ভাবটী ভক্তের আব্দার বলা যাইতে পারে। ভক্তের তখনকার ভাব বড়ই মধুর। এই ভাবটীকে বাৎসল্য ভাব বলিলেও হয়। অথবা ইহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে প্রবাহিত অনাবিল আবেগের প্রকাশ মাত্র। এই কথাটী হইতে হয়তো আরও সুন্দর ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। সে বিষয়ের অধিক আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের টীকাতে লিখিয়াছেন "এই লুপ্ত প্রায় গানগুলি সংগ্রহ করিয়া যেন ইত্যাদি।" এই শ্রেণীর গানগুলি সবই যে লুপ্তপ্রায় একথা বলা যায় না, কারণ আমি পূর্ব্বে সানাল ফকীরের যে সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্প্রদায়ের লোক এখনও এইরূপ অনেক নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকেন। অবশ্যই ইতঃপূর্ব্বে রচিত এই শ্রেণীর কতক গান লুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যোগেন্দ্র বাবু সহরে থাকেন বলিয়া ভাটিয়াল গান সংগ্রহ কার্য্যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই সহরে এত নাটক, যাত্রা ও খেমটা সঙ্গীতের মধ্যে সেই সকল সঙ্গীতের আলোচনা কমই দেখা যায়। মফঃস্বলেই এই শ্রেণীর গানের চর্চ্চা হইয়া থাকে। যদিও ইহা মফঃস্বলের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত, তবু ইহার লালিত্য ও প্রাণমাতান মধুর ভাব অন্য সঙ্গীত অপেক্ষা অনেক সময় উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বিগত কয়েক বৎসর কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান কালে একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের দিন অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ উৎসবোপলক্ষে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাতরুপাসনা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে, একটী মহিলা যে দুই একটী ভাটিয়াল গান গাহিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া মনে যে অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। ঐ গান যিনি শুনিয়াছেন, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিনি নিশ্চয়ই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। যে সকল সঙ্গীতের এরূপ প্রাণমনমুগ্ধকারিণী শক্তি, সেই সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ কার্য্যে যোগেন্দ্র বাবু ব্রতী হইয়াছেন, অতএব তিনি প্রকৃতই উৎসাহ পাইবার যোগ্য। আশা করি, যোগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত সম্প্রদায়-সংসৃষ্ট লোকের নিকট হইতে ভাটিয়ালগান সংগ্রহ করিয়া প্রতিভার পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিবেন। তিনি চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সানাল ফকীরের ন্যায় আরও অনেক ভক্ত সাধক অনেক স্থানে এইরূপ সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, এবং এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত জনের নিকটও সঙ্গীত সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার কর।

"শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ"

প্রতিবাদ

[আতুয়া শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২০ বঙ্গাব্দে ১১শ সংখ্যা প্রতিভায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধের যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা সম্যক প্রকাশিত করার স্থান প্রতিভায় নাই, সুতরাং যে সমস্ত আপত্তি তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই সংশোধিত ভাষায় সংক্ষেপে মুদ্রিত হইল। অসংযত ভাষা ও অবান্তর কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।]

প্রতিভা সম্পাদক।

(১) উপেন্দ্র বাবু "বঙ্গের চতুষ্পাঠি সমূহে" রঘুনাথ সম্বন্ধে যে "অনেক ইতি কথা প্রচারিত" আছে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে, এইরূপ বলিয়াছেন, অথচ

সেই সব ইতি কথা আলোচনা-যোগ্য মনে করেন নাই। আমরা এরূপ অনেকের মত অবগত আছি যাঁহাদের কথার মূল্য অল্প নহে।

(২) উপেন্দ্রবাবু কল্পিত সুবিদ নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুবিদ নারায়ণ কি কল্পিত? যদি সুবিদ নারায়ণ কল্পিত হয় তবে তাঁহার কাল বিচারের প্রসঙ্গ কেন?

(৩) উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "কাত্যায়ন রঘুপতি ....তাহাকে কুলগৌরবধ্বংসকারী জ্ঞানে...নবদ্বীপে গমন করেন" ইত্যাদি।

এ কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে লিখিত বা সমর্থিত হয় নাই। ১৩৯ পৃঃ ২।২।৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনমতে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চখণ্ড ভাস্কর বর্ম্মার অধীন ছিল, সুতরাং ত্রিপুরা রাজকর্ত্তৃক পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে উহা দান করার প্রসঙ্গ ঠিক নহে—এই কথা উপেন্দ্র বাবু বলিতে চহেন; অথচ তিনি তদীয় কাছাড়ের ইতিবৃত্তের ১ম অধ্যায়ে ১৯পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন? তিনি উক্ত পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায়ই বা কি লিখিয়াছেন?

(৫) (ক) "কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, স্বর্ণকৌশিক, গৌতম এবং বৎস্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ ৬৪১ খৃঃ একত্র আসিবার এক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে কয়েক শাখা আধুনিক, প্রমাণ পাওয়া যায়।"

(খ) "এই দশ গোত্রের অন্তর্গত বাৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি।......সুবিদ নারায়ণ ১৫শ শতাব্দীর হইলে তাঁহার ১০ম পুরুষ উর্দ্ধতন নিধিপতি যে ৬৪১খৃঃ শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"

(গ) "বৎস্য গোত্রে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধি।......শ্রীচৈতন্যের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র ১৪৫১ খৃঃ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া শ্রীহট্টে বসবাস করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর বাৎস্য গোত্র এবং তাঁহাদের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত বুরুঙ্গার বাৎস্যগণ ৬৪১ খৃঃ ত্রিপুরার যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্টে আগমন করেন কিরূপে?"

আলোচনা—(ক) দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ৬৪১ খৃঃ একত্র শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন ইহা লেখক "উপরোক্ত আখ্যানে" কোথায় পাইয়াছিলেন? শ্রীহট্টের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৩য় অংশ ১৮৬ পৃষ্ঠা, এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশ গোত্রীয়ের মধ্যে কোন কোন শাখা আধুনিক?

(খ) জাতীয় ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বাৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি বলিয়া লিখিত হয় নাই। আনন্দ বাৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

নিধিপতি আনন্দের পঞ্চদশ পুরুষ পরে, তাঁহার দশম পুরুষে সুবিদ নারায়ণের জন্ম। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এই হিসাবে কাজেই ৬৪১ খৃঃ বাৎস্য গোত্র শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হয় যেহেতু "সুবিদ নারায়ণকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়।"

কাছাড়ের ইতিহাসের ২৩ পৃষ্ঠায় লেখক স্বয়ংও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

(গ) বৎস্য গোত্রীয় শ্রীনন্দ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। শ্রীনন্দের সম্পর্ক শ্রীচৈতন্যের পিতামহের সহিত ছিল বলিয়া কে উপেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিয়াছে? শ্রীনন্দের বংশধর রায়গড় প্রভৃতি বাসী। দত্তরালী ও বুরুঙ্গাবাসীগণ যে শ্রীনন্দের সন্তান নহেন ইহা তাঁহারা নিজেই বলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে মধুকর মিশ্রকে সাম্প্রদায়িক বৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় নাই—শ্রীনন্দকেই বলা হইয়াছে। মধুকর মিশ্র পরে শ্রীহট্টে আসিয়াছেন ইহা শ্রীহট্টে স্বীকৃত বটে। মধুকর মিশ্র উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছেন বলিয়া জাতীয় ইতিহাসে লিখিত হইলেও শ্রীহট্টে স্বীকৃত হয় নাই। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মধুকর মিশ্রের শ্রীহট্টে আসা

অসম্ভব, কারণ চৈতন্যদেব ১৭৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের বৃদ্ধ বয়সের ছেলে, তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর ধরিলেও ১৪৫১ খৃঃ জগন্নাথের বয়স ১৬ বৎসর হয়। মধুকর মিশ্র পুত্র পৌত্রাদি লইয়া শ্রীহট্টে আসেন নাই; একা আসিয়া বিবাহ করিয়া শ্রীহট্টে থাকিয়া যান. ইহাই প্রচলিত ও প্রমাণসিদ্ধ কথা।

জাতীয় ইতিহাসের ১৯৬ পৃষ্ঠায় ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টে আসেন এই কথা বলা হয় নাই। তিনি তৎপূর্ব্বে উড়িষ্যা ত্যাগ করেন বলা হইয়াছে।

বুরুঙ্গায় পঞ্চ প্রবরান্বিত বৎস্যগোত্রীয়গণ ও দত্তরালীর পঞ্চ প্রবরযুক্ত বৎস্য গোত্রীয়গণ একই বৃক্ষের দুটি শাখা। সাম্প্রদায়িকদের সহ আদান প্রদানে বুরুঙ্গার বৎস্যগণ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

(৬) "শ্রীচৈতন্যের বংশ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রূপে বঙ্গে সুপরিচিত।" বঙ্গের কোন জেলায় এই বংশ বর্ত্তমান?

মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত ও প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য।

(৭) "সুবিদ নারায়ণ ও ওসমান নামধেয় এক জন সেনাপতি সমসাময়িক"—ইহারা সমসাময়িক নহেন, কারণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ইহা নাই। খোয়াজ ওসমান নামক এক ব্যক্তিকে রাজার সমসাময়িক বলা হইয়াছে।

(৮) "সুবিদ নারায়ণের সময়ে তাম্রকুটের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।"

এই হিসাবে উপেন্দ্রবাবু রাজাকে আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া অসম্ভব বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈষ্ণব গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ তামাক এবং কলঞ্জসংবেষ্টন অর্থে চুরুট বলিয়া অনুমিত হয়......; সুতরাং আকবরের পূর্ব্বেই তামাকের ব্যবহার ছিল। যাহারা জাতির উৎপত্তির হেতু তাম্বুল ভক্ষণ, তামাক নহে। শ্রীঃ ইঃ ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭ম অঃ, ১৩৮পৃঃ টীকা।

(৯) "সুবিদ নারায়ণের বংশীয় শ্রীযুক্ত আবদুল করিম চৌধুরী প্রণীত বংশপত্রিকা প্রামাণ্য"—কিন্তু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রদত্ত বংশপত্রিকাও সুবিদ নারায়ণের বংশীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত। সেই বংশাবলীতে তিন পুরুষের নাম অজ্ঞাত বলিয়া লিখিত, সুতরাং ইতিবৃত্ত লেখক "অজ্ঞাত তিন পুরুষ আবিষ্কার" করেন নাই। এই বংশাবলী অনুসারে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশে ১৩ পুরুষ হয়। ১২৬১ বাংলায় লিখিত একখানা প্রাচীন বংশাবলীর সহিত ইহার ঐক্য আছে।

শ্রীহট্টের খাজে ওসমান প্রবন্ধে উপেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন ওসমান কর্ত্তৃক যাহারা জাতিচ্যুত হয় তাহাদের বংশে ৮।৯ পুরুষ চলিতেছে, আর এই প্রবন্ধে বলিতেছেন, "বর্ত্তমান হইতে ১১ পুরুষ পূর্ব্বে রাজা সুবিদ নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন"—প্রতিভা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, ১৭ পৃঃ; প্রতিভা চৈত্র ১৩২০, ৩৫১ পৃষ্ঠা। ইহার কারণ কি? আমরা জানিয়াছি যে, রাজার সময় হইতে তদ্বংশে ১৩ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বংশেও ১১।১২।১৩ এইরূপ পুরুষ সংখ্যাই চলিতেছে—যথা, শ্রীচৈতন্যের মাতুল বংশ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক সাবর্ণ গোত্র, পার্ষদ ভক্ত বিদ্যানিধির বংশ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক সাতকানিয়া বাসুদেব দত্তের বংশ, শান্তিপুরের বংশ, অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ। অদ্বৈত বংশে ১১।১২।১৩ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিতেছে। ঢাকার উথলীতে অদ্বৈত বংশের এক শাখার বাস। যদি অদ্বৈত বংশের ১১।১২।১৩ পুরুষ বর্ত্তমানে চলিতেছে ইহাই হয় তবে সুবিদ নারায়ণকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কেন বলা হইবে না? লেখকের মতেও সুবিদ নারায়ণের বংশে ১১ পুরুষ চলিতেছে।

(১০) উপেন্দ্র বাবু বলেন ৪১৯ গৌরাব্দের পূর্ব্বে (১৩১২ বাং) রঘুনাথের কথা শ্রীহট্টে কেহ জানিত না। উত্তরে বলা যায় যে, শ্রীহট্টে কেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ঢাকাতেই এই আলোচনা ছিল। তখনকার বান্ধব পত্রিকা দেখিলেই এ কথার সত্যতা জানিবেন।

প্রবন্ধকার তদীয় কাছাড়ের ইতিবৃত্তে যে অংশ বৈদিক পুরাবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কি অপ্রামাণ্য?

(১১) "কাত্যায়ন পূর্ব্বে ছিল কি না বলা হইল না।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। বঙ্গে কাত্যায়ন গোত্র নাই; রঘুনাথ কাত্যায়ন গোত্রোৎপন্ন।

(১২) সম্প্রতি প্রাপ্ত ভাস্কর বর্ম্মার তাম্র শাসনের পাঠোদ্ধার কালে লেখক "তদুল্লেখিত ভূমি শ্রীহট্টে নহে" ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আবার বীপরীত কথা বলিতেছেন। ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে পঞ্চখণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল, তবে বেহলুল লোদীর সময়ে পঞ্চখণ্ড জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া সাব্যস্ত হইল কি রূপে? সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চখণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল। বেহলুল লোদীয় সময়ে "পঞ্চখণ্ডে রঘুনাথের জন্ম অসম্ভব" হইবে কেন? ইটা গরগনায় সঙ্কর্ষণ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বংশ আছে। এই বংশে ৩৪ পুরুষ পূর্ব্বে চূড়ামণি উপাধিবিশিষ্ট কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং বেহলুল লোদীয় সময় পঞ্চখণ্ডে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ বংশে 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি ছিল না শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসমাজ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ কোন ব্যক্তির মুখে একথা শোভা পায় না।

(১৩) উপেন্দ্র বাবু বলিতে চান যে, খাসোকের পুষ্করিণী ও খাসা গ্রামের অতি প্রাচীন দীঘি এক। কিন্তু এই পুষ্করিণী ৭ম শতাব্দীর নহে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালিদাস পালের প্রপৌত্র (২০ পুরুষ পূর্ব্বে) বারাণসী পাল এই পুষ্করিণী খনন করেন, সুতরাং ইহাকে "রাজা পালের দীঘি" বলে। "গঙ্গিনিকা" সহ মরাগাঙ্গের মিলও বেশ মানাইয়াছে।

(১৪) উপেন্দ্র বাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীহট্টের কানা ছেলে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কানা ছেলে" কি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যে, উপেন্দ্র বাবু ইহার সমালোচনা আবশ্যক মনে করিলেন? †

একডালা দুর্গ *

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে ইতিহাস শাখাতে পঠিত)

সম্রাট মহম্মদ টোগলকের রাজত্বকালে সুলতান ফকর উদ্দীন মোবারক শাহ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। দিল্লীর রাজশক্তি তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, সুতরাং ফকরউদ্দীনের দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। সুলতান ফকরউদ্দীন দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বনামে খোতবা ও সিক্কা প্রচলিত করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান নৃপতি। মহম্মদ টোগলক স্বীয় সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশ দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

বঙ্গের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

---

† শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি "বঙ্গের রঘুনাথ" প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের অনেক বিষয়ের আলোচনা সম্ভবতঃ সেই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। ইহা শীঘ্রই প্রতিভাতে প্রকাশিত হইবে। এই বিষয়ের আর দ্বিতীয় প্রতিবাদ পত্রস্থ করিতে আমরা অসমর্থ।

প্রতিভা সম্পাদক।

* এই প্রবন্ধটী বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে উহা যে ভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া পঠিত হইয়াছিল, তাহাই এস্থানে মুদ্রিত হইল।

সুলতান ইলিয়াস শাহ যখন বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন সম্রাট মহম্মদ টোগলকের মৃত্যু হওয়াতে তদীয় পিতৃব্যপুত্র ফিরোজ টোগলক দিল্লীর সম্রাট হইলেন। নানা কারণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই ফিরোজ শাহের উপর বিরক্ত ছিলেন। তদুপরি বঙ্গের নবীন স্বাধীনতা লাভে উত্তেজিত হইয়া তিনি ৭৫৪ হিঃ অব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আত্মরক্ষার্থ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট ২২ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়াও দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ইলিয়াস সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে আগমন করিলে একডালার উন্মুক্ত রণাঙ্গনে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে একলক্ষ বাঙ্গালী সৈন্য দেশরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করে। অতঃপর বর্ষাকাল সমাগত হওয়াতে সম্রাট ব্যর্থমনোরথ হইয়া ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিন এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী বিরচিত "তারিখ-ই-ফিরোজসাহী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ফিরোজ শাহের প্রথম বার বঙ্গ আক্রমণ।

ইলিয়াস সাহ কর্ত্তৃক নিহত ফজরউদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্রাট ফিরোজ শাহ ৭৬০ হিঃ অব্দে দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তখন ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হওয়াতে তদীয় পুত্র সেকন্দর শাহ বঙ্গের সুলতান ছিলেন। পিতৃপন্থানুসরণ পূর্ব্বক সেকন্দর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবারও সফলকাম হইতে না পারিয়া সম্রাট ফিরোজ অবশেষে সেকন্দর শাহের সহিত স্থায়ী ভাবে সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বার বঙ্গ আক্রমণ।

বঙ্গের ইতিহাসে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব কালে একডালার পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই হোসেন সাহের রাজত্ব কালেই শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়; পুণ্যশ্লোক রূপ, সনাতন, সাকর মল্লিক, দবিরখাস প্রভৃতি ইঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। হোসেন শাহ বিশ্বাস ঘাতক পাইক ও হাবশী দিগকে পদচ্যুত করিয়া, এই অসন্তুষ্ট দুর্দ্দান্ত সেনানীগণের বিদ্বেষ হইতে নিজকে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ করিবার জন্য একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থিত করিতেন। বঙ্গদেশের নৃপতিগণের মধ্যে এক হোসেন শাহ ব্যতীত অন্য কোন নরপতিই গৌড় ও পাণ্ডুয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। হোসেন শাহের রাজত্বকালে একডালাই বঙ্গদেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। *

যে একডালা দুর্গ মুসলমান শাসনকালে গৌড়, পাণ্ডুয়া হইতেও সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, দিল্লীর সম্রাট পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং সুদীর্ঘ অবরোধেও যে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, যে একডালার উন্মুক্ত রণাঙ্গনে একলক্ষ বাঙ্গালী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, বিবুধজন-সেবিত হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় অবস্থিত ছিল, যে একডালা হইতে হোসেন শাহের সৈন্যসমূহ কামরূপ আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, ‡ দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি নিঃসন্দেহরূপে ইতিহাস-বিখ্যাত সেই একডালার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

একডালা দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?

বহু মনীষী এবিষয়ে স্ব স্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া

* Stewart's 'History of Bengal', এবং রিয়াজ-উস্-সালাতিন'।

‡ Taylor's "Topography and Statistics of Dacca" p. 69.

একডালার স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ।

গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট, টমাস, ব্লকম্যান, ওয়েষ্টমেকট, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উত্তর বঙ্গে একডালার স্থান নির্দ্দেশে প্রয়াসী; পক্ষান্তরে, মেজর রেণেল, টেলার, হাণ্টার, বেভারিজ, খাঁন বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঢাকা জেলায় একডালা অবস্থিত ছিল, এইরূপ অভিমত প্রাকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ-রূপে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন নাই। যে পণ্ডিতগণ উত্তর বঙ্গে একডালার স্থান নির্দ্দেশে প্রয়াসী, তাঁহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নাম সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ যোগ্য। আমরা যে মত উপস্থিত করিব তাহা তদীয় মতের বিরোধী। এতদ্বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত প্রমাণাবলী নিম্নে বিবৃত হইল।

ঢাকা একডালাতে শিলালিপি আবিষ্কার।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আমরা ঢাকা জেলার উত্তরাংশস্থিত একডালা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান একখানা শিলালিপি ও কতিপয় বাদশাহি সনন্দ আবিষ্কৃত হয়। লক্ষ্যা ও বানার নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে একডালা অবস্থিত; মেজর রেণেলের মানচিত্রে উহা "একডালা চৌকী" বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। এই একডালার অতি সন্নিকটে একটী বনাকীর্ণ স্থানে একটী নাতিবৃহৎ মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার দ্বারদেশে একখানা শিলালিপি সংলগ্ন আছে। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

'ঈশ্বরের প্রেরিত (মহম্মদ)—তাঁহার উপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের নিমিত্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, ঈশ্বর তাঁহার জন্য স্বর্গে সেই প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই বৃহৎ মস্‌জিদ একডালাতে হোসেন বংশীয় সৈয়দ আসরফের পুত্র পরম মাননীয় আলাউদ্দুনিয়াওয়াদ্দিন আবুল মুজঃফর শাহ সুলতান হোসেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। দ্বাবিংশত্যধিক নব শত অব্দে (নির্ম্মিত)—৯২২ হিঃ।'

ঢাকা একডালাতে "একডালা" নামযুক্ত হোসেন শাহের শিলালিপি অবলম্বনে ঢাকা একডালাতে ঐতিহাসিক একডালার স্থান নির্দ্দেশ।

এই শিলালিপি যে মস্‌জিদের দ্বারদেশে সংলগ্ন আছে, তাহা একডালাতে সুলতান হোসেন শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, তাহা শিলালিপিতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। হোসেন শাহের রাজধানী একডালাতে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উক্ত শিলালিপি সহ মসজিদটী যখন অদ্যাপি ঢাকা একডালাতে বর্ত্তমান আছে, তখন হোসেন শাহের রাজধানী একডালা ও ঢাকা একডালা অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

বিয়াবানীর 'রিয়াজ' অনুযায়ী বর্ণনা।

দ্বিতীয়তঃ, "রিয়াজ-উস্-সালাতিনে" লিখিত আছে—"এই সময় (অর্থাৎ ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক একডালা দুর্গ অবরোধকালে) সেখ বিয়াবানী (অথবা রাজা বিয়াবানী) উপাধিধারী একজন ফকির কালগ্রাসে পতিত হন। এই ফকির সুলতান সামসউদ্দীন ইলিয়াসের শ্রদ্ধাভাজন ও পূজনীয় ছিলেন। তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিয়াবানীর দেহ সমাধিস্থ করিলেন। তারপর একাকী ফিরোজ শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই স্বীয় দুর্গে প্রবেশ করিলেন।"

এই বিয়াবানী কে ছিলেন, তাহা স্থির করিতে যাইয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভবানী ও বিয়াবানী

বিয়াবানী সম্বন্ধে টেলার ও বেভারিজের মত।

শব্দদ্বয়ের উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখিয়া ডাক্তার জেম্‌স্ টেলার বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ বিয়াবানী বুনিয়া বংশীয়া শেষ রাণী রাণী ভবানীর বংশধর।* বেভারিজ এই উক্তির সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, মুসলমান সাধুর নাম রাজা হইতে পারে না, তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বিয়াবানী এবং ভবানী হয়ত একই শব্দ। † বলা বাহুল্য, এই মতদ্বয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এবং অনুমানের উপর স্থাপিত; সুতরাং উহাদের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

বিয়াবানী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিয়াবানী একটী পারসিক শব্দ; তাহার অর্থ—আরণ্যক। যে সাধুপুরুষ মালদহ প্রদেশে "রাজা বিয়াবানী" নামে কথিত হইতেন, তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিয়ত অরণ্য মধ্যেই বাস করিতেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবানী) বলিত। অদ্যাপি তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মালদহের ইতিহাসলেখক গোলাম হোসেন এবং ইলাহি বক্স উভয়েই তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে বাস করিতেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য ইলাহি বক্স স্বরচিত হস্তলিখিত পারস্য ভাষা নিবদ্ধ "খুরশেদ জাঁহানামা" নামক ইতিহাসে অলিখিত স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। * * * লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া "রাজা বিয়াবানী"র সমাধিক্ষেত্রে কোনও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। তাহাতেই সে স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" * শ্রীযুক্ত মৈত্রের মহাশয়ের উল্লিখিত সাধু বিয়াবানীর অপর নাম খেরকা পোষ। † গোলাম হোসেন, ইলাহি বক্স প্রভৃতির গ্রন্থে বোধ হয় ইনি সেই নামেই পরিচিত হইয়াছেন।

তদীয় মত সম্বন্ধে আলোচনা।

খেরকা পোষ স্বনাম খ্যাত সাধু নুর কুতুব আল্ আলমের সমসাময়িক ছিলেন। নুর কুতুব ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অথচ, ইতিহাস বর্ণিত বিয়াবানী ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রমণ কালে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং খেরকা পোষ ও বিয়াবানীর জীবিতকাল মধ্যে প্রায় এক শতাব্দী প্রভেদ হইয়া পড়াতে এই উভয় ব্যক্তি এক বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকা একডালার সন্নিকটবাসী বিয়াবানী।

ঢাকা নগরী এবং একডালার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত টঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরখাঁন নামক একটী গ্রাম আছে। এই স্থানে সাধু বিয়াবানীর সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। প্রবাদ এই, কবির শাহ নামে খান্দেশের একজন বাদশাহ দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হওয়াতে, তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। সংসার ত্যাগ করিয়া ফকির হইয়া তিনি ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে উত্তরখাঁন নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিতেন বলিয়া তিনি 'শাহ কবির বিয়াবানী' ('বিয়াবানী' অর্থ আরণ্যক) নামে এতৎপ্রদেশে খ্যাত হইলেন। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে 'রাজা বিয়াবানী' বলিত, কারণ, খান্দেশের নৃপতি হইয়াও তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী ফকির হইয়াছিলেন। শাহ কবির বিয়াবানীর তিন পুত্র জন্মে; তাঁহাদের নাম

* "Taylor's Topography and Statistics of Dacca"

† J. A. S. B. Vol. LXIV. P. 227,

* "প্রবাসী,"—১৩১৫, অগ্রহায়ণ।

† শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—১৩১৯ পৌষ।

পাহাড়ী শাহ, শাহ দাউদ এবং শাহ আমির। তাঁহারাও পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক এবং শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পাহাড়ী শাহ এবং শাহ আমির নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয় ভ্রাতা শাহ দাউদের শাহ পদ্দল, শাহ সুলতান, এবং শাহ কুতবউদ্দীন নামক তিন পুত্র জন্মে। শাহ পদ্দল হইতে ক্রমশঃ এই বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং অদ্যাবধি শাহ কবির বিয়াবানীর বংশধরগণ উত্তরখাঁন গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশের বংশাবলী ইহাদের নিকট রক্ষিত আছে।

বিয়াবানীর বংশবিবৃতি।

উত্তরখাঁন গ্রামে শাহ কবির বিয়াবানী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাহাড়ী শাহের সমাধিস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। একটী বৃহৎ বেদীর উপর পাশাপাশিভাবে এই দুইটী সমাধি বেদিকা অবস্থিত। ইহা হইতে কয়েক গজ দূরে বিয়াবানীর স্ত্রীর এবং তাঁহার পৌত্র শাহ পদ্দলের সমাধিবেদিকাদ্বয়ের ভগ্নাবশেষ পাশাপাশিভাবে বর্ত্তমান। তাহার নিকটেই শাহ কবির বিয়াবানীর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ আমিরের সমাধি। এই সমাধি ক্ষেত্রসমূহের অদূরে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত কুঠরীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। উহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু জীর্ণ প্রাচীরগুলি অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে। ইহা শাহ কবির বিয়াবানীর মসজিদ ছিল। উত্তরখাঁন গ্রামের যে স্থানে এই সমাধিক্ষেত্র নিচয় ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান, তাহাকে লোকে শাহ কবির বিয়াবানীর দরগা বলে। এই স্থানটী বহু প্রাচীন বৃক্ষাদিতে ঢাকা; উহার পার্শ্বে একটী দীর্ঘিকা আছে।

বিয়াবানী ও তাঁহার বংশধরগণের সমাধিক্ষেত্রনিচয়।

উত্তরখাঁনবাসী শাহ কবির বিয়াবানীর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং অদ্ভুত শক্তিসমূহের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। বঙ্গাধিপতি ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। সাধুর ভরণ পোষণের জন্য তিনি অনেক ভূমি তাঁহাকে নিষ্কর দান করেন। শতখণ্ডে ছিন্ন জীর্ণ দানপত্রখানি অদ্যাপি বিয়াবানীর বংশধরগণ রক্ষা করিতেছেন। উহা এত জীর্ণ যে উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। সনন্দের যে স্থানটীতে রাজকীয় শিলমোহর ছিল, তাহা এখনও কিঞ্চিৎ স্পষ্ট আছে। অসংলগ্ন হইলেও উহা ইইতে সুলতান সামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নাম উদ্ধার করা যায়।

ইলিয়াস শাহপ্রদত্ত সনন্দ।

শাহ সুজা যখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন বিয়াবানীর বংশধরগণ যে সম্পত্তি বহুকালাবধি নিষ্কর ভোগ করিতেন, তাহা সুবিখ্যাত গাজীগণের জমিদারি ভাওয়াল পরগনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে গাজীগণ তাহা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাহ সুজার সহকারি জয়নুদ্দিন মহম্মদ আলতাফ সরমদি সুলতান ইলিয়াস শাহ প্রদত্ত সনন্দ পরীক্ষা করিয়া এক অনুমতি পত্র দ্বারা তাহাদিগকে ঐ জমি পূর্ব্ববৎ ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করেন। শাহ সুজার রাজত্ব কালের ঐ সনন্দ বিয়াবানীর বংশধর শাহ মুজঃফর-হোসেন কর্ত্তৃক অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে। ইলিয়াস শাহ প্রদত্ত সনন্দখানা বিনষ্ট হইলেও এই সনন্দদ্বারা তাহার অভাব কতকটা মোচন হইবে, কারণ ইহাতে পূর্ব্ব সনন্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শাহ কবির বিয়াবানীর বংশধরগণ অদ্যাপি তাঁহাদের সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহাদের সনন্দসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

ইলিয়াস শাহের সনন্দের উল্লেখযুক্ত শাহ সুজার রাজত্বকালে বিয়াবানীর বংশধরগণকে প্রদত্ত সনন্দ।

সনন্দখানার শীলমোহরে লিখিত আছে—"শাহসুজা মহম্মদি, তদীয় পুত্র (?) জয়নুদ্দীন মহম্মদ আলতাফ সর-

সদি।" বাঙ্গালাতে এই সনন্দের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'হুজুরের এই আদেশ হইল—

যখন খান্দেশি বিয়াবানীর বংশধর কৈশরের মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যাপার হুজুরের গোচরার্থ নিবেদিত হইল যে কৈশর ব্যতীত (অপর কেহ) বিরোধীয় ভূমির মালিক নহে, তখন হুজুরের আদেশানুযায়ী এই স্থির হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির এবং তাহার ভ্রাতৃগণের ও আত্মীয়গণের সাহায্যার্থ ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত (বিরোধীয়) জমিদারি খুর্দ (ছোট) উত্তরখানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। গাজির নির্দেশে তদীয় কর্ম্মচারী (বিচারপতি) মাননীয় মহম্মদ হায়াতের নিকট এই নালিশ রুজু করে যে থাপর খান্দেসি আমাদের (সরকারী) জমি বলপূর্ব্বক দখল করিতেছে। অতঃপর, আমীন পাঠাইয়া মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি (কৈশর খান্দেশি) সুলতান ইলিয়াস শাহের আমল হইতে (পুরুষানুক্রমে) ঐ জমি ভোগ করিতেছে। তদন্তের পরে (বিচার হইলে) পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির (খান্দেশির) অধিকারে বিচারকের হুকুমনামা আছে। উত্তরখাঁন নামক স্থান ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে উহার সীমা লইয়া সর্ব্বদাই জমিদারের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বহু খুন জখম হয়। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি যে, (বিরোধীয়) ভূমি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির (খান্দেশির) পুত্রের নামে (সরকার হইতে) লিখিয়া দেওয়া হউক। উহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৌজা খুর্দ (ছোট) উত্তরখান বিরোধীয় ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ঐ জমি তহশীলদারগণ তাহাদের নিজের অধিকারে রাখিয়াছে।"

শাহ সুজার রাজত্বকালে প্রদত্ত সনন্দের বঙ্গানুবাদ।

সনন্দের শেষ দুই পংক্তি নিতান্ত জীর্ণ হওয়াতে উহার অধিকাংশই পাঠযোগ্য নহে, সুতরাং উহার মর্ম্মার্থ দেওয়া গেল না। ঐ স্থানে "১০৬৬ ফসলি" এই তারিখটী দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণের মধ্যে ফসলি অব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ১০৬৬ ফসলি সনে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ ছিল।

এই সনন্দে উত্তরখাঁনবাসী খান্দেশি বিয়াবানীর নাম এবং তাঁহাকে ইলিয়াস শাহ সনন্দ দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং সেই ভূমি বিয়াবানীর বংশধরগণ শাহ সুজার সময়ে ভোগ করিতেন, প্রভৃতি বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং, ইলিয়াস শাহের সময়ে ঢাকা একডালার সন্নিকটে বিয়াবানী নামক একজন সাধু বাস করিতেন; ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহার ভরণপোষণার্থ ভূমি দান করিয়াছিলেন; এবং এই বিয়াবানীর সমাধিমন্দির অদ্যাপি ঢাকা একডালার সন্নিকটস্থ উত্তরখাঁন নামক স্থানে অবস্থিত, ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং উত্তরখাঁন বাসী বিয়াবানী ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত বিয়াবানী যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহাই বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার বেভারিজ লিখিয়াছেন, "বিয়াবানীর বাসস্থান যে একডালা দুর্গের সন্নিকটে ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ হাজি ইলিয়াস একডালা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া এই সাধুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বিয়াবানীর সমাধিক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই একডালার অবস্থিতি সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সুমীমাংসা হইতে পারে।" বিয়াবানীর সমাধিক্ষেত্র যে উত্তরখাঁন নামক স্থানে অবস্থিত, উপরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। সুতরাং, উত্তরখাঁনের সন্নিকটস্থ ঢাকা একডালাতেই যে ইতিহাস-বিখ্যাত একডালা দুর্গ অবস্থিত ছিল, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

উত্তরখাঁনের বিয়াবানী ও ঐতিহাসিক বিয়াবানী অভিন্ন ; সুতরাং, ঢাকা একডালাও ঐতিহাসিক একডালা অভিন্ন।

তৃতীয়তঃ, এক ঢাকা জেলা ভিন্ন অন্য যে যে স্থানে একডালা দুর্গের স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে,

তাহার কুত্রাপি একডালা নামের, এবং এমন কি উহার সাদৃশ্যযুক্ত অন্য কোন নামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। সাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফ তদীয় "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়া পৌঁছিলেন; তথায় ফিরোজ শাহের নামে খোতবা প্রচারিত হইল। সুলতান ফিরোজ শাহ একডালাকে আজাদপুর এবং সহর পাণ্ডুয়াকে ফিরোজাবাদ আখ্যা প্রদান করিলেন। * * * (তদবধি) আজাদপুর ওরফে একডালা, ফিরোজাবাদ ওরফে পাণ্ডুয়া।'

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সম্রাট ফিরোজ শাহ একডালাকে আজাদপুর আখ্যা প্রদান করেন। এই আজাদপুর নামক কোন স্থানের অস্তিত্ব অদ্যাপি আছে কি না, তদ্বিষয়ে কেহ বিশেষ কোন অনুসন্ধান করেন নাই। ঢাকা একডালা অঞ্চলে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, একডালার অনতিদূরে 'হাজাদপুর' নামক একটী স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ঢাকা একডালার সন্নিকটে সাম্‌স্-ই-সিরাজবর্ণিত 'আজাদ-পুর' আবিষ্কার।

মেজর রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে ঐ স্থান একডালা হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে 'সাজাদপুর' নামে চিহ্নিত আছে। বলা বাহুল্য, আজাদপুর অর্থাৎ হাজাতপুরকেই মেজর রেণেল শুদ্ধ করিয়া'সাজাদপুর' লিখিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত একডালা ও আজাদপুর এই উভয় নামই ঢাকা জেলাতে অদ্যাপি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান, অথচ একডালার অন্যান্য যে সমস্ত অভিনব স্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহার কোন স্থানেই একটী নামেরও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, এই মতই সমর্থিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী একডালার বর্ণনায় তদীয় গ্রন্থ "তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী"তে লিখিয়াছেন—

"উহার (একডালার) একদিকে জল (নদী), এবং অপরদিকে জঙ্গল।" 'রিয়াজ'-প্রণেতা আরও বলিয়াছেন যে, একডালা অঞ্চল বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া যায়।

বারণী ও মুসলমান ঐতিহাসিক-গণের একডালা বর্ণনা।

সুতরাং বর্ষাকাল আগতপ্রায় দেখিয়া ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাম্‌স্-ই-সিরাজ-আফিফ তদীয় গ্রন্থে এই স্থানের চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত থাকায় ইহাকে দ্বীপাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সহিত ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক সংস্থানের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বানার ও লক্ষ্যা নদীদ্বয়ের প্রায় সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়াতে একডালা ঠিক একটী দুর্গোপযোগী স্থান। উহার অব্যবহিত পশ্চিম হইতেই ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য আরম্ভ হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। ঢাকা একডালার পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে লক্ষ্যা ও বানার নদীদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত, এবং উহার উত্তরে টোক নদী প্রবাহিত। উক্ত ভূখণ্ড প্রকৃত পক্ষেই একটী দ্বীপ,—মেজর রেণেলের মানচিত্র দর্শনেই তাহা উপলব্ধি হইবে। সুতরাং, ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক সংস্থান মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। এই সমস্ত যুক্তির বলে আমরা এই মত স্থাপনে প্রয়াসী যে, ঐতিহাসিক একডালা দুর্গ ঢাকা জেলাস্থ একডালাতেই অবস্থিত ছিল।

ঢাকা একডালার প্রাকৃতিক সংস্থানের সহিত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সাদৃশ্য।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

হাঁড়ি চাঁচা

হাঁড়িচাঁচা কিন্তু কোন দিনই গায়ক শ্রেণীভুক্ত নহে। অথচ "গায়ক পাখী" নামক প্রবন্ধ লেখকের হাতে পড়িয়া তাহার এই উন্নতি হইতেছে। হাঁড়ি চাঁচা গায়ক পাখীর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না অতঃপর পাঠকগণ বিচার করিবেন, কিন্তু হাঁড়িচাঁচা গায়ক পাখী নহে খেয়ালের জোরে এই কথাও বলা চলে না।

দুর পাড়াগাঁয়ের অনক্ষর মূর্খও হঠাৎ দুই একটী সুন্দর কবিতা রচনা করে। আমাদের হাঁড়িচাঁচা সেই শ্রেণীর। তবে ইহাদের শব্দ বড় রুক্ষ, এবং ইহারা অত্যন্ত একাকী থাকিতে ভালবাসে বলিয়াই ইহাদের পক্ষে অনেকটা মোক্তারী করিতে হইল। নতুবা হাঁড়িচাঁচা 'গায়ক পাখীর' পেছনে হইলেও দলের প্রান্তেই একটু স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

হাঁড়িচাঁচার আরও কতিপয় কলঙ্ক আছে। ইহাকে আমাদের দেশে 'ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচা' বলে। ঐ রকম বিকট আওয়াজ করে বলিয়াই ইহার এই শ্রুতিমধুর নাম হইয়াছে। ঘরের আশে পাশে চীৎকার করিলে বাড়ীর লোকেরা ঢিল ছুঁড়িয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহাদের শব্দ না কি কলহের সূচনা করে। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'টাকুয়া লেজী' নামেও অভিহিক করা হয়।

হাঁড়ি চাঁচার মাথার রঙ ফিকে কালো। চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল এবং প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন। ঠোঁট বেঁটে, অত্যন্ত শক্ত এবং ধারাল। ঠোঁটের বর্ণ ধোঁয়াটে। প্রায় সর্ব্বাঙ্গের বর্ণই পাটল। স্থানে স্থানে ফিকে কালোর মিশ্রণে একটু গাঢ়। ডানার বর্ণ ফিকে কালো—তাহার উপরের দিকে কয়েকটী ঈষৎ হল্‌দে রঙ্গের পালখ আছে। ডানার মাঝামাঝিও কয়েকটী ঐরূপ বর্ণের ও সাদা কয়েকটী পালখ আছে। ইহাদের পুচ্ছ অতি দীর্ঘ—প্রায় ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুচ্ছদেশে ১২টী পালখ। মধ্যের পালখ্‌ দুইটীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। অন্যান্য পালখ্‌গুলি এই দুই পালখের মাঝামাঝি হইতে ক্রমে ছোট। দীর্ঘ পালকদ্বয়ের অগ্রভাগ এক পঞ্চমাংশ কালো তাহার উপরের অংশ ফিকে হল্‌দে ও পাটলের মিশ্রণে উৎপন্ন এক রং বিশিষ্ট। পুচ্ছের ছোট পালখ গুলির অর্দ্ধেকের বেশীই কালো, বাকী গুলি ফিকে পাটল। পা দুইটীর রঙ্‌ মেটে। প্রত্যেক পা'র চারিটি নখ শক্ত এবং তীক্ষ্ণাগ্র।

হাঁড়িচাঁচা একাকী বা পতি-পত্নীতে মিলিয়া বিচরণ করে। দলে মিশিয়া থাকা ইহাদের বড় একটা অভ্যাস নাই। তবে কখন কখন ২।৪টী অতিরিক্ত বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন হয় বটে, তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। ইহাদের দাম্পত্য প্রণয় গভীর, কিন্তু সময় সময় পতি-পত্নিতে যুদ্ধও হইয়া থাকে। এমন কি এই দম্পতি-কলহে হাঁড়িচাঁচা রাগের চোটে কখন কখন প্রণয়ীর জীবন সংহার করিয়া ফেলে। অবশ্য এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে।

হাঁড়ি চাঁচা হিংস্র প্রকৃতির পক্ষী। ইহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর বাসা বাহির করে এবং এই সকল বাসার ডিম্ব বা ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। তাল গাছের ডাঁটার ফাঁকে 'চামচড়া', 'নাকাটী' প্রভৃতির বাসা থাকে। হাঁড়ি চাঁচা দুই চারি দিন পর পর আসিয়া এক একবার তাল গাছে খাদ্যের অনুসন্ধান করে। হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেঙ্‌ ধরিয়া লইয়া যায়। কীট, পতঙ্গ, ছোট পাখী প্রভৃতি দ্বারাই ইহারা অধিকাংশ সময় জঠর-জ্বালা নিবারণ করে। কলা এবং অন্যান্য ফলেও ইহাদের অরুচি নাই।

গভীর জঙ্গলে উচ্চবৃক্ষের চূড়ায় ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। ফাল্গুনের শেষ ভাগে ডিম পারে এবং প্রায় দেড়-মাস পরে ছানাগুলিকে উড়িতে শিখায়। ইহারা প্রায়শঃই দুইটী ডিম্ব প্রসব করে। কদাচিৎ ৩টী ডিম্ব প্রসব করিতেও দেখা যায়। ডিমের রঙ্গ নীলাভ সাদা তাহাতে ফিকে ম্যাজাণ্টো রঙ্গের ছিটা।

ইহারা সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া রাগিণী আলাপ

করিয়া থাকে। ইহাদের সেই সঙ্গীত তেমন প্রীতিকর না হইলেও সঙ্গীত শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার দাবী করিতে পারে।

হাঁড়িচাঁচা এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইবার সময় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া ডাকিতে থাকে এবং সঙ্গিনী তদনুসারে তাহার অনুসরণ করে।

অন্যান্য পাখীর ন্যায় ইহাদের বংশও হ্রাস পাইতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সেরপুরের সুখ-দুঃখ

(৩)

পিতৃ-বিয়োগের পর ৺নব কুমার চৌধুরী মহাশয়ের বড় আদরের "চূড়ামণি" বিক্রমপুর ও নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করিয়া "তর্কালঙ্কার" উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া সেরপুর ফিরিয়া আসিলেন। পিতৃ-বিয়োগ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে একান্ত ব্যথিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু কর্ত্তব্য ও অধ্যবসায়-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। মহাত্মাদিগের চরিত্রের এটা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। তর্কালঙ্কার মহাশয় পঠদ্দশায় একান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং সে তপস্যা অত্যন্ত কঠোরতর হইলেও তাহাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা এ বিষয় তাঁহার 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' প্রস্তাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তর্কালঙ্কার মহাশয় দেশে আসিয়া মাতৃদেবীর আদেশ ক্রমে বিবাহ করিলেন। তাঁহার ১ম বিবাহ ময়মনসিংহ জেলারই আশুজীয়া গ্রামের ৺ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার সহিত হয়। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ, তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি অল্পকালের মধ্যেই পত্নীবিয়োগ যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইল, জননী ব্রহ্মময়ী বধূ-বিয়োগে কাতরা হইলেন, পুত্রের ক্লেশ সম্ভাবনায় আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে পুত্রের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আর একটী পাত্রী স্থির করিলেন। পাত্রীটী উক্ত জেলারই রামপুর গ্রামের স্বর্গীয় কালী ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা। যথাসময়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, জননী ব্রহ্মময়ী নববধূলাভে ভাঙ্গা সংসার আবার জোড়া দিলেন, তাঁহার বিষণ্ণ মুখ আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানিনা, তবে তর্কালঙ্কার মহাশয় এমনই মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মাতৃদেবী অন্ততঃ একদিনের জন্যও পুত্রের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে পান নাই। এই স্ত্রীর গর্ভে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা সন্তান জন্মে। ইনিই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গা সুন্দর। কন্যা চারিটীর মধ্যে একটীর নাম অজ্ঞাত, তিনি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্য তিনটীর নাম অন্নদা দেবী, রাজকুমারী দেবী, ও গিরিবালা দেবী। ৺গিরিবালা দেবী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুকালেও তাঁহার নিকটেই ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ গিরিবালা দেবী অকালে বিধবা হন, তর্কালঙ্কার মহাশয় কন্যার বৈধব্য মন্ত্রণায় নিজেও বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর কতক দিন পরে গিরিবালা দেবীও গঙ্গা লাভ করেন। গিরিবালা দেবীকে আমরা জ্যেষ্ঠা সহোদরার মত ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাদিগকে সহোদর তুল্য মনে করিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র ও মধুর ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কন্যাতে তাঁহার মনোবৃত্তির ছায়া লক্ষিত হইত।

জননী ব্রহ্মময়ী দেবী এবং সেরপুরের তদানীন্তন বিদ্যোৎসাহী, বিদ্বান্ ও বদান্য জমিদার স্বর্গীয় নবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার চৌধুরী

মহাশয়, প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীযুক্তা তারামণি চৌধুরাণী মহাশয়া ও তৎপুত্র স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী ও দানশীল জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহ ও সাহায্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বগৃহে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা পূর্ব্বেই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, দেশে চতুষ্পাঠী স্থাপনের পর নানাস্থানে রাজা ও জমিদার বাড়ীতে বিচার সভায় পাণ্ডিত্য ও বিচার নৈপুণ্যে সেই প্রতিভার প্রভা আরও বিস্তৃতি লাভ করিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যাপনা ও স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এমনই স্ত্রীভাগ্য যে, কিছুকাল পরে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শিশু সন্তানগুলি লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় মহাবিপদে পড়িলেন। এদিকে জননী ব্রহ্মময়ী দেবী শোক করিবেন না ছোট ছোট শিশুগুলিকে রক্ষা করিবেন? তিনি মহাক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।

মাতার ক্লেশ দর্শনে তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যথিত হইলেন। আবার জননীর অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় বিবাহ 'মনাং'গ্রামে সম্পন্ন হয়। দৈবের এমনই নির্ব্বন্ধ সেই স্ত্রীও বেশী দিন বাঁচিলেন না। পুত্র ভাবিতে লাগিলেন, 'জননীর ক্লেশ দুর হইল না,' মাতা ভাবিতে লাগিলেন, 'পুত্র সুখী হইয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে পারিল না।'

এদিকে শিশুগুলির প্রতিপালন করাও একা জননীর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এই বার মাতৃদেবীকে কিঞ্চিৎ 'জেদ' প্রকাশ করিতে হইল, এবং অতি সত্বর আর একটী পাত্রী স্থির করা হইল। উক্ত জেলায় কানীহারী গ্রামের বর্ত্তমান স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ভগিনীকে ব্রহ্মময়ী দেবী বধূরূপে গ্রহণ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগিতে না লাগিতেই ইনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এত কষ্টও লোকে সহ্য করিতে পারে? ক্রমে চারিটী স্ত্রীর বিয়োগ—তথাপি তর্কালঙ্কার মহাশয় এক দিনের জন্যও অধ্যাপনা ত্যাগ করেন নাই। সংসারের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে হইতেও একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল না। তিনি চিরকাল ধীর-স্বভাব, কোন বিপদে তাঁহাকে অস্থির হইতে দেখা যায় নাই! এই নিদারুণ শোক তর্কালঙ্কার মহাশয় বুক পাতিয়া লইলেন, কিন্তু জননী ব্রহ্মময়ী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এত চেষ্টা করিলেন তবু পুত্রকে সুখী করিতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অন্য পুত্রটীও কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। বড় উপার্জ্জনশীল রামচন্দ্রও তাঁহাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এতদিন পরে তাঁহার বিধবা পত্নীও স্বামীর পথ অনুসরণ করিয়া শাশুড়ীকে একেবারে অসহায়া করিয়া গেলেন। মাতৃদেবীর চোখের জল আর থামিতেছে না। পত্নী-শোক, ভ্রাতৃ-শোক তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কিছু বিচলিত করিবার উপক্রম করিল। ভ্রাতৃজায়া তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন, তিনি মাতৃদেবীর ও শিশু সন্তানগুলির সেবা শুশ্রূষা করিতেন, ছাত্র ও পরিবার বর্গের পাক-সাকের সাহায্য করিতেন, তিনিও গেলেন! তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটি অতি সুন্দরী কন্যা শিশুকালেই ইহাঁ-দেরই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, মাতৃদেবীরও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি এখন প্রায়ই পীড়িতা থাকেন; কষ্টের সীমা নাই, তবু কি মানুষ স্থির থাকিতে পারে? চঞ্চল হৃদয়ের সান্ত্বনা করিবার শক্তি তাঁহাকে ভগবানই দিয়া-ছিলেন, তিনি সেই শক্তির সাহায্যে সকল জ্বালা, সকল দুঃখশোক সহ্য করিয়া লইলেন, চিত্ত-চাঞ্চল্য দুর করিতে সমর্থ হইলেন; ভগবতী বীণাপাণি তাঁহার অমৃতনাদিনী বীণার মধুর ঝঙ্কারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রাণ সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, তিনি সকল জ্বালার অমোঘ ঔষধ বীণা-বন্দনা জীবনের সার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নীরবে ও সরবে বাণীর 'বন্দনা-গীতির' অনুশীলন

করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পরমবন্ধু হরচন্দ্র চৌধুরী ও গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে পরম উৎসাহিত করেন। তাঁহারা অনেক সময় নিজেদের মূল্যবান সময় বিয়োগবিধুর পরম বন্ধুর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যয়িত করিতেন। অকৃত্রিম বন্ধুগণের সাহায্যে বিদ্যার্থিগণের অধ্যাপনা ও কাব্য সৌন্দর্য্যের উপাসনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেকেই বলিয়া থাকেন "শোকেরদ্বারা কর্ষিত চিত্তক্ষেত্রে কবিতার বীজ অতি সত্বর অঙ্কুরিত হয়। কথাটা অনেকটা সত্য। আমরা 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমের' ন্যায় গদ্য-সাহিত্য এবং 'এষার' ন্যায় পদ্য সাহিত্য এক একটী পুণ্যপ্রতিমার শোকশেলে আহত হৃদয়েরই দানরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 'সতীপরিণয়' নামক মহাকাব্যখানি সেই শোকাশ্রুপূতলেখনীর সাহায্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সতীপরিণয়' নামক মহাকাব্যে আমরা পত্নী-শোকাহত হৃদয়ের করুণ বিলাপের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। এই সময়ে তাঁহার আরও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশ, কৌমুদী সুধাকর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্য দুইখানি যে কোন মহাকবির অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের সহিত তুলিত হইতে পারে। তা ছাড়া 'আনন্দতরঙ্গিনী' প্রভৃতি কতকগুলি শোকসান্ত্বনাপ্রদ শান্তিরসপূর্ণ স্তোত্রও বিরচিত হয়; এবং সেই সময়েই 'তত্ত্বাবলী' নামক একখানি উৎকৃষ্ট পদার্থ তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধিকাংশ পুস্তকই তাঁহার সেরপুর অবস্থিতি সময়ে রচিত। যাহা হউক তর্কালঙ্কার মহাশয় চতুর্থ বার দার-পরিগ্রহ করিয়াও সংসারে শান্তি পাইলেন না। তাঁহার সংসারিক ক্লেশ তেমনই রহিয়া গেল। জননী ব্রহ্মময়ী আবার জেদ ধরিলেন পুত্রকে আবার বিবাহ করাইয়া সংসারধর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন, সুখশান্তির অধিকারী করিয়া তুলিবেন—সংসারে তাঁহার এই একটিমাত্র পুত্র আর সকলেই ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; সেই একমাত্র পুত্রের বেদনাবিষণ্ণমুখ, মা কি কখনও দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? জননী পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "বাবা, আবার বিবাহ কর, সংসারী হও, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি আর এই নিয়া পারি না, ছেলেমেয়েগুলি 'মা মা' বলিয়া কাঁদে, শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়!"

তর্কালঙ্কার মহাশয় দেখিলেন বেদনা-ক্লিষ্টা জননীর শীর্ণ কপোলদ্বয় চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছে,—মাতৃভক্ত সন্তান আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতৃদেবীর ক্লেশ নিবারণের জন্য আবার বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। আবার বিবাহের আয়োজন হইল, পুত্রবৎসলা জননী আবার হাসিকান্নার মধ্যে নববধূ গৃহে আনিলেন। এই বিবাহই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শেষ বিবাহ। এই পঞ্চম স্ত্রীর গর্ভে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ কাব্যানুরাগী ও কবি শ্রীমান্ তারাসুন্দর ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই বিবাহ করাইয়া স্নেহময়ী জননী ব্রহ্মময়ী দেবী আর বেশী দিন সংসার বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহার দেহ শয্যালগ্ন হইল, রোগে তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, মাতৃভক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ভগিনীদের সঙ্গে প্রাণপণে জননীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগলেন, কিন্তু মা বুঝি আর বাঁচিলেন না, একদিন প্রিয় পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া রত্নগর্ভা ব্রহ্মময়ী দেবী অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতৃহীন হইলেন। যথাকালে সমারোহের সহিত জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তর্কালঙ্কার মহাশয় জনক জননীর মৃত্যুর পর এক এক বৎসর মহাগুরু নিপাতজনিত কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মহাগুরু নিপাতে এক বৎসর পরান্ন করা নিষেধ, তাহা শুধু পরের দেওয়া অন্ন খাওয়া নিষেধ মাত্র নহে, পরে পাক করিয়া

দিলেও তাহা ভোজন করা যায় না। তিনি এইরূপই ব্যবস্থা দিতেন, এবং নিজেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাংসারিক সুখ কোনও দিনই বেশী কিছু হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সামান্য কয়েকটা বৎসরে তাঁহার কতকগুলি শোক হইল, কতগুলি বেদনা তাঁহার মর্ম্মস্থানে কঠোর রেখা আঁকিয়া গেল, তিনি স্বভাব-সুধীর বলিয়া নশ্বর সংসারের প্রকৃত রহস্যবেত্তা বলিয়া নিজে তত ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। দুঃখ তাঁহাকে শত সহস্র মূর্ত্তিতে আক্রমণ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু শৈলাহত বজ্রের ন্যায় সামান্য ক্ষত করিয়াই প্রতিহত হইয়াছে; আমরা তাঁহাকে অনেক সময় অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি কিন্তু সুখেও আনন্দে! দুঃখ তাঁহাকে অনেক প্রকারেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু তাঁহার বিশিষ্টতাটুকু কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তাঁহার অধ্যাপনা তেমনই চলিতেছে, তেমনই বন্ধুগণের প্রতি প্রীতি প্রফুল্ল ভাব ও ব্যবহার, গৃহদেবতার অর্চ্চনা, ক্রিয়াকলাপ, দান ধ্যান ও অতিথি সৎকার, কিছুই বিপর্য্যস্ত হয় নাই। ধর্ম্মে অচল বিশ্বাস, সত্যে অটুট দৃঢ়তা, শাস্ত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম, ও গ্রন্থপ্রণয়নে অসাধারণ আগ্রহ এবং অধ্যবসায়, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করে নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় কনিষ্ঠ রামচন্দ্রের কর্ম্মকুশলতায় পূর্ব্বেই পৈতৃক সম্পত্তির কতক আয় বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, নিজেও অনেকটা আয় বাড়াইয়া তুলিলেন, এদিকে খরচও একান্ত বাড়িয়া উঠিল, ছাত্র ৪০, ৫০টী দুইবেলা আহার করেন, পরিবারও ছোট নহে, তৎপর বিদেশীয় পণ্ডিত বা শিক্ষিত কোন লোক সেরপুরে আসিলে প্রায় তর্কালঙ্কার মহাশয়েরই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সেরপুরে অবস্থিতিকালে সেরপুরের সারস্বতকুঞ্জের অবস্থা বড়ই মনোহর ও স্পৃহনীয় ছিল। ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয় ও তদীয় সন্নিহিত জ্ঞাতি পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি, তুল্য উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যাপনা করিতেন। আরও একটী চতুষ্পাঠীতে রীতিমত শাস্ত্রানুশীলন চলিত। তর্করত্ন মহাশয় অতি তেজস্বী ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা বড়ই প্রখর ছিল। তিনি নিজে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, স্থানীয় অধিকাংশ জমিদারের গুরুদেব, পরন্তু মর্য্যাদায় সেরপুরের অগ্রণী ছিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ের ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অসাধারণ ও সম্মান অপ্রতিহত। তর্করত্ন মহাশয় বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং চরমে কাশী লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কয়েকখানি সংস্কৃতগ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তর্করত্ন মহাশয় ও কৃতিরত্ন মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে স্থান বিশেষে মতামতের বিভিন্নতা থাকিলেও তাঁহারা তিন জনেই তিনের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় 'স্মৃতি চন্দ্রালোক' সংকলন সময়ে নিজের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তটী ইঁহাদের বিশেষ করিয়া দেখাইতেন, এবং নিজের অভিনব সিদ্ধান্তে কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিল কি না তাহা জানিবার জন্য এরূপ আলোচনা অন্যান্য কৃতবিদ্য পণ্ডিতের সঙ্গেও নিঃসঙ্কোচে করিতেন, কিছুমাত্র অভিমান প্রকাশ করিতেন না। সত্য নির্ণয়ের জন্য পঞ্চম বর্ষের শিশুর মত সরলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালেও এ সকল সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তি প্রমাণ সকল, পূর্ব্বস্থলী নিবাসী, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় ও ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল নিবাসী নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ৺ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। যাহা বলিতেছিলাম—সেরপুর সে সময় সরস্বতীর মানসসরোবর হইয়াছিল। এ দিকে যেরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল,

সেইরূপ অন্যদিকে বাঙ্গালাভাষারও রীতিমত অনুশীলন চলিল। সেরপুরের লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রগণ বিমাতার সঙ্গে চিরদিন সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন সে সময়ে হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি নিজেরা সংস্কৃত ইংরাজী ও পার্সি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাদের লাইব্রেরী এইসকল ভাষার সাহিত্য ও দর্শনে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও নিজের লাইব্রেরীটি বিশেষভাবে সাজাইতে লাগিলেন। যখন অর্থের তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না, তখনও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানাদেশ হইতে দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি হাতের লেখা শাস্ত্র গ্রন্থও বহুতর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোন কোন সাহেবের মতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লাইব্রেরীটি ভারতবর্ষের সংস্কৃত লাইব্রেরী সমূহের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই বিপুল পুস্তকালয়টী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দিবারাত্রির অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকগুলি দেখিলে মনে হয় না যে এগুলি অন্ততঃ ২।৩ বার ওলটপালট না হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিজ হাতে লিখিয়াছেন। এরূপ কঠোর অধ্যবসায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব!

তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরে অবস্থিতি সময়েও দেশে বিদেশে বহু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। তাঁহার পাঁচটী বিবাহ, শেষপক্ষের স্ত্রীও কাশী লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার এই বহু বিবাহ নিয়া সমবয়স্ক পণ্ডিত কেহ কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। এক বার একটী বড় সভাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে বিক্রমপুরের পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা বা বিচার হইয়াছিল;—"৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোক গৃহস্থাশ্রমী, এই সময় মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও গৃহী, ভার্য্যাবিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।" এই মতটী সমর্থন করিবার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা পান, পরিশেষে এই মতটী সমর্থিতও হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ একজন সুরসিক পণ্ডিত সভাস্থলে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তর্কালঙ্কার দাদা, আপনার বিবাহ না কয়টী? পাঁচটী কি?" বলা বাহুল্য ইহা শুধু রহস্য নহে, বর্ত্তমান বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অপদস্থ করা ও তাঁহার হৃদয়ে বেদনা দেওয়াই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু স্পষ্টভাষী তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ ভায়া পাঁচটীই বটে, কিন্তু জানি না মতৃদেবী অদ্যাপি জীবিতা থাকিলে আরও কয়টী হইত!"

বক্তা নির্ব্বাক্ হইলেন সভাস্থলে সকলেই বুঝিলেন তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল জননীর আদেশেই বহু বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এযাবৎ কেহ মিথ্যা বলিতে শুনে নাই। তাঁহার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির জননীর নাম করিয়া মিথ্যা কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শক্ররাও কিন্তু তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও প্রতিভার প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। এমনই সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা জগতে নিজের আসনটী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। "সেরপুরের সুখদুঃখ" প্রসঙ্গে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল আগামী সংখ্যায় তাহা বলিবার জন্য চেষ্টা করিব। আমরা হয়ত অনেক বৃত্তান্ত অবগত নহি, যাহা অবগত আছি বলিয়া মনে করিতেছি হয়ত তাহাতেও অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে সহৃদয় পাঠকগণ এসম্বন্ধে আমাদের ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১৪। মাসী মার আদরে
সর্ব্ব অঙ্গ বিদরে।

১১৫। ক্ষ্যাণ্ কুকুড়ার ঘর—
ক্ষ্যাণে হয় মাথা ব্যথা,
ক্ষ্যাণে হয় জ্বর।
ক্ষ্যাণ্=ক্ষণ।

১১৬। বাইর বাড়ী ঘর নাই বাড়ীর মধ্যে কাছারি;
বৌর্ পরণে ত্যানাখান্ ধাইর পরণে সাড়ি।

১১৭। শীত শীত শীত!
কাঁথা ওয়ালার গুণ্ গুণি, জামাওয়ালার গীত।

১১৮। লতার উপর দিয়া লতা গেছে—
টাইনা আন্‌তে ছিড়া গেছে।

অতিদূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার উল্লেখ হইলে এই শ্লোক দেওয়া হয়।

১১৯। আমার পেটের ছাও
আমারে ধইরা খাইতে চাও?

১২০। সুখের উপর সুখ—
তার উপরে পাটি কাটা টুক্।

১২১। দেশে নাই যা'—
পোলায় খোঁজে তা'।

১২২। গরম অম্বল টাট্‌কা দুধ
যে খায় সে অদ্ভুত।

১২৩। চুল কাট্‌লে হয় ডালে পালে,
নাক্ কাট্‌লে হয় না কোন কালে।

১২৪। চুন্নী মাগীর বড় গলা—
আরো খায় সে দুধ কলা।
চুন্নী=চোরের স্ত্রীলিঙ্গ।

১২৫। কইলে লড়া লড়া,
না কইলে পেট ভরা।

১২৬। মূর্খ পুত্র জম স্বরূপ।

১২৭। জিহ্বারে না দিও লাই,
জিহ্বা বলে আরো খাই।
লাই=প্রশ্রয়।

১২৮। খায় লর চিমটী,
নাম পড়ে চুসকীর।

১২৯। সর্প হইয়া দংশ তুমি,
ওঝা হইয়া ঝাড়।

১৩০। যে নারী সতীনের ঘরে পড়ে
তারে বিধি আলাদা সাজে গড়ে।

১৩১। সকল সতীনে লাড়ে চাড়ে,
বইন্ সতীনে পুইড়া মারে।

১৩২। চোরেরে কয় চুরি করতে,
গিরস্তেরে কয় সজাগ থাকৃতে।
গিরস্ত=গৃহস্থ।

১৩৩। জোরা ভিটায় তোলে ঘর,
যে আসে তারই হয় জ্বর।

১৩৪। ভাতে বলে মোরে খা—
সেচুর পাইরা ঘরে যা।
সেচুর পাইরা=সেঁচ্‌ড়িয়ে।

১৩৫। মরতে চলছে বুড়ী—
তবুও না ছাড়ে শাঁখার গুড়ি।

পূর্ব্বে বোধ হয় আধুনিক রোজ্ পাউডারের পরিবর্ত্তে বিলাসিনীদিগের প্রসাধন কার্য্যে শাঁখার গুড়ি ব্যবহৃত হইত।

১৩৬। কি না পায়—
মুগ ডাইল খায়।

১৩৭। নায় আটে না—
হুইয়া যায়।
হুইয়া=শুইয়া।

১৩৮। বেহায়ার বালাই দূর—
কাটা কাণে ঝিঙ্গা ফুল।

১৩৯। খ্যারে কুটায় আগুন দিয়া—
পেৎনি বইল আল্‌গোছ হইয়া।

কোন গুরুতর কার্য্য করিয়া কার্য্য কারক যদি পরম নিশ্চিন্ত ভাবে সরিয়া বসিয়া থাকে তবে এই শ্লোক দেওয়া হয়।

১৪০। মা'র নাম চেরকী বাঁদী—
পুতের নাম সুলতান খাঁ।

১৪১। ঝারি ঝরবে, উনান্ ঘর,
বাঁদী চোর, স্ত্রী মুখর।

১৪২। খটর মটর জোতা পায়,—
ছাখ্‌লো দিদি কেলো যায়?—
ভাব্‌রঞ্জীর ভাতারে যায়।

১৪৩। জৈচা—কুট্‌লে মিছা,
রাঁধ্‌লে দেয় টৌ,—
সগল খাইল বৌ।
সগল=সকল।

১৪৪। আরে ও গোলামের নাতি,
আন্‌চিলা ক্যান্ দুর্গামূর্ত্তি?
করুম্ই ত এই কীর্ত্তি!

এক হতভাগ্য বহু অনুসন্ধানে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যারত্ন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু শেষটা দেখা গেল যে বৌটি একটি আস্ত মাকাল ফল—অলস ও মুখরার এক শেষ। বৌর ব্যাদবি সহ্য করিতে না পারিয়া শাশুরী একদিন ছেলের কাছে সব কথা বলিলেন। মাতৃভক্ত ছেলেও যেই স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল স্ত্রীও অমনি রোষভরে তাহাকে বলিয়া উঠিল—

"আরে ও গোলামের নাতি"
ইত্যাদি।

১৪৫। আইজ বুঝ্‌লি না, বুঝ্‌বি কাইল্,
মার্গ থাপরাবি আর পার্‌বি গাইল্।

১৪৬। শাশুরি বড় দুতের দুত,
কাঠি মাইপা থোয় দুধ।
বৌ তেমুন দুতের দুত,
জল্ মিশাইয়া খায় দুধ।

১৪৭। পিরদুপেরই কোল আঁধার।
পিরদুপ=প্রদীপ।

১৪৮। আম তলাই আম মূল।

১৪৯। সোনা থুইয়া আঁচলে গিরু।

১৫০। বৌ মরে, জোকার পড়ে,
ঘরে ঘরে বিয়া করে।
জোকার=উলুধ্বনি।

১৫১। থাকেন যদি মোহন বাঁশী,—
কত রাধা হবেন দাসী।

১৫২। মা মরলে বাপ তাঐ,
ভাই হয় বনের বাঐ।

১৫৩। মাইয়ারে বাখ্‌নায় কে?
মাইয়ার মায় আর বাপে।

১৫৪। ছাই ফেলাইতে ভাঙ্গা কুলা।

১৫৫। সর্ব্ব কর্ম্মে রাধা,—
ভাতারেরে ডাকে দাদা।

১৫৬। অলি লো বাঁশ পাতা,—
বিয়ার রাইতে কইচিলি কথা।

১৫৭। শাশুরি নাই, ননদ নাই,
কারবা রাখি ডর,
আগে খাই পান্তা ভাত—
শেষে লেপি ঘর।

১৫৮। মায় রাঁধে যেমুন তেমুন,
বইনে রাঁধে পানি,

ঐ যে অভাগী রাঁধে—
যেমুন চিনি পরমন্‌খানি।
পরমন=পরমান্ন।

১৫৯। অদন্ত হাসি বড় ভালবাসি।

এক রাজার দুই রাণী ছিলেন। মামুলি প্রথামত বড় রাণীকে ছোট রাণীর প্ররোচনায় বনে দেওয়া হইল। একদা রাজা বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে পরম সুন্দর একটী শিশু দেখিয়া স্নেহাভিভূত হইলেন। শিশুটী রাজার আদর পাইয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; রাজা অমনি বলিয়া উঠিলেন,"অদন্ত হাসি বড় ভালবাসি।"

ঐ কথা শুনিয়া শিশুর জননী কুটীরের বাহিরে রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা তাঁহাকে বড় রাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়া পরম যত্নে গৃহে নেওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

ওদিকে ছোটরাণী সংবাদ পাইলেন যে, বড় রাণীকে সত্বরই রাজধানীতে আনা হইবে এবং রাজা বড় রাণীকে দেখিয়াই বলিয়াছেন যে, "অদন্ত হাসি বড় ভাল বাসি"। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার প্রিয় হওয়ার জন্য শাঁড়াশী দিয়া নিজের সব দাঁত ফেলিয়া দিলেন। দিয়া রাজ সমীপে গিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁর এই ডাইনীবৎ চেহারা দেখিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন: এবং বড় রাণীকে নিয়া সংসার গৃহস্তি করিলেন।

১৬০। যোর যার মুল্লুক তার।

১৬১। বাপের নাম নাই, দাদার নাম নাই,
ট্যামগোপালের নাতি।

১৬২। আহ্লাদের চাঁদ্—
বুইড়া কয় বুড়ীলো আমারে
কোলে কইরা রাঁধ্।

১৬৩। এত খাওয়ান খাওয়াইছ
লড়িতে না পারি;
রথখান দেও দেখি
নিত্ কর্ম্মকার।
রথ=পা।
নিত কর্ম্ম=নিত্যকর্ম্ম, এখানে চুরি করিয়া খাওয়া।

এক বৌ'র চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস ছিল। শাশুরী টের পাইয়া ভাবিলেন—এত বড় দোষ! যে করিয়াই হউক্ বৌ'র এ দোষ শোধ্‌রাইতেই হইবে। তাই তিনি একদিন বৌকে চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। বৌ আর নড়িতে চড়িতে পারে না। এদিকে তাহার চুরি করিয়া খাইবার সময় উপস্থিত; কিন্তু উঠিয়া যাওয়ার শক্তির অভাব। অগত্যা শাশুরীকে ডাকিয়াই বৌ বলিল—"এত খাওয়ান খাওয়াইছ" ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তি

প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিভা বৈশাখ ও জ্যৈ দুই সংখ্যায় প্রকাশিত উপর লিখিত নামধেয় প্রবন্ধটির কয়েকটি দোষ ও ত্রুটী দেখাইয়াছেন। ইংরেজী নোট অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধে স্থান ও ব্যক্তির নামে অনেক গুলি ভুল হইয়াছে, যথা—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আগার সিন্দূর	এগার সিন্দুর
ইসফ খাঁ	ঈশা খাঁ
বোকার নগর	বোকাই নগর
কাটার দীঘি	কুটামন দীঘি
সংসার দীঘি	সেনবাড়ীর দীঘি
কাতিয়াধি	কাটিয়াদি
আছুমতিয়া	আচমিতা
হাবাতনগর	হয়বত নগর

পূর্ণবাবু আরও লিখিয়াছেন যে, প্রবন্ধের লিখিত গিরীশচন্দ্র রায় প্রকৃত পক্ষে গিরীশচন্দ্র চৌধুরী হইবে, এবং শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি রৌপ্যময়ী নহে, দারুময়ী।

প্রতিভা সম্পাদক।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩২১   ৪র্থ সংখ্যা।

মাতৃস্তোত্র

উছল নীল সিন্ধু-সলিল
চুম্বে চরণ তব—
সংখ্যা-বিহীন উর্ম্মি-আননে
বন্দনা-কলরব ;
অদ্রীশ চিরগর্ব্বিত তব,
শুভ্র কেতন ধরি,
নির্ম্মল নীল অম্বর হাসে
মা, তোমার শিরোপরি।

দীপ্তোজ্জ্বল সূর্য্যে তোমার
অঙ্গের হেম ছায়া,
চন্দ্রের সুধা অর্ণবে তব
বিশ্ব-মোহিনী মায়া ;
গ্রহতারকার পূর্ণ সভায়
সম্বর্দ্ধনা তব,
অম্বুদ ঘোর-গর্জ্জনে তব
কম্বুর জয় রব।

জাহ্নবী তব চিত্তের চির
-জাগ্রত স্নেহ-ধার—
স্বর্ণাঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা
বক্ষেতে মা, তোমার!
পুষ্পিত তব কুঞ্জ-কানন
মঞ্জুল সুষমায়—
ছন্দে-সুহাসে গন্ধে-বরণে
নন্দন ভেসে যায়।

বিশ্ব-স্বভাব-সাম্রাজ্যের
মধুময়ী রাণী তুমি,
সৌন্দর্য্যের কল্প-প্রতিমা,
—অয়ি গো আমার ভূমি—
অধ্যাত্মের আত্মা শকতি,
কর্ম্ম-জ্ঞানের মাতা,
ধর্ম্ম-ধেয়ান-মন্দাকিনীর
পুণ্য-পীযুষ-স্নাতা!

শাশ্বত বেদ ছন্দ তোমার
বিশ্বের আদি গান—
ভক্তির মহা-আহ্বান-বাণী,
শক্তির মধু তান ;
দর্শন-গীতি- সংহিতা তব
ঋদ্ধির ভাণ্ডার—
মর্ত্ত্য-বাসীর গৌরব-জ্ঞান
-সম্পদ-পারাবার!

বাঞ্ছার তুমি প্রার্থিত ধন,
ভক্তের তুমি প্রাণ,
অন্নদা তুমি, পুণ্যদা তুমি,
অক্ষয় তব দান ;
মাতৃ-পীযুষ-স্তন্য-পিয়াসী
ভগবান বার বার
বক্ষে তোমার সন্তান রূপে
জন্মেন অবতার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

———

বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদে পঠিত, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১)

পূর্ব্ব প্রস্তাবের সার সঙ্কলন।

বঙ্গ-বিজেতা সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের ইটা অঞ্চলে সুবিদনারায়ণ নামে ত্রিপুরার জনৈক সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজের বৎসাদি পঞ্চগোত্রের অন্যতম বাৎস্যগোত্রে রাজা সুবিদনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যা রত্নাবতী খঞ্জা ছিলেন। রাজা পঞ্চখণ্ড ঘুঙ্গাদিয়া নিবাসী (১) রুদ্রপতির পুত্র এবং রমাপতির ভ্রাতা রঘুপতি নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবককে গৃহে জামাতারূপে পঞ্চখণ্ড হইতে ইটা রাজ্যে স্থাপিত করেন। শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজের কাশ্যপ, স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি অপর পাঁচ গোত্রের অন্যতম কাত্যায়ন গোত্রে রাজ-জামাতা রঘুপতি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক সমাজের এই দুই শাখার মধ্যে সদ্ভাবের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এই সামাজিক অসদ্ভাবের মূলে শ্রীহট্টের রঘুনাথের আবিষ্কার (২)। ১০।১২ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম সামাজিক পত্রে প্রচার করেন যে, রাজ-জামাতা রঘুপতির রঘুনাথ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং ইনিই কালক্রমে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি রূপে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভ্রাতার বিবাহে দুঃখী পরিবারের অর্থাভাব ঘুচিয়া গেল সুতরাং রঘুনাথের শ্রীহট্ট পরিত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রচার করা হইল বৎসাদি পঞ্চগোত্র, রাজা আদি ধর্ম্ম-ফার (?) দান প্রতিগ্রহ করায় কাত্যায়নাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ কর্ত্তৃক আদান প্রদানের বহির্ভূত ছিলেন। রাজা বৎসাদি পঞ্চগোত্রের অন্যতম বৎস্যগোত্রীয়, সুতরাং কাত্যায়ন রঘুপতি রাজকন্যা বিবাহ করায় "কুলগৌরব ধ্বংসকারী" বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার একাদশ বর্ষীয় ভ্রাতা রঘুনাথ অভিমানে জননী সহ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হন। শ্রীহট্ট হইতে ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে"

(১) রুদ্রপতির বংশ পত্রিকা প্রতিভা পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩২০) মুদ্রিত হইয়াছে। ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে কুকী রাজগণের 'ঘুণ' বাজাইলে প্রজাবর্গ বিপদ কালে সতর্ক হইবার সুযোগ পাইত। ঘুঙ্গাদিয়ার নিকটে কুকী রাজার বাড়ী ও দীঘি। পঞ্চখণ্ডের পূর্ব্বনাম "টেঙ্গইর" টেঙ্করী কুকীগণের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। পার্ব্বত্য ভূমিতে অবস্থিত ভদ্র পল্লীসমূহ ১৩।১৪ পুরুষ মধ্যে নিকটবর্ত্তী সমতল ভূভাগ হইতে আগত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ডের স্থাপয়িতা পাল ও দত্ত-বংশীয় গণের বংশপত্রিকা এসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অবকাশ হইলে যথা সময়ে উহা প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণের পূর্ব্বনিবাসভূমি বড়ুয়া কোনা, দাসউড়া, বস্বালা, ছোটলিখা প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পঞ্চখণ্ড সুপাতলা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান দত্ত বর্ত্তমান হইতে ১১পুরুষ পূর্ব্বে পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন। তাঁহার তিন পুরুষ মাত্র পূর্ব্বে, পালবংশীয় কালিদাস সদলবলে পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। সুবিস্তৃত "বার পালের দীঘি" তৎকালেও অত্যন্ত প্রাচীন দীঘি রূপে পরিণত ছিল এইরূপ বিবরণ পালবংশীয়গণের নিকট হইতেও অবগত হওয়া যায়।

এই দীঘি টীলা ও সমতল ভূমির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এই দীঘি অতি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সত্য, কিন্তু এই উপনিবেশ প্রাচীন যুগেই টেঙ্করী কুকীদিগের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া যায়। বর্ত্তমান ভদ্র উপনিবেশ সের শাহেরও পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত; চৈতন্য দেবের সময়ে এস্থলে ঘোর অরণ্য ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কুকীগণের বসবাস ছিল, সুতরাং তৎকালে তর্কসিদ্ধান্ত উপাধিধারী পণ্ডিতগণের পঞ্চখণ্ডে অবস্থানের কথা একান্ত অযৌক্তিক।

(২) "শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ৪১৯ গৌরাব্দ এবং নব প্রতিভা ১৩১০ বাঙ্গলা দ্রষ্টব্য।

এই কাহিনী স্থান প্রাপ্ত হয় এবং "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" লেখক উপর্য্যুক্ত উপাদান সমূহ অবলম্বনে এবং সময়োপযোগী সামান্য পরিবর্ত্তন ক্রমে রঘুনাথ বিবরণ নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। আমরা বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কল্পিত প্রতিগ্রাহী অপবাদের অসারতা এবং কাত্যায়ন রঘুনাথের সহিত বঙ্গীয় রঘুনাথের একীকরণ-চেষ্টার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছি। সনন্দ ও বংশপত্রিকা-লব্ধ প্রমাণাবলী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। রাজা সুবিদনারায়ণ পাঠান দলপতি ওসমান কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ইহার পর ৩।৪ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক ওসমানও নিহত হয়।

নাসিরুদ্দিন নামক দক্ষিণ শ্রীহট্টের জনৈক প্রতাপশালী ব্যক্তি ওসমানের হত্যাকার্য্যসাধনে সুজায়াত খাঁকে সাহায্য করেন এবং এই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বৎসরে, অর্থাৎ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে, কানিহাটী পরগণার চৌধুরী উপাধি এবং একখণ্ড ভূমি জায়গীর স্বরূপ লাভ করেন। এই জায়গীর প্রাপ্তির সনন্দ কানীহাটীর জমিদার-বংশে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। নাসিরুদ্দিন যে সুজায়াত খাঁকে ওসমান খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে সাহায্য করিয়াছেন ইহার প্রমাণ এই সনন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সনন্দ হইতে দেখা যায় যে, সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথের জীবিত কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। আলোচিত বংশ পত্রিকার মধ্যে আবদুলকরিম চৌধুরী প্রণীত সুবিদনারায়ণের বংশপত্রিকা, সার্ব্বভৌম প্রণীত বংশপত্রিকা, জাতীয় ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত রঘুপতি বংশ পত্রিকা এবং পঞ্চখণ্ডে অবস্থিত রঘুপতির জ্ঞাতিগণের বংশপত্রিকা—রাজ-পরিবার সংশ্লিষ্ট এই চারিটি বংশ পত্রিকার মধ্যে একমাত্র জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত বংশ পত্রিকায় রঘুনাথ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং ইহাদের কোনও একটীতেও রঘুনাথ-ভ্রাতা রাজ-জামাতা রঘুপতি ও তাহার বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে ৮ পুরুষ, এবং রাজা ও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে ৯ পুরুষের অধিক ব্যবধান দৃষ্ট হয় না। পুরুষ হিসাবে সময় নির্দ্ধারণের সর্ব্বোচ্চ হারে, অর্থাৎ তিন পুরুষে ১০০ বৎসর হিসাবেও শ্রীহট্টের রঘুনাথ ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হন না। সুতরাং সনন্দ ও বংশাবলী এই উভয়বিধ প্রমাণ হইতে নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, রঘুপতি ও অপর ভ্রাতা রঘুনাথের প্রাদুর্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। রাজা সুবিদনারায়ণের সময় দীর্ঘ করিয়া না দেখাইলে উভয় রঘুনাথের জীবিত কালের সামঞ্জস্য হয় না, সম্ভবতঃ এই জন্যই রাজার দুই পুত্রের নামের পর তদ্বংশীয়গণের অজ্ঞাতসারে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ৩ পুরুষ অজ্ঞাত লিখিত হইয়া থাকিবে। যাহাহউক রাজ-জামাতা রঘুপতির পর ঐরূপ "৩ পুরুষ অজ্ঞাত" দেখান হয় নাই।

বিভিন্ন কাত্যায়ন বংশপত্রিকায় উক্ত প্রকারে '৩ পুরুষ অজ্ঞাত' রূপে লিপিবদ্ধ না দেখিলে শুধু একটী মাত্র বংশ পত্রিকায় কৃত্রিম উপায়ে সময় দীর্ঘ করিয়া রঘুনাথের সময় নির্দ্ধারণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, এবং এই সকল বংশ পত্রিকা উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাত কয়েকটী পরিবারের বংশ পত্রিকা হইতে সময় নির্দ্দেশের চেষ্টাও বিশেষ কার্য্যকারী হইবে না। শ্রীহট্টের কাত্যায়ন রঘুনাথ ও বঙ্গীয় রঘুনাথ অভিন্ন ইহা সপ্রমাণ করিতে এবং উভয় রঘুনাথের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে শ্রীহট্টের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি অক্লান্ত ভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেছেন। ১০.১২ বৎসর পূর্ব্বে (তখনও শ্রীহট্টে রঘুনাথের সম্যক সৃষ্টি হয় নাই) তাঁহারা প্রকাশ করেন শ্রীহট্ট পরিত্যাগ কালে রঘুনাথ মাত্র একাদশবর্ষীয় ছিলেন, তৎপূর্ব্বেই তিনি পঞ্চখণ্ডের সুবিখ্যাত শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করেন। ইত্যাকার মত লইয়া রঘুনাথকে শ্রীহট্টের কাত্যায়ন গোত্রে রাখা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ মত পরিবর্ত্তন করিতে

বাধ্য হন। আমরা তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়াছি এবং নিষ্কলঙ্ক রজকুলের অমূলক অপবাদ প্রচার করাতে সমাজে যে অশান্তির সূত্রপাত হয়, তাহাও যথাক্রমে দেখাইয়াছি।

বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি *

বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি নিজ অমূল্য গ্রন্থরাজি ব্যতীত নিজ জীবনীর কোনও উপাদান রাখিয়া যান নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম আলোচ্য বিষয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে রঘুনাথ জীবনীর বিবিধ আখ্যায়িকা। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আখ্যায়িকা; সর্ব্বশেষ আলোচ্য বিষয় আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট মতবাদ।

সংগৃহীত উপাদান ও তৎসাহায্যে রঘুনাথ জীবনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক ঐতিহাসিক অবস্থার একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সকল ঘটনাবলি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব (১) রঘুনাথ ও চৈতন্য দেব উভয়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র হইতে পারেন কি না; (২) ওসমান ও ওসমান কর্ত্তৃক পরাজিত রাজা সুবিদনারায়ণ ও তাঁহার কুটুম্ব রঘুনাথ কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

হুসেন সাহের রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায় ১০ বৎসর কাল বঙ্গের সিংহাসনে হাবসী দাসরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গের এই দুর্দ্দিনের সময় সুলতান সাজাদা ৮ মাস কাল রাজত্ব করেন। ইনি হাবসী খোজা ছিলেন। পাঠান নৃপতি ফতেসাহকে নিহত করিয়া ইনি সিংহাসন লাভে সমর্থ হন। মালিক আণ্ডেল নামক তাঁহার হাবসী সেনাপতি কর্ত্তৃক তিনিও নিহত হন। মালিক আণ্ডেল সাধারণতঃ ফিরোজ সাহ নামে পরিচিত। অতঃপর তৎপুত্র মামুদ সাহ রাজত্ব করেন। পিতা-পুত্র উভয়ে ৪ বৎসরের অনধিক কাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। মামুদ সাহ ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। সিদিবদর দেওয়ানা নামক জনৈক হাবসী ক্রীতদাস তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং মজফর সাহ নামে পরিচিত হন। মজফর তিন বৎসর ৫মাস কাল রাজত্ব করেন। তিনিও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। ক্রমে পাঠান ওমরাহগণের পক্ষেও তাঁহার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

রাজা নিহত হইলে পর সৈন্যগণ সৈয়দ হোসেনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে। সৈন্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ তিনি তাহাদিগকে গৌড় নগর লুণ্ঠন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু কয়েকদিন লুণ্ঠন চলিলে পর তিনি আবার সৈন্যদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। সৈন্যগণ এই আদেশ অমান্য করে এবং ফলে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য নিহত হয়।

এই হোসেন সাহের মুদ্রা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ১৪৯৪ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিশেষ যশঃ ও পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্ব

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালা জাতি গৌরবান্বিত। এই ধর্ম্ম-মতের ক্রমবিকাশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গভাষা বাঙ্গালী জাতির অপর গৌরবের বিষয়, সুখের বিষয়। ইহারও যথা যোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম ও ভাষা ব্যতীত বাঙ্গালীর গৌরব অনুভব করিবার আর একটী বিষয় আছে; কিন্তু তাহার ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার কোনও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy) এমন কি বঙ্গীয় দর্শনিক গণের সম্রাট রঘুনাথের জীবনী যথা যোগ্য ভাবে লিখিত হয় নাই। সূক্ষ্ম চিন্তায় বঙ্গীয় দার্শনিকগণ হিগেল, কোমতে, মিল, বেইন (Hegel, Kant, Mill, Bain) হইতে ন্যূন হইবেন না।

করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে হাবসীগণ বঙ্গ-হইতে বিদূরিত হয় এবং দেশে শান্তি-সম্পদের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। এই প্রজাবৎসল নৃপতির অধীনে বঙ্গ-সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ইনি জৌনপুরের শেষ স্বাধীন নৃপতিকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইঁহার সময়েই পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যপোত গঙ্গাবক্ষে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল বিচারে দেখা যায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র (১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ) তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্য দেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃঃ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং ঐ সনেই পুরীধামে বাসুদেব সর্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। চৈতন্য দেবের জন্মের *অল্প পূর্ব্বে নবদ্বীপে হাবসীগণ কর্ত্তৃক বিবিধ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ফলে গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হয় এবং হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান জাতি-ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। এই কারণে রঘুণাথের গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নবদ্বীপ পরিত্যাগের কথা একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হোসেন সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরৎসা ও তৎ-পৌত্র মামুদসা যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মামুদ সেরসাহ কর্ত্তৃক ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন। সের সাহের মৃত্যুর পর (১৫৪৮ খৃঃ) ৪ জন পাঠান নৃপতি বঙ্গে রাজত্ব করেন।

মোগল রাজত্ব

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি খানজাহান কর্ত্তৃক বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ কররাণী পরাজিত হন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ ভাঁওয়ালে ও ব্রহ্মপুত্র-তীরে বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমানকে বিতাড়িত করিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার আলাউদ্দিন, চিস্তি নবাব ইসলাম খাঁ, বিদ্রোহী পাঠান, পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদিগকে দমন করিবার মানসে রাজমহল হইতে ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ওসমান নিহত হয়। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ শ্রীহট্টের নাসিরুদ্দিন ইসলামখাঁ হইতে জায়গীর ও সনন্দ লাভ করেন।

রঘুনাথ জীবনীর উপাদান।

চতুষ্পাঠী প্রচলিত আখ্যায়িকা।

চতুষ্পাঠী সমূহের পরম্পরাগত আখ্যানগুলি দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট ইতি কথা—ইহাদের অধিকাংশ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি, আই,ই কর্ত্তৃক ৺ গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ৺ চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ন্যায় শাস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া "সুপ্রভাত" নামক গ্রন্থে "রঘুনাথ শিরোমণি" নামক প্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। নিম্নে উল্লিখিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ সংগৃহীত বিবরণের মর্ম্ম

(১) বাসুদেবের পিতা মহেশ্বর বিশারদ এবং পিতামহ একপত্রী রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ। বাসুদেব শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দর্শন শাস্ত্রের একটী টোল স্থাপন করেন। শেষ জীবনে তিনি প্রতাপ রুদ্রের সহায়তায় পুরীধামে একটী বেদান্তের টোল স্থাপন করেন। বারাণসীতে না যাইয়া দণ্ডিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিত। বাসুদেবের সময়ে ন্যায়ের আধিপত্য ছিল মিথিলায়।

* ১। "বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত—চৈতন্য মঙ্গল।

২। "উৎকলে সার্ব্বভৌমশ্চ বারাণস্যাং বিশারদঃ।"
বিশ্বকোষে উদ্ধৃত—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা।

মৈথিলী পণ্ডিতগণ ছাত্রদিগকে কোন গ্রন্থই নিজদেশে লইয়া যাইতে দিতেন না। তখন নবদ্বীপে ন্যায়ের উপাধিদানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(২) পাঁচ বৎসর বয়সে (১১ বৎসর বয়সে নহে) রঘুনাথ তদীয় দুঃখিনী জননী সহ নবদ্বীপ বিদ্যানগরে বাসুদেব সর্ব্বভৌম-গৃহে আশ্রয় লাভ করেন।

(৩) রঘুনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ পন্নাতীরনিবাসী ছিলেন।

(৪) শিশু রঘুনাথের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও বিচার শক্তির পরিচয়—

(ক) 'সব গাছে প্রচুর আম হইবে' শুনিয়া রঘুনাথের প্রশ্ন—'তাল গাছেও আম হইবে নাকি ?'

(খ) বর্ণ পরিচয় কালে আগে 'ক' পরে 'খ' কেন, দুইটী "ব", তিনটি 'স' কেন ইত্যাকার প্রশ্ন।

(গ) বালুকা হাতে রাখিয়া হাতের উপর আগুন লওয়া প্রভৃতি কার্য্য।

(৫) রঘুনাথ ১২ বৎসর বয়সে মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের টোলে প্রবিষ্ট হন। রঘুনাথ গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত সটীক চিন্তামণি কণ্ঠস্থ করেন এবং গুরুদত্ত "শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং চিন্তামণি দীধীতি নামক নূতন আকারে ন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৬) পরবর্ত্তী বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অন্য কাহারও কোন নাম নাই ; কিন্তু রঘুনাথের নাম পত্রে পত্রে।

(৭) মিথিলায় অবস্থান কালে তিনি নিজকে নবদ্বীপ নিবাসী বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন।

(৮)ক। রঘুনাথ যখন আশীতিপর বৃদ্ধ তখন নবদ্বীপের জগদীশ তর্কালঙ্কার এক টীকা রচনা করেন।

(খ) চরম বার্দ্ধক্যে তাঁহার একটু একটু শিরঃকম্প হইত।

(গ) তিনি চিরকুমার ছিলেন।

(ঘ) অর্থোপার্জ্জনে তিনি উদাসীন ছিলেন।

(ঙ) তাঁহার একচক্ষু কাণা ছিল।

(চ) তাঁহার যথেষ্ট আত্মাভিমান ছিল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি গুরু পক্ষধর মিশ্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

(ছ) দারিদ্র্য ও শিরঃকম্পের দরুণ তাঁহাকে উপহাস করায় তিনি কবিত্ব পূর্ণ শ্লোকে প্রত্যুত্তর দানে নিজ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অপরাপর ইতিকথার মর্ম্ম নবদ্বীপ মহিমা এবং নদীয়া কাহিনী নামক দুই খানা গ্রন্থ হইতে নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

(অ) নবদ্বীপ মহিমা প্রদত্ত বিবরণের সারাংস—

(১) বাসুদেব মিথিলায় গমন পূর্ব্বক চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করেন। অতঃপর তিনি কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জীবনের শেষ-ভাগ শ্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। এই স্থানেই তিনি চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাজিত হন।

(২) রঘুনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ বৎসরে পিতৃহীন হন। তদীয় দুঃখিনী জননী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কোন কোন ছাত্রের গৃহে কার্য্য করিয়া নিজের ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন।

(৩) একদা তিনি 'নবদ্বীপ নিবাসিনঃ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

(৪) রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। অনেক স্থলে চৈতন্যদেব তাঁহার মত পরিস্ফুট করিয়া দিতেন। একদা এক উড়ুম্বর বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ২৪ ঘণ্টায় যে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই চৈতন্যদেব মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ বলিতেন,—"পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। 'ব্যুৎপত্তিবাদ' আমার পুত্র এবং 'লীলাবতী' আমার কন্যা। অতএব বিনা বিবাহেই আমার আশা ফলবতী হইয়াছে।"

(৬) রঘুনাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

(আ) নদীয়া কাহিনী প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ—

(১) খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বাসুদেব পক্ষধরের ছাত্র; মতান্তরে সহাধ্যায়ী। তিনি কাশীধামে বেদান্তও অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে। বাসুদেব তাহাতে উত্যক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকল যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থিত কালে সার্ব্বভৌম নিরুক্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন।

(২) রঘুনাথের পুত্র (!) রামভদ্র সার্ব্বভৌম। ইনি "পদার্থ খণ্ডনের" টীকায় আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

মুরারীগুপ্ত বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামীর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে রঘুনাথ।

(১) অদ্বৈত প্রকাশ—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের যত্নে অদ্বৈত প্রকাশ নামক একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা ঈশান নামক অদ্বৈত আচার্য্যের জনৈক সেবক। ঈশান নগর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে চৈতন্যদেব বাসুদেব সর্ব্বভৌমের টোলে দুই বৎসর কাল ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রঘুনাথের (!) মনস্তুষ্টির জন্য পাঠাবস্থায় চৈতন্যদেব স্ব-রচিত ন্যায়ের টীকা প্রণয়ন করেন, এই রূপও বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

(১) "গদাধর কহে শুন বেদ পঞ্চানন
আদ্য হৈতে কহি গৌরের পাঠ বিবরণ
প্রথমে শ্রী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার
তবে গেলা শ্রীমান বিষ্ণুমিশ্রের গোচর
তাহা দুই বর্ষে স্মৃতি জোতিষ পড়িলা
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা
তার স্থানে ষড় দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে
তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে
তার স্থানে তর্ক শাস্ত্র পড়িলা দুই বৎসরে
এবে তুঁয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে।"

(চৈতন্যদেবের ১০বর্ষ ব্যাপী বিদ্যাশিক্ষা।)

(২) "এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলুঁ স্থাপন॥
তাহা শুনি সভে কৈল জয় জয় ধ্বনি।
ছাত্র কহে বিদ্যাসাগর দেহ পান চিনি॥"

(বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ)

(৩) "পূর্ব্বে গোরা যবে শাস্ত্র কৈলা অধ্যয়ন
তর্ক শাস্ত্রের টীকা এক কৈলা বিরচণ
সেই টীকা লঞা তিহ গঙ্গা পারে যায়
হেন কালে এক দ্বিজ তাহারে পুছয়
তব বক্ষে কোন গ্রন্থ কহ মহাশয়
ন্যায় শাস্ত্রের টীকা এই শ্রীগৌরাঙ্গে কয়
দ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাকার
কহে মোর পরিশ্রম হইল ছারখার
ইহা দেখি মোর টীকার হইব অনাদর
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর
নিজকৃত টীকা গঙ্গা মাঝে ডারি দিল।"

(চৈতন্য দেব প্রণীত ন্যায়ের টীকা গঙ্গায় বিসর্জ্জন)

(২) শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—এই সুবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

(ক) "ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ন্যায় পড়িবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।"

(খ) আবার বলরাম দাস অমিয় নিমাই চরিতে রঘুনাথ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"রঘু তীক্ষ্ণবুদ্ধ্যে নদে চমকিত
কেবল নিমাই নিকটে স্তম্ভিত॥
রঘুনাথ পড়ে মনোযোগ দিয়া
নিমাই বেড়ায় অতি চঞ্চলিয়া॥
কখন যে পড়ে কেহ নাহি জানে
তবু রঘুনাথ নারে তার সনে॥"

অতঃপর রঘুনাথ যে প্রশ্ন সমাধান করিতে দিবারাত্র চিন্তা করিয়াও পারেন নাই নিমাইর মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমাধান করিবার বর্ণনা।

(গ) "নিমাই ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একখানা ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দীধীতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিশ্বম্ভরও একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।" অতঃপর গঙ্গাবক্ষে নিজ-কৃত ন্যায় গ্রন্থের বিসর্জ্জন ও বন্ধুর মনোমালিন্য দূর করিবার বর্ণনা

(৩) ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"বাসুদেবের ন্যায় ছাত্র-সৌভাগ্য সকল অধ্যাপকের অদৃষ্টে ঘটে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক চৈতন্য, বঙ্গে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ, স্মৃতি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন, তন্ত্রশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কৃষ্ণানন্দ, হরিদাস সার্ব্বভৌম প্রভৃতি, সকলেই তাঁহার ছাত্র।"

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে রঘুনাথ।

"খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিদাস ও রঘুনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও চৈতন্যদেব এই উভয়ের সম-সাময়িক। রামভদ্র সার্ব্বভৌম রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ও ছাত্র। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন।"

নব্যভারত পৌষ ১৩০৫, ৪৮২পৃঃ—ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কিছুদিন বাসুদেব সর্ব্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীহট্টবাসী 'কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ সহ তাঁহার যে রঙ্গ হইত, তাহারই একটা চিত্র এস্থলে উল্লেখ করিব।"

রঘুনাথ নির্জ্জনে বৃক্ষতলে বসিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তায় যে প্রশ্ন সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন চৈতন্যদেব মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা সমাধান করেন।

"রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার গ্রন্থখানা অদ্বিতীয় হইবে, ইহাদ্বারা তিনি খ্যাত হইবেন। কিন্তু নিমাইকৃত গ্রন্থে অদ্ভুত বিচার পদ্ধতি ও অচিন্তিত সিদ্ধান্ত দর্শন করিয়া তাঁহার সে ভরসা চলিয়া গেল। চির-পোষিত আশা মিলাইয়া গেল, তাঁহার ধৈর্য্য বিদুরিত হইল এবং চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণহৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন, 'ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন? ইত্যাদি।' অতঃপর পাদটীকায় নিম্নোদ্ধৃত দুই লাইন প্রদত্ত হইয়াছে—

"সেই ক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল।
নিজকৃত টীকা গঙ্গামাঝে ডারি দিল॥"

অদ্বৈত প্রকাশ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৪৪—৫ পৃঃ)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিতেছেন—২০ বৎসর বয়সে (১৫০৫ খৃঃ) চৈতন্যদেব নবদ্বীপে টোল স্থাপন করেন, তখন নৈয়ায়িক রঘুনাথ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন খ্যাতনামা পণ্ডিত, এবং বাসুদেব তখন বৃদ্ধ ও নবদ্বীপ বাসী। *

এই পর্য্যন্ত আমরা রঘুনাথ জীবনীর উপাদান এবং তৎসম্পর্কীয় ইতিকথা, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভৃতিতে রঘুনাথ বিষয়ক মতবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম। অতঃপর ইহাদের আলোচনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হইব।

(আগামীসংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

---

* Nimai set up a tol himself at the age of twenty * * * * About this time, there came to Navadwipa, a renowned scholar named Keshava Kashmiri * * * * There were veteran scholars at Navadwipa about this time; old Vasudeva Sarbobhauma, the first authority in Logic in India; Raghunandan Bhattacharyya whose jurisprudence up till now governs Hindu society in Bengal; and Raghunath Siromani were all living. These were the intellectual giants of this period, but they were scholarly recluses who for many years had scarcely mixed with men.

History of Bengali Language and Literature. Ch. V. PP. 420-1. University Edn. 1911

স্বপ্নবাসবদত্তা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবেশক

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। ভাগ্যে আবার মহারাজের বিবাহ-মঙ্গল দেখলুম! কে জানত এইরূপ অনর্থ-সলিলের পাকে প'ড়ে আবার আমরা ভেসে উঠব। এখানে দালানে শুই, অন্তঃপুরের দীঘিতে চান করি, আর কোমল-মধুর মোদক খাই,—মনে হচ্ছে যেন উত্তরকুরুবাসেই রয়েছি—শুধু একমাত্র অপ্সরার অভাব। একটা কিন্তু ভারি দুঃখ,—যা খাই তা ভাল হজম হয় না, ভাল ভাল বিছানার চাদর দেওয়া পালঙ্কেও ঘুম হয় না, আর চারদিকে কেবল বাত-রক্তের মতই আমার চোখে লাগছে। যদি শরীর ভাল না থাকে, আর সুখ যদি চিরস্থায়ী না হয়, তবে সে সুখ সুখই নয়।

চেটীর প্রবেশ

চেটী। আর্য্য বসন্তক কোথায় গেলেন! এই যে বসন্তক। বসন্তক ঠাকুর আপনাকে কতক্ষণ যে খুঁজছি!

বিদূ। কেন? তুমি আমায় খুঁজছ কেন?

চেটী। রাণী-মা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন জামাতার চান হয়েছে কি না।

বিদূ। রাণী-মা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, বেশ; তুমি কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

চেটী। আর কেন? ফুল-চন্দন আনব কি না তাই জানতে।

বিদূ। হাঁ, মহারাজের চান হয়েছে খাবার ছাড়া আর সব নিয়ে এস।

চেটী। খাবার আনতে বারণ কচ্ছেন যে?

বিদূ। আমি একটি হতভাগ্য কি না, তাই কোকিলের যেমন চোখ বদলায় আমারও তেমনি উদরের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

চেটী। বেশ, আপনার এরকম হলেই ভাল।

বিদূ। আচ্ছা, তুমি এখন যাও; আমিও রাজার কাছে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

পরিচারিকার সহিত পদ্মাবতী ও আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তার প্রবেশ

চেটী। রাজকুমারী প্রমদ বনে এলেন কেন?

পদ্মাবতী। মুগ্ধরিকা, দেখ্‌ত শেফালিকার কুঞ্জে ফুল ধরেছে কি না!

চেটী। হাঁ রাজকুমারী, মাঝে মাঝে প্রবাল তার পাশে পাশে মুক্তার ঝালরের মত ফুলের গোছাগুলি বেশ দেখাচ্ছে।

পদ্মা। তবে আর দেরী কেন? ফুল তুলে' আন।

চেটী। আচ্ছা, আপনি এই শিলাতলে একটু বসুন, আমি ফুল তুলে' আনছি।

পদ্মা। (বাসবদত্তার প্রতি) আর্য্যে, তবে এখানেই কি বসব?

বা। হাঁ, বসা যা'ক। (উভয়ের উপবেশন)

চেটী। (ফুল তুলিয়া) রাজকুমারী, দেখুন, দেখুন, মনঃশিলার চাকতির মত শেফালিকা ফুলে আমার অঞ্জলি ভরে' গেছে।

পদ্মা। বাঃ! ফুলগুলি কেমন সুন্দর! আর্য্যে, এক বার চেয়ে দেখুন।

চেটী। রাজকুমারী, আরো তুলব?

পদ্মা। না, আর তুলে, কাজ নেই।

বা। বারণ কচ্ছেন কেন?

পদ্মা। আর্য্যপুত্র এখানে এসে এই ফুলগুলির সৌন্দর্য্য দেখে সুখী হবেন।

বা। সখি, মহারাজকে আপনি কেমন ভাল বাসেন?

পদ্মা। সে কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে তাঁর বিরহে বড় কাতর হয়ে পড়ি।

বা। (স্বগত) আমি বড় দুঃখের কথা তুলছি। আবার রাজকুমারীও উত্তর দিচ্ছেন ঠিক এমনি।

চেটী। রাজকুমারীকে আমি বলতে শুনেছি যে মহারাজকে তিনি বড় ভালবাসেন।

পদ্মা। আমার শুধু একটা সন্দেহ হয়।

বা। কি! কি!

পদ্মা। আর্য্যপুত্রকে আমি যেমন ভালবাসি আর্য্যা বাসবদত্তাও তেমনি ভালবাসতেন!

বা। না, এর চাইতেও বেশী!

পদ্মা। আপনি জানলেন কি করে?

বা। তাইত, আর্য্যপুত্রের প্রতি প্রাণের এতটা টান বলে, ভদ্রতার বাইরে গিয়ে পড়েছি! (প্রকাশ্যে) যদি তাই না হবে তবে বাসবদত্তা কি কখনও স্বজন ছেড়ে রাজার সঙ্গে চলে আসতেন।

পদ্মা। হাঁ, একথা ঠিক বটে।

চেটী। রাজকুমারী, মহারাজকে ভাল করে বলুন আপনিও বীণা শিখবেন।

পদ্মা। তা তাঁকে ত আগেই বলেছি।

বা। তিনি কি বল্লেন।

পদ্মা। কিছুই বল্লেন না, শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইলেন।

বা। কিছু কারণ ঠাউরেছেন?

পদ্মা। আমার মনে হ'ল আর্য্যা বাসবদত্তার গুণের কথা বল্‌লে পাছে আমার মনে ব্যথা হয় তাই যেন অতি কষ্টে চোখের জল বারণ কল্লেন।

বা। (স্বগত) যদি সত্য হয় তবে আমি বাস্তবিকই ধন্য।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

বি। বাঃ! বাঁধুলি ফুলে সমস্ত যায়গা ছেয়ে যায় নি অথচ বিরলভাবে এখানে সেখানে পড়ে আছে। এতে প্রমদ বনটা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। মহারাজ, এদিকে আসুন।

রাজা। হাঁ, বয়স্য, এই যাচ্ছি।

বসন্তক, মনে হচ্ছে যখন উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলুম; অবন্তী-রাজকুমারীর সঙ্গে তখন প্রথম দেখা। কামদেব আমার অবস্থা দেখে তখন আমার উপর তাঁর পাঁচটি শরই নিক্ষেপ ক'রেছিলেন; সেই শরাঘাত এখন কিন্তু আমাকে বিষশরের ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দিচ্ছে। সকলেই জানে মদনের মাত্র পাঁচটিই বাণ. তবে এখন আবার আর একটা তিনি কোথায় পেলেন, বসন্তক?

বি। রাণী পদ্মাবতী গেলেন কোথায়? হয় লতা-মণ্ডপে গিয়েছেন, নয় বাঘের ছালের মত দেখতে যে পর্ব্বততিলক শিলা শালকুসুমে ঢেকে আছে তারই উপরে বসে আছেন; অথবা হতে পারে সপ্তচ্ছদ-বনে যেখানে সপ্তচ্ছদের খুব কড়া গন্ধ সেখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর যদি সেখানেও না গিয়ে থাকেন তবে যে দারুবনে মৃগ-পক্ষি প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই গিয়েছেন। মহারাজ ঐ দেখুন শরৎকালের আকাশ—কোথাও একটু মেঘের চিহ্ন নেই তারই নীচে বলদেবের বাহুর ন্যায় রমণীয় সারসের সারিগুলি চুপ ক'রে উড়ে যাচ্ছে।

রাজা। হাঁ, সখা ঠিকই বলেছ—সারিগুলি দেখতে চমৎকারই বটে। কখন সরল, কখন বক্র, কখন উঁচু-নীচু, আবার ঘুরাফেরার সময় সপ্তর্ষি বংশের মত কুটিল—খোলস-ছাড়া সাপের বুকের মত সুনির্ম্মল আকাশের যেন সীমা নির্দ্দেশ করে দিচ্ছে।

চেটী। রাজকুমারী, দেখুন! দেখুন! কোকনদের মালার মত পাণ্ডুবর্ণ কেমন সুন্দর সারসের সারিগুলি চুপ ক'রে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ওমা! মহারাজ যে!

পদ্মা। কি বল্‌লি আর্য্যপুত্র! (বাসবদত্তার প্রতি) সখি, আপনি সঙ্গে রয়েছেন এখন আর্য্যপুত্রের কাছে যাব না, আসুন আমরা মাধবীকুঞ্জে ঢুকে পড়ি।

বা। আচ্ছা আসুন।

(মাধবী কুঞ্জে প্রবেশ)

বিদূ। রাণী পদ্মাবতী নিশ্চয়ই এখানে এসেছিলেন, এখন চলে গিয়েছেন।

রাজা। তুমি জানলে কি ক'রে?

বিদূ। দেখেছেন না শেফালিকা-গুচ্ছ থেকে ফুল তুলে নিয়েছে!

রা। বসন্তক, দেখ ফুলগুলি কেমন সুন্দর!

বা। (স্বগত) বসন্তকের কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমি উজ্জয়িনীতেই আছি।

রাজা। বসন্তক, এস এই শিলাতলে বসেই পদ্মাবতীর আগমন প্রতীক্ষা করা যা'ক।

বি। আচ্ছা, আসুন বসাই যা'ক! (বসিয়া ও আবার উঠিয়া) বাপরে! শরৎকালের রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফেটে গেল; আসুন মহারাজ, মাধবীকুঞ্জে ঢুকে পড়ি।

রাজা। আচ্ছা, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে যাও।

বিদূ। এই যাচ্ছি।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

পদ্মাবতী। বসন্তক সব মাটি কল্লে, এখন কি করব!

চেটী। রাজকুমারী, ভাববেন না; এই দেখুন না এই যে লতাটায় মধুকরগুলি বসে আছে সেটা একটু নেড়েই আমি রাজার এখানে আসা যাতে না হয় ঠিক তাই করে দিচ্ছি।

পদ্মা। বাঃ! বেশ কথা; তাই কর, তাই কর।

(চেটী লতাটি নাড়িতে লাগিল)

বিদূ। আরে মলো; মহারাজ, মহারাজ, এগুবেন না, ফিরে যান, ফিরে যান।

রাজা। কি হয়েছে?

বিদূ। আঃ! দাসীর বেটা মধুকরেরা কামড়িয়ে দিলে গো, কামড়িয়ে দিলে!

রাজা। সাবধান! সাবধান! দেখ বসন্তক মধুকরগুলিকে যেন রাগিও না। ঐ দেখ—মধুমত্ত মধুকর সোহাগ-ভরে মধুকরীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে আছে, তোমার পায়ের শব্দে প্রিয়তমার আলিঙ্গন ভ্রষ্ট হয়ে আমারই মত দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

তাই আর যেয়ে কাজ নেই, এস এখানেই বসা যা'ক।

বিদূ। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

(উভয়ের উপবেশন)

পদ্মা। ভাগ্যে আর্য্যপুত্র এখানে বসে পড়লেন, তা নৈলে যে কি বিপদই হ'ত!

বাস। (স্বগত) ভাগ্যে আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তা নৈলে আমার না জানি কি দশা হ'ত!

চেটী। রাজকুমারী, আমরা কিন্তু আটক পড়লেম: এদিকে চেয়ে দেখুন একবার—আর্য্যা বাসবদত্তার চক্ষু যেন ছল ছল কচ্ছে।

বাস। মধুকরগুলি হঠাৎ কাশ কুসুম ছেড়ে উড়তে লাগলো, তাইতে পরাগ ছুটে এসে আমার চোখে পড়েছে—তাই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পদ্মা। হাঁ, তাই বটে।

বিদূ। সখা, এখন ত প্রমদ বনে কেউ নেই, একটা কথা জিজ্ঞেসা করব?

রাজা। স্বচ্ছন্দে।

বিদূ। আচ্ছা মহারাজ, আপনি কি মহিষী বাসবদত্তাকে বেশী ভালবাসতেন, না রাণী পদ্মাবতীকেই বেশী ভালবাসেন।

রাজা। সখা, তুমি আমাকে এই সঙ্কটে ফেলতে চাচ্ছ কেন?

পদ্মা। সখি, আর্য্যপুত্র বড় সঙ্কটেই পড়েছেন!

বাস। (স্বগত) হায়! আমি কি হতভাগিনী!

বিদূ। মহারাজ স্বচ্ছন্দে বলুন, একজন ত মরেই গেছেন, আর একজন ত কাছে নেই, ভয় কি?

রাজা। নাহে তোমায় বলব না, তোমার বড় আলগা মুখ!

পদ্মা। আর্য্যপুত্র ত অনেকটাই বলে ফেল্লেন। বলার আর বাকী রৈল কি!

বিদূ। মহারাজ, এই আমি সকলের শপথ করে বলছি, কারও কাছে কিছু বলব না—এই আমি জিভ কাটলুম।

(সেইরূপ করণ)

রাজা। না সখা, বলতে ভরসা হচ্ছে না।

পদ্মা। বসন্তক ত ভারি বোকা, এতেও রাজার মনোভাব বুঝতে পাল্লে না!

বিদূ। কি মহারাজ, বলবেন না—আচ্ছা না ব'লে দেখি কেমন ক'রে এই শিলা ছেড়ে আপনি এক পা চলতে পারেন—এই আমি পথ আগলিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা। কি তুমি জোর করবে নাকি?

বিদূ। হাঁ, নিশ্চয় জোর করব।

রাজা। বটে, তবেত বলতেই হ'ল।

বিদূ। মহারাজ, রাগ করবেন না—যদি সত্য কথা না বলেন তবে সখার শাপ লাগে।

রাজা। উপায় কি? বলছি তবে, শোন—

রূপে, শীলে মাধুর্য্যে পদ্মাবতী আমার বড় প্রিয়, কিন্তু বাসবদত্তার প্রতি আমার মন এত অনুরক্ত যে, সে মন কিছুতেই বাসবদত্তাকে ভুলতে পাচ্ছে না।

বাস। (স্বগত) যা হোক, এটাই আমার সন্তাপের যথেষ্ট পুরস্কার। এখন এই অজ্ঞাতবাসটাও আমার কাছে সুখের ব'লে বোধ হচ্ছে।

চেটী। রাজকুমারী, মহারাজ ত বড় নির্ম্মম!

পদ্মা। না, তুই বুঝতে পারিস নি—আমার প্রতি মহারাজের মমতা যথেষ্ট—যিনি এখনও আর্য্যা বাসবদত্তাকে ভুলতে পারেন নি, তাঁকে কি কখনও নির্ম্মম বলা যায়?

বাস। রাজকুমারী, আপনার বংশ যেমন উচ্চ, মনটিও তেমন উদার।

রাজা। বসন্তক, আমার কথা ত আমি বল্লুম, এখন তুমি বল ত রাণী বাসবদত্তা তোমাকে বেশী স্নেহ কত্তেন, না রাণী পদ্মাবতী বেশী স্নেহ করেন।

পদ্মা। আর্য্যপুত্রও বসন্তক হলেন দেখছি।

বিদূ। ছল ক'রে ফল কি? আমার কাছে দুই জনই সমান।

রাজা। মূর্খ, আমার কাছ থেকে জোর ক'রে সব কথা শুনে নিজের বেলায় সব চাপা দিচ্ছ!

বিদূ। কি! আমার উপরও মহারাজ জোর খাটাবেন না কি?

রাজা। হাঁ, জোর খাটাব বই কি! নিশ্চয় খাটাব।

বিদূ। তাহ'লে কিছুই শুনতে পাবেন না।

রাজা। হে মহাব্রাহ্মণ, রাগ করো না। আচ্ছা জোর করব না, নিজের ইচ্ছাতেই বল।

বিদূ। আচ্ছা, তাহ'লে বলতে পারি। রাণী বাসবদত্তা আমাকে বড় স্নেহ কত্তেন। রাণী পদ্মাবতী তরুণী, রূপবতী—একটুও রাগ করেন না, একেবারেই অহঙ্কার নেই, সদাই মিষ্ট কথা বলেন, কারো মনে কখনও ব্যথা দেন না। আর একটা গুণ তাঁর বড়ই বেশী—খুব ভাল ভাল খাবার নিয়ে আমাকে খোঁজ করেন।

বাস। (স্বগত) বসন্তকও আমাকে ভুলে যায় নাই দেখছি।

রাজা। বসন্তক, সব কথা আমি দেবী বাসবদত্তাকে ব'লে দিব কিন্তু।

বিদূ। হায়! কাকে বলবেন মহারাজ, রাণী বাসবদত্তা যে অনেক দিন মরে গেছেন।

রাজা। (সবিষাদে) হায়! তাইত বটে, বাসবদত্তা ত নাই!

পরিহাস কত্তে গিয়ে আমি যে সব ভুলে গিয়েছি! আমার মন যে তারই কথায় কথায় সত্যের দেশও ছেড়ে গিয়েছে! তাই বুঝি পূর্ব্বের অভ্যাসের দরুণই এই কথা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেড়িয়ে গেল!

পদ্মা। মহারাজের কথাগুলি বড়ই উদার! নৃশংস না হলে এমন কথায় কেউ রাগ করে না!

বাস। (স্বগত) আর্য্যপুত্র আমাকে যে ভুলতে

পারেন নি তা ঠিক বুঝতে পারলুম। পূর্ব্বে রাজার অসাক্ষাতে এইরূপ প্রিয় কথা শুনেও মনে ততটা বিশ্বাস হয় নি।

বিদূ। মহারাজ, অধীর হবেন না। বিধির বিধান লঙ্ঘন করে কার সাধ্য!

রাজা। সখা. তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না, তাই এমন কথা বলচ—

দুঃখ আমি ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু বাসবদত্তার ভালবাসা আজও ভুলতে পারি নি. তাই সেই ভালবাসা মনে করে আবার আমার দুঃখ নূতন হয়ে জেগে উঠছে। আমি জানি চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভার অনেকটা কেটে যায় তাই এখন চোখের জল ফেলে কাঁদছি।

বিদূ। সখা. কেঁদে কেঁদে আপনার চক্ষু ঘোর হয়ে গিয়েছে, যাই মুখ ধোয়ার জল নিয়ে আসিগে।

পদ্মা। আর্য্যে, আর্য্যপুত্রের চোখ এখন অশ্রুধারায় ঢেকে গিয়েছে, চলুন এই ফাঁকে আমরা কুঞ্জ থেকে বেড়িয়ে পড়ি।

বাস। আচ্ছা, চলুন রাজকুমারী—না হয়, আপনি থাকুন : স্বামীকে এরূপ উৎকণ্ঠিত ও শোকার্ত্ত রেখে আপনার যাওয়া উচিত নয়। আমি একাই যাচ্ছি।

চেটী। আর্য্যা ঠিক কথাই বলেছেন—রাজকুমারী, আপনি মহারাজের কাছেই যান।

পদ্মা। তবে কি আমি যাব?

বাস। হাঁ সখি, যাওয়াটাই ঠিক।

(পদ্মাবতীর রাজার সম্মুখে গমন)

বিদূ। (পদ্মপাতায় জল লইয়া), এই যে রাণী পদ্মাবতী!

পদ্মা। বসন্তক এতে কি?

বিদূ। এটাতে—এটা—এ—

পদ্মা। বল বসন্তক, এতে কি?

বিদূ। মহারাণী, বাতাসে উড়ে মহারাজের চোখে কাশপুষ্পের পরাগ এসে পড়েছে। এই নিন. মুখ ধোয়ার জল।

পদ্মা। যিনি পরের মনে ব্যথা দিতে চান না তাঁর পরিজনেরাও দেখছি তেমনি (অগ্রসর হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক। এই মুখ ধোয়ার জল এনেছি।

রাজা। এ কে! পদ্মাবতী! (জনান্তিকে) বসন্তক ব্যাপার কি?

বিদূ। (রাজার কানে কানে) যেমন দেখ্‌চেন।

রাজা। বসন্তক, বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ। (মুখ ধুইয়া) পদ্মাবতী, বসো।

পদ্মা। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

(উপবেশন)

রাজা। পদ্মাবতী. বাতাসে উড়ে এসে শরৎকালের চন্দ্রের মত কাশ-পুষ্পের রেণুগুলি আমার চোখে পড়েছে! তাই চোখ দিয়ে জল পড়েছে।

(আত্মগত) রাজকুমারীর এই সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে—যদি সত্য কথা বলি তা হ'লে মনে ব্যথা পাবে। যদিও এর স্বভাবটী বড় ধীর তবু সহজে কাতর হয়ে পড়ে—স্ত্রীলোক ত বটে!

বিদূ। মহারাজ, আজ বিকেল বেলায় আপনাকে সঙ্গে করে মগধরাজ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে যাবেন। শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে প্রতিসৎকার কত্তে হয় —আপনি তবে এখন উঠুন।

রাজা। ঠিক কথা; এটাই হচ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য— সদ্‌গুণের ও শিষ্টাচারের পরিচয় দেয় এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু শিষ্টাচারের মর্য্যাদা বেশ ক'রে বুঝতে পারে এমন লোক বড় বিরল।

[সকলের প্রস্থান।

প্রবেশক

পদ্মিনিকার প্রবেশ

পদ্মি। মধুকরিকা, শীগ্‌গির এস।

মধুকরিকার প্রবেশ

মধু। এই যে আমি এসেছি? কি কত্তে হবে বল।

পদ্মি। তুমি কি শোন নি যে, রাজকুমারী মাথা-বেদনায় কাতর হয়েছেন!

মধু। তা হলে ত বড় কষ্টের কথা!

পদ্মি। শীগ্গির গিয়ে আর্য্যা আবন্তিকাকে ডেকে নিয়ে এস। শুধু রাজকুমারীর মাথা ধরেছে এইমাত্র বলবে, তা হলে তিনি নিজেই আসবেন এখন।

মধু। তিনি এসে কি করবেন?

পদ্মি। কেন, মিষ্টি কথা বলে মাথা বেদনার উপশম করবেন!

মধু। হাঁ, তা বটে; রাজকুমারীর বিছানা হয়েছে কোথায়?

পদ্মি। বিছানা হয়েছে সমুদ্র গৃহে *। যাও এখন। মহারাজকে খবর দেওয়ার জন্য আমি বসন্তককে খুঁজছি।

মধু। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।

পদ্মি। বসন্তকের দেখা পাই কোথায়?

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। একে বৎসরাজ মহিষী বাসবদত্তার বিরহে একান্ত কাতর, তার উপর আবার রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় তাঁর অনেক কথাই মনে আসছে—এতে রাজার যে মানসিক সন্তাপটা বেশী হবে তাতে আর সন্দেহ কি। এই যে পদ্মিনিকা! পদ্মিনিকা তুমি এখানে কেন?

পদ্মি। বসন্তক ঠাকুর, আপনি শোনেন নি রাজকুমারী পদ্মাবতী মাথা ধরায় বড় কাতর হয়েছেন!

বিদূ। মাইরি পদ্মিনিকা, আমি কিচ্ছু শুনি নি।

পদ্মি। তাই আপনাদের রাজার কাছে একটু খবর দিন। আমিও একটা প্রলেপ নিয়ে যাচ্ছি।

বিদূ। রাণী পদ্মাবতীর বিছানা হয়েছে কোথায়?

পদ্মি। শুনছি, সমুদ্র-গৃহে।

বিদূ। আচ্ছা, তুমি যাও, আমিও এই যাচ্ছি—মহারাজকে খবর দিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

রাজার প্রবেশ

রাজা। কাল-চক্রে আবার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ কত্তে হ'ল! কিন্তু তুষার-পাতে নষ্টশ্রী সেই বাসবদত্তা—অবন্তীরাজকুমারী—অবন্তীরাজের অনুরূপা কন্যা—যাঁর অঙ্গ-যষ্টি অগ্নিদাহে লাবাণক গ্রামে ভস্মীভূত হয়েছে তার কথা ত ভুলতে পাচ্ছি না—অনেক চেষ্টা করেও ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পাচ্ছি না!

বিদূ। মহারাজ, শীগ্গির আসুন, শীগ্গির আসুন।

রাজা। কেন?

বিদূ। রাণী পদ্মাবতী মাথা-ব্যথায় বড় কাতর হয়েছেন।

রাজা। কে বল্লে?

বিদূ। পদ্মিনিকা এই মাত্র বলে গেল।

রাজা। হায়! যিনি রূপশ্রীতে উজ্জ্বল ও গুণে শ্লাঘ্য—তাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে আমার শোক অনেকটা কমে আসছিল, কিন্তু যদিও আমার বাসবদত্তার শোক একেবারে প্রশমিত হয় নি, তবু পদ্মাবতীকে যত্ন কত্তে হবে। বসন্তক, পদ্মাবতী আছেন কোথায়?

বিদূ। শুনছি সমুদ্র গৃহে তাঁর বিছানা হয়েছে।

রাজা। তা'হলে পথ দেখিয়ে চল।

বিদূ। এদিকে আসুন, মহারাজ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

* যে গৃহে জল-সঞ্চার আছে।

বর্ষাবিরহ

১

মেঘমালাময় আজিকে গগন
জল ঝরে শুধু অনিবার,
মনে পড়ে মুখ বঁধুয়ার।
জনহীন ধরা, আমি বাতায়নে
বসে আছি ঠায় আজি নিরজনে
তার কর ধরি এ মধুর খনে
বহু কথা ছিল বলিবার।
মনে পড়ে তাই মুখ তার।

২

বন-ভরা ফুল পড়ে ঝরি ঝরি
কে তোলে তাদের প্রিয়া বই ?
মালা গাঁথা আজ হলো কই ?
নীপ হলো সারা শিহরি' শিহরি,'
কেতকী মরিল গুমরি' গুমরি'
কুটজ-কামিনী কহে ঝরি ঝরি
"কতদিন আর জিয়ে রই ?"
কে মালা গাঁথিবে প্রিয়া বই ?

৩

নব যৌবনে দুকূল দোলায়ে
তটিনী ছুটিছে খর ধার,
যথা আছে ঐ বঁধু তার।
ললিত লতিকা শিহরি কেশরে
বক্ষে জড়ায় তাহার দোসরে
মিলনে রয়েছে বরিষা-বাসরে
সাথে সাথে সবে বঁধুয়ার,
আমি কাছে নাই শুধ তার।

৪

আমের আড়ালে, কপোত-কপোতী
বসে আছে দোঁহে মুখোমুখী,
সুখে সুখী আর দুখে দুখী।
ডাহুকে রাগায় ডাহুকী কপটী
সারস সারসী করে ঝটাপটী
কদমের শাখে ময়ূর ময়ূরী
খেলিতেছে আজ লুকোলুকি.
মোরা বসে নাই মুখোমুখী।

৫

মহাসমারোহে মেঘ আসে যায়
ঘুরে দেশ দেশ দ্বার দ্বার.
গলে দোলে মালা বলাকার।
গরজন করে রহিয়া রহিয়া,
কোনও কথা সে ত আনে না বহিয়া
প্রিয়া তবে আর মুখেতে চাহিয়া
কেঁদেছিল শুধু অনিবার।
ছিলনাক কিছু বলিবার।

৬

চপলা চমকি, হৃদয় চমকে
করে যেন মোরে পরিহাস,
প্রাণ করে আরো হা হুতাস।
বারতা বহিয়া মেঘ যায় ভেসে
জল-ধারা ঐ ছুটে দেশে দেশে
মিলনের প্রেম যদি তাহে মিশে
নাহি পায় আজি পরকাশ।
তবে আর মিছে প্রেমপাশ।

৭

কাজ পরে আছে শত শত, তবু
কাজ করা আজ হলো দায়।
নিরাশায়,—বিনা ভরসায়।

চরণে না ছুলে চলে না যন্ত্র
সব ভুল, কানে না দিলে মন্ত্র
হাতে হাতে কিছু মজুরী না পেলে
একা একা খাটা নাহি যায়।
আজিকার ঘন বরষায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

দানবীর দুর্গাচরণ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত পরগণে বিক্রমপুরের কৌলীন্য প্রধান বাদিয়া সমাজের "সাভাজ নগর" গ্রামে খ্যাতনামা ৺ রাজ কিশোর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে, ১২৩৩ সালের ১০ই মাঘ মঙ্গলবার ৺ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাচরণের পিতার নাম ৺ গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ৺ সর্ব্বতী দেবী। বাল্যে দুর্গাচরণ মাতুলালয়ে থাকিয়াই প্রতিপালিত হন, কিন্তু সে সময় তাহার মাতুলদের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা না হইলেও "কুলীনের ছেলের" শুভকার্য্যে কোনই ব্যাঘাত হয় না। তাই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুর্গাচরণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাড়িয়া গ্রামের ৺ শিবশঙ্কর বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা ৺ রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে থাকিয়াই বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার শ্বশুরেরই যত্নে বাঙ্গলা ও পার্শি পড়িতে আরম্ভ করেন। দুর্গাচরণের গ্রন্থগুলিতে পার্শি শব্দ পাওয়া যায় এবং তিনি পার্শি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিন শ্বশুরালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরে তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত রুদ্রকর গ্রামে যাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কুলশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

অধ্যয়নাদি শেষ করিয়া দুর্গাচরণ মাতুলের সহিত চট্টগ্রাম যাত্রা করেন এবং তথায় গবর্ণমেণ্টের খাস নিমক মহালে চাকরী গ্রহণ করিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু ঐ স্থানের জল বায়ু সহ্য না হওয়ায় ও নিমক মহালের কার্য্য স্থগিত হওয়ায় তিনি নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য্য লইয়া যশোহরে আগমন করেন। চট্টগ্রাম পরিত্যাগের অন্য আরও একটী কারণ ছিল। চট্টগ্রামেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং সেইজন্যই সে স্থানে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল। যাহা হউক, দুর্গাচরণ পুনরায় উক্ত হাড়িয়া গ্রামের ৺ গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা বসন্ত কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

কিয়দ্দিবস তিনি নীলকর দিগের অধীনে কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় নীলবিদ্রোহ ঘটাতে দুর্গাচরণ নীলকর দিগের কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং পিত্রালয়ে যশোহরের অন্তর্গত কাশীপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিক্রমপুর কাশীপুরে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, এবং ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কাশীপুর কুলীন প্রধান গ্রাম এবং উভয় স্থানেই অনেক "স্বঘর" থাকাতে, অনেক সময় "আদান প্রদানাদি" হয়।

নীলকর দিগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাচরণ কলিকাতা জান বাজারের খ্যাতনাম্নী রাণী রাসমণির ষ্টেটে অনেক কাল প্রশংসার সহিত নায়েবী ও অন্যান্য দায়িত্বকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তৎপরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কাশীপুরেই বাস করিতে থাকেন, এবং ১৩১৬ সনের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৺ কাশীধামে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয় কিন্তু এই প্রকার অচল অর্দ্ধাঙ্গ লইয়াও তিনি কোন দিন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মিত কর্ম্ম, গীতাপাঠ প্রভৃতি স্থগিত করেন নাই।

দুর্গাচরণ স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। তুলাপুরুষ দান, নবাগ্নি, চতুরাগ্নি, যাগ ও শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

দুর্গাচরণ চারিমাস কাল 'মহাভারত' দেন এবং সেই সময় প্রচুর অর্থব্যয়ে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক ও কুলীন প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করেন। এই সকল কার্য্য কালীন তিনি যে সকল দান করিতেন তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজনার্থ উপস্থিত। বালকেরা বসিবার ও খাইবার পাতা লইয়া টানাটানি করিতেছে। এমন সময়ে সহস্রাধিক আসন, ও তদুপযোগী থালা ও গ্লাস আসিয়া উপস্থিত। আহারান্তে সেই সকল ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই এক এক খানি করিয়া আসন ও থালা ও এক একটী করিয়া গ্লাস পাইলেন। আহারের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও কেহ এ ধারণা করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার ২।১টী নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

দুর্গাচরণের একটী কীর্ত্তি "হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ।" বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত খুব বড় লোকেই এই বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ মহাসমারোহের সহিত মৎস্য পুরাণোক্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে, এই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয় এবং যিনি ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত এই মহাদান করেন তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। এই যজ্ঞে দুর্গাচরণের প্রায় পঁচাত্তর সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয় এবং এই উপলক্ষে কাশী, কাঞ্চি, মিথিলা ও দ্রাবিড় হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আমন্ত্রণ হইয়াছিল ও তিনি তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত বিদায় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর, নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী হইতেও অনেক মহাপণ্ডিত আমন্ত্রিত হইয়া কাশীপুর পবিত্র করিয়াছিলেন। একমাস কাল ব্যাপিয়া কাশীপুরে এই মহাযজ্ঞের "জের" চলিয়াছিল।

এই মহাযজ্ঞের অন্তেই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্গাচরণ এই সময়ে দুঃস্থ ও দরিদ্রকে অকাতরে বহু অর্থ বিতরণ করেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ শত শত ভিক্ষুক আহার্য্য পাইত। উপস্থিত সকলের আহারাদি শেষ হইলে তবে দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আহার করিতেন। গৃহে কেহ অভুক্ত থাকিতে তাঁহারা জলস্পর্শ করাও সঙ্গত বোধ করিতেন না।

দুর্গাচরণের প্রধান কীর্ত্তি যশোহর জেলার অন্তর্গত লক্ষীপাশায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন। লক্ষীপাশা তাঁহার স্বগ্রাম হইতে প্রায় দেড়মাইল। ইচ্ছা করিলেই তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ সন্তুষ্ট হন ও সকলেরই উপকার হয়, সেইজন্য তিনি লক্ষীপাশায়ই বিদ্যালয় স্থাপন করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখনও দুর্গাচরণ প্রতিষ্ঠিত "ডি, সি, ইনষ্টিটিউসন্" (D. C. Institution) হইতে বৎসর বৎসর বহু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনীর পরিচয় দিতেছে।

দুর্গাচরণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাতুলালয় ও শ্বশুরালয়স্থ গ্রামদ্বয়ের দুঃস্থের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পার্শিভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। দুর্গাচরণ মাতৃভাষায় অনুরক্ত ছিলেন। শকাব্দ ১৭৮৬ বা ১২৭১ সনের ১৫ই শ্রাবণ তিনি 'বিক্রম নাটক' নামক এক "হাস্যরসময়" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ঢাকা মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। এতদ্ব্যতীত দুর্গাচরণ "ছিদাম শাপ মোচন" বা "বিচ্ছেদ মিলন পালা" নামে অন্য এক পুস্তক এবং "মানভঞ্জন" নামে অন্য এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত দুইখানি পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। তবে, সে সময়ে সেগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দুর্গাচরণের সখের "ঢপের দলে" ও পেশাদারী ঢপের দলেও এগুলি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইত। দুর্গাচরণ তাঁহার নিজের সখের দলে "ঢোল" বাজাইতেন এবং গ্রাম বৃদ্ধগণের নিকট আমরা জানিতে পারি যে, দুর্গাচরণ এবিষয়ে একজন "ওস্তাদ" ছিলেন।

চল্লিশ বৎসর বা তদূর্দ্ধ সময়ে দুর্গাচরণ যে বইগুলি লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে, ভরসা করি পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না। এক কালে, আমরা শুনিয়াছি, বিক্রমপুরে দুর্গাচরণের গানের যথেষ্ট আদর ছিল।

প্রথমেই মুদ্রিত "হাস্যরসময়" কাব্য "বিক্রম নাটকের" আলোচনা করিব। "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ভোজরাজ-পুত্রী তিলোত্তমার সহিত উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের আকস্মিক বিবাহ-বৃত্তান্ত এক কৌতুকাবহ ব্যাপার। এই ক্ষুদ্র নাটকে সেই ব্যাপারটী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যেমন কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন লোকে ইহা প্রণয়ন করিলে আদরের হইত, দুর্ভাগ্যক্রমে জগদীশ্বর আমাকে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন করেন নাই। সুতরাং আমার নাটক রচনার প্রয়াস পঙ্গু-জনের গিরি-লঙ্ঘনের ন্যায় উপহাসকর সন্দেহ নাই। তবে সারগ্রাহী গুণজ্ঞ মহোদয়গণ, যৎসামান্য কাব্যেরও সার গ্রহণ করিয়া যে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি সেইটী মনে করিয়াই এই পুস্তক প্রণয়নে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছি। এই আমার প্রথম উদ্যম।"

দুর্গাচরণের ইহা প্রথম উদ্যম হইলেও ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। নাটকের আখ্যান বস্তুটী তৎকালোচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য বিশ্রামমণ্ডপে পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকার নিকট অবগত হন যে, রাণী ভানুমতী তাঁহার সহোদরা "তিলোত্তমার রাত্তিরে বে হবে" এবং "বরকে দেবার জন্যই রাণী মালা গাঁথবেন।" শারিকা ইহাও নিবেদন করিল যে, "রাত্তির নিশুতি হলে, রাণীকে নেবার জন্য ভোজরাজার এক দাসী একটা গাছে উঠে আসবে, বাহির আঙ্গিনায় গাছটি রেখে গোপনে রাণীর নিকটে যাবে, আপনকার নিদ্রে হলে সেই মায়াবৃক্ষে চেপে রাণী বোনের বে দেক্তে যাবেন, রাত্তিরেই আবার ফিরে আসবেন।"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ অবগত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া নিদ্রার ভান করিলেন এবং রাণী যখন "কেবল গহনা কখানা পরে আর কাপড় খানা" ছাড়িতে গেলেন,তখন রাজা গোপনে সেই মায়াবৃক্ষে উঠিয়া "একটী পাশে লুকিয়ে" থাকিলেন। মায়াবৃক্ষ চক্ষের পলকে ভানুমতীর পিত্রালয়ে পৌছিলে, রাণী রাজান্তঃপুরে পৌছিলেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শকটারোহণে তথায় "বরের পিতা" আগমন করিলেন এবং সুপুরুষ দেখিয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট বলিলেন "বাবু, এখনি ভোজরাজার যে মেয়ের বে হবে, আমার ছেলেই তার বর, বাপু হে, আমার ছেলেটি কুঁজ, তুমি একটী কার্য্য কর, বরের পোষাক পরে, ফিট ফাট হয়ে, টোপর মাথায় দে বর সেজে, রাজবাড়ী গিযে রাজার মেয়েকে বে কর।" অবশ্য বিক্রমাদিত্য "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" মনে করিয়া সহজেই সম্মত হইলেন।

বিবাহ সভায় পুরোহিত যখন বরের "বাপ পিতেমহের" নাম জিজ্ঞাসা করিলেন তখন বর বলিলেন "মহাশয়, আমার নাম খোকা, আমার পিতার নাম খোকার বাপ পিতামহের নাম খোকার বাপের বাপ।" পুরোহিত যখন কোপ প্রকাশ করিলেন তখন বর বলিলেন যে "নাম কটা আমার ভাল স্মরণ হচ্ছে না" এবং "বরের পিতারদিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক মাথা ঈষৎ উচু করে" বলিলেন "ইনি বলবেন।" ভোজরাজ অবশ্য এ সুযোগ ছাড়িলেন না। "বেয়াই মহাশয়, বাপের নাম বলতে যে জামাই বাবু ভয় কচ্চেন। জন্মের কিছু ব্যতিক্রম আছে না কি? না হয় বেয়ানকে সুধান যাক্" এই উক্তি শুনিয়া বর বলিলেন "আমার পিতার নাম কে অজ্ঞাত, বলুন দেখি?"

তৎপরে বাসর গৃহের দৃশ্য। অনেকে হয়ত এ দৃশ্য পছন্দ করিবেন না। সুতরাং আমরা অন্য অঙ্কের বিষয়

আলোচনা করিব। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের বাসর ঘরে কি প্রকার পরিহাসাদি হইত, তাহা জানিবার ইচ্ছা করিলে আমাদের সমালোচ্য এই নাটকখানি পাড়তে পারেন।

প্রত্যূষে অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রমাদিত্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে যখন তিলোত্তমা তাঁহাকে "নাথ" সম্বোধনে অভিহিত করিলেন তখন বর বলিলেন "সরলে, তুমি আমাকে এমন সম্বোধন ক'রে অপরাধী ক'রো না। আমি নিতান্ত হতভাগ্য! তোমার নাথ সম্বোধনের যোগ্য নই।" তিলোত্তমা উত্তর করিলেন "যে যাকে শাস্ত্রসম্মত বিয়ে করে, সেই তার নাথ, সেই তার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। স্ত্রীলোকের স্বামীই সকল, তা আমার নাথ সম্বোধনে বাধা কি? তবে কি না—

সুরসিক মধুকর, চতুর বিলাসী।
মজায় পাদ্মনী-মন, নিয়ত বিলাসি॥
তার প্রেমে মন, যত মধুকর ধায়।
স্থলজ কুসুম চয়ে, তেমন কোথায়?
মধুবতী গুণবতী কমলিনী যত
মাধবী, মালতী, যূথী, কভু নহে তত।
কেমনে বাঁধিবে বল মধুকর-মন
রূপগুণ না থাকিলে কে করে যতন!
কিন্তু নাথ, তবু কি সে রসিক ভ্রমরে।
মাধবী প্রভৃতি ফুলে অনাদর করে?"

রাজাও কিছু কম ছিলেন না। তিনিও পদ্যে উত্তর দিয়া বলিলেন—

"সত্যে বন্দী আমি, তাই ত্যজি হেন ধন।
যাইতেছি, কিন্তু, হেথা রবে প্রাণ মন।"

তিলোত্তমা যখন শুনিলেন যে, রাজা অর্থলোভ এরূপ করিয়াছেন তখন তিলোত্তমা রাজার প্রতি "ঝাল ঝাড়িয়া বলিলেন "অবলা জাতি স্বভাবতঃই অল্পবুদ্ধি, এরা ভাল মন্দ বড় একটা বিবেচনা না ক'রে হঠাৎ মধুর কথায় মোহিত হয়ে পড়ে। আবার অনেক অবতার আছে, যে তাদিগে প্রথম হাতে হাতে আকাশ দিয়ে শেষে ত্রিকুল নষ্ট করে কুল বালাকে অকুল সাগরে ভাসিয়ে পলায়ন করে।" যাহাহউক, অঙ্গুরীয়ক বিনিময় করণান্তর বিক্রমাদিত্য প্রস্থান করিলেন এবং "কেলিগৃহে কুব্জেরও প্রবেশ হইল।"

কুব্জকে দেখিয়াই তিলোত্তমা "পোড়ামুখ বাঁদর! তুই কেরে?" বলাতেই কুব্জ "(সভয়ে) ঠাকরুণ, আমি আপনাকে বে করেছি, আমাকে চিন্তে পারেন্নি" বলিয়া উত্তর দিল এবং নিজ কবিত্ব শক্তির পরিচয়ে সুন্দরীকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বৃথা প্রয়াস। ফলে তিলোত্তমা "(সরোষে কুঁজের বুকের উপর পদাঘাত করিয়া)" "হাঘরের নাক কান কাটিবার" ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুব্জের চীৎকারে বরের পিতা ও কনের মাতা উপস্থিত হইলেন এবং শেষোক্তা সকল বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া কন্যা কেন "হাঘরের নাক কেটে ফেল্লি না।" ইহার কারণ জিজ্ঞাসা ও কন্যা অস্ত্রাভাবে তাহা হয় নাই এইরূপ উত্তর দিলেন। গোলমাল শুনিয়া রাজা ভোজ উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং যখন বরের পিতা "ছেলে জাল করা অসম্ভব" বলিলেন, তখন ভোজরাজ বলিলেন, মহাশয়, এমন অনেক ঘটক মহাত্মা পাত্র-পাত্রী জাল করে থাকেন। টাকা পেলে ফুলের মুখুটীর ঘরেও জেলেনীর মেয়ে চালিয়ে দেন। আবার দিব্যি কুলীনের মেয়েকেও যৎসামান্য লোকের হাতে সমর্পণ করেন।" যাহাহউক, অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, "এদেশের অভিযোগের বিচার কর্ত্তা হচ্চেন আপনাদের জামাতা বিক্রমাদিত্য" এবং তাহার নিকটই সকলে সূক্ষ্ম বিচারের জন্য উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় রাজা যখন তাঁহার দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ চক্ষুর নৃত্যের কথা বলিলেন তখন বিদূষক বলিলেন—

"নিম তিতো, কল্লা তিতো, তিতো মাখাল ফল।
তাহতে অধিক তিতো, দু'সতীনের ঘর।"

সে দিন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরদিবস বিচার ফল প্রকাশ করিবেন এইরূপ প্রকাশ করিলেন। এদিকে অন্তঃপুরে দুই ভগ্নীতে কথোপকথন কালে রাজা উপস্থিত হইয়া ভানুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমি যদি তিলোত্তমাকে বিয়ে করি, তুমি ত বেজার হবে না?" তিলোত্তমা উত্তর করিলেন "বেজার হব কেন?

চকোরিণী, কুমদিনী, সুধাংশুর প্রেমাধীনী,
আবার যামিনী, তায় লইয়া বিহরে হে,
দ্বিধা নাই মনে করে, সমভাব সবাকার।
সতিনী সতিনী তারা, কলহ কি করে হে?"

বিক্রমাদিত্যও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তবে তিনি যাহা উত্তর করিলেন তাহা একটু অশ্লীল বলিয়া অনেকের ভাল লাগিবে না। সুতরাং আমরা দৃশ্যান্তরে যাইয়া দেখিতে পাই যে, বিদুষক কুব্জকে বলিতেছেন যে—

"ভেকের বাসনা খেতে পদ্মিনীর মধু!
ছাতারের ইচ্ছা হয় কুমদার বঁধু॥
কুকুরের সাধ হয় দেবতুল্য পূজো।
সুখে চিত হয়ে শুতে সাধ করে কুঁজ।"

যাহাহউক, সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। বৈতালিক রাগিণী আলিয়া ও তাল কাওয়ালীতে নিম্নোক্ত গীতে সকলকে তুষ্ট করিলেন—

"আজ আনন্দে আর নাই পারাপার।

কি ঘটনা বিধাতার! যেমন সুরূপ ভূপতি, তেমন তিলোত্তমা সতী, রতিপতি সনে রতি, মিলন কি চমৎকার।

কেশবের বামে যথা কমলা বিরাজে,
ভূপতির বামে তথা, তিলোত্তমা সাজে,
মিলালে বিধাতা কি রোহিণী-দ্বিজরাজে!
যোগ্য জনে মিলে যোগ্য, সুধাসুরগণ ভোগ্য।
অসুরের ভাগ্যে কোথা, মিলে অমৃতের তার।"

দুর্গাচরণের নাটকের আখ্যান, রচনা ইত্যাদি আজিকার সমালোচকগণের মনঃপুত না হইতে পারে। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরে যখন এ নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তখন আপামর সাধারণ সকলেই সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, দুর্গাচরণের পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করি, কিন্তু প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে "হিরণ্যগর্ভ" বা স্কুলের জন্য যশোহরে দুর্গাচরণের যেরূপ খ্যাতি, ঢপের গান রচনায় বিক্রমপুরে তাঁহার খ্যাতি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আমরা সেই ভরসায়ই আজ ঢাকার সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে দানবীর দুর্গাচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And wastes its sweetness on the desert air".

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

প্রতীক্ষা

আমি শুধু বসে আছি তব প্রতীক্ষায়,
কখন আসিয়া তুমি তৃষিত হিয়ায়
মধুর সোহাগ রাশি দিবে গো ঢালিয়া,
বেদনা-ব্যথিত প্রাণ যাবে গো গলিয়া।
নিভৃত মধ্যাহ্ন কালে একাকিনী হায়!
সুদীর্ঘ সময় মম কাটিতে না চায়।
হৃদয় মাঝারে ভাসে অতীতের গীতি,
সমীরে বহিয়া আনে তব প্রিয় স্মৃতি।
তব প্রতীক্ষায় আর কতদিন আমি
থাকিব বসিয়া আর হে জীবন-স্বামী।
তিল তিল করি হায় গণি দণ্ড পল।
কেমনে কাটাব দীর্ঘ জীবন বিফল!

শ্রীচারুগুপ্তা।

রাখালের গান

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

ভুবন-মনোমোহিনী শস্যশ্যামলা বঙ্গপল্লীর বনবিহঙ্গ-তানে যেমন দশদিকে সুধার ধারা বর্ষিত হয়, বামা-কণ্ঠজাত সুমধুর পঞ্চম হুলুধ্বনিতে যেমন মঙ্গলবার্ত্তা আশীর্ব্বাদের মত দিগন্তের কোলে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ বঙ্গ পল্লীজননীর নিজস্ব অপার্থিব সম্পদ, পল্লীরাখালের কমকণ্ঠের 'মেঠো' সুরের মিঠা গানে দশদিক এক স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া থাকিত। বঙ্গপল্লীর সেই অতীত সুখের দিন আর নাই। একদিন বঙ্গপল্লীর প্রাকৃতিক শোভা মুনিজন-বাঞ্ছিত ছিল; বঙ্গের প্রতি পর্ণকুটীর এক একখানি তপশ্চারী মুনির আশ্রমের মত পবিত্র এবং শান্তিময় ছিল। সেই বঙ্গের অনবদ্য স্বাস্থ্যসম্পদশালী বাঙ্গালীর বিপুল দেহ-গৌরব, অশীতিপর বৃদ্ধের যুবকো-চিত কর্ম্ম-পটুতা, প্রতিবেশীর সহৃদয়তাপরিপূর্ণ অকপট ব্যবহার ও সহানুভূতি, সর্ব্বত্র অভাবশূন্যতা এখন গল্পের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বঙ্গের দিগন্ত প্রসারি মাঠ অপর্য্যাপ্ত শস্যরত্নে বিভূষিত থাকিয়া দেশ দেশান্তরে আপন গৌরব-কাহিনী মৃগনাভির সৌরভের মত বিতরণ করিত। পালে পালে ধেনুবৃন্দ মাঠে মাঠে অফুরন্ত শ্যামল ঘাসে উদর পূর্ণ করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় শুইয়া রোমন্থন করিত। শ্যামলী ধবলী লালী—কেহ বা মাথা গুঁজিয়া ঘাস খাইত, কেহ বা ঊর্দ্ধমুখে হাম্বা রবে নৃত্যশীল বৎসকে সস্নেহে আহ্বান করিত। "উন্নত ককুদ মেঘ-গম্ভীর আরাবী" বৃষভের-সজল-জলদ-সন্নিভ বা তুষার-ধবল-কমনীয় কান্তি নয়নের কতই না তৃপ্তি সাধন করিত। স্বেচ্ছাবিহারী সুপুষ্ট দেহ গোধন সকল বঙ্গের অমূল্য সম্পদ ছিল। ঘটোঘ্নী গাভী সকল সুমধুর পয়োদানে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রচুর সাহায্য করিত। রাখালেরা ক্ষুধা পাইলেই কলার পাতার ঠোঙ্গায়—যখন তখন গাভী দোহন করতঃ সেই "অঞ্জালের" দুধ পেট ভরিয়া পান করিত। গাভী সস্নেহে রাখাল বালকের অঙ্গ লেহন করিত। ইহা দেখিয়াই ত কবির ভাব-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল—

> "দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাটে,
> অমিয় লহরী ছুটে,
> স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।"

এ কল্পনা অত্যন্ত মৌলিক! বড় সুন্দর!

মাঠের নগ্ন-সৌন্দর্য্যের পারিপার্শ্বিকরূপে রাখাল বালকের মুক্ত কণ্ঠের উদাস আকুল সঙ্গীত-লহরী যেন বনদেবীর বনবীণার ঝঙ্কারের মত সুদূর পল্লীতে প্রবেশ করিত। এই জীবন্ত অশরীরী সৌন্দর্য্য তাহার আয়ত্ত নহে, কেবল মাত্র উপভোগ্য। চিত্রকরের তুলিকা কিংবা কবির কল্পনা সেখানে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। রাখালের গান বঙ্গের নিরক্ষর কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহাতে বর্ণনার কারিগরী নাই, ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, কুটিলতার ছায়া মাত্রও নাই, সরল, স্বচ্ছ, প্রাণের সহজ আবেগময়। শিক্ষিত কবির কবিত্ব অপেক্ষা এই নিরক্ষর কবির শক্তি হীন নহে। কিন্তু হায়! মেঠো গলায় রাখাল বালকেরা যে সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিত, এখন বঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এখন আর সেই মাঠ ভরা পড়া ক্ষেত (পতিত জমি) নাই; এখন আর গো-গ্রাসের জন্য জমিদারেরা জমি পতিত রাখেন না। খড় বিচালীই এখন গরুর জীবন ধারণের উপকরণ হইয়াছে। তাহাও অগ্নি মূল্যে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে শ্যামল দূর্ব্বাদলে উদর পূর্ণ করিয়া গাভীদল খড় বিচালীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত; ষাঁড়গুলিকে আদবেই খড় খাইতে দেওয়া হইত না। ষাঁড় বা গাভীকে ভোর বেলায় "ডাম্-ঘাস" (শিশির সিক্ত ঘাস) খাওয়ান হইত। এখন সে দিন নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বেও কৃষকেরা জমি হইতে ধানের ছড়া কাটিয়া লইত, তাহার সঙ্গে যতদূর সম্ভব খড় ঘরে আসিত, তাহাতেই কৃষকের বৎসর চলিয়া যাইত। পৌষ মাসের

শেষ ভাগে ঐ সকল জমিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইত, আর মাঠকে মাঠ ছাই ভরা থাকিত। তাহাতে একদিকে জমিতে উত্তম সার হইত ও অপর দিকে শস্যের ক্ষতি-কারক কাট ধাড়ী বাচ্ছা সহ পুড়িয়া মরিত। এখন জীবন-সংগ্রামের কঠোর নিষ্পেষণে মাঠে ঘাস জন্মিবার অবকাশ হয় না। ফসলের পর ফসল করিয়া কৃষকেরা ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে। গবাদিও কাঁচা ঘাসের অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

এখনকার রাখালের কার্য্য পুকুর পাড়ে গরু বাঁধিয়া বিচালী পরিবেশন করা, আর গোয়ালে গামলা দেওয়া। গরুর প্রতি রাখালের কর্ত্তব্য এখানেই শেষ। এখন আর ক্ষীর-সর-নবনীত-পরিপুষ্ট-দেহ সদাপ্রফুল্ল স্বাধান রাখালও নাই, তেমন মিঠা "মেঠো" গানও নাই। আমাদের স্মৃতি-পটে কখন কখন অতীতের সেই মধুর বীণার ঝঙ্কারবৎ রাখাল বালকের কোমল কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি বাজিয়া উঠে, আর একটা বুকফাটা হাহাকার যেন আগুনের হল্কা লইয়া নাকে মুখে ছুটিয়া বাহির হয়।

পল্লী রাখালের গানগুলি কি মধুর! না শুনিলে কেবল পাঠ করিয়া তাহার মাধুরী উপলব্ধি করা যায় না। বঙ্গ পল্লীর নিরক্ষর কবির রচিত এই সকল সরল সঙ্গীত বড়ই আনন্দদায়ক। সময়ান্তরে আমরা বঙ্গের নিরক্ষর কবির গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া অদ্য পাঠকগণকে কয়েকটী রাখালের গান উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

(১)

আরে শোন রাখাল ভাই ও রে,
তোর মায়ে কইছে রে,
গাঙ্গের জলে হাত মুখ ধুইয়া
গাছের তলাত্ বৈতে রে।
খিদা লাগলে টোপলা * খুইল্লা
মুড়ি চিড়া খাইতে রে। †
মায়ের বুকের দুধ খাই' কইয়া,
হাতের আঞ্জলায় পানি লইয়া,
আড়াই চুমুক খাইও রে।
ছেঁওয়ার মধ্যে লেংটি পাইত্যা
পূব শিওরে শুইও রে।
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া—
বাড়ীত্ ফিইরা যাইও রে।

আগে যখন সে বাড়ী হইতে মাঠে আইসে তখন মা একবার উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের মন—ছেলের মঙ্গল চিন্তায় অধীর। পরে যে রাখাল গোচারণে আসিয়াছে, তাহার নিকটেও পুনরায় শুধরাইয়া দিয়াছেন। সে মাঠে আসিয়া তাহাই গাইতেছে।

এই গানটীতে মায়ের সরল সস্নেহ উপদেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেমন আদেশ! দিন দুপ্রহরে হাত মুখ ধুইয়া গাছের তলায় বিশ্রাম করিলে ক্লান্তি ঘুচিয়া যায়। যেখানে সেখানে জল পান করিতে নাই সেকালে মাতা ছেলেদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন। নিতান্তই পথে ঘাটে জলপান করিতে হইলে হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল লইয়া "মায়ের বুকের দুধ খাই" বলিয়া আড়াই অঞ্জলি জল পান করিতে উপদেশ করিতেন। মায়ের বুকের দুধে সন্তানের অহিত হয় না—তাই এই কথা বলা হইয়াছে। ছেলের পানায় জল মাতৃ-স্তন্যের মত পবিত্র অপকার-বিহীন ও হিতকর হউক। পূর্ব্ব বা দক্ষিণ শিয়রে শয়নই হিন্দু-রীতি। মা সেই কথা পুনরায় ছেলেকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

(২)

মনটা কেমন করে আমার
বাড়ীত্ ফিইরা যাইত চায়।
বন্দের (১) পাই (২) চাইয়া রইছে
আমার কাঙ্গালিনা মায় গো—
আমার দুক্ষিনী (৩) মায়।

---

* টোপলা—পুটলী।
† "চাউল ভাজা খাইতে রে" এই পাঠান্তর।

ক্ষেণে যায় মা রান্ধা ঘরে
ক্ষেণে (৪) যায় মা দীঘির পাড়ে
উকী মাইরা (৫) চাইয়া দেখে
দেখা যায় কি নাই ও (৬) যায়—
আমারে দেখা যায় কি না যায় গো।
বাইগুণ পোড়া ভাত খাইয়া যায়
ঘরের মাইঝে শুইতে যায় ;
ক্ষেণে আইসা পীড়ার উপর
উকি মাইরা মাইরা চায়।
এরই লাইগা পানি খাইতে
আইজ (৮) আমার "বিষম' যায়॥

রাখাল আজ জল পানের সময় বিষম গিয়াছিল। জল পান করিতে বা পান খাইতে কখন কখন জল বা পান উর্দ্ধগামী হয়, উহাকে বিষম যাওয়া কহে। প্রবাদ কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিলে বিষম যায়। তাই রাখাল বালক আজ বিষম গিয়াছিল।

(৩)

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে
বেলাও ত আর নাই,
মায়ে জ্বালাইছে বাতি
চল গৃহে যাই।
গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া
তপ্তা ভাত গিয়া খাই।
মায়ের বুকে মাথা রাইখা—
শুইয়া নিদ্রা যাই রে।

(৪)

দিবা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল দুর ;
কানাইয়া ডাক দিয়া বোলে
হারাইলাম বাছুর।
বে-ওর বন (১) আন্ধার রাইত (২)
উরাত উচা (৩) ঘাস—
কৈ পাইবাম বাছুর আমার
লাগবো বার মাস।
খাড়াও (৪) তোমরা রাখাল ভাইরে—
বাছুর দেইখা লই,
উচা আইল উইঠা ডাকি
হাঁরৈ হাঁরৈ (৫)।

(৫)

কইও দুষখু বন্ধের লাগ্ পাইলে গো—নিরলে।
আমারে নি আছে বন্ধের মনে গো।
আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি,
কদম তলা বান্ছে টঙ্গি,
আমারে নি আজও মনে করে গো।
আমার বন্ধু চিকণ কালা,
গলায় শোভা বনমালা
হাতে শোভে ঐ না লো মুরলী গো।
বাঁশী বাজায় কদম্বেরি তলে গো।
আমি মৈলে এই করিও
দাবানলে না দহিও
না ভাসাইও যমুনার জলে গো।
আমি মৈলে আর করিও
না কান্দিও না পুড়িও
বাইন্ধা রাইখো তমালের ডালে গো।
কইও দুষখু বন্ধের লাগ্ পাইলে।

(১) বে-ওর = অসীম।
(২) আন্ধার রাইত = অন্ধকার রাত্রি।
(৩) উরাত উচা = উরু পর্য্যন্ত উচ্চ।
(৪) খাড়াও = অপেক্ষা কর।
(৫) হাঁরৈ = ছোট গোবৎসকে গাভীর অনুকরণে ভাঙ্গা গলায় আহ্বান করা। এই আহ্বানে বাছুর সাড়া দেয় এবং ছুটিয়া আইসে।

বিরহিণী রাধার এই করুণ সঙ্গীত ধারা রাখাল বালকেরা যখন কোমল কণ্ঠে দশদিকে ছড়াইয়া দেয়, তখন শ্রোতা মাত্রেরই নয়ন বাষ্পভারাক্রান্ত হয়। এই গানটী বিভিন্ন স্থানের রাখালের মুখে বিভিন্ন রূপ শুনিয়াছি।

(৬)

আমার সরল প্রেমে গরল কে কৈরাছে রে
নাগর বিনোদিয়া।
(নাগর বিনোদিয়া আমার রে বন্ধু বিনোদিয়া)
মনে রাইখ মনমোহিনী—
মনেতে রাখিয়া রে
নাগর বিনোদিয়া।
শ্রীচরণে লিখিও নামটী ঐ চরণে দাসী
বলিয়া রে নাগর বিনোদিয়া।
কঠিন তোর মাও বাপ কঠিন তোর হিয়া
পাইলাম না রে প্রাণ বন্ধুয়া
চিত্ত বান্ধা দিয়া রে. নাগর বিনোদিয়া।

(৭)

ঘাটে নাও লাগাইয়া রে তুমি,
পান খাইয়া যাও।
পান খাইয়া যাও রে বন্ধু
কথা শুইনা যাও।
কোন্ দেশের মানুষ গো তুমি
কোন্ বা দেশে যাও
একখান কথা কও বা না কও
পান খাইয়া যাও।
বিনয় কৈরা ডাকছি তোমারে গো
একবার ফিইরা চাও
ঘাটে নাও লাগাইয়া তুমি
পান খাইয়া যাও।

কোনও হীনচরিত্রা লজ্জাহীনা রমণীর উক্তি স্বরূপ এই গানটী রচিত। সরলপ্রাণ রাখাল বালক সময় অসময় বোঝে না; ভাব পীরিতির ধার ধারে না, আপন মনে সাধা গলায় গান গাইয়া যায়।

দেখরে ও ভাই সুবল সখা
তুই নিরে ভাই চিনুঙ্গে।
ঐ রমণী কে যায় গো জলে।
আগে পাছে অষ্ট সখী
ইসারায় কথা বলে।
চিকণ মাজায় নীলাম্বরী বাতাসে হেলে ঢলে
ঐ রমণী কে যায় গো জলে।
মদনমোহন খোঁপা বাইন্ধাছে নানা ফুলে
তাতে গুঞ্জরে অলি দলে দলে
ঐ রমণী কে যায় গো জলে।

এই গানটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। কারণ বৃদ্ধদিগের নিকট এই সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

বঙ্গ পল্লীর রাখাল বালকের সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য কি না, ঐ গুলি বঙ্গভাষার অতীত দিনের কোনও সাহায্যকারী ছিল কি না এবং এই সকল সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রাণে কোনও ভাবাবেশ হয় কি না সাহিত্য-সেবিগণের উপর সেই বিচার ভার অর্পণ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। সাহিত্যিকমণ্ডলী এই সঙ্গীত গুলি সংগ্রহ যোগ্য মনে করিয়া আদেশ প্রচার করিলে পুনরায় আরও কতিপয় সঙ্গীত প্রকাশ করিতে যত্নকর হইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রকাশ

যা' কিছু মোর মরমে ছিল
ফুটেছে বাইরে,
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে।—
চিত্ত আমার কমল পারা

সুপ্ত ছিল চেতন হারা,
ফুটেছে সে ফুলের মত
নীরবে চাহি রে,
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে!

বুকের বাস টুটিয়া গেছে
উতলা বাতাসে.
আঁচলখানি ছড়ায়ে গেছে আকাশে;
সজ্জা আমার সকল ফেলি'
লক্ষ বাঁধন হেলায় ঠেলি'
সরমহারা দাঁড়ানু আসি
সবার সকাশে ;
আঁচল খানি ছড়ায়ে গেছে আকাশে।

ধরণী মোরে টানিয়া নিল
বাহুর কুলায়ে,
সকল দেহে পরশ দিল বুলায়ে ;—
অঙ্গ আমার লতার মত
চুম্বনেতে বিবশ নত,—
বাহুর ডোরে দেয়গো মোরে
সকল ভুলায়ে ;
অঙ্গে আমার পরশ দিল বুলায়ে।

হাজার বরণ লুকায়ে ছিল
গোপন অন্তরে,
আজি সে হেরি আকাশ ভার সন্তরে!
বহ্নিশিখার নৃত্যতালে
বিশ্ব নিখিল লীলায় দোলে,
আমারি ধাপে উজল আজি
আমার পন্থ রে!
বরণরাশি আকাশ ভার সন্তরে!

নিচোল-পাশ বাঁধনখানি
নীরবে টুটিয়া
হৃদয় মোর বাহিরে ওঠে ফুটিয়া ;
গন্ধে গানে অরুণ রাগে!
মর্ম্মে একি পুলক জাগে!
নিখিল দিঠি পলক হারা
চুমিছে লুটিয়া ;
হৃদয় মোর নীরবে ওঠে ফুটিয়া।

যা' কিছু মোর মরমে ছিল
ফুটেছে বাহিরে,
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে!—
মুগ্ধ ভাষা প্রকাশ মাগি
রুদ্ধ দলে ছিল জাগি,
উল্লাসে আজি হাওয়ার সুরে
হরষে গাহি রে!
গোপন আর নাহি রে কিছু নাহি রে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ভারতশিল্পের নব জাগরণ

এল্ আর্ট ডেকরেটিফ্ (L' Art Decoratif) নামক চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত ফরাসী মাসিক পত্রে মাদাম হালবেক (Madame Hollebecque) ভারতশিল্পের নব জাগরণ সম্বন্ধে এক উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিগত ৩রা মে তারিখের ষ্টেট্‌সমেন (Statesman) পত্রে ইংরেজীতে তাহার এক সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার ভাব সঙ্কলন করিলাম।

ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কয়েকখানি ছবি ভারতের প্রাচ্য শিল্প-সমিতি (Indian Society of Oriental Art) পারিনগরে প্রেরণ করিয়াছিল। তথাকার প্রাচ্য শিল্প-সমিতির (Societe' des orientales) তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত চিত্র

পারিনগরে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সকল চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে মাদাম হলবেক লিখিয়াছেন—

"আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা ভারতবর্ষকে বুঝিতে পারিয়াছি। রাশি রাশি তীর্থযাত্রী দল বাঁধিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথবা স্বর্গকামনায় গঙ্গাতীরে বা দেবমন্দির পুষ্পোপহার লইয়া সমবেত হইয়াছে, —এই জাতীয় চিত্রই আমরা ভালমন্দ উভয় শ্রেণীর লেখকগণের ভারতবর্ষবিষয়ক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা যে ভারতের ছবি দিয়া থাকেন, সেই ভারত কখনও জাঁকাল, কখনও দরিদ্র, হীন,—এই উদ্দাম শান্ত —কিন্তু ইহার সমস্ত অবস্থাই ইউরোপীয় দর্শক দিগের বিভ্রমোৎপাদক। কিন্তু আজ এই চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারত আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই ভারত পর্য্যটকদিগের কল্পনা রাগ-রঞ্জিত নহে, ইহা ভারতীয় চিত্রকরদিগের তুলিকোদ্ভিন্ন। প্রাচ্য বাজারে যে নর্ত্তকী কি বাজীকর, সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকৃষ্ট ছবি পাওয়া যায় তাহাই জুলি এবং সেভিলঁ (Jules এবং Bois Andre Chevillon) ও অন্যান্য লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে সবের সহিত আলোচ্য চিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। প্রচণ্ড অনাবৃত আলোক, অসংযত উদ্যম এবং সুখলভ্য ইন্দ্রিয়বিলাস যে চিত্রের লক্ষণ, পর্য্যটকেরা সেইরূপ চিত্রই তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের বা অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোহর অথচ গম্ভীর চিত্রে সে লক্ষণের অভাব দৃষ্ট হয়।

"জীবন ব্যাপী গভীর সাধনার ফলে এই সমস্ত শিল্পী সম্প্রদায়—বিভক্ত এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা জড়িত ভারতীয় সভ্যতার এক পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে জাতি এত কাল উদ্ভাবনী-শক্তি রহিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই জাতির এই জাগরণকে 'নব অভ্যুত্থান' (Renaissance) বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হইবে না। কিছুকাল পড়িয়া থাকার পর, পুনরায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করাকে যদি পুনর্জ্জন্ম বলা অসঙ্গত না হয়, তবে ভারত-শিল্পের এই নব জাগরণকেও 'নব-অভ্যুত্থান' Renaissance) বলা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পসাহিত্যের পুনর্বিকাশকে যে অর্থে 'নব অভ্যুত্থান' বলা হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ বর্ত্তমান ভারতীয় শিল্পের প্রতি প্রয়োগ করা অসঙ্গত। কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনও এক বিশেষ আদর্শের অনুসরণে সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষিত করতঃ সেই আদর্শকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান ভারতবর্ষ, স্বীয় অফুরন্ত উদ্যমের প্রভাবে, একটা নূতন ও অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব বা মতবাদ জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করে নাই। কলিকাতার চিত্রকরদল সংস্কারক নহেন। তাঁহারা নূতন কিছু উদ্ভাবন করেন নাই বা পুরাতন কিছু বিনাশ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষকে চিন্তার কোন নূতন পথে প্রধাবিত করিতেও প্রয়াসী নহেন। প্রাচীনের প্রতি অনুরক্ত হইলেও তাঁহারা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কোন বিচ্ছেদ ঘটাইতে অনিচ্ছুক। ভারত-শিল্প অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যে শৃঙ্খল অল্পকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল কলিকাতার চিত্রকরদল পুনরায় তাহা সংযোজিত করিয়াছেন।

"নানা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও পরাজয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বীয় চিন্তার, স্বীয় ধর্ম্মের পূর্ব্বাপর ঐক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ আমরা ভারতবর্ষের যে প্রকৃতি দেখিতে পাই,—যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করি—তাহা এই যুগ-যুগব্যাপী ঐক্যেরই ফল। দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম অতীতকালে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে যে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, কিছুই সে বন্ধনকে শিথিল করিতে পারে নাই। যে ভাবপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, বহুশতাব্দীর পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সেই

তত্ত্বের পুনরুদ্বোধন করিয়াছেন। সে তত্ত্বের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে ঐরূপ বলা যাইতে পারে যে, মায়ার কুহকে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ জীবের মোহ উৎপাদন করিতেছে; ইহার অন্তরালে এক সনাতন অবিনশ্বর সত্যস্বরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিরাজ করিতেছেন; এবং বহুজন্মের অবসানে জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে. পরিদৃশ্যমান পদার্থের যথাযথ প্রতিকৃতি অঙ্কনই শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কিন্তু পরিদৃশ্যমান পদার্থরাজি যে অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের আবরণ ও আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাহার অনুসন্ধানই শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কারণেই দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যাবলী স্বভাবানুকারী ছবি. বাজারের জনতা, বারাণসীর রাস্তার দৃশ্য এবং আন্যান্য যে সমস্ত ছবির সহিত ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের প্রসাদে আমরা সুপরিচিত হইয়াছি, তাহার কিছুই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের রচনায় স্থান পায় নাই। নন্দলাল বসুর 'মদ্যপায়ী' এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৃষ্টিতে কেরাণী বাবুদের আপিষ যাত্রা' নামক চিত্রদ্বয় বাদ দিতে হইবে। এই শেষোক্ত ছবি দুইটী জাপানী প্রণালীতে অঙ্কিত; উহাদিগকে মৌলিক রচনা না বলিয়া জাপানী প্রথার কৃতিত্ব পূর্ণ অনুকরণ বলাই সঙ্গত। ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাকল্পে যতটুকু স্বভাবানুকরণের প্রয়োজন, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ততটুকুই স্বভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন। যে-সে ঘটনা এই তত্ত্বের উপযোগী নয়। বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়, পরে তুলিকা সংযোগে উহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। বাস্তবিক তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রভাবে পুনঃসৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না; এবং উহা এরূপ গভীর ভাব সম্পন্ন নহে যে তুলিকা সহযোগে উহার স্থায়িত্ব প্রদান করা আবশ্যক। দেবতাদিগের চরিত্র, গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যান বা সমাধি, অনাদি শক্তির পরিকল্পনা প্রভৃতিই তাঁহাদের মতে, শিল্প প্রতিভার উপযুক্ত আলম্বন। উজ্জ্বলবর্ণ ও শারীরিক সৌন্দর্য্য পরিহার না করিলে এই সকল ভাবের অভিব্যক্তি প্রদান করা যায় না। উজ্জ্বল বর্ণের পরিহার এবং সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের সমাবেশই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন এবং তদ্বারাই চিত্ত ধ্যানের উপযোগী হয়। এবং চিত্তের নিভৃত কোণে এই সমস্ত উচ্চ ভাবের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়।

"এবিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের ক্রমবিকাশের কাহিনী শিক্ষাপ্রদ। ভারতীয় শিল্পের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে ইংরাজ শিক্ষকেরা ভারতীয় ছাত্রদিগকে নিকৃষ্ট ইংরেজী চিত্র পুস্তক ও শিল্পাদর্শ নকল করিতে শিক্ষা দিতেন। ১৯০৬ সনে কি তন্নিকটবর্ত্তী কালে, 'ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্র বিদ্যার' (Indian sculpture and Painting) সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার হাভেল সাহেব এই সমস্ত অপকৃষ্ট আদর্শ দুর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রাচীন ক্ষুদ্রাকার চিত্র (miniature) সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিল্প চর্চ্চার স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করেন। ইংরেজ চিত্রকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় তিনি প্রথমতঃ উজ্জ্বলবর্ণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎপর তিনি ইংরেজ প্রভাবের হস্ত হইতে যতই পরিমুক্ত হইতে লাগিলেন ততই উজ্জ্বল বর্ণ পরিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ভ্রমণের অবসান' নামক চিত্রে মেঘের অন্তরালে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্ত কিরণমালা ভিন্ন আর কোনই উজ্জ্বল বর্ণ নাই। উহাতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। ঐ চিত্রের বর্ণ ফ্যাকাসে সাদা হইতে ঈষৎ বেগুণী আভাযুক্ত সাদায় পরিণত করা হইয়াছে। বর্ণ সন্নিবেশ প্রণালীর এই সামঞ্জস্য কলিকাতার চিত্রকরদিগের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষ উজ্জ্বল আলোকে

উদ্ভাসিত। লোকে সাধারণতঃ ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কলিকাতার চিত্রকর দলের কেহই তাহা অঙ্কিত করিতে উৎসুক নহেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র পরিণত দশায় যে পরিপক্কতা বা উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা অনুশীলন করিলে ভারতবর্ষের যে চিত্র মনোমধ্যে উদিত হয়, অস্ফুট, ক্ষীণ আলোকে চিত্রিত করিয়া ইহারা ভারতবর্ষের সেই ধীর গম্ভীর প্রতিকৃতিই অঙ্কিত করিতে ভালবাসেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহাদের বাহ্য জগতের প্রতিকৃতি আধ্যাত্মিক ভাব সমন্বয় বই আর কিছুই নহে।

"কেবল শিল্পিগণের ইচ্ছাই এই ক্ষীণ বর্ণের প্রয়োগের একমাত্র কারণ নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বহুদিন চিত্রশালায় ক্ষীণবর্ণে চিত্রিত ছবি অনুশীলন করিয়াছিলেন; এবং ইউরোপের 'র‍্যাফেলপূর্ব্ব' চিত্রকর দলের (Pre Rphaelites) প্রভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা সেই প্রভাব হইতে এখন পরিমুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কুমারী কার্পেলি (Karpeles) চম্পক কুসুমহস্তে পুষ্পাধারের নিকট উপবিষ্ট প্রাচ্য চিত্রকরের একছবি, ফরাসী দেশীয় প্রাচ্য চিত্রকর সমিতিগৃহে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের সাজসরঞ্জাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার চিত্রকরদল, তৈল চিত্রের পরিবর্ত্তে,—কুমারী কার্পেলি (Karpeles) কর্ত্তৃক অঙ্কিত সেই চিত্রের শিল্পীর ন্যায়, চম্পক-পুষ্প-হস্তে পুষ্পাধারের নিকট উপবেশন করতঃ, যে দিন জলীয় বর্ণে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন সেই দিনই তাঁহারা ইউরোপীয় প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইলেন।

"অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশের সনাতন আদর্শের প্রতি অনুরক্ত। যে 'ইন্দো পারস্য' ও 'মোগল' শিল্প তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিল তিনি তাহার, এবং অজন্তা ও অন্যান্য গুহার প্রাচীন চিত্রমালার পক্ষপাতী। তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের চিত্রে উক্ত শিল্পের কোন না কোনটীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মুসলমানও আছেন। ইঁহাদের একজন নূরজাহানের জীবনের ঘটনাবলী মনোহর ভাবে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ঈশ্বরী প্রসাদ সাদির কাব্যের ঘটনাবলী পারস্য রীত্যানুসারে চিত্রিত করিয়াছেন।

"শিব-চরিত্র অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা যতদূর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাঁহার ছাত্রবৃন্দের প্রতিভা তদ্রূপ করে নাই। অবনীন্দ্রনাথের হরগৌরীর ছবি মনোহর সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি নন্দলাল বসু, অজন্তার গুহাগারে চিত্রিত শিবপার্ব্বতীর যে ছবির অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা অবনীন্দ্রনাথের ছবি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। সেই চিত্রে, লতার মত ললিতা পার্ব্বতী স্বীয় পতির গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সে চিত্রের হরগৌরী ধীর-গম্ভীর, তাঁহাদের অনাবৃত দেহ সৌন্দর্য্য সুসমায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী;—স্ত্রীপুরুষের যুগপৎ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের অপূর্ব্ব রহস্যের এতদপেক্ষা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী উদ্বোধন চিত্রশিল্পে আর দেখা যায় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের কাহিনী অঙ্কনে এই শিল্পিদল তেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। গাঙ্গুলীর 'বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার' নামক চিত্রে আধুনিক ভাবের অতিশয় প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সচরাচর যাহা প্রাচীন রোমবাসীগণের আকৃতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহার বুদ্ধদেবেও সেইরূপ আকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। আর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'নির্ব্বাণের' পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও বাল-কোচিত। সে ছবিতে এক নীল সাগর অঙ্কিত করা হইয়াছে; এবং তন্মধ্য হইতে একটী মস্তক ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। কিন্তু তিনি ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিধর্ম্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্যের যে সমুদয় ছবি আঁকিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্টতর। তাহাতে মহত্বের এক ধীর-গম্ভীর রেখাপাত হইয়াছে। অঙ্কন

কৌশলের কথঞ্চিৎ ত্রুটী থাকিলেও তাঁহার 'অন্তিম কালীন শোক' নামক ছবি গভীর ভাবে চিত্ত আলোড়িত করে।

"অবনীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছাত্র নন্দলাল বসু হিন্দুদিগের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতের অনেক ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার যে সব ছবিতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ প্রভাব দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহাতে চমৎকারিত্ব কিংবা উন্মাদনা নাই। কিন্তু তাঁহার 'জতুগৃহদাহ' নামক ছবিতে সৃষ্টিক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং যুধিষ্ঠিরের 'মহাপ্রস্থান' নামক ছবি মহত্ত্বপূর্ণ বটে কিন্তু তাঁহার 'রাম-চরিত' নামক ছবিতে প্রকৃত প্রকারের কলা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি ইউরোপীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন; অজন্তা গুহার ছবিতে ভারতের সনাতন অঙ্কন-রীতির যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তিনি পূর্ণভাবে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। এই সনাতন অঙ্কন-রীতি এখনও ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই আদর্শে চিত্রিত ছবি বাজারে পাওয়া যায়; এবং ভারতীয় রমণীরা এখনও স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে দেবদেবীর যে ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকেন তাহাও এই রীতিতে চিত্রিত। রাম-মাতা কৌশল্যার চিত্রে তিনি হিন্দু রমণীর পরিপূর্ণতার এক ছবি আঁকিয়াছেন। 'সাগরতীরে রামের বিশ্রাম' নামক ছবি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কাব্যে যাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, চিত্রে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

"অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্রূপাত্মক ছবিও অঙ্কিত করিয়াছেন। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হইয়াছিল।

'আমরা কলিকাতার চিত্রকরদলের ছবির প্রকৃতি বর্ণনা করিলাম;—উহা মনোহর, বিশেষত্বপূর্ণ এবং ধ্যানস্তিমিত। এক সাধারণ উদ্দীপনার প্রভাবে সমবেত চেষ্টাদ্বারা কতদূর উৎকর্ষ লাভ করা যায় তাঁহারা তাহা দেখাইয়াছেন। ভারতীয় প্রকৃতির অনুরূপ আদর্শ ও কলাকৌশলের নবজীবন প্রদানের অনুরোধে এই সমস্ত প্রতিভাশালী ও কৃত্রিমতাহীন চিত্রকরদল নিজেদের ব্যক্তিগত রুচি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণের ঔজ্জ্বল্য এবং আকৃতির বৈচিত্র্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকিলেও খাঁটি ভারতীয় শিল্পাদর্শের অনুসরণের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

"এই মুষ্টিমেয় চিত্রকরদল যদি উৎকৃষ্ট চিত্র সৃষ্টি করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে বিদেশীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। এবং তাঁহাদিগকে পৌরাণিক কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া তুলিকা সহযোগে ভারতীয় চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাচীন ভাস্করগণের রচনায় যে তেজ, শক্তি ও বিক্রম দৃষ্ট হয় কলিকাতার চিত্রকরগণের চিত্রে তাহা দেখা যায় না। প্রশান্ত লাবণ্য সৃষ্টির প্রতি ইঁহাদের অনুরাগই তাহার কারণ। ইঁহারা ভারতের খাঁটি লক্ষণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করেন নাই। বিশাল স্বপ্নের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অসংখ্য দেবতারূপে পরিকল্পনা করিয়াছিল। সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের অসংখ্য হস্ত, ভোগের জন্য তাঁহাদের সহস্র মস্তক পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন কালে আমরা পরস্পরবিরোধী অনেক ভাব দেখিতে পাই; জীবন ও মৃত্যু, অনুভূতি ও চিন্তা, ভোগ বিলাস ও সন্ন্যাস। কিন্তু তখনও ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে আমরা স্থিতিশীলতার প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাই; এবং উদ্দাম প্রবৃত্তির উন্মত্ততার মধ্য হইতে স্থির চিত্ত-বৃত্তির উৎপত্তি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্যময় ও উচ্ছ্বসিত চিন্তাশক্তির উপযুক্ত অভিব্যক্তি আমরা ঐ চিত্রকরগণের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ একদিন ধ্যানের রাজ্য

অতিক্রম করিয়া বিশ্বজগতের কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে ; তখন উহা নবযৌবন লাভ করিয়া এরূপ এক শিল্পের সৃষ্টি করিবে যাহার দৃষ্টান্ত আমরা এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

"ভারতশিল্পের এই নবজাগরণকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। যে সভ্যতার মধ্যে এই শিল্প জন্মলাভ করিয়াছে মানসিক নেত্রে সেই সভ্যতার মধ্যে ইহাকে সংস্থাপিত করিয়া ইহার আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের পক্ষে ইহার অনুকরণ করার প্রয়োজন নাই। এক রমণীর পোষাক নির্ম্মাতার খেয়ালের গতিকে পারস্য রীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া, আমরা তিন বৎসরকাল যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়াছিলাম, এই উপায়েই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব। পারস্য রীতি আমাদের হস্তে আসিয়া, সমস্ত বিশেষত্ব হারাইয়া, এক অর্থহীন জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দু শিল্প আমাদের নিকট মানসিক ক্রীড়নক হওয়া উচিত নহে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে আমরা যে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, এবং তাঁহাদের সাহায্যে যে আমরা ভারতের অমূল্য সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাঁহারা আমাদের সে চেষ্টা ও আগ্রহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।"

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৬৪। পান, পানি, পিঠা
তিনই শীতে মিঠা।

১৬৫। অ্যাং উজায়, ব্যাঙ উজায়,
খইলা, পুঁঠি বলে আমি উজাই।
খইলা=খলিসা মাছ।

১৬৬। যেমুন মা, তেমন ঝি,
তেমুন তার নাতিন টি।

১৬৭। যত আছে নাড়াবইনা,
সগলেই হইল কীর্ত্তইনা।

১৬৮। বাইরা মইলে গে'য়াই খালি।
মইলে=মরিলে।
খালি=শূন্য।

১৬৯। নাপিত হইল কবিরাজ
চুল ফালাইব কে ?

১৭০। ওয়া জানি, এইয়া জানি,
জগতে নাইগো বাকি,
সতীনরে দিল সোনার গয়না
আমারে দিল ফাঁকি।

১৭১। খইল্‌সা মাছ দিয়া রাঁধিলাম ঝোল,
সতীনে গোসা করচে মাথা ধইরা তোল।
গোসা=ক্রোধ।

১৭২। বইতে জানলে পড়ে না,
খাইতে জানলে মরে না।

১৭৩। যদি থাকে নসিবে
আপনে আপনে আসিবে।

১৭৪। আপনা থেইকা পর ভাল,
পর থেইকা জঙ্গল ভাল।
থেইকা=হইতে।

১৭৫। পরের উপর খায়,
আঠার মাসে বচ্ছর যায়।

১৭৬। কুমাইরা রাঁধে কুমারণী খায়,
আঠা[illegible]াসে বচ্ছর যায়।

১৭৭। আমার পাঠা আমি
ল্যাজে কাটুম।

১৭৮। যত কিছু উপার্জ্জন
বিষ্ণুপদে সমর্পণ।

১৭৯। পাইয়া পাঁচনী
নাম থোয় সুবচনী।

১৮০। সায়রে শয্যা,
শিশিরে কি ভয়।

১৮১। এইয়া ফুরাইলে খাইবা কি?
ঘরে আছে আবিয়াত ঝি।

আবিয়াত=অবিবাহিতা।

এই শ্লোকটি পূর্ব্বদেশে কন্যাপণের প্রচলন প্রমাণ করিতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে এখন বিপরীত স্রোত প্রবহমান।

১৮২। অৰ্দ্ধেক আচার, অৰ্দ্ধেক বিচার।

১৮৩। ধান বান্‌তে শিবের গীত।

১৮৪। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

১৮৫। আকাঠা নায়ের সাজ বেশী।

১৮৬। রামায়ণের মধ্যে ভূতের কেচ্‌কেচী।

১৮৭। যখন পড়্‌ব চঙ্গের মৈ
এই বড়াই বা থাকব কৈ?

১৮৮। বিষের লগে উদ্দিশ নাই
কুলাপানা চক্কর।

১৮৯। ঘর দেবতা দয়া করে
দপ্পর দপ্পর কলা পড়ে।

১৯০। এক বুড়ীর নানান দোষ,
নাকের আগায় বিষ ফোট্।

১৯১। এক আভাগীর তিন কাম
ধান খাটে আর চোয় আম।

চোয়=চোষে।

১৯২। যার পরে তার খায়,
তারই ভিটায় ঘু ঘু চড়ায়।

১৯৩। ধোপ ক্লাপড়ের তেনাও ভাল।

১৯৪ স্বভাবে করিব কর্ম্ম কি দোষ আমার।

১৯৫। ইল্লৎ যায় ধুইলে,
স্বভাব যায় মইলে।

১৯৬। মুখে ভাল লাগে যা
ভাতার পুতেরে না দিও তা।

১৯৭। হাভাইতার দাঁতে বিষ,
কাচা কলাটা ভাতে দিস।

১৯৮। ভাতার পুত বানিজ্জে দিয়া,
আপনে বইলাম গোলা লইয়া।

১৯৯। জানেন না ক, খ,
করতে আসেন সরকারী।

২০০। আইড়ের মুড়া—ঘির্ত্ত মুড়া
দেও নিয়া জামাইর পাতে,
রুইতের মুড়া—কাষ্ঠমুড়া
দেও আইনা আমার পাতে।

ঘির্ত্ত=ঘৃত।

২০১। সাঁঝ গেলে দীয়া,
বয়স গেলে বিয়া।

দীয়া=দীপ।

২০২ আইবেন জামাই নিবেন ঝি,
জামাইর গোসায় যাইব কি?

২০৩। এক পাও দুই পাও বাওয়ন বাড়ী কদ্দূর।

বাওয়ন=বামন; ব্রাহ্মণ।

কদ্দূর=কতদূর।

২০৪। এক শ্বাশুরীর পুত্রসন্তান ছিল না। কেবল একমাত্র কন্যা। তাহার একটি ছেলে হয় ইহা সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু বহু ঔষধ পত্র, তাবিচ কবচেও কোনরূপ সুফল ফলিল না। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

এক দিন তাহার জামাতা শ্বশুর বাড়ী এসেছেন। শ্বশুর মহাশয় জামাতার জন্য বাজার হইতে খুব বড় একটি কই মাছ আনিয়া স্ত্রীকে উহা উত্তমরূপে পাক করিয়া জামাইকে দিতে বলিলেন। কিন্তু এদিকে শ্বাশুরী বড়ই লোভী, সে জামাতার পাতে কই মাছটি দিল বটে কিন্তু লোভে তাহার রসনেন্দ্রিয় সরস হইয়া

উঠিল, এবং অসহ্য হওয়ায় ঘরের বারান্দায় গিয়া জামাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—

"পাড়ার লোকেও কয়,
আমার মনেও লয়
জামাইর পাতের কই মাছ খাইলে
খাশুরীর পোলা হয়।"

২০৪ উল্টা পিলে মাড়ির দাঁত।

২০৫। গরজ ভারি, খরচ কম।

২০৬। হাউস আছে রুচ নাই,
দাঁড়ি আছে মোছ নাই।

২০৭। ধূপ নাই দেবা সাজাল খাও,
মুই আভাগা আছি দেইখা এইয়াও পাও!

সাজাল=ধোঁয়া (ধূপহীন)

২০৮। যার কাজ তারে সাজে,
অন্যে পরে ঠেঙ্গা বাজে।

২০৯। একপুত্র যার—
বাপের ঠাকুর তার।

২১০। কায়েতের বুদ্ধি,
ঘণ্টার বাদ্ধি।

২১১। রূপবতী গুণবতী কুলীনের ঝি,
তাতে আবার পুত্রবতী তুলনা দিবা কি।

২১২। ঝড়ে বানে বক মরে,
ফকীরের কেরামৎ বাড়ে।

২১৩। হয় কথা নয় করে,
গুতা গুতি সার করে।

২১৪। ক্যাৎরা চোখের ঘুম,
ল্যাছড়া কাঁথার উম্।

উম্=গরম।

২১৫। উপরি মাইরা ফাঁপরি,
ভাতার মাইরা দেশান্তরী।

২১৬। দরবারে না পাইয়া ঠাঁই,
ঘরে গিয়া মাউগ্ কিলাই।

২১৭। মামু,
ভাত এমুন চিজ—
খোদার থিকা উন্নিশ আর বিশ।

২১৮। কোথায় রাণী ভবানী,
কোথায় সেইজ্যে মুতনী!

২১৯। যার মরণ যথায়
নাও কইরা যায় তথায়।

২২০। এইও দিন যায়—
খ্যার দিয়া যে চুল বাঁধে
সেও ভাতার পায়।

২২১। মায় ছুইলে পোলা মরে,
এমুন পোলা নে উদরে ধরে।

২২২। কানে হাত না দিয়াই কয়
কান নিল চিলে।

২২৩। আটে পাথে নাইও,
নিত্য নিত্যি খাইও।

২২৪। পুত্রের কালী, গঙ্গাজলের বালি।

২২৫। আজ রান্‌চে কে?
অ্যাড়নে।
তবেযে ভাল হইছে
কেবল বড়বৌ লাড়নে।

রানচে—রাঁধিয়াছে।
অ্যাড়নে=পাগলপ্রকৃতির অকর্ম্মা স্ত্রীলোক।

২২৬। নিম তিতা, গিমা তিতা,
আর তিতা ক্ষর;
তার থিকা অধিক তিতা
দুই সতীনের ঘর।

নিম=নিম্বফল।
গিমা=শাক বিশেষ।
ক্ষর=ক্ষয়ের।

২২৬। শাগেই এত লাড়া?
ডাইল হইলে ত ভাঙ্গত পাতিল—
ভাইগা যাইত পাড়া।

২২৮। গোদেরে না কইও গোদ,
পিরীতে কইও "পানিফোট্।"

২২৯। আমি জানি না চুল বাঁধতে,
আমারে কয় আরেক বাড়ী রাঁধতে।

২৩০। ফ্যাদা মুখে আদা খায়,
হাতে হাতে স্বর্গ পায়।

২৩১। নাচতে না জানলে উঠান ব্যাকা।

২৩২। অপে গেলাম মাসীবাড়ী,
এত দু'গা ভাত, এত বড় একটা চাড়ি।

অপে = খুব নাম শুনিয়া। চাড়ি = গামলা।

২৩৩। পেটের থেইকা পোলা পড়ে,
উবুত হইয়া ডাবা ধরে।

ডাবা = হুঁকা।

২৩৪। দাদায় কইছে বাড়া বান,
বান্‌তে আছি ওদা ধান।

২৩৫। ভাত পান্ না বাঁদী,
মাছ ভাজার লিগা কাঁদি।

২৩৬। কপালে আছে বাঁদী,
সুখের লিগা কাঁদি।

লিগা = জন্য।

২৩৭। শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী,
তিন দিন পরে ঠ্যাঙ্গার বাড়ী।

২৩৮। শ্বশুর বাড়ী বাসা,
একজনেরে মারলে তিন জনে করে গোসা।

২৩৯। পাগে খাইয়া রাগে রাখে।

পাগে = হেঁসেল খানায়।

২৪০। যার বিয়া তার মনে নাই,
পাড়া পরসীর ঘুম নাই।

২৪১। ভাল কথা মনে পড়ছে
আচাইতে আচাইতে,
ঠাকুরঝিরে পানির কুটুমে নিল
নাচাইতে নাচাইতে।

কোন গ্রামে কোন বধূ ও তাহার ননদ একসঙ্গে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। দৈবক্রমে ননদটিকে হঠাৎ কুমীরে নিয়া গেল। ভ্রাতৃবধূটি এমন সহৃদয়া যে এ ভয়ানক খবরটা বাড়ীতে কহিতেও তিনি ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আচমন করিতেছেন তখন তাহার উক্ত ঘটনা মনে পড়িল এবং অতি হাল্কা ভাবে বলিলেন —

"ভাল কথা মনে পড়ছে" ইত্যাদি।

২৪২। বৌ ভাঙ্গে মুছি, তারে কয় ছুচী,
মাইয়া ভাঙ্গে মাইট্, তারে কয় বাইট্!

২৪৩। নাপিত দেখলে
কুনি নৌখ্ বাড়ে।

নৌখ = নখ্

২৪৪। বাড়ীর ধারে কামার,
দাও গড়াইতে দেও আমার।

২৪৫। আমার ঠাকুর খায়েন কি?
ঘি ভাত।
না পাইলে? শুধা ভাত।

২৪৬। ছটি লটি ইংরাজি পড়েন,
খইলতানিরে কয়েন "পাহেট্!"

২৪৭। চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে।

২৪৮। ভাত পায় না বাবাজি,
খাট্টা খাইতে চায়।

২৪৯। হয় না হয় বিয়া,
সাদি বাজাও গিয়া।

২৫০। লাখ টাকা, লাখ টাকা,
দুইকুড়ি দশ টাকা।

২৫১। অভাগীর লগ্‌নে
চাঁদ ওঠে দক্ষিণে।

২৫২। রাহু চণ্ডালের গুষ্ঠি—
এক লাফে বাগুণে তিন চাড়ালনীর কুষ্ঠি॥

কোন এক চণ্ডালপাড়ার ধার দিয়া গ্রহবিপ্র যাইতে

ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ৩টি চণ্ডালিনী তাহাদের নিজ নিজ কোষ্ঠি লিখাইয়া লইতে চাহিল। ঠাকুর পারিশ্রমিক চাহিলে তাহারা একটিমাত্র লাফা বেগুণ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিবে না জানাইল। ঠাকুরও যথালাভ ভাবিয়া উহাতেই তিনটি কোষ্ঠি লিখিয়া দিলেন।

২৫৩। মাইয়ার নাম ফেলি,
পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি,

২৫৪। অভুক্তা বড়ই, ভুক্তা বেল,
ডাকে বলে পরাণ গেল।

২৫৫। দাতায় দান করে,
ভাড়ারীর পেট ফাটে।

২৫৬। খাওইয়া আছে, চাওইয়া নাই,
নেওইয়া আছে, দেওইয়া নাই।

চাওইয়া—দৃষ্টিকরিবার লোক;
সহানুভূতিকারক।

২৫৭। আদি কাইলা ভাদী,
ভাতারে ডাকে "দিদি।"

২৫৮। খাইলাম ত বার চারি,
না খাইলাম ত দিন চারি।

২৫৯। এক বিয়াই দেবের বরে,
আরেক বিয়া কি গাছে ধরে?

২৬০। ক্ষুধা থাক্‌লে সুধাও রোচে,
ভেঙ্গরুলে কামর দিলে বুড়াও নাচে।

সুধা—সুধুভাত।
ভেঙ্গরুল—ভিমরুল্।

২৬১। ভাসুর ঠাকুর, ভাসুর ঠাকুর, শোনচ নি,
অভাগীর কথা বোঝছ নি?
বাইদা মাগী বাড়ীত্ আইল,
চোক্ ঠার দিয়া পাছ দুয়ারে নিল,
কপাল চিরা দাউর্‌কা ভর্‌ল।
সিন্দুর দিয়া বুঁদ মারল,
ঘরকোণা ব্যাঙ্ মোরে করল।

কোন এক ভ্রাতৃবধূ তাহার ভাসুরকে জানাইল যে একদিন এক বেদেনী তাহাদের বাড়ী আসিবামাত্র তাহার সতিনী তাহাকে চোক্ ঠারিয়া পা দুয়ারে ডাকিল, এবং বেদেনীর নিকট হইতে কি এক শিকর লইয়া হতভাগিনীর কপাল চিরিয়া উহা ভরিয়া দিল এবং তদুপরি সিন্দুরের টিপ্ পরাইয়া উহা অদৃশ্য করিয়া ফেলিল এবং তদবধি সে সতীনের চক্রান্তে কুণো ব্যাঙ্ হইয়া ঘরে আছে, আর তার সতিনী পরম সুখে স্বামী নিয়া সংসার করিতেছে।

২৬২। সাত বার খাইয়া রইচে শুইয়া,
তার চাউল দেও আগে ধুইয়া।

২৬৩। মূর্খের স্ত্রী, পণ্ডিতের মা,
"গম্যতাং" টা ব্যথা করে—
ধীরে ধীরে যা।

একগ্রামে এক পণ্ডিতের একটি টোল ছিল। বহু ছাত্র সেখানে লেখা পড়া করিত। একদিন এক কৃষক-পত্নী তাহার একমাত্র ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের হাতেপায়ে ধরিয়া ঐ ছেলেটিকে রাখিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও যখন লেখাপড়ার দিকে উহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না তখন নিরাশ হইয়া তিনি উহাকে বাড়ীর গোরু রাখার ভার দিলেন। এ দিকে ছেলেও মাঝে মাঝে বাড়ী যাইয়া দু'চারটা তিড়িং মিড়িং আওড়ায় আর মা ভাবে যে তার ছেলে ভারি পণ্ডিত হয়েছে। একদিন ছেলেকে বাড়ী নেওয়ার জন্য তার মা স্বয়ংই টোলে এসে উপস্থিত। মা আসিবামাত্র ছেলে ত গিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাড়ী যাওয়ার বিদায় চাহিল, কিন্তু তখন পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত, বার বার বিদায় চাওয়াতে তিনি মুখ ব্যাদান করিয়া বলিলেন—"গম্যতাং"। এখন রাখাল ছেলে ত কিছুই বুঝিতে পারে না, সে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; "কি

কইলেন কি কইলেন?" তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধাভিভূত হইয়া বলিলেন "তোর মাথা, যা।" বালক তখন "গম্যতাং" শব্দের অর্থ—মাথা ঠাহরাইয়া তার মার সঙ্গে বাড়ী চলিল। যাইতে যাইতে দু'পুরের রৌদ্রে তার মাথা ধরিয়া গেল—কিছুতেই দ্রুত হাটিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার মা খুব তাড়াতাড়ি হাটিতেছে। তখন সে তার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

মূর্খের স্ত্রী, (কারণ তাহার পিতা ত মূর্খই ছিল)
পণ্ডিতের মা, (সে নিজে ত এখন পণ্ডিত হইয়াছে)
গম্যতাংটা (মাথাটা) ব্যথা করে, ধীরে ধীরে যা।

২৬৪। আদা চুন্নীর মনে কামড়।

২৬৫। অধিক সন্তান যার পাপের সাজা তার।

২৬৬। গীত গায় কে লো রাই?
আমার দেওরের ভাই।
গায় কেমুন?
আপনা রস, পরের বেরস,
ভেড়ার থিকা কিঞ্চিৎ সরস।
দেওরের ভাই=দেবরের ভাই,
অর্থাৎ স্বামী।

২৬৭। বুড়ীর আগদুয়ারেও ভয়,
পাছদুয়ারেও ভয়,
সকল কথা থুইয়া বুড়ী
কামের হিসাব লয়।

২৬৮। এত কইরা আনলাম আমি তাওইয়ার ঝি,
মুখের চোটে মইলাম সদারামগুষ্টি।

২৬৯। দাসী লো দাসী আন্ ত ঘোড়া,
বিবাদ করতে যাই উত্তর পাড়া।

২৭০। বিয়া বাড়ীর কাম,
ঘুড়লে থাড়লে নাম।

২৭১। কামারের ভাইল, আইজ আর কাইল।

২৭২। ভালরে বইলা করলাম ঘো,
ঘো বলে আমারে পইথানে থো।
ঘো=যাদু।

২৭৩। যদি থোয় পাতিলের কোল, তবে খায় বেন্নুনের ঝোল।
বেন্নুন=ব্যঞ্জন।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।

অসময়ে

(১)

প্রকৃতি লো, আজি অসময়ে একি
ধরিলে সাজ?
এ মহা শিশিরে বাদলের ধারা
অবনী-মাঝ!
তুষার-শীতল অধীর সমীর
রুদ্ধ দুয়ারে আঘাতে গভীর
নাহি কি লাজ?
রবি-শশী-তারা নীরদের কোলে
ঘুমাইয়া সুখে পড়িল কি ছলে
পাশরি কাজ?
প্রকৃতি লো আজি অসময়ে একি
ধরিলে সাজ?
এ মহা শিশিরে বাদলের ধারা
অবনী-মাঝ!

(২)

কেতকী-কদম্ব কোথায় গো আজি
সুষমা মাখা?
শেফালি-গেঁদায় গোলাপে আমার
বাগান ঢাকা?
মাঠে মাঠে কোথা শ্যাম তৃণ-দল
কোথা কৃষাণের কর্ম্মের রোল
লাঙ্গল হাঁকা?
আজিকে সেথায় কাঁচা-পাকা ধান
নাচিছে পুলকে মায়ের মহান্
আশিস্ রাকা!

কেতকী-কদম্ব কোথায় আজিকে
সুষমা মাখা?
সেফালি-গেঁদায় গোলাপে আমার
বাগান ঢাকা!

(৩)

কোথায় গগনে আজিকে বলাকা
হাজার দলে?
সারস-সমাজ কেলি যে করে না
দীঘির জলে!
আজিকে আকাশে সুরঙিল টিয়া
উড়িছে হরষে কল কলাইয়া
সুতান-ছলে!
শুষ্ক তড়াগে নীচে প'ড়ে নীর
বিফল বাসনা মাছরাঙাটীর
চরণ টলে!
কোথায় গগনে আজিকে বলাকা
হাজার দলে?
সারস-সমাজ কেলি যে করে না
দীঘির জলে!

(৪)

তন্ত্রী আমার এখনো বাঁধি নি
বাদল-তানে!
এখনো জাগেনি আকুল তিয়াস
বিরহী-প্রাণে!
তবে লো প্রকৃতি, অসময়ে হেন
অশ্রু তোমার উথলিছে কেন
অপার মানে?
জরা ও যৌবনে আজি কোলাকুলি
কোন্ ভাব তব নিব মোরা তুলি
কেহ কি জানে?
তন্ত্রী আমার এখনো বাঁধি নি
বাদল-তানে!
এখনো জাগে নি আকুল তিয়াস
বিরহী-প্রাণে!

(৫)

কুন্তলদাম ফেলগো সরায়ে—
মুছগো আঁখি!
অকালে এ সাজ শোভে না তোমায়
কেমনে আঁকি!
সহজ, সরল, সুন্দর সাজে
এস আরবার ধরণীর মাঝে
শিশির মাখি'!
কুয়াসা-আঁচলে ঢাক গো বদন
অমিয়-মধুর বধূর মতন
হৃদয়ে রাখি!
কুন্তলদাম ফেলগো সরায়ে
মুছগো আঁখি!
অকালে এ সাজ শোভে না তোমায়
কেমনে আঁকি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পুস্তক পরিচয়

সাগর সঙ্গীত, সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, বার-এট-ল প্রণীত, রয়েল অষ্টাংশিত, চমৎকার ছাপা, চমৎকার কালী, প্রতি পৃষ্ঠায় সাগরের সুন্দর হাফ্‌টোন ব্লক, তা ছাড়া বহুসংখ্যক অতি সুন্দর হাফ্‌টোন ব্লক আরও আছে। এরূপ সুদৃশ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় বিরল। বিস্তৃত সমালোচনা সত্বর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্যের উল্লেখ নাই।

পল্লী. যুবক কবি শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী প্রণীত, ডবলক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। নূতন ধরণের কবিতা পুস্তক। সমালোচনা সত্বর পত্রস্থ হইবে।

পাষাণের কথা. বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—ভাল বাঁধাই—ভাল কাগজ ও ছাপা—প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়নামতির গান

ভূমিকা।

১৩১৭ সনের শ্রাবণ মাসে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমি কুমিল্লা অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৩১১ সনের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ময়নামতির গান নামক প্রবন্ধ বাহির হয়। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন "শুনিয়াছি ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজা গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল।" বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে, ময়নামতির গান তাঁহারা ছেলেবেলায় পল্লী বৃদ্ধদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, এবং ময়নামতির পুঁথি এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে।

পুঁথি আবিষ্কারের ইতিহাস

তাঁহার নিকট অনুসন্ধানে আরও অবগত হইলাম যে, কুমিল্লা হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত যে অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহার এক অংশ ময়নামতির পাহাড় নামে কথিত হয়। এই অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর টিলায় টিলায় বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ময়নামতির পাহাড় নামে পরিচিত টিলায় ময়নামতির বাড়ী ছিল এবং তাহার অদূরেই গোপীচন্দ্রের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এখনও স্থানীয় লোকে তাহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ময়নামতির পাহাড়ের একটি টিলার নাম অদুনামুড়া এবং অন্য একটি টিলার নাম পদুনামুড়া। ইহা শুনিয়া এবং ময়নামতির পাহাড়ের পশ্চিম দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকারা পরগণা ও ময়নামতির টিলার উত্তর দিকে দেবপুর নামে এক গ্রাম আছে ইহা অবগত হইয়া আমার কৌতুহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। চারি পাঁচ মাস আমি কুমিল্লায় ছিলাম। কুমিল্লা হইতে আসিবার কালে ময়নামতির পুঁথির জন্য অনুসন্ধান করিতে বৈকুণ্ঠবাবুকে অনুরোধ করিয়া আসিলাম। আমি কুমিল্লা পরিত্যাগ করিবার কিছু পরেই বৈকুণ্ঠবাবু কবি ভবানীদাস বিরচিত ময়নামতির পুঁথির আবিষ্কার করেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহী কুমিল্লা রাজবাড়ীর সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও একখণ্ড ভবানীদাসের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবুকে তিনি এই পুঁথি অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে দেন। বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত পুঁথি ও এই পুঁথি, এই দুইটি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া ময়নামতির পুঁথির পাঠ উদ্ধার করেন, এবং তাহা অবলম্বনে ত্রিপুরা সাহিত্য সভার এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩১৮ সনের মাঘ মাসে আমি প্রত্নানুসন্ধানে আবার কুমিল্লায় যাই, এবং বৈকুণ্ঠবাবুকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে ঘুরি। আসিবার সময় বৈকুণ্ঠবাবুর নিকট ভবানীদাসের পুস্তক ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু তাহাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন, এবং তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ সম্বলিত খাতাখানি ও ত্রিপুরা সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধটি আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। প্রবন্ধটি ১৩১৯ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় বাহির হইয়াছে।

দুইটি পুঁথি মিলাইয়া পুঁথির একটি বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার কার্য্য বৈকুণ্ঠবাবু করিয়াছেন; এজন্য তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবু দুই এক স্থানে ঠিক পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি নাই।

ব্যাখ্যা ও পাঠোদ্ধার কাহিনী

ব্যাখ্যাকার্য্য সম্পূর্ণ আমার করিতে হইয়াছে। কেবল দুই এক স্থানে দুই একটি শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা

হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। নানা কারণে ব্যাখ্যা ও এই ভূমিকা আমার মনের মত হইল না। তাহাতে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। ভবিষ্যৎ সংস্করণে যথাসাধ্য এই সকল ত্রুটী পরিহার করিতে চেষ্টা করিব।

১৮৭৩ খৃঃ ১ম খণ্ড নং ৩ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম গ্রীয়ারসন সাহেব দেবনাগর অক্ষরে রঙ্গপুরে প্রচলিত ময়নামতির গাথাটি মুদ্রিত করেন। গাথাটি তিনি এক যুগী জাতীয় বৃদ্ধের মুখের আবৃত্তি শুনিয়া সংগ্রহ করেন। যে বাবুর উপর তাহার নকল করিবার ভার ছিল তিনি গাথাটির প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর কলম চালাইয়া তাহার গ্রাম্যতা সংশোধন করিয়া দেন। সেই অর্দ্ধেক ছাপা হইয়া গেলে পর গ্রীয়ারসন সাহেব তাহা জানিতে পারেন এবং পরে যথাযথ ভাবে গাথাটি মুদ্রিত হয়। ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় দুর্লভ মল্লিক নামক এক কবি বিরচিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত নামক এই গাথার এক পরিচয় প্রকাশিত করেন, এবং পরে সেই গাথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৩১৫ সনের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঙ্গপুরের নিলফামারী সবডিভিসন হইতে দুইটি বৃদ্ধ যুগীর মুখে শুনিয়া এই গাথার এক পরিচয় প্রকাশিত করেন। বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত গাথা এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রীয়ারসনের গাথা ও বিশ্বেশ্বরবাবুর সংগৃহীত গাথা একই কবির রচিত। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

ময়নামতির গাথার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে প্রত্নানুসন্ধানের সময় অর্দ্ধ উড়িয়া অর্দ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই গাথার এক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়া লইয়া আসেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের ভবানীদাসের পুঁথি আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই চারিটি গাথার পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে। সম্প্রতি আমি দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত কোন গ্রাম হইতে আবদুল সুকুর মহম্মদ নামক এক মুসলমান কবি বিরচিত ময়নামতির গানের এক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুঁথিও যথাসম্ভব সত্বর ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে,

"মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।
গোপীচাঁদের গাথার ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥
জনপ্রিয়তা মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণ।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন॥"

এই গোপীপালের গীত যে আমাদের আলোচ্য গোপীচাঁদের গাথা সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যোগীপাল এবং মহীপালের গীত আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু রীতিমত চেষ্টা চলিলে, আবিষ্কৃত হওয়া খুবই সম্ভব। বিষহরির ভাসান গান এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। আর বিষহরির গানের পালার যে কত রচয়িতা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। মঙ্গলচণ্ডীর গীত এখনও উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রচলিত; এখনও অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে শারদীয়া পূজার কয়দিন মঙ্গলচণ্ডীর পালা গাওয়া হইয়া থাকে। চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, এই গাথাগুলি বাঙ্গালা দেশে বড়ই জনপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালা দেশে যে গোপীচাঁদের গাথা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের কবিগণের রচিত গাথা তো পাওয়া গিয়াছেই ভবিষ্যতে আরও যে কত কবির রচিত গোপীচাঁদের গাথা আবিষ্কৃত হইবে তাহা কে

বলিতে পারে। এই গ্রাম্য গাথাগুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু মুসলমান সমভাবে ইহাতে যোগ দিত এবং ইহা উপভোগ করিত। যে পুঁথি দুইখানি হইতে বর্ত্তমান পুস্তকের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল তাহার দুইখানিই মুসলমানের অধিকারে ছিল, এবং লিপিকরও মুসলমান। দিনাজপুর হইতে ময়নামতির গানের যে পুঁথিখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত করিয়াছি তাহা আবদুল সুকুর নামক মুসলমান কবির রচিত। কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন,

সুকুর মহম্মদে ভণে শুনিয়া হিন্দুর পুরাণে
মুসলমানের ইহবানি নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীর নিকট মনসার ভাসান গানের কতগুলি দল ছিল। তাহাদের সমস্তই মুসলমানের গঠিত এবং গায়কও সবই মুসলমান। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমও চট্টগ্রাম হইতে বহু মুসলমান কবির রচনা আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি এই বিষয়ে যাঁহারা এখনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না তাঁহাদিগকে এই বিষয়গুলি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

গোপীচাঁদের গাথা শুধু যে বাঙ্গালা দেশেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এমন নহে, এই গাথা সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে বিশেষ সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে এই গাথা প্রাচীন কাল হইতে গীত হইয়া আসিতেছে। "মারাঠী, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনায় বাঙ্গালী রাজা গোপী চাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প কহিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনা বিশেষের গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে।"* অনতিবৃহৎ জনপদের অধিপতি গোপীচাঁদের গাথার এরূপ জনপ্রিয়তা ও ভারতব্যাপিত্বের কারণ কি?

কারণ অনেকগুলি। গোপীচাঁদ অত্যন্ত রূপবান ছিলেন—গোপীচাঁদের গাথার অনেক স্থানেই তাহার পরিচয় আছে। গোপীচাঁদ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান—বিস্তীর্ণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী—পরাক্রান্ত রাজগণের কন্যাগণের স্বামী। এইরূপ একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই—ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্ব্বে ও পরে মাত্র এক এক বার ঘটিয়াছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে নবজাত পুত্র ছাড়িয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসে বাহির হইলেন—

"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তার।"

গোপীচাঁদের ৫০০ বৎসর পরে নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নবপরিণীতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া—মায়ের বুকে শেল হানিয়া আর এক নিঠুর এরূপে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—সমস্ত ভারতময় একটা অসীম করুণ রসের উচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গলা দেশ এখনও সেই রসধারায় সরস হইয়া রহিয়াছে। কাজেই গোপীচাঁদের করুণ কাহিনীযে, ভারতবর্ষের হৃদয়কে কাড়িয়া লইবে ইহাতে অসাধারণ কিছুই নাই। দ্বাদশ বৎসরের সন্ন্যাসে গোপীচাঁদ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই লোকের মন গলাইয়া আসিয়াছেন এবং বিগলিত হৃদয় জনসমূহ গোপীচাঁদের করুণ কাহিনীকে পুরুষপরম্পরায় উত্তরাধিকারের মত রাখিয়া গিয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে যখন উত্তর ভারতের একতা সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তখন ভারতের মহাদুর্দ্দিনের

* পরলোকগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত "বঙ্গে ব্রাহ্মণরাজবংশ।"

সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লব মাৎস্য ন্যায়ের দিনে বাঙ্গালীর প্রতিভা, মিলন-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অরাজক রাজ্যে রাজার প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; আত্মশক্তির এই আশ্চর্য্য উদ্বোধনে বাঙ্গালার সভ্যতা যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল উত্তরভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলে পর বাঙ্গালা দেশ সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালার ভাস্কর অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে ভারতে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, এবং বাঙ্গালার দীপঙ্কর দীপ হস্তে যাইয়া তিব্বতের অন্ধকার ঘুচাইয়া দেয়। এমনি সময়ে বাঙ্গালার নাথ সম্প্রদায় যখন বাঙ্গালী রাজা গোপীচন্দ্রের অদ্ভুত সন্ন্যাসের কাহিনী গোরক্ষনাথ মীননাথ ইত্যাদির অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনীর সহিত মিশাইয়া দেশে দেশে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, তখন তাহা যে সমস্ত ভারতময় সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

যে নাথধর্ম্মাশ্রিত বর্ত্তমান কালে যুগী বলিয়া পরিচিত জনসম্প্রদায়ের চেষ্টায় গোপীচাঁদের কাহিনী এককালে সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের ইতিহাস কুহেলিকাচ্ছন্ন।

নাথ ধর্ম্ম ও নাথগণ

নাথধর্ম্ম লইয়া এখনও কোন ঐতিহাসিক ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন; তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে নাথধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরে, কিন্তু কালক্রমে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই মতবাদের ভিত্তি কি জানি না, তবে নাথমার্গ, বজ্রযানমার্গ, মন্ত্রযানমার্গ, সহজ সাধনা ইত্যাদি ধর্ম্মপন্থা একই গোষ্ঠীভূক্ত—একটি হইতে আর একটিকে গণ্ডী টানিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশেষিত করা সম্ভবপর নহে। গঙ্গার ধারা যেমন সমুদ্রের কাছে আসিয়া সহস্র ধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মও তেমনি পতনের প্রাক্কালে বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন্‌টি কোথায় যাইয়া লয় পাইয়াছে, কোনটি এখনও ঘন বনান্তরালে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। নাথ-মার্গ কি সেই রূপই একটি ধারা, অথবা পূর্ব্ব হইতেই ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল তাহার বিস্তৃত বিচার এখানে আবশ্যক নহে। আমার বোধ হয়, অথর্ব্ববেদে যে মন্ত্র-তন্ত্রবহুল শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায় নাথ-ধর্ম্ম তাহা হইতেই প্রসূত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-গুলি হইতে নাথ-ধর্ম্মের যে জীবনী শক্তি অনেক বেশী ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি লুপ্ত প্রায়, দুই একটি নাম ভাড়াইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতেছে; কিন্তু নাথধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান, নাথসম্প্রদায় অব্যাহত ভাবে এখনও ভারতের সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছে, এবং বাঙ্গালা দেশে রাজ-কোপে তাহারা সমাজে পৃথক হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাহারা এখনও নগণ্য নহে। চৈতন্যের প্রেম-বন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা-গুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাথউপাধীধারী জনসমূহ এখনও সগৌরবে তাঁহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছে। নাথ-ধর্ম্মের জীবনী শক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বল্লালচরিতে যুগীগণের পুরোহিত দিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অদ্যাপি যুগীগণ শিবগোত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। যুগীদের নাথগণ শিব-অংশে সম্ভূত বলিয়া বিখ্যাত। বর্ত্তমান কালের যুগী-

সমাজে মীননাথ * এবং গোরক্ষনাথ সুপরিচিত এবং হাড়িপ্পা ও কাহ্নুপা নামক যুগীগুরুদ্বয় ও কম বিখ্যাত নহেন। ইহারা প্রকৃতই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন কি না তাহার সমসাময়িক প্রমাণ কিছুই নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ঐতিহাসিকত্বে যেমন কেহ সন্দেহ করে না, যুগী-গুরুগণের অস্তিত্বও তেমনি নিঃসন্দিগ্ধ। পুরুষপরম্পরায় ইঁহাদের অলৌকিক কার্য্য কলাপের কাহিনী বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের ৯ম, ১০ম, ১১শ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনে ইঁহাদের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। অনুসন্ধানে "মীন চেতন" নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার পুনরুদ্ধার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ময়নামতির গানগুলিতে কেবল গোরক্ষনাথ ও হাড়িপার প্রসঙ্গ দেখা যায়। গুরু গোরক্ষনাথের ভারতব্যাপী প্রভাব ছিল। উত্তরপশ্চিম ভারতে "গোরক্ষ" শব্দ সংযুক্ত বহুস্থানের নাম হইতে এবং গোরক্ষনাথের "জলন্ধরি" উপাধি দেখিয়া মনে হয় যে, পঞ্জাবের জলন্ধর নগর তাঁহার জন্মভূমি ছিল। ময়নামতি গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন, হাড়ি জাতীয় হাড়িপার নিকট ময়নামতির পুত্রের দীক্ষা গ্রহণ হইতে বুঝা যায় যে, নাথ সম্প্রদায়ে জাতি ভেদ স্বীকৃত হইত না, এবং গুণ থাকিলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরও গুরুর পদবী ও অধিকার লাভ করা অসম্ভব ছিল না।

নাথধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্ম যে অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তকে এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকে ধর্ম্ম, নিরঞ্জন সর্ব্বত্র ধর্ম্ম এবং নিরঞ্জনের উল্লেখ দেখিয়া তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থ সমূহে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতাগণের উল্লেখ প্রায় দৃষ্ট হয় না—কিন্তু ধর্ম্ম ও নিরঞ্জনের উল্লেখ সর্ব্বস্থানেই পাওয়া যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায়—

তোমার আন্ধার নষ্ট কৈল যেই জন,
নষ্ট কউরুক তার প্রভু নিরঞ্জন॥

২৭ পৃষ্ঠায়

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া রাজা সিঙ্গাতে দিল ফুক,
পুরী থাকি চারি বধূ শুনিতে লাগে সুক।

—ইত্যাদি স্থান তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায় স্মরণীয়। সেখানে ধর্ম্ম নিরঞ্জন ক্রুদ্ধ হইয়া "যবনরূপী" হইয়া হিন্দুদের দেবালয়াদি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। নাথধর্ম্মের প্রধান দেবতা শিব, কিন্তু পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম বা নিরঞ্জনও এই ধর্ম্মে কম সম্মাননীয় ছিলেন না। ধর্ম্ম-পূজা যে বুদ্ধ-পূজারই নামান্তর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তৎসম্পাদিত কবি দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দ চন্দ্রের গীতের ১২ পৃষ্ঠায় অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গে পূজিত ধর্ম্ম ঠাকুরগুলির এক সুবৃহৎ তালিকা দিয়াছেন।

ময়নামতির গানের ঐতিহাসিকতা অতি সাবধানে বিচার্য্য। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই গাথাগুলি সমস্ত দেশময় গীত হইত। রচনা যত প্রাচীনই হউক না কেন, এগুলি মুখে মুখে এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, প্রাচীনত্বের চিহ্ন বড় ময়নামতির বেশী নাই। এই রকম গাথা হইতে গাথার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে ঐতিহাসিকতা হইলে অত্যন্ত সাবধানতা ও সদাজাগ্রৎ বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন। কয়েক জন লেখক এই গাথাগুলি লইয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে যাইয়া উভয়েরই শোচনীয় অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা এই সমস্ত গাথার প্রত্যেক বাক্য বেদ বাক্যবৎ জানিয়া এমন গম্ভীর ভাবে বিপুলায়তন টীকাটিপ্পনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক আলোচনা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুভুক্ষু মাসিক

পত্রের সম্পাদকগণ এই সকল হাস্যজনক রচনা অম্লান বদনে পত্রস্থ করিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক আলোচনার মহা অনিষ্ট সাধিত করিতেছেন।

প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা বিগ্রহপাল দেবের রাজ্য অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং তিনি পূর্ব্বপ্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল স্বীয় বাহুবলে সেই বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন।

গোপী চাঁদের ঐতিহাসিকত্ব

সম্প্রতি কুমিল্লা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নিকটস্থ বাঘাউড়া গ্রামে একটি বিষ্ণু মূর্ত্তির নীচে, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি মহাশয় মহীপাল দেবের রাজত্বের ৩য় বৎসরের একটী লিপি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, বাণগড় লিপিতে উল্লিখিত পূর্ব্বদেশ কুমিল্লা অঞ্চল এবং মলয় উপত্যকা মলয় উপদ্বীপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখানে একটি ঐতিহাসিক সমস্যার আলোচনাও সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। বাণগড় লিপি ও বাঘাউড়া লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চল বিগ্রহ পাল-মহীপালের সময় পাল রাজাদের অধীনে ছিল, এবং মহীপালদেবের অন্ততঃ তৃতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত যে মহীপাল দেবের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, বাঘাউড়া লিপি তাহার প্রমাণ। অথচ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে যখন রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণাংশের উপর দিয়া তাহার বিজয়-বাহিনী চলাইয়া লইয়া যান তখন বাঙ্গলা দেশে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা হইল রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের। মহীপালের সঙ্গে তাহার দেখা হইল উত্তর রাঢ়ে। ইহার অর্থ কি?

বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্রদেবের দুইখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, মহাশয়ের প্রচারিত শাসন হইতে জানা যায় যে, পূর্ণচন্দ্র নামক একজন মহানুভব ব্যক্তির সুবর্ণচন্দ্র নামক পুত্র ছিল। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের রাজ-পদ লাভ করে। রাজ-যোগে জাত তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন। কোথা হইতে আসিয়া এই বংশ সহসা পূর্ব্ববঙ্গে রাজ্যপদ প্রতিষ্ঠিত করিল? শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজ-মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পালবংশের রাজ-মুদ্রা। ইহা হইতে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, চন্দ্র-রাজগণ পাল রাজগণের অধীন রাজা ছিলেন। বিগ্রহপাল যখন অনধিকারীর হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয় তিনি চন্দ্ররাজগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা চন্দ্র উপাধিধারী ক্ষমতাশালী বংশ পালরাজগণের দুঃখের দিনের সঙ্গী হইয়া গৌড় হইতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রে চলিয়া গেলে পালবংশের ক্ষমতা পূর্ব্ববঙ্গে অনেকটা হ্রাস পায় এবং সেই অবসরে সাভারে হরিশ্চন্দ্র, বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্র এবং কুমিল্লায়

অনুবাদ—[বিগ্রহপাল দেবের] সেনা গজেন্দ্রগণ পূর্ব্বদেশের প্রচুর জলে উদর পূর্ণ করিয়া, স্বচ্ছ জল পান করিয়া, তাহার পর মলয়োপত্যকার চন্দন বনে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া, মেঘের মত ঘনীভূত জল ফুৎকার দ্বারা তরুগণের জড়তা বিধান করিয়া, শীতল গিরির নিতম্ব দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। (১১শ শ্লোক) তাহা হইতে অবনীপাল মহীপাল দেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি বাহুবলে যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া এবং অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া সমস্ত রাজন্য বৃন্দের মস্তকে তাঁহার চরণ-পদ্ম নিহিত করিয়াছিলেন। (১২শ শ্লোক)

গৌড় লেখমালার ৯৫ পৃষ্ঠায় "প্রালেয়াদ্রি" অর্থ মৈত্রেয় মহাশয় হিমালয় পর্ব্বত করিয়াছেন—আমি তাহা করিবার কোন হেতু বা আবশ্যকতা দেখিলাম না।

(১১শ শ্লোক)

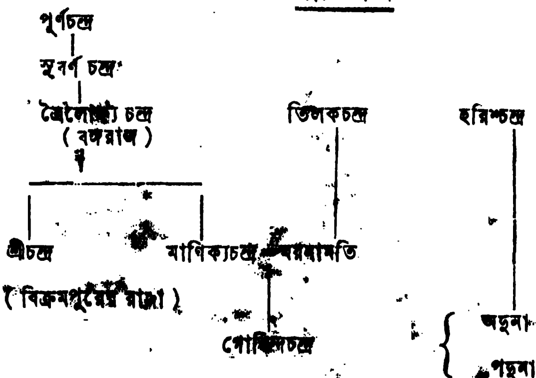
মাণিকচন্দ্র ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত করিয়া প্রায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণ পালবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব বা বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে দেখিতে পাওয়া যায়—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥
(৬৩ পৃষ্ঠা-৮৩ শ্লোক)

এই দুই ছত্রে অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করি। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে অমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার পিতামহের নাম সুবর্ণ চন্দ্র ছিল। একখানা সুপ্রাচীন তাম্রশাসনে এবং আধুনিক গাথার এই মিল দেখিয়া মনে হয় যে, দুর্লভ মল্লিকের কথাতে সত্য রহিয়াছে। মহারাজ ধাড়িচন্দ্র নামে খুব সম্ভব ত্রৈলোক্য চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। ধাড়ি মানে বড়—শ্রেষ্ঠ। এই উপাধি ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পাইবার উপযুক্ত, কারণ তিনিই প্রথম চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ধাড়ি উপাধিদ্বারা যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকেই বুঝান হইয়া থাকে তবে সাভার বিক্রমপুর ও মেহারকুল বা পাটিকারার রাজবংশ ত্রয়ের মধ্যে নিম্নরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিক্রম পুর | মেহারকুল বা পাটিকারা | সাভার



সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্রের কোন পুত্র থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং বিক্রমপুরাধিপ শ্রীচন্দ্রও বোধ হয় অপুত্রক পরলোক গমন করেন। কাজেই হরিশ্চন্দ্রের কন্যাগণের স্বামী এবং বঙ্গরাজ-পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র এই তিন রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাই রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে একমাত্র গোবিন্দচন্দ্রকেই পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি দেখিয়াছিলেন।

চন্দ্র উপাধীধারী রাজগণ পূর্ব্বাঞ্চলের রাজা হইয়াও তাঁহাদের গৌড় অঞ্চলে স্থিত পৈত্রিক সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে না। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজা হইলে অন্য পুত্র মাণিক্যচন্দ্র রঙ্গপুরে অবস্থিত পৈত্রিক সম্পত্তি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সকলেই জানেন রঙ্গপুর জেলায় ময়নামতির কোট ইত্যাদি বিদ্যমান। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি এইস্থানে প্রণিধান যোগ্য। ময়নামতি নিজের জ্ঞান প্রাপ্তির বিবরণ পুত্রকে বলিতেছেন—

শিশুকালে বিভা দিল বাপে আর মায়।
ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাইতুম অবসরায়॥

তাহার পর গোর্ক্ষনাথ সেই "বাপের বাড়ীতে" ময়নামতির দেখা পাইয়া তাহাকে জ্ঞান দিতে মনস্থ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—

তা দেখিয়া গোর্খনাতে মনে মনে ঘুনে
এমন সুন্দরী যাইব যমের ভোবনে॥
অত্রেপা হইল সিদ্ধি খিতির উপর।
এক নাম রাখি যাইমু মেহারকুল সহর॥
ভবানীদাস, ২ পৃষ্ঠা

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥
মোরে বিভা কৈল রাজা অল্প বয়সে।
গেলেন তোমার পিতা মোর বাপের বাসে॥
ধ্যানে দেখিলাম স্বামীর অকাল মরণ।
কেহ না আদরে তারে জিজ্ঞাসে কখন॥

পরিচয় দিমু আমি ধ্যানেতে বসিয়া।
পলাইল তোর পিতা রাক্ষসী বলিয়া॥
সেই হৈতে তোর পিতা না আইসে মোর পাশে।
মোর বাপে কয়্যা রাজা গেল নিজ দেশে॥
তোর পিতা মোর ডরে করয়ে তরাস।
মোর ভয় করি রাজা বঙ্গে গৃহ বাস॥
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ॥

দুর্লভ মল্লিক—৬৩,৬৪ পৃঃ।

ময়নামতি বলে বাছা হইবে অমর।
রাজা বলে তবে কেন বাপ মৈল মোর॥
ময়নামতি বলে বাছা ঐ তাপে মরি।
না শুনিল জ্ঞান কথা গেল জম পুরি।
তোমার পিতা মাণিকচন্দ্র পরম সুন্দর।
আমার যৌবনে টুটে কলেবর॥
উদুনা পুদুনা নহে একলে নাগিনী।
হৃদে বসি পিয়ে মধু জ্ঞান বিনাশিনী॥
যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।
মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোর্ক্ষনাথ মুনি॥

দুর্লভ মল্লিক—৬১ পৃষ্ঠা।

মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতি।

* * * * *

ভাটি হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
আছিল দেড় বুড়ি খাজনা নৈল ১৫ গণ্ডা।

গ্রীয়ারসন (Greerson).
J. A. S. B. 1873. Part I, No. 3.
P. 149, ll. 6, 12, 13.

মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্ম্মী বড় রাজা।
ময়নাকে বিভা করিল তার দও বুড়ি ভারযা॥
ময়নাকে বিভা করিল রাজার না পুরিল মনের আশ।
তার পরে দেবপুরের পাঁচকন্যা বিভা করে পুরি নিল
রাজার হাভিলাষ।
দেবপুরের পাঁচকন্যা ডাহিনী মএনা কোন্দল নাগিল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ—সাহিত্য—পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৫, ২য় সংখ্যা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙ্গালা সাহিত্য পরিচয়ে উদ্ধৃত।

বৃদ্ধ রাজা যমে নিছে গৌড়ের গোসাই।
কি বুঝিছ গোপীচন্দ্র তোর নাই ঠাই॥

ভবানীদাস—৮ পৃঃ, পাদটীকা।

গঙ্গা বোলে ময়নামতি কাঁদ কি কারণ।
মোর হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার চরণ॥
মেহারকুলের রাজা ছিল মাণিক চাঁদ গোসাই।
পৃথিবীতে জলমএ পুরীতে স্থল নাই॥

ভবানীদাস—১৫ পৃষ্ঠা।

সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে হইলে কি কি ছাড়িয়া যাইতে হইবে গোপীচাঁদ তাহার তালিকা মাতা ময়নামতিকে দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আছে—

এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া।
নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বাণিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কমলাঙ্ক নগর॥

ভবানীদাস—৬পৃষ্ঠা।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে যে কেহ নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গুলিতে উপনীত হইতে পারিবেন।

গৌড় অঞ্চলে মাণিক্যচন্দ্রের ভূসম্পত্তি ছিল। মাণিক্য-চন্দ্র গৌড় হইতে আসিয়া কমলাঙ্কের রাজা তিলকচন্দ্রের অল্পবয়স্কা একমাত্র কন্যা ময়নামতিকে বিবাহ করেন, এবং গৌড় পরিত্যাগ করিয়া ঘর জামাইর মত থাকেন। ময়নামতি বাপের বাড়ীতে গোরক্ষনাথের নিকট "জ্ঞান" লাভ করিয়া মন্ত্রতন্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র স্বীয় স্ত্রীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। অধিকন্তু

* কুমিল্লার ময়নামতির টিলার এক মাইল উত্তরে দেবপুর নামক এক গ্রাম এখনও আছে।

সিদ্ধদেহা স্ত্রীর সাহচর্য্য তাহার অসিদ্ধ দেহে সহ্য হইত না। মনের দুঃখে তিনি দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।* ঘর জামাইর অদৃষ্ট সর্ব্বকালেই সমান। মাণিকচন্দ্রকে শ্বশুর বাড়ী বড় কেহ খাতির করিত না। ময়নামতির সহিতও দেবপুরের পাঁচকন্যার বনিবনাও হইত না। কাজেই ছয় মাসের গর্ভবতী ময়নামতিকে রাখিয়া শ্বশুরকে বলিয়া ঘর জামাইর আসন পাট উঠাইয়া মাণিকচন্দ্র নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। তিনি কোথায় মরিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না, কারণ রঙ্গপুরের গাথা ও বর্ত্তমান ভবানীদাসের পুঁথিতে এই বিষয়ে মিল নাই। তবে ময়নামতিকে ছাড়িবার অত্যল্প কাল পরেই মাণিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বুকাননের (Buchanon) পুস্তকে এবং গ্রীয়ারসনের প্রবন্ধে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল নামক একব্যক্তির সঙ্গে ময়নামতির যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সাভারের হরিশ্চন্দ্র না কি ময়নামতিকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে যাইয়া নিহত হন। রঙ্গপুরে ময়নামতির কোটের অনতিদূরে ধর্ম্মপালের গড় এবং হরিশ্চন্দ্রের পাট থাকার কথাটিতে সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ধর্ম্মপাল কে?

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে দেখিতে পাই যে, তিনি দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ বিহারে এক ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সারনাথ লিপিতে (গৌড়লেখমালা, ১০৪ পৃঃ) দেখিতে পাই যে, মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক দুইজন পাল্লোপাধিক ব্যক্তিকে নানা জীর্ণ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা মহীপালের আত্মীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। পালোপাধিক দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপালও মহীপাল দেবের কোন আত্মীয়ই হইবেন। মহীপালের প্রতিনিধি স্বরূপ বোধ হয় তিনি দণ্ডভুক্তি শাসন করিতেছিলেন। বোধ হয় এই ধর্ম্মপালেরই বাড়ী ময়নামতির কোটের পাশে ছিল, এবং মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি মাণিকচন্দ্রের সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবার চেষ্টা করায় তাহার সহিত নাবালক গোপীচাঁদের স্বত্ব রক্ষা করিতে কৃতনিশ্চয় ময়নামতির ও তাহার পক্ষাবলম্বী বৈবাহিক হরিশ্চন্দ্রের যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। অবশ্য এগুলি কেবল যুক্তি সঙ্গত অনুমান মাত্র, ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই। গ্রীয়ারসন মাণিকচন্দ্রকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ে মামাত পিস্তুত ভাই হওয়া অসম্ভব নহে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর শিশু গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র "দাদার মিরাশ" মেহারকুল রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন। মাতা ময়নামতি তাহার অভিভাবিকা স্বরূপ রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। অল্প বয়সেই ময়নামতি সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় অদুনা ও পদুনার সহিত গোপীচাঁদের বিবাহ দেন। গোপীচাঁদ আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, যথা—

> এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
> সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা॥
> আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
> আর বিভা করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া॥
> দশ দিন লড়াই কৈল উড়িয়া রাজার সনে।
> চৌদ্দ বুড়ি মণিষ্য কাটিলাম এক দিনে॥
> চৌদ্দ পৌরন মণিষ্য কাটি সাত শত লস্কর।
> হস্তীঘোড়া কাটিলাম তুষকি হাজার॥
> যুদ্ধেত হারিয়া নিপে গেল পলাইয়া।
> তার বেটি বিভা কৈলুং মহিম জিনিয়া।

* ময়নামতির গাথাগুলি অবলম্বনে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ঐতিহাসিক হিসাবে যে তাহার মূল্য বড় বেশী নহে পূর্ব্বেই তাহার একবার আভাস দিয়াছি। তবে "নাই মামার চেয়ে" ইত্যাদি বচন স্মরণ করিয়া এই সকলের প্রতি আনাদর দেখান উচিত নহে।

উড়িয়ায় যুদ্ধব্যবসায়ী দিগকে খণ্ডাইত বলিত। "খাণ্ডাএ" জিনিয়া যে মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া গোপীচাঁদ গর্ব্ব করিতেছেন তাহা বোধ হয় উড়িয়া দেশেরই কাহারও মেয়ে। কিন্তু গোপীচাঁদের চতুর্থ স্ত্রীর পিতা এই উরুয়া রাজাটি কে? আমার ত খুব সন্দেহ হইতেছে যে, ইনি রাজেন্দ্র চোল ভিন্ন আর কেহই নহেন। উড়িয়া অঞ্চল হইতে আগত বলিয়া ইঁহাকে উরুয়া বা উড়িয়া রাজা বলা হইয়াছে। উড়িয়া রাজার সঙ্গে যে গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল দেখা যাইতেছে যে, কবি ভবানীদাসের সময় পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। গোবিন্দচন্দ্রের গর্ব্বোক্তিতে যদি সত্য থাকে (এবং থাকা অসম্ভব কিছুই নহে) তবে ইহা যুদ্ধের চিরন্তন আনুসঙ্গিক রহস্যের—উভয় পক্ষের বিজয় গৌরব দাবীর—একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! রাজেন্দ্র চোল তিরুমলয় লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, জয় করিয়াছিলেন তিনি,—ঝড়বৃষ্টি সমাচ্ছন্ন বাঙ্গাল দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়াতুর গোবিন্দচন্দ্র হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন! এদিকে ভবানী দাসের গাথায় গোপীচন্দ্রের গর্ব্বোক্তি সত্য বলিয়া ধরিলে দেখা যায় যে, ১৩০০ বৎসর পরে পূর্ব্বাঞ্চলে সেলুকাস্ চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় পুনরাভিনীত হইয়াছিল। উড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোল যুদ্ধেতে হারিয়া পলাইয়া যান। গোবিন্দচন্দ্র মহিম * নামক স্থান অধিকার করেন, এবং অবশেষে রাজেন্দ্র চোল কন্যা দান করিয়া পরিত্রাণ পান।

গোপীচাঁদ বর্ত্তমান কুমিল্লার পাঁচ মাইল দূরস্থিত ময়নামতি বা লালমাইর পাহাড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লালমাইর পাহাড় প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ। তাহার প্রত্যেক মুড়ার শীর্ষে প্রাচীন প্রাসাদাবলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুড়াগুলির অবস্থান এমন সুন্দর এবং সেগুলি স্বভাবতঃই এমন সুরক্ষিত যে, গোপীচাঁদের পছন্দ দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই একবার এই মুড়াগুলি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছি। ভবানীদাসের গাথার অন্যান্য যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়, রঙ্গপুরের দুর্ল্লভ মল্লিকের, সুকুর মহম্মদের এবং ময়ূরভঞ্জের গাথার সহিত তাহাদের মিল নাই। আমরা সে গুলির স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না। কেবল যেখানে বেশ্যাগৃহে গোপীচাঁদ আবদ্ধ ছিলেন সে স্থানটি ভবানীদাসের পুঁথি ছাড়া অন্য সমস্তগুলি গাথায়ই প্রায় একই নামে উক্ত হইয়াছে—তাহা শ্রীকলিঙ্গের বন্দর। শ্রীকলিঙ্গের বন্দর শব্দদ্বারা কোন স্থানকে বুঝাইতেছে। তমলুক নয় ত?

মেহারকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মুকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকা নগর বলিয়া এই স্থানদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। সুকুর মহম্মদ মুকুল লিখিয়াছেন। দুর্ল্লভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে যে প্রাচীনকালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে এখনও পূর্ব্বাঞ্চল বাসীদিগকেই বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতি পাহাড়ের আশে পাশে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় ভূপ্রোথিত কয়েটি বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভের কথা আমি অবগত হইয়াছি। ইহাদের গাত্রে হয়ত খোদিত লিপি থাকিতে পারে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এই অঞ্চলে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে বলিতে গেলে কোন অনুসন্ধানই হয় নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কে হইয়াছিল জানা যায় না। ভবানীদাস বলিয়া গিয়াছেন, "গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া।" গোবিন্দচন্দ্রের হস্ত হইতেই

* মহিম কোথায়? কঙ্কণ প্রদেশে না কি মহিম নামক একটি জনপদ আছে।

বোধ হয় বর্ম্মরাজগণ পূর্ব্বাঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান গাথার রচয়িতা ভবানীদাসের পরিচয় বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ভবানীদাসের কবি ভণিতায় নিজের নাম ভিন্ন আর কোথাও কিছুরই উল্লেখ করেন নাই।

পরিচয়

তবে ভাষার নমুনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের লোকই হইবেন এবং ৩০০শত ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার কবিত্ব-ভাণ্ডার যে ময়নামতির গাথা রচনা করিয়া রিক্ত হইয়া যায় নাই, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার উনবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় শিলচর নর্ম্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভবানীদাস রচিত রামের স্বর্গারোহণ এবং লক্ষ্মণের দিগ্বিজয় নামক দুইখানা পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। ভণিতায় এক স্থলে ভবানীদাস ষষ্ঠীবর-সুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ষষ্ঠীবর সুত বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে বুঝাইতেছে যে, ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। এই ষষ্ঠীবর কে? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫০৪ পৃষ্ঠায় (৩য় সংস্করণে) এক ষষ্ঠীবরের পরিচয় পাই। ষষ্ঠীবরের গঙ্গাদাস নামে পুত্র ছিল। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "ইহাঁরা উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন বিব্রত ছিলেন। পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। * * * কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥"

ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। এরূপ অনুমানের আরও অনেক কারণ আছে। ষষ্ঠীবরের গঙ্গাদাস নামক পুত্র থাকায় এবং ভবানীদাসেও গঙ্গাদাস নামসাদৃশ্য থাকায় মনে হইতেছে ভবানী দাস এই প্রতিভাশালী কবিরই পুত্র ছিলেন। এই বৈদ্য কবি-পরিবার আরও কবির জন্ম দিয়াছিল বলিয়া মনে করি। দীনেশ বাবু রাজেন্দ্র দাস নামক কবির আদি পর্ব্বের পরিচয় দিয়াছেন, (তৃতীয় সং ৫১৯ পৃষ্ঠা) এবং আমাদের নিকট শ্যামদাস সেন নামক কবি রচিত ময়নামতির গানের সমশ্রেণীর "মীনচেতন" নামক পুস্তক আছে। ষষ্ঠীবরের বাসস্থান "দিনার দ্বীপ" ছিল বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। দিনার দ্বীপ কোথায়?

জগদানন্দ ও জয়চন্দ্র

ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক এক সমৃদ্ধ ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবানীদাস রাজা জয়চন্দ্র নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায়। এই মহানুভব দ্বয়ের পরিচয় প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইঁহারা বোধ হয় পিতা-পুত্র ছিলেন। জয়চন্দ্রের আদেশে ভবানীদাস কর্ত্তৃক অনুদিত চণ্ডীর একখানা তাল পাতার পুঁথি ঢাকা পরিষদে আছে।

তৎকালীন আচার ব্যবহার

ভবানীদাসের পুঁথি হইতে বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, তৎকালীন পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কার, সৈন্য সামন্ত, বহুবিবাহ, জুড়নি প্রথা, ব্যাভারে কন্যাদান, দ্রব্যমূল্য, ভূমির খাজানা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই স্বল্পায়তন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের পাঠ-সুখ নষ্ট করিব না।

কবিত্ব

ভবানীদাসের কবিত্ব স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাণীগণের বিলাপের স্থলটির উল্লেখ হইতে পারে। স্থানে স্থানে সুকুর মহম্মদের পুস্তকের সঙ্গে ভাব ও ভাষার ভবানী দাসের আশ্চর্য্য মিল আছে। সুকুর মহম্মদের

পুস্তক প্রকাশিত করিবার সময় সেই সমস্ত স্থল দেখান হইবে।

ভবানীদাসের ভাষায় অনেক স্থানে অনেক শব্দের সংস্কৃত ও বর্ত্তমান বাঙ্গলার মধ্য-
ভাষার প্রাচীনত্ব
বর্ত্তী আকৃতির ব্যবহার দেখিতে পাই। যথা—

"তা শুন্যিয়া চারি বধূ বুক্কে মারে ঘাও" (১৬ পৃষ্ঠা) তা ছাড়া তুহ্মি, আহ্মি ইত্যাদিও আছেই। অনেক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার বিশেষত্ব আমরা এখন আর অবগত নহি, যথা, রাগ লগিয়ত, সিন্দুরা পয়ার, পরিতাল ছন্দ ইত্যাদি।

প্রাচীন পুস্তকের সম্পাদন বিষয়ে একটি কথা চিন্তনীয়। পাঠোদ্ধার করিয়া কি অবিকল তাহাই মুদ্রিত করা উচিত? না শুধু ভাষার ও বর্ণ বিন্যাসের বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া অনাবশ্যক ও অনুচিত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত? আমার ত মনে হয় যে, লিপিকারদের স্পষ্ট ভুল গুলি মুদ্রিত করিয়া বৃথা আমরা প্রাচীন সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি। বর্ণবিন্যাসের ও ভাষার বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া সুসংস্কৃত করিয়া পুস্তক বাহির করিলেই বোধ হয়, ভাল হয়। এই পুস্তক সম্পাদনে আমরা অনেকটা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি।

পুস্তকের প্রুফ আমি নিজে দেখিতে না পারায় এবং অন্যান্য কারণে অনেকগুলি ভ্রম প্রমাদ হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	১৭	থুলিয়া	খুশিয়া
২	১	২২	সর্ব্বগাত্র	সর্ব্বজএ
৩	১	৬	আপন সুক্য	আগল সুক্য
৩	২	১২	বিক্ষিক্ষা	বক্ষিব
৭	১	১২	ভিত	ভিতর
৭	১	৮	রন্মদেখা	রনদেখা
১১	১	২১	সর্ব্বগাত্র	সর্ব্বজএ
১১	১	২৯	খাত্তাত্র	খাওাএ
১১	২	২৩	তুহ্মি	তুহ্মি
১৩	২	৫	তরে	তবে
১৪	১	৫	গুপচাদ	গুপিচাদ
১৪	১	৮	বছাইল	বিছাইল
১৪	২	২৩	ওমি	তুমি
১৫	১	৬	পস্ত	পস্ত
১৬	১	২৫	সর্ব্বগাত্র	সর্ব্বজএ
১৬	২	১৬	আমরর	আমরার
১৬	২	২০	কানিয়া	কালিয়া
১৭	১	৩২	ছুড়ি	নিক্তি
১৯	১	৪	ওরমান	তুরমান
১৯	২	২৩	সর্ব্বগাত্র	সর্ব্বজএ
২১	১	২৬	যমের	জলের
২১	২	২৫, ২৯	সাকত্তা	সা ক ওা
২৪	১	১৮	সন্ত্র	মন্ত্র
২৮	২	৯	জল	জন

ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। এই পুস্তক সম্পাদন বিষয়ে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ পাইয়াছি এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব ময়নামতির গান লইয়া প্রতিভায় আলোচনা করিয়া সম্পাদনের দুই একটি দোষ ক্রটী দেখাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ত্রিপুরা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুঁথি এবং হরিন্দরা পাঠশালার শিক্ষক শ্রীযুক্ত সোভন গাজির পুঁথি এই দুই পুঁথি মিলাইয়া বর্ত্তমান পুস্তকের পাঠোদ্ধার হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।*

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ
১লা শ্রাবণ, ১৩২১ } শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ ভাদ্র, ১৩২১ ৫ম সংখ্যা

পুরীর সিন্ধুতরঙ্গ

কখন রবি বস্‌ল পাটে,
নাই কেউ আর শূন্য ঘাটে,
ব'সে আছি একা.
দেখ্‌ছি চেয়ে অবাক্ হ'য়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছ বয়ে.
আঁক্‌ছি জলে রেখা।
তোমার গভীর বিদার করে'
তরঙ্গ সব যেমন জোরে
উঠে. আবার লুটে,
তেমনি প্রাণে কত কথা.
কত কালের হরষ-ব্যথা
ফুটে আর টুটে।
তুমি যেমন উঠ্‌ছ পড়ে'
ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠ ছ গড়ে,'
কে পারে তা আর ?
কত রাজা, রাজ্য এল.
তোমার গর্ভে গড়িয়ে গেল,
কোথায় চিহ্ন তার !
কই বায়রণ, স্যুইনবরণ,
নবীন, দ্বিজেন কোথায় এখন.
লিখ্‌ল তোমার কথা !
নেমকহারাম, তোমার লাগি
গাঁথ্‌ছি মালা নিশি জাগি,
আমিও 'সাকিন তথা' !

থাক্‌গে তত্ত্ব, জ্যোৎস্নায় ভরে'
অকূল উঠ্‌ছে আকুল করে,'
—বাঁধি ভাষার ডোরে.
জলের মাঝে ওই যে আগুন,
আজ্‌কে তারে করি রে 'গুণ'
আঁখির অঘোর লোরে !
পিছে ফেলে' মুখর সহর
দাঁড়িয়ে গেছে ঝাউয়ের বহর,
দেখ্‌ছে জলে নাট,
দেখ্‌ছে শ্রীমন্দিরের চূড়া
এই গড়ে, এই হয় গুঁড়া
তোমার যত ঠাট্
বাতাস এসে মারছে ঠেলা,
তীরে নীরে কর্‌ছে খেলা,
কাঁপ্‌ছে বালির বাঁধ,
কিরণ-কিরীট জলে মাথে.
ঢেউগুলি সব রঙ্গে মাতে,
হাস্‌ছে ভাসছে চাঁদ।
শোন্ রে, হা-হা-র ফাঁকে ফাঁকে
ওপার এপারেরে ডাকে,
মিলন-সেতু পাথার !
জলের আগুন সুধামাখা,
আয় পতঙ্গ পুড়িয়ে পাখা,
ওড়া নয়, আজ সাঁতার !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বাঙ্গলা
"সাধুভাষা" ও "উচ্ছৃঙ্খল ভাষা"

কোন কোন বাঙ্গলা লেখকের ভাষা সংস্কৃতবহুল, আর কোন কোন লেখকের ভাষায় কথিত শব্দেরই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রথমোক্ত ভাষাকে কেহ কেহ "সাধুভাষা" ও দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাকে "কথিত বা উচ্ছৃঙ্খল ভাষা" নাম দিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, উভয়বিধ ভাষার মধ্যে "সাধু ভাষাই" সকলের লেখা উচিত। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে, যে সমুদয় লেখক বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই "উচ্ছৃঙ্খল" জাতীয়। ইঁহাদের লেখাই সমাজের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষা দু'এক জন লোকের সম্পত্তি নহে, উহা সুবিশাল সমাজের সম্পত্তি বটে। সুতরাং যে ভাষাকে বাঙ্গলার মনুষ্য-সমাজ বুঝিয়া থাকে ও বলিয়া থাকে, যে ভাষা বাঙ্গালী হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ তাহাকেই আমরা বঙ্গভাষা বলিব।

এক দিকে যেমন এক জাতীয় "উচ্ছৃঙ্খল" লেখা নূতন সাহিত্য-যুগের আনয়ন করিয়া সহৃদয়-হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে অপর দিকে, শতশত নগণ্য "উচ্ছৃঙ্খল" লেখকের লেখনী হইতে শত শত লেখা নিঃসৃত হইতেছে, এবং কিয়ৎকাল মাত্র দিবা-প্রদীপের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া, বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইতেছে। এরূপ লেখা পড়িয়া কেহ সুখও পায় না, আর এইরূপ লেখা জন সমাজ পড়েও না। তাহা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ লেখা অত্যল্পক্ষণস্থায়ী, উহা সাহিত্য-সমাজের কোনও বিশেষ অপকার করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি সমালোচকের বাক্য-ব্যয়েরও প্রয়োজন নাই, ইহা সমালোচনারও অযোগ্য। তবে, এইমাত্র দেখা উচিত যে, ইহা বিদ্যালয় পাঠ্যরূপে গৃহীত না হয়।

দর্শন-শাস্ত্র বল, ধর্ম্মশাস্ত্র বল, সাহিত্য-শাস্ত্র বল, প্রত্যেক শাস্ত্রই সমাজের এক একটী অখণ্ড অভিমত সমষ্টি (Expression of Public opinion) বটে। যে শাস্ত্র জন-সমাজের মনোমত নহে, সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে, সে শাস্ত্র সমাজকে শাসনই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, উপর্য্যুক্ত "উচ্ছৃঙ্খল" জাতীয় সাহিত্যও যদি বিশাল জন-সমাজের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারে, তবে তাহাই আমাদের সাহিত্য শাস্ত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিলেও উহা আমাদের সাহিত্য শাস্ত্র। যদি উহার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য সর্ব্বসাধারণের বিশাল ও গভীর হৃদয়কে চমৎকৃত করিতে পারিয়া থাকে তবে উহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করা সমালোচকের দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ আজকাল সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি উদাসীন লেখকগণের রচনা সমাজের যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে খাঁটী "সাধুভাষা" তদ্রূপ হইতে পারে নাই। এই শ্রেণীর লেখকও বিরল। সমাজের বিশাল হৃদয়টাই যে কলুষিত হইয়াছে, এবং সমালোচকের হৃদয়ই অনাবিল রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না। আর যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে তবে এ রোগ অচিকিৎস্য বটে।

প্রত্যেক প্রচলিত ভাষার এক একটী অনন্যসাধারণ দৃঢ় জীবনী শক্তি আছে। উহারা প্রত্যেকেই চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর ন্যায় প্রাকৃতিক পদার্থ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবয়বী এবং স্বতঃ পবিত্র। কুলেখক-প্রদত্ত শতশত আবর্জনাও উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং তাহা লইয়া হৈ চৈ করিয়া এবং নিরঙ্কুশ কবিদের প্রতি "উচ্ছৃঙ্খল ভাষা" লিখিও না, "সাধুভাষা" লিখিও এইপ্রকার ফরমাইশ্ (আদেশ) দেওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়ক না হইলেও বৃথা বটে।

কোনও লেখকের লেখা তাঁহারই মূর্ত্তিমান্ মহাপ্রাণ। যে লেখকের যেরূপ প্রতিভা তিনি তদ্রূপই লিখিবেন। তাঁহার লেখা তাঁহার প্রকৃতি লঙ্ঘন করিয়া সমালোচক বা গ্রাহকের আদেশ অনুসরণ করিতে পারে না, করিলে সেই লেখা লেখাই নহে, তাহা নির্জ্জীব, প্রাণহীন। সমুদয় লেখকই কোনও বিষয়ে লিখিবার কালে তাঁহাদের প্রতিভাকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে লেখক "সাধুভাষাময়" তিনি সাধুভাষায় লিখিবেন: আর যিনি "উচ্ছৃঙ্খল" তিনি "উচ্ছৃঙ্খল" ভাষাই লিখিবেন। কুসুম কাননে নানা পুষ্পেরই বৃক্ষ থাকে, নানা পুষ্পই স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এক জাতীয় বৃক্ষে কখনই অন্য জাতীয় পুষ্প জন্মিতে পারে না।

সাহিত্যসেবিগণ ভাবে যেমন মুগ্ধ হয়েন, ভাষায় তদ্রূপ হয়েন না। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা পাইলে, "সোনায় সোহাগা" বলিয়া মনে করেন। যে লেখকের ভাষা যত স্বচ্ছ ও স্বভাবসিদ্ধ. যে লেখাতে লেখকের মনের ভাব অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই লেখাকেই আদর করিতে সাহিত্য সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে কোন্ শ্রেণীর ভাষা থাকা উচিত সে বিষয়ে এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। "সাধু ভাষা"ই হউক আর "উচ্ছৃঙ্খল ভাষা"ই হউক, প্রতিভাশালী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লেখকের রচিত সাহিত্যই পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তবেই সাহিত্যের আবর্জ্জনারাশি বহু পরিমাণে কমিয়া আসিবে।

এক দিকে, একদল সমালোচক যেমন বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতপ্রায় করিতে চাহেন, অপর দিকে আজকাল আর একদল সমালোচক বঙ্গভাষাতে বহুপরিমাণে আরব্য ও পারস্য শব্দ ঢুকাইতে চাহেন। ফরমাইসে তৈয়ারী (made to order) বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে ইহা পারা যায় বটে, কিন্তু, আরব্য ও পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রকৃত সাহিত্যিকের লেখায় তাহা ঢুকান অসম্ভব। আর যদি বঙ্গভাষার ভাগ্যে এমন শুভ দিনই কখনও উদিত হয় যে, আরব্য ও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ প্রতিভাশালী লেখক আরব্য ও পারস্য-শব্দবহুল বঙ্গভাষা লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য চমৎকৃত করিতে পারেন তবে তখন সেইরূপ ভাষাই জন সমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মদিরার মাধুরী

(হাফেজ হইতে)

এস নদী-তীরে এস, সুন্দরী, এস গো ইরাণী বালা,
প্রতি পিয়ালায় দাও ডুবাইয়া যত সংসার-জ্বালা।
গোলাপের মত জীবন মোদের দশটি দিনের খেলা
হাসির সোনার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধো তায় এই বেলা।
যত নীচমনা শক্রর কথা করোনাক প্রত্যয়, --
সুরার প্রমোদ-ঝরণার তলে গাও রে তাহার জয়।
যুবার কৃপায় ভুলাও তাহারে—ভুলিয়াছে যেবা মোরে
সীধুর কণ্ঠে শুধু বাসনার বিরামের গান করে'
নিঠুর আঘাতে ছিঁড়েছে যাহার প্রণয়ের আশালতা
কে বাঁচাবে তা'য় সুরা বিনা হায়!

কে ঘুচাবে তার ব্যথা!

যৌবনে সুরা সুমধুরতম সকল সুখের সার
আছে যত দিন যৌবন ধন, রেখ মর্য্যাদা তার
যৌবন, রূপ.—এই দুটা তটে সুরার তটিনী দুলে,
তরুণ অধর. মদিরা সুধায় স্বর্গীয় করে' তুলে।
মান ,অপমান, লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, প্রতিহিংসার কথা
সুরার সায়রে দাও গো ডুবায়ে সব অন্তর-ব্যথা।
ভরি লও সুরা শোণিত-শিরায় ওগো নীরক্ত ম্লান,
শুষ্ক হৃদয়-বেলায় আসুক প্রেমানন্দের বান।

স্বর্ণ বরণে উঠুক উজলি তাম্র বরণ তার
সুরার অনলে জ্বলিয়া উঠুক গ্লানির অন্ধকার।
এ দিন দুনিয়া সুধায় গরলে সদা সুখে দুখে ভরা
কাঁটা কুসুমের মাঝে এ যে মধু,সব তাপ-জ্বালা-হরা।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বপ্নবাসবদত্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজা ও বিদূষক উভয়ে মাধবীকুঞ্জের দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

বিদূ। এই যে সমুদ্র গৃহ—মহারাজ ভিতরে যান।

রাজা। তুমি আগে যাও।

বিদূ। আচ্ছা, আমিই যাব আগে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মহারাজ আসবেন না! দাঁড়ান!—দাঁড়ান!

রাজা। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

বিদূ। আর কেন? প্রদীপের আলোকে পরিষ্কার দেখছি গৃহতলে একটা সাপ!

রাজা। (প্রবেশ করিয়া ও দেখিয়া)

হায়! মূর্খের চক্ষে এটা সাপই বটে! মূর্খ, দরজায় যে একটা মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাই নীচে প'ড়ে গিয়েছে; সেই মালাটারই খানিকটা সোজা ও খানিকটা কুটিল ভাবে প'ড়ে আছে ব'লে সাপের মত দেখাচ্ছে; আর মন্দ মন্দ বায়ুতে একটু একটু নড়ছে ব'লে বোধ হচ্ছে যেন একটা সাপ ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে।

বিদূ। (দেখিয়া) হাঁ মহারাজ ঠিকই বলেছেন—এখন দেখছি এটা সাপ নয়—কিন্তু মহারাজ ত বড় নিরাশ হলেন! রাণী পদ্মাবতী এখানে এসে চলে গিয়েছেন!

রাজা। বসন্তক, এটাও তোমার ভুল; পদ্মাবতী মোটেই এখনও এখানে আসেন নি।

বিদূ। আপনি কি ক'রে বুঝলেন?

রাজা। এই যে দেখ্‌ছ না,—

বিছানাটি একটুও ফুলে প'ড়ে নি, বিছানার চাদরখানা সটান ও সমান বিছান রয়েছে, একটুও ঘোচ হয় নি। মাথার ওষুধ লেগে ধপ্‌ধপে পরিষ্কার বালিশটি একটুও মলিন হয় নি। আর সাধারণতঃ চক্ষুর প্রীতি-সাধনের জন্য রোগীর শয্যাগৃহের একটা কিছু শোভা সংসাধন করা হয়, এখানে তাও কিছু করা হয় নি: আরও একটা কথা আছে—রোগী একবার শু'লে শীগ্‌গির শয্যা ছেড়ে ওঠে না।

বিদূ। তা' হ'লে মহারাজই এই শয্যায় খানিক ক্ষণ ব'সে রাণীর জন্য অপেক্ষা করুন।

রাজা। আচ্ছা, তাই কচ্ছি। (বসিয়া) বয়স্য, বড় ঘুম পাচ্ছে। একটা গল্প বল না?

বিদূ। আচ্ছা আমি গল্প বলছি, আর আপনি হু, হু করুন।

রাজা। বেশ।

বিদূ। উজ্জয়িনী ব'লে একটা নগর আছে। সেখানে কি ক'রে কার্য্যের ফল লাভ করা যায় লোকের এ জ্ঞানটা বড় সুন্দর।

রাজা। সখা, উজ্জয়িনীর গল্প বল্‌ছ কেন?

বিদূ। যদি এই গল্পটা মহারাজের ভাল না লাগে তবে আর একটা বলছি।

রাজা। বয়স্য, এই গল্প যে আমার ভাল লাগ্‌ছে না তা নয়। উজ্জয়িনীর কথায় আমার অবন্তী-রাজকুমারীর কথা মনে হচ্ছে—উজ্জয়িনী ছেড়ে আসবার সময় আত্মীয়-কুটুম্বগণের কথা মনে ক'রে তার চোখ জলে ভ'রে গিয়েছিল, আর প্রবৃদ্ধ অশ্রুবিন্দুগুলি বক্ষ সিক্ত ক'রে ঝ'রে পড়ছিল—তারপর অনেক সান্ত্বনার ফলে সে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এত উন্মনস্ক হ'য়ে বীণা বাজাতে লাগ্‌ল যে, বীণার কাঠী তারে লাগছে কি না তাতে লক্ষ্য নেই, শূন্যেই কাঠী চালাচ্ছে। সে ছবি এখনও আমার চোখে লেগে রয়েছে।

বিদূ। আচ্ছা, তবে আর একটা গল্প বলছি। ব্রহ্মদত্ত নামে একটা নগর আছে—সেখানে কাম্পিল্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন।

রাজা। কি বল্‌লে?

বিদূ। ব্রহ্মদত্ত নামে একটা নগর আছে—সেখানে কাম্পিল্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন।

রাজা। আরে মূর্খ, রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত, আর নগরের নাম কাম্পিল্য।

বিদূ। কি বল্লেন মহারাজ! রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত! আর নগরের নাম—কাম্পিল্য!

রাজা। হাঁ।

বিদূ। আচ্ছা, আপনি একটু চুপ ক'রে থাকুন, ততক্ষণ আমি এই দুটো নাম আওড়িয়ে নি—হাঁ, হয়েছে রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত, আর নগরের নাম কাম্পিল্য—আচ্ছা, এখন শুনুন—কি মহারাজ! ঘুমিয়ে পড়লেন? বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, যাই আমিও গায়ের চাদরখানা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তা ও চেটীর প্রবেশ

চেটী। আর্য্যা, আসুন। রাজকুমারী মাথাব্যথায় বড়ই কাতর হয়েছেন।

বাস। পদ্মাবতীর বিছানা হয়েছে কোথায়?

চেটী। শুনেছি সমুদ্রগৃহে।

বাস। আচ্ছা, তুমি আগে আগে যাও, আমি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। (উভয়ের পরিক্রমণ)

চেটী। এই যে সমুদ্রগৃহ। আপনি ভিতরে যান। আমি একটা প্রলেপ নিয়ে আসছি। [নিষ্ক্রান্ত।

বাস। হায়! আমার উপর বিধিও বাম হলেন! আর্য্যপুত্র একে বিরহকাতর—কোথায় পদ্মাবতীকে আশ্রয় ক'রে একটু সুস্থ হবেন তা না পদ্মাবতীই অসুস্থ হ'য়ে পড়লো! আচ্ছা যাই ভিতরে। চাকরাণীগুলি ভারি দুর্বিনীত দেখছি ত। ঘরে ত পদ্মাবতীকে দেখবার জন্য প্রদীপটী ছাড়া আর কেউ নেই! এই যে পদ্মাবতী শু'য়ে আছে—আমি এখানেই বসি—না আলাদা আসনে বসলে ভালবাসাটা কম দেখাবে। আচ্ছা বিছানার এক পাশেই বস্‌ছি। একি! এর কাছে বসাতে হঠাৎ আজ আমার সমস্ত প্রাণ যেন আনন্দের বন্যায় ডুবে গেল! বোধ হয় একটু সুস্থ হয়েছে—সমান ভাবে নিঃশ্বাস পড়ছে। রাজকুমারী শয্যার এক পাশে শুয়ে আছেন তাই শূন্য আর একটা পাশ যেন ডেকে বল্‌ছে, আমাকে এসে আলিঙ্গন কর। যাই আমি সেই পাশটায় শুই গিয়ে।

(শয়ন)

রাজা। (স্বপ্নে) হা বাসবদত্তা!

বাস। (সহসা উঠিয়া) হায়! হায়! আর্য্যপুত্র যে! এ তো পদ্মাবতী নয়। আমাকে কি দেখ্‌লে না কি? তা হ'লে ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হল!

রাজা। হা, অবন্তী-রাজকুমারী!

বাস। বাঁচলেম, আর্য্যপুত্র স্বপ্ন দেখছেন! এখানে ত কেউ নেই খানিক ক্ষণ অর্য্যপুত্রকে দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ করি!

রাজা। হা প্রিয়তমে, হা প্রিয়ে, হা প্রিয় শিষ্যে, আমার কথার উত্তর দাও।

বাস। কথা ত বলছি!

রাজা। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

বাস। না, রাগ করি নি, দুঃখিত হয়েছি।

রাজা। যদি রাগ কর নি, তবে তোমার গায়ে অলঙ্কার নেই কেন?

বাস। এর পর আর কি বলব?

রাজা। কি বলছ, "এই বিরহিনীকে কি তোমার মনে পড়ে?"

বাস। (সরোষে) দূর হ'ক: এখানেও বিরহিনী!

রাজা। আচ্ছা, এই দেখ বিরহিনীকে মনে আছে কি না। (আলিঙ্গনার্থ হস্ত প্রসারণ)

বাস। এখানে অনেকক্ষণ রয়েছি, যদি কেউ দেখে ফেলে তা হ'লে ভারি বিপদ ঘটবে। এখন যাই।

আর্য্যপুত্রের হাত দু'খানি বিছানার উপর তুলে রেখে যাই। (এই রূপ করিয়া প্রস্থান)

রাজা। (সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া) বাসবদত্তা, কোথা গেলে তুমি? আর একটু দাঁড়াও? হায়! হায়! বাসবদত্তা গেল কোথা? তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে চৌকাঠে লেগে পড়ে গেলুম! বুঝতে পাল্লুম না বাসবদত্তা সত্যি—কি স্বপ্ন!

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। মহারাজ জেগেছেন দেখছি।

রাজা। সখা, তোমায় একটা সুখের সংবাদ দিচ্ছি, বাসবদত্তা বেঁচে আছে!

বিদু। হায়! মহিষী বাসবদত্তা—কোথায় তিনি? তিনি যে অনেক দিন ম'রে গেছেন, মহারাজ!

রাজা। না সখা, বাসবদত্তা মরে নি!

আমাকে বিছানার উপর জাগিয়ে এইমাত্র চ'লে গেল। বাসবদত্তা আগুনে পুড়ে মরেছে এই কথা ব'লে রুমণ্বান আমাকে ছলনা করেছিল।

বিদু। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয় উজ্জয়িনীর কথা শুনে মহিষীর কথা ভাবছিলেন তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন।

রাজা। যদি বাসবদত্তা স্বপ্ন হ'য়ে থাকে তবে আমি আবার জাগলুম কেন? আর যদি মতিভ্রম হ'য়ে বাসবদত্তাকে দেখে থাকি, তবে এখনও সেই মতিভ্রম অটুট রইল না কেন?

বিদু। মহারাজ, যদি এরূপ করেন তবে লোকে আপনাকে উপহাস করবে। তবে আমি জানি এই রাজপরিবারে অবন্তী সুন্দরী ব'লে একটা যক্ষিনী আছে। আমার বোধ হয় মহারাজ সেটাকেই দেখেছেন।

রাজা। না—না সখা, আমি নিশ্চয় বাসবদত্তাকে দেখেছি—

জেগে দেখলুম বাসবদত্তার চোখে অঞ্জন নেই, আর তার সুদীর্ঘ কেশরাশি মুখের উপর লম্বিত হয়ে পড়ে রয়েছে—এই ক'রেই অবন্তী-রাজকুমারী পতিব্রতার ধর্ম্ম পালন কচ্ছেন। এই দেখ বয়স্য প্রিয়া ত্রাসিত হ'য়ে স্বপ্নে আমার বাহু স্পর্শ করেছিল সেই স্পর্শজনিত রোমহর্ষ এখনও দূর হচ্ছে না।

বিদু। এ সব অকারণ চিন্তা ক'রে আর লাভ নেই। মহারাজ, আসুন, এ বেলা আমরা অন্তঃপুরের অঙ্গনে যাই।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কা। আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক; আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলতে বল্লেন যে, অমাত্য রুমণ্বান সৈন্য সজ্জা ক'রে আপনার শত্রু আরুণির বিনাশার্থ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদেরও হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি আপনার সাহায্যার্থ সজ্জিত হ'য়েছে। অতএব মহারাজ সত্বর প্রস্তুত হ'ন। এখন দেখা যাচ্ছে সমস্তই বৎসরাজের অনুকূল—

শত্রুদের মধ্যে মনান্তর হয়েছে। রাজ-ভক্ত কৌশাম্বী-নিবাসী প্রজাগণ আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরবাসীগণ সকলে আনন্দিত, বিশেষতঃ অগ্রগামী সৈন্যগণ গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়েছে, আর আপনার অভিযান কালে যে সকল সৈন্য পশ্চাৎভাগ রক্ষা করবে তাদেরও নির্ব্বাচন হয়েছে; আবার আমাদের মহারাজও শত্রু-নিপাতের উপযোগী অন্যান্য সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে রেখেছেন।

রাজা। তা হ'লে আর চিন্তা নেই—এত দিনে বিধি মুখ তুলে চাইলেন।

মহাসাগরের ন্যায় যে যুদ্ধ ক্ষেত্র মাত্র নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গ সাহায্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিকীর্ণ বাণরাশি বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় সেইরূপ বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে দারুণ কর্ম্মে সুদক্ষ আরুণিকে এবার বিনাশ করবই করব। [সকলের প্রস্থান।

বিষ্কম্ভ।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কা। রত্নতোরণের দ্বার রক্ষা কচ্ছে কে হে?

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। আর্য্য, আমি বিজয়া; আদেশ করুন।

কা। বিজয়া, বৎসরাজ্য পুনরায় মহারাজ উদয়নের হস্তগত হ'য়েছে, আবার তাঁর সৌভাগ্যের দিন ফিরে এসেছে। তাঁকে বল মহারাজ মহাসেনের রাজধানী হ'তে রৈভ্যসগোত্র কাঞ্চুকীয় এসেছেন, আর মহিষী অঙ্গারবতীর প্রেরিত রাণী বাসবদত্তার ধাত্রীও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এরা দু'জনেই দ্বারদেশে অপেক্ষা কচ্ছে।

প্রতী। আর্য্য, এই খবর দেওয়ার ঠিক সময় এটা নয়।

কাঞ্চু। কেন বিজয়া?

প্রতী। আজ না কি কে শয্যা-মহাপ্রাসাদ থেকে বীণা বাজিয়েছিল মহারাজ শুনে বলেছেন এই বীণার স্বর অবিকল ঘোষবতীর মত।

কাঞ্চু। তারপর।

প্রতী। তারপর সেখানে গিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা কল্লেন, "এই বীণা কোথা থেকে এল?" সেই লোকটা বল্লে, "আমরা নর্ম্মদাতীরে একটা ঝোপে পেয়েছি। মহারাজের ইচ্ছা হ'লে নিতে পারেন।" তারপর বীণাটি কোলে তু'লে মহারাজ মূর্চ্ছিত হলেন। খানিক পরেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গল বটে কিন্তু অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে রাজার চোখ দুটি ফুলে উঠল. তারপর তিনি অত্যন্ত করুণ স্বরে বীণার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, "ঘোষবতি, তোমাকে ত পেলুম, তাকে ত দেখছি না?" আর্য্য এই ত অবস্থা শুনলেন, এখন কেমন ক'রে আবার এই খবর নিয়ে যাই।

কাঞ্চু। যাও, তুমি এই খবরও দেও গিয়ে—এই খবরেও ঘোষবতীর কথা আছে।

প্রতী। আচ্ছা, তবে যাই। এই যে মহারাজ শয্যা-মহাপ্রাসাদ থেকে নেমে আসছেন। এখানেই খবরটা দি।

কাঞ্চু। হাঁ, তাই দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

রাজা। ঘোষবতি, তোমার মধুর স্বরে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়; তুমি থাকতে দেবী বাসবদত্তার বক্ষে, না হ'লে তার ক্রোড়ে—সেই সুখের স্থান ছেড়ে তুমি ভীতিসঙ্কুল অরণ্যে গেলে কেন? আবার পাখীরা তোমার গায়ময় ধূলি ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘোষবতি, তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্রও স্নেহ নেই—হতভাগিনী বাসবদত্তাকে কি একটুও তোমার মনে পড়ে না?

গুরু-নিতম্বিনী বাসবদত্তা উপবিষ্ট হ'লে তার কোলে থেকে তোমার দুই দিকে চাপ পড়ত, তার পয়োধর যুগলের মধ্যে স্বেদাসক্ত হ'য়ে তুমি সুখে থাকতে, আমার বিরহে কাতর হয়ে রাণী করুণ সুরে তোমাকে বাজাত, আবার অন্য সময় তোমাতে মধুর রাগিণী আলাপ কত্ত—তাকি তোমার একটুও মনে পড়ে না?

বিদূ। মহারাজ, এরূপ কাতর হ'য়ে আর লাভ কি?

রাজা। সখা তুমিও এ কথা বলছ?

এই বীণা দেখে অতীতের কত কথা আমার মনে জেগে উঠছে. কিন্তু ঘোষবতীকে যিনি এত ভালবাসতেন সেই দেবীকে ত দেখছি না? বসন্তক, কোনও শিল্পীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোষবতীতে শীঘ্র নূতন তার লাগিয়ে নিয়ে এস।

বিদূ। যে আজ্ঞা। (বীণা লইয়া প্রস্থান)

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ মহাসেনের রাজধানী থেকে রৈভ্যসগোত্র কাঞ্চুকীয় এবং তার সঙ্গে রাণী অঙ্গারবতীর প্রেরিত মহিষী বাসবদত্তার ধাত্রী দ্বারদেশে অপেক্ষা কচ্ছেন।

রাজা। পদ্মাবতীকে সংবাদ দাও।

প্রতী। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

রাজা। এই ঘটনা এত শীঘ্রই কি মহাসেন জানতে পারলেন?

পরিচারিকাগণের সহিত পদ্মাবতীর প্রবেশ

প্রতী। রাজকুমারী, এদিকে আসুন।

পদ্মা। আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক।

রাজা। পদ্মাবতি, শুনচি না কি মহারাজ মহাসেনের রাজধানী থেকে রৈভ্যসগোত্র কাঞ্চুকীয় ও রাণী অঙ্গারবতীর কাছ থেকে ধাত্রী বসুন্ধরা দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন!

পদ্মা। আর্য্যপুত্র, বন্ধুগণের কুশল সংবাদ জানতে পাব এতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

রাজা। হাঁ পদ্মাবতী, তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। বাসবদত্তার যারা আত্মীয়, তারা তোমারও আত্মীয়, একথা ঠিক। পদ্মাবতি, ব'স—ব'সছ না যে?

পদ্মা। আর্য্যপুত্র, আপনি কি আমার সঙ্গে একত্র ব'সে এদের সঙ্গে দেখা করবেন?

রাজা। এতে দোষ কি?

পদ্মা। আর্য্যপুত্র পুনরায় বিয়ে করেছেন, এতে এদের মনে দুঃখ হতে পারে।

রাজা। যারা তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে পারে তাদের সঙ্গে যদি তুমি দেখা না কর তা হ'লে দোষের কথা হবে। তাই তোমাকে বসতে বলছি।

পদ্মা। আচ্ছা তবে বসি। (উপবেশন)

আর্য্যপুত্র, মা ও বাবা না জানি কি ব'লে পাঠিয়েছেন ভেবে আমার মন বড় উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

রাজা। ঠিক বলেছ—

আমারও মনে এই সন্দেহ হচ্ছে—না জানি তাঁরা কি ব'লে পাঠিয়েছেন। হায়! আমি তাদের স্নেহের কন্যা চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি— কিন্তু রক্ষা কত্তে পারি নি। ভাগ্য-দোষে গুণবান পুত্র কোন অপরাধ কল্লে সে যেমন পিতার কোপে পতিত হবে ব'লে ভীত হয় আমিও তাই হচ্ছি।

কাঞ্চুকীয়, ধাত্রী ও প্রতীহারীর প্রবেশ

কাঞ্চু। আমাদের রাজার আত্মীয়ের রাজ্যে এসেছি ব'লে মনে এক দিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে তেমনি আবার রাজকুমারীর মৃত্যুর কথা মনে ক'রে ঘোর বিষাদ উপস্থিত হচ্ছে। হে দৈব, তুমি যদি বৎসরাজ্য শত্রু হস্তগত না কত্তে তা' হ'লে দেবী বাসবদত্তার অকুশল ঘটত না!

প্রতী। এই আমাদের মহারাজ, আর্য্য সামনে আসুন।

কাঞ্চু। (অগ্রসর হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক।

ধাত্রী। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। (অত্যন্ত সম্মানের সহিত) আর্য্য, পৃথিবীতে রাজগণের উদয়াস্তের একমাত্র কর্ত্তা আমার আকাঙ্ক্ষিত বান্ধব রাজা মহাসেন কুশলে আছেন ত?

কাঞ্চু। হাঁ, মহাসেনের কুশল; মহারাজ সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন কি না তিনি তাই জানতে পাঠিয়েছেন।

রাজা। (আসন হইতে উঠিয়া) মহাসেন কি আদেশ করেছেন?

কা। মহাসেনের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন বৈদেহী-তনয়ের যোগ্যই বটে; মহারাজ, আসনে ব'সেই মহাসেনের বক্তব্য শ্রবণ করুন, তাতে দোষ নেই।

রাজা। মহাসেনের আদেশ শিরোধার্য্য।

(উপবেশন)

কাঞ্চু। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভাগ্যক্রমে শত্রু-হস্তগত রাজ্যের পুনরায় উদ্ধার হয়েছে। মহারাজ,

যারা অশক্ত, যারা কাতর, তাদেরই উৎসাহ নেই, যারা উৎসাহী প্রায় তাদের ভাগ্যেই রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ হ'য়ে থাকে।

রাজা। এ সমস্তই মহাসেনের প্রভাবের ফল—

আমি প্রথমে পরাজিত হয়েছিলেম, তারপর তাঁর পুত্রগণের সঙ্গে লালিত হয়েছি, বল-প্রয়োগে রাজ-কুমারীকে অপহরণ ক'রে এনেছিলেম কিন্তু রক্ষা কত্তে পারি নি। তারপর তার মৃত্যুর কথা শুনেও আমাকে একান্ত আপনার ব'লে মনে ক'রে তাঁরা যে আমার সংবাদ লওয়া উচিত মনে করেছেন তাতে মহাসেনের উদারতা ও প্রভাবেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

কাঞ্চু। আমি মহাসেনের বক্তব্য নিবেদন কচ্ছি। রাণীর কথা ধাত্রী বলবেন।

রাজা। মা গো! মা!

ষোল জন মহিষীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, যিনি পুণ্যশীলা, যিনি নগরের দেবীরূপিণী, যিনি আমার প্রবাস দুঃখে কাতর, আমার সেই মায়ের কুশল তো?

ধাত্রী। হাঁ মহারাজ, রাণীমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল. তিনিও মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানতে চেয়েছেন।

রাজা। আমার আবার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল! মা গো. আমার কুশল ত এই!

ধাত্রী। মহারাজ, এত কাতর হবেন না।

কাঞ্চু। আর্য্যপুত্র, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; যার পর মহারাজের এত ভালবাসা সেই মহাসেন-রাজকুমারী ম'রে ও মরেন নি, এবিষয়ে শোক ক'রে ফল কি?

মরণ-কালে কে কাকে রক্ষা কত্তে পারে? দড়ি ছিঁড়ে গেলে ঘটের অবলম্বন আর থাকে কৈ! সংসার ও অরণ্য একই রকম—অরণ্যে গাছ জন্মে সময় হলে ম'রে যায়; সংসারেও লোক জন্মে সময় ফুরালে ম'রে যায়।

রাজা। আর্য্য, এমন কথা বলবেন না—

মহাসেন-রাজকুমারী আমার প্রিয়তমা মহিষী, শিষ্যা মরণেও তাকে ভুলতে পারব না।

ধাত্রী। মহারাজ, রাণী বলেছেন, "বাসবদত্তা ম'রে গেছে—বিধির বিধান; কিন্তু আমার কাছে ও মহারাজের কাছে আমাদের গোপালক যেমন প্রিয় আমাদের জ্যেষ্ঠ জামাতা তুমিও তেমন। এজন্যই তোমাকে উজ্জয়িনীতে আনিয়েছিলুম, এবং অগ্নি সাক্ষী না ক'রে বীণার ছলে বাসবদত্তাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রেছিলুম। কিন্তু তোমারই চপলতার দোষে বিবাহ মঙ্গল হ'তে পারে নি। যা হ'ক আমরা তোমার ও বাসবদত্তার ছবি আঁকিয়ে সেই ছবির বিয়ে দিয়েছি। এখন বাসবদত্তার সেই ছবিখানা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই ছবি দেখে তুমি শান্তি লাভ করো।"

রাজা। আহা, আমার, পর, রাণীমার কত স্নেহ! আর তাঁর কথাগুলিও তাঁর বংশেরই অনুরূপ।

এই স্নেহমাখা কথা শুনে আমার প্রাণে যত আনন্দ হ'ল শত রাজ্য ফিরে পেলেও তেমন আনন্দ হ'ত না। আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, তবু আমাকে ভোলেন নি, আবার আমার উপর কত স্নেহ!

পদ্মা। আর্য্যপুত্র, গুরুব্যক্তির ছবি দেখে তাঁকে আমার প্রণাম কত্তে ইচ্ছে হচ্ছে।

ধাত্রী। রাজকুমারি, দেখুন দেখুন কেমন সুন্দর আকৃতি।

(চিত্র প্রদর্শন)

পদ্মা। (দেখিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এই ছবি যে অবিকল আর্য্যা আবন্তিকার মত। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র, এই ছবি দেখতে ঠিক আর্য্যা অবন্তিকার মত।

রাজা। 'মত' কি বলছ পদ্মাবতী—আমার বোধ হচ্ছে যেন এই ছবিটি ঠিক তাঁরই—

হায়! এত স্নিগ্ধ রূপের এই দারুণ বিপদ ঘটল কি ক'রে? মুখের এমন মাধুর্য্য আগুনই বা কোন প্রাণে পুড়িয়ে দিল?

পদ্মা। আর্য্যপুত্রের ছবি দেখ্‌লেই বুঝতে পারব এই ছবিটি আর্য্যা বাসবদত্তার ঠিক ছবি কি না।

ধাত্রী। রাজকুমারি, এই ছবিখানা একবার দেখুন ত।

পদ্মা। বাঃ, এ ত ঠিক আর্য্যপুত্রেরই মত! তা'হ'লে ঐ ছবিখানাও আর্য্যা বাসবদত্তার না হ'য়ে আর যায় না।

রাজা। দেবি, ছবি দেখা অবধি তোমাকে আনন্দিতও দেখছি এবং উদ্বিগ্নও দেখছি—এর কারণ কি?

পদ্মা। আর্য্যপুত্র, এই ছবিটি ঠিক যার চেহারার মত এমন একজন এখানেই আছেন।

রাজা। কি! তোমার কথা শুনে আমি যে অস্থির হ'য়ে উঠছি! বাসবদত্তা নয় ত?

পদ্মাবতি। কি! ভগিনী বাসবদত্তা!

রাজা। তা হ'লে তাকে এখনি এখানে নিয়ে এস।

পদ্মা। আর্য্যপুত্র, একজন ব্রাহ্মণ তাঁর ভগ্নীকে আমার কাছে আমার কন্যার মত থাকবে ব'লে রেখে গেছেন। তার স্বামী বিদেশে আছে, সুতরাং সে পর পুরুষ দর্শন করে না। কিন্তু সে আমার সঙ্গেই এসেছে। তাকে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

রাজা। যদি নিশ্চিতই সে ব্রাহ্মণের ভগিনী হ'য়ে থাকে তবে সে আর কেউ—বাসবদত্তা নয়—পৃথিবীতে একরকমের লোক নেই একথা বলা যায় না।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক। উজ্জয়িনী থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন, বলছেন, "রাণীর কাছে আমার ভগিনীকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছি। এখন তাকে ফিরে নিতে এসেছি।" সেই ব্রাহ্মণ দ্বার দেশে অপেক্ষা কচ্ছেন।

রাজা। পদ্মাবতি, তিনি কি সেই ব্রাহ্মণ!

পদ্মা। হাঁ, সেই ব্রাহ্মণই হবেন।

রাজা। উপযুক্ত শিষ্টাচার দেখিয়ে ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। পদ্মাবতি, তুমিও তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এস।

পদ্মা। আর্য্যপুত্রের যেমন আদেশ।

[প্রস্থান]।

যৌগন্ধরায়ণ ও প্রতীহারীর প্রবেশ

যৌ। (স্বগত) রাজার মঙ্গল হবে এই ভেবেই মহিষীকে ছদ্মবেশে সাজিয়েছিলাম। এখন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে কিন্তু মহারাজ কি বলবেন এই ভেবে আমার মনে বড় শঙ্কা হচ্ছে।

প্রতী। এই যে মহারাজ সম্মুখে; আর্য্য এগিয়ে যান।

যৌ। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। এই স্বর যেন পরিচিত বোধ হচ্ছে! ওগো ঠাকুর, আপনি কি আপনার ভগিনীকে পদ্মাবতীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন?

যৌ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। (প্রতীহারীর প্রতি)
এই ব্রাহ্মণের ভগিনীকে শীগ্‌গির নিয়ে এস।

প্রতী। মহারাজের যেমন আদেশ।

[প্রস্থান।

পদ্মাবতী, আবন্তিকা ও প্রতীহারীর প্রবেশ

পদ্মা। আর্য্যা আসুন আসুন; আপনাকে একটা সুখবর দিব।

আবন্তিকা। কি খবর, সখি!

পদ্মা। আপনার ভাই আপনাকে নিতে এসেছেন।

আবন্তিকা। আমার সৌভাগ্য যে, দাদা এখনও ভোলেন নি।

পদ্মা। আর্য্য পুত্রের জয় হ'ক; ব্রাহ্মণ যাকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন তাকে এনেছি।

রাজা। পদ্মাবতি, সাক্ষী রেখে গচ্ছিত বস্তু ফিরিয়ে দিতে হয়—এই রৈভ্যাস ঠাকুর ও ধাত্রী বসুন্ধরা তোমার সাক্ষী হবেন।

পদ্মা। মা, এই দেখুন যাকে আমার কাছে এই ব্রাহ্মণ রেখে গিয়েছিলেন।

ধাত্রী। (আবন্তিকাকে বিশেষ রূপে দেখিয়া)
একি! এ যে রাজকুমারী বাসবদত্তা!

রাজা। কি! মহাসেন-রাজকুমারী! দেবী বসুন্ধরা, পদ্মাবতীকে সঙ্গে করে তাকে এখানে নিয়ে আসুন।

যৌগ। না, না, তাকে এখানে আনা যায় কি ক'রে! সে যে আমার ভগিনী।

রাজা। আপনি কি বলছেন! এ যে মহাসেন-রাজকুমারী!

যৌগ। মহারাজ,

ভরত-কুলে আপনার জন্ম, আপনি পরম বিনীত, মহাজ্ঞানী ও শুদ্ধশীল সুতরাং অবিবেচনার বশবর্ত্তী হ'য়ে যদি রাজ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেন তা হ'লে এই নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত হবে।

রাজা। আচ্ছা, ছবির সঙ্গে এর রূপের কতটা সাদৃশ্য আছে তাই আমি দেখব। প্রতীহারী, পর্দ্দাটা একটু সঙ্কুচিত কর তো!

যৌগ। প্রভুর জয় হ'ক।

বাস। আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক।

রাজা। একি! ইনি যে যৌগন্ধরায়ণ, আর ইনিও যে মহাসেন-রাজকুমারী! (উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া)

আমার স্বপ্ন কি সত্য হ'ল? আমি কি আবার প্রিয়তমা বাসবদত্তাকে সত্যই দেখছি—পূর্ব্বেও একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম তখন কিন্তু বঞ্চিত হয়েছি।

যৌগ। মহারাজ, দেবীকে স্থানান্তরিত ক'রে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, এ অধীনকে ক্ষমা করুন।

(পদতলে পতন)

রাজা। (মন্ত্রীকে তুলিয়া) আপনি যৌগন্ধরায়ণ!

হায়! আপনি উন্মাদ সেজে, যুদ্ধ ক'রে, শাস্ত্রের নীতি অবলম্বন ক'রে আমাকে উদ্ধার করেছেন—আমি ডুবে গিয়েছিলাম শুধু আপনার ঐকান্তিক যত্নে ভেসে উঠেছি।

যৌগ। প্রভুর ভাগ্যের অধীন হওয়াই ত আমাদের কর্ত্তব্য।

পদ্মা। হায়! কি সৌভাগ্য! ইনিই আর্য্যা বাসবদত্তা! আর্য্যে, সখীর ন্যায় ব্যবহার ক'রে আমি আপনার প্রতি অশিষ্টাচরণ করেছি, যেরূপ শিষ্টাচার দেখান উচিত তা দেখাই নি; এখন পায়ে প'ড়ে প্রণাম কচ্ছি—অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

বাস। (পদ্মাবতীকে তুলিয়া) ওঠ ভগিনী, তুমি চিরসধবা হও। যে লোক প্রার্থী হ'য়ে আসে সে-ই দোষী হয়, যে প্রার্থনা পূর্ণ করে তার কিছুই অপরাধ নেই।

রাজা। বয়স্য যৌগন্ধরায়ণ, দেবীকে এরূপ ভাবে স্থানান্তরিত ক'রে কি উপকার করেছেন?

যৌগ। মাত্র কৌশাম্বী রক্ষা করেছি।

রাজা। পদ্মাবতীর কাছে তাকে গচ্ছিত রেখে গেলেন কেন?

যৌগ। পুষ্পকভদ্রাদি সিদ্ধ পুরুষগণ বলেছিলেন রাজকুমারী পদ্মাবতী কৌশাম্বী-রাজের মহিষী হবেন।

রাজা। রুমধ্বানও তা হ'লে একথা জানতেন!

যোগ। মহারাজ, একথা কারও অজানা ছিল না।

রাজা। কি আশ্চর্য্য, রুমধ্বান ত বড় শঠ দেখছি!

যৌগ। মহারাজ, দেবী বাসবদত্তা কুশলে আছেন এই সংবাদ দিয়ে রৈভ্যস ঠাকুর এবং ধাত্রী বসুন্ধরাকে আজই উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিন।

রাজা। দেবী পদ্মাবতীকে সঙ্গে ক'রে আমরা সকলেই সেখানে যাব।

ভরত বাক্য

যে পৃথিবী সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিন্ধ্যগিরি যার কুণ্ডল স্বরূপ, আমাদের রাজা একচ্ছত্র অধিপতি রূপে সেই সমগ্র পৃথিবীর শাসন দণ্ড পরিচালন করুন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি স্বপ্ননাটকমবসিতম্।

শুভং ভূয়াৎ।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গীয় রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতি এবং মতবাদ প্রচারিত আছে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম এই প্রবন্ধের উপাদান ভাগে ইতঃপূর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণি নিজ জীবনীর কোনও উপাদান রাখিয়া যান নাই। সমসাময়িক কোন মহাত্মাও রঘুনাথের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন নাই আর বর্ত্তমান বঙ্গেও এপর্য্যন্ত রঘুনাথ এবং অপরাপর দার্শনিক-গণের জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং রঘুনাথ সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণা বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে না। † পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বঙ্গীয় রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনপ্রবাদ হইতে সত্য উদ্ধার করিতে যদিও আমাদিগের সিদ্ধান্তের সহিত প্রচলিত বহু মতবাদের বিরোধ ঘটিতে পারে তথাপি আমরা যতদূর সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছি তাহা বিবৃত করা সঙ্গত মনে করিয়া নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

---

* শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের দুইস্থলের মুদ্রাকর প্রমাদের সংশোধন—

(১) ১৪৭ পৃঃ প্রথম স্তম্ভ ১১শ লাইনে ১৬২১ স্থলে ১৬১২ হইবে।

(২) ১৫১ পৃষ্ঠা (১) ৯ম লাইনে 'প্রণয়ন' স্থলে "গঙ্গা-গর্ভে বিসর্জন" হইবে।

† শ্রীহট্ট হইতে উত্থাপিত নূতন মতবাদগুলি "শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রতিভা, ১৩২১।

রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্ট, পদ্মাতীর অথবা নবদ্বীপ নিবাসী ?

গ্রীক কবি হোমরের বাসস্থান লইয়া ৭টী জনপদের নাগরিকগণ দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে আমাদিগকে তিনটীমাত্র স্থানের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীহট্টের দাবী আধুনিক। ১।১২ বৎসর হইল শ্রীহট্ট অচ্যুতনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত দক্ষিণ শ্রীহট্টের (বাৎস্য গোত্রীয়) সুবিদনারায়ণ নামক জনৈক রাজার জামাতা (কাত্যায়ন গোত্রীয়) রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়া প্রচার করেন।

শ্রীহট্ট-রঘুনাথ আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীহট্টের কাত্যায়ন গোত্রে নবাবিষ্কৃত রঘুনাথ একটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তিমাত্র এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত সুবিদনারায়ণের আত্মীয় রূপে এই কল্পিত রঘুনাথের অবতারণায় শ্রীহট্টের বহু ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে প্রচলিত জনশ্রুতি সমূহ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, পঞ্চম-বর্ষের পূর্ব্বেই রঘুনাথ জননী সহ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন এবং পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে সার্ব্বভৌমের নিকটেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়।

শ্রীহট্টের তথাকথিত রঘুনাথের বিদ্যারম্ভ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড নিবাসী শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে হইয়াছিল এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়া একাদশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিয়াছিলেন। এ কাহিনী হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, কাত্যায়ন গোত্রে নবাবিষ্কৃত রঘুনাথ, বঙ্গীয় রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। সুতরাং বঙ্গীয় রঘুনাথের নিবাস নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শ্রীহট্টের নাম উল্লেখই নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্বর্গীয় বান্ধব সম্পাদক রঘুনাথকে পদ্মাতীর বাসী বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু

পদ্মাতীর

পদ্মানদী রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা প্রভৃতি জিলার সীমা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পদ্মাতীর বলিতে ঢাকা জিলার অন্তর্গত স্থানবিশেষ বুঝাইবে এরূপ উক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

পশ্চিম বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে রঘুনাথের পিতা নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং রঘুনাথ নিজকে "নবদ্বীপ

নবদ্বীপ, পদ্মাতীর

নিবাসিনঃ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ একটী বচনও বঙ্গের চতুষ্পাঠী সমূহে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। এমতাবস্থায় রঘুনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পদ্মাতীরে কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতেন, তর্কস্থলে এইরূপ স্বীকৃত হইলেও কোনও প্রবল নূতন প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, "নবদ্বীপ নিবাসিনঃ" রঘুনাথের নিবাসভূমি নবদ্বীপ ভিন্ন অন্যত্র নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

এখন রঘুনাথ কোন সময়ে বিদ্যালোচনা করেন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক:

চৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌমের পরিচয় প্রসঙ্গ চৈতন্যদেবের মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যলীলা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। *

রঘুনাথ-গুরু সার্ব্বভৌম ১৪৮ খৃঃ অব্দে অথবা ১৫০৪ খৃঃ অব্দের পরে নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যায় উপনিবিষ্ট হন?

মধ্য লীলা হইতে উদ্ধৃত এই অংশ পাঠ করুন:

"গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম।
গোপীনাথাচার্য্য কহে 'নবদ্বীপ ঘর';
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্রপুরন্দর।
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁর ইহোঁ পুত্র;
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র।
সার্ব্বভৌম কহে 'নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী;
বিশারদের সমাধ্যায়ী, এই তাঁর খ্যাতি।
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য আমি মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হৈয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগৎগুরু সর্ব্বলোকহিতকর্ত্তা
বেদান্ত শুনাও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক-সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥" *

এই পরিচয়ে সার্ব্বভৌম সন্তুষ্ট না হইয়া, সন্ন্যাসী কোন সম্প্রদায় ভুক্ত এবং তাঁহার কি নাম, এই দুইটী বিষয় অবগত হইবার জন্য অতঃপর তিনি মুকুন্দ দত্তকে প্রশ্ন করেন—

"প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী আকৃতে সুন্দর;
আমার বহু প্রীতি হয় ইহাঁর উপর।
কোন্ সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ?
কিবা নাম ইহাঁর? শুনিতে হয় মন।"
মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ৫৪ অঙ্ক।

---

* চৈতন্যদেবের শেষজীবনের নিত্যসহচর দামোদর রচিত করচা বর্ত্তমানে লুপ্ত। কবিরাজ গোস্বামী তদীয় গুরু রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে উক্ত করচা শ্রবণ করিয়া তদনুসরণ পূর্ব্বক মধ্যলীলা বর্ণন করেন।

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় কর্ত্তৃক ঢাকা ফরিদাবাদ হইতে প্রকাশিত সংস্করণ। মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪০—৪৬ অঃ।

উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট দণ্ডীগণ বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বেদান্ত শাস্ত্রবিৎ "সন্ন্যাসী উপকর্ত্তা" বৈদান্তিক অধ্যাপকরূপে পুরীধামে দীর্ঘকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পুরীধামে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য দেবের সহিত পরিচয় হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের পরে (অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র রাজ্য লাভ করিবার এবং চৈতন্য দেবের ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পরে) উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাসুদেবের নৈয়ায়িক খ্যাতির পরিবর্ত্তে দেশ-বিখ্যাত বৈদান্তিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ব্বভৌম, তত্ত্ব চিন্তামণি গ্রন্থের টীকাকার। তাঁহার টীকার নাম সার্ব্বভৌম নিরুক্তি। তথাপি কবিরাজ গোস্বামী আভাসেও তাঁহাকে নৈয়ায়িক-রূপে বর্ণনা করেন নাই। তিনি যে দীর্ঘকাল যাবৎ পুরীধামে বেদান্তের আলোচনায় খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণনা হইতে এই ধারণা কি দৃঢ় হইতেছে না?

দ্বিতীয়তঃ, গোস্বামী মহাশয় বলিতেছেন—"গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম।" নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থাৎ চৈতন্য দেবের ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত না হইলে সার্ব্বভৌমের পক্ষে চৈতন্য দেবের মত নবদ্বীপের একটী খ্যাতনামা ব্যক্তিকে চিনিতে না পারা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, চৈতন্য দেব নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বাসুদেবের পক্ষে বংশ পরিচয় লাভের পরেও পুনঃ, "কিবা নাম ইঁহার? শুনিতে হয় মন" ইত্যাদি আলোচনা, আরও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। কয়েক দিবসের নিমিত্তও চৈতন্য-দেব বাসুদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই ভক্ত কবি এস্থলে এসম্বন্ধে উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না।

তৃতীয়তঃ, "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা" এবং জয়ানন্দ প্রণীত 'চৈতন্য মঙ্গল' এই দুইটী গ্রন্থ, দুইটী পৃথক সমাজের ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিখিত। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই চৈতন্যদেবের জন্মকালে নবদ্বীপে "যবন ভয়ে" অর্থাৎ মুসলমানগণের অত্যাচারে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভীত হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীধামে উপনিবিষ্ট হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, চৈতন্য দেবের জন্মকালে অত্যাচারী হাবসী ক্রীতদাস রাজাদিগকে বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিতে দেখা যায়। সুতরাং সমসাময়িক বঙ্গ ইতিহাস "যবন ভয়" কাহিনীর প্রতিকূল নহে।

পঞ্চমতঃ, মুরারীগুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির বর্ণনা অনুসারে চৈতন্যদেব গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করেন। তাঁহারা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট চৈতন্য-দেবের বিদ্যাভ্যাস করিবার কথা পরোক্ষ ভাবেও বর্ণনা করেন নাই। উপর্য্যুক্ত পঞ্চবিধ কারণে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যা গমন করেন এইরূপ নির্দ্ধারণই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে চৈতন্য দেবের ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে (অর্থাৎ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের পরে) প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক নবদ্বীপ হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জনশ্রুতি বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত হইলেও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইবে না। *

* "বাসুদেব সার্ব্বভৌম, উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ রুদ্র গজপতির বিশেষ অনুরোধে, নবদ্বীপ ছাড়িয়া, উড়িষ্যার রাজধানী "পুরী" নগরে চলিয়া গেলেন; এবং রাজার দ্বারপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানে আবার বেদান্তের টোল বসাইলেন।"—৺কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত, সুপ্রভাত ৩৭ পৃঃ।

সময় নির্দ্ধারণ

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল প্রেম ভক্তির প্রকাশ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌর কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমনামামৃতে ভাসাইল সকলে॥"

চৈতন্যদেব

—কবিরাজ গোস্বামী কৃত চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা. ৭ হইতে ৯ অঃ—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। পিতার নিকট অধ্যয়নান্তে তিনি শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন এইরূপ অবগত হওয়া যায়। রঘুনন্দনের "জ্যোতিষ তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের রবি সংক্রান্তি গণনায়, উক্ত গ্রন্থ ১৪৮৯ শকাব্দে প্রণীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়—"নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতঃ" অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় পূরণ করিবে। সুতরাং জ্যোতিষ তত্ত্বের প্রণয়ন কাল ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ এবং চৈতন্যদেবের জন্মের ৮২ বৎসর পরে। উক্ত গ্রন্থ রঘুনন্দনের ৫০। ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রচিত বলিয়া ধরা গেলেও দেখা যায় যে, রঘুনন্দন চৈতন্য দেবের অন্ততঃ ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

জন্ম গ্রহণ করেন। অপর. "হরিভক্তিবিলাস" নামক গ্রন্থ চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বহু পরে রচিত হয়, এবং রঘুনন্দন তাঁহার নিজ গ্রন্থে বহুবার উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রমাণীকৃত হয় যে, রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তী পণ্ডিত ছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চৈতন্য দেবের জন্মকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যায় গমন করেন। সুতরাং নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট রঘুনাথের বিদ্যা-শিক্ষা খুব পরে হইলেও, সেই বৎসরই (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে বাসুদেবের চতুষ্পাঠীতে সমাপ্ত হয়। জনপ্রবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে. ১৬ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে বাসুদেবের চতুষ্পাঠী হইতে রঘুনাথ মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন। এই সূত্রে রঘুনাথ (১৪৮৫-১৬) অর্থাৎ ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের; কিন্তু কোন মতেই ইহার পরবর্ত্তী হইবেন না; দুই চারি বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন এবং তাঁহার বয়স চৈতন্যদেবের অপেক্ষা অন্ততঃ ১৬ বৎসর অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রঘুনাথ শিরোমণি

জগদীশ তর্কালঙ্কার চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষের ব্যক্তি; এবং পুরুষ গণনায় জগদীশ হইতে বর্ত্তমানে ১০।১১ পুরুষ চলিতেছে। *

জগদীশ তর্কালঙ্কার

৺রায় বাহাদুর মহাশয়ের প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, জগদীশ যখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দীধীতির টীকা প্রণয়ন করেন তখনও রঘুনাথ জীবিত ছিলেন। উপর্য্যুক্ত সময়ের আভাস হইতে দৃষ্ট হইবে যে. এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।

---

* তাঁহার কোনও ছাত্রের গ্রন্থ হইতে তিনি ১৬৫৭ খৃঃঅব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে নবদ্বীপ মহিমা দ্রষ্টব্য।

গদাধর

গদাধর জগদীশের সমসাময়িক। জগদীশের শেষ অবস্থায় গদাধরের অভ্যুদয় হয়। পুরুষ গণনায় এক্ষণে গদাধর হইতে ৭জন পাওয়া যায় *

গদাধর যে শিরোমণির ছাত্র নহেন এ কথা উপর্যুক্ত সময়ের অভাস হইতেই প্রমাণিত হইবে। অথচ এইরূপ উক্তি বঙ্গ সাহিত্যে অপরিচিত নহে।

চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ প্রসঙ্গ। চৈতন্যদেব কাহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন?

চৈতন্যদেবের আদ্যলীলা সম্পর্কে তাঁহার বাল্য-সহচর মুরারি গুপ্তের রচিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত" †† এবং বৃন্দাবনদাস রচিত "চৈতন্য ভাগবত" সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণিক গ্রন্থ।

মুরারি গুপ্তের বর্ণিত ঘটনাবলী তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। চৈতন্যদেবের অধ্যয়নলীলা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন—

"ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিদ্যাং যে পণ্ডিত মহত্তমাঃ
তেষাং মহোপকারায় তেভ্যো বিদ্যাং গৃহীতবান্॥
নবম সর্গ ২৮ পৃষ্ঠা।

এক্ষণে বৃন্দাবন দাস কি বলেন দেখিতে হইবে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই বৎসর (?) পরে † নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে চৈতন্যদেবের একমাত্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন।

"ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠীমাঝে প্রভু পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাসপণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রঘর॥
মিশ্র বোলে "পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে॥"
চৈতন্য ভাগবত—আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

* * *

"যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেহ ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥"

* * *

চৈতন্য ভাগবত। ঐ।

চৈতন্যদেব অধ্যাপক হইয়াছেন।

"নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান॥"
—ঐ, ৭ম অধ্যায়

* শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত ঘোষ প্রকাশিত। মুরারিগুপ্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। বৃন্দাবন দাস, কবি কর্ণপুর, লোচন দাস এবং অপরাপর লীলা লেখক-গণ মুরারিগুপ্তের সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক গৌর লীলার বহু তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

† বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্য দেব যখন গৃহী ছিলেন তখন বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতার বয়স ৮ বৎসর ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

†† বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

"সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সবযত ঠাকুর বাখানে॥
এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত।
শব্দ সনে বাখানেন কৃষ্ণসমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে॥
এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত॥"

গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে একমাত্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন।

"মনে ভাবে মুকুন্দ আজ জিনিব কেমনে।
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে॥"

* * *

"প্রভু কহে 'সন্ধিকার্য্য' জ্ঞান নাহি যার।
কলি যুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥"

গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে মুরারি গুপ্তকে উপলক্ষ করিয়া চৈতন্যদেব বলেন—

"প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফপিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

—আদিখণ্ড, ৭ম অধ্যায়, চৈতন্য ভাগবত।

দিগ্বিজয়ীর আক্ষেপ।

"শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোরে জিনিল হেন বিধির ঘটন॥"

—আদি খণ্ড, ৯ম অধ্যায়।

পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে চৈতন্যদেবের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জীটীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হৈয়া নবীন॥
অধ্যয়ন লীলার প্রভু দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥"

আদিলীলা—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৫ হইতে ৭;

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের ব্যাকরণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অধিকার সম্বন্ধে আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ব্যাকরণ ব্যতীত অপর কোনও শাস্ত্র গঙ্গাদাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন. অথবা গঙ্গাদাস ভিন্ন অপর কোনও অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ ব্যতীত অপর কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ সকল কথা মুরারিগুপ্ত জানেন না, বৃন্দাবন জানেন না, এবং কবিরাজ গোস্বামীও অবগত হন নাই। ইঁহারা সকলেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে জানিতেন কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইঁহারা কেহই বাসুদেবকে অল্প সময়ের জন্যও চৈতন্যের অধ্যাপকরূপে উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও চৈতন্যদেবের পক্ষে বাসুদেবের ছাত্র হওয়ার প্রতিকূল প্রমাণ পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেব আদৌ ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি ?

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, চৈতন্যদেব অধ্যাপক হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন এবং ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক যখন তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখনও তিনি একমাত্র গঙ্গাদাসকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। আর গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যখন তিনি ছাত্রদিগকে কৃষ্ণ কথা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন তখনও চৈতন্যদেবের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার গুরু

গঙ্গাদাসের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে, চৈতন্যদেবের ন্যায়-শিক্ষার জন্য বাসুদেবের কথা দূরে থাকুক অপর কাহারও চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই বিবরণ বহু অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে তিনি যে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই এ কথাই বৃন্দাবনদাস দৃঢ় ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অমানুষিক প্রতিভা বলে দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করিবার পরে নদীয়াবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার বর্ণনা কালে বৃন্দাবনদাস স্পষ্টভাবে বলিতেছেন——

"দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর সুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে॥
কেহো বোলে 'এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পঢ়ে
ভট্টাচার্য্য হয়ে তবে কখন না নড়ে॥"

—আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

চৈতন্যদেব ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কত ব্যক্তি "ভট্টাচার্য্য" উপাধি লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সম্ভবতঃ ভক্ত বৃন্দাবনের হৃদয়ে ইহাতে একটু সাময়িক আক্ষেপের ভাব উদিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই ভক্ত লেখক অবগত ছিলেন যে, ভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মাহাত্ম্য, সাধারণ লোকের মত ন্যায়, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র-পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে না। শ্রীহট্ট-রঘুনাথ আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি সম্পাদিত "অদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, চৈতন্যদেব দুই বৎসর, দুই বৎসর করিয়া সমগ্র স্মৃতি, জ্যোতিষ, ষড়দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করেন; এমন কি তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কবি চৈতন্য দেবকে "বিদ্যাসাগর" রূপে বর্ণনা করিয়াও নিরস্ত হন নাই। চৈতন্যদেব, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ন্যায়ের এক অপূর্ব্ব টীকা প্রণয়ন করেন এবং জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অশ্রুবিসর্জ্জনে মর্ম্মবেদনায় পরিতপ্ত হইয়া তিনি স্বকৃত ন্যায়ের টীকা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন, এই সকল অপূর্ব্ব-কাহিনীও অদ্বৈত প্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে। স্কুল কলেজের ন্যায় দুই দুই বৎসরেই চৈতন্যদেব এক এক শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহা দেখাইয়া কবি তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই সব অপূর্ব্ব ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখিয়াও গ্রন্থপ্রকাশক তত্ত্বনিধি মহাশয় নিরস্ত হন নাই। বলরামের ন্যায় অসীম সাহসে তিনি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নবদ্বীপের তার্কিক শিরোমণি কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ বলিয়া ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মুরারিগুপ্ত, বৃন্দাবন দাস এবং কবিরাজ গোস্বামী আভাসেও চৈতন্যদেবকে নৈয়ায়িক রূপে বর্ণনা করেন নাই; পরোক্ষভাবেও চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রঘুনাথকে জগতের চক্ষে হীন করিবার চেষ্টা করেন নাই। পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা রঘুনাথের চরিত্র খর্ব্ব করিয়াছেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে চৈতন্যদেব কখনও ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই ও রঘুনাথের তিনি সহাধ্যায়ীও ছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহারা আরও উদারতার পরিচয় দিতেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। আর যদি ইহাই সত্য ঘটনা হইয়া থাকে যে, রঘুনাথ চৈতন্য দেবের ন্যায়ের টীকা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, ও বন্ধুর মর্ম্মবেদনায় পরিতপ্ত হইয়া চৈতন্যদেব স্বকৃত ন্যায়ের অমূল্য গ্রন্থ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন করেন, তবে রঘুনাথ যদি দীধীতি সহ ভাগীরথীর অতল জলে ডুবিয়া মরিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত—চৈতন্যদেবের ন্যায় অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির ন্যায়ের গ্রন্থ আজ বঙ্গদেশে লুপ্ত হইত না! কে বলিতে পারে ইহাতে কি জ্ঞান-ভাণ্ডার নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে চৈতন্যদেব রঘুনাথ ও রঘুনন্দন সহপাঠী কি না!

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথ, চৈতন্যদেব এবং রঘুনন্দন সহপাঠী ছিলেন, এই বহু বিস্তৃত জনশ্রুতি যে কতদূর অপ্রকৃত তাঁহাদের সময় নির্দ্ধারণ হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

চৈতন্যদেবের জন্ম বৎসরেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যা গমন করেন। চৈতন্যদেব একমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি কখন ন্যায়শাস্ত্র পড়িলেন? বাসুদেবের নিকট তিনি ন্যায় পাঠ করেন কিরূপে? তাঁহার জন্ম বৎসরেই বাসুদেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কি সমসাময়িক মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবন দাস একথা জানিতেন না? কবিরাজ গোস্বামী কি এ কথা অবগত হইতেন না? তাঁহারা চৈতন্যদেবের পাঠাবস্থার যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অথবা বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামোল্লেখ নাই। যদি চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ সহপাঠী হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুরারিগুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত প্রভৃতি চৈতন্যদেবের সহপাঠীগণের নামের সহিত রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের নামোল্লেখ থাকিত কিন্তু রঘুনাথের এইরূপ উল্লেখ না থাকাতে তাঁহাকে রঘুনাথ এবং রঘুনন্দনের সহপাঠীরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না।

কবিরাজ গোস্বামী সঙ্কীর্ণভাব লইয়া লিখিতে বসিলে বাসুদেবকে চৈতন্যদেবের গুরু বলিয়াই বর্ণনা করিতেন এবং বাসুদেবকে 'সন্ন্যাসী উপকর্ত্তা' বৈদান্তিক না বলিয়া চৈতন্যদেবের গুরু বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা সাহিত্যসভার মুখপত্র "সাহিত্য সংহিতা" † নামক মাসিক পত্রিকায় চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দনকে বাসুদেবের শিষ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক এবংবিধ উক্তি স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু দীনেশ বাবু ১৫০৫ খৃঃ অব্দেও যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে ছিলেন এইরূপ উক্তি করা অযৌক্তিক মনে করেন নাই।

বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার প্রধান্য স্থাপনে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক মধ্যে রঘুনাথের স্থান।

১। রঘুনাথ কর্ত্তৃক চিন্তামণি দীধীতি প্রণয়নের পূর্ব্বে বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না এইরূপ উক্তি বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও কয়েকটী ক্ষণজন্মা নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৯৯১ খৃঃ অব্দে হাবড়া জিলার অন্তর্গত ভুরসুট গ্রামে শ্রীধরাচার্য্য নামে একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক "ন্যায় কন্দলী" নামক ন্যায় শাস্ত্রের একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর উদয়নাচার্য্য *

---

†—সাহিত্য-সংহিতা বৈশাখ ১৩০৯ "ন্যায়-দর্শনের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ—"বাসুদেবের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। প্রথম চৈতন্যদেব। ইনি ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সাধন করেন। দ্বিতীয়, দায়ভাগের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তৃতীয়, সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। চতুর্থ শিষ্য সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।"

* ৺ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নব্যভারত পত্রে প্রকাশ করেন যে উদয়ন মৈথিল নৈয়ায়িক। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ক্রতু ভাদুড়ীর অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষের ব্যক্তি ছিলেন এইরূপ উক্তি সম্ভবপর নহে! এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা আবশ্যক।

"ন্যায় বার্ত্তিক পরিশুদ্ধি" ও "ন্যায় কুসুমাঞ্জলী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজ গ্রন্থে "গৌড় মীমাংসক" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়দেশে তৎপূর্ব্বেও ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনা হইত ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। উদয়নের পরে মনুর টীকাকার কল্লুকভট্ট ও "ভাষাপরিচ্ছেদ" প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মতবাদ অনুসারে বিশ্বনাথ রঘুনাথের বহু পরবর্ত্তী। যাহা হউক সম্প্রতি "ভাষা পরিচ্ছেদ" প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অবতারণা পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে বিশ্বনাথের পক্ষে শিরোমণির পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর নহে।

উপর্য্যুক্ত নৈয়ায়িকগণের বিবরণ হইতে দৃষ্ট হয় যে রঘুনাথের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ছিল এবং বহু নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া "নব্যন্যায়ের" প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থের ফলে ন্যায় শাস্ত্র আলোচনা নূতন আকার ধারণ করে। এই গ্রন্থই ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বহু নৈয়ায়িক এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির সুপ্রসিদ্ধ চিন্তামণি দীধীতিও এই গ্রন্থেরই টীকা বিশেষ। যাহা হউক রঘুনাথের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি অসামান্য প্রতিভা বলে "চিন্তামণি" ও মিথিলায় প্রচলিত টীকা টিপ্পনী ও ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থরাজির মর্ম্ম সাধারণ শিক্ষার্থীর বোধগম্য করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রযত্নেই নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং চারিদিকে ন্যায়চর্চ্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ব্যুৎপত্তিবাদ, তত্ত্বচিন্তামণি দীধীতি, পদার্থ খণ্ডন, লীলাবতী টীকা, ন্যায় কুসুমাঞ্জলীর টীকা প্রভৃতি ৩৮ খানা গ্রন্থ রঘুনাথের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এবং পরবর্ত্তীকালে বহু নৈয়ায়িক রঘুনাথ কৃত বহুগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক অতুল যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও দীধীতি অথবা দীধীতির টীকা পাঠ না করিয়া কেহই নৈয়ায়িক রূপে যশস্বী হইতে সমর্থ হন না। ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয় দার্শনিকগণ সূক্ষ্ম চিন্তার খনিস্বরূপ। রঘুনাথ ইহাদিগেরই শিরোমণি।

রঘুনাথের স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক, লোকপরম্পরায় অদ্যাপি দেশময় প্রচলিত। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

১। যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥

২। পঠন্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ ফ ছঠেতি বাচং শঠাঃ
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ।
বয়ং বকুল মঞ্জরী গলদপারমাধ্বীক—
ধুরীণ পদরীতিভি র্য্যুবতিভির্বিনোদামহে॥

৩। তাহার বার্দ্ধক্য ও দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জনৈক নীচাশয় ব্যক্তি নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করেন—

যস্য সাংসারিকী চিন্তা, চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।
তস্যৈব হি শিরঃ কম্পঃ ক শিরোমণি-ধারণম্॥

উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন—

কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণি মনীষিণঃ
নিপীত কালকূটস্য হরস্যেবাহি খেলনম্॥

রঘুনাথ আদর্শছাত্র, আদর্শ শিক্ষক। অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের ব্রত—ব্যবসা নহে।

* কল্লুকভট্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন এইরূপ অবগত হওয়া যায়। তিনি মনুর টীকায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈ বন্দ্যোবরেন্দ্রাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুক ভট্টোঽভবৎ॥

জনশ্রুতি "ব্যুৎপত্তিবাদ" ও লীলাবতী এই দুই গ্রন্থকে রঘুনাথের নিজপুত্র ও কন্যারূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ নৈয়ায়িক

রঘুনাথের পুত্র কন্যা

সমাজে "শিরোমণি" শব্দ যোগরূঢ় রূপে ব্যবহৃত। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ রঘুনাথের ছাত্র এবং পদার্থ খণ্ডনের টীকাকার রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রামভদ্রের টীকা হইতে নিম্নোক্ত দুইটী শ্লোক উল্লেখ যোগ্য।

১। তাতস্য তর্কসরসীরুহকাননেষু চূড়ামণেদিনমণে শ্চরণে প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রকৃতীকৃতিনাং হিতায় লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি॥"

২। "ভবানীভবনাথাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং।
যৎপ্রসাদাদিদং শাস্ত্রং করক্ষীরোপমী কৃতং॥
মকরন্দে প্রকাশে বা ব্যাখ্যা পরিমলে হথবা
ততোধিকং পিতুর্ব্যাখ্যা মাখ্যাতু ময়মুদ্যমঃ॥"

বহুবিস্তৃত কৌমার্য্যের জনশ্রুতি এবং যোগরূঢ় রূপে শিরোমণি শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও শিরোমণি বুঝাইতে চূড়ামণি শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে।

ঐতিহাসিকের পক্ষে ইতিহাসের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণ ভাব এবং বাক্ বিতণ্ডা উভয়ই প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রতিকূল। সঙ্কীর্ণ দেশ-প্রীতি-বশে ১০।১২ বৎসর হইল শ্রীহট্টে রঘুনাথ আবিষ্কৃত হন। প্রতিভার বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় রঘুনাথকে লইয়া শ্রীহট্টের দাবী আলোচনায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, রাজা সুবিদনারায়ণের জামাতার ভ্রাতারূপে এক কল্পিত রঘুনাথের অবতারণা করাতে এবং বঙ্গীয় রঘুনাথের সহিত তাঁহার সময়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায়, শ্রীহট্টে ইতিহাসের বহু তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদবিচারে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। আশা করি এখনও তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে বিতণ্ডা পরিহার পূর্ব্বক ধীরভাবে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অগ্রসর হইবেন।

এই গেল শ্রীহট্ট রঘুনাথের কথা! বঙ্গীয় রঘুনাথ সম্বন্ধে এস্থলে যৎসামান্য মাত্র আলোচিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, রঘুনাথ সম্বন্ধে আলোচনার আরও অবসর রহিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিবার অমূল্য উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী বহু অপ্রামাণিক কবির ও লেখকের ধৃষ্টতায় এই অমূল্য সাহিত্যে বহু আবর্জ্জনা প্রবেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নেতৃবৃন্দ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, নবদ্বীপের স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অজিত নাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ কতিপয় মহাত্মা অনেক বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

রঘুনাথ আলোচনায়, রঘুনাথের ভাষাতেই প্রবন্ধ শেষে নিবেদন করিতেছি—

"মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলি রেষভূয়ো ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য ভাবাববোধ-বিহিতো ন দুনোতি দোষঃ॥ *

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।

---

* প্রতিভা আষাঢ় সংখ্যায় "শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও

পরিশিষ্ট।

শ্রী

১৩২০, ১৫ই চৈত্র.........৪১১, বর্ণেল গঞ্জ
এলাহাবাদ।

প্রবন্ধ লেখকের কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে, মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মন্তব্য লিপি—

পরমক্ষেমাস্পদেষু!

আপনার প্রেরিত "বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীহট্টের রঘুনাথ শিরোমণি" শীর্ষক প্রবন্ধ আমি পড়িয়াছি। আপনার যুক্তি তর্ক অতি সুন্দর হইয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না; আমার কিছুই জানা নাই। খ্যাতনামা ব্যক্তির উপরে অনেক কল্পিত গল্প প্রচলিত থাকে; সে গুলির উপর আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নয়। কালিদাস ও ভবভূতি এক সঙ্গে কবিতা প্রস্তুত করিয়াছেন, সে কবিতাও ত পণ্ডিতদিগের মুখে মুখে আছে। কালিদাস কবেকার? ভবভূতি বা কবেকার?

চৈতন্যদেব, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন এক সময়ের লোক, এমন কি তিন জনেই এক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি, কিন্তু ইহার মূলে কি কিছু আছে? জ্যোতিষ তত্ত্ব দৃষ্টে জানা যায়—চৈতন্য হইতে রঘুনন্দন প্রায় ৮০।৯০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত। বৈষ্ণব গ্রন্থের কোন স্থানে পাই নাই চৈতন্যদেব ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছেন। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, চৈতন্যদেবকে দেখিয়া-ছিলেন; কৈ কোন স্থানেই নাই, তিনি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠ শেষ করিয়া মিথিলায় পক্ষধরের নিকটে ন্যায় পড়েন ও মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালায় আনেন; এ প্রবাদের মূলে কি বুঝি না।

বহু পূর্ব্বে ভুরসুট বাঙ্গালী শ্রীধরাচার্য্য ন্যায় কন্দলী লিখেন। উদয়নাচার্য্যকেও আমরা বাঙ্গালীই বলি। বাঙ্গালী কুল্লুকভট্টও নৈয়ায়িক ছিলেন, মনুর টীকায় আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখুন; তিনি যদি কিছু জানেন।

আশীর্ব্বাদক
(স্বাক্ষর) শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ

২৮ চৈত্র, নবদ্বীপ

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মন্তব্য লিপি—

বঙ্গের রঘুনাথ" প্রবন্ধের প্রতিবাদের মুখবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত শ্লোক বিষয়ক আপত্তি সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, এই গুলি দক্ষিণ শ্রীহট্টস্থ বিভিন্ন হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত। কাছাড়ের ইতিবৃত্তের পরিশিষ্ট ভাগের ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিবাদকারক বলিয়াছেন যে, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (?) [বোধ হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে হইবে, মুদ্রাকর প্রমাদ] অর্থাৎ ৪১৯ গৌরাব্দের পূর্ব্বে ঢাকার বান্ধব পত্রিকায়ই শ্রীহট্ট রঘুনাথের আলোচনা হইয়াছিল। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে বান্ধবের শেষ সংখ্যা মুদ্রিত হয়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ বান্ধব সম্পাদক পরলোক গমন করেন। আমরা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত বান্ধবের প্রথম খণ্ড হইতে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বান্ধবের শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত পত্র অনুসন্ধান করিয়াও রঘুনাথের কোনও আলোচনা পাইলাম না। বান্ধবসম্পাদক কৃত সুপ্রভাত নামক পুস্তকের রঘুনাথ শিরোমণি শীর্ষক প্রবন্ধের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কোনই আলোচনা বান্ধবে প্রকাশিত হয় নাই।

—লেখক।

শুভানুধ্যায়ি শ্রীঅজিত নাথ শর্ম্মণো বিজ্ঞাপনমেতৎ.

আপনার দুইখানা পত্রই পাইয়াছি কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ প্রত্যুত্তর দিতে বিলম্ব হইল ত্রুটি লইবেন না।

রঘুনাথ শিরোমণি চতুর্দ্দশ শত শকাব্দের শেষ ভাগে জন্ম হয় বলিয়া বো হয় শ্রীচৈতন্যের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি বাসুদেবের ছাত্র এ সম্বন্ধে নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী ও যুক্তি আছে সামান্য পত্রে তাহা প্রকাশ করিলাম না। আপনার লিখিত প্রবন্ধ প্রতিভা পত্রিকায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকুলীনে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া একাদশবর্ষবয়স্ক রঘুনাথ বিবেকী হইয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন ও তিনি পঞ্চখণ্ড গ্রামে প্রথম অধ্যয়ন করেন ইহা নূতন শুনিলাম; বস্তুতঃ রঘুনাথের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ পর্য্যন্ত বাসুদেবের নিকট হইয়াছিল. এ বিষয়ে নানা প্রমাণ আছে। আপনি সময়ের অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন উহা বড়ই সমীচীন বলিয়া বোধ করিলাম। আমার একটী বন্ধু কান্তি চন্দ্র রাঢ়ী নবদ্বীপ মহিমা নামক এক খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। দেখিয়াছেন কি না জানি না ঐ পুস্তকে ইহার বিশেষ প্রমাণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে আপনার নিকট একখণ্ড পাঠাইব দেখিবেন।

পদার্থ খণ্ডন প্রণেতা রামভদ্র শিরোমণির পুত্র নহেন জানকী নাথ চূড়ামণির পুত্র "তাতন্যতর্কসরসীরুহ কাননেষু" ইত্যাদি। রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক হইলেও শিরোমণি চৈতন্যের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। রঘুনন্দনের জ্যোতিষ্ তত্ত্বে লিখিত আছে "নবাষ্ট শক্র হীনেন শকাব্দাঙ্কেন যোজয়েৎ" ইহা দ্বারা তিনি শকাব্দা ১৪[illegible] শকে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। জ্যোতিষ তত্ত্ব তাঁহার শেষ বয়সের গ্রন্থ। ১৪৫৫ শকে চৈতন্যের লোকান্তর হয়, তখন রঘুনন্দন জীবিত। তাঁহার একাদশীতত্ত্ব হরিভক্তি গ্রন্থের যে প্রমাণ দিয়াছেন ঐ গ্রন্থ চৈতন্যের সময় প্রস্তুত ইহাতেও জানা যায় যে. চৈতন্যের বয়ঃ কনিষ্ঠ ছিলেন।

রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্য এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীস এই চারি জন বাসুদেবের প্রধান ছাত্র বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু কতদুর সত্য স্থির করিতে পারি নাই। কারণ চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে যাহা লিখিত আছে তাহাতে চৈতন্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পাড়িয়াছিলেন অন্য কোন দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং পুরুষোত্তমে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাতেও চৈতন্য বাসুদেবের ছাত্র বলিয়া বোধ হয় না।

কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য অতি প্রাচীন বাঙ্গালী নহেন। বিশ্বনাথ নবদ্বীপ নিবাসী সুতরাং বাঙ্গালী। "হরের গদা, গদার জয়, জয়ের বিশু, লোকে কয়"। হরিরামের ছাত্র গদাধর গদাধরের ছাত্র জয়কৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণের ছাত্র বিশ্বনাথ। কুল্লুকভট্ট বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ইহা তাঁহার নিজ লিখিত মনুর টীকায় প্রমাণ। উপর্য্যুক্ত বিষয় ও অন্যান্য বিষয় বিশেষ করিয়া পরে লিখিব। এক্ষণে এই পর্য্যন্তই রহিল ইতি।

কবির বিয়ে

বরষা,

তোদের বাড়ী কেন এত ধুম?
রদ্দুর গিয়েছে মারা
দর্দ্দুর দিয়েছে সাড়া
জলদ বাজায় কাড়া
গুড়ু-[illegible]!
গগনের নহবতে
কেন এত ধুম?

দ্বারপাল দাঁড় কাক
বাজায় বিজয় ঢাক্
শিঙা ফুকে দেয় হাঁক্
হোম্‌রা হুতুম্ !
কোকিল উকীল আজি
নীরব নিঝুম্ !

ভাঙায় ডাকিল বান
কুঞ্জে "কোকা" করে গান
ঝিঁঝি পোকা ধরে তান—
বে-মালুম্ "ঝুম্"
আজি যে তোদের বাড়ী
বেজায় জুলুম ?

কে তুমি ধানের ক্ষেতে
সাটিনের শয্যা পেতে
এ ভরা বাদর রেতে
চোখে নাহি ঘুম্ ?

একি ?

রামগিরি গেল গ'লে
শিপ্রা নদী ক্ষিপ্র চলে
পাহাড়ে পাহাড়ে ফলে
জল-জ্যান্ত "জুম্"
অবুঝের ঘরে আজি
সবুজের ধুম !
কে গো অই আম্রডালে
বিজলীর বাতি জ্বালে ?
নদ-নদী-বিলে-খালে
মস্ত মুরসুম্ !
কবির হইবে বিয়া
আর শিখী শাঁক্ নিয়া
গাওহে মল্লার মিঞা—
রিমি ঝিমি ঝুম্ !

তোরা,

কেতকী চামর ঢুলা
শ্রবণে ঝুম্‌কা ঝুলা
ইন্দ্রচাপ অঙ্গে বুলা—
চন্দন কুঙ্কুম !
এয়ো-বৌ মৌমাছিরা
বাজা সবে সপ্তস্বরা
আজি হবে স্বয়ম্বরা
কদম্ব কুসুম—
পুলক ফুটিছে গায়,
পাগল পূবের বায়
পরাগ মাখিয়া গায়—
তা-না-না-না-তুম্ !
গগনে পবনে বড়
লেগে গেছে ধুম !

আজি,

গাহুক্ সরাল শ্যামা
ডাহুক্ মরাল মামা
মণ্ডূকের সা-রি-গা-মা
ভেঙ্গে দিল ঘুম্
কপোত-কপোতী ডাকে—
"বাক্‌কুম্—বাককুম !"

শ্রীকুল চন্দ্র দে।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

সেরপুরে বন্ধুলাভ।

(৪)

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী, আমাদের কবিভ্রাতা শ্রীমান্ তারাসুন্দর বাচস্পতির জননী, যখন সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করেন, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। সেরপুর অবস্থিতি সময়ে তিনি যে সকল বিদ্যোৎসাহী 'ভূস্বামী' বন্ধুর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিদ্যাবিভব, ও সুখ-সম্মান লাভের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য করিছেন,—তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে,—তাঁহাদের মত বিদ্যোৎসাহী ধনবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির উৎসাহ না পাইলে আজ আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে জগতের এত উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিতে পাইতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যের কথা দূরে থাক সেরপুরের পুণ্যশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা তারামণি চৌধুরাণী মহাশয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পরিবারিক সুখদুঃখের সহিত যেরূপ জড়িত—আপদে বিপদে, আনন্দে ও উৎসবে যেরূপ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন, প্রয়োজন মত অর্থ-সামগ্রী বা লোক-জন দ্বারা যেরূপ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরিবারের প্রতি সেই সাধ্বী ভূস্বামিনীর যেরূপ সদয় দৃষ্টিপাত,—বর্ত্তমান সময় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধুবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় "বহুবান্ধব" ছিলেন,—প্রায় সকল বন্ধুই তাঁহার জন্য বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেন, অনেকেই তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্তও দিয়াছেন,—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধুবর্গ সম্বন্ধে আমাদের একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় রহিয়াছে।

সংসারে আমরা অনেক প্রকার বন্ধু দেখিতে পাই। আমাদের আপদে বিপদে যাঁহারা সাহায্য করেন,—আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনকল্পে যাঁহারা দান বিতরণ করেন, যাঁহারা যে কোনও প্রকারে আমাদের সকল রকম উপকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, সুখে দুঃখে হাসিকান্নার প্রতিধ্বনি তুলিয়া সামাজিকতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন,—তাহারাই আমাদের এক শ্রেণীর বন্ধু। ইঁহারা স্থলবিশেষে 'দাতা', 'দয়ালু', 'পরোপকারী', 'সামাজিক' বা 'সহৃদয় ব্যক্তি' নামে অভিহিত হইতে পারেন,—কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধিকাংশ বন্ধুই আরও একটু উন্নত শ্রেণীর। তাঁহাদের বন্ধুতা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংসারের সকল কার্য্যে সকল সময়ে সর্ব্বপ্রকারে অনুভব করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক সকল ঘটনার ফলাফলের সহিত জড়িত, সকল কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং সকল প্রকার সুখদুঃখের সহিত তুল্যানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনেক বন্ধুকেই দেখিয়াছি। তাঁহারা বুকের রক্ত ধারা বিনিময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সুখসৌভাগ্য সম্পাদন করিতে যেন প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ চিরকাল 'বন্ধু' ছিলেন। এখনও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা সেইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ বন্ধুলাভ প্রায় অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। আমরা 'দাতা' পাইতে পারি, 'পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি' পাইতে পারি, 'দয়ালু' পাইতে পারি, 'সমাজিক লোক' পাইতে পারি, যাঁহারা সমাজ হিতার্থ সাহায্য করেন, কর্ত্তব্যানুরোধে 'দেবত্র,' 'ব্রহ্মত্র' প্রদান করেন, এখনকার দিনেও সেরূপ লোকের একান্ত অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু তেমন সহৃদয় বন্ধু, তেমন একপ্রাণ মহানুভব বন্ধু, কয়জন দেখিতে পাই? তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগ্য-বলে অনুরূপ বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে আদর্শ বন্ধুরূপেই পাইয়াছিলেন। তিনিও বন্ধুর সুখ-দুঃখে অতিমাত্র জড়িত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বন্ধু বাৎসল্য, বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি এ প্রাচীন বয়সে রোগাক্রান্ত শরীর নিয়া ও অনবরত বন্ধুগণের কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সে চেষ্টার মধ্যে সামাজিকতার অভাব না থাকিলেও বন্ধুবাৎসল্য ও অকৃত্রিমতার পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান থাকিত।

সেরপুরের জমিদারবর্গের বন্ধুতা তাঁহাকে সাধারণের বন্ধুতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। অথবা তাদৃশ ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকের বন্ধুতার গর্ব্বে তাঁহাকে একদিনের জন্যও কেহ অভিমান প্রকাশ করিতে দেখে নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি আশ্চর্য্য রূপে পৃথিবীর বহুতর স্পৃহনীয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ততোধিক আশ্চর্য্যরূপে তিনি সে সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যত্ব সম্পন্ন উন্নত শ্রেণীর পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গেই বন্ধুতা ঘটিত, তাই তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সাধারণ অপেক্ষা কিছু বিশেষ মহত্ত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার "সেরপুরে বন্ধুলাভ" প্রসঙ্গে আমরা আরও দুই চারিটী বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়া অন্যান্য কথার আলোচনা করিব। বৈষয়িক বন্ধুদিগের মধ্যে সেরপুরের প্রসিদ্ধ তালুকদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পত্র-নবীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পত্রনবীশ মহাশয় সেরপুর প্রদেশে অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাসভবন সেরপুরে যখন যখন গিয়াছি, দেখিয়াছি বৃদ্ধ পত্রনবীশ মহাশয় প্রায় প্রত্যহ আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে, অনেক রহস্য হইয়াছে, অনেক বৈষয়িক ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছে। বৃদ্ধ পত্রনবীশ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র-বিয়োগে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিতান্ত মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরিবার মধ্যেও একটা শোকের প্রবল অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও পত্রনবীশ মহাশয়ের সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনেক আলোচনা হইত। পত্র-নবীশ মহাশয় প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইলেও বর্ত্তমান নব্য তন্ত্রের প্রবল শক্তির সহিত কোন প্রকারে "ভাব রক্ষা" করিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং সেই সকল 'ভাব' কিসে রক্ষিত হইতে পারে, পরমবন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে তাহারই পরামর্শ বা আলোচনা চলিত। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় অচল অটল ভাবে নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবেকেরই মাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এ ক্ষেত্রে বন্ধুবাৎসল্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। আমরা বারান্তরে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা রাখি।

এইবার আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কয়েকটী "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" বন্ধুলাভের কথার অবতারণা করিব। তর্কালঙ্কার মহাশয় এদেশে অবস্থান কালে তিনটী পণ্ডিত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন।

পাবনা জেলায় "হরিণা বাগ্‌বাটী" নিবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে জড়িত ছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্য ও অলঙ্কার সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তর্কালঙ্কার মহাশয় সকল শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু তিনি যখন চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন সেই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই তিনি দিবারাত্রি অক্লান্ত শ্রম সহকারে সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর ২।১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সেই অধ্যয়ন-ক্ষমতা মন্দীভূত হইয়াছিল মাত্র। তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে অল্পদিন মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা-বলে কাব্য এবং অলঙ্কারে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থরাশি ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ "অলঙ্কারসূত্র" তাঁহার সাহিত্য ও অলঙ্কার জ্ঞানের নিকষ প্রস্তররূপে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। এইরূপ নব্য ন্যায় ও প্রাচীন ন্যায় শাস্ত্রের অনেক মৌলিক তথ্যের অনুশীলন করিতে গিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট সাময়িক আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই কথার আলোচনা ইতি পূর্ব্বেই করিয়াছি, তর্করত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সুহৃৎ শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। কিন্তু যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আর একটী বন্ধু ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত "ন পাড়া" গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়। উক্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সাংখ্য ও বেদান্তাদি দর্শনে অতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে একান্ত ভাল বাসিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সাংখ্য, বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শনের অনেক স্থান উক্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের আনুকূল্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেরপুরে অধ্যাপনার সময় এই মহাত্মার সাহচর্য্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সকল উপকারের কথা তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি সরলভাবে স্বীকার করিতেন, অনেক সময়ে নিজেও গল্প করিতেন। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের অনেক প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এবং স্বর্গীয় হরচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় এতদ্দেশে খুব বড় রকমের দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহাদের জন্য সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন। ইঁহারা যদি এই সুদূর পল্লীপ্রদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া অন্য কোনও সমুন্নত প্রদেশে জন্মগ্রণ করিতেন, তবে বুঝি ইহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় সকল জগৎ মুগ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করিত । উক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন।

মহাত্মা বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাদের পরমবন্ধু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের বর্ত্তমান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জেষ্ঠতাত। ইনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গোহাটা গ্রামে, প্রসিদ্ধ পূর্ণানন্দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ ও আসামে ইঁহাদের বহুতর সম্ভ্রান্ত শিষ্য বর্ত্তমান। এতদ্দেশে ইহাদের সম্মান সামান্য নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতৃদেব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যখন টোল করেন তখন বেদান্তবাগীশ মহাশয় সেই টোলের ছাত্র হন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত এক পাঠে ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন করেন, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও একান্ত প্রতিভাশালী ছিলেন,—সুতরাং প্রতিভার অবতার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সহজেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উভয়ের জীবনের স্রোতঃ কালে বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নিয়মে গার্হস্থ্য জীবনে আবার দুই বন্ধু একই কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়া পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে ও পরস্পর অর্জ্জিত বিদ্যার বিনিময় দ্বারা অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে মনস্বী বন্ধুর সহিত জীবনের অধিকাংশ সময় অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, সেই মহাত্মা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই সকল প্রাচীন কথার আংশিক আলোচনাতেও লাভ আছে। ইহা দ্বারা আমরা প্রাচীন রীতিনীতির অনেকটা আভাস পাইয়া থাকি; যাঁহারা বিদ্যা ও মনুষ্যত্বে সকলের বরণীয় হইবার যোগ্যতা সত্বেও দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ একমত লোকলোচনের অগোচরে জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আমরা চিনিয়া রাখিতে পারি নাই, অথচ চিনিয়া রাখা নিতান্তই উচিত ছিল, পরন্তু চিনিয়া রাখিবার মত সামগ্রীও

তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে দু'একজনকেও হয়ত আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিব,—এইজন্যই আমরা এ সকল কথার আলোচনা করিতে ভালবাসি। জানি না আমাদের প্রিয়পাঠক মহাশয়দিগের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম কি না, তবে ভরসা আছে এসকল প্রসঙ্গ নীরস হইলেও সমাজ-তত্ত্বের অনুশীলনের সাহায্যকল্পে তাঁহাদের ক্ষীণ কৌতুহল কথঞ্চিৎ উদ্রিক্ত করিতে পারিবে।

বেদান্ত বাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধু অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ছিলেন। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরস্পরের মানসিক প্রণয় জনসমাজে 'বন্ধুতা' আখ্যায় আখ্যাত হইবার রীতি সুদীর্ঘকাল হইতে এ৺দেশে প্রচলিত আছে। ঐসকল অনুষ্ঠানযোগে প্রণয়িযুগল 'বন্ধুতা' সংস্থাপন করিয়া থাকেন। তাহার ফলে প্রণয়ি-যুগলের প্রণয় পরস্পরের পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকল পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সকলের সঙ্গেই একটী অপূর্ব্ব মধুর সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার ও অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এহেন বন্ধুতা,—যে বন্ধুতা শুধু জীবনে নহে মরণের পড়েও বন্ধুকে অতি আত্মীয়ের মত অশৌচ গ্রহণ করাইয়া দেয় সেইরূপ বন্ধুতা,—বেদান্তবাগীণ মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যে নানাবিধ অনুষ্ঠান সহযোগে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ বন্ধুতা তখনকার দিনে অনেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যাইত, এইরূপ বন্ধুতার ফলে পুরুষানুক্রমে আত্মীয়তা রহিয়া যায়। কিন্তু এখন আমরা এইরূপ বন্ধুতার পক্ষপাতী নহি, কোনও বিষয়ের মধ্যে যে কিছু একটা অনুষ্ঠানকে আমল দিতে আমরা মোটেই ইচ্ছা করি না। আমরা প্রায় সকল কাজই অতি সংক্ষেপে অতি গোপনে ও অতি সন্তর্পণে করিতে চেষ্টা করি, এমনভাবে কাজটি করিতে চাই যে আবশ্যক বোধ হওয়া মাত্র তাহাকে বেমালুম অস্বীকার করিবার সুবিধাটুকু যেন আমাদের হস্তচ্যুত না হয়!—আমাদের এখনকার বন্ধুতা অনেকস্থলেই একদিনের কথার একটী আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আগেকার দিনের 'বন্ধুতার' যে নিয়মটী ছিল, যে অনুষ্ঠানটা হইত, তাহাকে সহসা অস্বীকার করা যাইত না। কোনও কারণে মানব বন্ধনটী সহসা শিথিল হইলেও বাহ্য বন্ধনটী তাহাকে ক্রমে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারিত, ফলে বন্ধুতা ক্ষণ ভঙ্গুর হইত না, বন্ধুতা না হয় মন্দ নহে, কিন্তু ক্ষণ-ভঙ্গুর বন্ধুতা মানব সমাজের সবিশেষ অনিষ্টকারী সন্দেহ নাই। আমরা আজি দেখিব বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের সহিত বন্ধুতার ফলে তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক প্রকার উপকার পাইয়াছেন। কিন্তু এই উপকার, বন্ধুযুগলের মধুর বন্ধুতার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

যাহা হউক্ বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎ-পন্ন ছিলেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহার নিকট এসকল দর্শনের অনেক গ্রন্থ একরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন বলি-লেও অত্যক্তি হয় না।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় বন্ধুলাভ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে যে কত বড় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বেদান্তবাগীশ মহায়য়ের দর্শন অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটী বিচিত্র গল্প আছে। রংপুর তুষভাণ্ডারের জমিদার স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়দিগের পৈতৃক শিষ্য ছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্যকরণ ও কাব্যের পাঠ সমাপন করিয়া রংপুর শিষ্যালয় গিয়াছিলেন।

গুরুপুত্রের বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য চৌধুরী মহাশয় দর্শন শাস্ত্রের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয় দর্শন পড়েন নাই বলিয়া

সে সকল প্রশ্নের তেমন সুচারু উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয় কিছু উগ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বেদান্ত বাগীশ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর কুমার! প্রশ্নের উত্তর করিবার মত বিদ্যা শিক্ষা না করিলে বার্ষিকের দাবি চলিবে না!" বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও হঠিবার পাত্র নহেন, তিনি তেজস্বিতার সহিত বলিলেন, "প্রশ্নই বা করেন ক জন, উত্তরই বা শুনেন ক জন—আর প্রশ্নের উত্তর পাইবার মত বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যই বা করেন ক জন?"—শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় মাথা হেঠ করিতে বাধ্য হইলেন। অচিরাৎ গুরুপুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইল. বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় শিব্যালয় রংপুর হইতেই বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য পুণ্যক্ষেত্র ৺নারায়ণ কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া পণ্ডিতস্বামী কি 'আচার্য্য-স্বামী' ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না, ইহাদের একজনের নিকট দর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। ক্রমে চারিবৎসর কাল বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় একজন ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক 'মঠে' অধ্যয়ন করিতেন. তাঁহার প্রতিভা ও সুশীলতা দেখিয়া 'স্বামীজী' তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু সতীর্থ হিন্দুস্থানী বিদ্যার্থি-গণ, কিছু ঈর্ষা করিতেন, বাঙ্গালীর চির অপবাদ 'মৎস্যভোজিত্ব' পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ধামেও বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিল। তিনি "মছলী-খোর্ বাঙ্গালী" ইত্যাদি সম্ভাষণে সর্ব্বদা সম্ভাষিত হইতেন। কথাটা একদিন স্বামীজীর কানে গেল, তিনি প্রিয়শিষ্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বাবা, ইহারা তোমাকে বিরক্ত করিতেছে তুমি ইহাদিগকে পলাণ্ডুভোজী হিন্দুস্থানী বলিয়া প্রত্যুত্তর দিও দেখিবে গোলমিটিয়া যাইবে।" ফলে হইলও তাহাই। বেদান্তবাগীশ মহাশয় নিরুদ্বেগ হইলেন। কিন্তু এদিকে বেদান্ত বাগীশ মহাশয় দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাস করিয়া, বেদান্তদর্শন অধ্যয়নে ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্তে দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার চিত্ত ক্রমে নিবৃত্তিযানে প্রধাবিত হইতে লাগিল, তিনি দণ্ডগ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। সে যে কি আগ্রহ! সমস্তই প্রস্তুত, মাত্র গুরুজীর অনু-মতি গ্রহণের প্রতীক্ষা, কিন্তু গুরুজী জানিতেন বেদান্ত বাগীশ মহাশয় মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসেন নাই, সুতরাং তিনি দণ্ড গ্রহণে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন. পরন্তু নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে গৃহী হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় যখন যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিয়াও গুরুজীর অনুমতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেন তখন বিষণ্ণহৃদয়ে দেশে ফিরিলেন। বোধ হয় গুরুজনের আদেশ গ্রহণ করিয়া আবার দণ্ডগ্রহণের জন্য ৺ কাশীধাম যাই-বেন ইহাই উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহা ঘটিল না, বহুবিধ চেষ্টায়ও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় অগত্যা সংসারী হইয়া পড়িলেন, আর 'দণ্ডগ্রহণ' হইল না! কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে আবার ৺ কাশীধাম লইয়া গেল। তিনি ক্রমে দুই বৎসরকাল গীতা ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া 'বেদান্ত বাগীশ' উপাধিলাভ করত দেশে প্রত্যাগত হইলেন। সেই হইতেই প্রায় অধি-কাংশ সময় পরমবন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত একত্র বাস করিতেন। অনেকদিন হইল বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহা-শয়কে দেশের অল্পলোকেই জানিত, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রতিভার সাহায্যে যে মহানুভব পণ্ডিত কোনও কোনও বিষয় নিজ প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা সংসারে অতি অল্প। তর্কা-লঙ্কার মহাশয়ের এইসকল বন্ধুলাভ তাঁহার জীবনকে অতি মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সহৃদয় বন্ধুগণের প্রভাব আমাদের মধ্যে অতি সহজে বিস্তৃতিলাভ করিয়া থাকে, এইসকল পূতচরিত্র বন্ধু, ও নিজের পরস্পর

সাহচর্য্যে বন্ধুবর্গ—সকলেই আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল বন্ধুবর্গের নিকট হইতে নহে, যেখানে যাহা নূতন পাইয়াছেন—যতটুকু সারবস্তু পাইয়াছেন অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে তাহাই আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সাধারণে বিস্ময় বোধ করিত, কিন্তু এ স্মৃতিশক্তি যে কত সাধনার মহার্ঘ ফল তাহা সকলে বুঝিত না। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অনেকেই দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত অনেকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না যে মানুষ কি করিয়া এত শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং প্রায় অনেকেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তর্কালঙ্কার মহাশয় কোনও দৈবশক্তির প্রভাবে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছেন! হায়! দেশ কতকাল পুরুষকারের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছে!

কলিকাতা অবস্থানকালে একদিন একটী ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,--"মহাশয়, আপনার জিহ্বায় নাকি একজন সন্ন্যাসী একটী বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন?—কথাটা কি সত্য?" এ দীন প্রবন্ধলেখক সেখানে উপস্থিত ছিল। শুনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় একটু হাসিলেন, এবং বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয় আমি পঠদ্দশা হইতে যতদূর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া আসিতেছি সে রূপ পরিশ্রম আজকাল অনেকেই করিতে চাহেন না। যে সামান্য একটু জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়া আপনারা মনে করেন, তাহা আমার চিরজীবন অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের ফল মাত্র!" ভদ্রলোকটী একটু লাজ্জিত হইলেন, আমরাও নিজেদের ক্রটী অনুভব করিয়া নিতান্ত অপরাধীরমত মাথা হেঠ করিয়া রহিলাম। এইরূপ কতদিন কত প্রসঙ্গে সেই মহাপুরুষের কত উপদেশবাণী শুনিয়াছি, কত কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত পাইয়াছি, কত মহত্বের কথা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে," কিন্তু হায় এমন উদাত্ত সুরে জীবনের যন্ত্রটীকে ত এক দিনের জন্যও বাঁধিতে পারিলাম না!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধিকা

আজ শতাধিক বর্ষ অতীত হইল বঙ্গের সরস শ্যামল কুঞ্জে বসিয়া বৈষ্ণব কবিগণ একটী অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। অস্তগামী রবির স্বর্ণাভকিরণ-স্নাতা প্রকৃতির শোভা যেমন মানব-চিত্তকে বিমোহিত করে, গভীর নিশীথে দূরাগত বংশীরব যেমন শ্রবণ-পথে অমৃতধারা বর্ষণ করে, সুনীল যমুনা-সৈকতে প্রেমময়ী রাধিকার উন্মাদিনী মূর্ত্তি এবং তাঁহার মধুর প্রেম-রাগিণী তেমনি সহৃদয় পাঠকের নয়ন-মন বিমুগ্ধ করে সন্দেহ নাই। একদিন একজন প্রেমিক কবির কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম

"পাই যদি কভু গঠিতে রমণী
প্রাণ ভরি গঠি তায়;
ছাঁকিয়া নবনী চাঁদের আঁচলে
কম করি গঠি তায়।"

বাস্তবিক কাব্যের জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা অনেক প্রকার রমণী-চিত্র দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কবিগণের হস্তে এই রমণী-মূর্ত্তি এক একটী অপূর্ব্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতা, সতী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, ডেসডিমনা, মিরণ্ডা, জুলিয়েট,—ইঁহারা সকলেই অপরূপ রমণী মূর্ত্তি। ইঁহাদিগের এক একটী জীবন-আলেখ্য সাধারণের আরাধনার সামগ্রী। কবিগণ ইঁহাদিগকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে দয়া, প্রেম, পুণ্য, অসামান্য পতিভক্তি, আত্ম-বিসর্জ্জন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গুণরাশি অতি সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় যুগে বৈষ্ণব কবিগণের হস্তে কলঙ্কিনী রাধিকার যে উন্মাদিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি তাহার নিকট বুঝি সকল চিত্রই পরাস্ত। বৈষ্ণব যুগে বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত

করিয়া দিয়াছে। পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ। চিরবাঞ্ছিতের দেহস্পর্শ করিতে, তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া জীবন-মন সার্থক করিতে, তাঁহার প্রেম-মকরন্দে চিরদিনের নিমিত্ত আত্মহারা হইয়া থাকিতে স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস। এই অশ্রু হইতেই শ্রীরাধার জন্ম, এই অশ্রুতেই তাঁহার বিকাশ, এবং ইহাতেই তাঁহার বিলোপ। এই নিমিত্তই এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রেমিক পাঠকের আরাধ্যা দেবী।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি সকল কবিগণের কাব্যেই আমরা এই নারীমূর্ত্তির পরিস্ফুটন দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবিগণ রাধিকাকে কলঙ্কিনী বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়াছেন। রাধা কলঙ্কিনী কিন্তু তন্নিমিত্ত তিনি লজ্জিতা নহেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমের দাসী এ কথা নগরে নগরে প্রচার হউক তাহাতে রাধার দুঃখ নাই। এ কলঙ্কের ডালি গৌরবের ডালি বলিয়া রাধা নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি একদিন তাঁহার ননদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন

'ননদিনী বল নগরে নগরে
ডুবেছে রাই কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।'

এ কলঙ্ক-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত রাধিকার বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। যিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের চরণে দেহ মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার আত্মাভিমান কিসের? যতক্ষণ আপনার বলিয়া কিছু রহিল ততক্ষণ আত্মোৎসর্গ হইল কই? রাধিকা-চরিত্রে এই অপার্থিব আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে একটী স্বর্গীয় উপাদান আছে। মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে সে গীত-লহরী সহসা কি এক অজ্ঞাত সুরলোকের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। রাধা-চরিত্র অঙ্কনেও সেই উপাদানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাধিকার আত্ম-বিসর্জ্জন ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা কেবল ভক্ত ও ভগবানের মিলন-ভূমি। যে প্রেমিক সাধক আপনার বাঞ্ছিতের চরণে সকল জীবন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আবার লোকলজ্জা কিসের! প্রিয়তমের প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যদি লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করে, তবে তাহা তাঁহার অপবাদ নহে আশীর্ব্বাদ। রাধাপ্রেমেও এইভাব অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহা এত মধুর। ইহা ত গেল আত্ম-বিসর্জ্জন। এখন একবার এই অপূর্ব্ব তন্ময়ত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে তিনি যখন প্রথম দেখাইয়াছেন তখনই উন্মাদিনীর বেশ। রাধিকা আপনার শ্যামল কুন্তলজালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কারণ সেখানে কৃষ্ণরূপের মাধুরী আছে। শ্যামল মেঘমালার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন,কারণ মেঘমালা তাঁহার প্রিয়তমকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তমাল-লতাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া দিতেছেন, কেন না তিনি ভাবিতেছেন, "কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাই তমাল বড় ভাল বাসি।"

তাঁহার চিত্ত ওই শ্যামরূপে তন্ময়। চতুর্দ্দিকে আর কিছুতে তাঁহার নয়ন মন আকৃষ্ট হয় না, কেবল "পলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।"

এই ভাব পাঠ করিতে করিতে আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। সে দিন প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য পৌর্ণমাসী রজনীর সুধাধারাপ্লাবিত শ্যামল সাগর বক্ষকে তাঁহারই প্রিয়তমের বক্ষ মনে করিয়া তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে দুইটী ভাবের পরস্পর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রেমিক সাধকের ভগবদ্ভক্তিতে। তাই এ প্রেম সাধারণ সীমা

অতিক্রম করিয়া অপার্থিব স্বর্গলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যদিও রাধার অন্তর সর্ব্বদাই তাহার প্রিয়তমের সত্তায় পূর্ণ ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে রাধা এ মধুর শ্রদ্ধা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন না। এই সময়ই রাধিকার পূর্ণ বিরহের সময়। রাধিকার অন্তর এ তীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। তিনি তমাল-তলে, যমুনা-সৈকতে, গোচারণ-ভূমিতে তাঁহার প্রিয়তমের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনিও মধ্যে মধ্যে এইরূপে তাঁহার প্রাণের দেবতার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। যখন শ্রীচৈতন্যের অন্তরে এরূপ শুষ্কতা আসিত তখন তিনি বালকের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অধিকক্ষণ তাহার প্রিয়তম ভক্তের কাতরতা সহ্য করিতে পারিতেন না; অচিরে দর্শন দিতেন। সখার আগমনে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়কুটীর চরিতার্থ হইত, দরদর ধারে প্রেমবিন্দু জড়িত হইয়া তাঁহার সুন্দর বক্ষকে প্লাবিত করিত। তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইতেন। রাধাপ্রেমেও আমরা এ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই। বিরহ-বিধুরা রাধিকা সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। তাঁহার আহার-বিহার আমোদ-প্রমোদ কিছুতেই রুচি নাই; অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, তাঁহার প্রিয়তম মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাধিকা নয়ন ফিরাইয়া সে শ্যামল কান্তি নিরীক্ষণ করিতেই তাঁহার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত সংযত হইল. তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন;

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা;
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা;
আজু মঝু গেহ গেহ ভেল মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা—
আজু বিহি মোরে অনকূল হয়লো
টুটল সবহু সন্দেহা।"

তাই বলিতেছিলাম রাধাপ্রেম মানবীয় প্রেমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনেক উর্দ্ধে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। আজ এই নিমিত্তই বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে এ প্রেম-রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ,ভারতবাসী চিরদিন আপনার হৃদয়-মন্দিরে প্রাণের দেবতাকে বসাইয়া বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই রাধাপ্রেমের এ জটিল মনোবিজ্ঞান-তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রেমিক সাধক ভিন্ন অন্য কাহারও চিত্ত এতদূর স্পর্শ করে নাই। যাহাদের হৃদয় নাই তাহারা এ অপার্থিব প্রেমতত্ত্বের কি বুঝিবে! কিন্তু আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহারা অন্ততঃ একদিনের তরেও নয়নজলে আপনার জীবন-দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে এ নারীমূর্ত্তি অপার্থিব রমণী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। সাধারণের চক্ষে রাধিকা কলঙ্কিনী বলিয়া অনাদৃতা হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রেমিক সাধক তাঁহারা বুঝিবেন, যিনি আপনার জীবনযৌবন, কুলশীল, লজ্জাভয়, সকল আপনার প্রিয়তমের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া শুধু এক চিন্তা এক ধ্যান এক কামনা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে পারেন, তিনি মানবী নহেন দেবী, তিনি ইহলোকে বাস করিয়াও সুরলোকবাসিনী, তিনি নারীকুলের আরাধ্যা সতীকুলের শ্রেষ্ঠা সতী।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্তা।

পর্য্যটক

নিতে আসি নাই কিছু তোদের পৃথিবী হ'তে,
আসি নাই দিতে ;
কিংবা আসি নাই হেথা মিশিতে তোদের সনে
নৃত্য আর গীতে ;
খেলিতে আসিনি হেথা—আমারে পাবে না কিছু
জয়ে পরাজয়ে ;
হরিতে আসিনি কিছু অস্ত্র লয়ে দস্যু-সাজে,
কিম্বা চোর হ'য়ে ;
আসি নি ধনের লাগি', আসি নি যশের লাগি,
নাহি চাই জন,
নাহি চাহি ভালবাসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মায়া
নাহি প্রয়োজন।
তোদের মলয়-সেবা তোদের জোছনা পান
মানি তুচ্ছ বলে,
তোদের ফুলের ঘ্রাণে, পাখী-গানে মুগ্ধ হয়ে
রহিনি ভূতলে ;
কামিনীর হাসিটুকু কিংবা তার প্রেমালাপে
স্বর্গ মানি নাই ;
তার পায়ে অপরাধী—সংসারের কারাগারে
রব না সদাই !
চৌদ্দ পুরুষের ভিটা, লাথি মেরে তার বুকে
ফেলে পিতা মাতা
রমণীরে কাঁধে লয়ে প্রবাসে নাচিব বলে
আসি নাই হেথা !
কর্ত্তব্য তোদের যাহা, করিতে আসিনি আমি
হেথা সেই সব :—
ধর্ম্মের প্রচার, কিংবা সমাজ-সংস্কার, কিংবা
"কংগ্রেস" উৎসব।
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারিতে—তারে দিতে স্বাধীনতা
আসি নাই হেথা ;
উপাধি কিনিতে, কিংবা "ডিগ্রী" নিয়ে বড় হ'তে
কিংবা হয়ে নেতা
জাতিভেদ উঠাইয়ে, ধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন
ভারতের কাজ
সাধিতে আসিনি হেথা—ঘুচাইতে সভ্যতায়
স্বদেশের লাজ !!

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে পর্য্যটন করি সদা
করঙ্গ-কম্বল লয়ে আমি পর্য্যটক ;
কোথা হ'তে কোন দিকে কত কোটী যুগ ধরে
কি কাজে চালায় মোরে বিশ্বের চালক !
ছুটিতে ছুটিতে আমি পথ ভুলে আসিয়াছি
তোদের ধরায়,
কোটী কোটী মায়া হেরি চারিদিকে ধেয়ে আসে
গ্রাসিবে আমায়।
কেহ নর, নারী কেহ, কেহ শিশু, বৃদ্ধ কেহ—
যুবতী যুবক—
কারো আঁখি ছল ছল—কারো রোষে দুটি আঁখি
জ্বলে ধক্ ধক্ !
কেহ কহে ভালবাসি,—লয়ে যায় গৃহে মোরে
আদরে ধরিয়া ;
ঘরের বাহির ক'রে কেহ কহে শত্রু তুই,
ফেলিব মারিয়া !
বিজনে বসিয়া হেথা নিজ মনে নিশি দিন
মাতি নিজ গানে,—
"কবি হ'তে চাহ বাছা"—এই ব'লে ওরা এসে
চুলে ধরে টানে !
"সমালোচনার শূলে তোমারে বসাব আমি
সচিত্র মাসিকে,"
ইঙ্গিতে আকারে মোরে এই বলে কেহ কেহ
নাচে সাহিত্যিকে !

"কি লিখিছ মাথামুণ্ড, প্রেমের কবিতা চাহি,"
—করে কেহ জেদ,
কেহ চাহে "অবরোধে সধবার দুঃখ," কেহ
"বিধবার খেদ" !!
কেহ বলে "ভণ্ড তুমি, মুক্তি যদি চাহ তবে
রাধাকৃষ্ণ কও!"
কেহ কহে, "মিথ্যা কথা স্বায়ত্ত শাসন পাবে,
'ডেলিগেট' হও!"
জাতীয় শিক্ষার লাগি' বিলাতে পাঠা'তে কেহ
প্রাণ পণ করে!—

পথিক—পথিক আমি, আমারে পাবিনে তোরা,
কহি পায়ে ধরে!

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

শিলাপূজার মূলতত্ত্ব

শিলাপূজার নিদর্শন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই যে কোন না কোন সময়ে শিলাপূজা প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্তের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া বহুস্থানে শিলাপূজাতেই যে ধর্ম্মের প্রথম আরম্ভ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শিলাপূজার বিশেষ প্রাচীনত্ব তদ্দ্বারা নিঃসংশয়রূপেই প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে পর্য্যন্ত শিলাপূজার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব বাইবেল ধর্ম্মোৎপত্তির পূর্ব্বেই যে শিলাপূজার প্রচলন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না।" এখানে আমরা আমেরিকাতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ অপেন কোর্ট (The Open Court) নামক মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাপণ্ডিত ডাক্তার পল কেরাসের (Dr Paul Carus) মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

And if we consider that the most ancient prehistoric monuments in European countries are an unequivocal evidence that the Teutons, the Celts, the Slavs, the Mongolians, and also the Semites must at some time or another, have practised stone-worship we come to the conclusion that at a certain phase of man's religious development it must have been all but universal. We find traces of it preserved in that greatest storehouse of religious monument, the Bible." The Open Court, January, 1901.

পৃথিবীব্যাপিনী পূর্ব্বোক্ত প্রাথমিক শিলাপূজার মূল কোথায়, এক্ষণে ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে। যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, শিলাপূজার উৎপত্তিও সেই ভারতবর্ষে হয় বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের শিবপূজার সহিতই শিলাপূজার প্রথম যোগ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। শিবের 'গিরীশ' ও 'গিরিশ' নামে এবং দুর্গার 'পার্ব্বতী' নামে পর্ব্বতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ভারতীয় আর কোন দেবতারই এরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। পর্ব্বত শিলাময় বলিয়া শৈল নামে কথিত হইয়া থাকে। শৈলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া শিবও যে শিলার সহিত অভিন্ন-বাচিয়া বিবেচিত হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর যে "গৌরীশঙ্কর" নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেদের 'রুদ্র' দেবতা শিবের প্রকৃত স্বরূপ। এই রুদ্র দেবতা "গর্জ্জনকারী বজ্রাগ্নি" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাতে 'বজ্র' ও 'রুদ্র' অভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বেদে রুদ্রের অস্ত্র বলিয়াও বজ্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

"Rudra undoubtedly is a wielder of the thunderbolt." Vedic India by Ragozin. p. 209.

শিবলিঙ্গের উপরে যে বজ্র চিহ্ন স্থাপিত হয় তাহা

রুদ্র-বজ্রেরই নিদর্শন বলিতে হইবে। শিবের নমস্কার মন্ত্রেও তাঁহাকে বজ্রহস্ত বলিয়াই উল্লিখিত দেখা যায়; যথা

"নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥"

বেদে মেঘ 'পর্ব্বত' নামে অভিহিত হইয়াছে। বজ্রাগ্নি মেঘেতে অবস্থান করে বলিয়াই বজ্রাগ্নিরূপী রুদ্র বা শিব পর্ব্বত বা গিরিতে শয়ান বলিয়া যে 'গিরিশ' নাম প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভাব্য বোধ হয় না. এবং 'দুর্গা' বিদ্যুৎ-রূপিণী হইয়া যে 'পার্ব্বতী' নাম প্রাপ্ত হইবেন তাহাও অসম্ভাব্য বোধ হয় না।

রূপক ভাবেই যে কেবল পর্ব্বতের সহিত বজ্রের সম্বন্ধ তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃত পর্ব্বতের সহিতও বজ্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের সহিত বজ্রের স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেই যেন সর্ব্বদা পর্ব্বতে বজ্রপাত হইয়া থাকে।

রত্নাদি জ্যোতিষ্মান্ প্রস্তর বজ্রেরই বিকার বলিয়াই যেন সাধারণ বজ্র নামে অভিহিত হয়। সমস্ত মূল্যবান্ প্রস্তরই যে বজ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যাইবে —

"বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্য গন্ধসংজ্ঞকম্॥
চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফাটিকং বলকং তথা।
কর্কেতরং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ॥
স্ফাটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজময়ং শুভম্।
সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খব্রহ্মময়ং তথা॥
গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজং।
ধূলী মরকতঞ্চৈব তুথকং সীসমেব চ॥
পীলুং প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব।
ভুজঙ্গমা মণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ॥
তিথিভঞ্চ তথাপীতং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলম্।
বজ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহাভুজ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু।

ইহাদের মধ্যে বজ্রাগ্নি বা বিদ্যুৎ নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই ইহাদের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়—এই বিশ্বাস হইতেই বজ্রের বিকাররূপে ইহাদের বজ্র নাম কল্পিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রকার পর্ব্বত ও প্রস্তরের সহিত রুদ্র বা বজ্রাগ্নির সম্বন্ধ হইতেই রুদ্রের বিকাশ শিবের সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ হইয়াছে। এই জন্যই শিব 'কৈলাশ নিকেতন' নামে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন. এবং ধ্যানে তিনি 'রজত-গিরিনিভং' এই বর্ণনায় কৈলাশ গিরির সহিত তুলিত হইয়া থাকেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের প্রথম আরম্ভ ঋকটীতেই আমরা অগ্নিকে "রত্নধাতমম্" রত্নের বিশিষ্ট আধার রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। অথচ শিবের ধ্যানেও তিনি "রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্" বলিয়া কীর্ত্তিত। দেখি বজ্রাগ্নি ও অগ্নি যে মূলে অভিন্ন বেদে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রস্তর যে অগ্নি বা অগ্নিরূপী শিবের বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রস্তরই প্রথম বজ্রাগ্নিরূপ রুদ্র বা শিবের মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইত। তাহা হইতেই প্রস্তর শিবের বিশেষ চিহ্ন হইয়াছে। বিশেষ চিহ্ন বলিয়াই ইহা প্রথম লিঙ্গ নামে কথিত হইত বলিয়া বোধ হয়।* তাহাতেই প্রস্তরে শিবলিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত দেখা যায় যথা—"পাষাণে শিবপূজায়াং দ্বিগুণং ফলমীরিতম্।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মাতৃকাভেদ তন্ত্রে ১২শ পটল।

শিবলিঙ্গ পূজা এক সময়ে এরূপই বহুল প্রচার লাভ করে যে, আর্য্য অনার্য্য তুল্যভাবে ইহাতে অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই বাণাসুর কর্ত্তৃক পূজিত লিঙ্গ 'বাণলিঙ্গ'

* "লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে অনেনেতি লিঙ্গম্" ব্যাকরণে লিঙ্গ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়।

নামে আর্য্য অনার্য্য সকলেরই মধ্যে অপর সকল লিঙ্গ অপেক্ষা অধিক বরণীয় হইয়াছে। এই লিঙ্গ নর্ম্মদা জলে স্বতঃই পর্ব্বত হইতে স্খলিত হইয়া আসে এবং ইহার আকৃতি অলৌকিক সৌষ্ঠব ও প্রভাসম্পন্ন। বাণাসুর প্রথম ইহার আবিষ্কার করেন বলিয়াই ইহা তাঁহার নামেই পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছে। এখানে আমরা বাণ-লিঙ্গের আবিষ্কার তত্ত্ব শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

'দেবীং প্রতি শিববাক্যং—

"প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পকজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথাশুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥
হংস-ডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংস্রবতে গিরিতো নর্ম্মদাজলে॥
পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্ম্মদাতটে।
আবিরাসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ॥
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোঽর্থা জগতীতলে।
অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ॥
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈক পূজনাৎ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা॥

নর্ম্মদা বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইলেও রুদ্র দেহ সম্ভূতা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিতা হইয়াছে যথা—

"নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহা দ্বি নিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরানিচ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মৎস্য পুরাণম্॥

এখানে রুদ্র যে পর্ব্বত ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুর ছিল। এই শোণিতপুর ইজিপ্তের শুন্ত্ (Shoon) বলিয়াই প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং বাণাসুর কর্ত্তৃক কেবল যে বাণলিঙ্গেরই আবিষ্কার হয় তাহা নহে, শিব-লিঙ্গ পূজাও যে তৎকর্ত্তৃক ইজিপ্তে প্রবর্ত্তিত হয় আমরা এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করিতে পারি। বাণ শিব পূজা প্রচারে এরূপই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, শিবের লিঙ্গ যেমন তাঁহার নিজের নামে পরিচিত হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছে, তেমনই শিব স্বয়ংও নিজের নমস্কার মন্ত্রে "বাণেশ্বর" নাম ধারণ করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, যথা—

"বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণা-
ময় সাগরায়
কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায়
নমঃ শিবায়॥

অনার্য্য জগতে বাণের দ্বারাই শিব পূজার প্রথম বিস্তার হয় বলিয়া উদারহৃদয় আর্য্যগণ শিবকে বাণেরই প্রচারিত ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ শিবপূজার ইতিহাসে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

শিবলিঙ্গ যেমন শিলাতে পূজিত হন বিষ্ণুচক্রও তেমনই শিলাতে পূজিত হন। শিবকে আমরা বেদের রুদ্র বলিয়া বলিয়াছি বিষ্ণুও বেদের সূর্য্য। বেদে যে "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধানিদধেপদম্" 'বিষ্ণু তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বর্ণনায় বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা সূর্য্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুর তিন পদ সূর্য্যের পূর্ব্বগগন মধ্যাহ্ন ও পশ্চিম গগনের গতি বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বিষ্ণুর যে ধ্যান মন্ত্র আছে তাহাতেও "সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী" বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রকারে বিষ্ণু সূর্য্যের সহিত মূলতঃ অভিন্ন হওয়ায় সূর্য্যমণ্ডলের চিহ্ন চক্রই বিষ্ণুর চক্রচিহ্ন হইয়াছে। বিষ্ণুর এই চক্র চিহ্ন হইতেই শালগ্রাম নামক চক্রাকার শিলা বিষ্ণুরূপে পূজিত হইয়া থাকে। শিলাতে বজ্রের অধিষ্ঠান হইতেই যেমন তাহা শিবলিঙ্গ হইয়াছে, তেমনই শিলাতে সূর্য্যতেজের অধিষ্ঠান হইতেই তাহা সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর চক্র হইয়াছে। বিষ্ণুচক্রোৎপত্তির বর্ণনা পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"তথেত্যুক্ত্বা সরবিণা ভ্রমৌকৃত্বা দিবাকরম্।
পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ॥

ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রং মিত্রস্য চাধিকম্ ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত মৎস্য পুরাণে ১১ অধ্যায়।

এখানে আমরা সূর্য্যের তেজঃই যে ত্রিশূল (অগ্নি) ও বজ্রের মূল তাহা দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতঃ অগ্নি, বজ্র বা বিদ্যুৎ, এবং সূর্য্যকিরণ যে মূলে একই পদার্থ, এবং তিনটীই যে এক তেজেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, বেদ-পুরাণে আমরা তাহার পরিষ্কার প্রমাণই প্রাপ্ত হই।

এই প্রকারে বজ্রাগ্নি সূর্য্যতেজের সহিত অভিন্ন হওয়াতে বজ্রাগ্নির ন্যায় সূর্য্য তেজেরও যে প্রস্তরের মধ্যে বিশেষ অধিষ্ঠান কল্পিত হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিবিবরণ পাঠ করিলে শিলাতে শিবলিঙ্গ পূজা হইতেই যে শালগ্রাম শিলাচক্রে বিষ্ণুপূজার কল্পনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। উক্ত বিবরণে শালগ্রাম-শিলাগিরি যেমন শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই শিবস্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে যথা—বরাহ উবাচ

কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং শালগ্রামমিতি শ্রুতম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরদেবো মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ ॥
শালগ্রামে গিরৌ তস্মিন্ শিলারূপেণ তিষ্ঠতি।
অহং তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যতা ॥
তস্মিন্ শিবাঃ সমগ্রাস্ত মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন কিংপুনশ্চক্র লাঞ্ছিতাঃ ॥
লিঙ্গরূপেণ তু হরস্তত্র দেবালয়ে গিরৌ।
শিবনাভাঃ শিলাস্তত্র চক্রনাভাস্তথাশিলাঃ ॥
সোমেশ্বরাধিষ্ঠিতস্য শিবরূপোগিরিঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বারাহে সোমেশ্বরাদি লিঙ্গমহিমা বিমুক্তিক্ষেত্র ত্রিবেণ্যাদিমহিমা নামাধ্যায়ঃ।

শিলাতে শিবপূজার ন্যায়, শালগ্রামশিলাতেও বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

"শালগ্রাম শিলা যত্র তত্র সন্নিহিতোহরিঃ
শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারবতী শিলা
মৃতে বিষ্ণুপুরং যাতি কৃতার্থং যোজনত্রয়ম্ ॥
জপঃ পূজা হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ১১ অধ্যায়।

'শালগ্রাম চক্র' 'মানলে শালগ্রাম না মানলে শিলা' প্রভৃতি প্রচলিত কথাতেও শিলারূপের সবিশেষ মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন 'বাণলিঙ্গ' শিবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিলারূপ তেমই 'শালগ্রামচক্র' বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিলারূপ। ইহাতে শিব ও বিষ্ণুই যে শিলাপূজার মূল দেবতা, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত 'বাণলিঙ্গ' ও 'শালগ্রামচক্র' নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিস্তারিত বিচার পাওয়া যায়, তেমনই ইঁহাদের পূজা সম্বন্ধেও বহুবিধ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শিলা-পূজা ভারতে কেবল যে উৎপন্ন হয় তাহা নহে, ভারতে ইহা পূর্ণ বিকাশও প্রাপ্ত হয়। প্রতিমা পূজাকে আমরা লিঙ্গ ও চক্রপূজারই শেষ বিকাশ বলিয়া মনে করি।

ভারতকে আমরা শিলা পূজার মূলস্থান বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছি। এক্ষণে এই শিলা পূজার প্রচার বিদেশে কিরূপে হয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ইজিপ্টের রাজা বাণাসুর লিঙ্গপূজা গ্রহণ ও প্রচার করিয়া সবিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণকন্যা উষার পাণিগ্রহণ করেন এবং এতদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাণের রাজধানী শোণিতপুরে উপস্থিত হন, এইরূপ পুরাণকাহিনী আছে। সুতরাং বাণাসুর যে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মহাভারতে বলরামের দেহত্যাগবর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁহার মুখ হইতে সর্পগণ নির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়

এবং মিশ্র প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক তৎসমস্ত অভিনন্দিত হয়। এই মিশ্রজাতি আমাদের নিকট মিসরজাতি বলিয়াই বোধ হয়, কারণ পুরাণাদিতে ইজিপ্ত মিশ্রদেশ বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং এই মিশ্র নাম হইতেই বর্ত্তমান মিশর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলরামের মুখনির্গত সর্পগণ তদীয় বংশধরগণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বাণাসুর প্রথম ইজিপ্তে শিবপূজা প্রচার করিলেও, বলরামবংশধরগণ কর্ত্তৃক ইজিপ্তে ও অপর অনার্য্য দেশে প্রকৃতপক্ষে শিবপূজা প্রচারিত হয়। বলরাম বংশধরগণ প্রথম বেবিলনেই উপনিবেশ সংস্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়—তাহাতেই সম্ভবতঃ তাঁহারই নাম হইতে বেবিলন নাম হইয়াছে। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যুগলাবতার ছিলেন। বলরাম শিবেরই রূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরই রূপ। সুতরাং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণে শিব-বিষ্ণুরই মিলন হইয়াছে। বলরামবংশধরগণ তাঁহাদের বংশের এই আদর্শই যে নিজেরা পূজা করিবেন এবং অন্যত্রও প্রচার করিবেন তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বলরাম বা বলদেবই বেবিলন ও অন্যত্র বেয়েল (Baal) দেব হইয়াছেন। এই শিববিষ্ণুর সম্মিলিত আদর্শের নামে যেমন আমরা শিবাবতার বলরামেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই, তেমনই রূপেও শিবরূপেরই প্রধান্য দেখিতে পাই।

ফিনিসীয়া প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আদর্শের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে, ১৯০৪খৃঃ জানুয়ারির অপেন কোর্ট পত্রিকায় ডাক্তার পল কেরাস্ তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন —

"Boal Human on Votive Stones. Found at Cita, the present Constantine, Algiers. On one of the stones the god holds in his hand a branch, the symbol of vegetation and the rejuvenescence of life, on the other, the wand of Hermes, representing the solar disc, surrounded by the crescent, an emblem, that later on, when no longer understood, was misinterpreted as two intertwined serpents."

এখানে ডাক্তারের মতে সূর্য্যচক্র ও অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নটীকেই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ ভ্রমে সর্পাকৃতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। যেরূপেই হউক ইহাতে আমরা শিব-বিষ্ণুর সম্মিলনই দেখিতে পাই। অর্দ্ধচন্দ্র শিবেরই বিশেষ চিহ্ন; তাহাতেই তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর। এ দিকে সর্পও তাঁহার চিহ্ন। তাহাতেই তিনি ফণীভূষণ।

কার্থেজে আবিষ্কৃত প্রতিকৃতি ও মুদ্রিত লিপির যে বিবরণ তিনি ঐ প্রবন্ধেই প্রদান করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করে। সেই বিবরণ এই —

"From the votive tablets of Carthage we reproduce one that is interesting in more than one respect. The inscription which stretches over the middle of the slab reads —

To the Lady Tanit-Pene-Baal and to the Baal Hammen in redemption of his vow Abdashman, son of Shafet.".

Above the inscription we see Astarte, the Lady of the countenance of Baal, holding in her hand the symbol of her divinity, a disc within a crescent." Stone worship. pp. 42-50.

এখানে যেন আমরা হরগৌরী রূপেরই চিত্র পাইতেছি। গৌরীর অর্দ্ধমুখ হরের অর্দ্ধমুখের সহিত মিলিত হইয়া হরগৌরী রূপ হইয়াছে বলিয়াই অষ্টার্ত্তি দেবী Baal এর মুখরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টার্ত্তির যেরূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন, গৌরী বা দুর্গারও তদ্রূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন: যথা দুর্গার ধ্যান, "জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাম্॥" শিবের এক নাম যে 'বাণেশ্বর' বাণেশ্বরের লিঙ্গ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবের এই 'বাণেশ্বর' নামের অপভ্রংশেও Baal হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

Baal এর সহিত যে Hammen নামের যোগ উপরে

পাওয়া গিয়াছে, ডাক্তার কেরস্ বলেন তাহা ইজিপ্তের Ammen নাম হইতেই গৃহীত। যথা Baal Hammen (the Phœnician name for the Egyptian Ammen) ইজিপ্তের Ammen নামটীকে আমরা সংস্কৃত অশ্মন্ শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। অশ্মন্ শব্দের অর্থ প্রস্তর। সুতরাং Ammen শিলালিঙ্গমূর্ত্তি বুঝায় বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়।

আরবের কাবামন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তর ধর্ম্মেতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহা এখনও তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কৃষ্ণপ্রস্তর আমাদের নিকট শিবলিঙ্গের মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। ইহার প্রমাণস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুসলমানদিগের মধ্যে এখনও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে. হিন্দুর শিব কাবাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি হিন্দুগণ ইঁহার মাথায় কোন মতে বেলপাতা দিতে পারে, তবে শিব সমস্ত মুসলমানেরই ধ্বংস সাধন করিবেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই না কি মুসলমানগণ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত না করিয়া কাহাকেও কাবাতে প্রবেশ করিতে দেয় না।

ভবিষ্যপুরাণে মক্কায় 'মুক্তেশ্বর' শিব থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'মুক্তেশ্বর' নাম হইতেই মক্কা নাম হইয়া থাকিবে। আরবের ইতিহাসে সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশ আরবে রাজত্ব করার বিবরণ পাওয়া যায়, এবং তাহাদের একজনের নাম 'মুক্তেশ্বর' থাকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মুক্তেশ্বরই পূর্ব্বোক্ত মুক্তেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাতা।

শিবপূজা কেবল আসিয়া ও আফ্রিকাতেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহা অতি প্রাচীন কালেই ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হয়। তাহাতেই স্কেণ্ডিনেভিয়া ও ব্রিটেন্ পর্য্যন্ত ইহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের ক্রম্লেক্ (Cromlech), মেন্হির (Menhir) এবং টিউমুলি (Tumuli) প্রভৃতি প্রস্তরস্তম্ভসকলে যে সর্পচিহ্ন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই এই সমস্ত যে লুপ্ত লিঙ্গপূজারই ধ্বংসাবশেষ তাহাই অনুমান হয়। সর্প বিশেষরূপে শিবের সহিতই সংযুক্ত তাহাতেই তিনি 'নাগকেশ' 'নাগহার' 'অহিভূষণ' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্পচিহ্ন যে শিবলিঙ্গেরও জ্ঞাপক হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ফরাসীদেশের পিরীনিস্ (Pyrenees) পর্ব্বতে লিঙ্গপূজার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। তথায় এখনও মেন্হির প্রস্তর লিঙ্গরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের মধ্যে মধ্যবিন্দুযুক্ত একটী বৃত্ত চিহ্ন ⊙ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা শিবেরই জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা আমাদের নিকট সূর্য্যচন্দ্র চিহ্নেরই সংমিশ্রণ বলিয়া বোধ হয়। ইংলণ্ড. স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, ব্রিটেনী, স্কেণ্ডেনেভিয়া এবং ইউরোপের অপরাপর অংশে প্রস্তরের উপর যে সমস্ত চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বারাণসীর যোনিচিহ্নের অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে ইউরোপেই লিঙ্গ পূজা প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে, আমেরিকায় পর্য্যন্ত যে ভারতীয় শিবোপাসকগণ কর্ত্তৃক লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় জে এইচ রিভেট কার্ণেক্ (J. H. Revett Carnac) যে গভীর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা মুদ্রিত করিয়াছেন. তাহা হইতে আমাদের উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন হয়। *

* "The serpent appears on the prehistoric cromlechs and menhirs of Europe, on which as stated in my paper on Kumaon Rock carving published in the Society Journal for January 1877, I believe the remains of phallic worship may also be traced. What little attention I have been able to give to the serpent symbol, has been chiefly in its connection with the worship of Mahadeb or Siva with a view to ascertain whether the worship of the snake

তাহার পর্য্যালোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর সমস্ত শিলাপূজাই প্রকৃত পক্ষে ভারতের শিবলিঙ্গ পূজার সহিত সম্বন্ধ।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

and that of Mahadeb or the phallus may be considered identical, and whether the presence of the serpent on the preshistoric remains of Europe can be shown to support my theory that the markings on the cromlechs and mennirs are indeed the traces of this form of worship carried to Europe from the East by the tribes whose remains are buried beneath the tumuli.

I have now to state briefly the direction in which I would desire that these imperfect notes should be considered to lead. As the Society know, I have for sometime past been endeavouring to collect information on the points of resemblance between the tumuli of India, and the well-known types of Scandinavia, of Brittany, and of the British Isles. In my paper on the Kumaon Rock markings, besides noting the resemblance between the cup-markings of India and of Europe—I hazarded the theory that the concentric circles and certain curious markings of what some have called the "jews-harp" type, so common in Europe, are traces of phallic worship, carried there by tribes, whose hosts descended into India, pushed forward into the remotest corners of Europe and as their traces seem to suggest, found their way on to the American continent also.

No one who compares the stone *yonis* of Benares, sent herewith, with the engravings in the first page of the work on the rock markings of Northumberland and Argyleshire, published privately by the Duke of Northumberland, President of the New Castle Society of Antiquaries, which is also set for the inspection of the Society, will deny that there is an extraordinary resemblance between the conventional symbol of Siva-worship of to-day and ancient markings on the rocks, menhirs and cromleches of Northumberland of Scotland, of the Island of Brittany, of Scandinavia and other parts of Europe. And a further examination of the forms of the cromlechs and tumuli and menhirs, will suggest that the tumuli themselves were intended to indicate the symbols of the Mahadeb and *yoni*, conceived in no obscene sense, but as representing regeneration, the new life, "life out of death, life everlasting," which those buried in the tumuli, facing towards the sun in its meridian, were expected to enjoy in the hereafter.

Many who indignantly repudiate the idea of the prevalence of phallic worship among our remote ancestors, hold that these symbols represent the snake or the sun. But admitting this, may not the snake after all, have been but a symbol of the phallus? And the sun, the invigorating power of nature, has ever, I believe, been considered to represent the same idea, not necessarily obscene, but the great mystery of nature, the life transmitted from generation to generation, or as Prof. Stephen puts it, "life out of death, life everlasting." The same idea in fact which, apart from any obscene conception, causes the rude Mahadeb and *yoni* to be worshipped daily by hundreds of thousands of Hindus.

In a most interesting paper recently read at the Society of the Antiquaries of France, some extracts of which I am now preparing for the Society, the authors M. M. Edward

গেঙ্গেরিড়ি বা গেঙ্গেরিডয়

প্রাচীনকালে গ্রীশদেশবাসিগণ ভারতবর্ষে 'যবন' বলিয়া কথিত হইতেন। মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে য়ুনানী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

ভুবনবিখ্যাত সম্রাট অশোকের অনুশাসনের এক স্থানে লিখিত আছে—"অন্তিয়োক নাম যোনরাজ পরঞ্চতেন অন্তিয়োকেন চতুর।।।। রাজানে তুরাময়ে নাম অন্তিকিনি নাম মকনাম অলিকসন্দর নাম।"

সকলেই অবগত আছেন যে, সম্রাট অশোকের অনুশাসন পালি ভাষায় রচিত। উপরি উদ্ধৃত অংশে পাঁচজন নরপতির নাম লিখিত আছে—অন্তিয়োক, তুরাময়, অন্তিকিনি, মক এবং অলিকসন্দর। যোন রাজ শব্দদ্বারা যবনরাজ বুঝায়।

সম্রাট অশোক সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র; অনুশাসনের উল্লিখিত অন্তিয়োক চন্দ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী সিলুকস নিকেটরের পৌত্র এণ্টিয়কাস থিয়স Antiochus Theos). তিনি সিরিয়া অর্থাৎ সামদেশের অধিপতি ছিলেন। এণ্টিয়কাস থিয়স ২৬১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

তুরাময় এক্ষণ আমাদের নিকট টলেমি (Ptolemy)

Piette and Juben Sacaze have actually discovered the remains of the phallic worship still existing among the people of the Pyrenees, the existence of which in Scandinavia, in days gone by, has already been brought to the notice of the Society by Dr. Rajendralal Mitra. These doctors have established the fact that to this day the menhir is still reverenced in the Pyrenees as the phallus. And I may add in conclusion that no one who has been in this country and who has noticed the monolith Mahadeb of the Western Ghats, of the Himalays, can fail to be struck with the resemblance that the menhirs of Cornac in Brittany and its neighbourhood bear to the Siva-emblem of India. I visited these remarkable remains when at home last year and was taken aback by their resemblance to well-known Indian types. The monoliths of Scotland covered with what I believe to be Mahadeb symbols, are of the same class. Added to this on the recesses of the Pyrenees, the people whose lanuguage suggests their descent from the tribes who erected tumuli and menhirs not only in this neighbourhood but also in other parts of Europe, still preserve traditions connected with these monoliths and have actually retained some traces of what I call Siva-worship.

It might be expected that Naga or Cobra would be seen at its best in the carvings or idols of Nageswar, the Cobra or Snake Temple of Benares * * * *. A Bull or Nandi and Cobra faced Mahadeb. The contents of the inner temple were peculiar. The Mahadeb consists of broad blackstone in shape something like a tumulus. Further enquiry has confirmed the opinion expressed by me and supported by Mr. Campbell of Italy in my paper on Kumaon rock markings, that whatever, it may have meant on Europe, in India the sign ⊙ means Mahadeb. There seems to be little doubt that at Nageswar the snake god is Mahadeb himself or that he is worshipped under that name and that Nageswar is a temple of Siva or Mahadeb in the form of a Naga or Cobra. The snake symbol in India, especially in connection with the worship of Siva by J. H. Rivett Carnac, Esqr, Journal of the Ariatic Society of Bengal. No 1, 1879.

নামে পরিচিত। ইনি মিসরদেশের দ্বিতীয় টলেমি। অন্তিকিনি মাসিডনিয়ার অধিপতি এন্টিয়গনাস (Antiogones)। মক সাইরিণের অধিপতি মগস্ (Magus). অলিকসন্দর ইপিরাসের (Epirus) অধিপতি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander)। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৮ অব্দ হইতে ২৫১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

যবনরাজগণের সহিত ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের অন্যূন তিন বার সংঘর্ষ হইয়াছে। প্রথমতঃ মাসিডনিয়ার অধিপতি সুবিখ্যাত অলিকসন্দর, দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার অধিপতি সিলুকাস নিকেটর, তৃতীয়তঃ বেকট্রিয়া অর্থাৎ বাহ্লিক প্রদেশের অধিপতি মিনাণ্ডার। মিনাণ্ডার ভারতবর্ষে মিলিন্দ নামে বিখ্যাত।

সম্রাট অলিকসন্দরের সময়ে উত্তরাপথে মহানন্দ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে ছিল; শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পঞ্জাব প্রদেশ কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোন কোন রাজ্যে নরপতি ছিল, কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী ইয়োরোপের একচেটিয়া নহে, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতের কোন কোন প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত থাকার প্রমাণ আছে। *

সম্রাট অলিকসন্দর পঞ্জাবে অবস্থান করার সময়ে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে গমন করিয়া পাটলিপুত্র নগর আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন, যবনরাজ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ শতদ্রুনদী অতিক্রম করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

সিলুকস নিকেটর ভারতবর্ষ আক্রমণ করার সময়ে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট ছিলেন। সিলুকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট তাঁহার তনয়া সম্প্রদান করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পঞ্জাব প্রদেশ এই সময়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত যবনরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করা যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বৃত্তান্ত কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে জাতিভেদের এতাদৃশ কঠোরতা ছিল না। সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের জননী ব্রাহ্মণ-তনয়া ছিলেন, জাতিভেদের এতাদৃশ কঠোরতা থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। তৎকালে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত এবং বিদেশীয় ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

যবনরাজ মিলিন্দের সময়ে পুষ্পমিত্র মগধের অধীশ্বর ছিলেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ইহার প্রমাণ আছে।

অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্

অরুণৎ যবনঃ মাধ্যমিকান্

ইহ পুষ্পমিত্রম্ যজয়ামঃ।

যবনরাজ মিনাণ্ডার পতঞ্জলির সময়ে সাকেত (অর্থাৎ উত্তর কোশল এবং মাধ্যমিকা অবরোধ করেন। চিতোর হইতে সার্দ্ধ পঞ্চক্রোশ উত্তরে নাগরী নামক স্থান পূর্ব্বে মাধ্যমিকা বলিয়া কথিত হইত। তিনি পুষ্পমিত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। মিনাণ্ডার পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মিলিন্দ পন্‌হো অর্থাৎ মিলিন্দপ্রশ্ন নামে একখানা গ্রন্থ আছে ইহা পালি ভাষায় রচিত। এই মিলিন্দই বেকট্রিয়ার নরপতি মিনাণ্ডার। কাবুল প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫৩ অব্দে পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহাকবি

---

* কপিলাবস্তু (শাক্যগণ); কুশীনগর (মল্লগণ); মিথিলা ও বৈশালী (ব্রিজিয়গণ)।
Buddhist India, Rhys Davids. Chap I.

প্রঃ-সঃ।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেজন্য মহর্ষি তাঁহার মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন —

"ইহ পুষ্পমিত্রং যজয়ামঃ"

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যে কলিতে সমুদ্রযাত্রা অশ্বাকার অশ্বমেধযজ্ঞ প্রভৃতির নিষেধ সূচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই এরূপ উপলব্ধি হয় : নতুবা মহর্ষি পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে ব্যাপৃত হইতেন না।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে সিলুকস নিকেটর একজন দূত প্রেরণ করেন। এই দূতের নাম মিগাসথিনিস। ইনি দীর্ঘকাল পাটলিপুত্র নগরে অবস্থান করেন। মিগাসথিনিস ভারতবর্ষের তদানীন্তন ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। সে গ্রন্থ এক্ষণ অপ্রাপ্য। পরবর্ত্তী যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণ এই গ্রন্থের বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন। জনৈক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত পরবর্ত্তী যবন লেখকগণের গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক মেক্রিণ্ডেল তাহা ইংরেজি ভাষায় অনুদিত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মূল গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনুদিত করিয়াছেন

যবন ইতিবৃত্ত লেখকগণের গ্রন্থে গেঙ্গেরিড়ি নামে একটি প্রদেশের উল্লেখ আছে। ইহারা মিগাসথিনিসের গ্রন্থ হইতে এই প্রদেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিগাসথিনিসের মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়াতে ইহার সম্যক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। রোমেন কবি ভার্জিলের গ্রন্থেও গেঙ্গেরিড়ির অধিবাসীগণের উল্লেখ আছে। গেঙ্গেরিড়ি রাজ্য কোন কোন স্থানে গেঙ্গরিডয় বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এই রাজ্য কোনস্থানে কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিল তাহার বৃত্তান্ত প্রদান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যবন ইতিবৃত্ত লেখক দায়দরা (Diodorus) মিগাসথিনিসের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, গঙ্গানদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। তদনন্তর এই নদী মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদী গেঙ্গরিডয়গণের প্রদেশের পূর্ব্বসীমা। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য বিপুলকায় হস্তী আছে। এজন্য বিদেশীয় কোন নরপতি ইহাদের রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতিগণ এই রাজ্যের অসংখ্য বিপুলকায় হস্তিগণের পরাক্রমে ভীত।

প্লিনি বলেন গঙ্গানদীর শেষভাগ গেঙ্গেরিড়িগণের দেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত। গেঙ্গেরিড়ি কলিঙ্গের রাজধানী পার্থেলিস। এই দেশের নরপতির ৬০০০০ পদাতি ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ রণকুঞ্জর সৈন্য সর্ব্বদা থাকে।

সলিন নামক অন্য একজন যবন লেখক বলেন যে, গঙ্গানদীর যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন প্রস্থ সেস্থান ৮ মাইল এবং যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেস্থান ২০ মাইল। যেস্থান সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন গভীর সেস্থান ১০০ ফুট গভীর। এই নদীর সর্ব্বশেষ স্থানের নিকট যাহারা বাস করে তাহাদিগকে গেঙ্গেরিডি বলে। এই প্রদেশের নরপতির সৈন্যসংখ্যা ৬০ হাজার পদাতি. ১ হাজার অশ্বারোহী. এবং ৭০০ রণকুঞ্জর।

ভূগোলবেত্তা টলেমি বলেন যে, গঙ্গানদী যেস্থানে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিকটে গেঙ্গেরিডিগণ বাস করে। এই প্রদেশের নরপতি গঙ্গে নামক নগরে বাস করেন।

একজন অজ্ঞাতনামা যবন লেখক বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রচিত। * ইহাতে লেখা আছে গঙ্গানদী ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী : এই নদীর তীরে গঙ্গে নামক

---

* বোধ হয় লেখক The Periplus of the Erythrean sea গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছেন—প্রঃ সঃ।

একটি নগর আছে সেখানে পান, জটামাংসী, মুক্তা এবং অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই নদীর নিকটে একটি দ্বীপ অবস্থিত।

রোমক কবি ভার্জিল এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার মন্দিরের দ্বারে গেঙ্গেরিডিগণের যুদ্ধবৃত্ত অঙ্কিত করিবেন।

এই সমস্ত উপাদান হইতে গেঙ্গেরিড় রাজ্যের কাল এবং বিস্তৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মিগাসথিনিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। মিগাসথিনিস গেঙ্গেরেড়ি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে নন্দবংশীয় ধনানন্দ উত্তরাপথে সম্রাট ছিলেন। অতএব নন্দবংশীয় নরপতিগণের সময় হইতে গেঙ্গেরিডি রাজ্যের উদ্ভব অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে গেঙ্গেরিডি রাজ্যের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূগোলবেত্তা টলেমি বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রিয়দর্শীর অনুশাসনের উল্লিখিত তুরাময় টলেমি নহে। টলেমির গ্রন্থেও গেঙ্গেরিড়ি রাজ্য বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এ প্রদেশের খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর ইতিহাস অমানিশার শালবৃক্ষসমন্বিতা অরণ্যানীর গভীরতম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে অরণ্যানীতে জোনাকার আলোকও দৃষ্ট হয় না।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ লিপিতে ডবাক এবং সমতট প্রদেশের উল্লেখ আছে।

অতএব খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে গেঙ্গেরিড়ি রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

দায়দরা যে লিখিয়াছেন যে, গঙ্গানদী গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় প্রবাহিত তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা হইতে গেঙ্গেরিড়ি রাজ্য আরম্ভ; অর্থাৎ গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের পশ্চিম সীমা মৌর্য্যসাম্রাজ্য, পূর্ব্বসীমা গঙ্গানদী হইলে এপ্রদেশ ক্ষুদ্রপ্রদেশ হয়, এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতির সর্ব্বদা ৬০ সহস্র পদাতি সৈন্য থাকা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অসংখ্য বিপুলকায় রণকুঞ্জর দ্বারা ইহা গঙ্গানদীর পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত বলিয়া অনুমান হয়। পূর্ব্ববঙ্গ বিপুলকায় কুঞ্জরের আবাস ভূমি। বিশেষতঃ দায়দরার এই উক্তি পরবর্ত্তী লেখকগণের উক্তির বিরুদ্ধ।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। অতএব মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্দ্ধারিত হইলেই গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারিত হইবে। প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' বলিলে পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইত। পশ্চিমবঙ্গ তৎকালে রাঢ়, লাড়, বা সুহ্মদেশ বলিয়া কথিত হইত। তাহার উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল।

রাঢ় এবং বঙ্গদেশ সেনরাজগণের সময়ে এবং বোধ হয় ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের সময়ে একরাজ্যভুক্ত ছিল। অন্য কোন সময়ে এই দুই প্রদেশ এক রাজ্যভুক্ত থাকা অনুমান হয় না। সুবিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের সময়ে রাঢ় প্রদেশ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

বর্ত্তমান আফগানিস্থান বেলুচিস্থান এবং পারস্যদেশের কিয়দংশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সিলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই স্থান ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদিকে বঙ্গদেশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভুক্ত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পৌত্র অশোকের সময় তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ খৃষ্টাব্দের সপ্তম

শতাব্দীতে ইয়াংচাঙ্ সমতটে অশোকের চৈত্য দর্শন করিয়াছেন। অশোকের পরে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া রাঢ় প্রদেশের পশ্চিম সীমা গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের অন্তর্গত গঙ্গানদীর নিকটেই সুবর্ণময় একটি দ্বীপ আছে। যবন লেখকগণ অনেকেই নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এজন্য এই বৃত্তান্ত উপন্যাসের মত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা উপন্যাস বা গল্প নহে; ইহার ভিতরে সত্য নিহিত আছে।

বর্ত্তমান কালে গঙ্গার মোহনায় স্থিত সন্দীপকেই গ্রীকলেখকগণকথিত স্বর্ণদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর কোন সময় পর্য্যন্ত গেঙ্গেরিড়ি রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, তন্মধ্যে অশোকের সময়ে তিনি এ প্রদেশের কিয়দংশে কিয়ৎকালের জন্য আধিপত্য স্থাপন করেন।

এই রাজ্যের নরপতি পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার ৬০ সহস্র পদাতি, একসহস্র অশ্বারোহী এবং সাত শত যুদ্ধহস্তী দ্বারাই পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমককবি ভার্জিল এজন্য গেঙ্গেরিড়িগণের যুদ্ধদৃশ্য অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

গেঙ্গেরেড়ি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে গঙ্গানদী হইতে যবনগণ এই রাজ্য গেঙ্গেরিড়ি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্লিনির গ্রন্থে এই রাজ্য গেঙ্গেরিড়ি কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে। চোরমণ্ডল উপকূলের উত্তর হইতে সুবর্ণভূমির উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ, এবং মগ কালিঙ্গ।

গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের উপকূল মধ্যকলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত এজন্য প্লিনি এই প্রদেশ গেঙ্গেরিড়ি কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের রাজধানী প্রথমতঃ পার্থেলিস নগরে, পরে গঙ্গে নগরে ছিল।

পার্থেলিস নগর কোথায় ছিল তাহার নির্ণয় করা যায় না। গঙ্গে নগর সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম। গঙ্গে নগর গঙ্গার মোহনার নিকট এবং এ স্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত। সুবর্ণগ্রাম গঙ্গানদীর মোহনা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বিশেষতঃ এই স্থানেই প্রাচীনকালে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে ঢাকা নগর সংস্থাপন হওয়ার পরে এই বস্ত্র ঢাকা মসলিন বলিয়া কথিত হইত।

কেহ কেহ গঙ্গে নগর তাম্রলিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। তাম্রলিপ্ত পূর্ব্বে সাগর তীরবর্ত্তী ছিল, এক্ষণ তাহার ধ্বংসাবশেষ রূপনারায়ণ নদের তটে তমলুকে সাগর হইতে ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান। তাম্রলিপ্ত এ প্রদেশে প্রধান বন্দর ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু মসলিন বস্ত্রের জন্য তাম্রলিপ্ত বিখ্যাত ছিল না। বিশেষতঃ গঙ্গানদীর মোহনা বলিলে ভাগীরথীর মোহনা বুঝাইতে পারে না, পদ্মানদীর মোহনা বুঝাইবে। পদ্মানদীই প্রকৃত গঙ্গানদী; ভাগীরথী শাখানদী মাত্র।

যবন ইতিবৃত্তলেখকগণ গেঙ্গেরিড়ি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের বর্ণনা অনুসারে এই প্রদেশের নরপতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। অথচ এই রাজ্য প্রায় ছয় শত বৎসর বর্ত্তমান ছিল, পরে ইহার পতন হইয়াছে। কিন্তু এদেশীয় কোন গ্রন্থে এরাজ্যের বা এদেশীয় কোন নরপতির নামের উল্লেখ নাই।

বোধ হয় এই প্রদেশ তৎকালে অনার্য্যদিগের নিবাস ছিল এবং অনার্য্যনরপতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন এজন্য ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এপ্রদেশের উল্লেখ নাই। *

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

গ্রন্থ সমালোচনা

পাষাণের কথা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একখানি কথা গ্রন্থ। "যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করিত এবং তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের একত্র মিলন বলিয়া মহাভক্তিভরে তাহার পূজা করিত: সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল (বেষ্টনী) দিত।

বাঘেল খণ্ডে বেরুট নামক স্থানে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল। কালের কুটীল গতিতে বৌদ্ধদ্বেষী দিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিংয়ের যে অংশটুকু অভাঙ্গা টাটকা ছিল কানিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।" সেই যাদুঘর স্থিত রেলিংয়ের একখানা পাথর তাহার জন্মকাল হইতে যাদুঘরে আসা পর্য্যন্ত কি কি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং অবগত হইয়াছে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ পাথরখানা নিজে বক্তার আসন গ্রহণ করিয়া যেন বলিতেছে—ইহাই বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থ।

রাখাল বাবু বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ। তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ও অক্ষরতত্ত্ববিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধগুলি এ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বালোচনার পত্রিকায়ই প্রকাশিত হওয়া আসিতেছে। তাহাদের কয়েকটির অনুবাদ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের পণ্ডিত-সমাজে রাখাল বাবু অনেক দিন হইতেই পরিচিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় বেশী দিনের নহে। কিছুদিন হইতে তিনি প্রায়ই মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালী পাঠকগণকে ধরা দিতেছিলেন, এবার গ্রন্থকাররূপে

---

* ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে কলিঙ্গ রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। অশোককে সেই রাজ্য জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অসংখ্য প্রাণী কলিঙ্গযুদ্ধে মারা পড়িয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিতও লড়িতে পারে এমন কেবলমাত্র এক কলিঙ্গ রাজ্যই ছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেল ১৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধেই কলিঙ্গ রাজ্য লুপ্ত হয় নাই। হাতীগুম্ফা শিলালিপিতে দেখা যায় যে, অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির সহিত খারবেলের বন্ধুতা ছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণে স্থিত এই দুই রাজ্যে বন্ধুতা থাকায় উত্তরাপথের রাজগণ দক্ষিণ ভারতে তেমন প্রভাব ও বিস্তার করিতে পারেন নাই।

প্রতিভা সম্পাদক।

বিশেষভাবে ধরা দিয়া পরিচয় সুনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তিকে বঙ্গবাণীর সেবকরূপে পাইয়া আমাদের আনন্দের অবধি নাই।

আমাদের দেশের অনেক সুযোগ্য পণ্ডিতের অভিপ্রায় এই যে মাসিক পত্রিকার বিবর্দ্ধমান কালেবর পূর্ণ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রকাণ্ড আখ্যায়িকা বিস্তারে অনুরক্ত হইয়া রচনা লালসা-প্রকাশ করা রাখাল বাবুর উচিত হইতেছে না। তাঁহারা রাখাল বাবুকে প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্বের গহন কণ্টকবনে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন. সাহিত্যের শ্যামলক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। যিনি অপর্য্যাপ্ত মধু যোগাইতে পারেন, তিনি মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল জলভাণ্ড হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যগ্র মধুলোভীর তাহা প্রীতিজনক হয় না সত্য, কিন্তু নির্ম্মলজল পিপাসু ব্যক্তিরও ত অভাব নাই। তবে দেখিতে হইবে যে তিনি মধুসংগ্রহে কৃপণতা করিতেছেন কি না। আমরা মধুলোভীর দলভুক্ত হইলেও জলের পিপাসাও আমাদের মধ্যে মধ্যে হয় এই দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেছি। "তামাকের" সটকা হাতে পাইলে ভারী খুসী হইয়া যাই বটে কিন্তু 'দুধে'ও আমাদের অরুচি নাই। প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা একরকম কঠিন নেশা, চব্বিশ ঘণ্টা যদি তাহাতেই ভোঁর হইয়া থাকিবার দণ্ডাজ্ঞা হয় তবে প্রত্নতাত্ত্বিকের জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। মাঝে মাঝে সে যদি সাদা ভাষায় দুই চারিটা সুখ দুঃখের কথা বলিতে প্রয়াস পায় তবে তাহাকে ধমকান নিষ্প্রয়োজন।

স্থূলভাবে পাষাণের কথাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গভাষায় কয়েকখানি আছে—যথা, বঙ্কিমের রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, রমেশদত্তের শতবর্ষ, রবীন্দ্রের বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি ইত্যাদি। ইহার প্রায় সমস্ত গুলিতেই উপন্যাস প্রবল, ইতিহাস দুর্ব্বল। এগুলি পাঠ করিতে ইতিহাস ভুলিতে হয়, উপন্যাস-রসে মন মজিয়া উঠে। রাখাল বাবুর গ্রন্থ ঐতিহাসিক কথা হইলেও কথা হইতে ইতিহাস ইহাতে অনেক প্রবল। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ ইতিহাসচ্ছলে কল্পনাবলে ঐতিহাসিক নরনারীদের সুখ-দুঃখের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন. রাখাল বাবু উপন্যাসচ্ছলে ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উপন্যাস অংশ কেবল কুইনাইনের চারিদিকে চিনির বেষ্টনী। সেই বেষ্টনী স্থানে স্থানে এত স্বল্প যে ক্ষত সেবনেও পাঠকসাধারণ তিক্ত রসের আস্বাদন পাইয়া মধ্যে মধ্যে মুখ ফিরাইবেন।

রাখাল বাবু পাষাণের কথা বলিয়াছেন। পাষাণের কথা বলিবার উপযুক্ত লোক তাঁহার মত বাঙ্গালাদেশে খুব বেশী নাই। পাষাণের কথাকে তিনি সর্ব্বথা কোমল কান্ত করিতে পারেন নাই, পাষাণের হৃদ্‌গত কাঠিন্য স্থানে স্থানে জোর করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সুললিত নহে—কোথাও অত্যন্ত সংস্কৃতগন্ধী, কোথাও আবার ইংরেজীর অনুবাদের মত [illegible] পাষাণের কথা বহুদিন বদ্ধ ছিল কিন্তু তবু [illegible] হইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। স্থানে [illegible] মুদ্রাযন্ত্র তাহার ভগ্ন দন্তের চর্ব্বণচিহ্ন আঁকিয়া [illegible]ছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি [illegible] হউক এই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থে যে ধারা রাখাল বাবু অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অভিনব; প্রথম উদ্যমেই তাঁহার যতখানি সফলতা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা ভবিষ্যতের বিপুল সাফল্যের [illegible] বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কায়স্থ সমাজের সংস্কার—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা গ্রন্থ—১ম সংখ্যা, মূল্য ৮০ আনা--ডবলক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১৯৩ পৃষ্ঠা। কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আজকাল যে এক শ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার হইতেছে ইহাও সেই রকমই একখানি গ্রন্থ। সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল গ্রন্থে কায়স্থজাতির পূর্ব্বগৌরব ও উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রমাণ করে মাত্র।

শ্রীতার পাশিক।

নচিকেতা

[ভারতীয় মনুষ্য আত্মার অভিব্যক্তি কাহিনী]

হে অমৃত পুত্রগণ, শোন তোরা শোন!
বহু—বহু দূর হতে পড়েছি আসিয়া;
উষার উদয়মুখী শুকতারা হতে
আঁখির প্রদীপ মোর এনেছি জ্বালিয়া
রাগিণী ধরেছি মোর মহাকাশ হতে!
অনন্ত জীবন পথে চলিতে চলিতে,
এ বিশ্ব ভাণ্ডারে গুপ্ত প্রাণকুণ্ড হতে
লভিয়াছি প্রাণ সে আমার,
অনলে, অনিলে, সূর্য্যে দৃষ্টিপথে বসতি যাহার;
ভূভুব স্বর্লোকে যাহে গুপ্ত পথে ধ'রে দিনযামী
আসিয়াছি নচিকেতা আমি।
এই আঁখি দেখেরে—জগতের সীমা—
দেখিয়াছে পর্দ্দার অন্তরে;
মুখামুখী দেখিয়াছে গুপ্তের মহিমা
ডুব দিয়া প্রত্যক্ষের আবরণী আড়ে!
আড়ালের দেবতা যমেরে
মুখামুখী পুছিয়াছে নিখিলের গুপ্ত সে বিজ্ঞান
—অমৃত পথে যাহার সন্ধান!
দেখিয়াছে গুপ্ত সত্য—এবিশ্বের রহস্য যতেক
একের ভিতরে বহু, বহুমধ্যে দেখিয়াছে এক!
দেখিয়াছে স্রোত যেই সৃষ্টিরূপে বিশ্ব এই গড়ে
জ্ঞান তার ইচ্ছা পথে দিবানিশি জীবনরূপে ঝরে
জীবের অন্তরে!
দেখিয়াছে অভেদের ভিন্
সত্য শিব সুন্দরের মূর্ত্তি সেই, একে যাহা তিন!
সকল শেষের শেষে নির্ব্বিশেষে ডুবিয়া রসিয়া
একাকারে মিশে গিয়া উঠিয়াছে আবার ভাসিয়া
এলোকের মর্ম্মদ্বারে বিলাইতে অমৃত বারতা!
আনিয়াছি কথা তার, দেখাইতে প্রথা
আসিয়াছি অগ্নিপুত্র আমি নচিকেতা!

ব্রহ্মাণ্ডের এই পৃষ্ঠা নীলাম্বরা ঘেরা
ভাতে যাহা যেন মহা মন্দিরের ধারা—
জগতের দেবতার বিশাল মন্দির
ঊর্দ্ধ ভেদি আসে যার কোটি কোটি কটাক্ষ সুস্থির
কোটি জ্যোতি জাগ্রত আঁখির!
হেথা শুনেছি আমি এবিশ্বের হৃদয়প্লাবিনী
ঝটিকা কল্লোল যেন গভীর গম্ভীর
জগতের অনাহত ভাব সরসার!
অনাদি আরাত রত ঝঙ্কৃত সে ভূষণ শিঞ্জন
শুনিতেছি অন্তঃকর্ণে, নূপুর নিক্কণ
কোটি তারা অপ্সরার বিশ্ব নৃত্য ভূমে
জীবনের আনন্দের রসায়ন ধূমে!
সে নৃত্যে সঙ্গীতে
আলোকে কটাক্ষময়ী ছন্দ-সরসীতে
অতলে বিতলে ডুবি, ডুবায়ে হৃদয়—
আমার হৃদয়ে এই নিত্যবাহী সুখদুঃখময়—
নিখিল সৃষ্টিরে আজি ফেলেছি ঘেরিয়া;
শোন শোন, তাই লয়ে পড়েছি আসিয়া,
মরণের দেশে লয়ে অমৃতের গীতা
ব্যোমকায় আমি নচিকেতা।
কে শুনিবে ইতিহাস, জীবনের মর্ম্ম গীতিকথা
বীজ মাঝে বট বৃক্ষ যথা
জীবেতে আছিল বিশ্ব, বিশ্বমাঝে জীব ছিল তথা—
অনাদির সে সংবিৎ—অবোধ্য বারতা!
বাণী যারে সঙ্কোচিয়া আভাসে মিলায়
আকাশের বহির্দ্বারে বিজলীর প্রায়!
দৃষ্টিরে অজ্ঞাতস্পর্শে যায় মূরছিয়া,
ভাবেরে অভাবে শূন্যে দেয় হারাইয়া!
ক্ষুদ্র যথা বৃহত্তম, বৃহৎ সে ক্ষুদ্রতম যথা—
স্থিতিহীন স্থিতির বারতা!
অজানা সিন্ধুর ঢেউ আসিয়াছি আমি নচিকেতা!

(ক্রমশঃ) শ্রীশ্রীশশঙ্কমোহন সেন।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ | আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩২১ | ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা

নচিকেতা

ভারতে মনুষ্য আত্মার অভিব্যক্তি কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কে কবে কি ছিল আগে, কি ছিল সে প্রকৃতি তাহার
না-থাকার বুকজোড়া আকার ব্যাপার !
স্বপ্নস্মৃতি সম আসি উঁকি দেয় মনের নয়নে
এ'পুরে হেঁয়ালি সম নাহি ধরে বোধের বন্ধনে !
কে জানে সে ছিনু কত কাল
কালের অতীত, তথা নাহি সীমা আল !
কে জানে কেমনে হ'ল সীমা এল অসীমের বুকে
দেশ কাল খাঁচার কুহকে
কেমনে পড়িল ধরা অসীম সে মহিমার পাখী
কোথায় ছিঁড়িয়া গেল মর্ম্মতন্ত্র অন্ধ হল আঁখি !
মনে পড়ে তারপরে ঘোরাঘুরি নিত্য হাহাকারে—
বিরহে তিরিষা-ভরে কত কাল আঁধারে আঁধারে।
সে তিরিষা বশে আহা, কত ভাবে কত রূপ ধরে
নিত্য আবর্ত্তন গতি, গতি আহা আঁধারে আঁধারে !
আভাসের স্মৃতি সেই, আত্মা শুধু ধারে ইশারায়
মেঘ-আড়ে বিজলীর প্রায় !

স্মৃতি সেই আল-ঝালে মম
ছিন্ন গ্রন্থি-তন্তুধারা সম—
একের বিচ্ছিন্ন সূত্র শতে কাটা' জন্মমৃত্যুধারে
শত কাটা' আলোকে আঁধারে !
মনে পড়ে এই পথে অতর্কিত ছায়াবদ্ধ ঝোঁকে
কত কাল কাটায়েছি মহাশূন্য লোকে !
তারপরে কত কাল বায়ুভূত শক্তির অন্তরে,
—কত কাল অগ্নির জঠরে !
কত ভাবে কত রূপে মাটীবক্ষে জমাট হইয়া
ছিনু আহা সৃষ্টিরঙ্গে আসিয়া যাইয়া !
কত কাল আবিল সে আধজাগা' অনুভব ঘোরে
বৃক্ষরূপে, লতারূপে, ফুলরূপে, ফলরূপ ধরে,
ঊর্দ্ধমুখে আকাশে চাহিয়া,
অগ্নি-রূপী সূর্য্য লক্ষ্যে আলোকের ধেয়ান ধরিয়া
অব্যক্ত গোধূলিলোকে স্তব্ধ, শুধু মরণে বাঁচিয়া !
তারপরে, কতকাল অত্যুগ্র শকতি সদনে
লভিতে লভিতে গেল প্রাণের স্পন্দনে !
মতি এল উন্মাদের বুকে
মুক্তি এল বন্ধনের শিলা-অন্ধ দুঃখে !

কত রূপ কত ভাব ধরি
জন্ম যোনি পথে কত আইনু উত্তরি' !
আহা ! আহা ! সে অজানা অভাবের বশে
অপ্রাপ্তের পিপাসার রসে,
কত লক্ষ জীব-যোনি আইলাম অঘোরে ঘুরিয়া !
আসিলাম আমার সে নিশানা মুছিয়া !
আসিনু সে বার্ত্তা পুনঃ অণু দেহ বীজ মাঝে লয়ে
লক্ষ লক্ষ বৎসর গোঁয়ায়ে !
অবশেষে উপনীত মননের মানবের লোকে
উপস্থিত ইচ্ছাজ্ঞান ভাবের আলোকে !
যে আলোক মুহুর্মুহু পুনঃ নিরমম
ভাস্তে যেন অন্ধকার সম
জড়তায় ওতপ্রোত জ্যোতি অনুপম !
কে শুনিবে সেই কথা—অঘোরের গহনের ব্যথা
লুক্ষ জীবনের গাথা বিন্দু মাঝে মম !
হইনু বুঝিনু যাহা লভিনু যা
সুসুপ্ত ইবাড়া রূপে আছে লেখা সবি মোর গায় !
কত ব্যক্তি কত জাতি কত দেশ আইনু ঘুরিয়া
কে দেখিবে সে অতীতে গুপ্তনেত্রে আজি উঘারিয়া
অণু-পথে অনন্তে ডুবিয়া !
তারপরে কত কাল কত ভাব কত মূর্ত্তি ধরি,
আসা যাওয়া উপরি উপরি,
ঘোরাঘুরি কিছু না বুঝিয়া !
কি আবেগে অভাবে মজিয়া !
যুগ যুগ ইতিবৃত্ত ধীরে ধীরে অঘোরে বাহিয়া
সত্য শিব সুন্দরেরে তিলে তিলে হৃদয়ে সঞ্চিয়া !
এইরূপে কত কাল ! অকস্মাৎ কি ঘটিল মম !
হে মানব, অকস্মাৎ, শোন তাহা শোন !
কে যেন জাগালে মোরে এক দিন অপূর্ব্ব ব্যাপার—
কেমনে জাগালে !
আকুল আবিল সেই বিচঞ্চল মানস-সলিলে
ফুটিল হিরের পদ্ম তিলে !

বিবেকের শ্বেত পদ্ম আলোকপিয়াসী সহস্রার
সৌরভে ভরিয়া এ সংসার ;
বুকে লয়ে আলোকের গুপ্ত মধুধার !
আভাসে বুঝিনু যেন !
কে যেন বসিয়া হোথা হেন !
রয়েছে ছুঁইয়া মোরে শ্রীচরণে তার !
জাগরণ—অপূর্ব্ব ব্যাপার !
জীবনের অন্তস্তলে একদা সে গভীর আবেগে
একে—তিন; তিনে—এক প্রশ্ন যেন উঠিল ডাকিয়া—
'কে আমি, কেন বা আমি, কি করিতে আমি
বিপুল এ' বিশ্বলোকে উঠেছি জাগিয়া !'
প্রশ্ন সেই অসীম সন্তান
জানি জীব-জীবনের চরম সে রহস্য বিজ্ঞান
আছে লুকাইয়া, যথা আছে ওই প্রশ্ন সমাধান !
শত চঞ্চলতা মাঝে শত ভ্রান্তি ভুলের আড়ালে
জানি ওই সমাধানে জীবের জীবন নিত্য চলে !
হাতে ধরি' অমৃতের সূক্ষ্ম সূত্রে অনন্ত বন্ধনে
টানিছেন বিশ্ব-পিতা আপনার প্রিয় পুত্রগণে।
মনে আছে, সে জীবনে, একদা উষার—
কিরণ-কুন্তল উষা হৃদয় যাহার
তরুণ অরুণ রূপে উন্মীলিছে দ্বারে পূর্ব্বাশার
নিখিল বিশ্বেরে ঘেরি' আপনার আকুল কম্পনে
হৃদয় জাগিল মম নিজের সে গুপ্ত নিকেতনে !
হৃদয় জাগিল মম—বিশ্ব জোড়া' জাগি—বিশ্বময়
দেখিল হৃদয়,
আলোকে আগুনে বিশ্ব হয়েছে তন্ময় !
নিরখিল আপনারে
সবার ভিতরে, পুনঃ—আশ্চর্য্য সে-সবার বাহিরে !
ব্যোমাতীত সঙ্গীতের জলৎপিণ্ড হতে
ক্ষিপ্ত কণা আপনারে কবি বলে বুঝিল হৃদয়
পরিচিত বিশ্বনামে কি যেন সে নব পরিচয় !
চিনিল জাগিয়া নিজে, যথা ওই উষার ধারায়

ক্ষুদ্র ওই জুঁই ফুল, মধুগুপ্ত অশ্রুসিক্ত মুখে
প্রলুব্ধ করেছে ওই অলিএকে বসিবারে বুকে !
জীবন মধুর হল, মধুর এ' বিশ্বের সকলি
সে ত কালো অলি নহে, ঘনীভূত আলোকের অলি !
ক্ষুদ্র সে জীবন-সূর্য্য অন্ধ এই হৃদয় ফুলের
হৃদয় কহিল ডাকি—উচ্চকণ্ঠে উচ্ছ্বাসিয়া কহিল তাহায়
—"পেয়েছি তোমায় !"
বিশ্বের জীবন সূর্য্য বিশ্ব-মর্ম্মে বাহিরে পুনঃ যে
এ' বিশ্বের বর্ণশিল্পী-নাম রূপ যথা হতে আসে !
এ বিশ্বের জড়ময়ী মসীময়ী দেহবৃত্তি-তলে
রসের ভাণ্ডার সেই, সর্ব্বগ্রাসী আলোকে অনলে
তামসীর মসীবৃত্তি জ্যোতি-রসে দেয় যে মুছিয়া
গুপ্ত পথে সহসা ধাঁধিয়া !
অগ্নি-হোত্রী নচিকেতা চিনিল সে আপনার রবি
—হইলাম কবি !
শোন শোন—হইলাম কবি !
বিশ্ব মাঝে কত জনে কত পথে চলে ;
কেহ বাঁধিবারে চায় শক্তির শৃঙ্খলে
শূন্যগতি বেগবতী বিপুলা ধরারে
—গতি যার নিত্যগুপ্ত প্রত্যক্ষ অন্তরে !
কেহ দৈত্য পদক্ষেপে মানবের শির দলি' যায়,
সোনার অসিতে কেহ বিশ্ব-হিয়া জিনিবারে চায়,
সাগরে সরিতে কেহ মরুবক্ষে নিভৃত প্রান্তরে
আপনার নাম লেখে সোনা দিয়া কাটিয়া পাথরে—
জগতে শক্তির পূজা সোনার পাদুকাদীর্ণ সবি
তার মাঝে অপ্রত্যক্ষ অধরের জ্যোতি-স্বপ্না ছবি
আমি শুধু হইলাম কবি !
শুনিলাম মর্ম্মপথে ধ্বনি-গীতি গুপ্ত বেদনার
কি কহিব, অর্থ কিবা অভীষ্ট তাহার !
শোন শোন—এককালে দূর—দূর—দূরান্তর হতে
পুনঃ যেন সন্তর্পণে অতি কাছে কানের গোড়াতে
কি গাহিছে—গাহিছে কাহারা

অশ্রুত ভাষার রীতি-আরতির ধারা
কালে আসে উদয়-উদয়ে—
"হও তুমি কবি স্তব্ধতার !
নীরব বিশ্বের নেমিশ্বর,
নিশা যবে দ্বিতীয় প্রহর,
দূরে কাছে মৃদু শুধু ঝিল্লিকার স্বর—
এক মনে শুনিতে শুনিতে
মন যাহে মজে আচম্বিতে
অকূল অতলস্পর্শে নিস্তব্ধ সে নিঃশব্দ পাথারে !
হৃদয় পলকে করে পরশি' শিহরে !
লহ তারে চিত্তপথে ধৃতিপথে লহ সে বুঝিয়া
শব্দের মাঝারে যেই বসে আছে নিঃশব্দ হইয়া !
"হও তুমি কবি স্তব্ধতার—
কবি হও গভীরের—ঘন গহনার !
ভারতের কবি হও, অসীমের ধারণা লইয়া
মৃণ্ময়ী প্রতিমা পায়ে পড়িছে যে আপোষে শুইয়া !
ক্ষুদ্রেরে করিয়া খুঁটি অসীমে যে দিলে হাল ছাড়ি'
বিন্দুর ভিতর দিয়া সিন্ধুর যে যোগাইছে পাড়ি !
জগতের ব্রাহ্মণ ভারত
দেহেরে ডিঙ্গায়ে যেবা আত্ম-লোকে চালাইছে রথ !
ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করি' বিশ্বজিৎ বিপুল অধ্বরে
সর্ব্বস্ব যে বিলাইছে পরে অকাতরে !
আপনার গৃহ-দেহ অপরের করেতে সঁপিয়া
মন নিয়ে ভবলোকে চাহিছে যে রহিতে মজিয়া !
পলাইয়া জীবন-সমরে,
সুখ দুঃখ পলাইয়া আত্ম-তৃপ্ত বৈরাগ্যের ভরে
জীবনের সর্ব্ব কাজে একমুখে বাহিছে বিস্তরে—
গঙ্গা যথা সর্ব্বস্রোতে একলক্ষ্যে ঢালিছে সাগরে !
খোয়াইছে সর্ব্ব আশা আদর্শে উদার—
হও সেই কবি স্তব্ধতার !"
হইলাম কবি সেই, নিজ মনে সে বাণী ধরিয়া
ভারতের মর্ম্ম-গীতা গানে বীণে গাহিয়া সাধিয়া ;

দর্শনে পুরাণে কাব্যে ইতিহাসে বিপুল সম্ভারে—
আত্মরত সুপ্তি মাঝে শতকণ্ঠে ডাকি মানবেরে,—
কত ভাবে কত মূর্ত্তি ধরি'—
তুলিলাম নিঃশব্দের রাগিণী লহরী!
সুর-রাণী, ভাবরাণী, দীপ্তিরাণী হইল ভারত!
সমগ্র এসিয়া তার সুরে-তানে ধরিলা সঙ্গৎ!
—না জানি কি ছিল হোথা, পারি নি ধরিতে—
নর-বক্ষঃ হল স্থির পশুত্বের ধমনী তাহার—
শক্তির ধমনী সেও আছিল কি সাথে সাথে তার?—
হইল নিদ্রিত ধীরে, হল যেন মৃত্যুর আকার!
প্রবাহিল শান্তির সে নিদ্রারত সুষুম্নার ধারা!
শান্তি—শান্তি—শান্তি শুধু স্থির মহত্তরা!
বুঝিনি ত, শান্তি সে কি তলে তলে মৃত্যুর সোদরা?
অমৃতের আভা পুনঃ নয়নে যাহার?
মূর্চ্ছা, সেত মূর্চ্ছা নহে? না জানি কেমন সূত্রে ধরে—
আমার সে সুধাটুকু কি যে হল পশিয়া অপরে!
আমার সে জাগরণ আত্মরত স্তব্ধতা মাঝার!
আত্মা সেই, বিশ্ব-আত্মা সহোদর যার!
কুসুম-কলির গর্ভে আলোক উরসে
জন্ম যার, পুষ্প হাসি-জমজ-প্রকার—
জমজে জাগিলা বিশ্বে—হাসি সহ তার!
জাগরণ—হেথা যাহা তাতে যেন সুপ্তির আকার!
এইরূপে কত কাল কত ভাবে হৃদয় আমার
জাগিয়া ভারতবর্ষে শান্ত স্থির সুপ্ত নির্ব্বিকার!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

বালচরিত

নাটকের পাত্রগণ

পুরুষগণ

নারদ, দেবর্ষি
বসুদেব, কৃষ্ণের পিতা
নন্দগোপ, বসুদেবের সখা (গোকুলাধ্যক্ষ)
উগ্রসেন, কংসের পিতা
দামোদর } বসুদেবের পুত্রদ্বয়
সঙ্কর্ষণ }
কংস, মথুরার রাজা
চাণূর } মল্লদ্বয় (কংসের আত্মীয়)
মুষ্টিক }
ধ্রুবসেন, ভট (কংসের ভৃত্য)
বালাকি, কাঞ্চুকীয় (কংসের ভৃত্য)
শাপ, শাপের দেবতা
কুণ্ডোদর }
শূল } কাত্যায়নীর ভৃত্যগণ
নীল }
মনোজব }
গরুড়, বিষ্ণুর বাহন
চক্র }
শার্ঙ্গ } আয়ুধাধিষ্ঠিত দেবগণ
শঙ্খ }
নন্দক }
জনৈক বৃদ্ধ গোপালক
বৃষ্ণি পুরুষগণ
দামক, জনৈক গোপালক
অরিষ্টর্ষভ, অসুরবিশেষ
কালিয়, যমুনাহ্রদবাসী মহানাগ

স্ত্রীগণ

দেবকী, কৃষ্ণের জননী
প্রতীহারী, দেবকীর দ্বারপালিকা
ধাত্রী, দেবকীর মায়াকন্যার উপমাতা
চণ্ডাল যুবতীগণ
কার্ত্যায়নী, কংশহস্তমুক্ত আকাশ দেবী
গোপী ও ঘোষসুন্দরীগণ
রাজ্যশ্রী, রাজ্যলক্ষ্মী
মধুকরিকা. কংসের প্রতীহারী
যশোধরা, ঐ
কৌমোদকী. তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা

বালচরিত *

স্থাপনা

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। পুরাকালে সত্যযুগে যিনি শঙ্খক্ষীরবপু নারায়ণ, ত্রেতাযুগে যিনি সুবর্ণপ্রভ বিষ্ণু ও ত্রিভুবনে ত্রিপদবিক্ষেপকারী, রাবণবধে যিনি দূর্ব্বাশ্যামতনু, দ্বাপরযুগে যিনি রাম (বলরাম), কলিযুগে যিনি সর্ব্বদাই অঞ্জনসন্নিভ, সেই দামোদর তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

আচ্ছা ভদ্রমহোদয়গণকে এইরূপই বলি। একি! আমার বক্তব্য নিবেদন কত্তে ব্যগ্র হয়েছি কিন্তু কটা কি শব্দের মত যেন শুনছি! রসো, দেখছি।

নেপথ্যে

আমি গগনবিহারী (নারদ)

সূত্রধার। হাঁ, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দেবগণ তূর্য্যধ্বনি কচ্ছেন, বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত হরিকে দেখবার জন্য মহর্ষি নারদ আকাশপথে তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন। [প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ

নারদ। আমি গগনবিহারী ব'লে ত্রিলোক-বিখ্যাত। কলহপ্রিয় নারদ ব্রহ্মলোক থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দেবাসুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং গগন-পথ এখন প্রশান্ত, সেখানে আমার আর প্রীতি জন্মে না! বেদ-পাঠের মাঝে মাঝে বীণার তারে ঝঙ্কার দেওয়া আর শত্রুতা ঘটানই কিন্তু আমার স্বভাব।

আবার বেদে আমার একান্ত ভক্তি, আর সমস্ত তপোবনই আমার বড় প্রিয়; কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে নখ দিয়ে বীণা বাজিয়ে আর ভীষণ কলহ সৃষ্টি করেও আমার বড় সুখ। তাই লোক-কারণ, অবিনশ্বর ও পরিণামরহিত যেই নারায়ণ লোকহিতার্থে কংসবধের নিমিত্ত বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁকে দেখবার জন্য এখানে এসেছি। এই যে আর্য্যা দেবকী! মায়া করে যিনি এখন শিশু হয়েছেন সেই ত্রিলোকে-শ্বরকে গ্রহণ করে বসুদেবের সঙ্গে দ্রুতপদে গৃহ হ'তে বহির্গত হচ্ছেন।

যিনি লোকের অভয়ের কারণ, সুরগণের গুরু, দৈত্যগণের সংহারকর্ত্তা ও চক্রপাণি তাঁহাকে শোকার্ত্তা ও শশীমুখী দেবকী প্রশান্ত ভাবে রজনীতে মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় দুই হাতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

অনন্তবীর্য্য, কমলায়তাক্ষ, সুরেন্দ্রাধিপতি, অসুর-দর্পহন্তা, ত্রিলোকের কেতু, জগতের কর্ত্তা, আদিপুরুষ ও জনগণের পালনকারী ইনিই ভগবান নারায়ণ।

বাঃ, এইত কলহের একটা মূল সৃষ্টি হ'ল। আমিও এখন ভগবান নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাব। ত্রৈলোক্য-কারণ ভগবানকে নমস্কার।

যিনি নারায়ণ, যিনি নরলোকের প্রধান আশ্রয়-ভূত, যিনি লোকের আনন্দস্বরূপ, যাঁহার লোচন-

---

* গল্পাংশের জন্য মহাকবি ভাস শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রতিভা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১; ৮৩ পৃষ্ঠা।

যুগল কমলের ন্যায় অমল, যিনি রাম, যিনি রাবণ ও বিরোচনের (?) সংহারকর্ত্তা; যিনি পরাক্রমের আধার ও যিনি বীর পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে নমস্কার। [প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

বালকহস্তে দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। হা ধিক! আমার বাছার জন্ম সময়ে বহু মহা মহা শুভ নিমিত্ত দেখেও দুরাত্মা কংসের নিষ্ঠুরতার কথা মনে করে বাছা আমার মহাপুরুষ হবে এই কথা বিশ্বাস কত্তে ভরসা হচ্ছে না। হায়! আমি কি মন্দ-ভাগিনী! আর্য্যপুত্র গেলেন কোথায়? এই যে! হর্ষে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল-লোচন আর্য্যপুত্র এদিকেই আসছেন!

বসুদেবের প্রবেশ

বসুদেব। (সখেদে) আঃ! এটা কি হ'ল!

প্রবল বায়ু ও নূতন মেঘের নির্ঘোষের সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ খেলছে, মেদিনী কম্পিত হচ্ছে! অসুরসঙ্ঘের সংহারকর্ত্তা বিষ্ণু গুপ্তভাবে লোক-রক্ষার নিমিত্ত নিশ্চয়ই অদ্য অবতীর্ণ হলেন!

(চাহিয়া) এই যে দেবকী!

ছয়টি পুত্রের বিনাশজনিত শোকে নিতান্ত খিন্নমনা; কিন্তু কংসের যমস্বরূপ এবং স্বীয় তনয়রূপী সপ্তম শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য একান্ত যত্নবতী হ'য়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পুত্রের জন্মকালে বহু শুভ লক্ষণ প্রকাশিত হ'য়ে তার অগণিত গুণেরই সূচনা কচ্ছে।

দেবকী। (অগ্রসর হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক।

বসু। দেবকি, এখন মাত্র দুপুর রাত। মথুরায়* সকল লোক নিদ্রিত। সুতরাং কেহ না দেখবার পূর্ব্বেই ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

দেবকী। আর্য্যপুত্র, একে কোথায় নিয়ে যাবেন?

বসু। দেবকি, সত্য কথা বলতে গেলে আমিও জানি না কোথায় নিয়ে যাব। কিন্তু দুরাত্মা কংস পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। তাই ভাবছি বাছাকে—বাছা আমার দীর্ঘায়ু হ'ক—কোথায় নিয়ে যাব! কি করব, দৈব যেখানে নিয়ে যাবে বাছাকে নিয়ে সেখানেই পালিয়ে যাব।

দেবকী। আর্য্যপুত্র, বাছাকে একবার ভাল করে দেখে নি।

বসু। হায়! পুত্রবৎসলে! কি আর দেখবে! রাহুগ্রাসে শশাঙ্ক দেখে আর লাভ কি? যতক্ষণ তুমি ভাল করে দেখবে ততক্ষণে কংস বৎসের যম স্বরূপ হ'য়ে এসে উপস্থিত হবে।

দেবকী। না না, কংস কিছুতেই বাছাকে মারতে পারবে না।

বসু। তুমি যা বল্লে, দেবতারা যেন তাই করেন। আচ্ছা নিয়ে এস।

দেবকী। আর্য্যপুত্র, এই নিন।

বসু। বাপরে! এই শিশু কত ভারি!

এই শিশু বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের সারভূত, পদ্ম-দলের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট; এত ভারি সন্তানকে যে রমণী গর্ভে ধারণ করে তার ধৈর্য্য নিশ্চয়ই অসীম।

দেবকি, অন্তঃপুরে ফিরে যাও।

দেবকী। হায় হতভাগিনী আমি! এই যাচ্ছি।

বসু। চন্দ্রলেখা আকাশে ও সলিলে যেমন দুই ভাগ হ'য়ে যায়, দেবকীরও হৃদয় ও শরীর দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। হায়! দেবকী অন্তঃপুরে চলে গেল। আমিও এ বেলা নগর-তোরণের দিকে যাই।

প্রথম পুত্রের বিনাশেই আমার ক্রোধের সঞ্চার হ'য়েছে, এখন আবার কংস-ভয়ে ভীত হ'য়ে ভুজ-সাহায্যে মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় পুত্রকে বহন করে দ্রুতপদে পথ চলে যাচ্ছি। (পরিক্রমণ করিয়া)

এই যে নগর-তোরণ! আচ্ছা প্রবেশ করা যা'ক। (প্রবেশ করিয়া) মথুরার সকল লোকই এখন নিদ্রিত।

* মূলে সর্ব্বত্রই 'মধুরা' এই পাঠ আছে।

তবে এই সুযোগেই পালিয়ে যাই। এই ত মথুরার সীমা ছাড়িয়ে এলুম। উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার!

সমস্ত শরীরে যেন অন্ধকারের প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে! আকাশ যেন অঞ্জন বর্ষণ কচ্ছে! অসৎ-পুরুষের সেবা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ দৃষ্টিও নিষ্ফল হ'য়ে যাচ্ছে!

উঃ! অন্ধকারে কি হ'য়ে গেছে! দিঙ্‌নির্ণয় করা যায় না; গাছগুলি যেন সব একত্র জড়িয়ে গেছে। সুবিন্যস্ত পৃথিবীর যেন রূপ-বিপর্য্যয় হ'য়ে গেছে।

আর যেতে পরি না! এই যে সম্মুখে দীপালোক! দুরাত্মা কংস আমার পলায়নের সংবাদ পেয়ে আলো নিয়ে আমাকে ধত্তে আসছে না ত? বেশ, আসুক, তা হ'লে আমিও তার দর্প খর্ব্ব করব। (খড়্গ কোশমুক্ত করিতে উদ্যত হইয়া নিবৃত্ত) না, জন প্রাণী ত কিছুই দেখছি না!

আ! বুঝেছি; সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না, সুতরাং আমার পলায়নের সুবিধার জন্য বৎসই আলোর সৃষ্টি করে দিয়েছে!

এই যে পথ। এবার পালাব। হায়! হায়! বর্ষাকালে পূর্ণতোয়া যমুনা যে আমার সম্মুখে!—এখন কি করি! যমুনা উত্তীর্ণ হব কি করে? হায়! আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হ'ল! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

এই নদী বিবিধ জল-জন্তু ও ভুজঙ্গ-সঙ্কুল; ইহার প্রচণ্ড ঊর্ম্মিগুলিও মনে মনে অতিক্রম করা দুষ্কর। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি এত কাতর হ'য়েছি যে, দৈবের সাহায্যে সন্তরণ করেই যমুনা উত্তীর্ণ হ'য়ে সিদ্ধি লাভ করব। (যমুনায় অবতরণ করিয়া সবিস্ময়ে) একি! জল যে দুই ভাগ হ'য়ে গেল! এই পাশে জলরাশি স্থির হয়ে আছে, ও-পাশে প্রবাহিত হচ্ছে! ভগবতী যমুনাই আমাকে পথ করে দিলেন। যাই, এবার পালিয়ে যাই। (গমন) এইবার যমুনা উত্তীর্ণ হলুম। একি! একটা হুঙ্কার শব্দ যেন শুনছি। বুঝেছি, আমি হতভাগ্য! গোপ-পল্লীর নিকটে এসে পরেছি। আ! এই নিকটবর্ত্তী ঘোষ-পল্লীতেই ত সখা নন্দগোপের বাড়ী। কংসের আজ্ঞায় আমি তাকে কশাঘাত করে তার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলাম। আচ্ছা গোপ-পল্লীর দিকেই যাই। কিন্তু রাত্রি কালে বসুদেব গোপ-পল্লীতে এসেছে এই কথা শুনে গোয়ালারা সব ত শঙ্কিত হতে পারে! তবে কি এই ন্যগ্রোধ-তরুর তলে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব? হে ন্যগ্রোধ দেবতা, যদি এই বালক লোকহিতার্থ কংসবধের জন্য বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে তা হ'লে ঘোষপল্লী হ'তে কেহ এখানে আসুক। না না, তা হ'লে আমার সখা নন্দগোপই আসুক।

কন্যা লইয়া নন্দগোপের প্রবেশ

নন্দ। যাদুমণি, যাদুমণি, আমাদের গৃহলক্ষ্মীকে আনন্দিত না করে, আমাদের সকলকে ছেড়ে, তুমি চলে গেলে! অহো! কি ভীষণ অন্ধকার! যেন শত শত মহিষ একত্র হ'য়ে আছে।

কি দুর্দ্দিন! একটুও জ্যোৎস্না নেই! কোন জিনিষেরই আকার লক্ষ্য হচ্ছে না (আকাশ যেন মিলিয়ে গেছে)। মনে হচ্ছে যেন গোপী নীলবসনে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করে ঘুমিয়ে আছে।

আজ দুপুর রাতে পত্নী যশোদা এই কন্যাটি প্রসব করেছে। হতভাগিনী কন্যাটি প্রসব করেই যে মূর্চ্ছিত হয়েছে সে মূর্চ্ছা এখনও ভাঙ্গে নি। কাল ঘোষগণের চিরানুষ্ঠিত ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসব। যাতে গোপগণ এই দুঃখের ভাগী না হ'তে পারে সে জন্যই আমি একাকী শৃঙ্খলবদ্ধ-চরণে এই কন্যাটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। হত-ভাগিনী যশোদা মূর্চ্ছিত—সে জানে না কন্যা প্রসব করেছে, কি পুত্র প্রসব করেছে! হারে যাদুমণি!

বসু। রাত্রিকালে কে বিলাপ কচ্ছে! এই হত-ভাগ্যও দেখছি আমারই অবস্থাপন্ন (সমদুঃখভাগী)।

নন্দ। যাদুমণি আমাদের গৃহলক্ষ্মীকে আনন্দিত না করে, আমাদের সকলকে ছেড়ে তুমি চলে গেলে!

বসু। এই স্বর যেন আমার পরিচিত বোধ হচ্ছে! এ যেন আমার সখা নন্দগোপ! আচ্ছা, শব্দ লক্ষ্য ক'রেই অগ্রসর হই না কেন? সখা নন্দগোপ, এদিকে এস।

নন্দ। (সভয়ে) কি বিপদ! কে আমাকে পরিচিত স্বরে নন্দগোপ, নন্দগোপ বলে ডাকছে! এ কি রাক্ষস না পিশাচ! এই ভীষণ রাত্রি! আবার মৃত কন্যা আমার হস্তে! আমি এখন কি করি?

বসু। সখা নন্দগোপ, শঙ্কিত হ'ওনা। এদিকে এস।

নন্দ। (কান পাতিয়া) স্বরে ইহাকে বসুদেব বলেই ত বোধ হচ্ছে। আচ্ছা এগিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা আমার কাজ কি? ইনি রাজা কংসের আদেশে আমাকে অপরাধীর ন্যায় কশাঘাত করে আমার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলেন। থাক, আমি তাঁর কাছে যাব না। কিন্তু আমার এ নৃশংস ভাব ত ভাল নয়। বসুদেব আমার বহু উপকার করে'ছেন, তিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হন, সুখে সুখী হন, শুধু রাজার আদেশেই ত আমাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করেছিলেন। আচ্ছা, তাঁর কাছে গেলে দোষ কি? এ মেয়েটাকে নিয়েই বা কি করি! আচ্ছা এই করা যা'ক। রাত্রিও প্রভাত হ'য়ে এল। এ কি! আর্য্য বসুদেবও যে একটি ছেলে নিয়ে আছেন দেখছি! প্রভুর জয় হ'ক।

বসু। বয়স্য নন্দগোপ, তোমার গরুগুলি সব ভাল আছে ত?

নন্দ। হাঁ, প্রভু সব ভাল আছে।

বসু। তোমার পরিজনেরা সব ভাল আছে?

নন্দ। পরিজনের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? হাঁ সব ভাল।

বসু। বয়স্য, তুমি ঢেকে রাখ্‌ছ কি?

নন্দ। প্রভু, কিছুই না।

বসু। যদি সত্য কথা না বল তবে আমার প্রাণের দিব্য।

নন্দ। না ব'লে আর গতি নাই দেখছি। প্রভু তবে শুনুন। আজ দুপুর রাতে আমার স্ত্রী—না না, আপনাদের দাসী—যশোদা একটি কন্যা প্রসব করেই মূর্চ্ছিত হ'য়েছে। কাল গোপদের চিরানুষ্ঠিত ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসব। অন্য গোপেরা এই দুঃখের ভাগী না হ'তে পারে এজন্য আমি একাকীই শৃঙ্খলিত চরণে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। হতভাগিনী যশোদা মূর্চ্ছিত: জানে না, দুঃখিনী ছেলেই প্রসব করেছে, কি মেয়েই প্রসব করেছে!

বসু। হায়! লোকের আশ্রয়স্বরূপ যমকে বঞ্চনা করা যায় না। বয়স্য মেয়েটির শরীর একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছে—একে পরিত্যাগ কর।

নন্দ। প্রভু, পরিত্যাগ কত্তে পারি কৈ!

বসু। লোকধর্ম্মই এই—পরিত্যাগ কর।

নন্দ। প্রভুর আদেশ পালন কত্তেই হবে। যাদুমণি! যাদুমণি! (রোদন)

বসু। বয়স্য কেঁদে আর কি হবে? ওঠ।

নন্দ। (উঠিয়া ও নিকটে আসিয়া প্রভুর জয় হ'ক। এখন এ দাসের কি কর্ত্তব্য?

বসু। বয়স্য, তুমি ত জান দুরাত্মা কংস আমার ছয়টি ছেলেকেই একে একে হত্যা করেছে।

নন্দ। হাঁ প্রভু, তা জানি।

বসু। তাই এই সপ্তম পুত্র দীর্ঘায়ু হবে! আমার পুত্র-সৌভাগ্য নেই। তোমার ভাগ্যে এই শিশু বেঁচে থাকবে। তুমি একে নাও।

নন্দ। প্রভু বড় ভয় হয়! যদি রাজা কংস শোনে যে নন্দ গোপের গৃহে বসুদেবের পুত্র রক্ষিত হয়েছে তা হ'লে নিশ্চয় আমার মাথা যাবে।

বসু। (স্বগত) হায়। সব কাজ পণ্ড হ'ল। কিন্তু বুঝিয়ে বল্লে নৃশংসেরাও কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকে। বয়স্য নন্দগোপ!

যদি পূর্ব্বে আমি তোমার বিন্দুমাত্রও উপকার ক'রে থাকি তা' হ'লে জেন প্রত্যুপকারের এইই সময়।

নন্দ। কি! প্রত্যুপকারের কথা বলছেন? তবে কংসই হ'ক বা কংসের পিতা উগ্রসেনই হ'ক আমি কাকেও ভয় করি না। প্রভু ছেলেটিকে নিয়ে আসুন।

বসু। বয়স্য, এই নাও।

নন্দ। প্রভু, মরা মেয়ে আমার কোলে ছিল আমি অশুচি হ'য়েছি; একটু অপেক্ষা করুন আমি যমুনা হ্রদে গিয়ে স্নান ক'রে শুচি হ'য়ে আসছি।

বসু। বয়স্য, তুমি ঘোষ-পল্লীতে থাক, তুমি ত স্বভাবতঃই শুচি, আবার স্নানের প্রয়োজন কি?

নন্দ। তা' হ'লে ঘোষদের অভ্যস্ত ধূলি-স্নান করেই আমি শুচি হব।

বসু। বেশ, তা' হ'লে ধূলি স্নানই করে এস।

নন্দ। প্রভু যা আদেশ কচ্ছেন তাই করব। (ধূলি-স্নান করিতে গিয়া সবিস্ময়ে) প্রভু, বড় আশ্চর্য্য! বড় আশ্চর্য্য! আমি ধূলি খুঁড়ছি আর অমনি মাটি ভেদ করে যুগের * ন্যায় একটা জলস্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল।

বসু। নিশ্চয় জেন এটাও এই বালকের প্রভাবেই হয়েছে! স্নান কর।

নন্দ। হাঁ প্রভু, স্নান কচ্ছি। (স্নান করিয়া) প্রভু, এই স্নান করে এসেছি।

বসু। এই নাও।

নন্দ। প্রভু আমার বাহু বড় দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বল বাহু মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় ভারি এই ছেলেটি যে ধ'রে রাখতে পাচ্ছে না!

বসু। বয়স্য, আমি জানি তুমি ত বেশ বলশালী।

নন্দ। প্রভু আমার সামর্থ্যের কথা তবে শুনুন। শিং দিয়ে মাটী খুঁড়ছে এমন বৃষের শিং ধরেও আমি তার ঘাড় সোজা করে দিয়েছি। ভাঙবোঝাই গাড়ীর চাকা কাদা থেকে একা তুলে দিয়েছি। আমার এত সামর্থ্য কিন্তু কি আশ্চর্য্য এখন এই ছেলেটিকে তু'লে নিয়ে যেতে পাচ্ছি না।

পঞ্চায়ুধ ও গরুড়ের প্রবেশ

গরুড়। আমি সুন্দরপক্ষ মহাবেগশালী গরুড়; আমি বিষ্ণুর রথ এবং ধ্বজ দুইই। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণুর বলেই আমি বিষ্ণুকে বহন করেছি।

চক্র। আমি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় উগ্রতেজা কৃষ্ণের কর-শোভী চক্র। বিষ্ণুর ত্রিপদ-বিক্ষেপ-কালে এবং অমৃতমন্থন-সময়ে দানব ও দৈত্য-সমূহকে আমিই বিনাশ করেছি।

শার্ঙ্গ। আমি শার্ঙ্গ; আমার সুগোল মধ্যদেশ স্ত্রীলোকের ক্ষীণ কটির ন্যায় আনন্দদায়ক, এবং এই মধ্য দেশে বিষ্ণুর করাগ্র হ'য়েই আমি যুদ্ধে পুরুষের ন্যায় বীর্য্য-প্রদর্শন করে থাকি; আর বিষ্ণুর প্রয়োজন সাধনের জন্যই প্রবল যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্য প্রভৃতি বিপুল শত্রু নাশ করি।

কৌমোদকী। আমি হরির গদা; আমার নাম কৌমোদকী। পুরাকালে বিষ্ণুর আদেশে আমিই সমুদ্র মন্থন করেছি, এবং যুদ্ধ-নিহত দানবগণের শোণিত-নদীতে কেলি করেছি।

শঙ্খ। আমি শঙ্খ। ক্ষীরোদ সমুদ্র হ'তে বিষ্ণু স্বয়ং আমাকে উদ্ধার করেছেন। আমার শব্দ শুনেই দেবতার শত্রুগণ যুদ্ধে বিনষ্ট হয়।

নন্দক (খড়্গ)। আমি নন্দক; সংগ্রামে কোথাও আমি পরাঙ্মুখ হই না। প্রভাবশালী বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে থাকি।

চক্র। চক্র, শার্ঙ্গ, গদা, শঙ্খ ও নন্দক—আমরা সকলেই দৈত্য সংহার করে থাকি। বাসুদেবের কার্য্য সাধনের জন্য আমরা সকলে একত্র হ'য়ে আজ এখানে উপস্থিত হ'য়েছি।

ওহে তোমরা সকলেই এস। ভগবান বিষ্ণু মনুষ্য-

* জোয়াল।

লোকে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, আমরাও তাঁর বাল্যলীলা সাধন করবার জন্য গোপাল বেশ ধারণ করে ঘোষপল্লীতে অবতীর্ণ হব।

সকলে। তথাস্তু (বিষ্ণুর নিকট আগমন)

বসু। বয়স্য, এই বালককে নমস্কার কর।

নন্দ। প্রভু, তাই কচ্ছি। রাজকুমার, আপনাকে নমস্কার। আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে এই গোপালকের এরূপ পরাক্রম কোথায়!

চক্র। ভগবান্ মহাবিষ্ণু, ভগবান নারায়ণ,আপনাকে নমস্কার।

অমরগণের কার্য্যাকার্য্য আপনার সংস্পর্শেই এই পৃথিবীতে প্রভাবশালী হ'য়ে থাকে, সুতরাং হে যদুবংশ-কেতু, সাধারণ লোকের সংসর্গকারী এই অধমের প্রতি কৃপা করুন।

বসু। এই নাও।

নন্দ। প্রভু যা বলছেন। (গ্রহণ)

বসু। বয়স্য, রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে; এখন ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভু, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমার পায়ের দুটা শিকলই খুলে গেল!

বসু। এই সমস্তই কুমারের প্রভাবে হচ্ছে। যাও ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভুর যেমন আদেশ।

বসু। আচ্ছা, এস ত একবার আমার কাছে।

নন্দ। প্রভু, এই এসেছি।

বসু। তুমি স্বভাবতঃই স্নেহশীল আমি জানি, তথাপি ছেলেটিকে খুব স্নেহ করো, এই আমার অনুরোধ। দগ্ধাবশিষ্ট যদুবংশের বীজ তোমার হাতে সমর্পণ করেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা কত্তে পারবে।

আচ্ছা ছেলেটিকে তুমি কি রকমে রাখবে?

নন্দ। প্রভু শুনুন কি রকমে রাখব। এই শিশু এক বাড়ীতে যেয়ে দুধ খাবে, আর এক বাড়ীতে যেয়ে দৈ খাবে, অন্য আর এক বাড়ীতে গিয়ে নবনীত খাবে এবং অপর এক গোপের বাড়ীতে গিয়ে ঘোলের ঘট দেখবে। বেশী আর কি বলব, এই শিশু সকল ঘোষের রাজা (কর্ত্তা) হবে।

বসু। আচ্ছা তাই হ'ক। তুমি ফিরে যাও।

নন্দ। প্রভুর যা আদেশ। [প্রস্থান।

বসু। নন্দগোপ ত চলে গেল। আমিও এখন মথুরায় ফিরে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) ক্রন্দন শব্দ শুনছি না? তবে কি কংসের ভয়ে নন্দগোপ আবার ফিরে এল! (পরিক্রমণ করিয়া) একি! মেয়েটি যে বেঁচে উঠেছে দেখছি! বেশ হ'য়েছে; এই মেয়েটি দেবকীকে দিয়ে দুরাত্মা কংসকে বঞ্চনা করব। (গ্রহণ করিয়া) বাবা! কি ভারি! এই মেয়েটিও কুমার বাসুদেব হ'তে অন্য রকম এক বিশেষ প্রাণী হবে সন্দেহ নাই। আচ্ছা এখন যাই। একি! ভগবতী যমুনা ঠিক তেমনই রয়েছে দেখছি। যাই তবে নদী অতিক্রম করি। ঐই যে যমুনা উত্তীর্ণ হলুম। এই যে নগর-তোরণ। মথুরার সব লোক তেমনই নিদ্রিত রয়েছে। আচ্ছা নগরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া) দেখে বোধ হচ্ছে দুরাত্মা কংসের গৃহে যেন অলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়েছে; আর অমাদের গৃহ যেন লক্ষ্মী দেবী আশ্রয় করেছেন। যাই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেবকীকে আশ্বাসিত করি গে। দেবগণ মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

পাটুনী *

নীল নভ-পারাবার-পারে
অমৃত পুরী ;
হত-আশে ধরণীর কূলে
মরি ঘুরি' ঘুরি'।

অভ্র-ভেলাগুলি চেয়ে চেয়ে
ভাবি কোথা আছে মোর নেয়ে.
কোন্ তরী আসিবে সে বেয়ে
ক'রে মন চুরি ?

মহানীল অকূলতা দলি'
মন বেগে ছুটে যাবে চলি.'
ফুটা'বে সে হৃদি-ফুল-কলি,
ত্রিতাপ বিদূ'রি'।

তার পরে উতরিবে তীরে,
দাঁড়াবে অপ্সরা ঘিরে,
মা আমার, মুখে দিবে ধীরে
স্তন-ভার পুরি'।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

---

* প্রকাশিতব্য গীতিকাব্য "কণ্ঠ" হইতে। সুর "ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে"

বাঙ্গালীর উচ্চারণ

বাঙ্গালী খাঁটী উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। এই প্রবাদ দুরপনেয়। ইহাতে বাঙ্গালী আপত্তি করে না, করিতে পারেও না ; কারণ, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিতেছে, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় আক্রমণের ফলে, তাহাদের বাগিন্দ্রিয় এত বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, যদিও হিন্দুস্থানীর অনুকরণ করিয়া উচ্চারণপরিশুদ্ধিকামী কোন কোন ব্যক্তি আত্মা, চক্ষু প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তথাপি শ-কারত্রয়ের এবং ব-কার দ্বয়ের পৃথক্ উচ্চারণ কিছুতেই সংঘটিত হইয়া উঠে না। এই রূপ অনেক বর্ণেরই উচ্চারণগত বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। এই উচ্চারণ-বিভ্রাট কত কাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সংস্কৃত শব্দের অবিকৃত উচ্চারণপটু বলিয়া যে সকল জাতি প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় প্রকৃতির আক্রমণ হইতে সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে কি না, তাহাও একবার বিচার করা আবশ্যক।

যদি এই বিচারের ফলে আমরা দেখাইতে পারি যে, মানব মাত্রের বাগিন্দ্রিয়েই প্রকৃতির কুলক্ষয় ব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালী-কুৎসন-প্রয়াসী জাতিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা নিজের দোষ না বুঝিয়াই কেবল পরকুৎসনে অভ্যস্ত। জানি না কাহাকে লক্ষ্য করিয়া দাক্ষিণাত্যের পরিহাস-পেশল কবি একটি কবিতা পাঠ করিয়াছেন—
"অবিদিত শষস বিশেষা বাণী বদনাদ্ বিনির্গতা যেষাম্।
গুদবদন-বিবর-বিভেদো রদনৈরেব খলু দৃশ্যতে তেষাম্॥"

ইহার অর্থ এই—যাহাদের মুখ হইতে বিনির্গত ভারতীতে শকার ত্রয়ের পার্থক্য পরিস্ফুট হয় না, তাহাদের মুখচ্ছিদ্রের এবং অপান-রন্ধ্রের প্রভেদ কেবল দন্তের দ্বারাই বুঝিতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর পরিহাসব্যঞ্জক বচন বিন্যাস কবিত্বের নিদর্শন বটে,

কিন্তু একটু প্রণিধান সহকারে চিন্তা করিলে, এতাদৃশ বচনের অসারতাই প্রতিভাত হয়। কারণ. বেদের মন্ত্রে পর্য্যন্তও প্রকৃতির আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি শকারের স্থানে সকারের উচ্চারণের ত কথাই নাই। যে সকারকে হকার উচ্চারণ করিয়া আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীর অন্তর্গত "বাঙ্গাল" রূপ একটি স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়াছি, খাঁটী বেদেও তাহার নিদর্শন দেখা যায়। শিরা "হিরা" হইয়া গিয়াছে (১)। ভাষ্যকার সায়ন শকারের স্থানে হকার "ছান্দস" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "ছান্দসই" হউক আর "আর্ষই" হউক, ইহা কেবল কথার কথা, ফলতঃ প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় প্রভাবেরই পরিচায়ক। যে প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, ভারতের সর্ব্বত্র সভ্য সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, যে ভাষার গ্রন্থাবলী আদর্শ নায়ক রামচন্দ্রেরও পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, (২) সেই ভাষাতে একাধিক সকারের অধিষ্ঠান নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রাবলীই এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাহার উচ্চারণ যে খাঁটী, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, তাহার নির্ণয় হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আর্য্যাবর্ত্তের বশিষ্ঠ দাক্ষিণাত্যে বসিষ্ঠ, আর্য্যাবর্ত্তের শূকর দাক্ষিণাত্যের সূকর। এই সমস্যার ভঞ্জন করিবে কে?

শকার ত্রয়ের অধিকারগত বিবাদ অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগেরও বিভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি যে সকল ধাতুকে মূল করিয়া শব্দের রূপ এবং অর্থ স্থির করা হয়, সেই সকল ধাতুগত শকার সম্বন্ধেই মহাবৈয়াকরণদিগের মতদ্বৈত পরিলক্ষিত হয়। এই স্থলে মাধবীয় ধাতুবৃত্তি হইতে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। সায়ন "কুস্ শ্লেষণে" এই কুস্ ধাতুকে দন্ত্যসকারান্ত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুর্গসিংহ এই ধাতুকে তালব্য শকারান্ত পাঠ করিয়াছেন। (৩) "মুস্ খণ্ডনে" খণ্ডনার্থ মুস্ ধাতুকে সকলেই দন্ত্যান্ত পাঠ করেন, কিন্তু আত্রেয় নামক গ্রন্থকার কাতন্ত্র ব্যাকরণে ইহাকে মূর্দ্ধন্যান্ত পাঠ করেন। (৪) অতঃপর বলিয়াছেন যে, অস্‌ধাতু হইতে মস্ পর্য্যন্ত সমস্তগুলি ধাতুই দন্ত্যান্ত। (৫)

এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই শকার ত্রয়ের সঙ্গে তালব্য মূর্দ্ধণ্য প্রভৃতি বিশেষণ লাগাইতে হইতেছে। উচ্চারণের দ্বারা পার্থক্য প্রদর্শনে দাক্ষিণাত্যবাসীর বেদবিশুদ্ধ বাগিন্দ্রিয়ও অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে। কারণ যদি উচ্চারণের দ্বারাই প্রভেদ বুঝাইতে পারিতেন, তবে শান্ত, ষান্ত, সান্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তালব্য প্রভৃতি বিশেষণ সন্নিবেশের কিছুই প্রয়োজন হইত না।

মূল ধাতুগত এইরূপ বৈষম্যের ফলেই মুসল প্রভৃতি শব্দে বিভিন্ন ষকার দেখা যাইতেছে। কোষ প্রভৃতি শব্দ দ্বিরূপ হইয়া দেখা দিতেছে।

(১) অমূর্য্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিত বাসসঃ।
অথর্ব্ববেদ সংহিতা—৯৮ পৃঃ

(২) শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্র সমূহেষু প্রাপ্তোব্যামি * শ্রকেষুচ।
অর্থ ধর্ম্মৌচ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ।
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১ম সর্গ। ২৭ শ্লোক।

* ব্যামি শ্রকেষু প্রাকৃতাদি ভাষা—মিশ্রিত নাটকাদিষু। তিলক টীকা।

(৩) "কুস্‌শ্লেষণে"—দুর্গস্তালব্যান্তং পপাঠ। ধাতু বৃত্তি দিবাদি—১৮৩ পৃঃ

কোষ শব্দের অর্থ প্রদর্শন প্রসঙ্গে "ভানুজী দীক্ষিত" বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্বয়ং নির্গত হয়, এই অর্থে

(৪) "মুসখণ্ডনে" দন্ত্যান্ত ইতি সর্ব্বে, আত্রেয়স্তু কাতন্ত্রে মূর্দ্ধণ্যান্ত্যোঽয়ং।

(৫) অস্তাদয়োমসি পর্য্যন্তা দন্ত্যান্তাঃ। ঐ।

কুষ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়া কোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার তালব্যান্ত রূপও দেখা যায়। মেদিনী কোষে দুই প্রকার রূপই পঠিত হইয়াছে। (৬) তবেই দেখা যাইতেছে যে, উদাত্তাদি স্বর-পার্থক্য-প্রকটন-কুশল ভাস্নজী প্রভৃতিও কণ্ঠোক্তির দ্বারা শকার ভেদ প্রদর্শনের পরিচয় প্রদান করেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালীই যে কেবল উচ্চারণে অসামার্থ্য বশতঃ তালব্য প্রভৃতি বিশেষণের সহিত শকারের পাঠ করে, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

হিন্দুস্থানীগণ মূর্দ্ধণ্য ষকারকে অনেক স্থলেই খকার রূপে উচ্চারণ করেন; যেমন ভূষণ ভূখণ, ষট্শাস্ত্রী খট্শাস্ত্রী ইত্যাদি। স্থল বিশেষে বাঙ্গালীর মুখেও এইরূপ উচ্চারণ হয়। যেমন চক্ষু, ইহার উচ্চারণে ককার খকারের সংযোগই প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু এই স্থলে হিন্দুস্থানীগণ ষকারকে খকার না করিয়া ষকার রূপেই পাঠ করেন—চক্ষু।

আচার নিয়ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যেমন বৈপরীত্য দেখা যায়, ষকারের উচ্চারণেও সেইরূপ হিন্দুস্থানীর ও বাঙ্গালীর রুচিভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারিত লক্ষ্মণ হিন্দুস্থানীর মুখ হইতে লছ্মন হইয়া বাহির হইতেছে। এই উচ্চারণে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা আছে। হিন্দুস্থানী সকারকে ছকার রূপে উচ্চারণ করেন, সুতরাং লক্ষ্মণের উচ্চারণে ষকারের পরিবর্ত্তে দন্ত্য সকারের উচ্চারণ ঘটিতেছে। স্নান স্নাত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে বাঙ্গালীর মুখেও ছকারের আভাস পাওয়া যায়। মূর্দ্ধণ্য ষকারের ও খকারের ব্যত্যয় প্রসঙ্গে পাষণ্ড শব্দ দ্বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরুক্তি অনুসারে দেখা যায়, পাষণ্ড শব্দের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ খকার,—পালন করে বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মের নাম পা, সেই পাকে খণ্ডন করে বিধায় বেদবিরুদ্ধ আচরণ ও আচরণকর্ত্তা পাখণ্ড নামে কথিত হয় (৭)। কিন্তু বাঙ্গালী এই স্থলে খকারকে ষকাররূপে উচ্চারণ করিতেই অভ্যস্ত। বাঙ্গালীর টীকা প্রভৃতি দেখিয়াই বোধ হয় ভাস্নজী দীক্ষিত শব্দটিকে দ্বিরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বকার দ্বয়ের লিপি বিন্যাসে বাঙ্গালী পার্থক্য প্রদর্শন করে না। দেবনাগর অক্ষরে বর্গ্য বকারের মধ্যভাগে একটি ছেদ দেখা যায়। কিন্তু এই ছেদকে সর্ব্বত্র উচ্চারণের প্রভেদ জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে যমক প্রভৃতি অলঙ্কারে বকারদ্বয়ের ঐক্য অর্থাৎ একরূপ উচ্চারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। † সুতরাং বুঝা যায় যে, বাঙ্গালী যেমন উচ্চারণের দ্বারা শকারত্রয়ের পার্থক্য ব্যক্ত করিতে পারে না, অথচ লিপিগত ভেদ প্রদর্শন করে, এইরূপ অন্যান্য দেশেও বকারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাকৃতের প্রভাব সংস্কৃত ভাষার এত অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ফলে সংস্কৃত শব্দের খাঁটী স্বরূপ কি ছিল তাহার নির্ণয় অনেক স্থলেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অমরকোষে এবং মেদিনী কোষে ক্ষৌমবস্ত্র অর্থে দুকূল শব্দ দেখা যায়। কিন্তু হেমচন্দ্রের অভিধানে এই শব্দটীর "দুকূল, দুগুল" এই দুই রূপ

(৬) কুষ্যতি নিষ্ক্রামত্য স্মাৎ স্বয়মেব। অকর্ত্তরিচ। ৩।৩।১৯ ইতি ঘঞ্॥

মূর্দ্ধণ্যান্তে মেদিনী। তালব্যান্তোপ্যয়ং। "কোশোস্ত্রী" ইতি তালব্যান্তেষু মেদিনী।

(৭) পালনাচ্চ ত্রয়ী ধর্ম্মঃ পাশব্দেন নিগদ্যতে। তং খণ্ডয়ন্তি তে যস্মাৎ পাখণ্ডা স্তেন হেতুনা।

† যমকাদৌ ভবেদৈকং ডলোর্ববোর্লরো স্তথা। সাহিত্যদর্পণ।

পঠিত হইয়াছে। অমর ও মেদিনীকার এই উভয়ের মতেই ওড্র পুষ্প অর্থে জবা শব্দ পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মদাস নামক গ্রন্থকার জপা শব্দও পাঠ করিয়াছেন। *

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে জপা শব্দই দেখা যায়। এই সকল রূপ বিপর্য্যয় যে প্রাকৃত প্রভাব প্রসূত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আদি যুগে ইহাদের যে কি রূপ ছিল তাহার নির্ণয় করা মানব শক্তির অতীত। প্রাকৃতের প্রভাবে প্রথম বর্ণের স্থানেও তৃতীয় হয় এবং তৃতীয়ের স্থানেও প্রথম বর্ণ হয়। সুতরাং এইরূপ স্থলেই প্রাকৃতের সাহায্যেও মূল নির্ণয় অসম্ভব; অতএব উচ্চারণ বিভ্রাটের অভিযোগটা কেবল বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে খাড়া করা যাইতে পারে কি না, বিচারনিপুণ মনীষিগণ তাহা স্থির করিবেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

সন্ধ্যা

স্নিগ্ধ-পূত তনুখানি
আবরি সোনালি বাসে,
সলাজ আনত মুখে
সন্ধ্যারাণী নেমে আসে।
সারাটি দিবস রবি
ছড়ায়ে রূপের রাশি,
সন্ধ্যার রক্তিম ক্রোড়ে
ঢলিয়া পড়িছে হাশি।
উজ্জ্বল তারকা রাশি,
ফুটিল গগন-গায়,
হাসিছে মধুর হাসি
স্বপনে শিশুর প্রায়।
মন্দিরে আরতি-শঙ্খ
উঠিল স্বরগ পানে
শান্তি মন্দাকিনী-ধারা
বহে ধীরে ভক্ত-প্রাণে।
সাজিয়া সুন্দর সাজে
সলাজ মধুর হাসে
ধীর পদে সন্ধ্যা ঐ
অভিসারে নেমে আসে

শ্রীচারু গুপ্তা

পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণ

আজ যে স্বনামধন্য মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তিনি বঙ্গদেশের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বঙ্গের কোনও ঐতিহাসিক কোনও ইতিহাসে ইঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অতীতের অন্ধকাররূপ যবনিকার অন্তরালে এই প্রকার কত ঐতিহ্যতত্ত্ব যে লুক্কায়িত আছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন ব্যাপার। সেই সকল তথ্য উদ্ধার করা যে কত কঠিন কার্য্য তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেই অবগত আছেন। যেখানে জমিদারী তালুকদারী সংক্রান্ত কাগজ-পত্র, দেশ প্রচলিত প্রবাদবচন ও বৃদ্ধদের মুখের কথা

---

* জবায়ান্ত জপা স্মৃতা। অমর বনৌষধিবর্গ। ৭৬ শ্লোক হৈমাভুজীটীকা।

ইতিহাসের প্রধান উপকরণ সেখানে অল্পমতি লেখককে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যদি এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখা পাঠ করিয়া কোনও ঐতিহাসিক বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য সমুৎসুক হন তাহা হইলেই লেখকের সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

পাঁচদোনার নামকরণ, অবস্থান ও সামান্য বিবরণ

ঢাকা সদর ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন মহেশ্বরদী পরগণা। এই পরগণা পূর্ব্বে সুবর্ণ-গ্রামের অধীন মখাদি নামে অভিহিত হইত। পরে বৈশ্যবংশীয় মহেশ্বর নামক জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি মখাদিকে নিজনামে মহেশ্বরদী বলিয়া পরিচিত করেন। এই পরগণার দৈর্ঘ্য উত্তরসীমা কঠিয়াদীর নিকট হইতে দক্ষিণ সীমা মুড়াপাড়ার দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ৪১।৪৬ মাইল। প্রস্থ লক্ষ্যানদীর পূর্ব্ব তীর হইতে মেঘনার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত ১২ হইতে প্রায় ১৮ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় মঠখলার নিকট ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করিয়া এই পরগণাটীকে পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধের দক্ষিণে শীতল লক্ষ্যার শেষ সীমায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে পাঁচদোনা গ্রামটী অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র যখন সচল ছিল তখন পাঁচদোনা অত্যন্ত উন্নত ছিল। এখানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী, মঠ, ইষ্টকালয় প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া গ্রামের প্রাচীনতার ও পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় এখনও দিতেছে। কথিত আছে, ত্রিপুরার মহারাজ প্রেরিত কোন সেনাপতি এখানে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করেন। সেই অনুসারে এই স্থান "পঞ্চদ্রোণা" কালে পাঁচদোনা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখনও পাঁচদোনার অনেক তালুক সম্পত্তির কাগজে "ত্রিপুরাপতি" বলিয়া লিখা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান পাঁচদোনা গ্রামের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল। গ্রামের মধ্য দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একটী রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। দুঃখের বিষয় এই রাস্তাটী ব্রহ্মপুত্রকে বন্ধন করিয়া দিয়াছে। এই রাস্তা হইতে গ্রামের ভিতর অনেকগুলি লোকেল বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র-স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসরই এখানে বহু হিন্দু নরনারী সমবেত হন। তদুপলক্ষে একটী মেলা হয়। গ্রামে প্রায় ১৫০০ শত লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, বণিক্, তেলি, গোপ, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত, ধোপা, ভুঁইমালী, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, সাহা, সূত্রধর, লগ্নাচার্য্য প্রভৃতি নানাশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান আছে। ইহাদের মধ্যে বৈদ্য সম্প্রদায়ই সমধিক উন্নত।

মুসলমান রাজত্ব হইতে বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গ্রামে বহু শিক্ষিত লোকের বাস। এমন কি প্রবন্ধে বর্ণিত দেওয়ান দর্পনারায়ণ-বংশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধীধারিণী স্ত্রীলোকও এই গ্রামে বিদ্যমান আছেন। এই গ্রামে দুই শ্রেণীর বৈদ্যবংশ বিদ্যমান। এক দেওয়ান দর্পনারায়ণের বংশ ও অপর হাওলার বংশ। দুইটীই অতি প্রাচীন ও উন্নত। দেওয়ান দর্পনারায়ণের সময় হইতেই তদীয় বংশ ও পাঁচদোনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশের প্রাচীনতার নিদর্শন একটী জীর্ণ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশীয়েরা পূর্ব্বে গৌড় দেশে (বর্ত্তমান মালদহে) ছিলেন। দ্বিজ পুরুষ হইতে আমরা এই বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহার পুত্র কাশীদাস, তৎপুত্র সুরানন্দ। সুরানন্দের পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র শ্রীনিবাস। তিনি মসনদআলীর সরকারে দস্তিদারের কার্য্য করিতেন। জরিপের মাপকাঠি তাঁহার হস্ত প্রমাণ ছিল। এমন কি তাঁহার দস্তখত ভিন্ন ঐ সরকারে কোনও কাজ হইত না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন

হয় যে, তিনি উক্ত জমিদার সরকারে অতি প্রধান ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ছিলেন। পদ্মানদীর পশ্চিমে মথুরা-নামক স্থানে সত্রাজিত নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীনিবাস তাঁহার কন্যা হারাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল। ১ম স্ত্রীর গর্ভে রাঘব রায়, ২য় স্ত্রীর গর্ভে ১ম বলরাম, ২য় গৌরীকান্ত, ৩য় ভবনাথ এই পুত্রত্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। বলরাম পাঁচদোনার সংলগ্ন ভাটপাড়ায় যাইয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহার তীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন। বর্ত্তমান সময়ও সেই দীঘি বিদ্যমান আছে। পরন্ত দীঘির পাড় বলিয়া ভাটপাড়ায় একটী পাড়াও অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম সেন দেওয়ান ঈষাখাঁর সরকারে পত্রনবীশের কাজ করিতেন। আজ পর্য্যন্তও মহেশ্বরদী পরগণায় "তালুক বলরাম পত্র-নবীশ" নামীয় অনেক তালুক আছে। ইহাদ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ২য় গৌরীকান্ত সেনের নিবাস পাঁচদোনা (নৌলাপাড়া)। ৩য় ভবনাথ সেনের বংশধরগণ পাঁচদোনা উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বর্ত্তমান আছেন। শ্রীনিবাস সেনই প্রথমতঃ গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি সুবর্ণ গ্রামে সেনপাড়া, কালীপাড়া, ভবনাথপুর গ্রাম সকল স্থাপন করেন। ভবনাথপুর গ্রামটী হারিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের নিকট এখনও বিদ্যমান আছে। অন্যান্যগুলি দুরতিক্রম্য কাল মেঘনায় কুক্ষিগত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপাদিও বিনষ্ট হইয়াছে। অনুমান ভবনাথের নামানুসারে ভবনাথপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। পুথিতে উল্লিখিত আছে যে রাঘব রায় ভ্রাতৃগণকে সম্পত্তির কিছুই না দিয়া তৎপুত্র রত্নেশ্বরকে সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন। এইজন্য ভ্রাতৃত্রয় দেশত্যাগী হন। এদিকে রত্নেশ্বর মগ সাহচর্য্যে সমাজ চ্যুত হন।* পরন্ত মেঘনায় কালীপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল নষ্ট করিয়া ফেলিলে তিনিও দেশত্যাগ করেন। বলরামাদি ভ্রাতৃত্রয় বঙ্গদেশে বিবাহ করেন। এই নিমিত্ত গৌড়ীয় সমাজে মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হন। এই বলরামাদি ভ্রাতৃগণই প্রথমতঃ পাঁচদোনায় আসেন। ভবনাথের পুত্র রামজীবন সেন। তিনি বিক্রমপুর মুড়াকাটা গ্রামের ধনীরাম দাসের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। তিনি বিক্রমপুর সোমতারা গ্রামে বিবাহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে ৩ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১ম সন্তোষনারায়ণ, ২য় দর্পনারায়ণ, ৩য় ইন্দ্রনারায়ণ। প্রত্যেকের বংশধরগণই অতি প্রসিদ্ধির সহিত পাঁচ-দোনাতে অবস্থান করিতেছেন। বর্ত্তমান সুযোগ্য সিভিলিয়ান মিঃ বি, সি, সেন ও ইঞ্জিনিয়ার ৺ চারু চন্দ্র সেন ইঁহাদেরই বংশধর। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রূপচন্দ্র মুন্সী এই ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা পক্ষের।

দর্পনারায়ণের সময় নির্ণয়। দেওয়ান দর্পনারায়ণ কোন্ সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা দরকার। দেওয়ান দর্পনারায়ণের নিজ বাটীর ২য় প্রকোষ্ঠের সিংহদ্বারের প্রাচীর-গাত্রে ভিতর দিকে "৺শ্রীদুর্গা" তাহার নিম্নে "১১১০" ও সর্ব্বনিম্নে শ্রীদর্প… … …ন লিখিত দেখিলাম। দর্পনারায়ণ সেন লেখাটীর মধ্যের অক্ষরগুলি উঠিয়া গিয়াছে। লেখাগুলি প্রাচীর গাত্রে সুরকি দ্বারা লিখিত। নামটীর মধ্যের অংশের আস্তর খসিয়া যাওয়ায় নামটি সম্পূর্ণ নাই। এই১১১০ বাঙ্গালা সন।

* এদেশে প্রবাদ আছে যে কোনও মগ পান খাইয়া পানের রস সংমিশ্রিত থুথু (দেশজ ভাষায় পানের পেচ্ কি) উক্ত রায় মহাশয়ের শরীরে ফেলিয়াছিল। ইহাতে তিনি সমাজচ্যুত হন। বলা বাহুল্য সেই সময় হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান সমাজের ন্যায় ছিল না। সমাজের বন্ধন অতি দৃঢ় ছিল।

কাজেই বর্ত্তমান ১৩২১সন হইতে ২১১ বৎসর পূর্ব্বের লিখা। দর্পনারায়ণকে ১ম পুরুষ ধরিয়া আনিলে তাঁহাদের কুলজি দৃষ্টে বর্ত্তমান পুরুষকে ৬ষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়। কাজেই ৬পুরুষে আমরা ২১০ বৎসর ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হইবে না। যে দেওয়াল গাত্রে "১১১০" লিখাটী দেখিয়াছি তাহা ঠাকুর দালানের আঙ্গিনার সম্মুখস্থ প্রাচীরের সিংহ-দ্বারে। হিন্দুগণ পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ঠাকুর দালানই প্রস্তুত করান। তৎপর অন্যান্য দালান প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। বোধ করি এই ৺ঠাকুর দালান ১১১০ সনে হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বয়স অল্প ছিল বলিয়াই বোধ হয়। কার্য্যের উন্নতিও বিশেষ হয় নাই। ক্রমে কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত বাড়ীঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

তিনি ১১১০ সনের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে কত দিন পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। আমরা দেশ প্রচলিত প্রবাদ বচন হইতে এই জানিতে পারি যে, তিনি মুর্শিদকুলিখাঁর সময় ঢাকাতে কার্য্যে যোগদান করেন ও তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মুর্শিদাবাদে যান। (১৭০৩ খৃঃ)। সেই সময় তাঁহার কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তাহার ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন পারশী ও সামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াই লোক কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইত। কাজেই ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই অনেকে কার্য্যে যোগদান করিত। দর্পনারায়ণেরও তাহাই হইয়াছিল। কাজেই ১৭০৩ খৃঃ (বাঙ্গালা ১১০৯ সনে) আমরা দেওয়ানের ১৯।২০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হই। অতএব ১০৯০ বাঙ্গালা সনের সমসাময়িক কালে দেওয়ানের জন্মের সময় ধরিয়া লইতে পারি।

নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে দর্পনারায়ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি কায়স্থ বংশোদ্ভব। তাঁহার বাসস্থান মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী ডাহারপাড়ায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর সরকারে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। আমরা যে দর্পনারায়ণের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি বৈদ্য বংশোদ্ভূত। তাঁহার নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে। তিনি মুর্শিদকুলিখাঁর সময় ঢাকাতে প্রথম কাজে নিযুক্ত হন। তৎপর ১৭০৩খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মুর্শিদাবাদে যান। এক সরকারে একনামে দুইজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই পরবর্ত্তী কালে একের কীর্ত্তিকলাপাদি অন্যের নামে সংযোজিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেওয়ান দর্পনারায়ণ প্রথমে শিক্ষানবীশী হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ কার্য্যতৎপরতা দ্বারা কানুনগো ও তৎপর দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কাজেই ২জন দর্পনারায়ণ যে এক ষ্টেটে এক কানুনগোর কাজ করিয়া পরবর্ত্তী কালে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবেন তাহার বিচিত্র কি?

দেওয়ান দর্পনারায়ণ কে?

দেওয়ান দর্পনারায়ণের যে সকল কীর্ত্তি এদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহার প্রত্যেকটীই দেওয়ান দর্পনারায়ণের "দেওয়ানী উপাধির" সাক্ষ্য দান করিতেছে দেওয়ান দর্পনারায়ণ একজন ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি এই দেশে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, কোনও রোপিত বৃক্ষে ফল না হইলে, গাভী দোহন করিবার সময় গাভী লাথি দিলে, ইত্যাদি কার্য্যের সুফল প্রাপ্তির আশায় দেওয়ানের নামে মানসিক করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রকার ঘটনা পরম্পরায় দেওয়ান দর্পনারায়ণকে এই দেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা নবাবী আমলের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে,

নবাবী আমলের কার্য্যবিভাগ

বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য বিভাগের ন্যায় তখনও ভিন্ন ভিন্ন পদে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত থাকিয়া রাজ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন আমরা মন্ত্রী বিভাগে (১) দেওয়ানী আলা (Prime minister) (২) দেওয়ান খালসা শরিফা (Finance minister) (৩) দেওয়ান-ই-তর্ন (Paymaster-General, and Minister of the Master) (৪) দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ (Minister of domestic affairs) (৫) দেওয়ান-খান-সমান (Lord High Steward) প্রাদেশিক বিভাগে (১) দেওয়ান সুবাজাত (প্রাদেশিক মন্ত্রী) এই ৬ প্রকার দেওয়ানের কার্য্য দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিভাগে অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণ যে কোন্ দেওয়ানী করিয়া এদেশে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অতীব কষ্টকর। তবে এদেশ প্রচলিত জন-

দেওয়ান দর্প-নারায়ণ যে পাঁচদোনা-বাসীছিলেন তাহার বিবরণ

শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি নবাব বাড়ীর আসবাব-পত্র, বাড়ীর খরচ প্রভৃতি বিষয়ের দেওয়ানী অর্থাৎ সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ৪র্থ নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী পদে কাজ করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা পূর্ব্বে দেওয়ানের সময় নির্ণয় করিতে যাইয়া যে সময় নিরূপণ করিয়াছি তাহাতে ১০৯০ বাঙ্গলা সনে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে দেওয়ানের জন্ম ধরিয়া লইয়াছি। ১০৯০সন=১৬৮৪ খৃঃ অব্দ। যদি আমরা ৮০ বৎসর দেওয়ানের জীবিতকাল ধরিয়া লই তাহা হইলে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও কালে তাঁহার মৃত্যু ধরিতে হইবে। কাজেই ১৬৮৪-১৭৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময় তাঁহার জীবিত কাল ও কার্য্যকাল।

১৬।১৭ বৎসর বয়সে দেওয়ানের কার্য্য যোগদান ঘটিয়া থাকিলে ১৭০০খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে আমরা তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট দেখিতে পাই। কাজেই মুর্শিদকুলিখাঁর সময় কার্য্যে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া তিনি নিজের প্রতিভাবলে ক্রমে উন্নতি করিয়া আলিবর্দ্দির সময় দেওয়ানের কার্য্য পান। সিরাজদ্দৌলার সময় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণ নবাব সরকারে ক্রমে ক্রমে ৩ জন নবাবের অধীনে কাজ করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার আচরণে যখন তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তখন দেওয়ানকে সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবার নিমিত্ত অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ অনুরোধ করেন কিন্তু ধর্ম্মভীরু, সরলপ্রাণ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ভৃত্য দেওয়ান দর্পনারায়ণ তাহাতে সম্মত না হইয়া পক্ষান্তরে নবাবকে সকল কথা জ্ঞাপন করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা সকল কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া উক্ত ষড়যন্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন। হিন্দু ও মুসলমান সকল কর্ম্মচারীই নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ও কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল কথা অস্বীকার করেন। ইহাতে নবাব দেওয়ানকে মিথ্যা-বাদী স্থির করেন। এই ঘটনায় দেওয়ান অত্যন্ত অপ্রতিভ হন এবং স্পষ্ট ভাষায় নবাবকে বলেন যে, "আমি এই নবাব সরকারে ক্রমাগত তিন নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিলাম। নিমক হারাম নহি। যে মনিব ভৃত্যকে অবিশ্বাস করেন আমি তাঁহার অধীনে কাজ করি না, এমন কি তাঁহার রাজ্যেও বাস করি না"। নবাব ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেওয়ান, তুমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করিবে?" তদুত্তরে দেওয়ান, বলিলেন "আমি ৺ কাশী বাসী হইব।" বলা-বাহুল্য সেই সময়ই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী

আসিয়া অমনি ৺ কাশী যাত্রা করিলেন। ৺ কাশী যাত্রাকালীন তাঁহার দত্তক পুত্র রামদাস ও ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত একটী কন্যা (সেই সময় বিধবা) ও ২টী পুত্র শিবদাস ও কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন।

আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনীর সহিতই এক একটা অলৌকিক উপন্যাস বিজড়িত থাকে। দেওয়ানের জীবনীতেও সেই প্রকার অনেক উপন্যাস বিজড়িত আছে।

দেওয়ান সম্বন্ধে দেশ প্রচলিত কতিপয় গল্প

১ম—বাল্যকালে দেওয়ানের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তিনি একদিন মিষ্টান্ন খাইবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট আবদার করিলেন; অবস্থার দৈন্য প্রযুক্ত মাতা পুত্রের আবদার রক্ষা করিতে পারিলেন না। বার বার আব্দার করাতে মাতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে প্রহার করিলেন এবং বলিলেন, "যে দিন নিজে উপার্জ্জন করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে পারিবে সেদিন খাইও।" মাতার এই শাসনে বালকের মনে উন্নতির বীজ উপ্ত হইল তৎক্ষণাৎ বালক নিজের কর্ত্তব্য পথ অন্বেষণ করিতে বাড়ীর বাহির হইলেন কিন্তু "নবী" নাম্নী জনৈকা ধাত্রী অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনেন। তখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চড়কা ঘুরিত। উক্ত ধাত্রী সূতা কাটিয়া সূতার বিক্রয় লব্ধ অর্থদ্বারা বালক দর্পনারায়ণকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। কিন্তু বালকের মন আর গৃহে তিষ্ঠিল না। তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতেই দেওয়ান স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্য পরায়ণ ও সৎসাহসী ছিলেন। সেই সময় দেশে রেল জাহাজ দূরের কথা গয়নার নৌকাও দুষ্প্রাপ্য ছিল। একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়া এত সুগম ছিল না। উন্নতিচিকীর্ষু ব্যক্তিকে কিছুতেই কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সাধুসঙ্কল্প ব্যক্তির সাধু সঙ্কল্প কদাপি বিফল হয় না। তিনি পাঁচদোনা হইতে প্রায় ২৭।২৮ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকা নগরীতে পদব্রজে যাইয়া হাজির হইলেন। সেই স্থানে যাইয়া নিজের কর্ত্তব্য খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীন্তন ঢাকার দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁর নিকট যাইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজভাষা পারশী ছিল। গ্রামে গ্রামে এত স্কুল ছিল না। যাঁহারা পারশী জানিতেন বালকগণ তাঁহাদের নিকট হইতেই পারশী শিক্ষা করিত। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধেও এই কথাই ছিল। দর্পনারায়ণও পারশী জানিতেন। মুর্শিদকুলিখাঁ বালকের সৎসাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া রাজস্ব বিভাগে শিক্ষা নবীশের কাজে নিযুক্ত করিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাঁহাকে ক্রমে কানুনগো ও সর্ব্বশেষে দেওয়ানের কার্য্যে উন্নীত করিলেন।

২য়—তিনি অধিক বয়সে পুত্রমুখ দর্শন করেন। এই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সন্তোষনারায়ণের পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও শঙ্কর সেনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যায় তিনি যে প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রাতুষ্পুত্রদের নামে করিয়া গিয়াছেন। তালুক সংক্রান্ত কাগজপত্রে আজ পর্য্যন্তও ভ্রাতুষ্পুত্রদের নামই দেখা যায়। একদিন প্রাণপ্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীপ্রসাদ নিজ বাটীর নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রের ঘাট হইতে "ময়ূরপঙ্খী নৌকায়" ঢাকায় রওনা হইলেন। মাধবদীর নিকটবর্ত্তী কামরাঙ্গীরচর গেলে পরে নৌকার লগ্‌গি (চৈর) ভাঙ্গিয়া যায়; মাল্লাগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী একটী বাঁশ কাটে। এই জন্য উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী মাল্লাগণকে অনেক ভৎর্সনা করেন; তচ্ছ্রবণে ভবানীপ্রসাদের আর ঢাকা যাওয়া হইল না। অমনি বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। খুল্লতাত দর্পনারায়ণ দ্বার খুলিবার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন কিন্তু

কিছুই ফল হইল না। ভ্রাতুষ্পুত্র আবদার করিয়া বলিয়া উঠিলেন যদি কামরাঙ্গিরচর, সুরালাপুর প্রভৃতি স্থান আমাদের না হয় তাহা হইলে আর দ্বার খুলিব না। ভ্রাতুষ্পুত্রগতপ্রাণ খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের আবদার রক্ষা করিয়া নবাব সরকার হইতে উক্ত স্থানের মালিকের ফরমান আনিলেন। কথিত আছে যত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানের মালিক হইতে পারেন নাই ততদিন পর্য্যন্ত ভবানীপ্রসাদ এইপথে ঢাকা না যাইয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করাইয়া সেই পথে ঢাকা যাতায়াত করিতেন। এখনও পাঁচদোনার পূর্ব্বদিকে ভবানী খাল নামক একটী খাল ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই খালটী বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত প্রবাদ বচনের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ময়ূরপঙ্খী নৌকার মুখটী বর্ত্তমান থাকিয়া ভবানীপ্রসাদের নৌকার অস্তিত্বের প্রমান দিতেছে।

৩য়—উত্তর সাধার চর ও দক্ষিণ সাধার চরের ঘৃত ও দধি এককালে এই দেশে বড় বিখ্যাত ছিল। দেওয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এ স্থান হইতে আনাইয়া ঘৃত ও দধি খাইতেন। সময়ে ব্যবসায়ীরা অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিলে তাঁহাদের ভাগ্যে আর ভাল ঘৃত দধি জুটিত না। সেই জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় উক্ত দুই স্থানের মালিক হইবার জন্য খুড়া মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তিনি নবাব সরকার হইতে উক্ত স্থানের মালিকের সনন্দ আনেন। এখনও ৩৫৪নং তালুক ভবানীপ্রসাদ সেন সদর জমা ১৯৭৯৲ টাকা. এই তালুক বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে ভ্রাতুষ্পুত্রদের এই প্রকার আবদার রক্ষা করিতে করিতে তিনি নিজগ্রাম পাঁচদোনা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ঢাকা পুরান নাকাশ ৺বুড়াশিবের বাড়ী পর্য্যন্ত অনেক স্থানের মালিক হইয়াছিলেন। উত্তর দিকে কিশোরগঞ্জ পর্য্যন্ত সম্পত্তি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ও ৺বুড়াশিবের বাড়ী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে দেওয়ানের তালুক সম্পত্তি বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস একাউন্টেন্ট জেনারেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় রমণাতে যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই স্থানে যে মঠটী আছে সেইটী দেওয়ানের নির্ম্মিত। দুঃখের বিষয় উক্ত সুপারিটেণ্ডেণ্ট মহাশয় মঠের নিকট একটী পায়খানা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

দেওয়ান দর্পনারায়ণ যে বিপুল সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহার সকল গুলির বিবরণ সংগ্রহ করা অতি কঠিন ব্যাপার। অনেক সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছে কাজেই সেই সকলের নাম সংগ্রহ করা আরও কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় কুড়িখাই পরগনায় দর্পনারায়ণ নামক যে মহাল ছিল ১৮৭৮ সালে বাকী খাজানার জন্য তাহা নিলাম হইয়া গিয়াছে। তিনি বহু গ্রামে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

দর্পনারায়ণ কৃত সম্পত্তির তালিকা

তাঁহার খনিত বহু দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী এখনও নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে। আমরা যে কয়েকটি দীঘির নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। নিজ গ্রাম পাঁচদোনার প্রকাণ্ড দীঘি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, পাকুলিয়ার দীঘি, পাঁচরুখির দীঘি, ভুলতার দীঘি, দিনাজপুরের দীঘি। সকল গুলিই এখন বিদ্যমান। পাঁচরুখির দীঘি খনন করাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি সহ জনৈক ব্রাহ্মণকে ইহা উৎসর্গ করিয়া যান। রাজকার্য্য কোনও কার্য্য উপলক্ষে দিনাজপুর যাইয়া সে স্থানে এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া আসেন। আজও দেওয়ান দর্পনারায়ণের দীঘি মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার পূর্ব্বদিকে ভুলতা নামক গ্রামে অবস্থিত। এত প্রকাণ্ড দীঘি নিকটে আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর তিনটি পাড়ে ভিন্ন গ্রাম। ইহা দ্বারাই ইহার বিস্তৃতির পরিমাণ বুঝা যায়। ইহা

সৎকার্য্য—দীর্ঘিকা

খননের প্রবাদ বাক্য এই—দেওয়ান একদিন পাল্কীতে আরোহণ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে বাড়ী হইতে ঢাকা রওয়ানা হইয়াছেন। পাঁচরুখির নিকটবর্ত্তী সোনাখালের তীরে পাল্কী গেলে পর, পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন। এমন সময় নিকটে একটী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে পাইলেন; কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন একটি স্ত্রীলোক উক্ত খাল হইতে জল নিতে আসিয়া প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আর পাল্কীতে উঠিলেন না। স্ত্রীলোকটীর নিকটে যাইয়া বলিলেন, "মা তুমি পাল্কীতে উঠ। আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেছি।" স্ত্রীলোকটীও অনন্যোপায় হইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। তখন দেওয়ান পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে পাইলেন যে ঐখান হইতে স্ত্রীলোকটীর বাড়ী প্রায় ২ মাইল। তিনি ইহাতে মনে দারুণ কষ্ট পাইয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকাইলেন। গ্রামের সকলের পরামর্শ মতে তাহাদের প্রদর্শিত স্থানে এই সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তাহার ঘাটলা বাঁধাইয়া দেওয়াইলেন। পূর্ব্ব পাড়ে একটী মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ৺শিব স্থাপিত করিলেন। কথিত আছে যে, উক্ত দীঘি খনন করিবার সময় তাঁহার নিজ বাটীতে স্থাপিত যে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ আছে তাহা পাওয়া যায়।

দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মুসলমানদের পীরান ফকিরান

সাধক-শ্রেষ্ঠ ভক্তবীর রাম প্রসাদের সিদ্ধ পীঠ চিনিশপুরের ৺কালী এদেশের হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই পূজিত। দেওয়ান এই ৺কালী পূজার জন্য চিনিশপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এখনও সেই সম্পত্তি বিদ্যমান আছে। ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ভোগবেতালের ৺গোপীনাথ অতি প্রসিদ্ধ। সেই বিগ্রহের পূজার জন্য যে ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, ভোগবেতালের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেই সম্পত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান। নিজ বাটীস্থিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৺বৃন্দাবন চন্দ্র বিগ্রহের নামীয় সম্পত্তি আজও আছে। এই প্রকার দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দেওয়ানের দেব-দ্বিজে ভক্তির ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এখনও প্রদান করিতেছে। মুসলমানদের জন্যও পীরান ফকিরান অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। চিনিশপুরের ৺কালীবাড়ীর নিকট বাসাই গ্রামে পীরান সম্পত্তি এবং কিশোরগঞ্জের অধীন আস্তুতিয়া তালুকের মধ্যে সুখিয়া ও চর পলাশের মধ্যগত পাঁচ পীরের জায়গীর এখনও বর্ত্তমান আছে।

যিনি দক্ষিণে ঢাকা হইতে উত্তরে কিশোরগঞ্জ পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ স্থানের অধিকাংশ গ্রামে ন্যূনাধিক ভাবে সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন তিনি যে কত স্থানে কত ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহার প্রদত্ত ভোগোত্তর ও নানকার সম্পত্তি এতদ্দেশে এখনও অনেকে ভোগ করিতেছে।

আজ দেওয়ানকৃত বাড়ী, ঘর, মঠ প্রভৃতির বিষয় লিখিতে যাইয়া মনে যে কত ভাবের সমাবেশ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক। সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা রাজবল্লভের কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম দৃঢ়তর করিয়াছে। যতদিন কীর্ত্তিনাশা বিদ্যমান থাকিবে তত দিন লোকে কীর্ত্তিনাশার বিচিত্র নামদ্বারা রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি মনে আনয়ন করিতে পারিবে। ১৩০৪ সনের প্রবল ভূকম্প দেওয়ানের কীর্ত্তি-ধ্বংস করিয়াও সেই রকম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

নিজবাড়ী ও মঠ ইত্যাদি

দেওয়ান পাঁচদোনাতে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম তীরে পাশাপাশি ভাবে ৩ ভ্রাতার জন্য ৩টী প্রকাণ্ড বাড়ী

নির্ম্মাণ করেন। বড়বাড়ী—পঞ্চরত্ন (একটী প্রকাণ্ড এক-তালা দালান, তদুপরি ৪ কোণে ৪টী ঝিকটী ঘর * ও মধ্যস্থানে একটী মঠ); পঞ্চরত্নটী এখন ও সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। দেওয়ানখানা, ৺দুর্গামণ্ডপ, ৺ঠাকুর দালান দ্বিতল প্রকাণ্ড বাসভবন, আর ও ২।৩ খানা ছোট বাসভবন। সকল দালানই আংশিক ভাবে বিদ্যমান। একটী নবরত্নের মাত্র ভিত্তিগুলি বিদ্যমান আছে।

মধ্যমবাড়ী—অন্দর মহালে ১৪ কোঠা বিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাসভবন। এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ৺দুর্গামণ্ডপ ইষ্টক নির্ম্মিত অত্যুচ্চ দোলমঞ্চ। বহির্ব্বাটির প্রকাণ্ড ফটক—এইগুলি বাহির্ব্বাটিতে অবস্থিত। সকলগুলিই আংশিক বিদ্যমান আছে। মধ্য প্রকোষ্ঠে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকাণ্ড দ্বিতল ঝিকটী প্রাসাদ। দেওয়ানের দ্বিতল বাসভবন অন্যান্য ২।১ খানা ছোট দালান। এইগুলিও আংশিক ভাবে বিদ্যমান আছে।

ছোটবাড়ী—একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, অন্য একখানা অবিকৃত দ্বিতল প্রসাদ, ২খানা একতালা দালান। ৺বিগ্রহের প্রকাণ্ড ঝিকটী প্রাসাদ।

উল্লিখিত বাটীগুলির প্রত্যেকটী দালানেই লাদাও কাজ (সাথির বর্গা ব্যতীত)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দেওয়ান বংশীয় ১২।১৩ বাড়ী বৈদ্য এই গ্রামে অতি সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেকেরই অল্পাধিক ভূসম্পত্তি আছে। সকল বাড়ীতেই ২।১ খানা বা ততোঽধিক ইষ্টকালয় আছে। উল্লিখিত ৩ বাড়ীর দালান সকল ভগ্ন হইলে পর ২।১ খানা টিনের ঘর ও ছনের ঘর করা হইয়াছিল। কয়েকবৎসর গত হয় একবার সর্ব্বভূক অগ্নিদেব সেই সময় গৃহের সঙ্গে সঙ্গে দলিলপত্রগুলিও ভস্মাবশেষ করিয়াছেন।

তিনি যজ্ঞ করিবার জন্য নিজবাটীর পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে যে সকল যজ্ঞকুণ্ড ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার নষ্টাবশেষ এখনও বিদ্যমান। একাগ্নি, পঞ্চাগ্নি, সপ্তাগ্নি, নবাগ্নি ও তুলাযজ্ঞ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুরতিক্রম্য কাল সেগুলিকে চূর্ণ করিয়াছে। রাশীকৃত ইষ্টক ও বৃদ্ধদের মৌখিকবচন ভিন্ন সেগুলিকে বোধগম্য করিবার অন্য উপায় নাই। এই স্থানে প্রকাণ্ড ৪টী মঠ ও ১টী মঠের ভগ্নাবশেষ এখন ও বিদ্যমান। প্রত্যেকটীতেই ৺ শিব স্থাপিত। ভগ্নমঠটীর ৺ শিবটী নিকটেই একটী টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হইয়া বর্ত্তমানে পূজিত হইতেছেন। ৫টী মঠের মধ্যে ২টী দেওয়ানের দুই সহোদরের, ১টী তাঁহার বাল বিধবা কন্যা সিদ্ধেশ্বরীর, ১টী তাঁহার নিজের ও অন্যটী তাঁহার বাড়ীর তহবিলদার "শ্রী" র নাম ঘোষণা করিতেছে। কন্যা সিদ্ধেশ্বরীর মঠ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, সিদ্ধেশ্বরীর মৃত স্বামীর চিতার উপর সিদ্ধেশ্বরীর কথায় এই মঠ নির্ম্মাণ করান। কাজেই সেইটী সিদ্ধেশ্বরীর মঠ নামে পরিচিত। ভ্রাতৃবৎসল দেওয়ান দুই ভাইর নামেও -টী মঠ প্রস্তুত করান। সেই ২টী মঠ তাঁহার ভ্রাতাদের নামানুসারে—সন্তোষ সেনের ও ইন্দ্র নারায়ণের নামে পরিচিত।

"শ্রী" তহবিলদারের মঠ সম্বন্ধে দেওয়ান বংশীয় প্রাচীনদের মুখে যে গল্প শুনিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রাজা রাজ বল্লভের সময়ের লোক। আমরা যে সময় দেওয়ানের জীবিত কাল ধরিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে রাজা রাজবল্লভের সময়ের লোক বলিয়া ধরা যায়। বিক্রমপুরের কোনও সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশের একটী সর্ব্ব সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যার সহিত রাজা রাজবল্লভের পুত্রের বিবাহের আলাপ হয়। সেই কন্যার সহিত দেওয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইবারও প্রস্তাব হয়। দেওয়ান কৌশলে উক্ত কন্যা আনিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। ইহাতে রাজ-

---

* ঝিকটী ঘর—একটী প্রকাণ্ড একতালা দালান। তদুপরি দুইচালা ঘরের নক্সা বিশিষ্ট দালান।

বল্লভ অপমান বোধ করিয়া ক্রোধবশ হন এবং দেওয়ানের বাড়ী লুঠ পাঠ করিবার জন্য বহু লোকজন সহ ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া পাঁচদোনার নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দেওয়ান তখন তাঁহার কার্য্যস্থল মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীপ্রসাদ নিজ লোকজন সহ পাঁচদোনার নিকটবর্ত্তী কবিরাজপুর নামক স্থানে জলযুদ্ধে বিপক্ষের অনেক লোকজন হত ও তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। ভবানীপ্রসাদ এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ খুল্লতাতকে জানান। অধিকন্তু ইহাও জানান যে, রাজা রাজবল্লভ আমাদের অনেক জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া দেওয়ান সকল কথা তদানীন্তন নবাব আলিবর্দ্দিখাঁকে বিবৃত করেন। নবাব দেখিলেন দুই জনই তাঁহার কর্ম্মচারী। কাজেই তিনি সেই প্রকার কোন ও বিচার না করিয়া বলিলেন, "তোমার লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা দেও! আমি রাজবল্লভের নিকট হইতে সেই সকল দ্রব্য আদায় করিয়া দিব।" দেওয়ান বলিলেন, "আমি এখান হইতে সকল দ্রব্যের তালিকা দিতে অসমর্থ যেহেতু কিকি দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। বিশেষতঃ সকল জিনিস পত্র সনাক্ত করিতেও আমি অসমর্থ; আমার বাড়ীর তহবিলদার "শ্রী" সকল জিনিস পত্র সনাক্ত করিতে পারিবে। নবাব তখন দেওয়ানের প্রার্থনা মতে রাজবল্লভকে সকল জিনিস পত্র ফিরাইয়া দিবার জন্য এক আদেশ পত্র দিলেন। অধিকন্তু দেওয়ানের প্রার্থনা মতে সঙ্গে কতিপয় বরকন্দাজও দিলেন।

দেওয়ান উক্ত লোক সহ আদেশ পত্রখানা তাঁহার নিজবাটীতে ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট পাঠাইয়া নিজেও ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট লিখিয়া দিলেন যে "শ্রী"কে নবাবের লোকজন সহ রাজবল্লভের বাড়ী পাঠাইয়া জিনিসপত্র আনাইয়া লইবে। তদনুসারে "শ্রী" রাজবল্লভের বাড়ী পৌঁছিয়া নিজ ইচ্ছামত জিনিসপত্র বাছিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য নবাবের লোকজন ও আদেশ পত্র দৃষ্টে রাজবল্লভ কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। দ্রব্যসহ "শ্রী" বাড়ী আসিলে ভবানী প্রসাদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কতিপয় দিবস পরে দেওয়ান বাড়ী আসিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, এই জিনিসপত্র তাঁহার নহে তখন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন এবং বলিলেন যে, অন্যায়লব্ধ এই সকল জিনিসপত্র আমার বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। ধর্ম্ম-প্রাণ দেওয়ানের কথায় কেহই প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল, ইহা "শ্রী" নিয়া যাউক। শেষে তাহাই হইল। "শ্রী"ও নিজকৃত পাপকর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, সেই সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দেওয়ানের হস্তে প্রদান করিলেন। দেওয়ান সেই অর্থ ও নিজে আরও অর্থ দিয়া "শ্রী"র নামে এক প্রকাণ্ড মঠ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে শিব স্থাপিত করিলেন।

দেওয়ান যে সময় জীবিত ছিলেন সেই সময় ঢাকা বস্ত্র শিল্পের ও মুর্শিবাবাদ রেশম শিল্পের জন্য বড় বিখ্যাত ছিল। প্রবাদ যে দিল্লীশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাবকে ১ লক্ষ টাকা দ্বারা একখানা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করাইয়া দিতে আদেশ করেন। নবাব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দেওয়ান দর্পনারায়ণকে এই কার্য্য সম্পাদনের ভার দিলেন। দেওয়ান ৭০ হাজার টাকা দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বক্রী ৩০ হাজার টাকা নবাবকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

দেওয়ানের সাধুতা ও মহত্ব

নবাব দেওয়ানের এই সাধুতা ও লোভ শূন্যতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ ঐ ৩০ হাজার টাকা দেওয়ানকে দান করিলেন। সেই সময়ের ৩০ হাজার টাকার মূল্য বর্ত্তমান এক লক্ষ টাকারও অধিক।

ময়মনসিংহ জিলার কড়িবাড়ী পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে গারো পাহাড়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত স্থানকে মূলকে সুষঙ্গ কহে। মোগল সম্রাটদিগের সময় সুষঙ্গের জমিদারগণ অত্যন্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদিগকে ১২৫ জন অশ্বারোহীর মুন্সেফী দিয়াছিলেন এবং পাঁচ হাজার গারোতম্বি জমিদার বলিয়া উক্ত সম্রাট দরবারের তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। সেই সময় মুর্শিদকুলিখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান (নবাব) ছিলেন। বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা ছিল। তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবেদার আজিম উস্‌মানের সহিত রাজকীয় কার্য্য নিয়া মুর্শিদকুলিখাঁর বিবাদ হওয়ায় তিনি ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজের নামানুসারে সেই স্থানের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন (১৭০৩খৃঃ)। রণসিংহ সেই সময় সুষঙ্গের রাজা। এরূপ একটা জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুমার কিশোর সিংহ ও রাজসিংহকে বাকী রাজস্বের জন্য ঢাকার সহকারী দেওয়ান ধরিয়া আনেন। সঙ্গে প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য বাঞ্ছারামও আসনে। সহকারী দেওয়ানের আদেশ হইল যে কুমারদ্বয়কে বেত্রাঘাত করিয়া বাকী রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হউক। এই কঠোর আদেশ শুনিয়া কুমারদ্বয় ভয়ে মৃত প্রায় হইয়া উঠিলেন আত্মা যেন দেহ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভু-পুত্রের রক্ষার জন্য নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বপৃষ্ঠে বেত্রাঘাত লইয়া জগতে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন; কিন্তু এত করিয়াও বাকী রাজস্বের দায় হইতে মুক্তি পাইলেন না। সহকারী দেওয়ান বাঙ্গালার দেওয়ানের অধীন থাকিয়া কাজ করিতেন। তিনি বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারী অন্যের নিকট বন্দোবস্ত দিলেন। এই দেশে প্রবাদ যে সেই সময় দর্পনারায়ণকে উক্ত জমিদারীর বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। সুষঙ্গের তদানীন্তন রাণী কুমারদ্বয়কে ও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য বাঞ্ছারামকে সঙ্গে লইয়া পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান বংশীয়গণ এখনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন যে মধ্যবাড়ীর (দেওয়ানবাড়ীর) অন্দর মহলের প্রকাণ্ড দ্বিতল বাস-ভবনে রাণী অবস্থান করিয়াছিলেন। পুণ্যময়ী রাণী ইহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া আজও এই দালানটী অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এই ঘটনার সময় দেওয়ান কার্য্যস্থানে ছিলেন। কিয়দ্দিবস পর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন যে সুষঙ্গের মহারাণী তদীয় ভবনে সমুপস্থিত। ইহাতে তিনি একদিকে যেমন গৌরবান্বিত হইলেন বলিয়া ভাবিলেন অন্যদিকে ভগবানের বিচিত্র বিধান দেখিয়া নিজকে ঘৃণিতও মনে করিলেন। কেন না মহতের পতন দৃষ্টে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বলা বাহুল্য তিনি রাণীর নিকট কিছু না শুনিয়াই অবিলম্বে কুমারকে যজ্ঞোপবীত দিয়া দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

এখনও পাঁচদোনার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বাঞ্ছারামখাল নামক একটী রামখাল বিদ্যমান আছে। অনেকে অনুমান করেন যে মহারাণী রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রভুভক্ত ভৃত্যের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই দেশে এই খাল খনন করাইয়া যান। ইহার মূল কি বলা যায় না।

দর্পনারায়ণ নবাব ষ্টেটে দেওয়ানী করিয়াছিলেন যদিও তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। তথাপি তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি, বিস্তীর্ণ বাড়ীঘর, দীঘি, পুষ্করিণী, মঠ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর পীরান্, ফকিরান্, এই দেশ প্রচলিত নানা প্রকার প্রবাদ বচন ও তাঁহার নামের পূর্ব্বে যে এই দেশ প্রচলিত সর্ব্ববাদি সম্মত দেওয়ান বিশেষণটী সংযুক্ত রহিয়াছে, এই সকল দ্বারা বলা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই রাজকীয় উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নতুবা এতগুলি কীর্ত্তি এক জীবনে রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে আর একটী কথা প্রচলিত আছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও স্থানে যাইবার জন্য অন্য কাহারও নিকট বলে "আমি এখন যাই" তাহা হইলে ২য় ব্যক্তি ১ম ব্যক্তিকে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে যে রাজা রাজবল্লভ গিয়াছেন, দেওয়ান

দর্পনারায়ণ গিয়াছেন তুমি আর কি”, যদি তিনি একজন সুকৃতী পুরুষ না হইতেন; তাহা হইলে একই ব্যক্তির সম্বন্ধে দেশে পুরুষাণুক্রমে এতগুলি প্রবাদ-বচন চলিয়া আসিত না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে দেওয়ানের বংশধর কয়েকজন ভদ্র সহোদয় আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন আমা দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইত না।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

শরৎ-চিত্র

প্রভাত

সুবর্ণ কিরীট শিরে, প্রসন্ন নয়ন,
হাস্যোৎফুল্ল চারু আস্য, উজ্জ্বল বরণ,
কেবা ওই দেব-দূত কল্পলোক হতে
বহায়ে চেতনা বন্যা ঘুমন্ত জগতে
দেখা দিল আকস্মাৎ! স্নিগ্ধ সমীরণ
আগমনী বার্ত্তা বহে, বিহঙ্গমগণ
গাহে আরতির গান! প্রকৃতি সুন্দরী
গাঁথি' হর্ষে পুষ্প-মালা বন-গাত্র ভরি'
দাঁড়াল চরণ-প্রান্তে করিতে বরণ
উপাস্য বাঞ্ছিত যেন! হাসিল ভুবন
নিরখি সে স্বয়ম্বর! বিশ্ব-আমন্ত্রণ
পশে নি এ শূন্য-প্রাণে, পীযুষ বর্ষণ
হয় নাই শুষ্কচিতে! নিখিল উৎসবে
দেবী হারা বক্ষ মোর পূর্ণ আর্ত্তরবে!

মধ্যাহ্ন

অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উড়ানীর মত
নীহার-নীরবপুঞ্জে নির্ম্মল আকাশ
ছেয়ে আছে, বায়ু ফেলে রৌদ্র-তপ্ত শ্বাস,—
অতি ধীরে তরু-বল্লী কাঁপে অবিরত!
কভু ঘনীভূত মেঘ ক্ষণিকের তরে,
ক্ষণিকে সহস্র-অংশু ঈষৎ মলিন;—
দিগন্তে প্রান্তর-বুকে সুষম নবীন
আলোছায়া পরস্পর নাচে হাত ধরে!

বন্য কপোতের গীতি উদাস-গম্ভীর
ভেসে আসে সুনিঝুম অরণ্যানী হতে,
মনে হয় বিরহিনী কানন-লক্ষ্মীর
মর্ম্ম-ব্যথা অতর্কিতে উথলে মরতে!

প্রিয়ার মিলন-স্বপ্নে মোর শ্রান্ত প্রাণ
অন্তর-অন্তরে পশি করিছে সন্ধান!

সন্ধ্যা

ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা মন্দর-চরণে
সন্তপ্ত ধরণী-বুকে, শ্রান্ত দিনমণি
লুটায় অঞ্চল তলে, মেঘের তরণী
উড়ায় রঙ্গিন ধ্বজা নির্ম্মল গগনে!

মন্দার শিরীষ সুপ্ত—শ্যাম পত্রদল
কুঞ্চিত আনতমুখী, মৃদুল পবনে
ধীরে দোলাইছে শাখা, সরসী-দর্পণে
নাচিছে তরঙ্গ-ছায়া সোহাগ-চঞ্চল!

নাড়-যাত্রী বিহঙ্গের কল-কণ্ঠ সনে
"হুলু" দেয় দিক্-বধূ, মালতী সুন্দরী
সাজায় বরণ-ডালা, সারা নিশি ধরি'
অর্চ্চিবারে যেন কারে নিভৃত গোপনে!

মলিন ব্যাকুল চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে চায়
বিশ্ব সাথে ডুবে যেতে মহাস্তব্ধতায়।

নিশি

স্তব্ধ সব কোলাহল, বসুধা ঘুমায়
রূপসী জ্যোছনা-কোলে শিশুটীর মত,—
শীতল সমীর ধীরে চামর ঢুলায়
হরি' ক্লান্তি-অবসাদ স্নেহভরে কত!

শেফালীর গন্ধটুকু কভু ভেসে আসে
মুখর ঝিল্লীর মৃদু একতান সনে.
জ্বলে না একটি তারা নিথর আকাশে
ডুবে গেছে চাঁদিমার অমিয় প্লাবনে !

সরোজিনী হাসে সরে শশী সোহাগিনী
প্রাণেশে প্রাণের মাঝে পেয়েছে দরশ,
লহরে লহরে নাচে রজত-তটিনী
সিন্ধু-প্রেমে পাগলিনী পুলক-বিবশ !

বিরহী হৃদয় মোর খুঁজিতে প্রিয়ায়
কোথা যেন অতর্কিতে চলে গেছে হায় !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাধু ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা

ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য সম্মিলনীর এক মাসিক অধিবেশনে ভাষার "গ্রহণ ও বর্জ্জন" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করি, সেই প্রবন্ধে তিনটী বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করি। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পাদক মহাশয় নিয়মাবলীর একটী ধারা প্রয়োগ করিয়া আলোচিত বিষয়ের বিশদ বিস্তৃত সমালোচনা নিরস্ত করিয়া দেন এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনেও তাহার আলোচনা হয় না। তখনই আমার মনে হইয়াছিল আলোচিত বিষয় তিনটী পৃথক ভাবে উপস্থিত করিব এবং সম্মিলনীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব। আমার সেই প্রবন্ধের মূল তিনটী বিষয় এই—(১) সাধু ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (৩) বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য হইতে বিভিন্ন ভাবমূলক শব্দ ও পদ রচনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে এবং চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিশেষ আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য পরিষদেও এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব। আজ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম বিষয়েরই আলোচনা করিব। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ পাঠকের অধিগম্য হইয়াছে।

যেমন কোন লোকের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের কিছুরই ব্যবস্থা চলে না, তেমনি আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার কোথায় কি দারিদ্র্য কোথায় কি সম্ভাবনা আছে, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে সাহিত্যের পুষ্টিব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা অন্ধভক্তিকে প্রকৃত অনুরাগ বলিয়া মনে করেন এবং দেশের সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে যেমন আমাদের মনু পরাশর, ব্যাসবাল্মিকী, আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ বলিয়া ভাবে গদগদ হইয়া পড়েন, তেমনি ভাষার কথা উঠিলেই আমাদের সংস্কৃত ভাষা বলিয়াই ধূলায় লুটাইয়া পড়েন, দ্বিতীয় কথা বলিবার অবকাশ দেন না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ভাষার অভাব ও সম্ভাবনীয়তার আলোচনা করিতে গেলে বড় বিপদ উপস্থিত হয়। আমার পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী বিষয়ই প্রত্যেক প্রকৃত সাহিত্যানুরাগীর ভাবিবার বিষয়; এই সব বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই সাহিত্য ও ভাষার মঙ্গল।

ভাষার সহিত সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একের পুষ্টিতে অন্যের বিকাশ। বিভিন্ন দেশের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে যখন যে ভাষা অবাধে সহজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, এবং আপনার পুষ্টির জন্য বাহির হইতে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই, সেই ভাষা ও সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আর যেখানে ভাষাকে নিয়মের প্রাচীর দিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে সেখানেই ভাষাও দুর্ব্বল হইয়াছে সাহিত্যও স্থায়ী সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। স্যাকসনদের ভাষা

যখন বিজেতা নরম্যানের ভাষা ও ভাবের সংক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন সে পল্লীতে নির্ব্বাসিত হইয়া দীন ভাবে জীবন রক্ষা করিতেছিল এবং সাহিত্যও পঙ্গু ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আর ক্রমে যখন নরম্যান ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিয়া অত্যাবশ্যক ভাবপ্রকাশক অপর ভাষার শব্দ সকল আত্মস্থ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল তখনই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া গেল। সেই হইতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে অব্যাহত গতি ও শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাতেই জগতের ভাষা ও সাহিত্যে সে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

সমাজে যেমন সর্ব্বদা নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং প্রাচীনত্বের হেতুবাদে পুরাতনকে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া নূতনকে উপেক্ষা করিতে চাহেন, তেমনই সাহিত্যেও নূতন কিছুর অবতারণার সময় তাহা হিতকর হইলেও, প্রতিবাদের প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত করে। সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচীন-রীতি-পদ্ধতি প্রিয়তা মানুষের পক্ষে এত স্বাভাবিক,—কেন না ইহাতে এমন আত্মপ্রসাদপূর্ণ, অলস শ্লাঘার ভাব আনিয়া দেয়, এবং আয়াসপূর্ণ সাধনার দায় হইতে মুক্ত করিয়া অনায়াসে আরাম লাভ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়,—যে ইহার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করা যায় না কাজেই ইহার প্রভাবও এত বেশী। সাহিত্যের প্রাচীন রীতিও এই কারণে সাধারণের নিকট এত হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্যের ভাষা সাধারণের ভাষা হইতে পৃথক থাকিবে কি না, প্রাচীন রীতিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ ব্যাকরণানুমোদিত হইবে কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা সকল জীবন্ত সাহিত্যেরই করিতে হইয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসার দ্বারা সাহিত্যের গতি ও শক্তি নিয়মিত হইয়াছে ইংরাজী সাহিত্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। অনেকে মনে করেন সাহিত্যের ভাষা যদি নিতান্ত চলনসই রকম হইয়া যায় তবে তাহার সম্পূর্ণ অগৌরব হয় এবং সাহিত্যও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। সাধুভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা মুদ্রিত পুস্তকে দেখিলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। সাহিত্যকে যদি জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাসের ও ভাববিনিময়ের এবং চিন্তা-কল্পনার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধনের উপকরণ বলিয়া মনে করি, তবে আর তাহাকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণীর মত প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাতে বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণের ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া দিবে না। ঐ সকল নদীতে স্রোতস্বতীর মত সাহিত্যের ভাষা কখনও বিজ্ঞানের গিরিগহ্বর, কখনও দর্শনের শৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, কখনও ভাব ও চিন্তার জনপদ প্লাবিত করিয়া গ্রাম্য কুলবধূ ও গৃহস্থের নিকট প্রেম-পবিত্রতা, আশা, আনন্দ ও সান্ত্বনার নির্ম্মল জলধারা উপস্থিত করিবে; তাহাতেই সাহিত্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা। আজ আমাদের শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পড়িয়াছে। নানা ভাবে সাহিত্যের সেবা করিবার জন্য অনেকের প্রাণে অকৃত্রিম অনুরাগ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই সেবার ভাবকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে হইলে এবং ইহাকে উদ্দীপ্ত রাখিতে হইলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অভাব ও সম্ভাবনাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

সাহিত্যের ভাষা কি বর্ত্তমান প্রচলিত পুস্তকের ভাষা বা সাধুভাষা বা ব্যাকরণসঙ্গত ভাষা থাকিবে? না জনসাধারণের সহজগম্য ও সর্ব্বতোভাবে সুস্থ ও জীবন্ত করিবার জন্য ইহাকে সহজ ও স্বাভাবিক করা যাইতে পারে? এই সমস্যার আলোচ্য বিষয়ের দুইটি দিক বিবেচনা করিতে হইবে। সাধুভাষা অথবা ব্যাকরণসঙ্গত ভাষা না থাকিলে ভাষা সহজ করিবার

জন্য প্রাদেশিক ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে কি না? এবং সে কোন প্রদেশের ভাষা? তাহাতে প্রদেশ বিশেষের প্রাধান্য সূচিত হইবে কি না? সাধু ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? দুই দিক হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র শর পাড়বে আশঙ্কা করিতেছি।

প্রথমতঃ সাহিত্যের ভাষা যদি সংস্কৃত-মূলক, ব্যাকরণ-সঙ্গত, অভিধানাশ্রিত হইয়া থাকে তবে অনেক সময় তাহা সাহিত্যের বিষয় না হইয়া প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া পড়ে। সে ভাষা বিশেষ বিশেষ সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া তামাসা করা যায়, কিন্তু তাহাতে নিত্যজীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এই ভাষা যে সাপের খোলসের মত আপনি আপনি খসিয়া পড়ে তাহারও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই প্রথম যুগে যখন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও গরুর ঘাস কাটিয়া তালপাতে বা কলার পাতে লেখা পড়া শিখিতে হইত, সেই সময়কার "শিশুবোধকে" পত্র ও দলিল লিখিবার আদর্শ প্রণালী দেওয়া আছে। সেই সংস্করণ শিশুবোধক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শিশুদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রথম গ্রন্থে স্বামীর "শ্রীচরণ-সরসী-দিবানিশি-সাধন-প্রয়াসী মালতী মঞ্জরী—ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব-নাবিক প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য" মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়া-ছেন এবং তদুত্তরে "পরম-প্রণয়ার্ণব-গভীর-নীরতীর-নিব সিত কলেবরাঙ্গ-সম্মিলিত-নিতান্ত-প্রণয়াশ্রিত" ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে উত্তর লিখিয়াছেন, তখনও কোন দম্পতী এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পত্র লিখিতে সক্ষম হন নাই, এবং এখনও কোনও অধ্যাপক মহাশয়ের অকৃত্রিম সংস্কৃতানুরাগ থাকিলেও তিনি এই প্রণালীতে তাঁহার ব্রাহ্মণীকে পত্র লিখিতে পারিতেছেন না। আবার "বৎস! দেবা দুর্ম্মনায়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন সম্পাদন করিতে হয় তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ" এইরূপ ভাবে কনিষ্ঠের সহিত আলাপ বিশুদ্ধ ব্যাকরণসঙ্গত হইলেও এখন আর কেহ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে না। কোন গ্রন্থেরই কথোপকথনের ভাষা ইহার অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। এখন কোন দেবর যদি ভ্রাতৃবধূকে "দেবি, দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী ভগবান ভৃগু-নন্দন আমাদের অযোধ্যা-গমন-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন" ইহার অনুকরণে অভিভাষণ করেন, তাহা হইলে হাস্যের রোল পড়িয়া যায় এবং দেবরের কর্ণমর্দ্দনের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। "জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরিশিখর দেশ আকাশ পথে সতত সঞ্চরমাণ নবজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত"। এইরূপ রচনা বালকদিগের দুধের দাঁত ভাঙ্গিবার পক্ষে পরম উপ-যোগী হইলেও জীবন্ত ও উন্নতিশীল সাহিত্যে ইহার অনুসরণ করা চলে না, আমাদের সাহিত্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু শব্দযোজনাকৌশলের প্রভাব অতিদূর বিস্তৃত; এখনও আমরা ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানই সে বিষয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করে। এই প্রণালীর বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলেই আমরা ইহার মোহ কাটাইতে পারিব। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত ভাষার এই স্বর্ণ শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া সাহিত্যকে সুস্থ, সরল ও স্বাভাবিক করিয়া যান। তবে বঙ্কিমও ইহার কৃষ্ণ ছায়ার হস্ত হইতে একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত হন নাই। আমার এই আলোচনার রকম দেখিয়া কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন আমি ভাষার ঐশ্বর্য্যকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করি। যে বেশভূষায় সহজ গতির বাধা জন্মায় এবং অনাবশ্যক সজ্জারূপে উপদ্রব উপস্থিত করে তাহা মুল্যবান হইলেও পরিত্যাজ্য। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উঠিতে পারে এই, উচ্চ শ্রেণীর প্রাচীন রচনাপদ্ধতির

(Classical style এর) কোন প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি না অথবা সাহিত্যের কোন বিভাগে ইহার স্থান আছে বলিয়া মনে করি না। কাহারও এইরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে সংশোধন হওয়া আবশ্যক। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের আত্মোৎসর্গে, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা ও নিশীথ চিন্তায়, রজনীকান্ত গুপ্তের ইতিহাসে, টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধে এবং প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়ের গ্রীক ও হিন্দুতে এই প্রণালী বেশ মানাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা চন্দ্রনাথ বসুর রচনাপ্রণালীতে তাঁহাদের বিষয়-গাম্ভীর্য্যের কোন অগৌরব হয় নাই। আবার পূর্ব্ব কথিত প্রাচীন প্রণালীকে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ করিতে গেলে কি বিপদ ঘটে, কথামালায় "শশকগণ ও ভেকগণ" এবং কোমল কবিতার কবিতা হইতে (যাহার অধিকাংশই কোমলও নহে কবিতাও নহে) কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রাদেশিক ভাষায় পাঠ্য রচনা লইয়া এদেশে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন ইহার রাজনৈতিক দিকটা লইয়া যত নাড়াচাড়া দেওয়া হইয়াছিল, সাহিত্যের দিক্ দিয়া এ বিষয়ে কি বলিবার আছে সে বিষয়ে একেবারেই কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাষা ও সাধারণ সাহিত্যের ভাষার মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট রেখাপাত করিবার আবশ্যকতাই থাকে না, যদি সাধারণ সাহিত্যের ভাষাকে অসাধরণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি। সাহিত্য সাধারণের হইবে, জন কয়েক বিদ্যারত্ন বা বিদ্যালঙ্কারের সম্পত্তি হইবে না অথবা সম্পূর্ণ রূপে অভিধানাশ্রিত হইবে না, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং বিষয়-বিশেষের রচনাপ্রণালীতে বিশুদ্ধ শব্দসংগ্রহ ও শব্দবিন্যাস কৌশলের সার্থকতা থাকিলেও সাহিত্যের জীবন-রক্ষা, বিস্তৃতি ও যথাযোগ্য উন্নতির জন্য সাহিত্যের ভাষা এমন সহজ সরল ও কমনীয় হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সকল প্রকার ভাববৈচিত্র্য ও কলানৈপুণ্য এবং তত্ত্বসংগ্রহ বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইতে পারে। হয়ত কেহ বা বলিতে পারেন প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী কি না? তাহার উত্তরে আমি বলিতে বাধ্য হইব এবং যাহা বলিবার জন্য এতদুর অগ্রসর হইয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখান হইতে তাহাকে আর একটু অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। ইহাকে আরও গমনশীল ও তরল করিতে হইবে যেন অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি এই পরিবর্তনের যুগ উপস্থিত হইয়াছে যখন প্রাচীন আদর্শ প্রণালীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে রচনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া ভাষার সহজ গতি ও প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কোথায়ও কষ্টকল্পিত বা অকারণ শব্দঘন-ঘটা-সমাচ্ছন্ন নহে, তাহার গতি অতি সরল ও স্বাভাবিক। শিল্পনৈপুণ্য ও শব্দ সম্পদের অভাব নাই অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য। তাঁহার লিপি-কুশলতা ও স্বচ্ছতা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শব্দ বিশুদ্ধির সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই। কিন্তু এই যুগের সাহিত্যের গতি হইতে জীবন্ত বর্দ্ধনশীল সাহিত্যের গতি নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। বিষয় বিশেষে এই প্রণালী প্রযুজ্য নহে, এবং বিষয় বিশেষের গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতির প্রয়োজন বলিয়া এই সময়েই একটা কথা

উঠে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের গ্রন্থগুলি আপত্তিকারীদিগের মত কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করে। বঙ্কিমের পরবর্ত্তী যুগে এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিন্ন ভাষার দার্শনিক প্রবন্ধ সকলের বঙ্গানুবাদে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গভীর তত্ত্বালোচনামূলক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধাদিতে এবং রবীন্দ্রনাথের লোক-চরিত্র, দেশচর্য্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরস ও কৌতুকময় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সাহিত্যের সকল বিভাগে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। এখন এই সাধারণের বোধগম্য ভাষা কি ?

বাঙ্গালার উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমে সকল অংশেই যে এক সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মেদিনীপুরের মুদী ও ত্রিপুরার কৃষক অনায়াসে উপভোগ করিতেছে। শিক্ষা বিস্তৃত, ও সাহিত্যকে সতেজ ও সফল করিতে হইলে সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালার সকল অংশের নরনারীর অধিগম্য হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্য যে এত অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ ইহার ভাষা সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতা ও বাহ্যাড়ম্বরের আবর্জ্জনা পরিহার করিতে পারিয়াছে। এমন কি বিজ্ঞান গ্রন্থের ভাষা ও গল্প, কৌতুক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে কোন ভেদ নাই। সাধারণের বোধগম্য যে বাঙ্গালা ভাষা, অর্থাৎ ভদ্র সাধারণ যাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল অঞ্চলের লোকেই সহজে বুঝিতে পারেন, তাহাকে আদর্শ সহজ বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে। এই ভাষায় বাঙ্গালার এক অংশের লোকের সহিত অন্য অংশের লোকে সহজে স্বাভাবিক ভাবে কথোপকথন করিতেছে এবং ইহা সাধারণ লোকে এমন কি যাহারা ব্যবহার করিতেছে না তাহারাও সহজে বুঝিতেছে। পণ্ডিত গ্রিয়ারসন নদীয়া, কলিকাতা, চব্বিশপরগণা, হুগলী, হাবড়া, মুর্শিদাবাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষাকে আদর্শ বাঙ্গলা (বা Standard Bengali) বলিয়া তাহার Linguistic Survey of India Vol V. Pt. I এর ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ৮৪৪৬,৯৯৬ জন এই ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন বোধ হয় আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার সকল জেলার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যে ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং যাহা সকল জেলার সাধারণ লোকেও বুঝিয়া থাকে, সেই ভাষাকে সাধারণ বাঙ্গলা ভাষা বলা যাইতে পারে। এই ভাষাই যে বিশুদ্ধ ভাষা এবং জনসাধারণের সহজগম্য ভাষা সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই চলিত ভাষার আদিস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমি হয়ত অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছি। এই চলিত ভাষার মধ্যেও যে কিছু কিছু স্থানীয় বিকৃতি আছে এবং তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য,তাহা স্বীকার করিতে আমি ইতস্ততঃ করিতেছি না। তবে সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষাকৃত বিকৃতিশূন্য এবং সহজ ও সাধারণগম্য। এই ভাষাই যে বাঙ্গালার জন সাধারণের ভাষা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যখন যে অঞ্চলে যে গান কবিতা বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছে তাহা স্বাভাবিক ভাবে এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই অঞ্চলেরই দেওয়ান রঘুনাথ বা পাঁচালাকার দাশুরায় প্রভৃতি যে গান রচনা করিয়াছেন যাহা এখনওপর্য্যন্ত রামপ্রসাদের গানের ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ভাবে এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছে।

যে সব মাসিক বা সাময়িক পত্রিকা কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ নিতান্ত স্থানীয় বিকৃতিগুলিকে সাহিত্যের ভাষায় স্থায়ী স্থান দিবার হাস্যজনক বৃথা চেষ্টা করিতেছেন তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই বৃথা চেষ্টা চলিত ভাষা প্রসারে বাধা দিতেছে, এবং সাহিত্যের উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছে। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করি—কেন সাহিত্যের ভাষার দিক দিয়া এগুলি যেমন আবর্জ্জনা স্বরূপ তেমনি দেশের দিক দিয়া এগুলি তেমন অমঙ্গলজনক। তোমার অশোভন ও অকারণ বিশিষ্টতা যদি ক্রমাগত আমাকে পীড়ন করিতে থাকে তাহা হইলে তোমার গ্রহণ যোগ্য অংশও আমার স্বাভাবিক ভাবে অপ্রিয় হইয়া উঠে। আমি যে চলিত ভাষাকে আদর্শ সাধারণের ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিলাম তাহার কোন বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ না করিয়া ভদ্র সাধারণের পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা বলিলে বোধ হয় সংজ্ঞানির্দ্দেশ বিশেষ অশুদ্ধ হইবে না এবং বিরোধের কারণ কমিয়া যাইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন—এবং সাহিত্য সেবক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষিত কেহ কেহ আমার কাছে বলিয়াছেন—যে "এই অঞ্চলের কোন কোন কথা সম্পূর্ণ সংস্কৃত মূলক সেগুলি না জানিয়া তোমরা প্রাদেশিক বলিয়া পরিত্যাগ কর। সেগুলিকে সাহিত্যের ভাষায় বেশ স্থান দিতে পার।" তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া থাকেন —

অমু—অদস্ শব্দের রূপান্তর
করিয়াম—করিষ্যামঃ বা করিষ্যামির রূপান্তর
যায়াম্—যাম্ বা যায়ামঃ এর রূপান্তর
ইতান্—এতান্ শব্দের রূপান্তর
তে—এক বচনের পরিবর্ত্তে বহুবচন
কইতাম—তুম এর পরিবর্ত্তে তাম কৃৎ প্রত্যয় মাত্র
মাধানে—মধ্যাহ্নের রূপান্তর বিকল্পে অপরাহ্নের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি।

এই সকল শুনিলে প্রথমতঃ আমার বাল্য কালের পণ্ডিত মহাশয়ের কথা মনে হয়। একদিন সকলের পরামর্শে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম Stupid এর সংস্কৃত কি? পণ্ডিত মহাশয় অম্লানবদনে বলিলেন Stupid শব্দটী সংস্কৃত কথা, ইষ্টপিট, ইষ্টং পিনষ্টি যঃ স ইষ্টপিট্—নিপাতনে সিদ্ধ। আমরা ত অবাক। দ্বিতীয়তঃ মনে হয় সংস্কৃতমূলক বলিয়াই কোন শব্দকে মাথায় তুলিয়া লওয়া যায় না। প্রাদেশিক শব্দ বিকৃতি ও সেই সঙ্গে উচ্চারণ বৈষম্য ভাষাকে কি অদ্ভুত আকার দিতে পারে তাহা পণ্ডিত গ্রিয়ারসনের পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে বেশ কৌতুকজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি —

লিখিত ভাষা বা পুস্তকের ভাষা	ইহার অল্পদিন পরে কনিষ্ঠ পুত্রটি সমস্ত একত্র করিয়া দূরদেশে যাত্রা করিল এবং সেখানে অপরিমিত আচারে তাহার সমস্ত বিষয় অপচয় করিয়া ফেলিল।
হাবড়া, কলিকাতা	ইহার কিছুদিন পরে ছোট ছেলেটি সব জিনিস পত্র নিয়ে দূরদেশে গেল এবং সেখানে বদখেয়ালী করে সমস্ত বিষয় উড়িয়ে দিল।
কাটোয়া	তার পর বেশী দিন না যেতেই ছোট ছেলেটা আপনার যা কিছু ছিল সব একত্তর করে দূরদেশে চলে গেল আর সেখানে গিয়ে ওড়ম্বাগিরি করে সব সম্পত্তি ঘুচিয়ে ফেললো।
বগুড়া	ছোট ঝন ব্যাটা লেওয়ার কদিন পর ভিন্ন দেশে গেল। সেঠী যায়্যা লাঠাবো কর্য়্যা টাকা কড়ি উড়্যা দিল।
জলপাইগুড়ি	থোড়া কয়দিন বাদ শিশুয়া বেটা তামান সম্পত্তি একেঠে কোরে দূর দেশহ পালায়ে গেল। ঐঠে যায়্যা হানে যেই সেই খরচ কোরে অর সম্পত্তি ফুরায় দিল্।

কিছুদিন্ পর ঐ ছোট ছাওয়ালডি তার সগল টাকা করি য়্যাকাত্রে কইর‍্যা য়্যাক্ দূর
ঢাকা — হ্যাশে চইলা গ্যালো। সেখানে গিয়া তার যা কিছু আছিলো তাবদ খ্যালি কৈর‍্যা উড়াইয়া দিলো।

অল্প কদিন বাদে হোড় পোয়া হক্কলাইন অত্তর করি এরে দূরে এক দেয়ত্ গেল।
চট্টগ্রাম — হেন্তে মস্তামি করি তার ধন হক্কলাইন উড়াইল।

কিছুদিন বাদ ছোট ছাওয়া তাবৎ এক ঠাঁই করে দূর দেশৎ চলে গেল। আর সেই ঠাঁই
দিনাজপুর — সে যাতা বেভারে আপনার সমপৎ উড়ায়ে দিলে।

বহুৎ দিন না বিৎতে ছোটো ছেল্যা সব য়্যাকঠে কর‍্যা বিদেশ্ চল্যা গ্যালো। আর সে
মালদহ — বদ্চালে আপনার মালমাত্তা সব খোয়াইয়া দিলে।

অল্পদিন পরে ছোড়ো ছাওয়াল্ সকল জিনিস পত্তোর জড়ো কর‍্যা দূর হ্যাশে যাত্তার
পাবনা — করলো এবং সেখানে বদকাম কর‍্যা নিজের বিষেয় আষেয় উড়ায়ে দিলো।

থুল্লা দিন বাদ ছোট ব্যাটা মালমাত্তা জমা করি দূর হ্যাশে চলি গেল্ হিয়ানে সে বেহুদিগি করি নিজ দৌলত্ উড়াইল্।
নোয়াখালি (সন্দ্বীপ)

দিন হতো বাদে ছোটুগগা পোলা বেবাক একত্তর হরিয়া দূর হ্যাশে মেলা হরিল।
বরিশাল — হেখানে হে লুচ্চামি হরিয়া তার বিত্তবেশাদ বেবাক উড়াইয়া দিল্।

থুরা দিন বাদে ছোট্কা তার হগ্গল মাল ব্যাসাৎ খুয়াইয়া দূর মুল্লুকে গেল্। হেইখানে
ময়মনসিংহ — ফৈলামি কৈর‍্যা হলগ্গল খোয়াইল্।

কয় দিন বাদে হরু পোলা হগলতান অকত্তর কৈরা বহু দূর হ্যাশে গেলু। আর হেইখানে বাউল্লামি কইরা হগলতান খোয়াইল্।
ত্রিপুরা

কিছুদিন পরে ছোট ছেলেটি সব জিনিস পত্র নিয়ে দূর দেশে গেল এবং সেখানে
নদীয়া চব্বিশ পরগণা — বদকাজ করে সমস্ত বিষয় উড়িয়ে দিল।

আর অধিক উদ্ধার করিবার আবশ্যক নাই এই উদ্ধৃত অংশ সকলের তুলনা করিয়া প্রদেশিক ভাষার কোনটি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে কোন নমুনাটী আমার পূর্ব্বকথিত ভদ্রসাধারণের কথোপকথনের ভাষার অনুরূপ তাহা সকলেই নির্ণয় করিতে পারিবেন। সাধুভাষা বা অভিধানাশ্রিত ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণ করিয়া সাহিত্যকে সরল করিতে হয় তাহা হইলে বৌদ্ধ যুগের তাম্রশাসনের ন্যায় সাহিত্য বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িবে; প্রদেশ বিশেষে বোধযোগ্য হইলেও সাহিত্যের হিসাবে তাহা নিতান্ত হাস্যজনক ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িবে। গান কবিতায় যদি এই জাতীয় প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা কি হইয়া পড়ে তাহার নমুনা কিছু দিতেছি —

বরিশাল পটুয়াখালি মুসলমানদের গান

লালমতি কয় তোমেরদ্দি থানিক রহ বসি
থানিক বিলং কর সারি পইরা আসি
তোমেরদ্দি এ মুল্লুহে মোরে রেহো না।

বরিশাল পিরোজপুর হিন্দুগান

এসহে গহুর চাঁদ যোর্গো আসরে
ডাকি পেরভু তোমারে।

মোরা বয় * পাইয়া তোমারে ডাকি
এস মোর্গ আসরে।
(গহুর চাঁদ হে)

বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশিত

বালোর কপালে পরুক ছাই
অমন বালোতে কাম নাই।
হালের জোবা গেলো বইয়া
জান বাছামু কিবা খাইয়া।
চাষা মানুষ মোরা বাই—
মহোর্দ্দমার বুজি কি ছাই।
গরীব মানুষ অনুপায়
খাইয়া জান বাছান দায়।
হেইয়ার উপর আরেক দায়
হুদাহুদি পয়সা ব্যায়।
আমারগো কি ওয়া হাজে
ভদ্দোরের কাম ভদ্দোরে বোজে।

নোয়াখালী—রামগঞ্জ

মাডের হত্তুর ঘাস্ ঘাসের হত্তুর চাস্।
ফোলা ফানের ফিলাই হত্তুর বুড়ার হত্তুর কাস্॥
হাঁকের হত্তুর বেজি কুইরের হত্তুর হেনা।
হউরি ফুতের বৌর হত্তুর বৌয়ে ফিন্দেলে তেনা॥
হইরের হত্তুর বাইরা কাল মাছের হত্তুর জাব।
আক্কেের হত্তুর উচিত কথা দুই চউক লাল্॥

নোয়াখালি সন্দীপ

নাইয়া তুষ্ট না বাহনে যদি হয় রুজি
উজান গাঙ্গে পাল খাটিলে তুষ্ট দাড়ি মাঝি।
ধুকা দিয়ে টাকা রুজি করে টল্লিগণ
পয়সা লইয়া গোপনেতে তুষ্ট আমলাগণ।
হাকিম তুষ্ট হুকুমেতে যদি না হয় রদ
ফিসের টাকায় উকীল তুষ্ট মিছা কথার হদ॥

* —ভয়। সাধারণ 'ব' এর উচ্চারণ দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের 'ভ' উচ্চারণের নির্দ্দেশ ঠিক হইবে না। প্র, স।

আশা করি এখানে শেষ করিলে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে আর একবার সরল সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া রাখি ভারতীতে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্য স্মৃতি প্রভৃতি প্রবন্ধে যে সকল পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক বিকৃতি অবাধে অকুতোভয়ে প্রচলন করা হইতেছে সেগুলিও এই শ্রেণী হইতে পৃথক নহে। সাহিত্যের হিসাবে সকল প্রাদেশিকত্বই সমান ভাবে পরিত্যাজ্য।

কবি নবীন চন্দ্র যদি এইরূপ প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে তাহা অবকাশ-রঞ্জিনী বা কুরুক্ষেত্রে না হইয়াও অবকাশ-রঞ্জনের উপযোগী হইত এবং তাহা আয়ত্ত করিতে কুরুক্ষেত্রের মত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত এবং তাহা দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারী সহজে উপভোগ করিলেও বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট নিতান্ত দুর্গম ও প্রহেলিকাময় হইয়া থাকিত। সাধু ভাষা নয় অথচ সরল শুদ্ধ ভাষা যাহা ভদ্র সাধারণে ব্যবহার করে, এবং প্রাদেশিক বিকৃতিপূর্ণ নহে অথচ সাধারণের বোধগম্য, এই ভাষা যে অঞ্চলের হউক তাহাই আমাদের সরল সাহিত্যের প্রাণ।

সকল বিভাগেই আমাদের দেশে বেশ একটু সংকীর্ণ-গণ্ডী-অনুরাগ রহিয়াছে তাহাতে আমরা সকলেই বেশ আনন্দ অনুভব করি। গণ্ডীর অনুরাগ আবশ্যক মত কখন জেলার উত্তর কখনও দক্ষিণ. আবার কখন জেলা কখনও বিভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। আবশ্যক মত সংকোচন ও প্রসারণে বেশ সুবিধাও আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যখন ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের কোন বিষয়ের আলোচনা করিব, তখন যেন সর্ব্বদা মনে রাখি, বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উত্তর বা পূর্ব্বের জন্য নহে, দক্ষিণ বা, পশ্চিমের জন্য নহে। এখন আমরা কোন প্রশ্নকেই স্বতন্ত্র স্থানীয় বিশ্লিষ্ট ভাবে দেখিব না। এই সাহিত্যের মিলন-মন্দিরে আমরা জাতীয় জীবনের প্রাণপুরুষকে লাভ

করিব, এখানে আসিয়া আশা, বল ও আনন্দ লাভ করিব। সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া মন্দির-দ্বার দেশের নরনারীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিব। দেবতার মণ্ডপে আপনার সন্তানও অশুচি হইয়া আসিলে যেমন তাহাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলি, তেমনই আমাদের আপন প্রাদেশিক বিকৃতিও দূরে ফেলিয়া দিব। নিজের গ্রামের বা নিজের জেলার প্রদেশিক বিকৃত শব্দে সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দের মূলোদ্ধার করিয়া তাহাকে রক্ষা বা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া যাহা সরল, সহজ ও সুন্দর তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিব। এই সরল, সুন্দর বাঙ্গলা ভাষা আমাদের সকলের আপনার বাঙ্গলা ভাষা ইহাতে তোমার আমার ষোল আনা সমান অধিকার।

আমাদের সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের উপযোগী করিতে হইলে এবং শোভন ও সার্থক করিতে হইলে, সমাস ও অনুপ্রাসের সুবর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, এবং সংস্কৃতমূলক শব্দনৈপুণ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সাহিত্যের ভাষা ও সাধারণ ভদ্র লোকের কথোপকথনের ভাষার মধ্যে এখনও যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে, অথচ সরলতার ব্যপদেশে কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক বিকৃতি প্রবেশ করিয়া ইহাকে কলুষিত না করে সে বিষয় প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগনিবারণের পরে রোগীকে যেমন যথেচ্ছ ভোজনের হস্ত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, তেমনই বিশুদ্ধ শব্দাড়ম্বর বিকার দূর করিয়া তাহাকে গ্রাম্যতার হস্ত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। সুসঙ্গতি, সুরুচি এবং শিষ্টতার সহিত উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য-কৌতুক সহজ ভাবে মিলিত হইয়া সাহিত্যকে মধুর ও সুন্দর করিবে। তরল স্বচ্ছতা কোন বিষয়ের গম্ভীরতার গৌরব হ্রাস করিবে না কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তা বৃদ্ধি করিবে মাত্র। গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত সৌন্দর্য্য, সরলতা, স্বচ্ছতা ফুটিয়া উঠিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ চট্টগ্রাম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন "ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে তাহা সাধারণের বোধ-গম্য করা আবশ্যক, আর তাহাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস-সংযোগ করা আবশ্যক।" সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধারণ শিক্ষা সরল, সহজ ও সুবিস্তৃত হইবে। বস্তু-বিজ্ঞানের সুপরীক্ষিত সত্যগুলিকে সাধারণের আয়ত্ত ও সুগম করিতে হইলে, দেশবিদেশের নানা তত্ত্ব, নানা তথ্য জনসাধারণের দ্বারে উপস্থিত করিতে হইলে ভাষাকে এই ভাবেই গড়াইয়া তুলিতে হইবে। শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সহিত যাহাতে সরলতা ও স্বচ্ছতার সমাবেশ হয় তাহাই করিতে হইবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বাঙ্গালার সাহিত্য শ্রীহট্ট হইতে মানভূম, চট্টগ্রাম হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত সকল দেশের নরনারীর হৃদয় অধিকার করিবে। যেখানে যাহা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, সাহিত্য তাহা গ্রহণ করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ভাবে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবে। ইহাতেই সাহিত্যের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা। আমরা এই পরিবর্ত্তনের যুগে বৃথা বাহ্য চাকচিক্যেও মুগ্ধ হইব না, গণ্ডী অনুরাগেও অন্ধ হইব না। আমরা সাহিত্যের গতি ও জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিব। যেখানে যাহা পাইব তাহা থরে-বিথরে ভাষার ভাণ্ডারে সাজাইয়া রাখিব।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সাহিত্যের কোন বিভাগেই কি ভাষার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজনীয়তা নাই! তাহার উত্তরে বলি, ভাষা ভাবোজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী হইবে অথচ শব্দ-ভারে পীড়িত হইবে না, সরস, কৌতুকময় হইবে অথচ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইবে না, ওজস্বিতা ও ভাববিচিত্রতা থাকিবে অথচ শব্দবিন্যাসকৌশলে বিব্রত হইবে না। সাহিত্যের ভাষা চিরদিনই সরল ও স্বচ্ছ হইবে, অথচ সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক বিকৃতিশূন্য হইবে, তরল ও নমন-শীল হইবে অথচ বিষয় বিশেষে গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা শূন্য হইবে না। এই দিকেই বর্ত্তমান যুগে সকল সাহিত্যের গতি। আমরা সকলে এই গতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া

দিব, এবং সাহিত্যের প্রসার ও জীবনকে স্থায়ী ভূমিতে দণ্ডায়মান করিব। সাহিত্যের ভাষা সাধারণের সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী হইবে অথচ ইহাতে যেন কোন গ্রাম্য সুর বাজিয়া না উঠে।

সুশীল চক্রবর্ত্তী।

শারদীয়া

বন্ধ ছিনু বরষ ধরে
সোনার কাঠির পরশ করে
লক্ষ্মীছাড়া! আজকে তোরা
আমায় কেন ক্ষেপালি?

ওই কাশের হাসি নদীর কূলে
রৌদ্রছায়া বীথির মূলে!
ভোর না হতে বনের পথে
গাহে ও কে ভূপালী!

জলে স্থলে কিসের ঘ্রাণ
শিশির-তাজা শীষের প্রাণ!
দীঘির জলে আগুণ জ্বলে
মুক্তা ঝরে তরু-তলে—
শঙ্খধবল শেফালী!
আপন ঘরে ঘুমিয়েছিনু
স্বপ্নে কেন ক্ষেপালি?

কলমী দলের ফাঁকে ফাঁকে
"জলপিপি" আর ডাহুক ডাকে!
কেগো, বিশ্বাবাদী করলে যাদু
ঢেলে দিলে সুধা স্বাদু
কালো জলে আলো জ্বেলে
করে দিলে রূপালি?

মৃগনাভির কৌটা খুলে
কে ছড়ালে ফুলে ফুলে
পল্লীতে কি এলো ভুলে
নৈনিতালের নেপালী!
জোনাকীরা নীপের শাখে
প্রদীপ জ্বালে লাখে লাখে
আকাশ ভরা তারার ঝাঁকে
আজকে সোনার দীপালী!
ঘরের বাহির করে তোরা
আমায় কেন ক্ষেপালি?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

সন্তান পালন

শৈশবের বিশেষত্বই মানুষকে মানুষ করিয়াছে।* কথাটা শুনিতে সামান্য বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যে সত্যটি নিহিত আছে, সেটি বড় সামান্য নহে। জীব-জগতে মানুষের পরিণতি ও গঠনকাল যত দীর্ঘ, এমন আর কোন জীবের নহে। এ সময়টার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষের মন ও দেহ উভয়ই একান্ত কোমল ও নমনীয় থাকে। সুতরাং তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া তুলিতে পারা যায়। মোটের উপর মানুষের পরমায়ু যদি ৭০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার $\frac{1}{3}$ অংশ অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রথম ২৪।২৫ বৎসরকে তাহার পরিণতির কাল বলিতে পারা যায়। এসময় মানুষ জীবনের পথে যাত্রা করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত ও সজ্জিত করে মাত্র। জীবরাজ্যে যে জীবটি যত নিম্নপদবীতে অবস্থিত তাহার এই পরিণতিকাল বা শৈশবাবস্থা ততই অল্পকাল স্থায়ী হয়।

* "It is babyhood that has made man what he is"

কড মৎস্য (Cod fish) জীবনের আরম্ভকাল হইতেই স্বাধীন, তাহার পক্ষে কোনরূপ শিক্ষারই আবশ্যক করে না। সে জন্মিয়াই আপনার খাদ্য আহরণ করিতে পারে—কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহাও বেশ বুঝে; ফলতঃ তাহার জীবনে শৈশব বলিয়া কিছুই থাকিতে দেখা যায় না।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা উৰ্দ্ধ পদবীতে অবস্থিত কোন জীবের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে এই দেখা যায় মাতৃ গর্ভেই তাহার পরিণতির শেষ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, সে একবারে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না। তাহার শৈশব বলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। এ সময়টাকে তাহার পরিণতি ও শিক্ষার কাল বলা যাইতে পারে। কুক্কুর-শাবক জন্মিবার পর একান্ত অসহায় থাকে। তাহার মাতার চেষ্টা ও যত্ন ভিন্ন তাহার কিছুতেই চলিতে পারে না। এইরূপে মাতৃ-যত্নে লালিত পালিত হইয়া শেষে সে একদিন স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। এ কথা সত্য বটে কুক্কুর-শাবকের এই অসহায় শৈশব কালটা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। সে কিছুদিন মধ্যেই আপনাকে চালাইবার মত শক্তি সামর্থ্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া লয়। তাহার শৈশব যতই অল্পদিন স্থায়ী হোক না কেন কুকুরকে কিছু শিখাইতে হইলে, তাহা শৈশবেই করিতে হয়। যাহারা কুকুরকে দিয়া বিবিধ ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, তাহারা এ কথাটা বুঝে।

কুকুর অপেক্ষা আরও উচ্চশ্রেণীর জীবে গেলে তাহার শৈশবকাল আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে দেখা যায়। শিশু বনমানুষ জন্মকালে একান্ত অসহায় থাকে এবং এই অসহায় অবস্থাতেই তাহাকে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। ইহার পর আরও উর্দ্ধে আসিয়া আমরা যখন মানুষের নিকট পৌঁছাই তখন এই দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবার উপযোগী শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, তাহাকে ২৫ বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। ২৫ বৎসরের কমে তাহার দেহ ও মন সম্পূর্ণ পরিণত হইতে পারে না।

মানুষের পরিণতি অতিশয় মন্থরগামিনী। দেহের অপেক্ষা মনের পরিণতি আরও মন্থরগামিনী। আশ্চর্য্য এই যে দেহের ও মনের পরিণতিতে ঠিক যেন সামঞ্জস্য নাই মন যেন দেহের সহিত ছুটিতে সমর্থ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত এক বৎসরের শিশুর মাথটা তাহার পিতার মাথা অপেক্ষা খুব বেশী ছোট নহে। পিতার মাথা যদি ৩ হয়, এক বৎসরের শিশুর মাথা তাহা হইলে ২ হইতে দেখা যায়। বাহ্যতঃ এরূপ হইলেও, কার্য্যতঃ উহাদের মধ্যে প্রভেদ কত? দেখিতে এক ভাগ কম হইলেও কাজের বেলায় লক্ষ্য গুণ কম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২০।২২ বৎসর ধরিয়া রীতিমত শিক্ষা ও কর্ষণ করিলে, তবে তাহার মাথা একদিন তাহার পিতার মাথার তুল্য শক্তিশালী হইতে পারিবে। ১০ বৎসর বয়সকালে, শিশুর ও তাহার পিতার মাথার আকারগত কোনই পার্থক্য থাকিতে দেখা যায় না। পিতার টুপিটা এ সময় পুত্রের মাথায় ঠিক বসিতে দেখা যায়। পুত্রটি বাপের টুপিটা মাথায় দিবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার কাজকর্ম্ম চালাইবার মত শক্তি ও যোগ্যতাও যে প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কথা নিতান্ত পাগল ভিন্ন আর কেহই মনে করিতে পারে না। অনেক বৎসরের সাধনা ও শিক্ষা ভিন্ন এ হইবার জো নাই। এ শক্তি আপনা হইতে জন্মায় না। এ জন্মলব্ধ জিনিস নয়। ইহা শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের প্রতি বাপ মার যে সকল কর্ত্তব্য আছে, সেগুলি বড় সামান্য নহে। বাপ মাও যে তাহা না জানেন এমন নয়। তথাপি সন্তান-পালন ও তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা পদে পদে ভুল করিয়া বসি। ভদ্র বংশে জন্মাইলেই যে ভদ্র হয়, আর

বাপ শিক্ষিত ও পণ্ডিত বলিয়া পুত্রও যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইবে এমন মনে করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। চরিত্র-গঠন বিষয়ে কেবলমাত্র বংশানুক্রমের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিশ্রাম চেষ্টা ও যত্নেরও আবশ্যক।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই এমন ধারণা যে কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে, যেগুলি বিনা চেষ্টায়, আপনা হইতেই, বংশাধিকার সূত্রে সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ভদ্র ঘরের ছেলে, অতএব সে কেনই না ভদ্র হইবে? বলা বাহুল্য এ বিশ্বাস একান্ত ভ্রান্ত। আজন্ম ভদ্র নিতান্তই বিরল। যে সকল ব্যক্তি ভদ্র বলিয়া পরিচিত, তাহারা শৈশব ও বাল্য হইতেই ভদ্রতা শিক্ষা করিয়াছে। শিষ্টাচার, সৌজন্য, মার্জ্জিতাচরণ, সদ্বিবেচনা, এবং সমাজের গতি-বিধির বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভদ্রতার অত্যাবশ্যক অঙ্গ তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু এগুলি ভদ্রতার বাহিরের অঙ্গ। এসব ছাড়া ভদ্রতার আর কতকগুলি ভিতরের অঙ্গও আছে। প্রকৃত ভদ্র ব্যক্তি নিঃস্বার্থপর হইবেন তিনি যেমন আপনার জন্য ভাবিবেন, তেমন পরের জন্যও ভাবিবেন; তিনি দয়াপরবশ ও উদারচিত্ত হইবেন; তাঁহার যথেষ্ট আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিবে। এ সবগুণ যাহার নাই, তাহাকে প্রকৃত ভদ্র বলা যাইতে পারে না। আশ্চর্য্য এই যে, এ সবগুণ যদি খুব ছেলেবেলা হইতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা না করা যায় পরে আর তাহা হইতে দেখা যায় না। আত্মসম্মান-বোধ ও উদারতা মানুষ যেমন দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে, এমন বোধ করি আর কোন গুণ নয়। বালক যদি সদা-সর্ব্বদা ঐ সকল গুণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে নীচস্বভাব, প্রতারক ও বক্রবুদ্ধি হওয়া একবারেই অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সুশিক্ষার গুণে বালকের চরিত্রে নিঃস্বার্থপরতা গুণটির যেমন বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্ভব কুশিক্ষায় ইহা আবার তেমনই নষ্ট হওয়াও সম্ভব। আমরা কতবালকের কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্তদ্বারা স্বাভাবিক উদারতা নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। যে গৃহে বাপ-মা ছেলেদের সকল ইচ্ছা, সকল কামনা অবাধে পূর্ণ হইতে দেন এবং গৃহের অপর পাঁচ জনকে, তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করেন, সে গৃহে ছেলেদের নীচ ও স্বার্থপর না হইয়া আর গত্যন্তর নাই। পৃথিবীতে মানুষ আপনা হইতে যতখানি স্বার্থপর হইয়া পড়ে, শিক্ষার দোষে তদপেক্ষা ঢের বেশী হয় একথার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিতে দেখা যায় না। মানবজীবনে শৈশব ও বাল্যের প্রকৃত সার্থকতা আমাদের মধ্যে কয়জন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এ সময়ে মানুষের চরিত্রের উপর শিক্ষার প্রভাব যে কায়েম করে তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরক্তি যেন প্রকৃতিগত জিনিস। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। মাতৃক্রোড় হইতেই মানুষ ধর্ম্ম শিক্ষা করে। জীবনের প্রথম ১২ বৎসর মানুষ যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বড় হইলে, তাহাকে সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এ সময় শিশুর হৃদয়-ক্ষেত্রে যে কোন একটা মতের বীজ বপন করা যায়, কালক্রমে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহ হইয়া দাঁড়ায়। ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বালককে যে মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সেই মন্ত্রেরই জপ করিতে থাকে। বংশানুক্রমিক অধিকার বলিলে, ঠিক কি বুঝায়, অনেকে তাহা জানেন বলিয়া বোধ হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যতটা পাব মনে করে, অনেক সময় তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। পিতা-মাতার গুণটি সন্তান ঠিক পায় না, তবে সেই গুণটি লাভ করিবার উপযোগী শক্তি ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হয় মাত্র। শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা এই উপযোগিতা ও শক্তিটি কার্য্যে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। কৃষ্ণনগরের কুমারদের মাটির পুতুল ও খেলেনাদি প্রস্তুত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকিতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এ

ক্ষমতাটি তাহাদের বংশগত। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যটা সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত। বংশগত শক্তি সত্ত্বেও যদি তাহারা এই শিল্পের অনুশীলন না করে, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে কেহই নিপুণ, দক্ষ শিল্পী হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক বুদ্ধির অনুশীলন ও কর্ষণ করিলে, তবেই তাহাতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা না করিলে, সে বুদ্ধি কোন কালেই ফলিতে পারে না। কিন্তু সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এমন দুই চারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যতিরেকেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। এইসব ক্ষণজন্মা পুরুষদের লোকে প্রতিভাবান বলিয়া থাকে। প্রতিভাকে সাধারণ নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে মনে করিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম এই যে, কাহারও কোন বিষয়ে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে শৈশবে ও বাল্যে শিক্ষার দ্বারা সেই বুদ্ধিকেও বৃদ্ধিও পরিণত করিতে হইবে। এরূপ করিলেই তবে তাহাতে সুফল জন্মিতে পারিবে, নচেৎ নহে।

মানুষের দেহ ও মন ঠিক একসঙ্গে পরিণত হয় না। তাহার দেহ যেরূপ বেগে পরিণত হয়, মন তাহা পারে না। শিশুর মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলী একান্ত অপরিণত থাকে। এই কারণে শিশুর পক্ষে কোন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মন সংলগ্ন করিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব। এরূপ করিতে বাধ্য করিলে, তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। তথাপি এমন অনেক শিশু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা শৈশবেই বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহাদের কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ইহাদিগকে "অকালপক্ক" বলা যাইতে পারে। এ অবস্থাটাকে স্বাভাবিক মনে করা উচিত নয়! ইহার প্রশ্রয় দিতে নাই। ইহার পরিণাম ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। এই সব শিশুর শরীর ও মন কোনটাই সম্পূর্ণ ভাবে পরিণত হইতে পারে না। আফ্রিকা মহাদেশে কতগুলি বর্ব্বর, আদিম, অসভ্য জাতি আছে যাহারা মোটের উপর ৩০ বৎসরের অধিক বাঁচে না। ইহাদের শিশুরা খুবই অকালপক্ক। ইহারা এত অল্পবয়সে হাটিতে শিখে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১০ বৎসরের মধ্যে ইহাদের দেহের ও মনের পরিণতি শেষ হইয়া যায়। কাফ্রি শিশুরাও খুবই অকালপক্ক বলিয়া বিখ্যাত। পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যে ককেশীয় জাতিরই সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে পরিণতি সাধিত হয়। এবং ককেশীয় জাতিরাই যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতায় সকলের শ্রেষ্ঠ, একথা কাহারই অবিদিত নাই।

"অকাল পক্কতা" নানা কারণে সম্ভব হইতে পারে এবং ইহার শ্রেণী-বিভাগও করা যাইতে পারে। র‍্যোক ফোর্ড (Rochford) অকালপক্কতাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর অকালপক্কদের তাহাদের বয়সের তুলনায় অধিক বড় ও বেশী বুদ্ধিমান দেখায়। ইহাদের দেহ সাধারণতঃ বেশ বলিষ্ঠ। সমবয়স্কদের সঙ্গ অপেক্ষা বয়স্কদিগের সঙ্গই ইহারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। ছেলেদের স্বাভাবিক দৌড়ধাপে ইহাদের তেমন মন লাগে না। লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চ্চাতেই ইহারা বেশী সুখ পাইয়া থাকে। শিক্ষক মহাশয় ও বাপমার নিকট সর্ব্বদা উৎসাহ ও বাহবা পাওয়াতেই ইহারা লেখাপড়াকেই একমাত্র ব্রত করিয়া তুলে। ইহার ফলে তাহারা অসময়েই দিব্য পাকিয়া উঠে, বটে কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অসময়ে পাকাইয়া তুলিলে ফলের যে দশা হয় ইহাদের বেলাতেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। এইসব শিশুদের মানুষ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। ইহাদের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখার দরকার। ইহাদের অস্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহাকে উৎসাহ দিতে নাই। হিসাব করিয়া মানুষ করিলে, এইসব শিশু বড় হইলে, অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। অন্যথা শিশুকালে প্রভূত বুদ্ধির পরিচয় দিলেও বড় হইলে তাহার

আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—ইহাদের সকল বুদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারাজি উত্তীর্ণ হইতেই শেষ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার "অকাল পক্ক" শিশুরা দেখিতে প্রথম শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা প্রায়ই রুগ্নকায়। ইহাদের এই রুগ্নতা হয় বংশগত নয়তো কোন রোগ সম্ভূত।

ইহাদের বংশে প্রায় স্থানেই ক্ষয়কাশ (phthisis) রোগের ইতিহাস থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের দেহ যেন নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। ইহাদের গাত্রবর্ণ বেশ উজ্জ্বল গৌর; মুখশ্রীতে দিব্যলাবণ্য থাকিতে দেখা যায়। চক্ষুদুটি বেশ উজ্জ্বল। তাহাদের হৃদয় খুবই স্নেহ ও প্রেমপরায়ণ। ইহাদের মানসিক শক্তি খুবই উচ্চঅঙ্গের বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহাদের শরীরের অবস্থা এমন যে, কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাকা ইহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ইহাদের বুদ্ধি কেবল একটি মাত্র বিষয়েই পরিস্ফুট ও পরিণত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাদের স্মরণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। ইহাতে দেখা যায় স্মরণ শক্তির যে পরিমাণে উন্নতি হইতে দেখা যায়, অন্যান্য মানসিক শক্তির সেই হারে অবনতি ঘটিতে দেখা যায়। শিশুকবি, শিশু গণিতবিদ্ ও শিশু-সঙ্গীতজ্ঞ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অকালপক্কদের অন্তর্গত। ইহাদের সকল মানসিক শক্তি সুধু একটি মাত্র বিশেষ গুণের পরিণতিকল্পে ব্যয়িত হইতে থাকায়, বড় হইলে, ইহাদের নিকট বেশীকিছু আশা করিতে পারা যায় না। এই শ্রেণীর অকাল পক্কদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহাদের শরীরের যাহাতে বিশেষ উন্নতি হয় সদা সর্ব্বদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহাদের মানসিক শক্তির অবাধ-গতির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করা আবশ্যক। এবিষয়ে ইহাদের উৎসাহ না দিয়া বরং নিরুৎসাহ করা দরকার।

সন্তান-পালনের সহিত শিক্ষার একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিক্ষা অর্থে ছেলেকে "ইস্কুলে দেওয়া" মাত্র বুঝিলে হইবে না। হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) শিক্ষাকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিক্ষার ৫টি উদ্দেশ্য :—

(১) সাক্ষাৎ ভাবে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করা।
(২) গৌণভাবে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করা।
(৩) সুপিতা হইবার উপযোগিতা লাভ করা।
(৪) সুনাগরিক হইবার উপযোগিতা লাভ করা।
(৫) শীলতা, ভদ্রতা, এবং চিত্তরঞ্জিনী বিদ্যাদি শিক্ষা করা।

এই পঞ্চবিধ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই সন্তানটি "মানুষ" হইতে পারে। ইহাদের কোন একটি বিষয় অবহেলা করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং ছেলেটি ঠিক "মানুষটি" হয় না। কি করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে হইবে, কি করিলে রোগাদির আক্রমণ এড়াইতে পারা যাইবে আঘাত ও অন্যান্য দৈব বিপদ-পাত নিবারণ করিতে পারা যাইবে—এ সকলই শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলেই যে আত্মরক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট হয় তাহা নহে। জীবন-ধারণের জন্য অর্থেরও আবশ্যক অতএব অর্থকরী বিদ্যাও শিক্ষা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় কেবল অর্থকরী বিদ্যাকেই আমরা একমাত্র শিক্ষার বিষয় করিয়া তুলিয়াছি সেইজন্য আমাদের শিক্ষা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কি করিলে সুপিতা হইতে পারা যায়, এসম্বন্ধেও সকলের জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য কেন না ইহারই উপর জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। মানুষ সামাজিক জীব অতএব সুনাগরিক হইতে হইলে যেসকল গুণের আবশ্যক, সে গুলিও শিক্ষাদ্বারা অর্জন করার প্রয়োজন। ইহার জন্য রাজনীতিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতে জ্ঞানলাভ করার দরকার। শীলতা, ভদ্রতা এবং বিবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ

উপভোগ করিবার ক্ষমতাও অনেক পরিমাণেই শিক্ষা-সাপেক্ষ।

সন্তানপালন সম্বন্ধে পুস্তকে লেখা যত সহজ, কাজে কিন্তু ততটা সহজ নয়। এ বিষয়ে পারিবারিক চিকিৎসক অনেক কাজ করিতে পারেন। চিকিৎসা-সূত্রে তাঁহাকে অনেক পরিবারেই গমনাগমন করিতে হয়। তিনি সে সকল পরিবারের প্রত্যেকেরই সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত। কোন শিশুটি কিরূপ ভাবে বৰ্দ্ধিত ও পরিণত হইতেছে ইহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে কোন শিশুর পালন সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রম ঘটে ইচ্ছা করিলে তিনি সহজেই সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের যে একটা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, একথা তাঁহাদের একেবারেই মনে হয় না। তিনি অনেক সময় শিশুটির মাতার স্কন্ধের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকেন। ইঁহাদের অনেকেই বলিয়া থাকেন বর্ত্তমান সময়ে জননীরা শিশুপালন বিষয়ে অতিশয় অমনোযোগিনী তাঁহাদের উপদেশ বাক্য পালন করা ইঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করেন না। বলা বাহুল্য এবিষয়ে আমরা তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। এখনকার জননীরা পূর্ব্বকালের জননী-দের অপেক্ষা সন্তানের শুভাশুভ বিষয়ে যে অধিক উদাসীন এ কথা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। সন্তা-নের মঙ্গলের জন্য এখনকার মাতারাও তাঁহাদের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে সম্পূর্ণই প্রস্তুত আছেন। তবুও যে সন্তানপালন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদাদি ঘটে, তাহার একমাত্র কারণ অনভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বর্ত্তমান কালের জননীদের স্কন্ধে দোষারোপ করি-বার সময় আমরা এ কথাটি ভুলিয়া যাই যে, আমা-দের পিতামহীদের আমলে সন্তানপালন ব্যাপারটা যত সহজ ছিল, এখন আর তাহার কণামাত্র নাই। সেসময়কার অবস্থাতে আর এখনকার অবস্থাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখনকার সভ্যতাও যেমন সহজ ছিল, ছেলে "মানুষ" করাও তেমন সহজ ছিল। এখনকার সভ্যতাও যেমন দিন দিন জটিল হইয়া পড়িতেছে সন্তান-পালনও তেমনই দিন দিন জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্য আমাদের দায়ী করিলে চলিবে না। কালের ধর্ম্মই এই। অত-এব ইহারই মধ্য হইতে আমাদিগকে কর্ত্তব্য নিরূপিত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কাল স্রোতকে ফিরাইতে চেষ্টা করা আর সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলায় কিছু প্রভেদ নাই। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা নিচয়ের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে একদিকে আমাদের অসুবিধা যেমন হইয়াছে, লাভও তদপেক্ষা কম হয় নাই। আমাদের শৈশবে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল এখন তাহার কতই না পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এই সব পরিবর্ত্তনের লাভ লোকসান আমাদিগকে তুল্য ভাবেই সহ্য করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার যত্ন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে যে সন্তান-পালন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতেছে, সে কেবল সময়েরগুণে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যে। সত্য কথা বলিতে কি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ছেলেদের কথা মানুষ যেন বেশী করিয়াই ভাবিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের বিশেষত্ব এই। এখন একটি ছেলের জন্য বাপ মা যত ভাবেন, যত করেন তাহা যদি আমাদের পিতামহগণ দেখিতেন তাহা হইলে, তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকিত না। শিশুদের জন্য আজকাল অনেক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন শিশু-পাঠ্য হাজার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা প্রতিদিন প্রকা-শিত হইতেছে। শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রেরও অভাব

নাই। ফলতঃ এখনকার ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে ও সমাজে যে একটা স্থান দেওয়া হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোথাও তাহা ছিল না। কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার একটু বাড়াবাড়ি ও অপব্যবহারও যে না হইতেছে, তাহা নহে। এক একটা বাড়ীতে গিয়া দেখি, সেখানে ছেলেদের একটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের এতদূর বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে, তাহাদের উপর এমন সব কাজের ভার দিয়া রাখা হইয়াছে যে, সে সব বহন করা তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সন্তানপালন বিষয়ে আর একটি ভুল অনেক বাড়ীতেই ঘটিতে দেখা যায়। অনেক বাপ-মা ছেলে মেয়েদের অষ্টপ্রহরের জন্য সঙ্গী করিয়া রাখেন।

বয়স্থ ও অপ্রাপ্তবয়স্থদের মধ্যে বয়সের যে একটা পার্থক্য আছে, এ কথাটা যেন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান। ইঁহারা যেসব আমোদপ্রমোদে সুখ ভোগ করেন শিশুদেরও তাহার অংশীদার করিতে চেষ্টা করেন। থিয়েটার দেখিতে হইলে, কোলের ছেলেটিকেও লইয়া যাইতে ভুলেন না। শিশুদের ও বালকদিগের পক্ষে এসব আমোদপ্রমোদ কোন মতেই ভাল নয়। ইহাতে তাহাদের কচি মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলী অন্যায়ভাবে উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে শৈশবেই বিবিধ স্নায়বীয় রোগের বীজ বপন করা হয়। বড় হইলে এই সব ছেলেরা নানা প্রকার স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পাইতে থাকে। শিশুর পক্ষে ছেলেবেলা দৌড়, ঝাঁপ প্রভৃতিই একান্ত স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশু একে একে তাহার শৈশবের খেলাগুলি আপনা হইতেই ত্যাগ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যদি তাহাদিগকে ঐ সকল খেলা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অন্যায় জুলুম ও অত্যাচার করা হয় মাত্র। দুঃখের বিষয় অনেকের বাড়ীতেই শিশুদের এইরূপ অন্যায় জুলুম সহ্য করিতে বাধ্য হইতে হয়

আরটিমাস্ (Artemus) বলেন—এমন অনেক অবিবেচক বাপ-মা আছেন তাঁহাদের কেমন স্বভাব, যেসব জায়গায় গেলে শিশুর ভয় পাওয়ার সম্ভব সেখানে তাহাদের যেন না লইয়া গেলেই নয়। ভয় পাইয়া শিশুর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে এমন কথাও শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন নয়। যাহা দেখিলে, কি শুনিলে, শিশুর মনে ভয় জন্মাইতে পারে, এমন কিছু করা বা বলা অতিশয় অন্যায়। তথাপি এ অন্যায় অনেককেই করিতে দেখা যায়। শিশুচরিত্রে অনভিজ্ঞতা ও অমনোযোগিতাই ইহার একমাত্র কারণ। জীব-বিদ্যা শিশুদের পক্ষে উত্তম জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সব শিশু স্বভাবতঃই ভীরু-স্বভাব, তাহাদিগকে কিম্ভূতকিমাকার জন্তু ও কুৎসিৎ, কদাকার সরীসৃপাদি দেখাইতে না লইয়া যাওয়াই ভাল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বেচারারা দিনটা তো ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে কাটাইয়া দেয় আর রাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই সব শিশুদের হাতে বাঘ, ভাল্লুক ও অন্যান্য ভীষণ বন্য জন্তুদের গল্পের বই দিতে নাই, তাহাতে তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই হইতে দেখা যায়। কোন শিশুর যদি কোন বিষয়ে ভয় থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে জোর করিয়া তাহার ভয়ের কারণটির সম্মুখবর্ত্তী করিতে নাই ইহাতে তাহার ভয়টি তো যায়ই না, উপরন্তু সে আরও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। এরকম করায় তাহার মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। ভয় পাইলে শিশুর "গা গরম" হইতে পারে, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ ছাড়া আরও অনেক মৃদু গোছের রোগ আছে, তাহাদের কারণ ভয় পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আজকাল মেয়েদের মধ্যে হিষ্টিরিয়া, ও ছেলেদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য যেন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে বর্ত্তমান কালে, ছেলে-

মেয়েদের এমন সব সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয়, যাহাতে তাহাদের মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা ও খাটুনি না হইয়া যাইতে পারে না। বাপ-মা ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ছেলেটির দেহ ও মন উভয়ই বেশ উন্নত ও পরিণত হোক্। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থার দোষে তাঁহাদের এ বাসনা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। আমরা নিজেরাই শিশুর সুপরিণতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের বীজ শিশুকালেই বপন করিয়া থাকি। শিশুকে লইয়া এত নাড়াচাড়া করি, তাহাকে এত বেশী খেলা দিয়া থাকি যে, তাহার স্নায়ুগুলি বিশেষ ভাবেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিশুর ও যে আমাদের মত স্নায়ু আছে এ কথা আমরা পদে পদে ভুলিয়া বসি। অতিরিক্ত আদর সোহাগের ও নাচানের জন্য আমরা অনেক শিশুর অনিদ্রা রোগ জন্মাইতে দেখিয়াছি—ইহার জন্য তাহার মেজাজ খিট্‌খিটে হইতে দেখিয়াছি। যদিচ শুনিতে কঠিন, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য অনেক সময় শিশুদের নাচান বা খেলা দেওয়া, তাহাদের লইয়া কৌতুক রঙ্গাদি করা, একবারে বন্ধ করাই অধিক শ্রেয়স্কর। এ সব না হইলেও শিশু ভাল ভিন্ন মন্দ থাকে না। শিশু আমাদের আমোদ দেওয়ার ও খেলা দেওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। সে নিজের আমোদ নিজেই যেন দেখিয়া লইতে জানে।

শিশু যেই একটু বড় হয়, তাহার বুদ্ধিবিবেচনা যেই একটু পরিস্ফুট হয়, আমরা অমনি তাহার মস্তিষ্কের উত্তেজনার পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে থাকি। ইহাতে যেসকল শিশু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায়।

খুব ছোট শিশুকে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাকে নাচাইয়া দুলাইয়া, তার বাপ-মাই বেশী আনন্দ পান, ইহাতে শিশু কত যেন অনন্দ পায়, তাহা ভাবিবারও দরকার হয় না। কিন্তু শিশুটি যখন একটু বড় হয়, তখন সে কিসে আনন্দ পাবে, সেটাও ভাবিয়া দেখিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন তাহার চিত্তবিনোদের জন্য তাহার হস্তে খেলেনা দেওয়ার, এবং আর কত কি করার দরকার হয়। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ঘটিতে দেখা যায়। শিশুর চিত্তবিনোদের উপকরণের ব্যবস্থা করিবার কালে, অনেকেই এ কথাটি ভুলিয়া যান যে, জগৎটা শিশুর নিকট চিরসবুজ ও চিরনবীন। আমাদের মত পৃথিবীটা তাহাদের কাছে একান্ত পুরাণ ও একঘেয়ে হইয়া উঠে নি। ছোট শিশু অতি সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য জিনিসেই বিমুগ্ধ হয় এবং তাহাতেই সে যথেষ্ট আনন্দ পায়। এরূপ স্থলে, তাহার হস্তে অত্যন্ত জটিল খেলেনা দিবার আবশ্যক কি আমরা তো তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শৈশবের একটা মস্ত বিশেষত্ব এই যে, শিশুর এক একটা বিশেষ জিনিষের প্রতি বেজায় ঝোঁক থাকে ইহাতে তাহার আর যেন অরুচি হয় না। ছেলেভুলান ছড়া, "রাজপুত্তুরের" গল্প ইত্যাদি শিশুর নিকট কোন কালেই পুরাণ হইতে জানে না। সে প্রতিদিন ঠাকুরমার কাছে শুনিতেছে, তবুও যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে না। খেলেনা সম্বন্ধেও ঐরূপ বিশেষত্ব না থাকে এমন নয়। কতকগুলি খেলেনা শিশুদের একান্ত প্রিয়। এগুলি জরাজীর্ণ হইলেও তাহারা ইহাদের ছাড়িতে পারে না। এ গুলিতে তাহারা যত আনন্দ পায় তেমন জাঁকাল মূল্যবান খেলেনাতে কখনও পায় না। এমন কেন হয় তাহার একটা কারণও যে না দিতে পারা যায় এমন নহে। শিশুর মানসিক শক্তি নিতান্তই অপরিণত। তাহার ধারণা-শক্তিও নিতান্ত অপরিপুষ্ট। সে তাহার পুরাণ খেলেনাটির সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত।

বিবিধ কৌশলপূর্ণ জাঁকাল নূতন খেলেনা হাতে দিলে, সে তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না কাজেই

তাহাতে তাহার কোনই আনন্দ হইতে পারে না। নূতন খেলেনাটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে গেলে তাহার দুর্ব্বল মন ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণেই সে বহুমূল্য নূতন খেলেনাটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ভগ্নপ্রায় পুরাতন খেলেনাটার দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। শিশুকে নিত্য নূতন নূতন খেলেনা দিয়া আদর করিতে থাকিলে, নূতন খেলেনা লাভ করিবার জন্য তাহার একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায়। শেষে এক দিন এমন হয় তাহার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ মিটাইবার আর উপায় থাকে না। এরূপ শিশু সন্তোষ কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে না। ইহার জন্য সে নিজে দায়ী নয়, দায়ী তাহারা যাহারা কিঞ্চিৎমাত্র ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া, তাহার হাতে যখন তখন, যেসে খেলেনা দিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন। যে শিশুর খেলেনার পরিমাণ যত অল্প সে ততই সুখী, ইহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।

মনের পরিণতি অতিশয় ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয়। শিশু যখন খুবই ছোট থাকে সে সময়ের জন্য ঝুমঝুমির মত খেলেনাই তাহার চিত্তত়ুষ্টির পক্ষে সহজ ও যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। তারপর সে যখন একটু বড় হয়, তখন ঝুমঝুমিতে তাহার চিত্ত প্রফুল্ল হইতে পারে না। তখন তাহার খেলেনার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহার পর সে যখন আরও বড় হয় তখন তাহার খেলেনাপ্রিয়তা নানা প্রকার শিশুসুলভ ক্রীড়া ও পুস্তকানুরাগে পরিণত হয়। তখন সে কিছুক্ষণ পড়ে, বাকী সময় দৌড় ধাপ করিয়া বেড়ায়।

বয়সের তারতম্যানুসারে আমোদপ্রমোদেরও পার্থক্য হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। শিশুর যাহাতে আনন্দ, যুবার তাহাতে আনন্দ থাকিতে পারে না। আবার যুবার যাহাতে আনন্দ বৃদ্ধের তাহাতে কোনই আনন্দ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালে আমাদিগকে শিক্ষার দোষে, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলকেই একই প্রকার আমোদে যোগদান করিতে হয়। ইহাতে শিশুর দেহ ও মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়িতেছে, তাহার কল্পনা শক্তি অস্বাভাবিক রূপে উত্তেজিত হইতেছে। জগতে সন্তোষেই মনুষ্যের একমাত্র সুখ। বাসনার পরিতৃপ্তিতেই সন্তোষ জন্মায়। সেই শিশুই প্রকৃত সুখী, যে সহজ সরল আমোদ প্রমোদেই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছে। যে শিশু বড় বড়দের আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণ হইয়াছে তাহার তুল্য দুর্ভাগা আর কে আছে? সাদাসিদে সহজ রুচি লইয়া যে ব্যক্তি আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে শিখিবার অনেক উপকরণ থাকে। আর শৈশব ও বাল্যেই যাহার সকল আকাঙ্ক্ষা—সকল আশা পূর্ণ হয় তাহার পক্ষে জীবনটা একটা মস্ত ভার ও অসুখের কারণ হয় মাত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাকচী।

আহ্বান

আকাশ তোরে ডাক্ দিয়েছে,
ওরে আমার খাঁচার পাখী!
আগলে তোর ঐ বদ্ধ আগল
আজও আটক রইবি না কি?

দূরে দূরে গগন মাঝে
সুরে সুরে যে গান বাজে,
হাজার স্বরের আনন্দে সে
সুরটি রে তোর রইল বাকী;
আকাশ তোরে ডাক দিয়েছে,
ওরে আমার খাঁচার পাখী!

নিখিল তোরে কোল দিয়েছে,
ওরে আমার ভুবনছাড়া,
কোন্ জগতের মন্দাকিনী
নন্দনে তোর চাল্‌ল ধারা!
গন্ধ-আকুল বকুল বনে
বাতাস বহে অকারণে,—
কোন্ সুদূরের গান গাহে সে
উদাস সুরে পাগলকরা!
নিখিল তোরে কোল দিয়েছে,
ওরে আমার ভুবনছাড়া!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

নন্দ দুলাল

চারিদিকে নিস্তরঙ্গ নীরবতা; আকাশে, বাতাসে, প্রান্তরে, মেঘে রৌদ্র-কিরণের মায়া মাখানো। বাড়ীর চারিদিককার আমগাছগুলি হইতে সুমিষ্ট আম্রমুকুলের মৃদু মধুর গন্ধ মধুপগুঞ্জনের সঙ্গে জড়িত হইয়া তপ্ত বায়ু-তরঙ্গে ছড়াইয়া গিয়া সমগ্র মধ্যাহ্নটিকে অত্যন্ত নিদ্রাতুর করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের সমুদয় মাদকতা সৌদামিনীর কোমল-তপ্ত হৃদয়টুকু পরশ করিয়া তার গোলাপী রংটি দেখাইয়া দিত। তার হৃদয়ের সুন্দর পেয়ালাটি কোন সুদূর স্বর্গরাজ্যের স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুজলে—কোন সন্নিহিত মরণ-রাজ্যের ক্ষণিকের আনন্দ-রসে পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিত গাছে গাছে যেন কার বন-ফুলের মালা হাওয়ায় দুলিতেছে, কান পাতিয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইত অদূরে তরুকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়াতলে যেন কার অদৃশ্য চরণে সোনার নূপুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তার বুকের ভিতরটা আনন্দে গুরু-গুরু করিয়া উঠিত। আবার কখনো কখনো আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তার মনে হইত রঙীন মেঘের তরী বহিয়া যেন কোন অকূলের নাবিক অনন্ত নীল সাগর পাড়ি দিয়া রঙীন মেঘের খেয়া-নৌকায় ইহলোক হইতে পরলোকে, পরলোক হইতে ইহলোকে বিশ্বের নরনারী পারাপার করিতেছে। চিত্রগুলি বালিকার হৃদয়ে খুব পরিষ্কার হইয়া না ফুটিলেও উহাদের ঈপ্সিত ভাবের আভাসগুলি হৃদয়ের সুখদুঃখের মাঝে বরাবর ঝিলিক দিয়া উঠিত। এমনি করিয়া প্রতিদিন তার হৃদয়ের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, স্বপ্নে ও সত্যে আলো ও ছায়ায় বিচিত্র হইয়া দিন দিন এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন দুপ্রহরের রৌপ্য রৌদ্রজাল শ্যামল তরুলতার অঙ্গে, নব কিশলয়ের মুখে, দিগন্তলীন সুনীল আকাশ-প্রান্তে বসন্তের মধুর আনন্দটুকুর মত ঝিকমিক করিতেছিল। সৌদামিনীর মা শোয়ার ঘরে শীতল মেঝের উপর পাটিতে শুইয়াছিলেন। একখানা বই পড়িতে পড়িতে তাঁর দু'চোখের পাতা ঘুমের আলস্যে ভাঙ্গিয়া আসিতে-ছিল। মেয়েটি মার চুলগুলি অঙ্গুল দিয়া চিরিয়া চিরিয়া দিতেছিল।

যখন মার হাতের খোলা বইখানা আলগোছে তাঁর বুকের উপর পড়িয়া গিয়া বন্ধ হইয়া গেল এবং চোখ-দুটি ঘুমের ঘোরে বুজিয়া আসিল, তখন সৌদামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার হাতের চুড়িগুলি, কানের দুলগুলি রুণু ঝুণু বাজিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। তাদের মুখের শিঞ্জন কোনমতে সামলাইয়া লইয়া সৌদামিনী বরাবর দোতালার সিঁড়ি দিয়া ছাদের দিকে চলিয়া গেল।

ছাদের চাল কোঠার পাশে ছোট্ট একটি কাম-রার দরজা ভেজান। দরজার ফাঁক দিয়া সৌদামিনী উঁকি দিয়া একবার কি দেখিল। তারপর দুটি প্রফুল্ল কম-লের মত পায়ের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে দরজাটি

খুলিয়া নিঃশব্দ চরণে ঘরের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। মৃদু অন্ধকারের ভিতর একটি বেদীর উপর একখানা রূপার বিমান, তার ভিতরে কতগুলি ফুল-পাতার রাশি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ঘরটি ফুল-চন্দনের ও ধূপ নৈবেদ্যের সুমিষ্ট গন্ধে ভরা।

সেই নীরব মধ্যাহ্নের নিভৃত পূজা-গৃহের সুবাসিত অন্ধকারে এই একমাত্র পূজারিণী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিমানের ভিতরকার ছায়াস্নিগ্ধ সুন্দর পুষ্পস্তূপের পানে কতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিল। তারপর বিমানটির কাছে আসিয়া তার মৃণাল-শুভ্র কোমল বাহুলতাখানি কুসুমরাশির ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া সে চোরের মত ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। কিছু কাল পর, ফুলপাতার অন্তরাল হইতে স্বর্ণাঞ্চলের এক প্রান্ত মৃদু অন্ধকারে ঝকমক করিয়া উঠিল। সৌদামিনীর দুই চক্ষু সহসা পুলকে বিস্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দুই হাতে ফুলের রাশি ঠেলিয়া দিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত ছোট সুন্দর একটি প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া আনিল। সৌদামিনীর সুমধুর স্পর্শের ভিতর বোধ হয় তার সবটুকু কচি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাই তার পরশ লাগিতেই যেন নিদ্রিত বনমালা সহসা সৌন্দর্য্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষুদ্র পদ্মের উপর ছোট নূপুর পরা পায়ের উপর পা রাখিয়া বনমালা ত্রিভঙ্গ বেশে তার ছোট ভক্তিমতী পূজারিণীটির সমুখে রঙীন ঠোঁটের উপর বাঁশীটি তুলিয়া লইলেন। অস্ফুট ফুলটির মত হাসি হাসি মুখখানির ঐ রঙীন ঠোঁটের পরশে মোহন বাঁশীতে বুঝি এখনি একটি অশ্রুত সুন্দর কোমল মিলনের গাথা বাজিয়া উঠিবে।

সৌদামিনী বিস্মিত-তৃষিত নেত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া মূর্ত্তিটি দেখিয়া লইল। জননী যেরূপ নবপ্রেম-বিকশিত-নেত্রে প্রথম প্রসূত শিশুটির পানে চাহিয়া থাকে, চাহিয়া হচায়িাও চোখের দেখার সাধ মিটে না, সৌদামিনীর চোখে মাতৃত্বের সেই সুধামাখা স্নেহদৃষ্টি উথলিতেছিল, যেন একখানা ছবি—অপূর্ব্ব কলা-শিল্পেরই সাধনার জিনিস।

বনমালী এখনই তার হাস্যোদ্ভিন্ন অধর-প্রান্তে বাঁশীটি বাজাইয়া চারিদিক পুলকিত করিয়া তুলিবেন, এখনি তাঁর অশ্রুত-সুন্দর জীবন্ত রাগিণীটি সৌদামিনীর হৃদয়-কুঞ্জে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিবে, বোধ হয় সেই আশায়ই সে মূর্ত্তিটি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। বাঁশী যখন বাজিল না, তখন আঁচল দিয়া দেবতার মুখ হইতে পরম স্নেহে চন্দনের গন্ধমাখা পুষ্পরেণু মুছিয়া লইয়া সৌদামিনী আবার স্নেহপূর্ণনয়নে মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া দেখিল, বিমানের বিশৃঙ্খল পুষ্পরাশির মাঝে মূর্ত্তিটি রাখিয়া দিয়া আর একবার হৃদয়ের সমুদয় ক্ষুধায় লোচন পূর্ণ করিয়া লইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তারপর, একটি মৃদু অশ্রুসিক্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী নিঃশব্দে সে পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া বরাবর নীচে নামিয়া যেখানে অজস্র নূতন বোলের ভারে আমগাছের কচি ডালখানি হেলিয়া পড়িয়া সিঁড়ি-ধাপের একাংশ ছায়াস্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সৌদামিনী সেইখানে আসিয়া পা মেলিয়া বসিয়া পড়িল। সেখানে বসিয়া সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুবিন্দুগুলি তরল মুক্তাবিন্দুর মত নেত্র-পল্লবের উপর ছল ছল করিতে লাগিল। এরূপ নিস্তব্ধ দুপ্রহরে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ে মানুষের ব্যথিত চিত্ত সহজে অবরোধমুক্ত হয় বটে, কিন্তু সৌদামিনী বালিকা—যার এখনো পুতুল খেলার বয়স পার হয় নাই,—তার আবার কিসের দুঃখ, কার উপর তার এমন করুণ-কঠিন অশ্রু-সজল গুরু অভিমান! সেই দিন হইতে এখন সৌদামিনী নিরালা পাইলেই চুপ করিয়া কাঁদে। এখানে ওখানে, যুঁইগাছের পাশে, বাঁধাঘাটের আড়ালে তার লুকাইয়া কান্না আর শেষ হয় না। রাত্রির অন্ধকারে বালিশের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিবার সময়

তার বুকে কোন সুদূর জন্মান্তরের বেদনা ধ্রুব হইয়া উঠিত, সে কথা কে বলিতে পারে ?

বছর বছর শ্রীপঞ্চমীর সময় গ্রামে মস্ত মেলা বসে। সেবার মেলা হইতে সৌদামিনীর মা মেয়ের জন্য একটি ভারি সুন্দরপুতুল-মেম কিনাইয়া আনিলেন। যেমন খাসা তার মুখ চোখ, তেমনি তার খোপা বাঁধার জাপানী কায়দা। নেহাৎ ভঙ্গপ্রবণ চীনামাটির পোষাকপরা পুতুল হইলেও খাঁটি তার পরিচ্ছদের ব্যাপারটা মেম সাহেবদের মতই—অত্যন্ত আঁটা, জমকালো ও বাহুল্য পূর্ণ। পুতুলটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে,একবার চাবি দিয়া দিলেই মেমসাহেব ঘাড়টি সুন্দর কাৎ করিয়া বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করেন-ভারি চমৎকার, সুন্দর সে বাজনা।

পুতুলটি পাইয়া সৌদামিনী প্রথমে ভারি খুসী হইল, সে কখনো মেম সাহেবের সঙ্গে খেলা করিত, কখনো নির্জ্জনে বসিয়া তার বেহালার গৎ শুনিত। কখনো বুকে চাপিয়া সোহাগ করিত, আবার কখনো তাহার পুতুলের সঙ্গে মানুষের মত কথা বলিত। পুতুল-মেমটি ঠিক খাঁটি বিলাতি মেমের মতই সৌদামিনীর বিশুদ্ধ বাংলা আলাপ কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাসি দিয়াই তার অজ্ঞতার লজ্জা চাপা দিতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু দুই দিন অনবরত দম দেওয়াতে সে দিন মেম সাহেবের হাতের বেহালা আর বাজিল না। সৌদামিনীরও মেম সাহেবের উপর আসক্তিটা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। দুপুর বেলায় বাড়াতে আর আর সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন সে তার খেলার ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে তার অনেক কালের বেতের কাজের ঝাঁপিটি খুলিল। সে প্রকাণ্ড ঝাঁপি খেলনা পুতুলে একেবারে বোঝাই! ঝাঁপির ভিতরে ঢালা বিছানায় এক সঙ্গে মেছুনী ও ভিক্ষুক, নর্ত্তকী ও বন মানুষ, ফুলবাবু ও ভিস্তিওয়ালা, দাড়িচাচা অজীর্ণরোগগ্রস্ত কেরাণী ও দাঁড়িওয়ালা বাবুর্চি সাহেব বসিয়া আছেন। সেখানে যেন কোন জাতিভেদ নাই! যেন তারা সব কটিতে মিলিয়া এক সখের পরিবার ভুক্ত হইয়া পরম সখ্যে সংসার করিয়া আসিতেছে! তাদের মধ্যে কারো হাসিমুখ, কেউ বিরস বদন, কেউ গর্ব্বিত, কেউ ভীরু, কারো পেটের ক্ষুধা দূর করিবার আয়োজন, কারো মন ভুলাইবার সরঞ্জাম—হুবহু সংসারের চিত্র। কেবল তফাৎ এই যে, আমাদের জাতিভেদ, সামাজিক দলাদলি ও কলহের কোন এলাকা তারা রাখিত না।

ঝাঁপির ডালা খুলিয়া সৌদামিনী মেম সাহেবটিকেও সেই ঝাঁপির ভিতর রাখিয়া দিয়া তাকেও সেই বিচিত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল। তাহাতে মেম সাহেব কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। মেমটিকে সেই ঝাঁপির ভিতর রাখিয়া সৌদামিনী একবার সবগুলি পুতুলের পানে কৌতুকপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তার চোখের পাতা আবার ছল ছল করিয়া উঠিল। কৈ! তার বহুদিবসের উপবাসী হৃদয়ের ব্যথামাখা অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষাটুকু তো পুরিল না! তাই তার বুকের মাঝে নীরব বেদনার কুজ্ঝটিকার ভিতরে সেই সহাস্য মুখ পদ্মপলাশনয়ন নন্দদুলালের কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে।

এমনি করিয়া নিত্য নব সুখ-দুঃখের লুকোচুরির ভিতর দিয়া অনেক গুলি বছর ম্যাজিক লণ্ঠনের চলন্ত দৃশ্যের মতন খুব তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল। এখন নব বসন্তের আম্র পল্লবের অন্তরালে চুতকষায়কণ্ঠ কোকিলের সাড়া পাড়তেই সৌদামিনীর সমুদয় হৃদয়টি কামনায়, স্বপ্নে, বিস্ময়ে, বেদনায়,অশ্রুতে, ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিঝুম দুপুর বেলায় তার ছাদের উপরকার পূজার ঘরে তার নিঃশব্দ গোপন গতিবিধিটুকু এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, সে এখন চোক বুজিয়া পূজার ঘরে যাইতে পারিত এবং চোখ বুজিয়াও সে ঐ দেবতার

ভুবনমোহন মধুর রূপ দেখিতে পাইত। তাই এখন দুপুর বেলায় পুতুল খেলায় আর তার মন বসিত না। সে সময় সে সকল মোহ কাটাইয়া, সকলের চোখ এড়াইয়া সেই জনহীন পূজা-গৃহে দেবতার সম্মুখে আসিয়া তরুণ তপস্বিনীটির মত দাঁড়াইত। রাঙ্গা কিশলয়ের মত সেই বনমালীর কচিমুখের নীরব হাসিটুকুর পানে চাহিয়া তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত, তবু তার দেখিবার সাধ মিটিত না। সে তার সকরুণ সুন্দর চোখ দুটিতে নয়ন-জলের অঞ্জলি সাজাইয়া রাখিত। যেন তার সমুদয় অন্তঃকরণ বলিতেছে—এসো দেব, এসো এসো, শূন্য হৃদয়-মন্দিরে এই যে আমি স্নেহের ফুল-চন্দন লইয়া তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি! মধুর নুপুর-শিঞ্জনে ব্যথিত বন-বীথির দুই পাশে ফুলের দীপালী সাজাইয়া দিয়া এসো, এসো হে হৃদয়-রঞ্জন, হৃদয়ে এসো! তোমার চরণ-রেণুর পরশ পাইয়া আমার বক্ষ-নীড়ের অস্ফুট মাতৃ-স্নেহটুকু সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া যেন আমার নারী-জীবন ধন্য করিয়া দেয়। সে দেবতার সহিত সৌদামিনীর অন্তরের না জানি কেমন একটা আশ্চর্য্য সম্পর্ক ছিল। পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় প্রত্যহই যেন সে তার হৃদয়ের পাত্রটি অশ্রুজলে পূর্ণ করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিত। তার পর কয়েকদিন ধরিয়া গাছের আড়ালে, ঘরের কোণে, রাত্রির অন্ধকারে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিত। এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিলে পর তার হৃদয়ের বেদনার উপর আবার আশার রঙীন আলো ঠিকরাইয়া পড়িত। তুষারাঘাত-খিন্ন শুষ্ক বৃক্ষশাখাটি বসন্তের প্রথম স্পর্শেই যেরূপ সবুজ হইয়া উঠে, তারপর পত্র-পল্লবে সাজিয়া উঠে, তারপর ফুলে ফলে ভরিয়া যায়, তেমনি একটু একটু করিয়া আশার আলোকে সৌদামিনীর সারা বুক ভরিয়া উঠিত. সে যেন কান পাতিয়া শুনিতে পাইত, যে গানের সুরে চাঁদ হাসে, ফুল ফোটে যমুনার নীল জল উজান বহিয়া যায়, সেই গানে তার অশ্রুনীরে ফোটা হৃদয়-পদ্মটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সে চোখ মেলিয়া—চোখ বুজিয়া, দেখিতে পাইত সেই ভক্ত-বৎসল অমিয়মুরতি, সেই আঁখিভরা সজল দৃষ্টি, সেই অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত ফুলটির মত মুখের হাসি হাসি আভাস—সে মুখ দেখিয়া সৌদামিনীর জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অন্তরের ক্ষুধা চোখের পলকে পরিতৃপ্ত হইত, সমুদয় হৃদয় নুইয়া পড়িত। সৌদামিনী আবার মুগ্ধার মত পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া ফুলের ভিতরে নিমজ্জিত তার হৃদয়দেবতাটিকে বাহির করিয়া তার উচ্ছ্বসিত বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিত। যখন দেবতার আরক্ত সুন্দর মুখে তার অধর দুটি যোজনা করিয়া একটি স্নেহ-চুম্বনে তার অন্তরের সমুদয় মাতৃ-স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিত, তখন স্নেহাবেশে তার রক্ত নয়ন পল্লব দুটি আপনি মুদিয়া আসিত। চোখ মুদিতেই সে দেখিতে পাইত সেই নন্দদুলাল বনমালী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তার হৃদয়ের মাঝে নন্দন-সুষমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

সৌদামিনীর ক্ষীণ তনু-লতাটিকে নব যৌবনের অস্ফুট লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া বঙ্গভূমি পার হইয়া গেল। এখনো তার বেতের ঝাঁপিটার ভিতরে মেছুনী, পণ্ডিত, নর্ত্তকী, বনমানুষ প্রভৃতি পুতুলগুলি সকলে মিলিয়া সংসার করিতেছে!

কিন্তু কৈ? সে পূজা-ঘরের নন্দদুলাল বনমালীর মত তেমনি আর একটি জীবন্ত পুতুল কৈ—যার ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়! তেমনি পদ্ম-পলাশ চক্ষু, তেমনি অর্দ্ধবিকশিত ফুলটির মত হাসি হাসি মুখ, যে মুখের উপর মাতৃস্নেহ নিঃশব্দ ফুলের মত আপনি ঝরিয়া পড়ে।

এখন তার পুতুল-খেলার বয়স গিয়াছে বটে কিন্তু পুতুল পাওয়ার সাধটুকু সম্পূর্ণ মিটে নাই। তাই এখন প্রাণভরা সচেতন পুতুলের মত শিশুগুলিকে দেখিতে পাইলে সৌদামিনীর হৃদয় কোমল স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিত। এ তরুলতা

ঘেরা সুন্দর জগতের পথেঘাটে শিশু, গৃহে গৃহে, উদ্যানে প্রান্তরে শিশু, কোলে কাখে, ছায়ায় রৌদ্রে শিশু! বিধাতা যেন পৃথিবীর বুক ভরিয়া কতই না রহস্যের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বীজ হইতে কালে কালে ঝাকে ঝাকে,লাখে লাখে কত শিশুফুল ফুটিয়া উঠিতেছে! এ বিচিত্র জগতে যেন চিরকাল ধরিয়া শিশুর মেলা বসিয়াছে। কারো লাল লাল টোপা টোপা গাল, কারো মোটাসোটা, গোলগাল হাত পা, কারো টলমল চোখ। কেউ মার কোলে বসিয়া আকাশের চাঁদ ছুঁইতে উঠিতেছে। কেউ মুখের ভিতর নিজের আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া দেবভোগ্য অমৃতের আস্বাদন করিতেছে, কেউ বা সুখতপ্ত শয্যায় আরামে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়া এক একবার হাসিয়া উঠিতেছে!

সৌদামিনীর শৈশব সঙ্গিনীদের মধ্যে যাদের আগে বিবাহ হইয়াছিল তাদের কেউ কেউ এমন একটি দুটি করিয়া শিশুফুল পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সৌদামিনী কোথাও শিশু দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত। কোনটিকে দোলা দিয়া খুসী করিত, কোনটিকে কোলে করিয়া চুমা খাইত, কোনওটিকে বুকের ভিতর পরম আগ্রহে চাপিয়া ধরিত। এমনি করিয়া একটি সুন্দর শিশু-জগৎ সৌদামিনীর হৃদয়খানির উপর চারিদিক হইতে মোহজাল বিস্তার করিত। তাদের কোমল গুঞ্জনে তার হৃদয়ের স্নেহরাশি উছলিয়া উঠিত। কিন্তু তবু তারা একটু চোখের আড়াল হইতেই তার দুই চক্ষে অশ্রুধারার বান আসিত!

এ জগতে শিশুর অভাব নাই সত্য কিন্তু সৌদামিনী তার মনের মত আর একটি স্বপ্নের শিশুর জন্য তার বুকভরা স্নেহের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ করিত। সেটি যে নিতান্ত তারি নিজস্ব জিনিস—হাসিতে হাসিতে স্নেহের তুফান তুলিয়া তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তার বুকের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া স্নেহ সুকোমল হৃদয় মাঝে প্রবেশ করিয়া আরামে চোখ মুদিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে! সেই নন্দদুলাল বনমালীর মত পদ্মপলাশনয়ন, তেমনি ফুলের মত হাসিমাখা মুখ!

একদিন স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সৌদামিনীর সহিত তার প্রফুল্লের চারি চোখের মিলন হইল। সৌদামিনী প্রফুল্লকে আর কখনো দেখে নাই, কিন্তু অপরিচিতকে দেখিয়া আজ তার মনে হইল প্রফুল্ল আর কারো নয়—যেন তার বহুকালের বহু জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। প্রফুল্লের নীরব স্নেহময় দৃষ্টি-ধারা সৌদামিনীর হৃদয়ের ভিতরে স্বপ্নরাজ্য সৃজন করিল। প্রফুল্লের মৃদু হাসি ও নব বিস্ময়মাখা মুখখানির উপর চাঁদের আলো ঢলিয়া পড়িয়াছে। সৌদামিনী তার হৃদয়-তটে সুদূর বনস্থলীর অস্ফুট মধুর মর্ম্মর-ধ্বনি শুনিতে পাইল। প্রফুল্লের মুখ দেখিয়া সৌদামিনীর মনে হইল যেন প্রফুল্লের মুখের নীচে হাসিটুকু বসন্তের আকুল সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে মাখা। ঐ ভাসা চোখে শৈশবের স্বপ্ন-জড়িত পদ্মপলাশেলোচনের ইঙ্গিতটুকু অতি স্পষ্ট।

প্রফুল্ল বাহিরের জগৎ হইতে আহরণ করিত, সৌদামিনী গৃহে সঞ্চয় করিত। কর্ম্মের বাহুল্য বশতঃ প্রফুল্ল বেশীক্ষণ সৌদামিনীর সহিত থাকিতে পারিত না। অনেকদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রফুল্লকে ঘরে বসিয়াও কাজ করিতে হইত। সৌদামিনী তার হৃদয়খানি অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ করিয়া দীপোজ্জ্বল গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। গৃহের দীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া প্রেমের আলোকে চোখদুটি ভরিয়া লইয়া সে কঠোর কর্ম্মনিরত স্বামীর নিষ্ঠামণ্ডিত মুখখানার পানে অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সৌদামিনীর সমুদয় হৃদয় স্বপ্নরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। সে পরিষ্কার দেখিতে পাইত স্বামীর চোখে তার শৈশব-দেবতার সুন্দর চাহনিটুকু আর মুখে অস্ফুট ফুলের শোভার মত নীরব হাসির রেখা। স্বামীর ঐ চোখ, ঐ হাসি দেখিয়া সৌদামিনীর হৃদয় এখন ঐ রকম একটি ছোট

শিশু লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দেখিতে হইবে ঠিক সেই নন্দদুলাল বনমালীর মত। তেমনি পদ্মপলাশ চক্ষু, তেমনি হাসিটুকু ফুলের মাধুরী মাখা। সে যখন শয্যায় শুইয়া থাকিত, তখন তার লীলায়িত বাহুলতাটির উপর একটি আতপ্ত কোমল শিশুর মস্তকের মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। সে মনশ্চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইত যেন তার বাম বাহুটির উপর মাথা রাখিয়া ঠিক নন্দদুলালের মত একটি ফুটফুটে টুকটুকে ছেলে বিছানার উপর ঝলমল করিতেছে। সেই হাসি, সেই চোখ,—ছায়া-সুষমা-ঘেরা কোমল মুখ খানার মাঝে সেই মৃদু গোলাপী আভাটুকু। তার আনন্দমাখা আধ আধ কথাগুলির মাধুরী যেন সৌদামিনীর হৃদয়ের মমতার সহিত জড়াইয়া যাইত। তার বহুকালের কোমল হৃদয় স্নিগ্ধ-শীতল করিয়া দিবার মত একখানা মমতাঘেরা চাঁদমুখ—যাকে হৃদয়ের মাঝে পাইবার অতৃপ্ত আশায় সৌদামিনীর শৈশবের স্বপ্নরাজ্য নব যৌবনের ফুলবন পর্য্যন্ত তার পিছু পিছু ঘুরিয়া মরিতেছে।

কিছুকাল পর ধীরে ধীরে সৌদামিনীর গতি মন্থর এবং সারা অঙ্গ আলস্যের জড়তায় ভরিয়া আসিল। মুকুলিত চুত লতার মত তার মুখ-শোভা অত্যন্ত পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। সে এখন আকাশ-ঢাকা রঙীন মেঘে, চঞ্চল দক্ষিণ পবনে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জে যেন কোন অপূর্ব্ব স্বপ্ন-জগতের সন্ধান পাইত। বিস্ফারিত চোখ দুটি তার নবীন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সে মুখ দেখিলে মনে হইত যেন সুদূর স্বর্গরাজ্য হইতে তার শৈশব-দেবতা নীল স্নিগ্ধ দৃষ্টি-ধারায় তার সমুদয় হৃদয় সিক্ত করিয়া সরস করিয়া দিয়াছেন। সে কোমল—পুষ্প-কোমল অঙ্গের অমিয় পরশ পাইয়া যেন সৌদামিনীর মাতৃত্বের সকল সাধ চরিতার্থ হইয়া গেছে।

তারপর একদিন গভীর নিশীথে অসহ্য বেদনা সৌদামিনীর সন্নিহিত মাতৃত্বের বিকাশ সূচনা করিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনার ভিতর দিয়া নারী যে পূর্ণত্ব, মহত্ব ও মাতৃত্ব-সফলতা প্রাপ্ত হয় সৌদামিনী বাসিত, পাণ্ডুর, আশাপূর্ণ ও উৎকণ্ঠিত মুখে সেইখানে আসিয়া পৌছিল। সৌদামিনী চোখ বুজিয়া ভাবিল, এইবার বুঝি আমার নন্দদুলাল বনমালী স্বর্গ হইতে কোলে নামিয়া আসিল। সে চোখ বুজিয়াও পরিষ্কার দেখিতে পাইল, সেই ফুলের মত হাসি, তেমনি পদ্মপলাশ নয়ন!

অনেকক্ষণ পরে সৌদামিনী যখন চোখ মেলিয়া চাহিল তখন ধাত্রী একটি শিশু আনিয়া সৌদামিনীর সম্মুখে ধরিল। সৌদামিনী দেখিল, কৈ এ ত তার আশৈশবের বাঞ্ছিত নন্দদুলালটির মত একটি প্রিয়দর্শন সুকুমার শিশু নয়! এ যে এক রত্তি মেয়ে! চোখদুটি ছোট ছোট, মুখখানা ফ্যাকাসে, মুখে সে হাসির আভাস কোথায়? একটা ঘূর্ণিবায়ু যেমন বনানীর পত্র-পল্লব ছিন্ন, লুণ্ঠিত, বিদীর্ণ করিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, সৌদামিনীর হৃদয় হইতে তেমনি একটা হাহাকার বুকের অনেক কালের সঞ্চিত, পালিত, আশাগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল।

সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইবার পর একদিন সৌদামিনী নিঝুম দুপুর বেলায় দুর্ব্বল মেয়েটিকে পুরু তোয়ালের ভিতরে জড়াইয়া আবার তাহার ছেলে বেলার বেতের ঝাঁপিটি খুলিয়া বসিল। দেখিল ঝাঁপির ভিতরে মেছুনী, ভিক্ষুক, নর্ত্তকী, বনমানুষ প্রভৃতি হরেক রকমের পুতুলগুলি তেমনি ছেলেবেলার মত সখের সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে! না জানি কি খেয়ালের বশে একবার তার কোলের মেয়েটি বিরসবদন ভিক্ষুকের পাশে রাখিয়া কেমন দেখায় সে তা দেখিল। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, তার কোলের মেয়েটিকে বুকের ভিতর তুলিয়া বেতের ঝাঁপি বন্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। তার আশৈশবের সুন্দর

আকাঙ্ক্ষাটি যেন মিটিল না। সেই দুঃখটি ভুলিবার জন্যই যেন মেয়েটিকে সৌদামিনা আরো বেশী করিয়া ভালবাসিতে লাগিল।

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল, আবার হৃদয়ের নিরাশার মেঘে আশার রঙীন আলো মাখিয়া দিয়া অচির বসন্ত অতীতের দেশে চলিয়া গেল। প্রফুল্লের কর্ম্মক্ষেত্র এখন বিস্তৃত। জীবনের অবসর বড়ই অল্প, চিত্তের প্রফুল্লতা যেন কর্ম্মসাগরে জলাঞ্জলি দিয়া সে প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছে। প্রচুর ধনের অধিকারী প্রফুল্লকে অর্থ উপার্জ্জনের নেশা একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। স্বামী যখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘরে বসিয়া একমনে কাজ করিতেন, তখন সৌদামিনী অনেকদিন ছায়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। আগের মত সে প্রফুল্ল মুখশ্রী আর নাই। মাথার চুলগুলি আর নবীন মেঘের ঝালরের মত সুন্দর নয়. চোখের নীল তারা ঝাপসা। তবু হঠাৎ চঞ্চল দীপালোকে সৌদামিনী দেখিতে পাইত, প্রফুল্লের বিষণ্ণ মুখের বিবর্ণতার মুখোস ভেদ করিয়া মুখের কোলে সেই চির নবীন মোহমাখা তরুণ বয়সের পুরাতন গোলাপী আভাটুকু বিদ্যুৎ চকিতের মত ক্ষণিকের জন্য প্রফুল্লের সবখানি মুখ একবার রঞ্জিত করিয়া দিয়া আবার সেই ম্লান পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের মাঝে কোথায় মিলাইয়া যাইত। আবার সৌদামিনীর স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া সেই ক্ষণিকের দীপ্তিতে রঙীন স্বপ্নজালজড়িত বনমালীর তরুণমূর্ত্তি তার মুগ্ধ চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিত। সেই বনমালীর মতই একটি সুকুমার প্রিয়দর্শন শিশু অঙ্কে ধারণ করিবার জন্য আবার তার সমুদয় ব্যথিত মাতৃ-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই আবার প্রস্ফুটিত দোহদ চিহ্নগুলি সৌদামিনীর আসন্ন মাতৃত্বের শুভ সংবাদ সূচনা করিল। আবার একটি নব শিশু—বেটাছেলে বটে, কিন্তু বিশ্রী কাহিল। তার শৈশবের চিত্তরঞ্জন বনমালীর সহিত সাদৃশ্য এর কোথায়? নিঝুম দুপ্রহরে সৌদামিনী বেতের ঝাঁপি খুলিয়া ছেলেটিকে নক্তকার পাশে রাখিয়া দিয়া দেখিবার সময় তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

আশার রত্নদীপ যতই ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল সৌদামিনীর হৃদয়ের অন্ধকার ততই দুঃসহ ঠেকিতে লাগিল। এখন মা কমলা প্রফুল্লের নিকট তাঁর ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের চাবি দিয়াছেন। কর্ম্মের যজ্ঞশালা আরো বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মন দুর্ভাবনায় ও চিন্তায় আরো অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন সৌদামিনীর সহিত প্রফুল্লের বড় একটা আলাপের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। তবু অনেকদিন আড়াল হইতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার সময়, সেই কৈশোরের জ্যোৎস্না রাত্রির কথা সৌদামিনীর মনে পড়িত—মনে পড়িত. সেই হাসি. সেই চোখ মুখের সেই গোলাপের আভা।

আরো অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তবু আশার স্বর্ণরেখা এখনও সৌদামিনীর হৃদয় হইতে একেবারে মিশিয়া যায় নাই। সেই শৈশবের নন্দদুলালের নীল দু'চোখ. হাসিমুখ, আনন্দ-মূরতি স্মৃতির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া মধুর স্বপ্নের মত উঠিত। অবশেষে আবার সৌদামিনী মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সুন্দর হইয়া উঠিল। এবার প্রসবের সময় সৌদামিনী কঠিন ব্যারামে পড়িল, বাঁচিবার আশা একেবারে ছিল না। অনেক দিন পরে সে যখন রুগ্ন শয্যায় জাগিয়া উঠিল, তখন মনে হইল বুঝি নন্দদুলাল. নীল চোখে হাসিমুখে তার শীর্ণ বাহুটির উপর মাথা রাখিয়া তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সৌদামিনী ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই—ক্রোড় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে! মাতৃত্বের পরিবর্ত্তে শুষ্ক ব্যথায় তার সমুদয় হৃদয় ভরিয়া

রহিয়াছে! ধাত্রীকে ডাকিয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল তার কি হইয়াছে? বুকের ভিতর এমন বাজিতেছে কেন? তার সাধের নন্দদুলাল কোথায় গেল? ধাত্রী আঁচলে চোখ মুছিল, সৌদামিনীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সৌদামিনীর মেয়েটির অনেক দিন বিবাহ হইয়াছে। এখন নাতি নাতিনীরা দিদিমার স্নেহদুর্গ লুণ্ঠন করিতে ছাড়িত না. সৌদামিনীও তার হৃদয়ের দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া কোন রূপ আত্মরক্ষা করিত না! কিন্তু তবু তার শৈশবের স্বপ্ন আজো সফল হয় নাই। এরা কেউ তার নন্দ-দুলালের মত চোখ পায় নাই। তেমন ফুলের মত হাসি হাসি মুখ তো এদের কারো নয়!

আরো কিছুকাল পর সে তার ছেলেটিকেও বিবাহ দিয়া নববধূ ঘরে আনিল। সৌদামিনীর পুত্রবধূ বাস্তবিক সুন্দরী বটে! কিন্তু সে নবীন প্রেমের মাঝে নিমজ্জিত, তার রূপের গর্ব্ব রাখিবার স্থান ছিল না! সৌদামিনী অনেক দিন হইল নানা পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শুকাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পুত্রবধূ তার রূপ ও গৌরব লইয়া ব্যস্ত ছিল—অন্যদিকে আর তার দৃষ্টি ছিল না।

অবশেষে সৌদামিনী যখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল, তার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি প্রায় লোপ হইয়া আসিল, এমন সময় একদিন সকালবেলা তার নিকট সংবাদ পঁহুছিল তার পুত্রবধূ একটি সুন্দর নবকুমার প্রসব করিয়াছে। আবার বহুদিনের পর যেন নন্দন হইতে নদী, প্রান্তর, পর্ব্বত, কান্তার প্লাবিত করিয়া এক নবীন স্নিগ্ধ আলোক-পুঞ্জ সৌদামিনীর হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিল। তার কানের ভিতর দিয়া শিশুর কূজন-গুঞ্জন, হাসিকান্না মর্ম্মের নিভৃত কুঞ্জে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তার উচ্ছ্বসিত হৃদয়কে সে আর থামাইয়া রাখিতে পারে না। নবজাত কুমারটিকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিবার উৎকণ্ঠায় তার বহুদিনের পুরানো ব্যাধি যেন আজ হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

শীর্ণ কম্পিত পদে সে আঙ্গিনা পার হইয়া পুত্রবধূর সুতিকা ঘরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। যে মানুষ বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিত না. তার পক্ষে ইহা কম কথা নয়। কিন্তু কবি গাহিয়াছেন, আশা এমনি দুরারোহিণী! সেই চাঁদপানা মুখখানার পানে চাহিয়াই সৌদামিনী সুমধুর বিস্ময়-জলধির মাঝে ডুবিয়া গেল। তার মনে হইল যেন এত কাল পরে নারী-জন্মের সকল অতৃপ্ত বাসনা আজ সফল হইল—এই তো সেই হাসি হাসি ফুলের মত মুখখানার উপর আনন্দ ও স্বাস্থ্যের গোলাপী আভা! যেন তারি শৈশবের স্বপ্নে রঞ্জিত হইয়া, হৃদয়ের আজন্মসঞ্চিত মমতায় মধুর হইয়া, সেই নন্দদুলাল বনমালী আজ তার ঘরে আসিয়াছেন—যেন সেই শৈশবের স্বপ্নঘেরা নন্দদুলাল বনমালী—সেই পদ্ম-পলাশ নয়নে তেমনি স্নিগ্ধ কোমল মধুর দৃষ্টি!

ব্যথিতা নারীর সমুদয় ক্ষুধিত চিত্ত একটি স্নেহ-চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তার তৃষিত অধর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি সে ঘুমের শিশুকে বিছানা হইতে তুলিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

নিদ্রোত্থিত শিশু তার পদ্মপলাশ নয়ন মেলিয়া নির্ব্বাক, বিস্ময় ও আনন্দভরা চোখে সৌদামিনীর স্নেহ-সকরুণ মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। সৌদামিনীর সমুদয় অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সেই স্বপ্নের মাঝে সহসা কার পদ-শব্দ শুনিয়া চকিতার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরিয়া দেখে তার সুন্দরী পুত্রবধূ তার পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে, তার সুন্দর দৃষ্টির উপর অভিমান যেন উছলিয়া পড়িতেছে—সে অভিমানের সঙ্গে একটু হিংসার ছিট মাখানো। তার ছেলেটি লইয়া সৌদামিনীর এত সুখ যেন তার সহ্য হইতেছিল না।

বধূ একটু নিষ্ঠুর পরিহাসের সহিত বলিল, "রক্ষা কর মা ! ইস্ বাপরে বাপ ! রক্ষা কর মা। মায়ের চাইতে যে বেশী ভালবাসে তারে দূর থেকে নমস্কার !"

একটা ভীষণ অলন্ত কামানের গোলা পড়িয়া সৌদামিনীর জীর্ণ হৃদয়-দুর্গ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তার হৃদয়টা যেন গন্ধক ও বারুদের তীব্র ধূমে একেবারে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিল।

সৌদামিনী কিছু বলিল না। শুধু সে তার ইহকালের —চিরকালের বাঞ্ছিত,জীবন্ত,সুন্দর নন্দদুলালটিকে প্রাণপণ স্নেহে তার শুষ্ক বক্ষের ভিতর চাপিয়া ধরিল। একটি চুম্বনের ছলে তার সমুদয় হৃদয় অশ্রুজলে গলাইয়া লইয়া পুষ্পপেলব অধর-পুটে ঢালিয়া দিল।

সৌদামিনী এখন আর উঠান সমুদ্র পাড়ি দিয়া উঠিতে পারে না। আজ তার আশা পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে। বক্ষস্থলে ব্যথার অকূল পাথার-বারিরাশি ধূ ধূ করিতেছে। কূলে বাঁধা আশার তরণী আজ তরঙ্গঘাতে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! তবু তাকে কোন মতে ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সৌদামিনী আজ আবার অনেক দিন পরে তার শৈশবের স্মৃতিমাখা বেতের ঝাঁপিটির ঢাকনি খুলিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল সেই মেছুনী, ভিক্ষুক,ফুলবাবু, নর্ত্তকী, বনমানুষ ! তারা সকলে মিলিয়া সেই সখের সংসারটি তেমনি জমাইয়া রাখিয়াছে ! সৌদামিনীর শৈশবে যেমন ছিল তেমনি—কাল যেন তাদের স্পর্শও করিতে পারে নাই ! সৌদামিনীর সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর যেন তাতে কিছুই ক্ষতি হয় নাই ! খেলা যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে।

ধীরে ধীরে বেতের ঝাঁপির ডালাটি বন্ধ করিয়া সৌদামিনী বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। সে চক্ষু মুদিয়াও দেখিতে লাগিল সিক্ত অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত রক্ত কমলটির মত শিশুর সেই অশ্রুসিক্ত হাসি হাসি মুখখানি !

সারাদিন সৌদামিনী বিছানা হইতে উঠিল না। সন্ধ্যার সময় নীরব গৃহ ধীরে ধীরে ধূসর তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কর্ম্মরত সংসারের কলরব তখন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন সময় কানের কাছে চারিদিকের অন্ধকার সঙ্গীতময় করিয়া কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে ডাকিল— "মা ! আমি জানি ব্যথা তোমার কোথায় ! তবে আমার হাত ধরে চলে এসো মা। যেখানে তোমার নন্দদুলাল বনমালী বাস করেন তোমায় আমি সেখানে নিয়ে যাব।"

সে বিচিত্র সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর মধুর আশ্বাসে ভরা। সৌদামিনীর সারা অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে তার দুই চক্ষু মেলিয়া দিয়া সৌদামিনী দেখিল কোনও ভুল হয় নাই—ঠিক সেই পদ্মপলাশ নয়নদুটি, ফুলের মত সহাস্য তরুণ মুখখানার উপর গোলাপের রক্তিম ছায়া !

তার সেই চির সাধের নন্দদুলাল বনমালী তাঁর লাবণ্য-পুঞ্জে গঠিত অভয় বাহুদুটি তার পানে মেলিয়া দিয়া স্নেহ-মাখা নয়নে তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া,হাসিয়া হাসিয়া ডাকিতেছেন—মা, এসো।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

চাকুরিয়ালোকের দুঃখ

[পুরাতন কাগজপত্র ঘাটিতে ঘাটিতে একদিন হঠাৎ একখানা জীর্ণ তুলট কাগজে বক্ষ্যমান কবিতাটি পাইয়াছি। এই কবিতাটিতে চাকুরিয়া জীবনের দুঃখ-কাহিনী অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাটি কতদিনের রচনা বলা যায় না, তবে যে কাগজে ইহা লিখিত আছে উহার অপর পৃষ্ঠায় "শ্রীহরি" নামের নীচে "সন ১২৫৬" লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটি হয়ত ইহার পূর্ব্বের বা এই সময়েরই রচনা হইবে। তাহা হইলেও অন্ততঃ ৬৪ চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ চাকুরীজিবিগণ তাঁহাদের অবস্থাটা কি রকম মনে করিতেন তাহার একটি সুন্দর চিত্র এই কবিতায় পাওয়া যাইবে। কবির নাম "কবিচন্দ্র রায়" ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ইহাতে লিপিকারের নাম নাই। এই কবিতার বর্ণাশুদ্ধি-গুলি যেমন আছে তেমনই রাখা হইল। কবিতাটি যে ভাবে লেখা হইয়াছে যেরূপ দাড়ি কমার পরিবর্ত্তে বিসর্গের ন্যায় দুইটি পুটলি দ্বারা যতি চিহ্নাদি দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপই দেওয়া গেল।

—শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।]

শোন ২ সভাজন : করি এক নিবেদন :
চাকুরিয়া লোকের যত দুখ :
ছয় দিবশের কালে : বিধাতা ভুলিয়া ভালে :
না লিখিলেক তাহাদের সুখ :
তাহার প্রমাণ শোন : বিস্তারিয়া কহি পুন :
জনম হল বিত্যাহিনের ঘরে :
সিসুকাল হতে লিখে : সেবাগত সিরিস্তা শিখে :
আত্ম বাধে উপকার করে :
অন্য শাস্ত্র আছে জত : তাহাতে হয় রাগ হত :
সদৎ চাকরি করে ধ্যান :।
যে জাহা মনেতে ভাবে : সে তাহা অবস্য পাবে :
মুনি বাক্য পুরান প্রমান :
ছারি নিজ দেশ বাড়ি : করে কত ওমেদোয়ারি :
নানা দেশে দেশে দিগন্তরে :
কোন কোন স্থানে জায় : গতমাত্র জওাব পায় :
বলে কার্য্য নাই এ সরকারে :
তাহা সুনে হয় ক্ষোভ : মুখেতে ন স্বরে রব :
কত দুখ ভাবে মনে মনে :
সেবা পাওা প্রমাদ : সেবক হইতে সাদ :
তাহা না ঘটয়ে কোন খানে :
দুখী হয়ে উঠে যায় : পুন অন্য দ্বারে যায় :
আরোহিয়া আশা মনোরথে :
কোন কালে কোন জোগে : অদৃষ্ট ফলের ভোগে :
কায পাইলে স্বর্গ পায় হাতে :
মনিব সন্তোষ তরে : সতৎ বিনয় করে :
বচন উদগারে যেন মধু :
পর পুরুষের যেন : হরিয়া লইতে মন :
সদা ভাবে তোশে কুলবধু :
সদা সচকিত থাকে : জওাব করে এক ডাকে :
করে কার্য্য হুকুমানুসারে :
হুকুমমাত্র হয় খাড়া : কুকুর হতে দৌরে তারা:
মনিবের কায্য সাধিবারে :
যেখানে আদেশ পায় : সেখানে চলিয়া জায় :
কালা-কাল কিছু না বিচারে :
কিবা দিবা সর্ব্বরি : রৌদ্র বৃষ্টী আদি করি :
কিবা ঘোরতর অন্দকারে :
কখন বা সত্য কয় : কভু মিথ্যা কথা কয় :
পাপ পুর্ণ (পুণ্য) কিছু না বিচারে :
সন্দা পুজা না করি : খেইয়ে জল তারাতারি :
সদা থাকা থাকেন দরবারে :
যদি প্রভুর আজ্ঞা হয় : সুজনেরে কটু কয় :
হৃদয়ে না ভাবে কোন বেথা :

যেমন সিফাই লোক ঃ কিঞ্চীৎ না করে শোক ঃ
হুকুমে কাটয়ে বাপের মাথা ঃ
চাকুরিয়া লোকের রিতি ঃ জত সব বিপরিত ঃ
বিষয় হইলে ধরে ভুতে ঃ
নাহি লাজ ভয় ভিক ঃ এমন বিষয় ধিক ঃ
বাপের নিকাশ করে সুতে ঃ
বিদেশেতে জনম কাটে ঃ বারি জাওয়া নাহি ঘটে ঃ
না দেখে আপন সুতদারা ঃ
দৈবে যদি কোন দিনে ঃ বাড়ি ঘর পড়ে মনে ঃ
তবে ভাবে কে কোন আকার ঃ
অনুমান বুঝি হেন ঃ ফাটকে আটক জেন ঃ
বন্দি আর থাকে বাড় মায ঃ
তেমতি চাকুরিয়া লোকে ঃ সদা কাল বন্দি থাকে ঃ
বলে রাজ কাজ অনুফায ঃ
সদেশে চাকুরিয়া জারা ঃ কিছু সুখ করে তারা ঃ
বাড়ি জায় দুই তিন মাসে ঃ
দেখি-দারা-সুত-মুখ ঃ দুরে জায় সব দুঃখ ঃ
মাফিক করার পুন আইশে ঃ
যারা অতি সন্নিকটে ঃ তারা অতি ভাল বটে ঃ
নিত্য খেইতে সুতে বাড়ি জায় ঃ
গতমাত্র সর্ব্বকাজ ঃ তৈয়ার পুজার শায ঃ
নিত্য ২ রান্না ভাত খায় ঃ
দুরদেশী প্রবাশি ঃ সকল দোশের দুশী ঃ
সকল হতে বেশী দুখ পায় ঃ
বারমাশ থাকে পরো ঃ ব্যম হৈয়ে জায় মৈজে ঃ
তত্রচ বিদায় নহে পায় ঃ
কেহ করে অভিমান ঃ পুন বিদায় নাহি চান ঃ
কেহ কহে অন্যের দ্বারায় ঃ
কেহ বা কাহেল হৈয়া ঃ বিস্তর প্রকারে কৈয়া ঃ
নৌকাযোগে দেশে চলি জায় ঃ
বাড়ি গেলে রোগী দেখি ঃ পিতামাতা হয় দুখী ঃ
রমনির হরিশে বিশাদ ঃ

সেবা করে নিদ্রাভয় ঃ মনে ২ কত কয় ঃ
এ বালাই বিষম প্রমাদ ঃ
সুস্থ হলে পরবাস ঃ পৈরে থাকে বার মাস ঃ
কাহিল হইলে আইসে বাড়ি ঃ
সুখের প্রসঙ্গ কিবা ঃ দুখে ভাবি রাত্র দিবা
পতি বর্ত্তমানে জেন রাড়ী ঃ
পুত্রকন্যা হবে ছাই ঃ আসলেতে দেখা নাই
ফুরাইছে বিবাহের দায় ঃ
মনাগুন কেবা জানে ঃ কারে কব কেবা সুনে
মনাগুণে মন জলে জায় ঃ
বরঞ্চ কাঙ্গাল যারা ঃ কিবা পসু পক্ষিপারা ঃ
জদি নিজ পতি থাকে শাতে ঃ
বিধাতা তোমাকে কই ঃ আর জদি নারী হই ঃ
না পরি যেন চাকুরিয়ার হাতেঃ
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জত ঃ ব্যবহার শাস্ত্র মত ঃ
শাস্ত্র ছারা নাহি কোন কাম ঃ
এই এক দোশের দোসি ঃ সেই গুণ রাশি রাশী ঃ
তাহাদের উর্দ্দেসে প্রণাম ঃ
দুর দেশে নাহি জান ঃ জদি নিমন্ত্রন পান ঃ
তবে জান নিকটা নিকটে ঃ
দৈবে যদি জান দুরে ঃ মাশ মধ্যে পুনঃ ফিরে
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাল বটে ঃ
পষ্ট হয়ে কৈতে নারে ঃ মনে মনে চিন্তা করে
ভার হৈয়ে অধমুখে রয় ঃ
কিবা নিশী দিসি কালে ঃ খামিরে বিরলে পেলে ঃ
কত কথা বুঝাইয়া কয় ঃ
এবার সারিলে প্রভু ঃ বিদেশে না জাইয় কভু ঃ
সেবা দেশে কিবা নিধি পাও ঃ
জাতায়াতে পথে ঘাটে ঃ কবে কি প্রমাদ ঘটে ঃ
কি কারণে আমারে জালাও ঃ
এদেশেতে রাজা আছে ঃ আপনি তাহার কাছে ঃ
গতমাত্র দিবেন বিষয় ঃ

অন্ন লভ্য হৈলে দেশে : তাহাতে জুরিয়া আইশে :
বিদেশের সর্ব্ব কিছু নয় :
জা জুরিবা তাই খাইবে : মাসে মাসে দেখা পাবে :
রাখ প্রভু আমার মন্ত্রনা :
তথাচ না সুনে স্বামি : পুন দুরদেশে গামি :
হৈয়া ভোলে যতেক মন্ত্রনা :
কৃশানেরা হাল বায় : খুদা হৈলে বাড়ি যায় :
রমণি জোগায় অর্দ্ধজল :
সুতে বৈসে সঙ্গে খায় : কত বা আনন্দ পায় :
ভুলে যায় শে দুঃখ সকল :
ধিবরে ধরে জে মিন : জলে থাকে শারাদিন :
শন্ধাকালে নিজ গ্রহে জায় :
দেখী দারাসুত মুখ : দুরে জায় সব দুখ :
সুখভোগে রজনি গোয়ায় :
আর দেখ জোলা তাতি : সারা রাইত জেইলে বাতি :
গ্রহে বশি সদা তাত বোনে :
না'হ জানে পরবাশ : ঘরে থাকে বাড় মাশ :
সুতদারা সদা দেখে সুনে :
এমত প্রমাদ জত : বিস্তারিয়া কব কত:
কবিতা অনেক বেড়ে জায় :
পরিজনগন লাগি : এসকল সুখভোগী :
কহিলেক কবি চন্দ্র রায় :

ইতি—

আলোচনা

বর্ত্তমান সনের আষাঢ় সংখ্যা প্রতিভায় আমার সংগৃহীত ভাটিয়াল গান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার কর মহাশয় কৃত আলোচনা পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

গত বৈশাখ মাসের প্রতিভায় প্রকাশিত একটি ভাটিয়াল গানে "সানাল" শব্দটি আছে। উক্ত শব্দের আলোচনা করিতে গিয়া হরেন্দ্র বাবু "সানাল ফকির" সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঐ শব্দের "ঈশ্বর" অর্থ আমি নিজে করি নাই, যাহার নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছি সেই মাঝিই এই অর্থ করিয়াছে।

হরেন্দ্র বাবু এক যায়গায় লিখিয়াছেন যে, আমি নিজে দুইটি গান একত্র করিয়া একটি গান করিয়াছি এবং অর্থ সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য উহার একটি পংক্তিতে "চোর" স্থলে "চোট" লিখিয়াছি। ইহা হরেন্দ্র বাবুর কল্পনা—আমি গানের একটি শব্দও নিজে বদলাই নাই, যে মাঝি আমাকে গান দিয়াছে তাহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি ঠিক সেইরূপই লিখিয়াছি। আমার শুনিতেও ভুল নাই, কারণ "চোট" শব্দটি আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছি। সুতরাং "চোট" শব্দ রাখিয়া গানের যেরূপ অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। তবে আমার কৃত অর্থই যে, সকলেই অনুমোদন করিবেন ইহা আমি কখনও মনে করিতে পারি না। দুইটি গান যোড়া দেওয়ার অপরাধও (জানি না এ অপরাধ সত্য কি না) আমার নহে। এই সব বিষয়ে কথিত মাঝিটিও নির্দ্দোষ হইতে পারে; কারণ মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার সময় এই সকল গানের পাঠে কাহাদ্বারা কত রকম পরিবর্ত্তন হয় কে বলিতে পারে? আমার নিবেদন এই যে আমি নিজে কোন গানের পরিবর্ত্তন করি না, কারণ ওরূপ করা আমি অন্যায় মনে করি।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।

বাঙ্গলা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বপ্নবিলাসের পরবর্ত্তী গ্রন্থ দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের কবিত্ব-স্রোত অব্যাহত আছে কিন্তু এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বপ্নবিলাসের মত ঘটনা অথবা কল্পনা বৈচিত্র্যহীন। স্বপ্নবিলাসে যেই সমস্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে দিব্যোন্মাদেও সেই সমস্তের কথাই আবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। গল্পাংশটি প্রায় একই রকমের। সেই স্বপ্ন দেখিয়া যশোদার কৃষ্ণের জন্য দুঃখ, সেই রাধার বিরহের বর্ণনা এবং অবশেষে কৃষ্ণের সহিত মিলনে গ্রন্থের সমাপ্তি। বাস্তবিক স্বপ্নবিলাসের সাফল্যে ঠিক তাহারই অনুকরণে আর একখানি গ্রন্থ রচনা দেখিয়া কবির নাটকীয় প্রতিভা যে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। গল্পে বৈচিত্র্য অবতারণা করিবার ইচ্ছা এবং বোধ হয় ক্ষমতাও কৃষ্ণকমলে ছিল না। তাহার ছিল একখানা অশ্রুময় বৈষ্ণব হৃদয়, একখানা বিষাদরাগিণীপূর্ণ বীণা। তিনি শত মুখে তাহাদ্বারা সেই অনন্ত প্রেম বিরহের কাহিনীই গাহিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার কবিত্বের চরম অভিব্যক্তি, তাহাতেই তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। দিব্যোন্মাদে স্বপ্নবিলাসের হাস্যজনক অনুকরণ দেখিয়া কবিকে বটতলায় বসাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু স্বপ্নবিলাসেই যেই বিষয় গাহিয়া গাহিয়া নিঃশেষিত করিয়াছেন, একটু বিশ্রামান্তে সেই বিষয়েই আবার এত নূতন সুর লাগাইতে দেখিয়া এত নূতন কথা কহিতে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। অন্তর্নিহিত সলিলের চাপে যেমন পার্ব্বত্য উৎস নব নব ধারায় উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে থাকে, বিরহিনী রাধার অনন্ত দুঃখ-কাহিনীও কৃষ্ণকমলের কবিত্ব-উৎসকে তেমনি অশেষ ধারায় রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রের বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার বৈকুণ্ঠকে বলিতেছে—"আপনার এই আশ্রমটিতে এলে......... মনে হয় যেন কেবল এক যোড়া হৃৎপিণ্ডের উপরে একখানি মুণ্ড নিয়ে বসে আছি।" কিন্তু শুধু এক যোড়া হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে একটি মুণ্ডের সংযোগ কৃষ্ণকমলের কাব্যাবলিতে যেমন দেখা যায় অন্য কোথাও এমন নহে। শুধু একটি অনন্ত বেদনাবাহী হৃদয় অনন্ত বিরহগীতি গাহিয়া চলিয়াছে, হস্তপদাদি অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গের উৎপাত অনুপস্থিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দিব্যোন্মাদের গল্পাংশে আর স্বপ্নবিলাসের গল্পাংশে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। প্রথম দৃশ্যে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়া সখিগণের নিকট বিলাপ করিতেছেন, সখিগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি রাখালগণ কৃষ্ণবিরহে তাহাদের দুঃখ-কাহিনী কহিতে কহিতে ব্রজ পথ দিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে শ্রীরাধা বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট, সখিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কৃষ্ণস্মৃতির চর্চ্চা করিতেছে। একজন সখি প্রস্তাব করিল যে, শ্যাম যে এভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। একবার কুঞ্জে কুঞ্জে তাহার খোঁজ করিয়া দেখা উচিত। বিরহিনী রাধার কথাটি মনে লাগিল, সে শ্যাম অন্বেষণে বাহির হইল, সখীগণ তাঁহার পাছে পাছে চলিল। চতুর্থ দৃশ্যে রাধা কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনের আবেগে সে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিতেছে—সখিগণ তাঁহার সহিত হাটিয়া পারিতেছে না। সখিগণ তাই রাধাকে একটু ধীরে চলিতে অনুরোধ করিয়া বলিল রাস্তায় কণ্টক ভুজঙ্গ ইত্যাদি আছে, একটু ধীরে চলাই উচিত। আর দ্রুত চলিলেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে? রাধা তাহার

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত—২৬শে শ্রাবণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

উত্তরে দীর্ঘকাল সাধনাদ্বারা কিরূপে সে ভুজঙ্গবঙ্কিম পিচ্ছিল পথে চলিতে অভ্যাস করিয়াছে তাহার বিবরণ সখিগণকে বলিতে লাগিল। অতঃপর বংশীবটের নিকট কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া কদম্ব কাননে যাইয়া প্রবেশ করিল। পঞ্চম দৃশ্যে কদম্ব কাননে রাধার পূর্ব্বসুখস্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—সে অশ্রুময় নেত্রে গদগদ ভাবে সখিগণকে পূর্ব্বকথা সকল বলিতেছে। ষষ্ঠ দৃশ্যে রাধা সখিগণকে সঙ্গে লইয়া নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ব্ব স্মৃতির চর্চ্চা করিতেছে। সহসা সারসের রব শুনিয়া রাধার কৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলিয়া ভ্রম হইল এবং সে শ্যাম অন্বেষণে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। যাইতে যাইতে সম্মুখে মেঘ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল অবশেষে কৃষ্ণ মেঘকে সম্বোধন করিয়া কতই গদ্‌গদ বাণী বলিতে লাগিল। মেঘ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল তাহা দেখিয়া অসীম দুঃখে রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সখিগণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল কিন্তু কৃষ্ণকে না দেখিয়া রাধা আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। প্রিয় সখীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সখিগণও মনোদুঃখে চৈতন্য হারাইল। এমন সময় চন্দ্রাবলী সেই কুঞ্জে আসিয়া রাধা ও সখিগণের দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সখিগণের ধীরে ধীরে চৈতন্য হইল, সকলে মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিল যে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে হইবে এবং চৈতন্য পাইয়া কৃষ্ণকে দেখিতে চাহিলে কৃষ্ণের চিত্রপট দেখাইতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে চেতনা পাইয়া রাধিকা স্খলিত বচনে কতই কথা বলিতে লাগিল এবং কৃষ্ণ-ভ্রমে চিত্রপট আলিঙ্গন করিয়া ভ্রম বুঝিয়া অসীম দুঃখে নিমগ্ন হইল। চন্দ্রাবলী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে সে মথুরা যাইয়া কৃষ্ণকে লইয়া আসিবে। তাহা শুনিয়া রাধা আনন্দিতা হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রা প্রস্থান করিল, কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ রাধিকার নিকট যে দাসখৎ দিয়াছিলেন তাহা চাহিয়া লইল। অভিপ্রায়, কৃষ্ণ অমনি না আসিলে দাসখৎ দেখাইয়া আপন জোরে কৃষ্ণকে বাঁধিয়া নিয়া আসিবে। রাধিকা চন্দ্রাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে কৃষ্ণকে যেন বেশী অপ্রিয় কথা বলা না হয়। সপ্তম দৃশ্যে চন্দ্রা মথুরার রাজপথ দিয়া চলিয়াছে। মথুরার নাগরিকাগণ কলসী-কক্ষে জল আনিতে চলিয়াছে। চন্দ্রার রূপ দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। চন্দ্রা বলিল যে রাজ-দর্শনে যাইবে। নাগরিকাগণ তাহাকে বলিল যে সিংহ দ্বারে শত শত প্রহরী পাহারা, সম্মুখ দ্বার দিয়া সে যাইতে পারিবে না। পেছন দ্বারা দিয়া অনেক দাস দাসী যাতায়াত করে তাহাদের সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলে অনায়াসে তাহার রাজ-দর্শন হইতে পারে। অষ্টম দৃশ্যে চন্দ্রা মথুরা-রাজ-বাটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। একটি মণিপর্য্যঙ্কযুক্ত কক্ষে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রা নেপথ্যে থাকিয়া জয় রাধে শ্রীরাধে উচ্চারণ করিয়া উঠিল। সহসা অনেক দিন পরে রাধার নাম শুনিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি নানা বিলাপ করিয়া অবসন্ন ভাবে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রা বুঝিল যে কৃষ্ণ রাধাকে ভুলে নাই তখন সে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ প্রথম চন্দ্রাকে চিনিতেই পারিলেন না এবং চন্দ্রা সেই সুযোগে কৃষ্ণকে মিঠে কড়া বেশ দুকথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে চিনা পরিচয় হইয়া গেলে চন্দ্রা কৃষ্ণ-বিরহে বৃন্দাবনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অবিলম্বে বৃন্দাবনে যাইবেন প্রতিজ্ঞা করিলে চন্দ্রা বিদায় গ্রহণ করিল। ৯ম দৃশ্যে রাধা কৃষ্ণের নিকুঞ্জ কাননে মিলনে নাটক শেষ হইয়াছে।

চৈতন্যের আদর্শ

দিব্যোন্মাদ নামে রাধিকার প্রেমোন্মাদের বর্ণনা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নবদ্বীপের সেই প্রেমিক পাগলের প্রেম উন্মত্ততার একখানি মধুর চিত্র। দিব্যোন্মাদের গৌরচন্দ্রে তাহার পরিচয় আছে।

যথা—

তিন ভাব মনে করি স্বাদিতে নিজ মাধুরী
রাধার স্বরূপ ধরি নবদ্বীপে অবতরি,
নিজ ভাব পরিহরি নাম ধরি গৌরহরি,
হরির বিরহে হরি কাঁদে ব'লে হরি হরি।
"দুটি চক্ষে" ধারা বহে অনিবার দুঃখে বলে বার বার,
স্বরূপ দেখাবে একবার নতুবা প্রাণে মরি।
ক্ষণে গোরাচাঁদ হয়ে দিব্যোন্মাদ
উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ
ধরতে যায় করে দৈন্য॥

চৈতন্যের আশ্চর্য্যজনক প্রেম ভক্তির আদর্শ না পাইলে কৃষ্ণকমল তাহার প্রেমবিহ্বল রাধিকার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

নাটকের প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় জানান হইয়াছে যে, যে অবধি নন্দ গোবিন্দকে মধুপুরে রাখিয়া আসিল সে অবধি ব্রজধামের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই। যশোদা ক্ষীর-নব-নীতহস্তে বসিয়া থাকেন আর "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করেন। অবিরত নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। একদিন স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিয়া জাগিয়া আর তাহাকে পাইলেন না। তখন তাহার শোক-সাগর উথলিয়া উঠিল।

প্রথম দৃশ্যে যশোদা সখিগণের নিকট তাহার দুঃখ কাহিনী বলিতেছেন। স্বপ্নবিলাসেও তিনি স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া নন্দকে নিজের দুঃখ কাহিনী বলিয়াছিলেন। কাজেই দিব্যোন্মাদের এই প্রথম দৃশ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কৃষ্ণকমলের অনুপ্রাস-প্রিয়তা প্রথম লাইন হইতেই দেখা দিয়াছে।

স্বপ্নবিলাসের সহিত তুলনা

ওরেরে দারুণ বিধি, তোর এ দারুণ বিধি
বিধি হয়ে অবিধি করিলি,
কেন দত্তাপহারী হলি।
ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি
কৃপা করি দিলি হেন নিধি
দিয়ে দুঃখ নিরবধি দুঃখিনীরে বধি
কি বাদ সাধি নিধি হরে নিলি।

এইখানে 'ধ' এর অনুপ্রাস মোটেই কর্ণকটু হয় নাই। তবু আধুনিক রুচিকে গ্রন্থারম্ভেই এই অনুপ্রাস একটু পীড়া দেয়।

স্বপ্নবিলাসের প্রথম দৃশ্যেই দুঃখিনী যশোদাকে কৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্ট রাখাল গণ আসিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল। এখানে দ্বিতীয় দৃশ্যে রাখাল গণকে উপস্থিত করান হইয়াছে — বক্তব্য একই। সুবল কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সেই বিবরণ রাখালগণকে বলিতেছে—রাখালগণ কৃষ্ণ-বিরহে নিজ নিজ হৃদয়-বেদনা বর্ণনা করিতেছে।

তৃতীয় দৃশ্যের পূর্ব্বে একটু ভূমিকা আছে। একদিন প্রভাতে উঠিয়া রাধা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, সখিগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সখিগণ ও রাধিকার কথোপকথনই তৃতীয় দৃশ্য। সখিগণের জিজ্ঞাসায় রাধিকার দুঃখ-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহ-বর্ণনায় কৃষ্ণকমলের তুলনা নাই। রাধা ও কৃষ্ণ ভারত-বর্ষে সর্ব্ব যুগে প্রেমিক-প্রেমিকা গণের প্রতিনিধি। অনন্ত জন-প্রবাহের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের অভাবনীয় বৈচিত্র্যময় প্রেম-বিরহ হইতে তিল তিল মধু লইয়া ভারতের এই দুইটি কমনীয় তিলোত্তম ও তিলোত্তমা যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে যন্ত্র বাঁধিয়া তান ধরিবা মাত্র তাহাতে নূতন রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তোলার ক্ষমতা বীণাপাণির বিশেষ অনুগ্রহের দান। তৃতীয় দৃশ্যে রাধার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা আরম্ভ হইবা-মাত্র আসর জমিয়া গেল—যে সকল শ্রোতা উঠিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহারা আবার ঠিক হইয়া বসিলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে শ্যাম অন্বেষণ করিতে রাধা কাননে প্রবেশ করিয়াছেন—মনের আবেগে দ্রুত চলিয়াছেন, সখিগণ কণ্টক ভুজঙ্গের ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু

প্রেমোন্মাদিনীর কি কণ্টক ভুজঙ্গের ভয় আছে! তিনি প্রেম-সাধনায় যে সমস্ত জয় করিয়াছেন। প্রবল বাত্যায় পতিত তরণীর আরোহী যেমন প্রথম তরঙ্গাভিঘাতেই বিপদের পরিমাণ বুঝিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিয়া বসে, যেমনি প্রেম-প্রবাহে ভাসমান জীবন-তরণীতে আসিয়া প্রথম অনুরাগের তরঙ্গ আঘাত করিল তখনই রাধা বুঝিতে পারিল যে জীবনের মহা সাধনা—জনমের মহা সার্থকতা তাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে. তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাধা বলিতেছেন—

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছের কাজে।
(যা যা করতে হবে গো, আমার বঁধুর লাগি,)
প্রেম করে রাখালের সনে ফিরতে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক মাঝে
(সখি আমার যেতে যে হবে গো,
রাই বলে বাজিলে বাঁশী)—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতেম।
(সখি আমার চলতে যে হবে গো
বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইলে আঁধার রাতি পথমাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম
(সদা আমার ফিরতে যে হবে গো
কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন বনে
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলেম কত
(কত যতন করে গো—ভুজঙ্গ দমন লাগি)
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে ক'ব কত,
হতবিধি সব কৈল হত।

পঞ্চম দৃশ্যে রাধা কদম্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছেন—যেই কদম্বমূলে কানু বসিয়া বেণুর তানে ব্রজ পাগল করিতেন তাহা দেখিয়া রাধার কত পূর্ব্ব কথাই মনে পড়িতেছে! কদম্ব-মূলে বাঁশী সময়ে অসময়ে বাজিয়া উঠিত আর তড়িৎ প্রাবাহে তড়িৎ শলাকার মত বৃন্দাবনের তরুণী হৃদয় সমূহ চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহারা পথ বিপথ না জানিয়া মুরলীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিত। এই কাননেই একদিন এমন একটি আনন্দময় ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার স্মৃতি রাধার নিকট কৃপণের সঞ্চিত ধনের ন্যায় প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। চম্পকবরণী রাধার ধ্যানে তন্ময় কৃষ্ণ একদিন চম্পকফুল দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া "কোথা রাধা" বলিয়া অচৈতন্য হইয়া এই কাননেই পড়িয়াছিলেন। সুবল শ্রীদাম ইত্যাদি সঙ্গীগণ যখন প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না তখন তাহারা গোপনে যাইয়া গৃহকার্য্যরতা রাধিকাকে সংবাদ দিল। প্রিয়তম তাহারই নাম লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন শুনিয়া রাধা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কি করা যায়, না যাইলেই যে নয়। তখন—

আপন ভূষণ দিয়ে সুবলকে রাই সাজাইয়ে
এলাম আমি সুবল সাজিয়ে।
(ধরাচূড়া পরে গো সুবলের,
বৎস কোলে লয়ে গো কাঁচলি ঢেকে)
দেখে নীলগিরি ধূলায় পড়ে অমি তুলে নিলেন ধূলা ঝেড়ে
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার উপরি
(কত যতন করে গো)
আমার পরশে চেতন পেয়ে বলে আমার মুখ চেয়ে
কোথায় আমার পরাণ কিশোরী
(সুবল বল্ বল্‌রে, কেঁদে কেঁদে বলে)
বল্‌লেম——আমিই তোমার সেই দাসী
(নাথ আমায় বুঝি চিন নাই হে)
অমনি হৃদয়ে ধরিল হাসি
(বঁধু কতই বা সুখে)

এই সুখ-কাহিনী বলিতে বলিতে রাধার নয়ন যে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা আমরা অনায়াসে

অনুমান করিয়া নিতে পারি—কারণ যাহারা শুনিতেছেন তাহাদেরও নয়ন শুষ্ক থাকে না। বস্তুতঃ যেখানে কৃষ্ণকমলের প্রতিভার প্রকৃত উদ্দীপনা হইয়াছে সেখানে সমালোচনা স্তম্ভিত হইয়া যায়, লেখনী অবশ হইয়া আইসে, অপূর্ব্ব আনন্দরসে হৃদয় কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়া আলোচককে কৃতার্থ করিয়া দেয়।

ষষ্ঠ দৃশ্যে নিকুঞ্জকাননে রাধা তখনও অতীত স্বপ্নস্বর্গে বিচরণ করিতেছেন। নিভৃত নিকুঞ্জে শ্যামের স্মৃতিবিজড়িত শত চিহ্নাদি দেখিয়া ক্ষুব্ধ সিন্ধুর মত রাধার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি, যেখানে শ্যাম মোহন ভঙ্গিতে চরণ ফেলিয়া বসিতেন সেই স্থান সখিগণকে দেখাইয়া দিতেছেন। তখন কি গৌরবের দিন ছিল, শ্যাম-সোহাগে সোহাগিনী রাই তখন জগতে আপনাকে সকলের চেয়ে সুখী মনে করিত। কুঞ্জভবনে বসিয়া শ্যাম প্রিয়তমারে অঙ্গে বসাইতেন গজদন্তের চিরুণী দিয়া রাধার চুল আঁচড়াইয়া দিতেন কত আদরে বেণী বানাইয়া কবরী বাঁধিয়া তাহাতে মালতীর মালা জড়াইয়া দিতেন এবং অবশেষে সেই বিধুবদনের দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতেন—অবিরত নয়ন জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত! সেই গৌরবের—সেই তীব্র অনুভূতির দিন চলিয়া গিয়াছে—রহিয়াছে কেবল স্মৃতি—যাহা লৌহ-যন্ত্রের মত তীব্র পেষণে হৃদয়-রক্ত ঝলকে ঝলকে অশ্রুরূপে নয়ন দিয়া বাহির করে।

পরবর্ত্তী অংশের বর্ণনাও সুন্দর। সহসা সারঙ্গের ধ্বনি শুনিয়া রাধার ভ্রম হইল যে কৃষ্ণের বাঁশী বুঝি আবার বাজিতেছে। ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া গমনোন্মুখ হইয়া সম্মুখে কৃষ্ণমেঘ দেখিয়া রাধার কৃষ্ণভ্রম হইল—তাহার পরেই সেই বিখ্যাত গান।

কি ভাবিয়ে মনে দাঁড়ায়ে ওখানে, এসহে
একবার নিকুঞ্জ কাননে কর পদার্পণ।

গানটি কৃষ্ণকমলের সঙ্গীতাবলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, ভাবে ভাষায় অপূর্ব্ব। রাধার আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যথা ইহার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল—রাধা বিহ্বল হইয়া তাহাকে কত কথাই বলিল—মেঘ থামিল না। রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণকমলের কবিত্বের চরম অভিব্যক্তিও এই খানে শেষ হইল। তাহার পরে সখিগণের মূর্চ্ছা, চন্দ্রাবলীর আগমন, রাধিকার চৈতন্যসঞ্চার, চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ আনিতে মথুরায় গমন—রাধাকৃষ্ণের মিলন ইত্যাদিতে কৃষ্ণকমলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বড় বেশী নাই।

স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদ কৃষ্ণকমলের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাহার নিজের ভাষায় তিনি "নিজ তৃষা ঘুচাইতে" কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে শুধু তাহারই যে তৃষ্ণা ঘুচিয়াছে তাহা নহে, তিনি তাহার এই দুই গ্রন্থে যে ভক্তি-অমৃত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা শত শত তাপিত হৃদয়ের তাপ ঘুচাইয়াছে এবং ভক্তি-নত-হৃদয় বঙ্গবাসী চিরদিন এই দুই পাত্র হইতে—"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি."

বিচিত্রবিলাস

কৃষ্ণকমলের শেষ রচনা বিচিত্রবিলাস তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। এই গ্রন্থখানাতে গীতের ভাব হইতে নাটকীয় ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণকমলের নাটকীয় প্রতিভা বিশেষ ছিল না, আর গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ও রাধাকৃষ্ণের বিলাস ও মিলন—তাই গ্রন্থ কোথাও আঁট বাঁধে নাই। কেবল চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে প্রসাধনরতা রাধা বেণুর ধ্বনি শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই আলুথালু ভাবে দৌড়িয়া শ্যামকে দেখিবার জন্য ছাদে যাইয়া উঠিয়াছেন এবং অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতার ন্যায় ললিতার স্কন্ধে ভর করিয়া শ্যামকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু অবিরত নেত্রজলে কিছুই দেখিতে পারিতেছেন না আর সখিগণ তাঁহাকে শাসাইতেছে—

তোরে নিয়ে মোদের হল একি বিষম দায়।
না দেখিলে মরবি, দেখলেও এমন করবি,
তবে কিসে জীবন ধরবি, না দেখি উপায়!

সেইখানে প্রেম-পাগলিনী রাধার মূর্ত্তি পলকে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া নেয়। এর পরে বিচিত্র-বিলাসে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

কৃষ্ণকমলের দ্বারা পুষ্টীকৃত দৃশ্যকাব্যের স্রোত নানা নব নব রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষ গীতাভিনয় নাম ধারণ করিয়া এখন বিরাজ করিতেছে। আমরা পরে তাহার ক্রম বিকাশ আলোচনা করিব।

বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব।

কৃষ্ণকমল যখন উন্মাদিনী রাধিকার বিরহ-গাথা গাহিয়া পূর্ব্ববঙ্গ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় নাটকের জন্মসূচক আবহাওয়া বহিতেছিল, এবং "কলিরাজার যাত্রা নাটক" "বিদ্যাসুন্দর নাটক" ইত্যাদি দুই একটি হ্রস্বজীবী ফুল কচিৎ প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় নাটুকে রামনারায়ণ সংস্কৃত নাটকের আসর ভাঙ্গিয়া নামাবলিতে সংস্কৃতের পুষ্পসার মাখাইয়া কুলীনকুল-সর্ব্বস্বহাতে আসিয়া বাঙ্গাল দৃশ্যকাব্যের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের মধ্যযুগ বা দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

শঙ্কট-তরাণীর ব্রত

ত্রিপুরাজেলায় শঙ্কট-তরাণীর ব্রত প্রচলিত আছে। কোনও শঙ্কট হইতে উদ্ধার হওয়ার জন্য বঙ্গগৃহের কুললক্ষ্মীগণ এই ব্রত মানস করিয়া থাকে। এবং শঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। তিনজন, পাঁচজন কি দশজন ব্রতিনী মিলিয়া বৃহস্পতিবারে কিংবা রবিবারে শঙ্কট-তরাণীর ব্রত করিয়া থাকে। দুপুর বেলায় উন্মুক্ত অঙ্গনে পুরোহিত শঙ্কট তরাণী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন*। এই ব্রতের প্রধান উপকরণ খোলা পিঠা§। এক এক ব্রতিনীর জন্য তিনটি করিয়া খোলা পিঠা একটি কলার ডিগ-পাতে সাজাইয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়‡। এবং পূজার অন্তে ব্রতিনীগণ সেই দিন মাত্র পিঠা খাইয়া কাটাইয়া দেয়।

ব্রতের কথা।

(১)

এক ধনী সওদাগর। তার সন্তান হয় না। পরে শঙ্কটতরাণীর ব্রত করিয়া সওদাগরের স্ত্রী একটি মেয়ে প্রসব করিল। মেয়ে হওয়ার পরই সওদাগর বাণিজ্যে গেল। বাণিজ্যে গেলে বার বৎসর আর্ দেশে ফিরতে নাই। এই বার বৎসর মেয়ে আবিয়াতা (১) রহিল। সওদাগর বার বৎসর পরে দেশে আসিল। মা মেয়েকে বলিল, "তুই কার্ (অ) (২) উঠ্যা থাক্, অতবড় মাইয়া আবিয়াতা দেখ্‌লে রাগ্ অইব।" মেয়ে তাহাই করিল।

---

* ভুজৈশ্চ দশাভির্যুক্তাং লোচন ত্রিতয়ান্বিতাং।
বালার্কমণ্ডলোপেতাং বরপদ্মগদাধরাং।
ত্রিশূলডমরুচাপ-খড়্গা-চর্ম্ম-বিভূষিতাং॥

§ জল ছাড়া সিদ্ধ চাউল আঠা আঠা করিয়া বাটিয়া তরলভাবে জলের সহিত মিশাইয়া মিষ্টি না দিয়া মাটির হাঁড়িতে রমণীগণ এক প্রকার পিঠা প্রস্তুত করে। অন্য নাম চিতৈ পিঠা।

‡ যে কলাপাত এখনও সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইয়া বিস্তৃত হয় নাই৭

(১) অবিবাহিতা।

(২) চালের নীচে জিনিষপত্র রাখার জন্য বাঁশের বা তক্তার পাটাতন।

সওদাগর খেতে বসিয়াছে, মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। সওদাগরের সঙ্গে সওদাগর-পত্নী কেবল কথাই বলিতেছে,আলোটি প্রায় নিব নিব হইয়াছে। তখন মেয়েটি 'কার' হইতে এক টুকরা লাকড়ি দিয়া প্রদীপের শালিতাটি (৩) বাড়াইয়া দিল। সওদাগর মাত্র মেয়ের হাতটি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?" প্রথমটা পত্নী চাপিয়া গেল। সওদাগরের মনে নানা সন্দেহ হইল, সওদাগর রাগিয়া উঠিল। সওদাগরের রাগ দেখিয়া পত্নী অবশেষে সকল কথা খুলিয়া বলিল। কন্যাটিও 'কার' হইতে নামিয়া আসিল।

সওদাগর এত বড় মেয়ে দেখিয়া বলিল, "কি আমার মাইয়া অত বড় অইয়া রইছে! কা'ল সকালে প্রথম যার মুখ দেখি তার কাছেই এই মাইয়া বিয়া দিমু।" এই অস্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সওদার-পত্নী ও সওদাগর-কন্যা উভয়েই অন্তরের সহিত শঙ্কটতরাণীকে ডাকিতে লাগিল। এই বার বৎসর কিন্তু শঙ্কটতরাণীর কথা কাহারও মনে ছিল না। বিপদে পড়িয়া সমস্ত দেবভক্তি আজ জীবন্ত ও সজাগ হইয়া উঠিল। দুইজনেই প্রাণের সমস্ত একাগ্রতা দিয়া দেবীকে ডাকিতে লাগিল ও তাঁহার ব্রত করিল।

আর এক দেশের এক সওদাগর পুত্র হরিণ শিকারে এই সওদাগরের দেশে আসিয়াছিল। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সওদাগর-পুত্র সমস্ত লোকজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও দিশাহারা হইয়া মাত্র দুইজন লোক সঙ্গে রাত্রে সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। তাহার বৈঠকখানায় আসিয়া ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া সওদাগর-পত্নী একজন দাসী পাঠাইয়া দিলেন। দাসী সকল কথা শুনিয়া আসিয়া সওদাগরের স্ত্রী-নিকট বলিল।

সওদাগর-পত্নী শুনিল ভোর না হইতেই সওদাগর-পুত্র নিজদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন তিনি দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ইহাতে তাহাদের আপত্তি নাই কিন্তু তিনি যত সকালেই যান অবশ্য বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

তখনও ভোর হয় নাই। কাকগুলি তখনও ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, মাত্র বিবিধ পক্ষীর মধুর কলরব গ্রামান্তের বৃক্ষ-কুঞ্জ হইতে আকাশে ভাসিয়া আসিয়া সুপ্ত নর-নারীর ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সওদাগর-পুত্র আসিয়া বাড়ীর কর্ত্তা সওদাগরকে ডাকিতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া প্রথমেই কর্ত্তা এক সওদাগর-পুত্রের মুখ দেখিলেন। তখন সওদাগর তাহাকে বলিলেন,"তুমি এখন যাইতে পারিবে না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সকাল হইল। সওদাগর হাত মুখ ধুইয়া বৈঠক-খানায় আসিয়া বসিলেন এবং সওদাগর-পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। সওদাগর-পুত্র ত শুনিয়া অবাক্। যাহাহউক তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই দিনই সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। প্রথম প্রথম আগন্তুক একটু আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু তাহার আপত্তি শুনে কে? সওদাগর-পুত্র বলিয়াছিল "আমার ত মা-বাপ আছে তাহাদের অনুমতি ছাড়া ও তাহাদিগকে না জানাইয়া আমি কিরূপে বিবাহ করি।" কিন্তু কতকটা সকলের অনুরোধে ও কতকটা কন্যার সৌন্দর্য্যে অনিচ্ছাসত্বেও পরে বিবাহ করিতে সম্মত হইল।

আজ রবিবার। বাসর শয্যা। বিপদ কাটিয়া গিয়াছে তাই আর শঙ্কটতরাণীর কথা কারও মনে নাই। আজ তাঁহার ব্রত হয় নাই। তখন দেবী শঙ্কট-তরাণী ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া মেয়েটির দুই গালে, বেশ করিয়া দুটি চপেটাঘাত করিলেন এবং ব্রত করে নাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন।

কন্যা তখনই শয্যা হইতে উঠিল। কুলার মাথায়

(৩) পলিতা।

"নিছুনি পিছুনী"র (১) গুঁড়ি লইয়া তিনটি ছোট্ট পিঠা করিল। পিঠা তিনটি প্রদীপের শীষে (২) সেকিয়া লইল। এবং দুর্ব্বার আগার জল দিয়া দেবীরপূজা করিল। এসমস্ত জিনিষ বাসর ঘরে বিবাহের কুলায়ই ছিল সুতরাং ব্রত করিতে মেয়েটির কোনই কষ্ট হইল না।

সওদাগর-পুত্র মাত্র শুইয়াছিল, তখনও ঘুমায় নাই। সে এই সব কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই সব কি করলা?" প্রশ্ন শুনিয়া কন্যা স্তম্ভিত হইল, কি রূপে সে বরের সঙ্গে কথা বলিবে! আবার শঙ্কট-তরাণীকে ডাকিতে লাগিল, দেবী আদেশ করিলেন, "কোন লজ্জা নাই তুই সকল কথা ক।" দেবীর আদেশ পাইয়া বরকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সওদাগর-পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "এই ব্রত করলে কি অয়?" কন্যা বলিল, "নির্ধনার ধন অয়, আপুত্রার পুত্র অয়, অন্ধলের চক্ষু অয়, আড়াইল (৩) ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোরা লয়।"

"আচ্ছা বুঝ্যাম্" (৪) তুমি কেমন বর্তের বর্তিনী, আমি আইছি ঘোড়ায় যদি যাইতে পারি নায় (৫)।"

কন্যা আবার একাগ্রচিত্তে শঙ্কটতরাণীকে ডাকিতে লাগিল। ভোর হইলে সওদাগর-পুত্র গিয়া কামার দোকানে বসিল। অমনি মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, দুপুর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল। 'পাক-সাক' হইল পাত পিড়ী (৬) হইল, সকলের ডাক পড়িল জামাইর ডাক পড়িল। কোথায়? জামাই বাড়ীতে নাই। তখন কন্যা দাসীকে বলিল, "কামার দোকানে খোঁজ কর।" দীঘি হইতে একখান নৌকা তোলা হইল এবং এই নৌকায় জামাই কামার দোকান হইতে বাড়ী আসিল।

বর ও কন্যা নৌকা সাজাইয়া বিবাহের প্রচুর যৌতুক লইয়া দেশে যাত্রা করিল। মাত্র একজন দাসী কন্যার সঙ্গে গেল। সাতদিন সাত রাত্র নৌকা বাহিয়া সওদাগর-পুত্র বাড়ীর নিকট একটা বড় নদীতে আসিয়া পড়িল। এই নদীর পাড়েই সওদাগর-পুত্রের বাড়ী। নদীতে পড়িয়াই সওদাগর-পুত্র দাসীকে বলিল, "দেখ সমস্ত অলঙ্কার খুল্যা দিতে কও। এই নদীতে ডাকাইতের ভয়।" তদনুসারে কন্যা গায়ের সমস্ত গহনাপত্র খুলিয়া দিল। সওদাগর-পুত্র অলঙ্কারগুলি ও বিবাহের সাড়ীটি একটা পানের বাটায় আটকাইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কন্যা এই বিপদে আবার শঙ্কটতরাণীকে মনে করিল, ও যাহাতে গহনাপত্রগুলি রক্ষা পায় তার জন্য দেবীর চরণে প্রাণের আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরেই সওদাগরের পুত্রের নৌকা ঘাটে লাগিল। লোকে মেয়ে দেখিয়া কানাকানি করিতে লাগিল, "ওমা! এ কেমন মাইয়া! গায় একখানা গয়না নাই, পরণে একখান সাড়ী নাই! সওদাগরের পোলা এ কেমন মাইয়া বিয়া কৈরা আনল!"

বাড়ীর লোকেরা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সওদাগর-পুত্র কোনই উত্তর দিল না। তাহারা সকলে মুখ 'চাওয়া (১) চাওয়ি' করিয়া বলিতে লাগিল, "এইটা কার মাইয়া না কার মাইয়া জানি পোলাটা (২) বিয়া কৈরা আনল!"

মেয়ের পাকস্পর্শ হইবে। বহু লোকজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা পুকুরে জাল ফেলাইলেন একটা

(১) শুকনা ও আঠা আঠা করিয়া চাউল বাটিলে ইহাকে পিটালি বলে। সেই পিটালি দিয়া ছোট ছোট মোদকের মত করিয়া ইহাদের উপর বাঁশের সরু শলায় তুলা লাগাইয়া বাসাইয়া দেয়।

(২) শিখা।

(৩) যাহা হারাইয়া গিয়াছে।

(৪) বুঝিব।

(৫) নৌকায়।

(৬) খাওয়ার যায়গা।

(১) একে অন্যের মুখপানে তাকান।

(২) ছেলেটা।

পুঁটিও জালে উঠিল না। তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। নূতন বৌ দাসীকে দিয়া শ্বশুরের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আপনি চিন্তা করবেন না আমরা যে বড় গাঙ দিয়া আইছি হেই গাঙে জাল ফালান বড় মাছ উঠ্‌ব।" সংবাদ পাইয়া বৌ মনে মনে শঙ্কটতরাণীকে "হাকারিতে" (১) লাগিল। সওদাগর অবিলম্বে নদীতে জাল ফেলিবার বন্দোবস্ত করিলেন। একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ উঠিল। সওদাগরের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মাছ যে কাটা যায় না! দা, কুড়ালি কিছুই মাছের গায়ে বসে না। নূতন বৌ বলিয়া পাঠাইল, "মাছটা পিছদুয়ারে পাঠাইয়া দেন আমি কাটমু।" মাছ আসিল বৌ বলিল, "একটা মশের টাঙ্গাইয়া দাও। আমি মশেরের তলে মাছ কাটমু।"

বৌর কথা মত মশারি খাটান হইল। বৌ শঙ্কটতরাণী দেবীকে স্মরণ করিয়া মাছ কাটিতে গেল। মাছের গলা কাটা মাত্রই পেট হইতে অলঙ্কার ও সাড়ীর পেটিকা বাহির হইয়া পড়িল। মাছ কাটা শেষ হইলে দাসী জল আনিয়া দিল। বৌ হাত-পা ধুইয়া অলঙ্কার ও সাড়ী পরিয়া মশারির মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মনেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বৌ স্বয়ং রান্না করিল, কিন্তু এইসকল অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নিমন্ত্রিত সকলেই স্থির করিল কেহই এই বৌর হাতের রাঁধা খাইবে না। যে এই অমানুষিক কাণ্ড করিতে পারে সে মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ভূত বা পিশাচ। ভূতের রাঁধা কে খাইবে? ফলে তাহাই হইল। সময় মত রান্না হইলে বাড়ীর কর্ত্তা সকলকে ডাকিলেন, নানা প্রতিবন্ধক দেখাইয়া কেহই আসিল না। কেহ বলিল, "আমার পেটের অসুখ।" কেহ বলিল, "আমার জ্বর।" কেহ বলিল "নিমন্ত্রণ খাইলে আমার সয় না।"

এবার বৌ প্রাণের সমস্ত ভক্তি ও সমস্ত একাগ্রতা একত্র করিয়া আকুল ভাবে শঙ্কটতরাণী দেবীকে ডাকিতে লাগিল, "মা, আমার এই কলঙ্ক দূর কর।"

আর কি রক্ষা আছে! শঙ্কটতরাণী দেবী রাত্রে সকলকে বিছানায় যাইয়া চরাইতে লাগিলেন ও নির্ব্বংশ হওয়ার ভয় দেখাইলেন। সকলে তৎক্ষণাৎ খাইতে আসিল। কর্ত্তা বলিলেন, "ভাত তরকারি সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন আর ভদ্রলোককে খাওয়ান যায় না।" সকলে কিন্তু জেদ করিতে লাগিল, আমরা এখনই খাইব। নূতন বৌ পরিবেশন করিবে। ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কর্ত্তা বৌ-কে বলিলেন, "মা, তুমি বলিলে সকলকেই বসিতে বলি।" বৌ বলিল, "সকলকেই বসাইয়া দেন, চিন্তা করবেন না। ভাত তরকারি সমস্তই গরম আছে।" কি আশ্চর্য্য! সকলে খাইতে বসিয়া দেখিল সমস্ত জিনিসই গরম রহিয়াছে—যেন এখনই রান্না হইয়াছে। খাইয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "এমন রাঁধা আমরা জীবনে আর খাই নাই।"

(২)

নূতন বৌর একটি ছেলে হইয়াছে। সওদাগর একটা প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিল কিন্তু দীঘিতে জল উঠে না। পাড়ে পাড়ে ফল ফুলের সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর ঘাটলা কিন্তু দীঘির তল ধু ধু করিতেছে জল নাই। সওদাগর কিছুই স্থির করিতে পারে না। এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, আমার বংশে এ যে একটা ভয়ঙ্কর কুকীর্ত্তি রহিয়া গেল!" পুত্র বলিল, "আপনার বৌকে জিজ্ঞাসা করুন।" বৌ বলিল, "আপনি একদিন ছান কৈরা দীঘির পারে 'হত্যা' (১) দেন, যা শোনেন আমারে কৈবেন।" শ্বশুর তাহাই করিল। সাত দিন পরে গঙ্গার আদেশ হইল, "তোর নাতি কাট্যা দিলে দীঘিত জল উঠ্‌ব।"

(১) মনে মনে একাগ্রতার সহিত ডাকা।

(১) দেবতার উদ্দেশে প্রায়োপবেশন; ধন্না।

আদেশ শুনিয়া সওদাগরের প্রাণ শুকাইয়া গেল। যে আশাটুকু ছিল তাহাও শেষ হইল। বৃদ্ধ খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করিল, নিদ্রাদেবীও বৃদ্ধকে তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। অনেক পিড়াপিড়িতে বৃদ্ধ পুত্রের নিকট গঙ্গার আদেশ-বাণী ব্যক্ত করিল। বৌ কিন্তু কিছুই জানিল না।

দীঘি প্রতিষ্ঠা হইবে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। যে দীঘিতে এত কাল জল উঠে না কি সাহসে সওদাগর সেই দীঘির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তত হইয়াছে! কি জানি একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিবে ইহা মনে করিয়া বহু লোক আসিল—নিমন্ত্রিত আসিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে—যাহাদের ঠেকা ছিল তাহারাও আসিল। আর বহু অনিমন্ত্রিতও আসিল—দেখিতে!

বৌ ত রান্নাঘরে রাঁধার কাজে ব্যস্ত। বহুলোক খাইবে। ছেলের কথা বৌর আর মনে নাই। ছেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিষ্ঠার দেবকার্য্য হইয়া গেল। সওদাগরের পুত্র সকলের অলক্ষ্যে আপন ছেলেটিকে দীঘির মধ্যে লইয়া গিয়া কাটিয়া দিল। কাটা মাত্রই দীঘির তল হইতে হু হু শব্দে জল উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কানায় কানায় দীঘি ভরিয়া গেল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এত দিনে সওদাগরের কলঙ্ক ঘুচিল, পাপ দূর হইল, পরকালের স্বর্গ-পথ সুগম হইল।

ছেলেটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের সন্দেহ হইল। ছেলের মা বলিল, "আমি নূতন দীঘিতে গিয়া গা ধুইমু। লোক জনের খাওয়া দাওয়া চুইকা গেছে গা ধুইয়া আমি একটু শুইয়া থাকমু।"

শ্বশুর প্রথমে একটু অনভিমত প্রকাশ করিল—কত দেশের কত লোক আসিয়াছে—কোণের বৌ কেমন করিয়া বাহিরের দীঘিতে স্নান করিবে? পুত্র কিন্তু বাধা দিল না। ছেলের মা দীঘিতে নামিয়া সাঁতার দিয়া গিয়া হুবের (১) বাঁশ ধরিল। বাঁশ ধরা মাত্রই শঙ্কটতরাণী তাহার দুই গালে দুই চর দিয়া বলিল, "পোলা কাট্যা দিছে সকালে আমি এতখন্ কোল্ (অ) লইয়া বৈয়া রইছি—তোর এতখনে পোলার খোঁজ অইছে!" বলিয়া ছেলেটি মায়ের কোলে দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। ছেলে কোলে লইয়া যখন সওদাগর-বধূ দীঘির পাড়ে উঠিল তখন এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সওদাগর বাদ্যে ভাণ্ডে বৌকে ঘরে আনিলেন—নাতি ফিরিয়া পাইয়া সওদাগর বিশেষ আনন্দিত হইল। কলঙ্ক ঘুচিল, শোক গেল, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে যেন নূতন জীবন পাইতে লাগিল।

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাগানের গাছগুলি বড় হইয়াছে। অসংখ্য ফুলের গাছ, অসংখ্য ফলের গাছ—তাজা, নবীন, সবুজ, সুন্দর! কিন্তু একটা গাছেও ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। লোকে সওদাগরের নাম লয় না। যার গাছে ফল ধরে না তার নাম লইলে অমঙ্গল হয়। সওদাগরের আবার একটা নূতন দুঃখের সূচনা হইল। কত কষ্টে, কত সাহস করিয়া এক কলঙ্ক দূর হইয়াছে! সে কথা মনে হইলে এখনও তার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে—প্রাণের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়া যায়!

সওদাগর আবার 'হত্যা' দিল। সাত দিন পরে আবার আদেশ হইল—"তোমার নাতি বাগান্ (অ) কাট্যা দেও বাগান ফলন্ত অইব।"

সওদাগর আবার দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইল। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোক হইল। সওদাগরের সমস্ত ব্যাপারই অলৌকিক! এবার না জানি আর একটা কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে!

ব্যাপারের (১) দিন আসিল। বৌ রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। দীঘির পারে যজ্ঞ হইতেছে। দেবকার্য্য শেষ হইলে পর সওদাগর-পুত্র এবারও সকলের অলক্ষ্যে আপন ছেলেটি আনিয়া বাগানে গাছের আড়ালে

(১) নাগযষ্টি।

১। সমারোহ; অনুষ্ঠান।

কাটিয়া দিল। কাটিয়া দেওয়া মাত্র ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল—ফলের গাছ মুকুলের ভারে নুইয়া পড়িল। ভ্রমর গুণ গুণ করিতে লাগিল, পক্ষিকুল কলস্বরে বৃক্ষকুঞ্জ মুখর করিয়া তুলিল। গাছে গাছে, ফুলে ফুলে যেন একটা নূতন জীবনের সঞ্চার হইল! সৌন্দর্য্য-গৌরবে, রস সম্পদে, গন্ধ-সম্ভারে, ছন্দ-গুঞ্জনে উদ্যানভূমি সচেতন হইয়া উঠিল।

লোকজনের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, লোকের গঞ্জনাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; তখন অবসর হইয়া ছেলের মা ছেলের খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলে ত কোথাও নাই! এঘর ওঘর, এবাড়ী সেবাড়ী, এপথ-ওপথ, গাছের ঝোপ, বাঁশের ঝাপ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল ছেলে মিলিল না। মায়ের মনে আবার সন্দেহ আসিল। এবার কাহাকেও না বলিয়া সওদাগরের পুত্র-বধূ ফুল বাগানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবা মাত্রই একটি সুন্দর গোলাপ কুঞ্জের ছায়া-শীতল অন্তরালে পুত্র কোলে দেবীকে দেখিতে পাইল। দেবী দুই গালে দুই চড় দিয়া মায়ের কোলে ছেলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দুই বার দুই বার পোলা বাচাইলাম আর বাচাইমু না।"

মাতা দেবীর পায়ে পড়িয়া অশ্রুজলে মায়ের চরণ দুটি ধুইয়া দিল। একটিও কথা বলিল না। দেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সওদাগর-পুত্র দেখিল শঙ্কটতরাণীর বরে সত্য সত্যই "আপুতার পুত অয়, আরাইল ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোরা লয়।" তখন হইতে শঙ্কটতরাণী দেবীর প্রতি তাহার হৃদয়ের ভক্তি-স্রোত অবাধবেগে ছুটিয়া বাহির হইল, এবং তখন হইতেই পৃথিবীতে শঙ্কট তরাণীর ব্রতের প্রচার হইল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

পুষ্প

পুষ্প বিশ্বধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এমন মনোমোহকর জিনিস জগতে অতি অল্পই আছে। বিকচ কুসুমের অমল সৌন্দর্য্যে, প্রাণ মাতান সুগন্ধে মুগ্ধ না হয়, পৃথিবীতে এমন লোক নাই।

জ্ঞানোন্নতির প্রথম যুগে, ফুলের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, মানুষ ভগবানের ভাব সাগরে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা প্রয়াসী বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞাননেত্রে স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিয়া, নিগূঢ় সৃষ্টি রহস্য উদ্ভাবন করিতেছেন। কারণ ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এই চিন্তায় বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল। তাই তাঁহারা ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, তন্মধ্যে মধুর আবির্ভাব, ফুল ও ফলোৎপত্তির অব্যবহিততা প্রভৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাত করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন মকরন্দ পরিপূরিত সৌন্দর্য্যময় কুসুমরাজি, দুই চারি দিনেই বৃন্তচ্যুত হইয়া নীরবে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করে, আর তৎসঙ্গে সঙ্গেই, সেই বৃন্তে অন্য একটি পদার্থের ক্রম বিকাশ লক্ষিত হয়। এই জিনিষটিই রসালফলে পরিণত হইয়া আমাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করে। পুষ্পধ্বংস ও ফলোৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিতে থাকে দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিলেন, ফুল নিশ্চয় ফলোৎপত্তির কারণ। কিন্তু ফুলের এত সৌরভ কেন? এত সৌন্দর্য্য কেন? ইহার অভ্যন্তরে মধুরই বা প্রয়োজন কি? সামান্য সমীরণ ভরেই সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহার এত রূপ কেন? এই চিন্তা প্রথম যখন অনুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—ফুল বড় পরার্থপর। দুদিনের মধ্যে নিজ অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে, সেই চিন্তায় অধীর না হইয়া, সে কত হাস-

মুখে সৌরভ ছড়াইয়া, মধু বিলাইয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছে। আমাদিগের তুষ্টির জন্যই ফুল হাস মুখে প্রস্ফুটিত হয়। ক্ষীণজীবন প্রজাপতিকুলকে জীবিত রাখিবার জন্যই, ফুল মধু বিতরণ করিয়া থাকে। ফুলের ন্যায় দাতা, ফুলের তুল্য পরার্থপর জগতে কেহই নাই। কিন্তু স্রষ্টার উদ্দেশ্য সৃষ্টি বৈচিত্র্যের আবরণে দীর্ঘ দিন আবৃত রহিল না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা সহকারে সিদ্ধান্ত করিলেন, বীজ বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধির প্রধান কারণ, এবং ফুল না ফুটিলে বীজোৎপত্তি হয় না। সুতরাং উদ্ভিদ আমাদিগের তুষ্টির জন্য পুষ্প ধারণ করে না; স্বকীয় বংশ বৃদ্ধির কামনায়, তাহারা ফুল প্রসব করে।

এক্ষণে পুষ্পের অঙ্গাবলী আলোচনাদ্বারা দেখা যাউক, উহার মধ্যে কি কি রহস্য লুকায়িত আছে। প্রথমে শাখার অগ্রভাগে অথবা গাত্রে একটি সুদৃঢ় গুটিকা দেখা যায়, পরে উহা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ফুল্ল কুসুমে পরিণত হয়। প্রস্ফুটিত কুসুমটিকে পরীক্ষা করিলে, উহার মধ্যে চারিটি স্তর দৃষ্ট হইবে। প্রথমতঃ ফুলের বোঁটার নিকট একটি বাটীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট সবুজ পদার্থ। এই জিনিষটির মধ্যে অবিকশিত অবস্থায় ফুলটি লুকায়িত ছিল। ইহা কুণ্ড নামে কথিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বর্ণ-বৈচিত্র্য-পূর্ণ সৌরভময় পত্রবৎ পদার্থ; যাহা ত্বক্‌ নামে পরিচিত। এই দুইটি আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, মধ্যে কতকগুলি নলাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। এইগুলি পুষ্পের জননেন্দ্রিয়। ইহাদের দুইটি শ্রেণী আছে। যে গুলি বহির্দিকে অবস্থিত সেগুলি পুংজননেন্দ্রিয়। পুংজননেন্দ্রিয়ের সংখ্যা প্রায়ই বহু। ইহার অগ্রভাগে একটি থলের ন্যায় পদার্থ— উহা রেণু বা পরাগপূর্ণ, এজন্য থলেটি রেণুস্থলী বা পরাগকোষ নামে খ্যাত। রেণুস্থলীর গঠন বিচিত্র। কোন ফুলের রেণুস্থলীর উপর একখানি পর্দা আছে, রেণু পরিপক্ক হইলে, পর্দাখানা সরিয়া পড়ে। কোন ফুলের রেণুস্থলী পাকিলে, উহা দোপাটী ফুলের গুটীর ন্যায়, এত জোরে বিদীর্ণ হয় যে তাহার ফলে রেণুগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অপর একশ্রেণীর উদ্ভিদ আছে, উহাদের রেণুস্থলীর মুখ, যেন দুখানা কবাট মিলিয়া রুদ্ধ করিয়াছে। রেণু পাকিলে, কবাট দুখানা উদ্ঘাটিত হয়, ও রেণুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এই জননেন্দ্রিয় চিনিবার তিনটি উপায় আছে। প্রথমতঃ উহা পুষ্পদলের অব্যবহিত পরেই অবস্থিত; দ্বিতীয়তঃ উহার গঠন স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের গঠন হইতে কৃশ; তৃতীয়তঃ পুং জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে একটি রেণুস্থলী আছে, থলেটি চেপ্টা ও দীর্ঘ।

পুংভাগ ত্যাগ করিলে কোন ফুলে একটি, কোন কোন ফুলে বা একাধিক নলাকার পদার্থ দেখা যায়। এই নলগুলির গোড়ার দিকে একটি স্থূল জিনিষ আছে। উহা কর্ত্তন করিলে, মধ্যে কতগুলি গুটিকাকার পদার্থ লক্ষিত হয়। এই গুটিকাগুলি ভবিষ্যতে বীজে পরিণত হইবে! এজন্য এগুলি বীজাণু ও স্থূল জিনিষটি বীজকোষ নামে খ্যাত। বীজকোষ হইতে যে নলাকার শূন্যগর্ভ জিনিষ উপরদিকে বর্দ্ধিত হয়, উহাই স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে, গোলাকার একটি পদার্থ আছে। উহাকে চিহ্ন বা পীঠ বলে। পরিণত পুষ্পের চিহ্ন আটাল। পুষ্পের অঙ্গ সমূহের মোটামুটি এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক পুষ্পে উভয় প্রকার জননেন্দ্রিয় প্রায়ই নাই। কোন পুষ্পে পুং জননেন্দ্রিয় আছে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয় নাই; এই গুলিকে পুং পুষ্প কহে। যে পুষ্পে কেবলমাত্র স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, তাহা স্ত্রী পুষ্প নামে কথিত হয়। উভয় প্রকার জননেন্দ্রিয় যুক্ত পুষ্পকে পূর্ণপুষ্প কহে। জননেন্দ্রিয় হীন অর্থাৎ ক্লীব পুষ্পও প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায়। উহার সংখ্যা অল্প। পুং জননেন্দ্রিয়

হইতে পক্ক পুংরেণু স্ত্রী পুষ্পের পীঠে পতিত হইলে, উভয়ের মিলনে ফলোৎপত্তি হয়।

কোন পূর্ণপুষ্পের পুংরেণু, সেই পুষ্পের চিহ্নে পতিত হইয়া যে মিলন হয়, উহাকে স্বতঃ সম্মিলন কহে। একজাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পুষ্পের যে পরাগ মিলন হয়, তাহাকে শঙ্কর সম্মিলন কহে। শঙ্কর সম্মিলনে ফলফুল খুব বড় হয়, এবং ফুলটি পুং ও স্ত্রী এই উভয় ফুলের বর্ণ লাভ করিয়া মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট হয়। পুং ও স্ত্রী ফুলের মধ্যে মিলন সময়, যাহার শক্তি অধিক থাকে, শঙ্কর জাতকের মধ্যেও তাহার বর্ণ ও অবয়বের নৈকট্য থাকে। অল্পদিন হয়, অষ্ট্রিয়ায় আঙ্গুরের উৎপত্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল সে জন্য তদ্দেশীয় উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ আমেরিকা হইতে উৎকৃষ্ট আঙ্গুরের কলম আনিয়া, উভয় প্রকার গাছের মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। আঙ্গুরের আকার এত বৃহৎ ও ফলন এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। উন্নতিশীল আমেরিকান বৈজ্ঞানিকবর্গ এই উপায়ে অনেক মিশ্রফলফুল উৎপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। পুষ্পপ্রকৃতি শঙ্কর মিলন ইচ্ছা করে না। যদি ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সচরাচরই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে পরাগমিলন দৃষ্ট হইত।

প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ পুষ্প বেশী নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এক পুষ্পের পুং রেণু, সেই পুষ্পের স্ত্রী ভাগে পড়িয়া যে মিলন হয়, তাহা স্বতঃ সম্মিলন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এক পুষ্পের উভয় ইন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অনেক সময় উক্ত প্রকার মিলন হইয়া উঠে না। কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, অনেক পূর্ণ পুষ্পেরই উভয় ইন্দ্রিয় এক কালে পরিপক্ক হয় না। হয়ত যখন পুংভাগ বিকাশ লাভ করিয়া শুকাইতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীভাগে বিকাশ লক্ষণ দেখা যায়। কোন ফুলে বা ইহার বিপরীত অবস্থা। অনেক সময় দেখা যায়, পূর্ণ পুষ্পের উভয় ইন্দ্রিয়, একসময় পরিপুষ্ট হইলেও স্ত্রীভাগ অন্য ফুলের পুং রেণু গ্রহণ করিয়া মিলন ক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, পূর্ণ পুষ্পের পুং রেণু উহার স্ত্রীভাগের মধ্যে পতিত হওয়ার ফলে, ফুলটি অচির কাল মধ্যে বিষাক্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পুং ও স্ত্রী ভাগের অবস্থান বৈষম্যও অনেক সময়, স্বতঃ সম্মিলনে বাধা দান করে।

উদ্ভিদ যেন স্বপরাগ সম্মিলন ভালবাসে না। তাহারা ইহা বুঝে, স্বপরাগ সম্মিলন বংশ রক্ষার অনুকূল নহে। মনুষ্য সমাজে স্বগোত্র কিম্বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহপ্রথা বংশ রক্ষার অনুকূল নহে বলিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উদ্ভিদও যেন এই সত্য অবগত আছে। একজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি কেবল পুং পুষ্প ও কোনটি কেবল স্ত্রীপুষ্পবাহী; যেমন তাল, পেঁপে প্রভৃতি। আবার কোন কোন উদ্ভিদ পুং ও স্ত্রী উভয় পুষ্প বাহী; যেমন লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উভয় পুষ্পবাহী গাছের পুং পুষ্পের রেণু, সেই গাছের স্ত্রী পুষ্পে মিলিত হয়, ইহা উদ্ভিদ বিশেষ ইচ্ছা করে না।

পরতঃ সম্মিলন প্রকৃতির বাঞ্ছনীয়। এই সব পরাগ সম্মিলন নানা উপায়ে সংঘটিত হয়। বায়ুস্রোত, জলস্রোত, প্রজাপতি, মধুমক্ষিকা, পীপিলিকা প্রভৃতির সাহায্যে এই মিলন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে সম্মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য, পুষ্পের অবয়ব ও প্রকৃতি বিভিন্ন। বায়ুদ্বারা যে সকল উদ্ভিদের মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে সমস্ত পুষ্প দীর্ঘ বৃন্তের উপর জন্মে। এবং পত্র যাহাতে বায়ু প্রবাহের বাধক হইতে না পারে, তজ্জন্য পুষ্পগুলি পত্রগুচ্ছের বাহিরে প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুর প্রতিকূলে মুখ স্থাপন করিয়া অবস্থান করে। বায়ু

সম্মিলক পুষ্পগুলির মুখ বড় ও দলগুলি বহির্দ্দিকে বিস্তারিত। এই শ্রেণীর পুষ্পের বর্ণ ও সৌরভের চমৎকারিত্ব নাই। ইহারা বায়ু হইতে ভাসমান পুংরেণু গ্রহণ জন্য গর্ভদণ্ডটিকে দলাবরণ হইতে, রথচূড়ার ন্যায় বহির্দ্দিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। পরাগ মিলন হইলেই ফুলের স্রক্‌ নষ্ট হইয়া যায়, এবং বীজকোষ পুষ্ট হইয়া ফল উৎপন্ন হয়। এই সময় উদ্ভিদগণ ফলটিকে কাক, বানর, শিলাপাত, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতির উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আস্তে আস্তে পত্রগুচ্ছের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। ফাল্গুন মাসে আম্রবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন, গাছটি একমাত্র পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে। পত্রগুচ্ছের উপর পুষ্পগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত আছে : সমীরণ তখন চুত কুসুমের মিলন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেয়। মিলনের ফলে যেই ফল উৎপন্ন হয়, অমনি উহারা নবজাত সহকার কিশলয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া পড়ে।

প্রজাপতি যাহাদের মিলন সংঘটক, সেই পুষ্পগুলির অঙ্গ সৌষ্ঠবপূর্ণ, বর্ণ বিচিত্র, এবং উহাতে মধু ও সৌরভ থাকে। মধুমত্ত পতঙ্গকুল অহোরাত্র পুষ্পসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিতে থাকে। মধুকর স্বকার্য্য সাধন জন্য কুসুমে কুসুমে বিচরণ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের গূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে! কেন না ফুলের মধু গর্ভকোষের নিকট অবস্থিত থাকে; সুতরাং মধুকর মধুলোভে ফুলের গর্ভকোষের নিকট উপস্থিত হয়। তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে, উহার গাত্র পুংরেণু পূর্ণ হইয়া যায়। এই মধুকরটি যখন স্ত্রীপুষ্পে উপস্থিত হয়, ঐ পুষ্পের পরিপক্ক স্ত্রীভাগ প্রজাপতির গাত্র হইতে পুং রেণু প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করে। এই প্রকারে প্রজাপতি শ্রেণী দ্বারা উদ্ভিদ জাতির মহোপকার সাধিত হয়।

প্রজাপতি দ্বারা যাহাদের মিলন সম্পন্ন হয়, সেই পুষ্প সমূহের গঠন, প্রজাপতির উপবেশনের অনুকূল। কোন কোন ফুলের একটি দল ঈষৎ দীর্ঘ, যেন একখানা পিড়ী। ফুল যেন প্রজাপতির জন্য আসন পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তিল ফুলে উহা লক্ষ্য করা যায়।

যে সমস্ত পুষ্প রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়, তাহাদের সম্মিলন ক্রিয়াও রাত্রে সম্পাদিত হয়। এই শ্রেণীর পুষ্পের বর্ণগৌরব নাই; আছে কেবল উগ্র গন্ধ। ঐ উগ্র সৌরভে একপ্রকার পিপীলিকা ঐ ফুলে উপস্থিত হয়। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণশীল এই পিপীলিকা দ্বারা নৈশ কুসুমের মিলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রজনীগন্ধা, ঘেঁটকুট প্রভৃতি পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার সত্যতা প্রমাণ হইবে।

জলজ উদ্ভিদের পরপরাগ মিলন, জলস্রোত দ্বারা সম্পন্ন হয়। একটি জলজ উদ্ভিদের আশ্চর্য্য সম্মিলন কৌশল বর্ণনা করা যাইতেছে। অনেকেই পাতত পুকুর কিংবা খালের নিকট পাটা নামক গাছ দেখিয়াছেন। এই গাছের পাতাগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া চিরিয়া যায়। ছেলেদের কাল্পনিক মহোৎসবে পাটাপাতা লুচির অভাব পূরণ করে। চিনির কারখানায়ও পাটাপাতা ব্যবহৃত হয়। চারি পাঁচ হাত জলের নীচে এই উদ্ভিদের কাণ্ড অবস্থিত থাকে। কাণ্ড হইতে বহুদীর্ঘ বৃন্ত-পত্র উপর দিকে বর্দ্ধিত হয়। ইহাদের একই গাছে পুং ও স্ত্রীপুষ্প বিদ্যমান থাকে। স্ত্রীপুষ্পগুলির বোঁটা স্ক্রুর ন্যায় পাক দেওয়া, পুং পুষ্পের বোঁটা খর্ব্ব; এবং পুষ্পগুলি কাণ্ডের নিকটেই প্রস্ফুটিত হয়। যখন স্ত্রীপুষ্প পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার বৃন্তের পেঁচ খুলিয়া যায়। ফুলটি জলের উপর ভাসিয়া উঠে, এখানে উভয়ের মিলন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, মিলন সম্পন্ন হইলেই, স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত পূর্ব্ববৎ স্ক্রুর ন্যায় পেঁচ জন্মাইয়া, জলের নীচে ডুবিয়া যায়। অন্বেষণ করিলে প্রকৃতির ভাণ্ডারে ঈদৃশ বৈচিত্র্যের অভাব নাই। শিক্ষায় যাঁহার ইচ্ছা, সৌন্দর্য্যে যাঁহার স্পৃহা, তিনি স্থির-নয়নে লক্ষ্য করিলে, কুসুমের প্রতি পটলে, দাতার অপূর্ব্ব কলাকৌশল দেখিতে পাইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ দে।

আলোচনা

ভাদ্রের "প্রতিভায়" পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু শর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "কায়স্থ সমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকের অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক "শ্রীন্যায়পাশিক" লিখিয়াছেন, "কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আজকাল যে একশ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার হইতেছে ইহাও সেই রকমের একখানি গ্রন্থ। সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল গ্রন্থ কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব গৌরব ও উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রমাণ করে নাকি।"

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে পুস্তকখানার এইরূপ সমালোচনা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই গ্রন্থকার আমাকে এক খণ্ড উপহার দিয়াছিলেন; তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। আজ কাল জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা ও সমাদরের অযোগ্য এক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে সত্য; কিন্তু আলোচ্য পুস্তক সেই শ্রেণীর নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। পুস্তকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাতে বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহার সর্ব্বাংশেই ঐতিহাসিক বিচার প্রণালির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়পাশিক মহাশয়ের মতে গ্রন্থখানা ঐ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং সমালোচনার অযোগ্য। • • • যিনি নিরপেক্ষভাবে পুস্তকখানা পাঠ করিবেন তিনিই অনুভব করিবেন যে সমালোচক "ন্যায়পাশিক" হইলেও তাঁহার সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। * * * * *

শ্রীঅমিয়াথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

["কায়স্থ সমাজের সংস্কার" গ্রন্থখানির যে সমালোচনা প্রতিভার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পুস্তকখানির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে মনে করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অনেক কায়স্থ সভ্যও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

প্রতিভা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা। ইহার সমালোচনায় কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, বা কেহ মনে কোনরূপ ব্যথা পান, ইহা পরিষদের ও প্রতিভা সম্পাদকের অভিপ্রেত নহে। কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ আন্দোলন ও আলোচনা পরিষদের এবং প্রতিভার নিয়মবিরুদ্ধ। "কায়স্থ সমাজের সংস্কার" পুস্তকখানার সামাজিক আন্দোলনের পক্ষ সমর্থনের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সাহিত্য হিসাবে উহার নিরপেক্ষ পরিচয় মাত্র প্রদান করে এই ভাবিয়া উক্ত সমালোচনা পত্রস্থ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সমালোচনার সম্বন্ধে একটা আপত্তি উঠাতে উপরোক্ত আলোচনা পত্রস্থ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইল।—প্রতিভা সম্পাদক।]

রাখালের গান ও গোরক্ষ নাথের সিন্নি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাখালের খেলায় অনেক বিশেষত্ব ছিল। সে খেলার সুখ আজকালের ক্রিকেট, ফুটবল, বা টেনিসে নাই; সে সুখ বঙ্গের পল্লীতে ছিল। রাখালেরা একজনকে রাজা সাজাইয়া কোনও গাছের তলায় উচু টিপির উপর বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক উচ্চস্থানে বসাইয়া কেহ উজির কেহ নাজির হইয়া বসিত। তখন আইনকানুন তৈয়ারী হইত। কত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কূট প্রশ্নের [illegible] মীমাংসা হইত।

কেহ চুরির কেহ বা বাপ-মার অবাধ্যতার দরুণ রাজার সম্মুখে ধৃত হইয়া আনীত হইত। যে দারোগা খুঁজিয়া, দৌড়িয়া চোর ধরিতে পারিতেন তিনি তালপাতার টুপী বখশিশ পাইতেন। তালপাতা ও নারিকেল পাতায় রাখালেরা যে সুন্দর টুপী বানাইত তাহা উচ্চশিল্পের পরিচায়ক না হইলেও প্রশংসার্হ ছিল, রাখালের এই রাজত্ব দেখিয়াও কবি গাইলেন

"বধূ! তোমায় কর্‌ব রাজা তরুতলে।"

রাখালেরা বিবাদ করিত, তাহারাই সালিশী করিয়া তাহার মীমাংসা করিত। নেংটীপরা পাঁচনধারী হিন্দু মোসলমানের ছেলেরা মিলিয়া খেলিত, আর দুই দুই জনে 'বন্ধু' পাতিয়া লইত। বন্ধুর সঙ্গে ভাব ছুটিয়া গেলে—দুজন সালিশ রাখিয়া বলিত

"বিন্না পাতা কালা
বন্ধু আমার শালা।"

বস! অতঃপর বন্ধুত্ব টুটিয়া গেল: কিন্তু শত্রুতা হইল না। এই 'শালা' গালি সূচক নহে। তাহাদের ধারণা এই শ্লোকটি মুনি ঋষিদিগের রচিত: সুতরাং ইহা বলিলেই বেদ বিধিমতে বন্ধুত্ব কাটাকাটি হইয়া গেল, কখন কখন আবার বিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপিত হইত। এই বন্ধুত্ব কাহারও কাহারও চিরজীবন স্থায়ী হইতেও দেখা গিয়াছে।

রাখালদের দুই নম্বরের খেলা ছিল 'হা ডু ডু' বা 'ডুগ ডুগ'। তিন নম্বরের খেলা 'সুন কোর্ট'। চারি নম্বরে 'মল দাইর' পাঁচ নম্বরে 'কান্দায় যে কান্দে সে' বা 'গাছো'। ছয় নম্বরে সাঁতার কাটিয়া 'বলাই বলাই' সাত নম্বরে 'ডাকুসই,' আট নম্বরে 'গুলি দাঁড়া'। আর দুপুরের 'মাথা ফাটা' রৌদ্রে গাছতলায় ঘর আঁকিয়া 'বাঘবন্দী' বা 'ষোল কটি' 'দশ পঁচিশ,' 'কড়ি বা খিলা' খেলা হইত। এই শেষোক্ত-খেলাগুলিকে তাহারা 'কুড়েমী' খেলা বলিয়া ঘৃণা করিত। চঞ্চল বালকের দল ছুটাছুটি করিতেই ভালবাসিত। তাহাদের দেহ যষ্টি দিনে দিনে লাউএর ডগার মত 'ফণ ফণে' হইয়া উঠিত। আর দিদিমা আশীর্বাদ করিতেন 'বেচে থাক—তোমার লোহা হজম করা।' আর ব্যারামের প্রতি আমরা যতই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি ব্যারামও আমাদের তত নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে।

রাখালের দৃষ্টি তাহার গরুর উপর। গরুগুলিকে যথেষ্ট যত্ন করে। গরুর বাছুর হইলে রাখালের আনন্দের আর সীমা থাকে না। রাখাল নবজাত বাছুরটির গলায় কত রং বেরঙ্গের ফিতা বাঁধে, তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়।

নবজাত বৎসের বয়স ১০।১২ দিন হইলেই গোয়াল ঘরের দরজায় গোরক্ষনাথের সিন্নি দেওয়া হয়। এই উৎসবে রাখালেরই প্রাধান্য। আমাদের দেশে প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় না। এই গাভীর দুগ্ধ (প্রসবের চার দিন পরে) দোহন করিয়া তাহাদ্বারা দধি ক্ষীর, ক্ষীরপুরি প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়। এসকল দ্রব্য রাখালদের ফরমাইস মত বাড়ীর গিন্নিরাই করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পরে গোয়াল ঘরের দরজার বাহিরে কলার আগ পাতায় খৈ চিড়া, দধি, ক্ষীর, ক্ষীরপুরি, গুড় কলা প্রভৃতি সাজাইয়া সিন্নির কবিতা বা ছড়া পাঠ করা হয়। এই পৌরোহিত্য মুসলমান বা আচণ্ডাল হিন্দু সকলেই করিতে পারেন। পুরোহিত বা শ্লোকপাঠক দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করে—আর পাড়ার যত নিমন্ত্রিত রাখাল চাকর বাকর সমস্বরে হাঁচো হাঁচো * করিয়া থাকে। হেমন্ত ও শীতকালে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গ্রামের কোনও না কোনও বাড়ীতে হাঁচো হাঁচো শোনা যাইত। এখন গরুও কম—রাখালও প্রায় নাই বলিলেই চলে।

গোরক্ষ নাথের যে ছড়া আমাদের দেশে গীত হয় তাহাতে পাঠক তৎকালের একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখিবেন। আমরা ছড়ার অনেক স্থানে অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। 'যথা শ্রুতং তথা লিখিতং'।

পুরোহিত বা মণ্ডল } রাখাল ভাই থোব। (১)

সকলে—হাঁচো হাঁচো।

মণ্ডল—থোব নাড়া থোব বাজে,

* সত্যি, সত্যি—"সব সত্যি"।

(১) থোবঅর্থে স্বীকৃত কি?

সকলে—হাঁচো হাঁচো। প্রতিছত্রেই এইরূপ।
চালকরাটি ঝুমুর বাজে।
বাজে তাল বাজে ধামাল (২)
আমার গোরখনাথ জগৎমাল। (৩)
জগৎমাল ঝিমি ঝিমি
সোনার বান্ধম পাঁচটিমি (৪)
সোনা বান্ধিয়া বান্ধম মোয়া (১)
আমার গোরখনাথে খাইলেন গুয়া (২)
গুয়া খাইতে লাগল চুণ
কে কে যাইব বিক্রমপুর।

* * * * *

মাগী বলে মিন্সে আমার কথা শোন
প্রথম বৈশাখে নালিতা (৩) বোন্। (৪)
নালিতা বুনলে হইব ডাঙ্গর। (৫)
আগখান খাইবাম, গুঁড়িখান ফালাইবাম,
মাঝখান সায়রে (৬) ভিজাইবাম।
সায়রে ভিজাইলে হইব কুইয়া (৭)
পোলা পুলিয়ে লইবে ধুইয়া।
ফালাইবাম রইদ (৮)
পাট হইব মণ চৌদ্দ।
পাট বোলে মুই বড় বীর
হাতী বান্ধম হাতী থির।

এখন 'পাট' নিজ প্রশংসা করিয়া হাতী, ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি বাঁধিবে।

২

সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটী—
এই খানে বসাইলাম লোয়াইত আটি। (১)

(২) ধামাল,—জাকালো।

(৩) জগৎ মাল......জগতের সকলের উপর মল্ল।

(৪) অর্থ বুঝি নাই।

(১) মোয়া ..মুখ, মাথা। (২) গুয়া...সুপারি এখানে পান সুপারি। (৩) নালিতা...পাট। (৪) বোন...বুনট-করা। (৫) ডাঙ্গর...বড়। সায়রে...জলে। (৭) কুইয়া ...পঁচা। (৮) রইদ...রৌদ্রে।

(১) লোয়াইত আটি=লোয়াইত, সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা মুড়ি খৈ, খৈর লাড়ু ইত্যাদি তৈয়ার ও বিক্রী করে। আটি অর্থে পাড়া। অর্থাৎ লোয়াইত পাড়ায় গেলে রাখালগণ আদরে খৈর লাড়ু পাইত।

ওরে ভাই লোয়াইত
আমার রাখালরে খৈ'র লাড়ু যোগাইবে।
লোয়াইত।—তোমার রাখাল কেম্‌নে চিনি? (২)
রাখালের মালীকের পক্ষের উত্তর—
"হাতে লড়ি বিনান দড়ি (১)
গাঙ্গের কূলে দৌড়া দৌড়ি।
[গাঙ্গের কূলে পাড়ে ডুক—পাঠান্তর]
সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটী—
এখানে বসাইলাম গোয়াল আটি।

এই ভাবে কুমার মোদক প্রভৃতি সর্ব্বজাতির উপর রাখালের 'খাবার' দিতে, রাখালের সকল রকম সুবিধা করিতে বলিয়া দেওয়া হইল এবং সকলের নিকট রাখালের পরিচয় দেওয়া হইল।

পরিচয় ইত্যাদি শেষ হইলে সকলে মিলিয়া গোরক্ষের প্রসাদ পাইল। প্রসাদ গ্রহণে জাতি বিচার আছে বটে, কিন্তু যে স্থানে প্রসাদ খাওয়া হয়—সেখানে গোবর দেওয়া নিষিদ্ধ। কেন? উহা কি শ্রীক্ষেত্র হইয়া উঠে?

প্রসাদ লওয়ার পর এক ব্যক্তি দধির পাতিলটা লইয়া সজোরে ভূতলে ক্ষেপণ করিয়া তাহা চূর্ণ করে, এবং 'আগপাতা' খানি মুড়িয়া গোয়ালঘরের দরজার উপর—চালে গুঁজিয়া রাখা হয়। তার পর গরুকে বাঘ, মহিষ, সিংহ, গেঁড়া (গণ্ডার), প্রভৃতি জানোয়ারের হাতে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করা হয়। উপরোক্ত ভাঙ্গা পাতিলের টুকরা চারিদিকে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সীমানার মধ্যে গরুর কোনও বালাই ঢুকিতে পারিবে না —ইহা গোরক্ষনাথের আশীর্ব্বাদ।

অবশেষে পুরোহিত পাঠ করিলেন—
"গোরক্ষের দড়িটা নিম্মল গুণে,
গরু ছুটা হইল গোরক্ষের পুণ্যে।"

গোরক্ষের পুণ্য ফলে গরুর রোগ, বালাই, আশঙ্কা সব দূর হইল। আমার গরু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 'ছুটা' খাইবে—কাহার সাধ্য বাধা দেয়। কারণ গোরক্ষ নাথের হুকুম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

(২) লোয়াইত রাখাল চিনতে চাহিতেছে।

(১) বিনান দড়ি...পাকানো দড়ি।

কবি শ্যামদাস সেনের মীন চেতন

(প্রথম পাতা লুপ্ত)

... ... গণ গৌরি ॥
সকল জন্মিয়া রহিল ঠাই ঠাই।
সাক্ষ্যাতে আছয়ে দেখ জগতের মাই ॥
লোমে লোমে যত ইতি জর্ম্ম হইয়া গেল।
অনন্ত স্বরূপ হইয়া সব উপজিল ॥
এহি মতে পৃথিবী যে জন্মিয়া আছন্ত।
নানা মতে পৃথিবী যে হইল অনন্ত ॥
বার বার যুগী সবে সে যোগ সাদিল।
অনন্ত প্রকারে যুগী তখনে হইল ॥
অনাদি কহেন তত্ত্ব মনে হেতু করি।
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী (১) ॥

* * * *
* * * *

ইসব শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট।
বুজিলেক এই কন্যা সকলের জেঠ ॥
তাহাতে জন্মিল পুনি না হএ উচিত।
জানিয়া করয়ে আজ্ঞা মনের বাঞ্ছিত ॥
তবে পুনি আজ্ঞা কৈল ধর্ম্ম নিরঞ্জন। (২)
হর গৌরি দুই জন করিল মিলন ॥
শুন শুন যএ হর পাইলা এই নারী।
এহারে গ্রহণ কর মোর বাক্য ধরি ॥
হরগৌরী জাহ চাল পৃথিবীর মাজ
এথাতে রহিয়া তোমার নাহি কোন কাজ ॥
ধর্ম্মের আদেশ পাইয়া পৃথিবীতে যাইল।
... ... সকল রহিল ॥
আদি পুরানেত (৩) জান এই মত কএ।
তাকে বিচারিয়া চাহ হএ কি না হএ ॥

... ...
... কহি শুন সভে গোঁক্ষের বিজয়।
তবে যদি হর গৌরী পৃথিবীতে যাইল।
মীন নাথে ... ... ॥
পদ্মাসনে কত কাল সাদিলেক জোগ।
বাউ পান করি মীন না করিল ভোগ ॥
মিনের চাকরি করে যতেক গোসাই।
... ... কানাই ॥
শিবের ঠাই লৈয়া চলে হারিফা মিনাই।
পিষ্ঠ ভাগে গৌরী আছে জগতের মাই।
তাহার শিরেত গঙ্গা শুনহ কারণ।
সদাএ কৃষ্ণ ভাবে হর অন্য নাহি মন ॥

(১) যে পুথিখানি হইতে এই গ্রন্থের পাঠ উদ্ধার করা গেল তাহা অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। প্রথম পাতাখানা লুপ্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় তৃতীয় পাতাও এত জীর্ণ যে পাঠ উদ্ধার করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। "কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী" এই পদের পরে "শিবের কাছে লইয়া গেল হাড়িফা মিনাই" ইত্যাদি ছিল কিন্তু এই পদের এইখানে কোন অর্থ সঙ্গতি হয় না। অধিকন্তু এই পদ হইতে "ফিরিয়া দেখিল গৌরীর বদন" পর্য্যন্ত সঙ্গত ভাবে একটু পরেই আছে। লিপিকার প্রমাদে অথবা প্রাচীন পুস্তকের প্রায়ই দুই তিন পাতা ছিন্ন ও জীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া "কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী" এবং "ইসব শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট" এই দুই পদের মধ্যে অনেকখানি পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথম পাতায় সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত ছিল। এই আবশ্যক অংশটি খণ্ডিত হইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

(২) ধর্ম্ম নিরঞ্জনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে হরগৌরী পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতেছেন। মীনচেতন নাথধর্ম্মের একখানা প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক এবং গোরক্ষনাথ-মীন নাথের কাহিনীও সর্ব্বজন বিদিত ও দেশ মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। এই গ্রন্থে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ স্থান গভীর অর্থদ্যোতক।

(৩) এই আদিপুরাণের উল্লেখ সহদেব চক্রবর্ত্তীও তাহার ধর্ম্ম মঙ্গলে করিয়াছেন। (বিশ্বকোষ ১৮শ

এহি মতে নিজ কার্জ সাধি মহেশ্বর।
অন্ত মন নাহি হর ভাবে নিরন্তর॥
কামদেবে আসি হরে ভ্রমাইল তখন।
ধ্যান ভঙ্গ হৈল হর আনন্দিত মন॥
ফিরিয়া দেখিল হরে গৌরীর বদন।
* * করিতে মায়া হইলেক মন॥
তবে যদি হর-গৌরী একত্রে বসিল।
শিবের চরণে দেবী কহিতে লাগিল॥

ভাগ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা) তিনি আদিপুরাণ মতে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থেও "শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উভয়ের বল্লুকাতীরে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান কালে শিব মুখ নিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণে মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান লাভ, মীননাথের ভগবতী নিন্দা, তজ্জন্য ভগবতীর শাপ হেতু কদলীপাটনে রমণীর মোহন-মন্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থান, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার" ইত্যাদি বিবরণ বর্ণিত আছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, একই মূল আদিপুরাণ হইতে সহদেব চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস সেন তাহাদের বর্ণিতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সুলতান মামুদের সভাস্থ মহাপণ্ডিত আলবেরুণী (১০৩১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার ভারত বিবরণ গ্রন্থে ভারতে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের দুইটি তালিকা দিয়াছেন, তাহার প্রথম তালিকার প্রথমেই আদিপুরাণের নাম দেখিতে পাই। বিশ্বকোষের পুরাণের বিবরণেও এক জৈন আদি পুরাণের পরিচয় পাই। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ও শ্যামদাস সেনের অবলম্বিত আদিপুরাণ এই উভয় পুরাণ হইতেই বিভিন্ন ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সুকুর মহম্মদের ময়নামতির গাথায় গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনীর বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

তোমার গলেত প্রভু কিবা কণ্ঠমালা।
কি কারণে ধর প্রভু গলে মুণ্ডমালা॥
শিব বলে যত জন্ম হইল আমার।
এক জন্মের এক মুণ্ড গলাতে আমার॥
হরের বচন যদি শুনিলেক গৌরী।
পুনরপি দেবী পুছেন্ত যত্ন করি॥
কোন যুগে জিয় প্রভু কোন যুগে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ প্রভু যুগে যুগে তরি॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
ত্বরিতে চলহ প্রিয়া ক্ষীরা (সুসাগর)॥
সাগরের মাঝে আছে টঙ্গি মনোহর।
ই বুলিয়া দুই জন চলিল সত্বর॥
মৎস্য রূপ ধরি গেল দুই মহাবল।
হেটেত থাকিয়া মিনাই শুনিল সকল॥
(মহেশ্বর) বোলে দেবী শুন সাবধানে।
যতেক পরম তত্ত্ব কহি তোমার স্থানে॥
মহাদেব কহে যত সঙ্কেত বিচারণ।
* * * * "
নামাতে থাকিয়া মীন হুঙ্কার পূরএ।
মহাদেবের মনে লাগে দেবী ত্রাস পএ (১)॥
চৈতন্য পাইয়া দেবী (বলিল বচন)।
——·———হর নিদ্রার কারণ (২)॥
দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে।
কহিতে হইবে কথা হুঙ্কারিল কোন জনে॥
ধ্যানেত জানিল হর হুঙ্কারিলেক মীন।
হরে বোলে হইবেক নারীর অধিন॥

(১) মহাদেবের মন চঞ্চল করিল এবং দেবী ভয় পাইলেন।

(২) ভাল অর্থ সঙ্গতি হয় না। চেতনা লোপ অর্থে নিদ্রা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। লিপিকার প্রমাদেও ইহার স্থলে "নিদ্রার" লেখা হইয়া থাকিতে পারে।

ক্রোধ হইয়া মহাদেব বলিল বচন।
যে শুনিলা এইখানে হৈবা বি (স্মরণ)॥
মহাদেব গৌরী উঠি··· ··· ···।
পুনরপি সিদ্ধা সব একত্তর হৈল॥
আধ্যে গুরু মহাদেব পাছে আর সব।
যোগ সাধে সিদ্ধা··· ·· ··· ···॥
মহাদেব ··· ··· ··· ···কৈলাস।
সেই স্থানে হর গৌরী কৈল গৃহবাস॥
পূর্ব্বদিকে হাডিফা গেল দক্ষিণে মীনাই।
পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে কানাই॥
পৃথিবী ভ্রমএ সবে যোগ পথ ধ্যাই।
কৈলাসেতে হর গৌরী আছে এক ঠাই॥
রহিলেক হর গৌরী কিবা কুতুহলে।
তাহার··· ··· ··· ··· ··
সেই সব কহিলে কথা নাহি আদি অন্ত।
যুগী হইয়া গেলে সব যোগেতে শুনন্ত॥
একদিন হর গৌরী আনন্দে বসিল।
··· ··· ··· ···কহিতে লাগিল॥
ভবানী বোলেন হর শুন সাবধানে।
তোমার জে শিষ্যে নারী না করে কি কারনে॥
দেবের দেবতা হর নারায়ণ তুমি।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী গ্রহণ কৈলা তুমি।
ধ্যানেত সাদিল যোগ কি পাইল ফল॥
অজ্ঞা কর গৃহবাস করুক সকল॥
মহাদেব বোলে দেবী হেন শক্তি নাহি।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিছে এডাই॥
ভবানী বোলেন হর না বলিয় আর।
কাম ভোগ তেজি হেন মানব আকার॥ (১)
যদি আজ্ঞা কর হর করম নিবেদন।
এহি সবু ভোলাইব আমি করিয়া রচন॥

এহি কথা শুনিয়া শিবে সিদ্ধা আমেন্ত্রিল।
যতেক সিদ্ধাগণ ডাকিয়া আনিল॥
একে একে আসন দিলেক জনে জন।
বসিলা মণ্ডলী করি যত সিদ্ধাগন॥
জগত মোহন রূপ ধরিয়া আপনি।
আপনি পৈরএে (২) অন্ন শিবের ঘরিণি॥
ভুবন মোহনী দেবী সঙ্করের নারী।
কটাক্ষে যে সিদ্ধাগনের প্রাণ নিল হরি।
শিবের ঘরিণী দেবী বড়ই চতুর।
সোবর্ণ কোটরা করি জল দিল দুর॥
পত্রে ভরিয়া জল আনি দিল জনে জন।
জলের ছায়ায় দেখে কমল বদন॥
দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে।
বিষম কপট মায়া মুনির মন টলে॥
দেবীর দেখিয়া রূপ রহিতে না পারে।
কামবাণে দহে তনু বড় অন্তরে॥
নানারূপ ধরে দেবী ভুবনমোহিনী।
কামাতুর সিদ্ধাগণ হইল আপনি॥
মনে মনে চিন্তে মিনে পাই এই নারী।
ত্রিজগতে নাই যানি এমন সুন্দরী॥
বিচিত্র আসনে থাকি হেন নারী লইয়া।
কেলি কুতুহল করি বুকেত থুইয়া॥
বুজিয়া মিনের মন দেবী দিল বর।
কদলি সহরে মিন চলহ সত্বর॥
শোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি।
কদলীর রাজ্যে তুমি ঝাট যাও চলি॥
দ্বিতীএ চিন্তিল মনে সিদ্ধা হাড়িফাএ।
* * বেগ্র মন সোন্দরি যদি পায়ে॥
হাড়ি কর্ম্ম করি যদি থাকি এহার পাশ।
তথাপি পুরএ মোর মনের হবিলাস॥
হাসিয়া বলিলা দেবি দিনু এই বর।
(চলি যাও হাড়ি)কা জে মৈনামতির ঘর॥

(১) কাম ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকিলে এমন সাধারণ মানুষের মতই আকৃতি থাকিত না।

(২) পরিবেশন করে ;—পদটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হাতে করিয়া পিছা কান্দে কোদাল লই।
মেত্রের কোলেত জায় (১) পাইবা সেই ঠাই॥
ত্রিতিএ * * * *
এমত সোন্দরি যদি থাকে মোর ঘরে॥
তার সঙ্গে কেলি করি মরিয়া যদি যাই।
তথাপিয় তার সনে আনন্দে গোঞাই॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনেতে ভাবিয়া।
তুরিত গমনে জায় * * * চলিয়া॥
যেই মনে কৈলা তুমি পাইলা সেই বর।
* * * * * * ॥
চতুর্থে মানস কৈল গাবুর সির্দ্ধাই।
এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাঁই॥
তার লাগি যাএ যদি হাত কাটা।
* * * * * ॥
আজ্ঞা দিল ভবানী বুজিয়া তার আশ।
বর দিল চলি যায় সত মাএর পাস॥
ভজিবেক সতমাএ দেখিয়া জৌবন।
এহার কারণে তুমি পাইবা আপন॥
পঞ্চমে ভাবিল গোর্ক্ষে মনে করি সার।
এহিরূপ জননী যদি হএত আমার॥
তাহার কোলেত বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমন জননী যদি পৃথিবীতে পাই॥
মল মুত্র সহে মোর পালে কাখে কোলে।
মনোবাঞ্চা সিদ্ধি যদি হরে মোরে বরে (২)॥
* * * দেবী সুরেশ্বরী।
অবশ্য ছলিমু তোরে আর রূপ ধরি॥
সর্ব্ব সিদ্ধা চলি গেল গার জে আসনে।
দেবীকে পুছিল কথা দেব ভগবানে॥

(১) যাও।
(২) (ক) হর আমাকে বরদান করেন.
(খ) আমার হরপদ প্রাপ্তি হয়।
(গ) হর আমাকে পুত্র ভাবে ভজনা করেন।

কিমত দেখিলা দেবী মোকে কহ সার।
সিদ্ধা সবের বুঝিলা কেমন ব্যবহার॥
সিবের আদেশে দেবী কহিল সকল।
জেই জেই সিদ্ধা সবে পাইল জেই বর॥
গোর্ক্ষের চরিত্র শুনি হাসে মহেশ্বর।
মহা অবধূত গোর্ক্ষ জগতের ভিতর॥
তারে যদি দেবী তুমি না পার ছলিতে।
রাখিল মহিমা কিছু গোর্ক্ষ অবধূতে॥
দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর রূপে।
দেখিব সকল হর জানিব সর্ব্বরূপে॥
তবে সির্দ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে (১)॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া বুঝিলেক হাড়ি রূপ ধরি॥
কালফা চলিয়া গেল অববির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে॥
গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন (২)
কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন॥
কদলিতে দেখে মিনে নারীগণ প্রজা।
নারীর যে হাট ঘাট নারী দেখে রাজা॥
দেখিয়া যে নারী গণ ভুলিয়া গেল মন।
তখন পাইল দেখা কদলির গন॥

(১) ময়নামতির পুথিতে হাড়িফার বিস্তৃত কার্য্যকলাপ বর্ণিত আছে। মাতা ময়নামতির অনুরোধে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িফার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গেই সন্ন্যাসে বাহির হন॥

(২) ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে গোরক্ষনাথ বলিতেছেন, "আস্ত-মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহর"। এই পুথিতেও দেখিতেছি যে গোরক্ষনাথ বঙ্গ নিকেতন চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরই গুরু গোরক্ষনাথের প্রধান লীলা ভূমি ছিল।

মোঙ্গলা কমলা দেখি ভুলি গেল মন।
শুকুনাতে জল পাইল জেন মীন গন :: :: ॥

ইতি মিনের মন ভঙ্গ ॥ ঃ ঃ ঃ ॥

লাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ ॥ ঃ ঃ ঃ ॥

মিন নাথ যাইল যবে ঃ কদলি দেখিল তবে ঃ
চাহে সবে রাখিতে ভুলাইয়া।
* * দেখি এই ঃ আমি সবে তারে পাইঃ
আনন্দে রাখিব ভোলাইয়া ॥
মোঙ্গলা কমলা দুই ঃ ষোলশত নারী লইঃ
নিমেষেক করি সমুদীত ॥
মিননাথ ভোলাইতেঃ সব আইল একচিত্তে ঃ
বেরিয়া রহিল চারিভিতে ॥
করিয়া নানান বেশ ঃ মাথেত লম্বিত কেশ ঃ
গ্রীবার উপর গুঞ্জরে ভোমরা ॥

চতুর্থ পাতা (১)

ধোলে তাথে রত্ন-হার ঃ মানিক্ক মুকুতা ভার ঃ
দেখিতে যেন বড়হি উর্জ্জল ঃ
করিয়া নানান সাজ ঃ কেশরী জিনিয়া মাজ ঃ
কটাক্ষে হানে পঞ্চশর ঃ
চলিল নানান গতি ঃ দশন মুকুতা পাতিঃ
শ্যামল সুন্দর কলেবর ঃ
কটীতে কিংকিনি বাজে ঃ চরনে নুপুর সাজে ঃ
দেখিয়া মুনির মন টলে ॥
ঈঙ্গিত নয়ানে চাহে ঃ হরিহর মোহ জায় ঃ
নানা ভেসে দিল দরশন ॥
মিনের সম্মুখে আসি ঃ মোঙ্গলা কমলা হাসি ঃ
কহে সবে মধুর বচন ॥
নয়ানে নয়ানে চায়ে ঃ হাত নাড়ি কথা কয়ে ঃ
ঠমকে দেখায় দুই * ॥

উরুতে জে হাতে তালি ঃ কথা কয় ঠেলি ২ ঃ
নানা মতে মধুর বচন ॥
কেহ নেয় ধুনি কাড়িঃ কেহ নেয় ব্যাঘ্র ছড়ি ঃ
নানা-ছলে মিনেরে বুঝায়ে ॥
কোন দেশে তোর ঘর ঃ মাগি খায়ে নিরন্তর ঃ
(হেথা আ) ইলা কেমত উপায়ে ॥
হাতে কেন দণ্ড ধরি ঃ কানে কেন দিছ কড়ি ঃ
নিরন্তর বঞ্চ একাশ্বর ॥
মোর দেসে নাহি রাজা ঃ তাই করি তোমা পূজা ঃ
তুমি (১) হয় রাজরাজেশ্বর ॥
নারীর পাটন এই ঃ ষোল শত কদলী লই ঃ
তার রাজা দেখ আমি হই ॥
নারী দেশে হয় রাজা ঃ সবে মিলি করি পূজা
আমি সব কর পরিত্রাণ ॥
ছাড় অমঙ্গল বেশ ঃ ভুঞ্জঅ কদলীদেশ ঃ
নবদ ....মাতে ॥
আমি ধরি হাতে পায়ে ঃ চামর করিএ বায়ে ঃ
দাসি হইয়া রহিবাম সাতে ॥
বিচিত্র বসনে পৈর ঃ ক্ষ.........তুমি এড় ঃ
সিঙ্গা-সনে কর আরোহন ॥
কদলীর রূপ দেখি মিনের পুলকে আখি ঃ
শুনি সবের মধুর বচন ॥
পুলকিত মীননাথে দেখিরূপ সহসাতে ঃ
দেখি সবের নতুন যৌবন ॥
ভোলেতে পড়িল মিনঃ হারাইল গুরুর চিন ঃ
কদলিতে ভুলি গেল মন ॥
বুঝি সবের অনুমান ঃ নআনে দিলেক সান ঃ
ধরিলেন্ত মিন সব নারী ॥

---

(১) হও ; অনুজ্ঞার এই আকারটি দ্রষ্টব্য।

যোলসত কদলি ধরি ঃ হাতে ২ হাতে ধরাধরি ঃ
দোলয়ে সে সুবর্ণ * * ভরি ॥

চতুর্থ পাতা (২)

সিঙ্গাসনে বসাইল ঃ প্রসাদ মালা গলে দিল ঃ
ছত্র ধরি করে হুলাহুলি ॥
কদলিতে মিন রাজা ঃ নারী সবে করে পূজা ঃ
সবে মিলি ধরে ফিরি ফিরি ॥
কেলি কুতুহল রসে ঃ রাত্রিদিনে মিনে বৈসে ঃ
শিতলিত চামরের বায় ॥
রাত্রিদিন করে কেলি ঃ মন গেল কামে ভুলি ঃ
কোন নারী ধরে হাতে পায় ॥
ত্যাজিল গুরুর বোল ঃ কামে হত হইল ভোল ঃ
রতি রসে মগ্ন হইল অতি ॥
সকল যুবতিগণ ঃ কেলি করে অনুক্ষণ ঃ
ক্রিয়া বিনে আর নাহি মতি ॥
মিনে ভাবে অনুক্ষণ ঃ না জানি আইসে কোন জন ঃ
যোঙ্গলা কমলা লৈয়া জায় ॥
আদেশিলা যে মিনাই ঃ যুগী পায় জেই ঠাই ঃ
মারিয়া যে ফালায় নিশ্চয় ॥
রাজার আদেশ পাইল ঃ থরে ২ থানা দিল ঃ
হেন মতে হইল অঙ্গীকার ॥
নিশ্চিন্ত রহিল মিন ঃ নাহি জানে রাত্রি দিন ঃ
রহিলেক পুরীর মাঝার ॥
নানা কুতুহল রসে ঃ কতদিন মিনে বৈসে ঃ
নারী লইয়া থাকেন্ত বেড়িয়া ॥
তাম্বুল যোগায় কেহ ঃ চামড়ে করয়ে বাহ ঃ
কেহ দেয় চন্দন লেপিয়া ॥
আনিয়া কাঞ্চন বারি ঃ ভৃঙ্গারের জল ভরি ঃ
পাখালিল দুইখানি চরণ ॥
কদলি সকল আনি ঃ চরণের লইল পানি ঃ
বসিবার দিল সিঙ্গাসন ॥

চন্দ্র যেন সুশোভিত ঃ তারাগণ বেষ্ঠীত ঃ
কদলিতে রহিলেক মিন ॥
নানামতে কেলিরসে ঃ কতদিন মিনে বৈসে ঃ
মোহাদেবী হইল গর্ব্ববতী ॥
কালে দিনে প্রসবিল ঃ সুন্দর কুমার হৈল ঃ
যোঙ্গল করিল নানাভিতি ॥
রাজার কুমার হইল ঃ তখনে গনিয়া চাহিল ঃ
নাম থুইল বিন্দু জগন্নাত ॥
ভাট বিপ্রনারীগণ ঃ তুষিলেক দিয়া ধন ঃ
যোঙ্গলা রহিল তান সাত ॥

॥ খর্প ছন্দ ॥

মিন নাথ পরিলেক কদলির ভোলে।
গোর্ক্ষনাথ রহিলেক বকুলের তলে ॥
হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ।
গোর্ক্ষেরে দিবারে মুই না পারিল লাজ ॥
এমত ভাবিয়া দেবী মনে কৈল ভ্রম।
বিবস্ত্রা হইয়া গেল গোর্ক্ষের আশ্রম ॥
সম্মুখে রহিল দেবী বিবস্ত্রা হইয়া
* * * * করি দুই জানু প্রসারিয়া ॥
আসন ছাড়িয়া গোর্ক্ষে যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পাতা (১)

হরের ঘরিনি দেবী সম্মুখে দেখিল ॥
বিবস্ত্র দেখিয়া তবে মনেতে ভাবিল।
অতিবড় লগ্ন্য বেটী কিকর্ম্ম করিল ॥
আস্তে বেস্তে দেখিয়া যে গোর্ক্ষে গেল ধাইয়া।
ঢাকিলেক * * বিল্বপত্র দিয়া ॥
গোর্ক্ষনাথের স্থানে দেবী বড় লাজ পাইল।
ততক্ষণে মোহামায়া মাছি রূপ হইল ॥
আসনে বসিতে দেবী পেটেতে সামাইল।
মনেতে ভাবিল গোর্ক্ষে মোরে দুঃখ দিল ॥

তখনে জানিল গোর্ক্ষে দেবীর হেন কর্ম্ম।
উদরে রহিল দেবী জানিলেক মর্ম্ম ॥
তালি মারি রহে নাথ দশমীর দুয়ার।
প্রকাশ না পায় দেবী ছটফটি সার ॥
মহাদুক্ষ পাইয়া দেবী ডাকিয়া বলিল।
তুমি বড় সতীনাথ নিশ্চয় জানিল ॥
পথ এড়ি দেয় মোরে জাম নিজ ঘরে।
বড় দুক্ষ পাইল মুই তোমার ওদরে ॥
দেবীর বচনে গোর্ক্ষ হাসিতে হাসিতে।
কোন পথে এরি দিব লাগিল ভাবিতে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথে মনে কৈল সার।
মার্গপথে গোর্ক্ষনাথে করিল বাহির ॥
বাউর ঠেলায়ে দেবী বাহিরে পড়িল।
দোমের ঠেলায়ে বেথা কাকালিতে পাইল।
কটী ভঙ্গ হইয়া দেবী তথাতে রহিলা।
তথাতে রহিয়া দেবী সকল সহিলা।
প্রতিদিন ভক্ষ্যএক মনুষ্য পাইল।
প্রতিদিন এই মতে খাইতে লাগিল ॥
এথাতে না পায়ে শিবে দেবীর দ্রসন।
গোর্ক্ষেরে ধরিয়া সিবে করে কদার্থন ॥
কথা গেল মোর নারী তুমি কে না কৈলা।
শুনিয়া যে গোর্ক্ষনাথে হাসিতে লাগিলা ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে কি বলিব তোরে।
কথায় হাড়াইলা নারি ধর আসি মোরে।
তখনে যে গোর্ক্ষ নাথে রাড়াত (১) চলিল।
দেবীর সাক্ষাতে গিয়া গর্জ্জিতে লাগীল ॥
কিবা কর্ম্ম কর তুমি কর অনাচার।
দেবতা হইয়া কর মনুষ্য আহার ॥
সেইসে গোর্ক্ষে তবে নিবন্ধ করিল।
কালি বলি এক মূর্ত্তি রাড়াত রাখিল ॥
গোরী লৈয়া আইল নাথে শিবের সমাজ।
এথা দৈবে বিপরিত হইয়াছে কাজ ॥ (২)

* * * * *

আমারে পাইতে স্বামীর মনের হভিলাষ।
উর্দ্ধাসনে মাগি বর শঙ্করের পাস ॥
কৈন্যার তপস্যা দেখি নিতি চিন্তে হর।
গোর্ক্ষসঙ্গে বিবাদ যে হইছে দেবীর ॥
কোন মতে বিরোধ হইব সমাধান।
এহি কন্যা গোর্ক্ষে নেউক দিল স্বামিদান ॥
সেবক বৎসল হর কৃেপার সাগর।
গোর্ক্ষনাথ পতি হউক তোরে দিল বর ॥
আমার নাহিক কেহ ভোবন ভিতর।
স্বামী হইতে তোমারে তাহারে দিল বর ॥
শিবের বচনে গোর্ক্ষের হইল সঙ্কট।
ভাল বর দিলা হর করিয়া প্রকট ॥
গুরুর গুরুর আজ্ঞা পালিবার চাহি।
শিবের বচনে কন্যা বোলিলেক যাই ॥
স্বামী পাইয়া বিরহিনী চলি গেল ঘর।
নাথেরে লইয়া গেল পুরীর ভিতর ॥
তবে যদি সতী কন্যাএ ধ্যানে কৈল ভোর।
দুক্ষের বালক আইল পুরীর ভেতর ॥

---

(১) এইখানে দেখা যায় যে, রাঢ় দেশে যাইয়া গোর্ক্ষনাথে এক কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। গোর্ক্ষ-নাথ প্রতিষ্ঠিত কোন কালীমূর্ত্তি রাঢ়ে আছে বলিয়া অবগত নহি। কালীঘাটের কালীর প্রসঙ্গ নয় ত?

(২) এইখানে মূল পুথিতে পঞ্চম পাতার প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হই-য়াছে তাহার সহিত এই প্রথম পৃষ্ঠার প্রসঙ্গের মিল নাই। মধ্যে অনেকখানি লিপিকার প্রমাদ বাড়িয়া গিয়াছে।

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যাএ বলে আচা ভুয়া (১) ॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে।
শুনি কি বলিব মোর বাপ আর মায়ে ॥
হাসিবে সকল লোকে বৃথা হৈল কাজ।
বর না পাইল আমি পাইল মহালাজ ॥
মনেত ভাবিয়া দুক্ষ বহুল কান্দিল।
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা বিমর্স্যিয়া (২) চাহিল ॥
গোর্ক্ষের বুঝিল সব মায়ার চরিত্র।
মায়া করি ভণ্ডিতে তাহার হইল চিত্ত ॥
ই বলিয়া রাজকন্যা স্তুতি আরম্ভিল।
করজোর করি নারী কহিতে লাগিল ॥
মহাদেব দিল বর স্বামী পাইল তোকে।
কপট করিয়া প্রভু কেনে ভাণ্ডে মোকে ॥
কপট ছাড়িয়া যদি না তোষ আমারে।
স্ত্রীবধ দিব আমি কহিল তোমারে ॥
কুমারির বাক্য সুনি ইসিদে (৩) হাসিল।
কন্যা সম্বুদিয়া সিদ্ধা কহিতে লাগিল ॥
তোমারে ভাণ্ডিল হয়ে কপট করিয়া।
কহিব সকল কথা না করিবু মায়া ॥
না হয় স্ত্রীপুরুষ মুই না হই যুবান।
তেজঃবীর্য্য নাহি মোর কহি তোমার স্থান।
সুকুনা শরীর মোর কাষ্ঠ সম সর।
ছায়াতে নাহিক ফুল মান্দার সম সর ॥

(১) আশ্চর্য্য।
(২) বিমর্ষ হইয়া; অথবা সংস্কৃত বিমৃশ্য হইতে আসিয়াছে ধরিলে "চিন্তা করিয়া" এই অর্থ হয়।
(৩) ঈষৎ।

শরীরেতে বিন্দু নাহি কাষ্ঠ সম সর।
সিদ্ধার মেনেতে (১) নাহি মোর সমসর ॥
আমার বচন দেবী যদি ধর তুমি।
পাইবা পুত্রের বর যদি দিব আমি ॥
আমার কর্পটি জলের সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
ভক্তি করিয়া তারে যেই জনে লয় ॥
এহি কর্পটির ধোয়া যদি কর পান।
জন্মিবেক সিদ্ধাপুত্র দেখ বিদ্যমান ॥
গোর্ক্ষের বচন তবে শিরেতে করিয়।
কর্পটি ধুইয়া জল খাইল আনিয়া ॥
কর্পটি ধুইয়া যদি খাইলেক পানি।
সেই জোগে গর্ভবতী হৈল কন্যা খানি ॥
দশদণ্ড অন্তরে ছাওয়াল প্রসবিল।
সর্ব্ব অঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহারে দেখিল ॥
দেখিয়া যে গোর্ক্ষনাথে ধ্যান আরম্ভিল।
শ্রীকর্পটিনাথ নাম তখনে রাখিল ॥
কন্যা সম্ভাষিয়া তবে গোর্ক্ষে চলি গেল।
বিজয়ানগর (২) ছাড়া বৈকুণ্ঠেত গেল ॥
বৈকুণ্ঠেত বসে নাথ করিয়া আসন।
কালফা চলিয়া যায় সৈন্যেত গমন ॥
বায়ুবেগে চলি যায় মনে জপি গতি।
তরুতলে বসিয়াছে গোর্ক্ষ মহামতি ॥
ছায়ার শরার গোর্ক্ষ দেখে ততক্ষণ।
হাসিয়া চলিল তবে গোর্ক্ষ মহাজন ॥
এমত আছয়ে কোন সিদ্ধার ভিতর।
না কৈল আমারে মান্য কিশের অন্তর ॥

(১) অর্থ কি? বোধ হয় "মাঝে" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) বিজয় নগর কোথায়? রাজসাহীর অদূরে প্রসিদ্ধ বিজয়সেনের রাজধানী এক বিজয় নগর আছে।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩২১ | ৮ম সংখ্যা

ভারতীয় ধর্ম্ম বনাম সাহিত্য (১)

মনুষ্যকে উপাসনাশীল জীব বলিয়া সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে স্থানেই মনুষ্যসংঘ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলের মধ্যে এই উপাসনার লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া, আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। মনোবিজ্ঞান যেমন ক্রমে সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়া নিখিল মনুষ্য-মনের অনন্ত একাত্মতা দর্শন করিতেছে, ধর্ম্মবিজ্ঞানও প্রত্যক্ষ প্রমাণরাজির সংগ্রহ এবং সমন্বয় পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, মনুষ্যের এই উপাসনা-বুদ্ধি মূলতঃ এক এবং অখণ্ড! মনুষ্যকে জীবনমার্গে প্রতিপদেই জগতের বা জগৎব্যক্তির সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া, নিজকে প্রতিপদে বাহিরের প্রচণ্ড অজ্ঞাত শক্তির সমক্ষে ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভব করিতে হয় বলিয়া, এই উপাসনা অপরিহার্য্য ভাবে উক্ত অনুভবের সহচর হইয়াছে। এই উপাসনা লক্ষণকে মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করা হয়।

সকল ধর্ম্মের আদি ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, উহা সর্ব্বত্র অসহায় মনুষ্যমনের ভয়, বিমোহ অথবা বিস্ময় হইতে উপজাত হইয়াই ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। আদিম অবস্থায় তাহার মধ্যে কোনরূপ অন্তর্মুখিতা, অধ্যাত্মতা কিংবা প্রীতিপবিত্রতার নামগন্ধও মুখ্য হইতে পারে নাই। আজীবন উপাসনা প্রায় স্থানে কেবল ঐ অজেয় প্রচণ্ড শক্তির তোষামোদমূলক স্তবস্তুতি কিংবা বশীকরণের উপায়মূলক মন্ত্রকৌশল অথবা পরিতোষার্থক উৎকোচদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক উপাস্য-উপাসকের মধ্যে ভক্তি, প্রীতি, অথবা পবিত্রতার উপর যে একটা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ তাহা নানাদিকে মনুষ্যের সমাজ এবং অধ্যাত্মজীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং অভিজ্ঞতার সামগ্রী বলিয়াও ধারণা জন্মিতে থাকে!

আরও দেখা যাইবে যে, ঐ ভয়-বিস্ময়ের লক্ষ্য-স্বরূপ

(১) এই প্রসঙ্গ লেখকের যাত্রীপন্থা নামক বিস্তারিত গ্রন্থে "ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি" শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্গত; এবং গত সনের বিজয়া পত্রিকার আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান ইতিহাস বনাম সাহিত্য" নামক প্রবন্ধের সহিত ক্রমসূত্রে সম্বন্ধ।—লেখক।

'অজ্ঞাত' পদার্থকে প্রাচীনকালের মনুষ্য কচিৎ 'এক' বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিল! বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষতঃ বহুধা-বিভিন্ন কার্য্যকারণশক্তির লীলাস্থলী বই নহে। প্রত্যক্ষের অন্তরালে কোন 'একতা' আছে কি না, এই প্রশ্ন এবং উহার সমাধান মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধির উত্তর ফল। মনুষ্য অতীতকালের দীর্ঘ জীবনপথে চলিতে চলিতে কচিৎ-কখন 'ঘুণাক্ষরে' তাহার সম্মুখীন হইলেও, উহাকে সজ্ঞানে এবং দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার বিজ্ঞাননেত্রে সমন্বয়শক্তির (Synthesis) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের আদিকারণবিষয়ে এই 'একত্বের অববোধ' বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মানুষ ক্রমে বিকাশমান সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই একত্বের অনুভবে সুস্থির হইয়া উহার সঙ্গে সমুন্নতভাবের 'পিতৃত্ব' 'মাতৃত্ব' কিংবা সখ্যদাস্যমধুর রসের সম্বন্ধ অথবা 'অভেদ-সম্বন্ধ' পাতাইয়াছে; এবঞ্চ ঐকান্তিকী ভক্তি ও পবিত্রতার আদর্শে কিংবা রসতন্ময়তার আদর্শে তদ্গত হইতে পারিতেছে।

এই সমস্ত মনুষ্যের আদিম উপাসনা-বুদ্ধি বা ধর্ম্ম বুদ্ধির ইতিহাসের গোড়ার কথা বলিয়া এই বিষয়ে সকল উপক্রমের প্রাক্কালে তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

এখন, মনুষ্যের এই আদিম উপাসনা-বুদ্ধি দেশকাল-পরিবেশের বাধ্য হইয়া যে কত বিভিন্ন দিকে কত বিভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বনে বিকাশিত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহা কোন দেশে 'প্রেতপূজা' বা 'পিতৃপূজা' রূপে, কোথাও বা বিশ্বপ্রকট নিসর্গ-শক্তিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রদান পূর্ব্বক 'দেবপূজা' রূপে, জন-মন-ধন প্রভৃতি বিষয়ে অভয় অথবা অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তবে সমস্ত ব্যাপারের আন্তরিক তত্ত্বটি এই যে, সমস্তই মনুষ্যের আদিম কারণপিপাসার বা চরমতত্ত্বের বিজ্ঞান ক্ষুধার ফল! অপিচ, প্রাচীন মনুষ্যের পরিবার কিংবা সমাজজীবন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা তাহার সাহিত্যের মূল গতি উহার প্রভাবেই অপরিহার্য্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল! সুতরাং, মনুষ্যের এই বুদ্ধি এই প্রচেষ্টা এবং প্রাপ্তির ভালমন্দ বা উচ্চাবরতার উপরেই যে তাহার সমগ্র জীবনের মূল গতি নির্ভর করিতেছিল, তাহার বিশ্বসিত পদার্থের পাপপুণ্য লক্ষণের উপরেই যে তাহার জীবনের পাপপুণ্য উপাদান এবং গতি নির্ভর করিতেছিল, এই কথা আমাদিগকে নিয়ত ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে 'সামান্য' একটা কথার উপরে, এবং ঐ কথায় বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস নামক একটা সামান্য মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম কাঁটার উপরেই যে মনুষ্যের সমগ্র জীবনের তাবৎ ক্রিয়াফল এবং উহার ভালমন্দের মানদণ্ডটুকু সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহাও আমাদিগকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব, জগৎ কিংবা জগৎকারণের বিষয়ে কোন মনুষ্যের বা সমাজের বা জাতির প্রকৃত ধারণা কি তাহা জানিতে পারিলে তাহার ইহজীবনের 'মহাদশা' নিরূপণ করিবার পথে অনেক বাধাই অপসৃত হইয়া যায়।

আরও দেখা যাইবে যে, এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রথমতঃ কেবল আচার অনুষ্ঠানরূপে উপজাত হইয়া ক্রমে দেব-পরিতৃপ্তির বিভিন্ন উপায় এবং কৌশলরূপেই নানাপ্রকার মন্ত্রমুদ্রার আকার গ্রহণপূর্ব্বক অত্যন্ত জটিলতা এবং অপরিহার্য্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং ক্রমে সকল দেশেই একশ্রেণীর লোকের মধ্যে একচেটিয়া হইয়া গিয়াছিল। আদিম মানব-ধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বত্র উপাস্য এবং উপাসকের মধ্যবর্ত্তী পুরোহিত! এই পুরোহিতের হস্তে পড়িয়া সকল দেশেই মনুষ্যমনের সহজসরল ধর্ম্মলক্ষণ নানাদিকে সার্থক অথবা অর্থহীন গহনতা লাভ পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যসংঘেই অনেক স্থলে এক একটা স্বতন্ত্র জাতির বা সম্প্রদায়ের

সৃষ্টি করে। ক্রমে মনুষ্যসমাজে রাজশক্তির উৎপত্তি, অভ্যুদয় এবং ক্রমপরিণতি সংঘটিত হইলেও এই পুরোহিত-শক্তি অনেক সময় উহার সহিত পাল্টা দিয়া মনুষ্যের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের অধিকার লইয়াই গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্য-ভাবে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। কখন রাজা, কখন বা পুরোহিত জয়ী হইয়া মনুষ্যের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বলিতে কি, এই পুরোহিতই পূর্ব্বকালে মানুষের সমস্ত সারস্বত ব্যাপারকে, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারকে একচেটিয়া করিয়া রাখার দরুণ প্রাচীন মনুষ্যের সাহিত্যও বহুপরিমাণে (অনেক স্থলে নির্ব্বিশেষে) ধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল; অনেক স্থলে পুরোহিতের স্বার্থ এবং স্বার্থসম্পর্কিত উপদেশের গুপ্ত কিংবা প্রকাশ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ রূপেই পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে মনুষ্যের সভ্যতা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই এই পুরোহিতশক্তি রাজশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে; সুসভ্য দেশসমূহে পুরোহিত রাজাধিষ্ঠিত সামাজিক সাধারণের নির্ব্বাচিত ভৃত্যরূপেই পরিণত হইয়া যাইতেছেন। মনুষ্য-অদৃষ্টের একটা প্রধান নিয়ন্ত্রণা এবঞ্চ পাপ-নিয়তি সৌভাগ্যবান জাতিসমূহের মধ্যে এইরূপ পরিচ্ছিত হইতেছে। বহুপরবর্ত্তী কালের জাতি এবং ক্রম-বিকাশের ফল হইলেও এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে,মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান গতি এবং প্রবৃত্তি প্রকারান্তরে জন্মজাতিগত পুরোহিতের স্বার্থকবল হইতে ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্য প্রভৃতির উদ্ধার বই নহে।

এখন এই স্থানে বলিতে হয় যে, বিভিন্ন দেশে কিংবা কালে এই 'ধর্ম্ম' কোন কোন দিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, উহার মূল অর্থ-ব্যক্তির কোথাও বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উহার একটা 'সংজ্ঞা' স্থির করিতে হইলে, সমস্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে অবস্থিত একটা তত্ত্বের নিরূপণ করিতে হইলে, বলিব যে, উহা মনুষ্যের সহজাত 'রিপু'-প্রবৃত্তিগুলির সংযম, এবঞ্চ জীবনের শান্তি, পবিত্রতা এবং প্রেমপ্রবৃত্তিগুলির অনুসরণমূলক 'ঊর্দ্ধগতি' বই নহে। পৌরোহিত্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উহা সর্ব্বত্র প্রবল হইতে না পারিলেও, এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন শক্তি লাভ করিয়াছিল: ধর্ম্মই 'মনুষ্যত্ব' লাভের সহায় বলিয়া মনুষ্যমাত্রেই যেন মানিয়া চলিতেছিল। সুতরাং এ যাবৎ মনুষ্যের যাহা উন্নতি, শ্রেয়ঃ, কিংবা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা যেমন এই ধর্ম্মের দরুণেই ঘটিয়াছে, তেমন, মনুষ্যের প্রধান অবনীতি, অবগীতি এবং অধঃপাত, বা জীবন-পথে তাহার সমস্ত স্থগিত, স্তম্ভিত ভাবও এই ধর্ম্মের গতিকেই ঘটিয়া আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন মনুষ্যের 'ধর্ম্ম' আদর্শ বিস্তারিত ভাবে কেবল 'আচার' সমষ্টিকেই, প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিকতাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া জাতিবিশেষের সমস্ত পাপ, মৃত্যু, অধঃপাতও প্রধানতঃ তাহার 'ধর্ম্ম' হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যের হৃদয় তখন নিজের জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভাবের বৃত্তিকে পরস্পর কার্য্য সম্পর্কে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে নাই, ধর্ম্মবিধি হইতে সমাজ-বিধিকেও পৃথক করিতে পারে নাই; সুতরাং কেবল বাহ্যিক আচার সাহায্যেই ধর্ম্মকে ধারণা করিতে ছিল। এই কারণে কেবল প্রাচীন-প্রীতি এবং পরাচীনতাই ধর্ম্ম আদর্শের বলবান্ ভিত্তি হইয়া পড়ে। এ স্থলে ইহাও বলিতে হয় যে, পূর্ব্ব-প্রীতি যেমন মনুষ্য-সমাজের প্রবল রক্ষক, অন্যদিকে উহাই তাহার জীবন-পথে প্রবলতম অন্তরায়। যে মনুষ্য বা যে জাতি জগৎ-গতির সঙ্গে পূর্ব্বাপরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সে-ই সৌভাগ্যবান্। কিন্তু মনুষ্যজাতির সংখ্যার তুলনায় উহার দৃষ্টান্ত এখনও স্বল্প, এমন কি নাই বলিলেই চলে। ইহা জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, এই ধর্ম্ম বা উহার আচার আদর্শ হইতেই জগতের অধিকাংশ জাতি নিজের পাপতাপ এবং মৃত্যু

ভোগ করিতেছে। যে জাতি নিজের অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে, নিজের জ্ঞান-ভাব এবং কর্ম্ম-আদর্শের মধ্যে, নিজের ধর্ম্ম এবং আচার-আদর্শের মধ্যে জগৎ-স্রোতের সামঞ্জস্য করিতে পারে না, ঐ সামঞ্জস্য ঘটনায় বিষয়ে যাহার হৃদয় মধ্যে অনতিক্রম্য বাধাসমূহ বর্ত্তমান আছে, যাহার সমাজনীতি বা আচার ধর্ম্মনীতি অনতিক্রম্য প্রভুতা এবং অচলতা লাভ করিয়া, তাহাকে জড়ত্বা অথবা ভাবোন্মত্ততার বশবর্ত্তী করতঃ বর্ত্তমানের বিষয়ে অচল অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহার রক্ষামন্ত্র কে উচ্চারণ করিবে? যেহেতু ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহলোকে মনুষ্যের আর কিছুই বড় নহে। ধর্ম্মই মনুষ্যকে 'অনন্তের সন্তান' বলিয়া আশ্বাস দিয়া ইহজীবনকে উহার তুলনায় মুহূর্ত্ত মাত্র বলিয়া—কেবল 'শতবৎসরী' পান্থ বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে ইহজীবনের সমস্ত অপরিহার্য্য পাপতাপ বেদনার সম্বন্ধে 'বে-পরোয়া' করিয়া তুলিয়াছে! সুতরাং এই ধর্ম্মই যদি অন্যদিকে তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া কতগুলি সংকীর্ণ মতামত বা অনতিক্রম্য আচার আদর্শের পর্দ্দা তুলিয়া তাহাকে জগৎ বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আর সহায় কে? তাহার রক্ষকই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, জগতের সকল জাতির মধ্যেই এইরূপে রক্ষকটাই ভক্ষক হইয়া পড়ার দৃষ্টান্ত আছে! সকল জাতিই এই পৌরোহিত্য-অধিষ্ঠিত সংকীর্ণ 'আচার' আদর্শের জড়তা এবং অচলতার বিষ-রসে কিছু-না-কিছু দুর্বিপাক ভোগ করিয়া থাকে—উহা মনুষ্যের অপরিহার্য্য রোগ। সৌভাগ্যবান্ সেই জাতি, যাহার মধ্যে উহার মাত্রাটুকু কম! কিন্তু এই মাত্রার সামান্য বেশী-কমির পার্থক্যই এই ক্ষেত্রে তিলকে তাল করিয়া তোলে! মানুষে মানুষে যাহা পার্থক্য, জীবিত কিংবা মৃত জাতির মধ্যে, প্রভুত্বজীবী বা দাসত্বজীবী জাতির পার্থক্যটাই এই খানে! মনুষ্যের এবং পশুজাতির মধ্যস্থিত পার্থক্যটাও এই স্থানে নহে কি? মনুষ্যের ধর্ম্ম তুলনায় গতিশীল; পশুদের ধর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতিশীল—যুগ যুগান্ত ধরিয়া 'সনাতন'!

মনুষ্যজীবনের সকল বিভাগকেই অধিকৃত করিয়া এমন কি পরিব্যাপ্ত ভাবে কবলিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া, প্রাচীন মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান-মূলক ধর্ম্ম-আদর্শ হইতে তাহার সমাজ-সাহিত্য-শিল্পের নিয়তিকে পৃথক করা যায় না। উহা মনুষ্যের সমস্ত অবিভক্ত এবং অবিশিষ্ট মনস্তত্ত্বের ওতপ্রোতঃ সম্বন্ধ হইতে উপজাত অথচ একটা 'একহারা' (Homogenious) পদার্থ! মনুষ্যের মন ক্রমান্বয়ে জীবনের সূত্রে এবং জগতের গতি-সঙ্গতে নানাপথে প্রবাহিত হইয়াই বা heterogeneity লাভ করিয়াই তাহার সাহিত্য প্রভৃতিকে আচারমূলক 'সনাতন ধর্ম্ম' প্রভুত্বের কবল হইতে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যের ইতিহাস বিজ্ঞান বা দেশকালের অবস্থা-পরিজ্ঞান ক্রমাভিব্যক্ত হইয়াই 'বিশ্ব-মনুষ্যতা' 'বিশ্ব-সভ্যতা' এবং 'বিশ্ব-সাহিত্য' প্রভৃতি আদর্শ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, এবং নিজ নিজ 'জাতীয়' আদর্শের সহিত উহার সঙ্গতি এবং সমন্বয় লক্ষ্য করিতেছে। এখনো 'জাতীয় সভ্যতার' অবস্থাভেদে দেশে দেশে এই 'সনাতনত্বের' দৃষ্টান্ত আছে! এমন জাতিও আছে, যাহার ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্র এবং অনুষ্ঠান মধ্যেই পরিসমাপ্ত, যাহার বাণী-ভাণ্ডারে ধর্ম্মাচারসম্বলিত মন্ত্রগাথা ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সাহিত্য-বিত্ত নাই। ভারত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ মহাসমুদ্রের দ্বীপসমূহে যে সমস্ত অসভ্যজাতি বর্ত্তমান আছে, তাহারা কত যুগান্ত ধরিয়া এই পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের মনুষ্য সভ্যতার উপার্জ্জন এবং উহার পরিচয়-সংস্রব হইতে দূরবর্ত্তী থাকিয়াই পার্থিব জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে! তাহাদের ধর্ম্মপদ্ধতি মধ্যে এবং বাণী-চেষ্টার মধ্যেও একটা যুগযুগান্তজীবী অচলতা রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই উহাদের মধ্যে

ইয়োরোপীয় কর্ম্ম-গতিশীল জাতিসমূহের প্রভাব আপতিত হইয়া, তাহাদের 'সনাতন' ধর্ম্মকে বিচলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রাচীন মনুষ্যের সমাজ এবং ধর্ম্ম আদর্শের ওতপ্রোত বন্ধনের এই ইতিহাস. উভয়ের এবং সাহিত্যের এই অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি-সংযোগ, অপিচ মনুষ্যের সভ্যতাগতি সহকারে ক্রমিক বিশ্লেষণ এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের এই ইতিবৃত্ত, প্রত্যেক মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, এবং ঐ শিক্ষাই মনুষ্যমাত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কারণ, মনুষ্যজীবনের অর্দ্ধেক ভুলভ্রান্তি এবং দুঃখ এই শিক্ষার অভাব জনিত গোড়ামি হইতে, পূর্ব্বাপর জ্ঞানের অভাব এবং সমাজবিধি ধর্ম্মবিধি ও সাহিত্য আদর্শের বিরূপ 'আলথালকে' পৃথক করার অক্ষমতা হইতেই উদ্ভূত! বলিতে কি, উক্তরূপ গোড়ামি হইতেই এখন যাবৎ সভ্যতা-অভিমানী জাতিসমূহের মধ্যেও এইরূপ শিক্ষার মাহাত্ম্যটুকু যথার্থভাবে অধিগত কিংবা ঐ কর্ত্তব্যটুকু যথোচিত মতে অনুসৃত হইতে পারিতেছে না।

মানবের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুলির তুলনা মূলক অধ্যয়ন পথেই দেখা যাইবে যে, মানুষ একরূপ জ্ঞানকৃত অন্ধতার বশবর্ত্তী হইয়াই, 'মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মের অন্তরঙ্গীয় এবঞ্চ শাশ্বতী নীতিকে নানাদিকে অবহেলা করিয়াই, কোথাও বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানবিশেষকে অপরিহার্য্য ধরিয়া, কোথাও বা প্রাচীন গ্রন্থবিশেষকে অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের বাক্য, কোথাও বা ব্যক্তিবিশেষকেই ঈশ্বরের পুত্র বা প্রতিনিধি অথবা ত্রিকালজ্ঞ এবং সনাতন শাস্তা বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক পরস্পরের বিষয়ে অসহিষ্ণু এবং ঐকান্তিক হইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নিজের সমস্ত সুখদুঃখের এবং পাপপুণ্যের দুরন্ত অদৃষ্ট পাকাইয়া বসিয়াছে। এই স্বেচ্ছাকৃত নাগপাশ হইতে মানুষ শতচেষ্টা সত্বেও স্বাধীন হইতে পারিতেছে না!

অল্প কথায় বলিতে গেলে, মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে আদিম শোণিত-সম্বন্ধ সূত্রের অনুসরণ পূর্ব্বক যেমন পরিবার এবং গোত্র, গোষ্ঠী এবং বংশবদ্ধ হয় তেমনই জীবন-নীতির বাধ্য হইয়াই গ্রাম-সমাজ গঠন করে। এই সমাজবিধি ক্রমে পৌরোহিত্য-অধিষ্ঠিত ধর্ম্মবিধির সহিত পরস্পর জড়িত বিজড়িত হইয়া এবং 'গাঁট বাধিয়া' উভয়ের সন্ধি এবং বিচ্ছেদের স্থলগুলি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেয়! উহার বাধ্য হইয়া তাহার মতিগতি চরিত্র এবং বাক্যচেষ্টা পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে! মানুষ এই নিয়তির শাসনাধীন হইয়া স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য সভ্যতাসূত্রে ক্রমে এই গাঁটগুলি একে একে খুলিয়া আপন তত্ত্বকে স্বাধীন করিতে চাহিতেছে বই নহে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কত বাধা-বিপর্য্যয়! কত যুদ্ধ! এবং তাহার জীবনশক্তির কত অপব্যয়! যুগে যুগে মনুষ্য মধ্যে 'দ্রষ্টাগণ মহাপুরুষ-গণ' অভ্যুদিত হইয়া ন্যূনাধিক স্থানকালের উপযোগী আদর্শে নব-নব 'ধর্ম্মের' খ্যাপন পূর্ব্বক মনুষ্যকে বাহ্যিক 'সনাতনতার কবল হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বই নহে। তবে তাঁহাদের চেষ্টাও মনুষ্যের দুরদৃষ্ট গতিকেই অনেক স্থলে যে নব নব বন্ধনের দড়িরূপেই বিপাক লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়! ঐ আদিম কারণ পিপাসা এবং উপাসনা বুদ্ধির বাধ্য হইয়া হতভাগ্য মনুষ্য নিজের ধর্ম্ম, আচার, সমাজ আদর্শ এবং পৌরোহিত্য প্রভৃতির বেড়া-জালে পতিত হইয়া কতদিকে পাশবদ্ধ এবং পঙ্গু হইয়া গিয়াছে! কত রকমের কত দেবদেবতার কল্পনা এবং পূজা অর্চ্চনার ফেরে পড়িয়া কতদিকে ম্রিয়মান হইয়া চলিতেছে! তাহার কায়িক ও মানসিক পরমার্থ এবং সুখশান্তি কতদিকে ব্যাহত হইয়াছে! প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব', মনুষ্যের সভ্যতা আদর্শ, মনুষ্যনেত্রের ঋজু-দৃষ্টি এবং হৃদয়ের ঋজু-গতি কতদিকে পাকচক্রে পড়িয়া তাহাকে দেশে দেশে কোথাও বা অধোগামী, কোথাও বা স্থবির, কোথাও বা চিরকালের জন্য পঙ্গু করিয়া গিয়াছে! সর্ব্বোপরি তাহার অহঙ্কার—ধর্ম্মগর্ব্ব বা আচার

অনুষ্ঠানের গোড়ামি বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে কতদিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফেরে পড়িয়া পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটি, মারামারি এবং দলাদলি প্রাচীনতম কাল হইতে মনুষ্যসমাজে পশুত্বের লক্ষণকে অটল করিয়া রাখিয়াছে! পৃথিবীবাসী মনুষ্যের এই ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে হৃদয়বান মানুষমাত্রই অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া পারেন না! উপায় কি? হতভাগা মানুষ নিজের দেশকাল এবং জন্মগত নিয়তির বশেই কত দুরদৃষ্ট ভোগ করে, তাহার সাহায্য করিবার কে আছে? যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমন জাতির জীবনেও এই

এত প্রবল দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সন্দেহ হয়—বুঝি, দুনিয়ার কোন মালীক নাই! দেবতা কি ঘুমাইতেছেন! সামান্য একটা বিশ্বাসের গতি-কেই, কেবল সমাজ-আদর্শের গতিকেই কত জাতি অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! পৃথিবীর মানচিত্র-খানি খুলিয়া বসিয়া এক একটি দেশ-সীমা-নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যসংঘের অতীত এবং বর্ত্তমান চিন্তা করিলে হৃদয় ক্ষমতাহীন দৈন্য-কারুণ্যে আকুল হইয়া উঠে! যেমন বলিয়াছি, যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া কোন কোন দিকে মানুষের দুঃখচক্র পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকেই বা মানুষ কতক্ষণ এবং কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? এবং উহার শুভফল মনুষ্যের অতীত শতসহস্র বৎসরের ইতিহাস এবং দুঃখদুর্ভাগ্যের ব্যাপকতার হিসাবে কত সামান্য! মানুষ কত ধীরে ধীরে প্রকৃত বিজ্ঞানপথে অগ্রসর হইতেছে! কত জাতির, কত সমাজের মুখ-মণ্ডলে কি অবিজ্ঞাত অতর্কিত বেদনার আভাস! কত জাতির হৃদয়ে নিদারুণ নিয়তি-নিষ্পেষণের কি বুক-চাপা হাহাকার! কি অভাবনীয় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় দীর্ঘনিশ্বাস! কত জাতির ব্যক্তিমাত্রের মুখেই যেন দুঃসহ দুঃখবেদনা ছায়া ফেলিয়া কালী মাখাইয়া গিয়াছে! কত জাতির মুখে যেন গাছ-পাথরের বা 'অহল্যা পাষাণীর' জড়তার, কাহারও বা মুখে কেবল সিংহ-ব্যাঘ্র-গজবানরের প্রকৃতিটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে! অথচ ব্যক্তিমাত্রেই যেন 'সুখে আছি', বলিয়া, 'বড়াই ধরিয়াই' বসিয়া আছে! ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার কিছুমাত্র সদুত্তর পাওয়া যাইবে না—অনেকেই অন্ধ এবং কোন দিকেই আত্মজাগ্রত নহে। কিন্তু ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদের ধর্ম্ম এবং সমাজবন্ধনের মূলতত্ত্বকে—উহাদের জীবনের মূলতত্ত্বকে জিজ্ঞাসা কর, কি ভয়াবহ—কি হৃদয়বিদারক—অথচ অতর্কিত হলাহলের পরিণতি! বলিতে হইলে সমস্তই মনুষ্যের আত্মকৃত! অধিকাংশই স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরার—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দুরাত্মতা, স্বার্থ-নিয়তি এবং অহংকারের অপরিহার্য্য পরিণতি! কোন জাতি প্রত্যেক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং পরিবারে-পরিবারে ভেদআদর্শের অভেদ্য দেওয়াল তুলিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির চোখে মুখেই স্বয়ং-অন্ধতার ঠুলি এবং ঘোমটা দিয়া একটা পরম-সম্মিলনের বা সমাজ-জীবনের আদর্শ পাকাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত! কেহ নিজের পা কাটিয়া, পায়ে লোহার শিকল পরিয়া পা এবং নিজের অর্দ্ধাঙ্গকে পঙ্গু করিয়াই নিষ্পাপ চলাচলের পরমোত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারল বলিয়াই গর্ব্বিত! ঘরে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন পূজ্য পুরুষ চারিদিকে একটা ভাবুকতার কাব্য-গণ্ডী অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, সুতরাং প্রত্যক্ষ দেহটাকেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না। কোন জাতি—জগদীশ্বর প্রাচীনকালে পরম পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে যে একটা পুঁথি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইরূপ অগ্ন্যুৎপাতের কোন উল্লেখ নাই, অতএব ইহা একটা অমূলক কল্পনা বলিয়া মনে করিতেই চেষ্টা করিতেছে! দরদরজা বন্ধ করিয়া এবং চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাটাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছে!

আবার কোন জাতি উহা একটা অপরিহার্য্য কালধর্ম্মের আগুন ও অদৃষ্টের সৃষ্টি এবং এইরূপে পুড়িয়া মরিতে পারাই একটা পরম 'জাতীয় ব্যক্তিত্ব' ও মাহাত্ম্যের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই পুড়িতেছে! অন্যদিকে. অনেক জাতিসমূহ কেবল চলৎশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই পৃথিবীময় এইরূপ বিশ্বাসীর সুযোগ সন্ধানপূর্ব্বক ঘুরিতেছে! মনুষ্য জাতির এবং মনুষ্য অদৃষ্টের নিত্য সত্য অন্তর তত্ত্বের এই গ্রন্থ! আরও কত দেখিব—কি ভয়ানক—কি ভীষণ নিয়তি! স্বর্গে মর্ত্ত্যে আমাদের সহায় কে!

অথচ এই দুরদৃষ্টের মূলে কি? বিষয়টিকে নিরপেক্ষ ভাবে এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য এখন সময় উপস্থিত! এত দুঃখ দুর্ব্বিপাক সত্ত্বেও 'বুদ্ধিমান' মনুষ্য তন্মধ্যে সহিষ্ণু এবং অচল থাকিবার মূল কারণ কি? অল্পকথায় বলিতে গেলে উহা ধর্ম্মকর্ত্তৃক অন্যায় মতে অধিকৃত সমাজের আদর্শ! যেমন বলিয়াছি. মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব একটা স্থির পদার্থ! উহার ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে বিশেষ কোন বিবাদ নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশ দুর্গতিই প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যত্বের প্রধান শক্তীভূত স্বত্ব এবং দায়িত্বের, বা তাহার 'সম্মিলন' আদর্শের ফল! মনুষ্যের পূর্ব্বপ্রীতিনামক মনোবৃত্তির ছিদ্রপথে পৌরোহিত্য কর্ত্তৃক ধর্ম্মের শীল-মোহর অঙ্কিত আচার-তন্ত্রের ফল; সমাজবদ্ধ মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে স্বত্ব এবং দায়িত্ব নিরূপণ বিষয়ে অবিচারের ফল! দুর্ব্বলের বিষয়ে সবলের, অবোধের বিষয়ে বুদ্ধিমানের অত্যাচারের ফল! ধর্ম্ম-অজুহাতের অন্তরালে লুক্কায়িত স্বার্থপরতা, হিংসা এবং অহঙ্কারের নানামুখী পরিণতি!

ভক্তবিশ্বাসিগণের অথবা 'ধর্ম্ম'-আদর্শবাদিগণের এ স্থলে একটা গভীর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, এই দুর্ঘটনা কেন? যে সকল জাতি ধর্ম্মকে—পরমার্থকে—ভগবান্‌কেই ভবজীবনের মুখ্য লক্ষ্যরূপে মানিয়া চলিয়াছে পৃথিবীতে তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন? তবে কি জগতের মালিক কেহ নাই, অথবা ধর্ম্মের গতিই বিশ্বনিয়মের বিরোধী? এ স্থলে বিষয়টির সকল দিকে দৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে অবান্তর হইলেও, বলা অপরিহার্য্য যে আমরা মনুষ্যের ভবজীবনের পরমতম দুর্ব্বিপাক এবং গভীরতম সমস্যার সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছি। 'ধর্ম্মস্য গহনা গতি', কিন্তু ঐ গতি জগৎগতির বিপরীত বলিয়াও মনে করিতে পারি না। এই স্থলে, চিন্তাশীল মনুষ্যের অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বলিব যে, প্রকৃত ধর্ম্মের পথ দুরত্যয় ক্ষুরধার: উহা অনেক সময়েই দুরবগাহ—প্রকৃতের সহিত প্রতীয়মান প্রত্যক্ষের বিষম বিরোধ-বিসংবাদে পরিপূর্ণ! এই ক্ষেত্রে আপাতঃ দর্শনের কিছুমাত্র মাহাত্ম্য নাই। অনেক আপাতঃদৃষ্ট ধার্ম্মিক কিরূপে অধ্যাত্ম-জগতে প্রচণ্ড অধার্ম্মিক হইয়া পড়িতে পারেন, সকল জাতির অধ্যাত্ম শাস্ত্রই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে কিছু-না-কিছু উল্লাস দেখাইয়াছে, সুতরাং, বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, এ দুর্দ্দৈব কেন হয়। দুর্ভাগ্য গতিকে মনুষ্যের দেহটাই একদিকে অধর্ম্মের গুপ্ত সহায়! এই দুর্ভাগ্য গতিকেই মনুষ্যের সমস্ত প্রকাশ্য ধর্ম্ম-ভাব, অনেকস্থলে অতর্কিতে কেবল তন-মন-ধন প্রভৃতি ইষ্টলাভের জন্য 'চোরাকটাক্ষ' বই নহে! তাহার মুখোচ্চারিত 'ভগবান্‌' শব্দের অর্থও তলেতলে মৎলব সুসার করার উদ্দেশ্য বই নহে! তাহার 'ধর্ম্মবুলিও' অনেক সময় 'আড়ালে-আড়ালে' কেবল লোক দেখাইবার লোক-শাসাইবার বা তর্কযুদ্ধের গুপ্ত-অস্ত্র রূপেই পরিণাম লাভ করে! এ দুর্দ্দৈব প্রত্যেক অধ্যাত্মপথিকের অনুভবগম্য! সুতরাং যাহাকে আপাততঃ ধার্ম্মিকতা বা ভগবন্নিষ্ঠা বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা যে অনেক স্থলে আত্মবঞ্চনা এবং বিশ্ব-বঞ্চনায় পরিণত হইয়া মনুষ্যকে জগৎপরিচালকের দয়া হইতেও ইহপরকালে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে,

তাহার উত্তর দিক খোয়াইবে, উহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ইহা অধ্যাত্ম জগতের সত্য! যেমন ব্যক্তির, তেমন জাতির! ব্যক্তি যেমন কৃতপাপের ফলভোগ করে, জাতিকেও তেমনি কৃতকর্ম্মের পাপনিরয় অধোগতি এবং মৃত্যু-নিয়তি ভোগ করিতে হয়। এই পথেই ধর্ম্মধ্বজী জাতিসমূহের সমস্ত দুর্ভাগ্যের সূক্ষ্ম কারণটুকু উদ্দেশ করা যাইতে পারে। অধ্যাত্মপথে পূর্ণ নাস্তিকতা কিংবা জড়বাদিতা হইতে উহার কিছুমাত্র বেশী মূল্য নাই। এই পথে আরও দেখা যাইবে যে, জাতিবিশেষ কেবল ধর্ম্ম-আচার-তন্ত্রী হইয়াই অপর কোন জাতি হইতে অধিক ধর্ম্মশীল হইতে পারে না। প্রকৃত ধার্ম্মিকের সংখ্যা যখন দুর্লভ উহা যেমন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ" তখন জাতির বিষয়ে কথাই উঠিতে পারে না। যেমন বলিয়াছি, ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত জীবনের সতর্ক সাধনার ফল; মনুষ্যের রিপু-প্রবৃত্তিগুলির সংযম-পথে অধ্যাত্মক্ষেত্রে "ঊর্দ্ধগতির" সাধনা! এই সাধারণতার ক্ষেত্র হইতে পরে-পরে এই 'পথ' 'গতি' অথবা উহার লক্ষ্য বিষয়ে আরও কত কথা আছে, তাহা এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক নহে। এখন, এই সাধনার পথে পুরাণকারগণের সেই 'রূপক' কথা—'অপ্সরা' ছলনার কথাটি সত্য বলিয়া সকল দেশের সাধকগণের আত্ম-অনুভূতিই সাক্ষ্যদান করিতেছে! এ ক্ষেত্রে স্বয়ং 'ধর্ম্ম' কিংবা 'ভগবানের' নামটাই এমন পদার্থ যে, উহার উচ্চারণ মাত্রই নানা বিপদের সূত্রপাত হয়! যে মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম করিয়াছে, বা প্রবৃত্তির সংযমপথে কৃতসংকল্প হইয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার যুদ্ধ আরম্ভ! তোমার আত্মপ্রকৃতি, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন 'শীকার পলাইতেছে' বলিয়া দ্বিগুণ প্রচণ্ডতা সহকারেই তোমাকে আক্রমণ করিতে থাকিবে! তোমার সংসার—পরিবার—সমাজ আপাতত পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে! এই সমস্তের বাধা কিংবা প্রলোভন ছাড়াইয়া উঠা ত দূরের কথা, সর্ব্বপ্রথম তোমার 'অহঙ্কার' টাই সহস্রমূর্ত্তিতে ছলনা ভণ্ডতা এবং 'মিথ্যাচার'কে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিবে! এই কারণেই 'ধর্ম্মের পথ' ক্ষুরধার! বলিতে কি, জগতে মনুষ্যমাত্রের মনেই কোন-না-কোন সময়ে পরমার্থের প্রবৃত্তিটা 'মাথা উচু' করিতে চায়, কিন্তু এই 'বিরোধের' গতিকে অনেক সময়ে এমন আঘাতটুকু সামলাইতে না পারিয়াই অনেকে রসাতলে তলাইয়া যায়! সরল উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করিতে যাইয়াও অনেক সময় ঐ অহংকারের ফেরে পড়িয়াই কপটতা এবং ভণ্ড তপস্বিতার আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়! যেমন ব্যক্তি, তেমন জাতি!

কোন 'গতানুগতিক' আচারের আদর্শই যে মনুষ্যসন্তানকে প্রকৃত ধর্ম্মফল প্রদান করিতে পারে না তাহা তুলসীদাস প্রভৃতি সকল ধর্ম্মপথিকই বারংবার মাথার দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইবে যে অনেকসময় ব্যক্তি বা জাতি যাহাকে (সরলভাবে) ধর্ম্ম বলিয়াই অনুসরণ করিতেছে তাহাই হয়ত ভিতরে-ভিতরে প্রচণ্ড অধর্ম্ম, অথবা সম্পূর্ণ উদাসীন পদার্থ! উহা হয়ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল দেশকালের একটা সংকীর্ণ সামাজিক বিধি, অথবা পারিবারিক আদর্শের 'মৎলবী চাল' বই নহে—বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-নিয়তি কিংবা মনুষ্যসমাজের যুগধর্ম্ম ও যুগনিয়তির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবঞ্চ হলাহল! অধ্যাত্মক্ষেত্রে দুর্লভ মনুষ্যজন্মের জীবনীশক্তির পূর্ণমাত্রায় অপব্যয় এবং ব্যভিচার! যাহা জগতের 'প্রত্যক্ষ নারায়ণে'র, বিদ্রোহী, তখন (সংশয়ীগণ বলিতে পারেন) জগতের 'অপরোক্ষ নারায়ণ' বলিয়া কেহ থাকিলে তাঁহারও যে দয়া লাভ করিতে পারিবে না, উহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই! সুতরাং এই পথেই প্রসজ্জিত ধর্ম্ম-দুর্দ্দৈব এবং ধর্ম্ম দুর্ভাগ্যের অনেক রহস্যোদ্ভেদ হয়। এই রূপে মনুষ্যের ইতিহাসে অনেক ধর্ম্মতন্ত্রই

(হয়ত প্রথম কিছুকাল হিতকর প্রতীয়মান হইয়া) জাতিবিশেষের অপরিহার্য্য মৃত্যু-নিয়তি রূপেই দাঁড়াইয়া যাইতেছে। "A good custom has curruptod the world!" বলিতে কি এক কালের "A good religion has corrupted the world!"

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

গুণী কে ?

গুণী বলে আপনারে ভাব অনিবার!
আপনার নহে গুণ, গুণ বিধাতার।
যখন শমন আসি, গ্রাসিবে তোমায়,
বিদ্যা, জ্ঞান, গুণ তব কেড়ে নিয়ে যায়!
অপরে করিবে দান বিধাতা সে সবি,
অন্যে হ'বে দার্শনিক—অন্যে হ'বে কবি!
ফিরে যবে জন্ম হ'বে, হ'তে পারে এই,
মূর্খ বলে পায়ে তোমা ঠেলে সকলেই!
যাহারে নির্গুণ বলি হাস মনে মনে,
হতে পারো কোনো জন্মে শিষ্য সে চরণে!

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার সভা।

(৫)

আজকালকার দিনে বৈদ্যুতিক আলোকমালা সমুদ্ভাসিত হাবভাববিলাসভঙ্গিময়ী বারনারী তাণ্ডবিত, রঙ্গরসের তরঙ্গময় এদেশীয় রঙ্গমঞ্চের তথাকথিত নাটক ন্যাটিকার অভিনয় ও উদ্দাম নৃত্যগীতাদির দর্শন শ্রবণে একান্ত পরিতৃপ্ত, নিতান্তপক্ষে সেই সকল "পেশাদারি" থিয়েটারগুলির বর্ত্তমান হাস্যজনক, অপকৃষ্ট অনুসরণ প্রয়াসী 'ব্যবসাদার' যাত্রাওয়ালাদিগের যাত্রা বা গীতাভিনয় দর্শন শ্রবণে বিকৃত-রুচি, এমন একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদিগের অনেককেই 'অশিক্ষিত' বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই' পরন্তু যাঁহারা দলেও নিতান্ত খাটো নহেন; তাঁহারা প্রাচীন যাত্রাওয়ালা 'গোবিন্দ অধিকারী' প্রভৃতি এমন কি পরম ভক্ত কবি সুকণ্ঠ গায়ক "নীলকণ্ঠের" নাম শুনিলে পর্য্যন্ত ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন এবং কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করেন না। এই শ্রেণীর শ্রোতা বা দর্শক কেবলমাত্র চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেবা করিবার জন্যই নাটকাভিনয় দর্শন বা সঙ্গীত প্রভৃতি শ্রবণের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীনকালের 'পরিপূর্ণ আদর্শ' ও উপদেশাবলীযুক্ত গীতাভিনয় দর্শন শ্রবণের মুখ্যতম উদ্দেশ্যটী স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু এই ভারতবর্ষের বিশেষতঃ সমস্ত বঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন কি প্রতিবাসী মুসলমান মণ্ডলীর মধ্যেও অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমাজনীতির শাসনসূত্র ও আদর্শ চরিত্রের পবিত্র উজ্জ্বল মধুর ভাবগুলি একমাত্র সার্ব্বজনীন 'যাত্রা' 'কথকতা' প্রভৃতি দ্বারাই নিজের প্রভাবটী বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল। আজকালকার দিনের এই আড়ম্বরপূর্ণ নাট্যাভিনয়ের সহিত তুলনা করিলে 'কথকতার' প্রতি আপাততঃ অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদ্বারা এ দেশের যে সকল উপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঠিক এইরূপ আর একটী পরম উপকারী প্রাচীন প্রথার প্রতি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের একটু বিতৃষ্ণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রথাটী

এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারসভা। অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারসভা বর্ত্তমানে কোনও স্পৃহ-ণীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য নিয়ম অনুসারে এই দেশে যে সকল সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাদের কতকগুলি অপরিহার্য্য অঙ্গ কিছু নূতন রকম দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, সঙ্গীত, প্রীতিউপহার, কদাচিৎ ফটো, ফুলের মালা, পান চুরুট্, চা বা কদাচিৎ তাহারও দুই চারি ধাপ উপরে;— সে যাহাহউক, ফলতঃ সময়ের পরিবর্ত্তনে রীতিনীতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিয়া একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন, অন্ততঃ মৌলিকব্যাপারে, এখনও (ততটা) লক্ষ্য হইতেছে না। আগেকার দিনে সামাজিক বিচার সভার যে রীতি প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রীয় বিচার সভারও সেই রীতিই প্রচলিত ছিল। 'তর্কবাদ' উভয় সভাতেই হইত, এখনও তাহাই হইয়া থাকে। বলিতে লজ্জা বোধ হয় তর্ক বা 'দলাদলি' বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত, এখনও আছে তখনও ছিল; নূতন সভাসমিতিও তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এই উপলক্ষে কাহাকেও আক্রমণ করা বর্ত্ত-মান প্রবন্ধলেখকের উদ্দেশ্য নহে; তবে এ ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার সভাই দেশ-কালরীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া অযথা নিন্দাভাজন হই-তেছে কেন? এই প্রশ্নটী শিক্ষিত সমাজের গোচর করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সুতরাং আমরা ও বিনীত ভাবে তাহারই অবতারণা করিতেছি মাত্র। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিচার সভার ধারণাটী আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে ভাবে পোষণ করিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ নহে। আগেকার দিনের কথা বলিতে চাহি না, যে সময়ে এদেশের সকল সভাই বিশিষ্ট সভ্য দেশের আদর্শ সভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইত। বড় বেশী দিনের কথা নহে, যে সময়ে এদেশে "বাদ" বিচারের (১) সমধিক প্রচলন ছিল, সেই বাদ বিচার সভার আদর্শ আমরা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। এখনকার "বিতণ্ডা বিচার" সভার আদর্শকে উদ্দেশ করিয়া যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিচার সভা মাত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে নিতান্ত অবিচার করা

(১) "বাদ" "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক ত্রিবিধ বিচার দার্শনিকগণের অভিমত।

(ক) যে বিচারে জ্ঞানবান তত্ত্বদর্শী গুরু, জ্ঞান-পিপাসু শিষ্য, অথবা সত্যান্বেষী পণ্ডিতমণ্ডলী বিজিগীষা পরিহার পূর্ব্বক কেবল সত্য নিরূপণের জন্য প্রমাণাদির উপন্যাস করতঃ স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষের সমর্থন করেন তাহার নাম "বাদ বিচার"।

(খ) যে বিচারে বাদী বা প্রতিবাদী স্বীয় স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্য বিজিগীষা পরতন্ত্র হইয়া (স্ব পক্ষের অবৈধতা বুঝিতে পারিলেও) পরপক্ষে দোষারোপ পূর্ব্বক কেবল স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাহার নাম "জল্প বিচার"।

(গ) যে বিচারে (সত্য নিরূপণের আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া) বিজিগীষা পরতন্ত্র হইয়া বাদী বিপক্ষে কেবল দোষারোপ করিয়া থাকেন তাহার নাম 'বিতণ্ডা বিচার'।

বর্ত্তমান সময়ে 'বাদবিচারের' স্থান 'জল্প বিচার' ও একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন 'বিতণ্ডা' বিচারেরই পূর্ণ প্রভাব! এইজন্য মূলপ্রবন্ধে জল্প বিচারের নামোল্লেখ করা হয় নাই। স্থূলতঃ 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' বিচারের ফল প্রতিপক্ষ-নিরাস আর 'বাদ বিচারের' ফল সত্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ।

এসম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহর্ষি গৌতম প্রণীত 'ন্যায়দর্শন' ও শ্রীহর্ষ প্রণীত খণ্ডন খণ্ডখাদ্য নামক দার্শনিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। —প্রবন্ধ লেখক।

হইবে। সেই 'বাদ' বিচার সভার আদর্শটীও স্মরণ করিতে হইবে। যখন কোনও শাস্ত্রার্থের সন্দেহ উপস্থিত হইত, সেই সময়ে প্রথিতনামা পণ্ডিতগণ পরিষৎ গঠন করিয়া যথামতি শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন। ধর্ম্মনির্ণয় আবশ্যক হইলে প্রাচীন ঋষিগণ যেমন একত্র সমবেত হইয়া তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন, সেই আদর্শে ইদানীন্তন পণ্ডিত সমাজও বাদরীতিতে বিচার করিতেন, তাহাতে পক্ষপ্রতিপক্ষের মধ্যে কোনও প্রকার দলাদলির ভাব, হিংসা দ্বেষাদির ভাব প্রকাশ পাইত না, সম্ভাবনাও ছিল না; এবং বর্ত্তমান সময়ের বিতণ্ডা বিচার সভার ন্যায় সভামণ্ডপটী 'হট্টক্ষেত্রে' পরিণত হইত না। ধীর ও স্থির ভাবে পণ্ডিতগণ প্রকৃত শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন. যে সকল ধর্ম্মাত্মা ধনবান ব্যক্তি সভা আহূত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্ররসিক থাকিতেন তাঁহারা স্বয়ং সেই সকল বিচার শুনিতেন। যদিও তাহাতে পণ্ডিতগণের প্রতিভার তারতম্য প্রকাশ পাইত সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রতিভা প্রকাশ করিবার জন্য বর্ত্তমান অধিকাংশ বিচার সভার সভাগণের ন্যায় অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেন না। সেই ধীরতা ও স্থিরতার আদর্শ ক্রমে 'বিতণ্ডা বিচারের' প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছিল। যে সময় হইতে এদেশে বিতণ্ডা বিচারের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, ঠিক্ সেই সময় হইতেই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এমন অধীরতার (?) পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বা এখনও যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বিচারসভায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এরূপ কথা বলা যায় না। তবে এই বিতণ্ডারীতির একটা প্রধান দোষ এই যে, উহা বিচার সভার বিচার্য্য বিষয়ে জয়পরাজয়টাকেই সর্ব্বাপেক্ষা 'নিজস্ব' বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে শাস্ত্র সিদ্ধান্তটী নিজের যোগ্যতা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক খাট হইয়া পড়ে। তখন শাস্ত্র অপেক্ষা আমরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিমানটাকেই বড় করিয়া তুলি। বিতণ্ডারীতি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ; তা ছাড়া দম্ভ বা অভিমান অথবা সভাস্থলে সংযমের অভাব প্রদর্শন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দোষ মাত্র। এই সকল দোষে বাদী প্রতিবাদী এমন কি অনেক সময় মধ্যস্থ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন; এবং স্থানে স্থানে বিচার সভা যে প্রহসন সভায় পরিণত হইয়া উঠে, এ সকল দোষই তাহার সর্ব্বপ্রধান হেতু বলিয়া আমাদের ধারণা। এই সকল আনুষঙ্গিক দোষে যদিও বাদী প্রতিবাদীরাই শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কিছু খাট হইয়া পড়েন, তথাপি শাস্ত্রার্থের অপলাপে দেশের বা সমাজের ক্ষতি তদপেক্ষা যে অনেক গুরুতর হইয়া পড়ে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কারণে বিতণ্ডা বিচার সভার প্রতি শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা আসিতে পারে, কিন্তু 'বাদ বিচার' সভার প্রতি কিছুমাত্র অ[illegible] হইবার কারণ দেখা যায় না। পরন্তু যেরূপ ধী[illegible] সংযমের সহিত বাদবিচার হইয়া থাকে, বা পূর্ব্বে [illegible] তাহার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা [illegible] বোধ হয় সঙ্গত। বর্ত্তমান কঠোর জীবনসংগ্রাম উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন, আর [illegible] শিক্ষিত সমাজই হউন, কোনও শাস্ত্রার্থ নিরূপণ ক[illegible] গিয়াই হউক, আর সামাজিক সমস্যা মীমাংসা করিতে গিয়াই হউক্, তাঁহারা পক্ষপাতমূলক দলগঠন প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাদবিচার রীতিতে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিলে দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বিতণ্ডা বিচারের দোষগুলি সংক্ষেপে বলিলাম, কিন্তু ইহার কতকগুলি গুণও আছে। যদি বিতণ্ডা বিচারের আনুষঙ্গিক দোষগুলি, অনেক সময় অনেকের মধ্যে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহার মূ[illegible] দোষটী,—শাস্ত্র অপেক্ষা নিজকে বড় বলিয়া ঘোষণ[illegible]

করিবার স্পৃহা,—প্রায় সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা বিতণ্ডা বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফূর্ত্তি অনেক সময় এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। ঐ সকল পণ্ডিত বিচার সভায় জয়পরাজয়ের চিন্তায় পাঠাবস্থা হইতে জীবনের চরম কাল পর্য্যন্ত একরূপ অস্থির থাকিয়া অধীত বিদ্যার একান্ত অনুশীলন ও নব নব তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রত্যহ শেষরাত্রে উঠিয়া অধীত গ্রন্থের আবৃত্তি ও আলোচনা করিয়া থাকেন, এখনও এমন দুই চারিটী পণ্ডিতের অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রানুশীলনস্পৃহা ও অধ্যবসায়টী বিতণ্ডা রীতির উৎকৃষ্ট ফল! আবার যাঁহারা অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির সাহায্যে সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াও বিতণ্ডা বিচারের আকাঙ্ক্ষায় বা আশঙ্কায় সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছেন বা করিতেছেন, অথচ বিচার সভায় কিছুমাত্র ঔদ্ধত্য বা অসংযমের ভাব প্রকাশ করিবার মত মানসিক দুর্ব্বলতার অধীন হইতে নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতেন, বা এখনও করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা এই বিচার-সভার একটী উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইব। আমরা যে মহাত্মার পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সেই আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয়, জীবনের অধিকাংশ কাল বিচার সভায় বিচার করিয়াছেন। কালদেশের নিয়মানুসারে তিনি বিতণ্ডাবিচারই বেশী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহাকে কেহ দম্ভ প্রকাশ করিতে বা অসংযমের ভাব প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় ধীর ও স্থিরভাবে বিচার সভায় বিচার করিতেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ বিচার শেষে তাঁহার সম্বন্ধে হিংসা, দ্বেষ বা জিগীষার পরিবর্ত্তে এমন একটী প্রীতিমধুর শ্রদ্ধার ভাব আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেন যে, বিতণ্ডা বিচারের সেরূপ ফল বড় দেখা যাইত না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর সৌম্য-স্বভাব পণ্ডিত আরও কয়েকজন ছিলেন, এখনও তাঁহাদের দুই চারি জন বর্ত্তমান আছেন। 'দুই চারি জন' বলিলাম এই জন্য যে বর্ত্তমান সময়কার নব্য পণ্ডিত শ্রেণীর এই সকল 'বালাই' একরকম নাই বলিলেই হয়। দেশে শ্রদ্ধাশীল কর্ম্মকর্ত্তার অভাব হেতু 'সভা'ই প্রায় নাই, বিচার ত দূরের কথা। যদিও দুই চারিটী সভা কোনও বৎসর সম্ভবপর হইয়া উঠে, তখন আমরা সেই সকল বিচার-রীতির উপর 'তথাকথিত' দোষগুলি আরোপিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি, কদাচিৎ বা তাঁহাদেরই অনুকরণে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া থাকি, যদিও তাহাতে প্রায়ই কোন নূতনত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ইহার একদিকের ফল বড় ভাল হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এখন আর তেমন একাগ্রতার সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিতে কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। পল্লবগ্রাহিতা দ্বারা বিচারসভায় জয়লাভ ঘটিত না, এখন তাহা দ্বারাও আমাদের কাজ চলিয়া যাইতেছে। আমাদের মনে হয় এদেশে আবার বাদবিচারের প্রবর্ত্তনা আবশ্যক। অন্ততঃ বিতণ্ডা বিচারও যদি দোষশূন্য হইয়া চলিতে পারে, তাহাতেও লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। আমরা অনেক সময়ে বাহিরের মোলায়েম আদর্শের অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের পরম হিতকর মৌলিক প্রথার উচ্ছেদ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতে ভুলিয়া যাই। কোনও প্রাচীন আদর্শের যদি কোনও অংশে দোষ থাকে, তবে সেই দোষটুকু বর্জ্জন করিয়া লইলেই আমরা তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে খাটাইয়া লাভবান্ হইতে পারি কি না, সেই বিচার করিবার পূর্ব্বেই 'সরাসরি' তাহাকে 'বাতিল' করিয়া দিলে কি অনেক সময়েই আমাদিগকে ঠকিতে হয় না?

আমরা এই প্রবন্ধে অনেক অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি জন্মাইয়া দিতেছি; কিন্তু

কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন আরও দুই একটী বিচার সভার বিবরণ না লিখিয়া উপসংহার করিতে পারিতেছি না। অন্ত দেশের কথা বলিতে চাহি না, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা চাঁদপ্রতাপ রোয়াইলের রাজমোহন রায় মহাশয়দের বাড়ীর বিচার সভা, এবং পশ্চিমবঙ্গে উলা বামনদাস বাবুদের বাড়ীর বিচার সভা, বিগত একশত বৎসর মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই দুই স্থানেই ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হইত. এবং রীতিমত বিচার সভা হইয়া বিচার হইত. সেই সকল বিচারের ফলাফল অনুসারে পণ্ডিতগণের 'সহচার,' বা শ্রেণী নিরূপিত হইত। যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিচারে যোগ্যতার পরিমাণ পুনঃ নির্দ্ধারিত হইবার সুযোগ না হইত, সেই পর্য্যন্ত সেই সকল পণ্ডিত দেশের প্রায় সর্ব্বত্র উলার বাবুদের বা রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীর মীমাংসিত 'সহচার' অনুসারে বিদায় পাইতেন। রোয়াইলের বাবুদের জমিদারীর আয় যে খুব বেশী ছিল তাহা নহে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, রাজমোহন বাবু তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধে সোনার দানসাগর এবং ধাত্রীর শ্রাদ্ধে রূপার দানসাগর করিয়াছিলেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না পাইয়াছেন তাঁহারা নিজকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

রাজমোহন বাবু বিচার সভার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্ব্বাচন করিতেন, একত্র সকল শাস্ত্রের বিচার সভা বসাইয়া তামাসা দেখিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি নিজে বিচার শুনিতেন, এবং তাঁহার পরমবন্ধু ভারতের গৌরব মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় শ্রদ্ধার সহিত বিচার সভায় যোগদান করিতেন। তিনিও একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় রোয়াইলের বাবুদের বাড়ীতেও বিচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ব্ববঙ্গে. ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, সেরপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার বাড়ীতেও বিচার সভা আহূত হইত। সুবঙ্গের মহারাজগণও অনেক সময়ে বিচার সভা আহূত করিয়া পণ্ডিতগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ঢাকা ও ভাগাকুল, শ্রীনগর, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানে ও বরিশাল কলসকাটির বাবুদের বাড়ীতে ক্রিয়া উপলক্ষে পণ্ডিতদিগের বিচার সভা হইত। তখনকার দিনের বিচার সভার প্রতি লোকের একটা শ্রদ্ধা-মণ্ডিত পবিত্র ধারণা থাকিত, এখনকার দিনের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই!

যাহা হউক, আমরা যে সময়কার কথা আলোচনা করিতেছি সেই সময়ে দেশের পণ্ডিত শ্রেণীর অবস্থা মোটের উপরে ভাল ছিল। বড় পণ্ডিতের সংখ্যাও কম ছিল না, বিচার করিয়া যোগ্যতানুসারে 'সহচার' হইত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবটীও বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার য' তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজের চরিত্রের বিশিষ্টতাটুকু রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেশে এবং অনেক বিচার সভায় অনেকেই বিচার ক. তাঁহার জীবনে অনেকবারই বিদ্যা বুদ্ধি ও স. পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি কখনও এ বিচলিত হন নাই। আমরা তাঁহার কয়েকটী [illegible] সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া অদ্যকার মত বিদা গ্রহণ করিব।

ঢাকা নবাবপুর নিবাসী ৺মদন মোহন বসাক তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলায় মাত্র একখানা পত্র ছিল। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন। তখনও ঢাকা রেলগাড়ী হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় সুখী গৃহস্থ, ও জমিদার শ্রেণীর সাহচর্য্যে বর্দ্ধিত বলিয়া পাল্কী করিয়া সেই শ্রাদ্ধে গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ চাক

সুভাঢ্যা গ্রাম নিবাসী ৺রুক্মানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়। বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত ৺জগৎ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অন্যতম প্রধান ছাত্র, ঢাকা 'ন'গা' নিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দায়ভাগের একটী পূর্ব্বপক্ষ করেন। সেই সভায় মহামহোপাধ্যায় ৺তারিণী চরণ শিরোমণি মহাশয় ও বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয় মধ্যস্থতা করেন। বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জয়লাভ হয়। সভাস্থলে জগৎ সার্ব্বভৌম মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সে দিন তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই সভায় বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, তাঁহার পাথেয় ব্যয় না কি প্রায় ৮০ টাকা পড়িয়াছিল। তিনি সেইজন্য কিছু লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আমি নিতান্ত অসমর্থ বলিয়া এতটাকা পাথেয় পড়িয়াছে। আমি ঢাকা পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে এইমাত্র প্রথম নিমন্ত্রণ পাইয়াছি, সুতরাং পাথেয় বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর আমার ঘটে নাই। আমি নিজ হইতেও যদি পাথেয় বহন করিয়া এরূপ সম্মান লাভ করিবার অবসর পাই তথাপি তাহাতে দুঃখিত নহি।" বলা বাহুল্য, কর্ত্তৃপক্ষ অতি সন্তুষ্টচিত্তে সম্পূর্ণ পাথেয় বহন করিয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্তের সহচার চৌদ্দ আনি বিদায় তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেই ক্রিয়াতে নাকি ২০ টাকা 'সহচার' ছিল।

ইহার কিছুকাল পরে আর একবার ভাগ্যকুলের ভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র কুণ্ডু বাবুদের বাড়ীতে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। সেই সভাতেও জগৎ সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রমুখ বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিত-মণ্ডলী, বিক্রমপুরের প্রধান বৈয়াকরণ ৺পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্যামাচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 'শ্রাদ্ধ বিবেকের' একটী পূর্ব্বপক্ষ করাইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই সভাতেও জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য পণ্ডিত শ্যামাচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে তিনি একান্ত প্রশংসা এবং সভাস্থলে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বোধ হয় তৎপর আর দুটী একটীর বেশী বিচার তাঁহাকে করিতে হয় নাই। ইতঃপর তিনি সকল বিষয়ের বিচারেই প্রায় মধ্যস্থতা করিতেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত "কুমার" বাহাদুরের উপনয়ন উপলক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বিচার-কেশরী ৺গুরুদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহাদেরই বাড়ীতে ৺সোনাধন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার উদীয়মান প্রতিভা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয় এজন্যই এই বিচার অনুষ্ঠান। এই অবসরে শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র বাহাদুরের সংস্কৃতানুরাগ ও পণ্ডিত-বাৎসল্য সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্বদাই নৌকায় বাস করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, ময়মনসিংহ হইতে নৌকা ভাসাইয়া রাজা বাহাদুর প্রায়ই জামালপুরে যাইতেন, এবং সেরপুর হইতে স্বর্গীয় তর্করত্ন মহাশয় এবং তাঁহাকে নৌকায় আনাইয়া ৫ দিন ৭ দিন রাখিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, রাজাবাহাদুর বেশ ভাল সংস্কৃত জানিতেন, এবং যখন যে পণ্ডিতকে নিকটে পাইয়াছেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন, রাজাবাহাদুর একজন দস্তুর মত 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ছিলেন।

মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ীতে অন্য এক বিচারসভায় কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত বিচারে তর্কালঙ্কার মহাশয় যশোলাভ করেন।

কলিকাতা উত্তরপাড়ার মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট তর্কালঙ্কার মহাশয় পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলেন, বিচারে তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপ হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভাটপাড়া হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই সময় ভাটপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিতও তাঁহার বাদার্থের আলোচনা হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সুবঙ্গ রাজধানীতে শিবপুর নিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত স্বর্গীয় তারাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়প্রমুখ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের পণ্ডিতবর্গ ৺প্রাণনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট একটী পূর্ব্বপক্ষ করাইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার উত্তর করিয়াছিলেন। এই প্রকার কত সভায় ও কত বিচারে যে তাঁহাকে পূর্ব্ববাদী ও উত্তরবাদী হইতে হইয়াছে, কত বিচারে যে তাঁহাকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহার সকল সংবাদ আমরা অনেকেই অবগত নহি; কিন্তু চরিত্রের বিশিষ্টতাটুকু তিনি আগাগোড়া রক্ষা করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। একবার সুবঙ্গ রাজধানীতে অন্য একটী ক্রিয়া উপলক্ষে নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় ৺ব্রজ বিদ্যারত্ন মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ বিবেকের একটী পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল। সেই সভায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যাপক। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, সভাস্থলে উপযুক্ত ছাত্র উপস্থিত থাকিলে গুরুর নিকট উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ছাত্রেরাই প্রদান করিতে চেষ্টা পাইতেন, তদনুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও অতি বিনয়ের সহিত উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন,—কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না যেহেতু বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে দেশীয় পণ্ডিতগণের সর্ব্বদাই একপক্ষ হইয়া থাকিবার রীতি বঙ্গদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই অবস্থায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতেও ভুলিলেন না, অগত্যা তিনি নিরস্ত হইলেন। সেই সভায় বিদ্যারত্ন মহাশয় অশ্রুপূর্ণনেত্রে ও বাষ্প গদ্‌গদ কণ্ঠে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি ধন্য, যেহেতু 'চন্দ্র' আমার ছাত্র, এবং আমি আরও ধন্য যে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আমার নিকট হইতে যে উত্তর পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না, আমারই প্রিয়তম শিষ্য 'চন্দ্রের' নিকট হইতে সেই উত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া আমাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।" বিচার শেষ হইল, বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন।

এক্ষণে আমরা যে কতগুলি বিচার সভার উল্লেখ করিলাম, বা এইরূপ শত শত সভার বিবরণ আমরা যাহা অবগত আছি, কৈ তাহাতে 'তথাকথিত' অসভ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রহসন ত দেখিতে পাইতেছি না? আমাদের শিক্ষিত সমাজের লক্ষ্যভূত বিচার সভার এ হেন দুর্দ্দশার জন্য কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীই দোষী, অথবা সভাআহ্বানকারী কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, গুণগ্রাহিতা, ও শাস্ত্রানুরাগের অভাবও তাহার জন্য দায়ী, সে বিষয়টী সুধীসমাজের বিচার-সাপেক্ষ বলিয়া আমাদের এখনও ধারণা রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

আগণে

বঁধু, ধরেছি তোমারে আজি
বামালে!
লুকোচুরি পড়্লো ধরা
কোথা যাবে পীতধড়া
কত আর থাক্‌বে শ্যাম!
সামালে?
কালিন্দীর কলকলে
খেলা কর কত ছলে
কভু বা নীপের তলে—
তমালে!
কভু বা জাঁকাল রাজা
কখনো রাখাল-সাজা
বাঁশরী বাজাও—তাজা
শ্যামলে!

আজি, ধরেছি তোমারে কানু
বামালে!
তুচ্ছ পুচ্ছ শীরে পর
কভু উচ্চ গিরি ধর
কভু সাজো গদা-চক্র-
কমলে!
নীরদে তোমার কান্তি
সমুদ্রে—স্বরূপ-শান্তি
শৈলে তব রুদ্ররূপ
তুমি ভূমা! বিশ্বভূপ!
কমঠ-কঠিন তুমি
কোমলে!

আজি, [illegible] খেতে গিয়ে তোমায় বঁধু!
বামালে!
হায়! একি হলো জ্বালা
সবি যে সবুজ-ঢালা
নয়ন ভরিয়া গেল
শ্যামলে!

শুধু, গাহিছে "হলুদে পাখী"—
("কাম্‌লার" প্রিয় সখী)
পীতধড়া—আগণের
আমলে!

শ্রীকুলচন্দ্র দে

বাল চরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

চণ্ডাল যুবতীগণের প্রবেশ

চণ্ডাল যু। আসুন মহারাজ, আসুন; আপনার সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজার প্রবেশ

রাজা। এ কি কাণ্ড!

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান সব পড়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের কোলে নৌকার মত সমস্ত মেদিনীটা টলমল কচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জীবই স্ব স্ব ধর্ম্ম ও কর্ম্মফল সূচিত শুভাশুভ নিমিত্তের অধীন। আমি জানি না, এ সকল নিমিত্ত অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যসন সূচিত কচ্ছে কি অভ্যুদয় সূচিত কচ্ছে!

চণ্ডাল যু। আসুন মহারাজ, আসুন; আপনার সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজা। এক জনও রক্ষিপুরুষ এখানে নেই, দীপ-ধারিণী এক জন রমণীকেও দেখেছি না। তাই সীজপায়

ও অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ-দৃষ্টি চণ্ডালিনীগণ রাজপুরে প্রবেশ কত্তে সমর্থ হ'য়েছে।

চণ্ডাল যু। আসুন মহারাজ, আসুন; আপনার সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হ'ক।

রাজা। আমার কোপে সমগ্র শত্রুপক্ষ উৎসন্ন হয়। সূর্য্য, শশী ও অগ্নিদেব সকলেই আমার অধীন। আমি যমের যম, ভয়েরও ভয়কারণ। কিন্তু কি লজ্জার কথা! অবরোধমুক্ত এই চণ্ডালিনীগণ এইরূপ গর্হিত বাক্যদ্বারা আমায় অপমান করে গেল!

চণ্ডাল যু। আসুন মহারাজ, আসুন।

রাজা। একি! অশুভগুলি দেখতে দেখতেই অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। যাই, এখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করি।

শাপের প্রবেশ

শাপ। ওহে, কোথায় যাচ্ছ? এই পুরী এখন আমার।

রাজা। মহেশ্বরের মুখ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ ক্রোধবহ্নির ন্যায় আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে উল্কাহস্তে সহসা এ কে বহির্গত হল! অঞ্জনরাশির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কি ভীষণ দেহ! দন্তপংক্তি ও মুখমণ্ডলই বা কি ভীষণ! আবার নয়ন যুগল সর্পের চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গল! কি ভীষণ আকৃতি! আপনি কে?

শাপ। কি! তুমি আমাকে চিনলে না! আমি মধুক ঋষির শাপ—আমার নাম বজ্রবাহু।

রাজা কংসের হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্য অতি বিরূপ চণ্ডাল-বেশ ধারণ করে, কপালের মালা গলায় পরে, শ্মশানভূমি হ'তে আমি এখানে এসেছি।

কংস। তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব! সুবর্ণময় গুহা, শৃঙ্গ ও নিকুঞ্জ-শোভিত রমণীয় মেরু-পর্ব্বত কি কাক-পক্ষ-বাতে কখনও বিচলিত হয়? তুমি নিতান্তই উপহাসের পাত্র দেখছি! তুমি কি না দুই হাতে সমুদ্রতরঙ্গ বিক্ষোভিত করে মাত্র অঞ্জলি সাহায্যে সমগ্র সমুদ্রবারি পান কত্তে ইচ্ছা কচ্ছ?

শাপ। আমি উপহাসের পাত্র কি না সময়ে জানতে পারবে।

রাজা। একি! দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হ'ল! যাই আমিও শয্যা গ্রহণ করে বিষয়ান্তরে নয়ন নিয়োজিত করিগে।

শাপ। বঃ! ঘুমিয়ে পড়লে? ওগো অলক্ষ্মি, খলতি, কালরাত্রি, মহানিদ্রে, পিঙ্গলাক্ষি তোমরা সকলে একবার এদিক পানে এস; সকলে মিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি।

চণ্ডাল যু। হাঁ যাচ্ছি গো, যাচ্ছি।

রাজশ্রীর প্রবেশ

রাজশ্রী। না—প্রবেশ কত্তে পারবে না।

শাপ। আপনি কে?

শ্রী। কি! আমাকে চিনতে পারলে না? আমি এই রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী।

শাপ। বটে! আপনি রাজশ্রী, চলে যান। এই পুরী এখন আমার হয়েছে!

শ্রী। বটে!

কি বল্লি মূঢ়! রাত্রিকালে আমাকে অগ্রাহ্য করে কার বলে লঙ্কার ন্যায় আমার এই পুরীতে তুই প্রবেশ কত্তে যাচ্ছিস্? এই পুরী আমার আশ্রিত—প্রবেশ করা দূরে থাক্ তুই এই পুরী চোখেও দেখতে পাবি না।

শাপ। ভগবতী পদ্মালয়ে, কংস-শরীর পরিত্যাগ করে আপনি চলে যান। ইহা ভগবান বিষ্ণুর আদেশ।

শ্রী। কি! ইহা ভগবান বিষ্ণুর আদেশ! হায়! হায়! এখানে এতদিন রয়েছি, তাই রাজাকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। মহারাজ কংস বিবিধ গুণের আধার। ইহাও আমার আরও কষ্টের কারণ। উপায় কি? ভগবান বিষ্ণুর আদেশ অতিক্রম করে কার সাধ্য! যাই আমিও ভগবান বিষ্ণুর কাছেই যাই।

শাপ। রাজশ্রীও চলে গেলেন। বেশ হল। এখন এই পুরী আমাদেরই আবাস স্থান। অলক্ষ্মি, খলতি,

কালরাত্রি, মহানিদ্রে, পিঙ্গলাক্ষি, এখন তোমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আপন আপন কার্য্য কত্তে প্রবৃত্ত হও।

চণ্ডাল বু। আজ থেকে তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'লে।

শাপ। মধুক ঋষির শাপ আজ হতে তোমার শরীরকে আশ্রয় কল্লে! এখন থেকে তুমি নিত্য অধর্ম্ম-পরায়ণ হলে; তোমাকে এখন আমি গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করব। আর তুমিও সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

[অন্তর্দ্ধান।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। কে?

প্রতী। মহারাজ, আমি যশোধরা।

রাজা। যশোধরে, এই যে চণ্ডালিনীরা সব ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তা তুমি দেখ নি?

প্রতী। কি! চণ্ডালিনীরা ঢুকে পড়েছিল? যারা সর্ব্বদা মহারাজের কাছে থাকে তাদেরও এখানে প্রবেশ করা দুরূহ, চণ্ডালিনীদের ত দূরের কথা।

রাজা। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখেছি? আচ্ছা যশোধরে, তুমি যাও। নাসাক্ষি, তুমি একবার কাঞ্চুকীকে ডেকে দাও ত?

প্রতী। যথা আজ্ঞা, মহারাজ

[প্রস্থান।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কাঞ্চু। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। আর্য্য বালাকি; পুরুত (সাংবৎসরিক) ঠাকুর দিগকে জিজ্ঞাসা করুন ত আজ রাত্রে যে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি হ'ল এই দৈ'ব দুর্ণিমিত্ত-গুলির কারণ কি?

কাঞ্চু। মহারাজ, পুরুত (সাংবৎসরিক) ঠাকুর দু'জনেই ঐই কথা বলেছেন—

রাজা। কি বলেছেন?

কাঞ্চু। শুনুন মহারাজ——তাঁরা বল্লেন, "হে কালকাশবাসী নরেন্দ্র, ভূতগণ নানা কার্য্যের ছলে নরলোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এবার যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-কম্প ও আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হ'ল তাঁর জন্মে কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবে।"

রাজা। কার জন্মহেতু সশৈল বসুন্ধরা এরূপে কম্পিত হ'ল? জেনে আসুন কার পুত্র হয়েছে, আর তার জন্মের উদ্দেশ্যই বা কি?

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের জয় হ'ক। আমি আগে যা বলেছি তাই ঠিক। ভগিনী দেবকীর একটি মেয়ে হয়েছে।

রাজা। অথবা ব্রাহ্মণ বাক্য মিথ্যা হলেও আমি সত্যই দেখছি। যাও, বসুদেবকে ডেকে নিয়ে এস।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহারাজ

[প্রস্থান।

রাজা। বসুদেব ধর্ম্মশীল ও সত্যবাদী। আমার কাছে তিনি কখনও মিথ্যা বলবেন না। আচ্ছা, শুনি দেখি ব্যাপারটা কি।

বসুদেবের প্রবেশ

বসু। ক্রমে ক্রমে ছয়টি ছেলের বিনাশ দর্শন করেও এই শোক-কৃশ শরীর বহন কাচ্ছি! নিষ্ঠুর-কংস আবার ডেকে পাঠিয়েছে! আমাকেও পরাধীন ভৃত্যের ন্যায় যেতেই হবে।

হায়! শোকের স্বভাবই এই।

রাজা স্মরণ করলে ভয় কল্লেও যেতে হবে, ভয় না কল্লেও যেতে হবে। উভয় পক্ষেই যেতে হবে——ভয়েই হ'ক, আর অভয়েই হ'ক।

(অগ্রসর হইয়া)

শৌরসেনী-পুত্র, বসে আছ না কি?

রাজা। যাদবীপুত্র, এস, বস।

বসু। হাঁ, বসছি; (বসিয়া) শৌরসেনীপুত্র, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

রাজা। যাদবীপুত্রে দেবকী কি সন্তান প্রসব করেছে ?

বসু। হাঁ, সন্তান প্রসব করেছে।

রাজা। কি সন্তান প্রসব করেছে ?

বসু। (স্বগত) হায়! আমাকেও মিথ্যা বলতে হল! অথবা কুমারের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বল্‌লেও সত্যই বলা হবে। এখন কি করি? আচ্ছা তাই করা যাক। (প্রকাশ্যে) দেবকী একটি মেয়ে প্রসব করেছে।

রাজা। মেয়েই হউক আর ছেলেই হউক, বধ আমাকে কত্তেই হবে। পুরুষকার দ্বারা আমি অবশ্যই দৈবকে বঞ্চনা করব।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হ'ক। ভগিনী দেবকী বলেছেন, "এটি মেয়ে, মহারাজ কি দয়া করবেন না?"

বসু। শৌরসেনীপুত্র, দুঃখিনী দেবকীর এ অনুরোধটি রাখ। মেয়ের প্রতি মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃই বেশী হয়ে থাকে।

রাজা। তুমি মধুক ঋষির শাপ শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তান আমাকে দেবে, সেই প্রতিজ্ঞা কি তোমার মনে হয় না?

বসু। প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞার কথা বলছি না।

প্রতী। মহারাজ ভাগিনীকে কি উত্তর দেব?

রাজা। যশোধরে, দেবকীকে এই বলো যে, নির্বন্ধ অতিক্রম করা অসাধ্য। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর একটা কিছু করব।

প্রতী। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। যশোধরে, যা বলেছি তাই কর।

প্রতী। নির্বিঘ্নে প্রবেশ করুন।

বসু। আমি গোলমাল একেবারেই ভাল বাসি না। শেষে কিনা আমাদ্বারাও অপরের অপত্য-বিনাশ সংসাধিত হল! তবে কি কুমারকে এনে কংসকে প্রদান করব? না! এই কন্যা পূর্ব্বে মরে গিয়েছিল আবার বেঁচে উঠেছে। এই বালকের মাহাত্ম্যের বলেই এই মেয়েকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

যাই, গিয়ে দেবকীকে একটু আশ্বাসিত করি।

[প্রস্থান।

রাজা। যশোধরে, নবপ্রসূত মেয়েটিকে নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা, মহারাজ [প্রস্থান।

কন্যা লইয়া ধাত্রী ও রক্ষিগণের প্রবেশ

সকলে। আর্য্যা, ধীরে ধীরে আসুন—আমরা মধ্যমদ্বারে এসেছি।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। মহারাজের জয়! আমরা অনেকক্ষণ থেকে এ মেয়েটিকে পাহারা দিচ্ছি।

রাজা। আহা! মেয়েটি ত দেখতে বেশ দিব্য! হায়! শেষে আমাকে স্ত্রীবধও কত্তে হল!

ধাত্রী। মহারাজ, ধীরে—ধীরে।

রাজা। এই যে কংসশিলা! এখানেই সেই নিষ্ঠুর কার্য্য শেষ কত্তে হবে!

ঋষি-শাপের বলে দেবকী সপ্তম গর্ভে এই শিশু ধারণ করেছে। ইহার বিনাশেই আমার শান্তি হবে।

(শিশুগ্রহণ ও শিলাতলে প্রহার)

একি! একি! এক অংশ ভূতলে পড়ে রৈল! আর এক অংশ সমুজ্জ্বল শস্ত্র হস্তে আমাকে বিনাশ করবার জন্য আকাশে উঠে গেল!

হায়! নিশ্চয় আমার বিনাশকাল উপস্থিত হয়েছে! তাই বুঝি তীক্ষ্ণাগ্র শূল ধারণ করে কালরাত্রির ন্যায় রৌদ্রবেশে এই মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হল।

পাপপুণ্য ফলদাত্রী সপরিবারা কার্ত্যায়নীর প্রবেশ

কার্ত্যায়নী। শুম্ভ, নিশুম্ভ ও মহিষাসুরকে বধ করে দেবগণকে নিঃশঙ্ক করেছি—এখন কংস-বংশ ধ্বংস করার জন্য কার্ত্যায়নীরূপে বসুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি।

কুণ্ডোদর। আমার নাম কুণ্ডোদর। আমি অজেয়, রণে আমার প্রচণ্ড প্রভাব। দেবী জন্মগ্রহণ করেছেন

বলে ভীষণ হুঙ্কার কচ্ছি। শীঘ্রই আকাশ হ'তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব। বীর্য্য-দর্পিত অসুরগুলিকে সংহার করাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

শূল। আমার নাম শূল। দেবীর প্রসাদে উজ্জ্বল ও চারুবেশ ধারণ করে আমি ভূতলে অবতীর্ণ হব। কার্ত্তিকেয় যেমন বৃষরূপধারী তারকাসুরকে বধ করে সমুদ্র বক্ষ হ'তে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ দুরাত্মা কংসকে যুদ্ধে বিনাশ করব।

নীল। আমার নাম নীল। আমি কলহের কর্ত্তা। আমি সংগ্রামে সর্ব্বদাই বীরত্ব দেখাই। কদাপি পরাঙ্মুখ হই না। শক্তিধর কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চাসুরকে বধ করেছিলেন আমিও সেরূপ যুদ্ধে দুর্ব্বিনীত কংসকে বধ করব।

মনোজব। আমার নাম মনোজব। আমার বেগ বায়ুর ন্যায়। দেবীর কার্য্য সাধনের জন্যই এখানে এসেছি। অগ্নি নলবনকে যেরূপ দলন করে, রণ ক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে যুদ্ধ করে দৈত্যগণকেও আমি সেরূপ দলন করব।

কাত্যা। কুণ্ডোদর, শঙ্কুকর্ণ (শূল), মহানল, মনোজব, তোমরা সকলে এদিকে এস। ভগবান বিষ্ণুর বাল্যলীলানুষ্ঠানের সাহায্য কত্তে গোপাল বেশ ধারণ করে আমরা সকলেই ঘোষ-পল্লীতে অবতীর্ণ হব।

সকলে। ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

রাজা। এই যে রাত্রি প্রভাত হ'ল।

যাই এখন শান্তি লাভের জন্য শান্তি-গৃহে প্রবেশ করে বিপুল শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিগে। তা'হ'লেই আমারও শান্তি লাভ হবে।

প্রবেশক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ। ওহে মেঘদত্ত, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, ঘোষদত্ত, গোধনগুলিকে সামলাও। বৃন্দাবনে প্রচুর জল পান করে ও হাম্বা হাম্বা রব করে গরুগুলি সব আসছে। চেয়ে দেখ শিং দিয়ে বল্মীকের মূল খুঁড়েছে বলে এই ষাঁড়টার শিংয়ে কাল রঙ্গের কতগুলি সাপ জড়িয়ে গিয়েছে বোধ হচ্ছে যেন কেহ নীলপদ্মের মালা পরিয়ে দিয়েছে। আবার দেখ আর একটা চাঁদের মত সাদা ষাঁড় জানু দুটি কুঞ্চিত করে, লেজ উঠিয়ে ও লেজের লোমগুলি ছড়িয়ে দিয়ে কেমন সুন্দরভাবে দৌড়ে আসছে! মনে হচ্ছে যেন শিংয়ের আগা দিয়ে পৃথিবীটি তুলে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে! আচ্ছা, এ বেলা দামককে ডাকি। ওরে দামক, গাইগুলিকে ভাল যায়গায় জড় করে বাছুরগুলির সঙ্গে নিয়ে আয়।

দামকের প্রবেশ

দামক। আমাদের মনিব নন্দগোপের ঘাসের অভাব নেই। ছেলে হওয়ার দিন থেকে ঘাস যেন বিপুল আনন্দে কেবল বাড়ছেই। আচ্ছা, গরুগুলি এখানেই থাক, আমি মামার কাছে যাই। মামা, প্রণাম কচ্ছি।

বৃদ্ধ। তোমাদের ও তোমাদের গোধন সকলের শান্তি হ'ক।

দামক। মাতুল, যে দিন থেকে নন্দগোপের পুত্র জন্মেছে সেদিন থেকে আমাদের গরুগুলির আর কোনই অসুখ নেই। গোপেরা সকলেই কেবল আনন্দে আছে। আর যেখানে খাত সেখানেই প্রচুর মূল, যেখানে গুল্ম সেখানেই প্রচুর ফল।

বৃদ্ধ। দামক, এ আর কি আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে। নন্দগোপের ছেলে হওয়ার দশ দিন পরে পুতনা রাক্ষসী যশোদার রূপ ধরে স্তনে বিষ মেখে এসেছিল। তারপর ছেলে কোলে করে রাক্ষসী যেই বিষাক্ত স্তন তার মুখে পুরে দিল অমনি ছেলেও

রাক্ষসীকে চিনতে পেরে মেরে ফেল্‌লে। মিথ্যা যশোদটাও রাক্ষসীর রূপ ধরে সেখানে পড়েই মরে গেল। তারপর ছেলের যখন এক মাস বয়স হল তখন শকট দানব শকটের রূপ ধরে এল। ছেলেও চিনতে পেরে এক লাথি মেরে শকট চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেল্‌লে। সেই রাক্ষসও দানব রূপ ধরে সেখানে পড়ে তখনই মরে গেল। একমাস বয়স হলে পর নন্দ-নন্দন এক বাড়ীতে গিয়ে দুধ, এক বাড়ীতে গিয়ে দৈ, অন্য এক বাড়ীতে গিয়ে ননী, আর এক বাড়ীতে গিয়ে পায়স, অপর আর এক বাড়ীতে গিয়ে ঘোল খেয়ে বেড়াতে লাগল। গোপিনীরা গোপালের এই দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হ'য়ে যশোঁদার কাছে এসে সব কথা বলে দিলে। যশোদাও রুষ্ট হ'য়ে গোয়াল ঘরের গরুবাঁধা দড়ি * দিয়ে গোপালকে পেটে-পিঠে বেঁধে একটা উদুখলে বেঁধে রাখল। নন্দগোপের পুত্রও উদুখলটি নেড়ে-চেড়ে তখন যুগলরূপী যমলার্জুন বৃক্ষের মাঝ খানে ফেলে দিল। এদিকে উদুখলটা ফেলে দেওয়া মাত্রই দেখ্‌তে দেখতে গাছ দুটাও জোড়া লেগে গেল। কাজে-কাজেই উদুখলটাও গাছের ভেতরে আটকে গেল। তখন নন্দগোপের পুত্র দড়িতে এত জোরে টান দিল যে মূলশুদ্ধ গাছ দুটা উপড়িয়ে ফেল্‌ল আর সেগুলি দানবের রূপ ধরে সেখানে পড়েই মরে গেল। এ সকল দেখে তখন গোপেরা বলতে লাগল, এই শিশু মহাবলশালী, আজ থেকে ইহার নাম দামোদর হ'ক। তার পর ছেলে যখন দৌড়াদড়ি কচ্ছে গ্রামে এমন সময় এক দিন প্রলম্বাসুর অবিকল নন্দগোপ সেজে এসে সঙ্কর্ষণকে কাঁধে করে নিয়ে চল্‌ল। সঙ্কর্ষণও চিনতে পেরে অসুটার মাথায় এমন জোরে এক মুষ্টি প্রহার কল্লে যে তার চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এল, আর দানবের আকার ধরে দৈত্যটাও সেখানেই পড়ে মরে গেল। একদিন দামোদর গোপদের সঙ্গে তাল আনতে তাল বনে গেল। তখন গাধার রূপ ধরে ধেনুকাসুর সেখানে এসে উপস্থিত। অসুরটাকে চিনতে পেরে তার বাঁ পা ধরে দামোদর তাল পাড়তে লাগল। ধেনুকও তখন দানবরূপ ধরে সেখানে পড়ে মরে গেল। তার পরে ঘোড়ার রূপ ধরে কেশী দৈত্য এল। তাকেও চিনতে পেরে দামোদর তার মুখে কনুই ঢুকিয়ে দিল। তাতে সেই ঘোড়া দুই খণ্ড হ'য়ে গেল, আর দানবের রূপ ধরে সেখানে পড়ে মরে গেল। দামোদর যে কেবল এ সকল অসাধ্য কাজই করেছে তা নয়। তা ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করেছে।

দামক। মাতুল, এসব কথা এখন থাক। দামোদর আজ গোপ-কুমারীদের সঙ্গে রাসকেলি° কত্তে আসবেন।

বৃদ্ধ। তাহ'লে গোপদের সঙ্গে আমিও দামোদরের রাসকেলি দেখব।

দামক। মাতুলের যেমন ইচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ। সূর্য্য উঠতে না উঠতেই প্রতিদিন জগতের মাতৃরূপিণী অমৃতপূর্ণ গাভীগণকে অত্যন্ত আদরের সহিত প্রণাম করবে।

আমাদের মত সামান্য লোকেরও সমৃদ্ধি কম নয়! যাই জাঁকজমক ও আড়ম্বর করে কাপড়চোপড় পরে আসি গে। ওগো গোপকুমারীগণ, ওগো ঘোষসুন্দরী বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষী, তোমরা এস॥

ঘোষসুন্দরীগণের প্রবেশ

সকলে। মাতুল, প্রণাম কচ্ছি।

বৃদ্ধ। ওগো গোপ-সুন্দরীরা, গরুর দুধের মত পাণ্ডুবর্ণ সঙ্কর্ষণ অ র গোপকুমারদের সঙ্গে দামোদর এদিকেই আসছে—বোধ হচ্ছে যেন একটি সিংহ গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে!

---

* চলিত ভাষায় যাকে দাওয়াইন বলে।

° মূলে 'হল্লীসক' পাঠ আছে।

গোপকুমারগণের সহিত দামোদর ও সঙ্কর্ষণের প্রবেশ

দামো। আহা! গোপকুমারীগণ একেই স্বভাব-সুন্দরী। তাতে আবার পরিচ্ছদের পারিপাট্য! কি সুন্দর! এদের সমস্তই সুন্দর! গায়ের রং চম্পক চাঁপার মত, মুখ পদ্মের মত, আর চোখ নীলোৎপলের মত,— আবার নানা রঙের সুন্দর সুন্দর পোষাক পরেছে! এদের কথাগুলিই বা কত মিষ্টি! অলকদাম বনকুসুমে সাজিয়ে এদিকেই আসছে।

সঙ্ক। এই যে গোপাঙ্গনাগণ এসে পড়েছে দেখছি। কেহ কেহ রক্তবর্ণ ডিণ্ডিম বাজিয়ে যাচ্ছে, আর ডিণ্ডিমের বাজনা শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে অনেকে একস্থানে জড় হয়ে হর্ষধ্বনি কচ্ছে। কেহ বা আবার নানাভাবে কেলি কচ্ছে! তাদের সকলেরই মুখ পদ্মের মত, আর নয়ন পদ্মদলের মত। ঘোষ পল্লীতে হুম্ভা শব্দ শুনে উত্তেজিত হয়ে সকলেই বৃন্দারণ্যে এসে নিতান্ত পুলকিত চিত্তে গান কচ্ছে।

বৃদ্ধ। প্রভু, সকলেই সাজগোজ করে এসেছে।

দামক। প্রভুর জয় হ'ক।

সঙ্ক। দামক, গোপকুমারীরা কি সকলেই এসেছে?

দামক। হাঁ প্রভু, সকলেই কাপড়চোপড় পরে সেজেগুজে এসেছে।

দামো। ওগো, ঘোষ সুন্দরীগণ! ওগো বনমালা, ওগো চন্দ্ররেখা, ওগো মৃগাক্ষি, ঘোষ পল্লীর অনুরূপ রাস-কেলি আরম্ভ কর।

সকলে। যথা আজ্ঞা, প্রভু।

সঙ্ক। দামক, মেঘনাদ, তোমরা খোল, পাখোয়াজ* প্রভৃতি বাজাতে আরম্ভ কর।

উভয়ে। হাঁ, প্রভু, এই বাজাচ্ছি।

বৃদ্ধ। প্রভু, আপনারা ত সকলেই রাসকেলি আরম্ভ কল্লেন, আমি এখন কি করি।

দামো। কেন? তুমি দেখ।

বৃদ্ধ। আচ্ছা, তাই কচ্ছি।

(সকলের নৃত্য)

বৃদ্ধ। বাঃ! বাঃ! সকলেই বেশ গাচ্ছে, বেশ বাজাচ্ছে, বেশ নাচ্ছে, আমিও তবে নাচি। বাবা! নাচাও ত কম পরিশ্রম নয়!

গোপালকের প্রবেশ

গোপালক। প্রভু, প্রভু এখান থেকে শীগ্‌গির পালিয়ে যান।

দামো। দামক, তুমি ত ভয় পেয়েছ কেন?

গোপালক। প্রভু, পিণ্ডাকার দানব অরিষ্ট বৃষভ খুর-প্রহারে পৃথিবীকে দলিত করে মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জন কত্তে কত্তে এদিকে আসছে—তাই ভীত হয়েছি।

দামো। বটে! অরিষ্টর্ষভ এসেছে। তাতে ভয় কি? তুমি গোপকুমার ও গোপকুমারীগণকে নিয়ে পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করে আমাদের যুদ্ধ দেখ গিয়ে। আজ আমি অরিষ্টর্ষভের দর্প চূর্ণ করব।

[সঙ্কর্ষণ সহ সকলের প্রস্থান।

দামো। এই যে দুরাত্মা অরিষ্টর্ষভ! এই যে গোবৃষেন্দ্র! ভীষণ গর্জ্জন কত্তে কত্তে অগ্রসর হচ্ছে—ভয়ার্ত্ত গোপগণ ভীতিবিহ্বল হয়ে একদৃষ্টে তারই পানে চেয়ে আছে। ইহার খুর-প্রহারে ধরা যেন দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং শৃঙ্গাঘাতে মেঘমালা আক্ষিপ্ত হচ্ছে।

অরিষ্টর্ষভের প্রবেশ

অরিষ্ট। শত্রুবধের নিমিত্ত বৃষরূপ ধারণ করেছি, শৃঙ্গাগ্রের অসংখ্য কিরণরেখায় আকাশ-তল কর্ষিত করে, বৃন্দাবনে লীলাবিলাসে গর্জ্জন কত্তে কত্তে আজ শত্রুকে বিধ্বস্ত করে সুখে বিচরণ করব।

আমার হুঙ্কার শব্দে এই ঘোষ-পল্লীতে স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়, অর্দ্ধচন্দ্রাকার আমার খুরপাতে বৃক্ষ ও কাননসঙ্কুল সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়।

* মূলে "আতোদ্যাদি" শব্দের প্রয়োগ আছে। খোল, পাখোয়াজের ন্যায় যে সকল বাদ্যযন্ত্র চাপড়াইয়া বাজাইতে হয় তাহাদিগকে 'আতোদ্য' বলে।

তাইত নন্দগোপ-পুত্র গেল কোথা ? ওহে নন্দগোপ-পুত্র তুমি গেলে কোথা ?

দামো। ওরে গোবৃষাধম, এদিকে আয়, এদিকে আয়। আমি এখানে।

অরিষ্ট। (অবলোকন করিয়া)

এই বালক বাস্তবিকই বলশালী। আমার ন্যায় মহাবলশালী দানবের উগ্ররূপ দেখে এবং ভীষণ গর্জ্জন শুনে বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিস্মিত হচ্ছে না ! কি আশ্চর্য্য বালকের মনে একটু ভয়ও নাই।

দামো। কি বল্লে ? ভয় ! ভয়ের নাম ত আজ আমি তোমারই মুখে প্রথম শুনলুম। ভীত জনকে অভয় দেওয়ার জন্যই আমি মহীতলে জন্মগ্রহণ করেছি।

অরি। তুমি বালক কি না তাই ভয় জান না।

দামো। ওরে গো বৃষধম ! বালক বলে তুই আমার অপমান কচ্ছিস্ ! শিশু কৃষ্ণ সর্পের দংশনে কি লোকের মৃত্যু হয় না ! বালকবীর কার্ত্তিকেয়ই পুরাকালে ক্রৌঞ্চাসুরকে বধ করেছিলেন।

* * * * *

দেখ মূর্খ, শোন্, বজ্রপাতে শৈলমালা সামান্য পল্লবের ন্যায় সমভূমি হ'য়ে যায় ! তুইত কয়েকটি কঠিন উপলের সমষ্টি মাত্র !

অরিষ্ট। নন্দগোপ-নন্দন, তুমি কি করবে ?

দামো। তোকে নিধন করব।

অরিষ্ট। পারবে ?

দামো। বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

অরিষ্ট। বেশ, তা হলে, তোমার অভ্যস্ত শস্ত্র গ্রহণ কর।

দামো। আবার শস্ত্র গ্রহণ কত্তে হবে ! তোর মত দুর্ব্বলের জন্য গিরিমূলের ন্যায় কঠিন আমার স্কন্ধলগ্ন এই বাহুই যথেষ্ট। যদি এই ভুজ দণ্ড দ্বারা নিষ্পেষিত করে তোকে ভূতলশায়ী কত্তে না পারি তবে আমি দামোদর নই।

অরিষ্ট। বেশ, তা'হলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

দামো। দেখ্ গো-বৃষাধম, এই আমি এক পায়ের উপর দাঁড়ালুম, যদি শক্তি থাকে ত আমাকে সরা।

অরিষ্ট। এতে আবার সন্দেহ ! (সরাইতে চেষ্টা ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

দামো। ওরে গোবৃষ, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ। এত বল নিয়েই অহঙ্কার !

অরিষ্ট। (একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বগত) অহো, এই বালকে তেজ সত্য সত্যই অসহ্য।

এই বালক হয় রুদ্র, নয় শক্র, নয় স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস ইনিই পুরোষোত্তম।

আ ! যেখানেই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ত্রিলোক-পালক মধুসূদনও দানব-নিধনের জন্য সেখানেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

যদি বিষ্ণুর হাতে মরি তা'হলে আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে, এ হ'তে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে। সুতরাং যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। (প্রকাশ্যে) নন্দগোপপুত্র, আবার আমার দর্প জেগে উঠেছে।

দামো। হুঁ,—আচ্ছা একটু রসো।

বর্ষাকালে বর্ষণমুক্ত হলেও মেঘ যেমন জেগে উঠে সেইরূপ আমার বাহুগত হ'য়েও তুই গর্জ্জন কচ্ছিস ! আয়, বজ্রাহত অঞ্জন পর্ব্বতের মূল দেশের ন্যায় এখনই তোকে ভূতলশায়ী করব।

এই যে দুরাত্মা দানব অরিষ্টর্ষভ বজ্র-ভগ্ন শিখরাগ্র গিরি-দেহের ন্যায় গতজীবন হয়ে ভূপতিত হ'ল। ইহার নাসিকা, মুখ ও চক্ষু হ'তে নিঃসৃত রুধিরধারা জমাট বেঁধে গিয়েছে ! ঝুঁটির রোমগুলি কম্পিত হচ্ছে। আর পা গুলিও থেকে থেকে নড়ে উঠছে !

দামকের প্রবেশ

দাম। প্রভুর জয় হ'ক। যমুনা হ্রদে মহানাগ কালিয় দেখা দিয়েছে পর্ব্বত শিখরে এই সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রভু সঙ্কর্ষণ সেদিকে চলে গিয়েছেন। প্রভু, সঙ্কর্ষণকে নিবারণ করুন ! নিবারণ করুন।

রাখাল। আমিও শুনেছি সর্পরাজ কালিয় বড় দাম্ভিক। আমি আজ তার দর্প চূর্ণ করব।

দুরাত্মা কালিয় গোব্রাহ্মণাদি জীবগণকে হিংসা করে, আজ থেকে সে শান্ত ও নিস্তেজ হবে। [প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

মায়াময়ী

১

কত কাল দেখিনিকো
তবু যেন মনে হয়,
হাসিমাখা আঁখি দু'টী
প্রাণে মোর জেগে রয়।
হৃদয়-গগনে মম
একি নিতি নিরুপম
উদিয়াছে উষাকালে
এ যুগল শুকতারা,
নিরমম বসুধায়
রোগ-শোক-বেদনায়
নীরবে ঢালিতে শুধু
আকুল সুধার ধারা।
কত কাল দেখিনিকো
তবু যেন মনে হয়,
হাসিমাখা আঁখি দু'টী
প্রাণে মোর জেগে রয়।

২

কত কাল কেটে গেছে
সে গেল বিদায় নিয়ে,
তবু যেন সে রয়েছে
দেহে মনে জড়াইয়ে!
পরশন-মধু তার
জোছনা-প্রলেপ-সার
আজো এ তাপিত কায়
সরস শীতল করে;
আজো এ অধর-আগে
তপত চুম্বন জাগে—
নিভৃত মরমখানি
শিহরে হরষ ভরে!
কত কাল কেটে গেছে
সে গেল বিদায় নিয়ে,
তবু যেন সে রয়েছে
দেহে মনে জড়াইয়ে!

৩

কত কাল শুনি নাই
সুমধুর বাণী তার,
তবু যেন বাজে বুকে
প্রতিধ্বনি অনিবার।
সে যেন আমার কাছে
এখনো বসিয়ে আছে
তেমতি দিয়েছে খুলে
হৃদয়ের সুরধুনী,—
সেই 'কুল'-'কুলু'-ভাষা
সেই সাধ সেই আশা
প্রেমের প্লাবন সেই
অনন্ত জীবন চুমি'।
কত কাল শুনি নাই
সুমধুর বাণী তার,
তবু যেন বাজে বুকে
প্রতিধ্বনি অনিবার।

৪

অয়ি মায়াময়ী দেবী,
একি মায়া-লীলা তব,

আকুল অবাক্ হয়ে
চেয়ে রই সুনীরব !
সবে ভাবে বহু দূরে
তুমি আছ সুর-পুরে—
ভাবি আমি হবে তাই
গেছ মোরে একা ফেলি'—
আবার দেখিতে পাই
তুমি ছাড়া আমি নাই
কত কাছে আছ তুমি
সব বাধা অবহেলি' !
অয়ি মায়াময়ী দেবী
একি মায়া-লীলা তব,
আকুল অবাক্ হয়ে
চেই রই সুনীরব !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক ন্যায়

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত কলিকাতা অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত)

আমরা যে প্রসঙ্গ আলোচনায় ব্রত হইতেছি, তাহাতে অনেক অবান্তর কথাও বলিতে হইবে; নহিলে, কর্ম্মীর কর্ম্মজীবন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে না, কারণ, তিনি বিজ্ঞান-জগতের যুগান্তর সংঘটক, সমগ্র রসায়নবিদ্‌গণের কর্ম্মের বিচক্ষণ সমালোচক ও বিচারক এবং পরিমাণাত্মক রসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা; অতএব, পাঠকবর্গের একটু ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক অবহিত চিত্তে পাঠ করিতে হইবে।

লাভোয়াসিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের নৈয়ায়িক। তাঁহার পরিমাণাত্মক সত্য, রসায়নের ন্যায়শাস্ত্র। ভাষা ও সাহিত্যে যেমন প্রভেদ ও সম্বন্ধ আছে, তেমনি প্রাচীন রসায়নী-বিদ্যা ও নব্য রসায়নী-বিদ্যার মধ্যে প্রভেদ ও সম্বন্ধ আছে। প্রাচীন রসায়নীবিদ্যা, ভাব প্রকাশের উপায়ের ক্রমবিকাশের ফল বা ভাষা, আর নব্য রসায়নী বিদ্যা ভাবের ক্রমবিকাশের ফল বা সাহিত্য। ভাব স্রষ্টা, ভাষা সৃষ্ট। আবার, ভাব ও ভাষার সমঞ্জসীভূত সমন্বয় বা নির্ব্বাণই সাহিত্য। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। মানব-চিন্তা-সমূহ যখন বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাষার সাহায্যে লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে, তখন হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্যাকরণ যেমন ভাষার ন্যায়শাস্ত্র, তেমন এই পরিমাণমূলক রসায়ন, প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের ব্যাকরণ বা সংযম। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভাষার অন্তর্নিহিত সূত্র-সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া ভাষার মধ্যে যে, বাক্যরচনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারা সেই প্রণালীর আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক রীতি-গুলি আবিষ্কার করিতে হয়। ভাষাকে আয়ত্ত করিবার পর ভাষার মৌলিক উপাদনগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সাধারণ নিয়মগুলি অর্থাৎ ভাষার সূত্র বা ব্যাকরণ শাস্ত্র বাহির করিতে হয়। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, এই বিশ্লেষণ-কার্য্য যেমন সমাধা হইতে পারে না কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য, তেমন রসায়নে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা না জন্মিলে— সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ না জানিলে এই রসায়নঘটিত ন্যায়শাস্ত্রের [illegible] অধিকার জন্মিবার

সম্ভাবনা নাই; সুতরাং উপরিউক্ত ভাষাশিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় রসায়নী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। যেরূপ বাক্য-রচনায় নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষার সাহায্যে এবং ভাব প্রকাশের প্রণালীর উৎকর্ষে ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইলেই সাহিত্যে বুৎপত্তি জন্মে, নতুবা নহে সেরূপ বিশ্লেষণ প্রণালীতে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিলেই পরিমাণাত্মক বিজ্ঞান আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। অতএব, পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানই, "রাসায়নিক সাহিত্য।"

বস্তুর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিমানাত্মক-সত্যরূপ বজ্রলেপদ্বারা প্রস্তুত নব্য-রসায়ন-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ "বস্তুর অবি-নশ্বরত্ব" অর্থাৎ পরমাণুর ধ্বংস বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই এমত মহাজ্ঞানী লাভোয়াসিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা বা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। লাভোয়াসিয়েই এই ভিত্তিকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়া রসায়ন শাস্ত্রকে পরিমাণাত্মক শাস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রচারক এবং নব্য রসায়নী-বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জর্ম্মনীর ষ্টাল্ ও বেকার, ইংলণ্ডের জোসেফ্ প্রিষ্ট্লী ও হেনরী ক্যাবেন্‌ডিস্, স্কটলণ্ডের জোসেফ্ ব্ল্যাক, সুইডেনের শীলে প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক-গণই মহানুভব লাভোয়াসিয়ের নিকট চিরঋণী ও তাঁহার শিষ্যত্বে আবদ্ধ। তাঁহারা সকলেই অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন—রসায়ন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই। পাঠক, এরূপ অন্ধবিশ্বাস কখনই রাখিবেন না যে, লাভোয়াসিয়ে কেবল পরের আবিষ্কৃত বিষয়গুলি আত্মসাৎ করিয়া জুড়িয়া গাঁথিয়া বা জীর্ণ-সংস্কার করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সে সময় বিজ্ঞান-জগতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কারণ, ভাষাই প্রথম, ব্যাকরণ পরে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে বস্তু অনশ্বর এবং পরমাণু-সমষ্টিদ্বারা গঠিত এই মত চলিয়া আসিতেছে। মহর্ষি কপিল বলেন, "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত বস্তু না থাকিলে আপন হইতে বা স্বতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ বলেন, "জড় পদার্থের পরমাণু মাত্রেই, আর পরমাণু সমষ্টিরূপ ঘটপটাদি সাবয়ব দ্রব্য অনিত্য।" আমাদের দেহও প্রকৃত পক্ষে নশ্বর নয়। মৃত্যুর পর, যে পঞ্চভূতের সমবায়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পঞ্চভূতেই পুনর্ব্বার লীন হয়, অর্থাৎ "পঞ্চত্ব প্রাপ্ত" হয়। আবার বৈশেষিক দর্শনের অনেক পূর্ব্বে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জানা যায় যে, "মৃত্যুর পর দেহ মৃত্তিকাতে লীন হয়"। অতএব, হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিকদের মতে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চভূত (সূক্ষ্ম ও স্থূল) সমবায়ে সৃষ্ট হয়; এবং বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভূতে পরিণত হয় অর্থাৎ সৃষ্টি পঞ্চভূতের সমন্বয়, এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণয়। সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে এই মত অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে বস্তুর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা কল্পনা, যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যেই কেবল সত্যের সন্ধান করিতেন বলিয়া অনেকে দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই দোষারোপের ভিত্তি যে কতদূর পোক্ত তাহাও সাহস করিয়া বলা কঠিন। কেন না প্রকৃত সত্যই নিত্য—অপ্রকৃত সত্য অনিত্য। যেমন "বজ্রলেপ" নামক সিমেণ্ট বা আস্তরের দ্বারা ভারতের প্রাচীন মন্দিরাদি প্রস্তুত হইত বলিয়াই "সহস্রাব্দবর্ষস্থায়ী"

হইয়া রহিয়াছে। আর, প্রাচীনেরা পঞ্চভূতকে আবার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও একটী বিশিষ্ট প্রমাণরূপে বোধ হয় গণ্য হইতে পারে। অতএব, তাঁহাদের জ্ঞান যে কেবল গোষ্পদ পরিমিত স্থানেই আবদ্ধ ছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে না। তবে, প্রামাণিক গ্রন্থাদির অভাবেই হউক, কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞানের ন স্বরূপে টীকা-বর্জ্জিত মূলস্থিত বিপর্য্যয়-কঠিন রূপ প্রাচীর দ্বারাও অবরুদ্ধ থাকিতে পারে। অন্যথা, বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে শ্রেষ্ঠতা আরোপ করিলেও পক্ষপাতিত্ব করা হয়—সেও দোষ; কেন না, বেদের স্বদেশ-বিদেশ নাই, বেদ সার্ব্বত্রিক। তবে, দেখা যায়, অনুমান, পর্য্যবেক্ষণ, ও পরীক্ষণ এই তিনের সমবায়েই "বিজ্ঞান"—অনুমানই আবার বিজ্ঞানের ভিত্তি। অনুমানকেও অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করিলে চলে না। কারণ, ভিত্তিহীন সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে না। অনুমান যতদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষিত তথ্যের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ উহা গ্রহণীয়। সচরাচর কোন বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন বা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসংক্রান্ত বিবিধ ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে স্বতঃই নানারূপ অনুমান করিতে হয়। এই অনুমান সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষরূপে কারণ নির্দ্দেশ হইলে 'অনুমান' ক্রমশঃ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু, তৎপরে আবার নূতন নূতন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ কালে উক্ত অনুমান দ্বারা সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে উহা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর সত্য বলিয়া আদর হয় না। অতএব, হিন্দু দার্শনিকদের কার্য্যতঃ পরীক্ষার অভাবেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, তাঁহাদের মধ্যে "বস্তুর বিনাশ নাই" এই মহাসত্যের বিশেষ আলোচনা বা বিকাশ হয় নাই, দেখা যাইতেছে; সুতরাং 'লাভোয়াসিয়েকেই' এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রচারকর্ত্তা এবং নব্য-রসায়ন-শাস্ত্রের 'জন্মদাতা' স্বীকার করিতে হইবে।

এই বস্তুর অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিবার জন্য লাভোয়াসিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটী করিয়াছিলেন।

একটী কাচনির্ম্মিত বকযন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাঙ্ বা সীসা গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাঙ্ গলিয়া না গিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত বালুকা যন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তাপ বশতঃ যে পরিমাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল, তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন তৎপরে, বকযন্ত্রের সরু মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন বন্ধাবস্থায় বকযন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে রাঙ্ রাঙ্-ভস্মে পরিণত করিতে লাগিলেন। বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ু যত বেশী থাকিবে রাঙ্ও তত বেশী পরিমাণে ভস্মে পরিণত হইবে। যখন আর রাঙ্ রাঙ্-ভস্মে পরিণত হইতেছে না তখন (এমন অবস্থায়) বকযন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় তাহার ওজন লইলেন। তাহাতে দেখিলেন, তাহার ওজন বাড়েও নাই, কমেও নাই, ঠিক সমানই আছে। যদিও রাঙ্ রাঙ্-ভস্মে পরিণত হইয়াছে, যদিও এখানে একটী রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং পরে ওজন ঠিক আছে।

বকযন্ত্র ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় তাহার সরু মুখ খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তখন দেখিলেন বাহিরের বায়ু সশব্দে বকযন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিল। কেন প্রবেশ করিল—ইহার তাৎপর্য্য কি? রাঙ্ ভস্ম হইবার সময় ভিতরকার বায়ুর কিয়দংশ টানিয়া লইয়াছিল। বকযন্ত্রের মুখ খুলিবামাত্র বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য সশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। তিনি পুনরায় এই বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলেন, ওজন প্রায় দশ গ্রেণ বাড়িয়াছে। তৎপরে, রাঙ্-ভস্ম ও নির্দ্দিষ্ট ওজনের রাঙ একত্রে ওজন করিয়া দেখিলেন যে, গৃহীত রাঙ্ অপেক্ষা রাঙ্-ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে, রাঙ্-ভস্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে?—তিনি দেখিলেন, বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল ঠিক

সেই পরিমাণে রাঙ্ অপেক্ষা রাঙ্-ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। উত্তপ্ত করিবার পর বদ্ধ বকযন্ত্রের মুখ ভাঙ্গাতে যতটুকু বায়ু প্রবেশ করিল, তাহা হইতে বকযন্ত্রকে বদ্ধ করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির হইয়াছিল, তাহার ওজন বাদ দিলে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল, তাহা পাওয়া যাইবে।

অতএব দেখা গেল যে, রাঙ্কে রাঙ্-ভস্মে পরিণত করিবার সময় কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, নির্দ্দিষ্ট ওজনের রাঙ নির্দ্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংমিলিত হইয়া দু'য়ের সমষ্টি ওজনের রাঙ রাঙ-ভস্মে পরিণত হইয়াছে সেইরূপ সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয় মাত্র সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না। পূর্ব্বে যে, রাঙ্-ভস্মের ওজন বাড়িয়াছিল, দেখা গিয়াছে তাহা কেবল অম্লজান-সংযোগের ফল। বাস্তবিকই জগতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি নূতন বস্তুর সৃষ্টি বা বিনাশ হইত, তাহা হইলে, এতদিন বস্তুর আধিক্যে বা অল্পতায় জগতের বিনাশ সাধিত হইত। লাভোয়াসিয়ে রঙ্গভস্ম লইয়া বহু পরীক্ষা করেন। কি উপায়ে রঙ্গ ভস্মে পরিণত হয় ও কেন হয় এবং তাহার ওজনই বা কেন বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানে তিনি বহুদিন ব্যাপৃত থাকেন। সাধারণতঃ বোধ হয় যে, রঙ্গভস্ম রঙ্গাপেক্ষা লঘু। কিন্তু যে ওজনের রঙ্গ জারিত হয় সমগ্র ভস্ম তদপেক্ষা গুরু। সুতরাং মারণ কালে রঙ্গ হইতে কোন উপাদান দূরীভূত না হইয়া বরং বাহির হইতে অন্য কোন নূতন পদার্থ রঙ্গের সহিত আসিয়া সংযুক্ত হইয়া থাকে। অম্লজানের সহিত রঙ্গের সংযোগকেই রঙ্গের মারণ কহে। লাভোয়াসিয়ে আরও বুঝিলেন যে, রঙ্গ যখন জারিত হয়, তখনও বায়ু হইতে এই উপাদান পৃথক হইয়া রঙ্গের সহিত সম্মিলিত হয়। অপর পক্ষে মারণ প্রক্রিয়ার শেষে বায়ুর যে অন্যতম উপাদান অবশিষ্ট থাকে, তাহাদ্বারা আর দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তাহাই যবক্ষারজান (Nitogen). রঙ্গ-মারণ প্রক্রিয়া হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি দ্বারা আরও দৃঢ়মূল হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই সময়ের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩০খৃঃ অব্দে জন্ রে (John Rey) নামক ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছিলেন যে, রাং বা সীসা বায়ুর সংস্পর্শে গলাইলে ক্রমশঃ ওজন বাড়ে এবং তাহার কারণ এই দর্শাইয়াছিলেন যে, যেমন বালুকারাশির উপর জল ঢালিলে বালুকা-কণাগুলি জল টানিয়া লয়, তেমনি ধাতুভস্মও বায়ুকণার সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ধাতু ভস্ম হইবার সময় যে ওজনে বাড়ে বিখ্যাত রবার্ট বয়েলের (Robert Boyl) এরূপ ধারণা ছিল; তিনি পদার্থসমূহের গঠনে তাপের শক্তি বিষয়েও বিশেষ আলোচনা করেন। বয়েল এরিষ্টটলের অনুগামী ছিলেন। সেইজন্য পদার্থের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই একমত। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উত্তাপ পাইলে ধাতুর পরমাণুগুলি অগ্নির পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। অগ্নি বা তেজ পঞ্চভূতের অন্যতম, অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ বিশেষ। এক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত মিলিত হইলে যে মিশ্র পদার্থের ওজন বাড়িবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি? তিনিও রাংকে ভস্মে পরিণত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, গৃহীত রাং অপেক্ষা প্রাপ্ত রাং-ভস্মের ওজন অনেক বেশী। পাঠক, বুঝিবেন যে, উভয়ের মতেই সত্যের কিঞ্চিৎ আভাস আছে মাত্র। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য রসায়নশাস্ত্রবিৎগণ মহানুভব লাভোয়াসিয়ের নিকটই ঋণী। ইংলণ্ডের আর একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক জন্ মেও এণ্টিমণি নামক ধাতুকে ভস্ম করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ধাতুভস্ম গৃহীত ধাতু অপেক্ষা ওজনে ভারী। ইহাদের পরীক্ষার ফল ষ্টাল ও বেকারের অবিদিত ছিল না; কিন্তু তাঁহারা ইহাদের প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন নাই।

ইহার দ্বারা আর একটী বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের পথ পরিষ্কৃত হইল—বহুদিনের দৃঢ়মূল মহাভ্রমের সংস্কার হইতে চলিল।

ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের পর "ফ্লজিষ্টনবাদের" পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। কিন্তু, যতদিন পর্য্যন্ত ধাতুভস্মের ওজন বৃদ্ধির হেতু ঠিক্ নির্ণীত না হইয়াছিল, ততদিন "ফ্লজিষ্টনবাদের" বিরুদ্ধে কোনও নূতন মত লাভোয়াসিয়ে প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ধাতুর সহিত কোন্ পদার্থ সংযুক্ত হইলে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য লাভোয়াসিয়ে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার এই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। তাঁহা কর্ত্তৃক উক্ত মতবাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটীর পর আর একটী করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। কত অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, বিচিত্র ভাব প্রবণতা এক একটী বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার কাহিনীকে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখে। এই "ফ্লজিষ্টনবাদের" সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ অশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমস্ত জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন। সহিষ্ণুতাই সিদ্ধির জনক বা প্রাপক। বাস্তবিক, সহিষ্ণু না হইলে কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাই, ইংরেজিতে রাসায়নিকদের সম্বন্ধে একটীকথা আছে,"A Chemist is the most patient animal even the ass not excepted"—চির-সহিষ্ণু গর্দ্দভ অপেক্ষাও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। মূল কথা, জ্ঞান-সাধকগণ সাধনাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন—জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র ধ্রুব সত্য মনে করিয়া জ্ঞানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

কিছুদিন পর যখন এই ভ্রম-সংস্কার বিষয়ে রসায়নবিদগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, তখন ফ্লজিষ্টনবাদিগণের মধ্যে একটা গোল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ইহার একটা খেলো অর্থাৎ অর্থশূন্য মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য বলিলেন যে, ফ্লজিষ্টনের ওজন নাই, ইহা মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া বিপরীত দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং ইহার সংযোগে দ্রব্যের ওজন কমে, ও বিয়োগে ওজন বাড়ে। যদি দাহিত বস্তু হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার গুরুত্বের হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। ফ্লজিষ্টনবাদিগণ ইহাতে বলেন যে, ফ্লজিষ্টন সংযোগে পদার্থ নিচয়ের লঘুত্ব সাধিত হয় (Phlogiston possesses a negative weight)। ইহা একটি বড় অদ্ভুত মীমাংসা। যদি ফ্লজিষ্টন মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে, উহা কিরূপ বা কোন্ জাতীয় পদার্থ এবং কিরূপেই বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অনেক দিনের ভ্রান্ত সংস্কার সহজে অপনীত হয় না। এ ক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কাল্পনিক মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাৎকালিক রসায়নবিদগণ ফ্লজিষ্টনবাদের ভুল দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের পরিভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। বেকার (Becher, 1615—1682) এবং ষ্টাল (Stahl, 1660—1734) উভয়েই ঘোর ফ্লজিষ্টনবাদী ছিলেন এবং ইঁহারাই এই "অদ্ভুত তেজোবাদের" প্রথম প্রচারক। জোসেফ্ প্রীষ্টলী, হেনরী ক্যাবেণ্ডিস্, জোসেফ্ ব্ল্যাক্ এবং শীলে প্রভৃতি যাবতীয় রসায়নিকই এই ফ্লজিষ্টনবাদের পরিপোষক ছিলেন। আবার, হম্বার্গের (Homberg, 1652—1715) মতে পদার্থ সমূহের দাহনের একমাত্র কারণ "গন্ধক" (Sulphur) এবং উহা সকল পদার্থেই বর্ত্তমান আছে। এ স্থলে ইহাও স্মরণ করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না

যে, কান্‌কেলের (Kunckel 1630—1703) ধারণা ছিল যে, সমস্ত পদার্থেই "পারদ" (mercury) বর্ত্তমান আছে। তিনি ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) প্রভৃতি লইয়া অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে নানা বাধা বিঘ্ন-আপত্তি খণ্ডন করিয়া লাভোয়াসিয়ে নির্ভয়ে "ফ্লজিষ্টনবাদ" ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রথমে অনেকেই লাভোয়াসিয়ের মতের বিরোধী হইয়াছিলেন। শেষে সত্যের জয় হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের দুই জন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক দুইটী অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার করিলেন, তাহাতেই লাভোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টন বাদের ভ্রম সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাইলেন। প্রিষ্টলীর দ্বারা অম্লজান্ এবং ক্যাভেণ্ডিসের দ্বারা জলের রাসায়নিক স্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই দুইটী আবিষ্কারের ফলে লাভোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদকে চিরদিনের জন্য রসায়নশাস্ত্র হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করা লাভোয়াসিয়ের গৌরবিত মহাকীর্ত্তি।

লাভোয়াসিয়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার তুলনামূলক সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিতে পাইল যে, এই নূতন বায়ু ফ্লজিষ্টনবাদের বজ্রসম কঠিন প্রাচীর ভেদ করিবে। অতএব, প্রিষ্টলীর পরীক্ষার সত্যতা অবধারণের জন্য তিনি প্রথমে তুলাদণ্ডে তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও দেখিলেন যে, লোহিত বর্ণ পারদ-ভস্ম (Red oxide of mercury) হইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে নির্ব্বাণপ্রায় শুষ্ক কাঠ, মোমবাতি প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নূতন বায়ুতে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং ইহা সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন গুণ সম্পন্ন; কিন্তু বোধ হয় সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ু অন্য কোন প্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে এবং দাহ্য বস্তু জ্বলিবার সময় এই নূতন বায়ু দাহ্য বস্তুর উপাদানের সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নূতন বায়ু সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া খানিকটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের পারদ একটি বকযন্ত্রে (Retort) গ্রহণ করিলেন। এই বকযন্ত্রের মুখ, অপর একটি পারদপাত্রে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপাত্রে (Bell Jar) প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজ দ্বারা কাচপাত্রের বায়ুর পরিমাণ মাপ করিয়া লইয়া বকযন্ত্রস্থিত পারদকে প্রায় একপক্ষকাল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল যে, বায়ুর পরিমাণ প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বকযন্ত্রস্থিত পারদের উপর একপ্রকার রক্তবর্ণ স্তর পড়িতেছে অর্থাৎ লোহিতবর্ণের পারদ ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে আর মোমবাতি প্রজ্জলিত হয় না। তিনি আরও দেখিলেন যে, অপর পাত্রস্থিত পারদও ক্রমশঃ ঘণ্টাকৃতি কাচ পাত্রের ভিতর উঠিতেছে। ইহার কারণ এই যে, বকযন্ত্রের মধ্যস্থিত বায়ুর কিয়দংশ যখন পারদ সংযোগে অপসারিত হইল, তখন আভ্যন্তরিক বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেল; সুতরাং বাহিরের বায়ুর চাপ (Atmospheric pressure) বশতঃ পারদ ক্রমশঃ কাচপাত্রের ভিতর উঠিতে লাগিল।

লাভোয়াসিয়ে এই পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, সাধারণ বায়ুতে এমন এক উপাদান আছে, যাহা উত্তাপ প্রয়োগে পারদের সহিত সংযুক্ত হয় অর্থাৎ পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া পারদ-ভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। এই লোহিত বর্ণ ভস্ম একটি যৌগিক পদার্থ। এই যৌগিক পদার্থ পুনর্ব্বার তীব্ররূপে উত্তপ্ত হইলে বিশ্লিষ্ট হয় এবং উপরি উক্ত বায়বীয় উপাদান বহির্গত হইয়া কেবল পারদ পড়িয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্ত লোহিত পারদ ভস্ম

উত্তপ্ত করিয়া তিনি উহা হইতে এই নূতন বায়ু অনেক খানি পাইলেন। এই পরীক্ষা দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিতে পারিলেন। এইরূপে অন্যান্য ধাতুও এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হয়। রঙ্গ-দাহণ প্রক্রিয়া হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা উপরিউক্ত পরীক্ষাদ্বারা দৃঢ়মূল হইল। এই পরীক্ষাদ্বারা আরও সপ্রমাণ হইল যে, বায়ু বা সাধারণ বাতাস একটি মূল পদার্থ নহে, পরন্তু উহাতে দুইটী বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে। বায়ুর এই নবাবিষ্কৃত উপাদান যাহা ধাতু ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার নাম রাখিলেন "অম্লজান" বা "অক্সিজেন" (Oxygen). কিন্তু যদি অঙ্গার কিংবা গন্ধক দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে বায়বীয় (gaseous) পদার্থের সৃষ্টি হয় ; অঙ্গার ও গন্ধক-দহনে উৎপন্ন উভয় বায়ুই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই জলের অম্ল আস্বাদ ঘটে, এই কারণে সাধারণ বায়ুর এই উপাদানকে লাভোয়াসিয়ে "অম্লজান" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সোডিয়াম (Sodium) পোটাসিয়ম (Potassium) প্রভৃতি ধাতু অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার আস্বাদ অম্ল না হইয়া বরং ক্ষারের মত হয়। সুতরাং বাতাসের এই উপাদানের "অম্লজান" নামকরণ ঠিক হয় নাই। লাভোয়াসিয়ের "অম্লজানের" "অম্লত্ব" এক্ষণ ঘুচিয়া গিয়াছে।

এখন লাভোয়াসিয়ে প্রচার করিলেন যে, ফ্লজিষ্টন বাদে বিলক্ষণ ভ্রম-প্রমাদ আছে। ধাতু ভস্ম হইলে, তাহার ওজন ত কমেই না বরং বাড়িয়া থাকে। এই ওজন বৃদ্ধির কারণ, আর কিছুই নয়, ধাতু সাধারণ বায়ুর অন্যতম উপাদান অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন ধাতু ভস্ম অঙ্গার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়, তখন অঙ্গার ধাতু ভস্মের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্লে (Carbonic acid gas) পরিণত হয়, এবং অসংযুক্ত ধাতু পড়িয়া থাকে। "ফ্লজিষ্টন" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা একটী ভ্রান্ত ধারণামাত্র। লাভোয়াসিয়ের এই অপূর্ব্ব নূতন আবিষ্কার রসায়ন জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিল। প্রথম প্রথম কেহ তাঁহার মতের পোষকতা করিল না। ফ্লজিষ্টনবাদিগণ তুমুল আন্দোলন করিলেও শেষে লাভোয়াসিয়ের মতই বলবৎ রহিল কারণ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই জীবদ্দশায় (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) ডি, মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী, ব্ল্যাক প্রভৃতি স্কচ্ রাসায়নিকগণ তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কেবল প্রিষ্টলী ও ক্যাবেন্ডিস্ চিরজীবন ফ্লজিষ্টনবাদী রহিয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু এখন পর্য্যন্তও লাভোয়াসিয়ের অম্লজানবাদ একটি বিষয়ের সম্যক্ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার, ইহার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে, দস্তা, রঙ্গ প্রভৃতি ধাতু যখন জলীয় বা তরলীকৃত লবণাম্ল বা গন্ধকাম্লে (Dilute hydrocloric or sulphuric acid) দ্রবীভূত হয়, তখন উদজান (Hydrogen) নামক একটী খুব লঘু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং ধাতু ভস্ম হইয়া অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হয়। ফ্লজিষ্টনবাদীরা বলিতেন যে, এই অতি "লঘু উদজানই" "ফ্লজিষ্টন" ; এবং অম্ল সংযোগে ধাতু হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ধাতুভস্ম পড়িয়া থাকে। লাভোয়াসিয়ে ইহার উত্তরে বলিলেন যে, এই উদজানবায়ু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে, তবে, উহা বাহির হইয়া গেলে কেমন করিয়া ধাতুভস্মের ওজন ধাতু হইতে বেশী হইয়া থাকে ? তিনি ফ্লজিষ্টন বাদীদের ভ্রম বলিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজের মতানুযায়ী প্রোক্ত বিশিষ্ট মীমাংসা

করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময়ে ইংলণ্ডের তাৎকালিক অন্যতম প্রধান রসায়নিক ক্যাবেণ্ডিস্ জলের রাসায়নিক স্বরূপ নির্ণয় করিলেন এবং জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিলেন। লাভোয়াসিয়ে প্রমুখ রাসায়নিকগণের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অম্লজান ও নাইট্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছিল। প্রিষ্টলী "অম্লজান" এবং ক্যাবেণ্ডিস্ "জলজান্" আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণাগুণ পরীক্ষা বা তৎসম্বন্ধে আর কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। বরং তাঁহারা পূর্ব্বাপর প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র লাভোয়াসিয়েই এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জলের যৌগিকত্ব সম্বন্ধেও তুমুল বিতণ্ডা হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাবেণ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী, সার্ চার্লস ব্লাকডেন্ ক্যাবেণ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল লাভোয়াসিয়ের গোচরে আনয়ন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্যাবেণ্ডিসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, সেই বৎসরই ফরাসীদেশের আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস ক্যাবেণ্ডিসের পরীক্ষার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। লাভোয়াসিয়ে আরও জলীয় বাষ্পকে একটী পোর্সিলেনের (Porcelain) নলে উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্জান বায়ু (Hydrogen) প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় জলীয় বাষ্প বিযুক্ত (Decomposed) হইয়া উদ্জান ও অম্লজানে পরিণত হয় এবং অম্লজান গ্যাস লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া লৌহভস্মে (Oxide of Iron) পরিণত হইয়া থাকে ও উদ্জান্ বাহির হইয়া আসে। এখন এই দ্বিবিধ পরীক্ষাদ্বারা জলের পরিমাণাত্মক রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। লাভোয়াসিয়ে কেবলমাত্র এই সকল পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি এখন দেখিতেপাইলেন যে, এই আবিষ্কার ফ্লজিষ্টনবাদীদিগের শেষ আশাও নির্ম্মূল করিবে। এত দিনে তিনি ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে উদ্জান কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এখানে নিম্নলিখিত ক্রিয়া সাধিত হইতেছে—প্রথমে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া অম্লজান উদ্জানে পরিণত হয় ও পরে অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সেই ধাতুভস্ম অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্জান বায়ু অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অতএব, ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে কাল্পনিক ফ্লজিষ্টনের উদ্ভবের কোনও সম্পর্ক নাই। জলের বিয়োগে একদিকে উদজান বায়ু বহির্গত হয় ও অপর দিকে ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। মূল কথা, প্রিষ্টলী ও ক্যাবেণ্ডিস ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। একমাত্র লাভোয়াসিয়েই যে এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

পাবনা জেলায় প্রচলিত প্রবাদ বচন

১। নিজে পায় না শোয়ার জাগা (=জায়গা) [illegible]য়ার মাক্ (মাকে) ডাকে মধ্যে শো গা।

২। ভাত পায় না স্যাকের ব্যাটা, পোল্লা ভাজা খায়।

স্যাক্—শেখ, মুসলমান।

পোল্লা=পটল

৩। মার চেয়ে মাসী আপন, তারে বলে ডা'ন।

ডা'ন=ডাইনা।

৪। হাড় খাব মাংস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব

৫। যত হাসা, তত কান্না, বলে গেছে রাম শন্না (=শর্ম্মা)

৬। দাদা কানা, আমি চোখে দেখি না।

৭। যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম কামাই।

৮। যার ঘোড়া তার ঘোড়াই নয়, চ্যারাক্‌দারের ঘোড়া।

চ্যারাক্‌দার=যে আলো ধরে।

৯। বিয়ের সময় কন্যা বলে, আমি হাগ্‌বো।

১০। শুনতেই শোনা যায় সোণারগাঁ বিক্রমপুর অর্থাৎ যতটা শুনা যায় প্রকৃত পক্ষে তত নয়।

১১। তোর তেল আঁচলে ঢাল, আমার তাড়ি আপুর কর।

তাড়ি=মাটীর তৈয়ারী তৈলাধার বিশেষ। আপুর করা অর্থাৎ, তোমার ক্ষতি হয় হউক, কিন্তু আমার কাজ হওয়াই চাই।

১২। নিজের ধান পাকিছে, এখন মারুক খরা।

খরা=অতি রৌদ্র, অনাবৃষ্টি। অর্থ, নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইলেই হইল।

১৩। খেয়ার কড়ি, ডুবে পার।

১৪। শক্ত মর্দ্দের দক্ষিণ দুয়ার।

১৫। শুইলে দুই পা যেখানেই যায়।

অর্থ—একই কথা।

১৬। ধন দিলি তো ব'য়ে দে।

১৭। যার ছাওয়াল যত খায়, তার ছাওয়াল ততই লালায়।

ছাওয়াল=ছেলে

লালায়=চায়

১৮। ছাইমুখে দেবতার ঘ'সির নৈবিদ্যি।

ঘ'সি=ঘুঁটে

১৯। যেমন দেবতা তার তেমনই বাহন।

২০। পেটে খেলে পিঠে স'য়।

২১। জলের ছিট্যা দিলে চো'ড়ের গুত্যা খেতে হয়।

চো'ড়=নৌকা বাহিবার লগী।

২২। একগুণ রামায়ণ, তার তিন গুণ ভ্যাবায়ন।

অর্থ=বাহ্যাড়ম্বরই বেশীর ভাগ।

২৩। নিজের মান নিজে রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

২৪। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।

অর্থ=ফাঁকে ফাঁকে থাকা

২৫। চোরের মায়ের ডাঙ্গর গলা—

ডাঙ্গর=বড

২৬। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

দড়=শক্ত

২৭। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

২৮। যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন মন্দ।

২৯। না দেওয়া কাঁঠালের শাওনে মাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ব্যক্তি আর এক জনের কাছে তাহার গাছের একটা কাঁঠাল চাহিয়াছিল। কিন্তু কাঁঠাল দিবার বৃক্ষস্বামীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, অথচ লজ্জা বশতঃ অস্বীকারও করিতে পারে না। তখন সে বলিল যে গাছের

কাঁঠাল তো এখন পাকে না—শ্রাবণ মাসে পাকে (শাওনে)

৩০। দুই দিনকার বৈরাগী নয়, ভাতেক বলেন অন্ন।

৩১। জাতও গেল, পেটও ভরল না।

৩২। একা রামে রক্ষা নাই, দোসর লক্ষ্মণ (সুগ্রীব)।

৩৩। বিশ্বকর্ম্মার ব্যাটা চাম্‌চিকা।

৩৪। করজ ক'রে খাওয়া, আর ভাট্যাল নাও বাওয়া।

ভাট্যাল=ভাটীর দিকে

নাও=নৌকা।

৩৫। সুদের কড়ি সা'ঙ্গে চলে

সা'ঙ্গে=কোনও ভারী বস্তু কাঁধে করিয়া বহিবার বাঁশ।

অর্থ—সুদ এত দ্রুত বাড়িয়া চলে যে তাহা কাঁধে বহিয়া লইতে হয়।

৩৬। কোথায় রাণী ভবানী, আর কোথায় ঘুঁটে-কুড়্যানী।

৩৭। রাম না জন্মিতেই রামায়ণ।

৩৮। ন্যাংটার আবার চোরের (বাটপারের) ভয়।

৩৯। চৌদ্দ চাকার রথ দেখান।

অর্থ—বিষম মুস্কিলে ফেলান।

৪০। গঙ্গাতীরে বাসা।

৪১। জানে না শুনে না বামন্
চিন্যার ক্ষ্যাতে বুনে আমোন।

চিন্যা=শস্য বিশেষ।

আমোন=আমন ধান।

৪২। মামার শালা পিস্তার ভাই,
তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

৪৩। মার কোড়ে না, পোড়ে মাসীর
ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী।

৪৪। গোলেমালে হরিবোল।

৪৫। বেঁচে থাক্‌তে দেয় না ভাত কাপড়
ম'লে করবে দানসাগর।

৪৬। যার শীল যার নোড়া
তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া।

৪৭। আতি চোর, পাতি চোর
দিনে দিনে সিধ চোর।

৪৮। সাধে কি বৈরাগী নাচে চিন্যার ছালার কাছে—(চিন্যার ছালা কাঁধে !)

৪৯। কল্লার নেমন্তন্ন, না আচালে বিশ্বাস নাই।

৫০। সব শিয়ালের এক ডাক।

৫১। —নাই চাম,
রাধা কৃষ্ণ নাম।

অর্থ—নিজের ভাত জোটে না, অথচ পরের দরবার করিয়া বেড়ায়।

৫২। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

৫৩। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।

৫৪। কাণা গরুর ব্যালোক্ ঘাঁটা।

ব্যালোক=পৃথক, আলাহিদা

ঘাঁটা=পথ রাস্তা

৫৫। মশার কামড় না স'য় গায়।
ছোট লোকের কথা না স'য় গায়।

৫৬। বারো মাস ব্রহ্মোত্তর, অগ্রাণ মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার।

কোনও জমিদার একজন ব্রাহ্মণকে কিছু ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোমস্তা ভবানন্দ অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকিলে, জমির ফসল সরকারী খামার এই অজুহাতে আত্মসাৎ করিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া জমিদারের নিকট উপস্থিত হইল এবং উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা জমিদারকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর

শিল্পকার্য্যের উৎকর্ষ সভ্যতার পরিচায়ক। সভ্যজাতি তাঁহাদের বাসস্থানের নির্ম্মাণেই শিল্পের প্রথম প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের নগরাদি নির্ম্মাণে শিল্প-কৌশলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা তাঁহাদের সভ্যতার প্রমাণ পাইতে পারি। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর নির্ম্মাণের যে বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা যেমন ভারতের প্রাচীন শিল্পোৎকর্ষের প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তেমনই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

'নগর' যেমন সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল পুরও তেমনই কেন্দ্রস্থান ছিল। কিন্তু 'নগরই' সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত; 'পুর' তদপেক্ষা অপ্রধান কেন্দ্রস্থান রূপে বিবেচিত হইত। নগর ও পুরের প্রভেদ শাস্ত্রাদিতে কিরূপ করা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—"বহুগ্রামের ব্যবহার অর্থাৎ ব্যবস্থাদির স্থান পুর—পুর সকলের মধ্যে প্রধান স্থানই নগর।" সুতরাং পাশ্চাত্য বর্ত্তমান City ও Town এর মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায় পূর্ব্বতন 'নগর'ও 'পুরের' মধ্যে সেইরূপ প্রভেদই বিদ্যমান ছিল। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পুর বৃহৎ হইলে তাহা নগর বলিয়া কথিত হইত।

[illegible] পূর্ব্বে পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হইত বলিয়াই [illegible] শব্দার্থ দ্বারা বুঝা যায়। কারণ 'নগ' শব্দের অর্থ [illegible] তদ্বৎ অত্যর্থে 'র' প্রত্যয় করিয়া 'নগর' হয়। অভিধানে 'নগর' শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে কিন্তু পর্ব্বতের [illegible] প্রাসাদাদি বিদ্যমান আছে যথায় এইরূপ [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"নগা ইব প্রাসাদাদয়ঃ [illegible]।" দুর্গস্থান পাশ্চাত্য নগরের প্রধান চিহ্ন বলিয়া [illegible] Citadel নামে কথিত হয়—পর্ব্বতরূপ স্বাভাবিক দুর্গস্থানও তেমনই প্রাচ্য প্রাচীন নগরের বিশেষ চিহ্ন হওয়াতেই উহা 'নগর' নামে অভিহিত হইত বলিয়া বোধ হয়।

দেবীপুরাণ হইতে নিম্নে আমরা একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা হইতে নগর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানিতে পারা যাইবে—

"ঐন্দ্রোত্তর প্লবে ভূমৌ পুরং দুর্গঞ্চ শস্যতে।
চতুরস্রমথাবৃত্তং ত্র্যস্রং দীর্ঘমথাপি বা॥
পুরঃ যথাক্রমাৎ শ্রেষ্ঠং মধ্যমোত্তমকন্যসম্।
সমন্তাদ্ যোজনান্যষ্টাবৈন্দ্রং দেবপুরং মতম্॥
দশষ্বে বৈষ্ণবং প্রাহুঃ ষষ্ঠমানন্তু শাঙ্করম্।
দশ ব্রাহ্মাং তথা পঞ্চ সামান্যং সার্ব্বভৌমিকম্॥
যোজনার্দ্ধার্দ্ধ মানানি পুরাণি সন্নিবেশয়েৎ।
মধ্যে রাজগৃহং কার্য্যং বিপ্রাণাঞ্চোত্তরাদিতঃ॥
ক্রমাচ্ছেষাণি কার্য্যাণি প্রকৃতিবাহ্যতঃ পুরাৎ।
বসেয়ুরন্যথাদোষো বর্ণশঙ্করজোমহান্॥
কৃত্রিমেষু চ দুর্গেষু চেষ্টপ্রাকারকল্পনা।
চতুঃ পঞ্চকমানেন কল্পয়েদ্বিধিনা মুনে॥
খাতিকারচিতং কার্য্যং প্রণালীভিঃ সমন্বিতম্।
চত্বার্য্যথবা ত্রীণি দ্বৌ বা ভূমিবশাদ্ভবেৎ॥
নবদুর্গাসমেতঞ্চ সশিবং ভুজগান্বিতম্।
নগরং সর্ব্বতোভদ্রং কর্ত্তব্যং রুচকং পিবা॥
স্বস্তিকং মধ্যমং কার্য্যং কুমারীপুরমেবচ।
চতুষ্পথ চতুর্যুক্তং সর্ব্বকামসুখাবহম্॥
ছিন্নকর্ণং বিনাসং দুঃস্থিতং কৃশদুর্ব্বলং।
নগরং ন প্রশংসন্তি গর্ত্তাবদ্ধং বিভেদিতম্॥
অগ্রতঃ স্বল্পপ্রাসাদং ছিন্নগ্রাণং বিদুর্ব্বুধাঃ।
দ্বিমুখং কর্ণহীনন্তু কৃশং মধ্যে কৃশং বিদুঃ॥
দুঃস্থিতং নিম্নং যাম্যন্তু নৈঋতং ধনদুর্ব্বলং।
সৌম্যং সর্ব্বসুখাচ্ছাদি পূরিতং বারুণং বশম্॥
যাম্যাযায়ুঃপ্রদং পূর্ণনগরং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
[illegible] সংপূর্ণ সর্ব্বারোগ্য সুখপ্রদম্॥

মধ্যং চতুষ্পথোপেতং ন চ তং পীড়য়েৎ ক্বচিৎ।
ব্রহ্মস্থানং হিতং বিপ্র শিবস্তত্র সদা স্থিতঃ॥
চতুর্বিংশতি নাভাস্ত হস্তানষ্টশতং পরম্।
অত্রমধ্যং প্রশংসন্তি হ্রাসোৎকৃষ্ট বিবর্জ্জিতম্॥
অথ কিন্তু শতান্যষ্টৌ প্রাহুর্ম্মুখ্যং নিবেশনম্।
নগরার্দ্ধঞ্চ বিষ্কম্ভং খেটংগ্রামং তদর্দ্ধতঃ॥
নগরাদ্ যোজনং খেটং খেটাদ্ গ্রামার্দ্ধযোজনম্।
দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ॥
ত্রিংশদ্ধনুর্গ্রামমাহুঃ সীমামার্গো দশৈবতু।
ধনুংষিচ দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান রাজপথঃ কৃতঃ॥
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধ সুসঞ্চরঃ।
ধনুংষি চৈব চত্বারি শাখা রথ্যাস্ত নির্ম্মিতাঃ॥
ত্রিকরা শ্চোপরথ্যাস্ত দ্বিকরাপ্যুপরথ্যকাঃ।
জঙ্ঘাপথ শ্চতুষ্পাদঃ ত্রিপদং স্যাদ্ গৃহান্তরম্॥
বৃতীপাদস্তর্দ্ধপাদং প্রাগ্বংশঃ পাদিকঃ স্মৃতঃ।
অবকরঃ পরিচারঃ পাদমাত্র সমস্ততঃ॥"

দেবীপুরাণ, ৭২ আধ্যায় (বঙ্গবাসীর ছাপা)

"ঈশানকোণে নিম্নভূভাগে নগর এবং দুর্গস্থাপন প্রশস্ত। চতুষ্কোণ, বৃত্ত, ত্রিকোণ, এবং দীর্ঘ নগর যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম উত্তম এবং কনিষ্ঠ। চতুর্দ্দিকে অষ্ট যোজন যে নগর তাহা ঐন্দ্রদেবপুর। দ্বাদশ যোজন নগর বৈষ্ণবপুর। ষষ্ঠ যোজন নগর শৈবপুর। দশ যোজন পরিমিত নগর ব্রহ্মপুর এবং যোজন পরিমিত নগর সামান্য সার্ব্ব-ভৌমিকপুর। সাধারণ নগর ক্রোশ পরিমিত হইবে। রাজগৃহ নগর মধ্যে হইবে। উত্তরাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বসতি যথাক্রমে হইবে। তদ্ভিন্ন নীচ জাতির বসতি যথাক্রমে পুরবাহ্যে হইবে। এইরূপ না হইলে মহান্ বর্ণশঙ্কর দোষ ঘটিয়া থাকে। কৃত্রিম দুর্গে ইষ্টকের প্রাকার করিবে। চার পাঁচটী প্রাকার যথাবিধি কল্পনীয়। প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ খাতপরিবৃত করিবে। খাতের প্রণালী রাখিবে। এই প্রণালী ভূমি বিশেষানু-সারে চারিটী, আটটী, তিনটী বা দুইটী কর্ত্তব্য। মধ্যদুর্গা, শিব এবং নাগ-প্রতিমাযুক্ত নগর সর্ব্বতোভদ্র। রুচক নগরও এইরূপ। স্বস্তিক নামক নগরের মধ্যে কুমারীপুর স্থাপনীয়। স্বস্তিক নগরে চারিটী চতুষ্পথ থাকিবে। স্বস্তিক নগর সর্ব্বকামসুখাবহ। নাসাহীন, কর্ণহীন, কৃশ, দুঃস্থিত, দুর্ব্বল, গর্ত্তাবিদ্ধ এবং বিভেদযুক্ত নগর প্রশস্ত নহে। নগর-সম্মুখে প্রাসাদ অল্প থাকিলে সেই নগর নাসাহীন (বিনাস বা ছিন্ন ঘ্রাণ) নামে অভিহিত। বিমুখ নগর কর্ণহীন পদবাচ্য। মধ্যে কৃশ নগর, তাহাই কৃশপদবাচ্য। দক্ষিণ-নিম্ন নগর দুঃস্থিত নামে অভিহিত। নৈঋত-নিম্ন নগর দুর্ব্বল বা ধনদুর্ব্বল নামে অভিহিত। উত্তরভাগে পরিপূর্ণ যে নগর তাহা সর্ব্বসুখানন্দ জনক। পশ্চিমভাগে নগর সর্ব্ববশকারী, এবং দক্ষিণভাগে পরিপূর্ণ যে নগর তাঁহা আয়ুঃপ্রদ এবং প্রীতিবর্দ্ধন। ঈশান কোণে বা পূর্ব্বদিকে পরিপূর্ণ নগর সর্ব্বারোগ্যসুখদায়ী। মধ্যপূর্ণ চতুষ্পথোপেত নগর কদাচ পীড়িত হইবার নহে। এরূপ নগর ব্রহ্মস্থান, শিব তথায় সর্ব্বদা অবস্থিত। হে বিপ্র, এরূপ নগর হিতজনক। দ্বাদশ ক্রোশ অষ্টশত হস্ত, মধ্য নগরের পরিমাণ, মধ্যনগর সর্ব্বদিকে সমান হইবে। হ্রাসবৃদ্ধি থাকিবে না। অষ্টশত কিছু মধ্যমুখ্যনিবেশন। খেট বা বিষ্কুম্ভ নগরার্দ্ধ পরিমিত। গ্রাম খেটের অর্দ্ধ, খেট্ নগর হইতে যোজনমাত্র ব্যবহিত। খেট্ হইতে গ্রাম অর্দ্ধযোজন। দুই ক্রোশ হইল পরমসীমা, চারিধনুপরিমিত স্থান ক্ষেত্রসীমা। ত্রিংশৎ ধনুঃ গ্রামের ন্যূন পরিমাণ। সীমাপথও দশ ধনু। আর শ্রীমান্ রাজপথ দশ ধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত বিস্তীর্ণ হইবে। এরূপ হইলে মনুষ্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তী দিগের অবাধ সঞ্চরণ হইতে পারে। শাখাপথ চারি ধনু হইবে। উপরথ্যা (পথবিশেষ) তিন হস্ত, অন্তরথ্যা (তদন্তর্গতপথ) দুই হস্ত পরিমিত হইবে। জঙ্ঘাপথ চতুষ্পাদ পরিমিত। ত্রিপদের পর গৃহান্তর সংজ্ঞা। বৃতীপাদ অর্দ্ধ পাদ পরিমিত। প্রাগ্বংশ (বস্তীয় স্থান বিশেষ) পাদ পরিমিত হইবে॥" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে প্রাচীন নগর সকলের গঠন সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে উহা যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নগর গঠনপ্রণালী অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, তাহা প্রতীয়মান হয়। দেবতা ধষ্ঠান নগরে একটী বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। পাশ্চাত্য Parish এ যে ধর্ম্মমন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাসাদ পত্তনের ব্যবস্থা দেখা যায় ভারতীয় নগর, দেবাধিষ্ঠানও তদনুরূপ ব্যবস্থা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নগরমধ্যে চারিটী চতুষ্পথ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চতুষ্পথ যে বর্ত্তমান নগরের স্কোয়ারেরই (Square অনুরূপ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। স্কোয়ারগুলি নগরের মুক্তস্থান বলিয়া যেমন নগরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী চতুষ্পথগুলি সেরূপ উপযোগী বলিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান নগরের রোড (road) ষ্ট্রীট (street) লেন (lane) বাইলেন (by-lane) ফুটপাথ (foot path) প্রভৃতি রাস্তার যে সমস্ত বিবিধ বিভাগ দেখা যায় প্রাচীন নগরের রাজপথ, শাখাপথ, উপরথ্যা অল্পরথ্যা, জঙ্ঘাপথ প্রভৃতিতে আমরা তদনুরূপ বিভাগই দেখিতে পাই। রাস্তার নাম যে 'রথ্যা' দেখিতে পাওয়া যায় ইহা 'রথ' শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন। রথচালনের উপযোগী রাস্তাই রথ্যা নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে যেমন মধ্যরাস্তা গাড়ী প্রভৃতি চালনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দেখা যায় রথ্যাও সেইরূপ ভাবেই রথচালনার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান নগরে যেমন আমরা রাজপ্রতিনিধির আবাস ও দুর্গ সন্নিবেশ দেখিতে পাই তদ্রূপ প্রাচীন নগরেও রাজগৃহ ও দুর্গের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নগরে বিভিন্নজাতির সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট স্থান বিভাগ দেখিতে না পাইলেও ইউরোপীয় জাতিদিগের জন্য প্রায়ই স্বতন্ত্র স্থান বিভাগ দেখিতে পাই। পূর্ব্বের নগরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান বিভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম সমাজ সকল বিষয়েই যে অধিক সুবিধাজনক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরের বর্ণনায় "খেট" বর্ত্তমান Suburb বা নগরোপকণ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা স্বয়ং যে নগরে বাস করিতেন তাহা একটি বিশেষ নামে কথিত হইত। ইহার নাম ছিল 'পত্তন' —যথা "যত্র রাজা তৎপরিচারকাশ্চ তিষ্ঠন্তি তৎ পত্তনম্" ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভরতঃ। যেখানে রাজা ও তাঁহার পরিচারকগণ বাস করেন তাহা পত্তন। রাজধানী বলিলে আমরা যাহা বুঝি 'পূর্ব্বে' পত্তন তাহাই ছিল। এই রাজধানী বা রাজপুরী সম্বন্ধে আমরা মৎস্যপুরাণ হইতে একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজা সহায়সংযুক্তঃ প্রভূত যবসেন্ধনম্।
রম্যমানস্ত সামন্তং মধ্যমং দেশমাবসেৎ ॥ ১
বৈশ্য শূদ্র জনপ্রায়মনাহার্য্যং তথাপরৈঃ।
কিঞ্চিদ্ব্রাহ্মণ সংযুক্তং বহুকর্ম্মকরং তথা ॥ ২
অদেবমাতৃকং রম্যমনুরক্তজনান্বিতম্।
করৈরপীড়িতঞ্চাপি বহুপুষ্পফলং তথা ॥ ৩
অগম্যং পরচক্রানাং তদ্বাসগৃহমাপদি।
সমদুঃখসুখং রাজ্ঞঃ সততং প্রিয়মাস্থিতম্ ॥ ৪
সরীসৃপ বিহীনঞ্চ ব্যাঘ্রতস্কর বর্জ্জিতম্।
এবংবিধং যথালাভং রাজা বিষয় মাবসেৎ ॥ ৫
তত্রদুর্গং নৃপঃ কুর্য্যাৎ যন্নামেকতমং বুধঃ।
ধনুদুর্গং মহীদুর্গং নরদুর্গং তথৈবচ ॥ ৬
বার্ক্ষঞ্চৈবাম্বুদুর্গঞ্চ গিরিদুর্গঞ্চ পার্থিব।
সর্ব্বেষামেব দুর্গানাং গিরিদুর্গং প্রশস্যতে ॥ ৭
দুর্গঞ্চ পরিখোপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্।
শতঘ্নী যন্ত্রমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৮
গোপুরং সকপাটঞ্চ তত্রস্যাৎ সুমনোহরম্।
সপতাকং গজারূঢ়ো যেন রাজা বিশেৎ পুরম্ ॥ ৯

চতুরস্র তথাতত্রে কার্য্যাস্তায়ত বীথয়ঃ।
একস্মিংস্তত্র বীথ্যগ্রে দেববেশ্ম ভবেদ্ দৃঢ়ম॥
বীথ্যগ্রেচ দ্বিতীয়েচ রাজবেশ্ম বিধীয়তে।
ধর্ম্মাধিকরণং কার্য্যং বীথ্যগ্রেচ তৃতীয়কে॥ ১১
চতুর্থেত্বথ বীথ্যগ্রে গোপুরঞ্চ বিধীয়তে।
আয়তং চতুরস্রং বা বৃত্তং বা কারয়েৎ পুরম॥ ১২
মুক্তিহীনং ত্রিকোণঞ্চ যবমধ্যং তথৈবচ।
অর্দ্ধচন্দ্র প্রাকারঞ্চ বজ্রাকারঞ্চ কারয়েৎ॥ ১৩
অর্দ্ধচন্দ্রং প্রশংসন্তি নদীতীরেষু তদ্বসন্।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং প্রযত্নেন বিজানতা॥
তত্র তত্র যথাস্থানং রাজা বিজ্ঞায় সারথীন্।
দদ্যাদাবসথস্থানং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ॥
যোধানাং শিল্পিনাঞ্চৈব সর্ব্বেষামবিশেষতঃ॥
দদ্যাদাবসথান্ দুর্গে কালমন্ত্রবিদান্ শুভান্।
গোবৈদ্যানশ্ববৈদ্যাংশ্চ গজবৈদ্যাংস্তথৈবচ॥২৫
আহরেত ভৃশং রাজা দুর্গে হি প্রবলারুজঃ।
কুশীলবানাং বিপ্রাণাং দুর্গেস্থানং বিধীয়তে॥২৬
ন বহুনামতো বিনাকার্য্যং তথা ভবেৎ।
দুর্গেচ তত্র কর্ত্তব্যা নানাপ্রহরণা ন্বিতাং॥২৭
সহস্রঘাতিনো রাজংস্তৈস্তু রক্ষা বিধীয়তে।
দুর্গে দ্বারাণি গুপ্তানি কার্য্যাণ্যপিচভূভুজা॥২৮
সঞ্চয়শ্চাত্র সর্ব্বেষামায়ুধানাং প্রশস্যতে।
ধনুষাং ক্ষেপণীয়ানাং তোমরাণাঞ্চ পার্থিব।২৯
যন্ত্রায়ুধাট্টালচয়োপপন্নং সমগ্রধান্যৌষধসম্প্রযুক্তম্॥
বণিকজনৈশ্চাবৃতমাবসেত দুর্গং সুগুপ্তং নৃপতিঃ সদৈব॥"

মৎস্যপুরাণ, ২১৭অধ্যায়, বঙ্গবাসী মুদ্রিত।

"মধ্যদেশই রাজার বাসযোগ্য। যেখানে কাষ্ঠ ও ঘাসাদি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, সমস্ত রাজগণ যথায় বশীভূত, যেখানে শূদ্র জাতির বাহুল্য, যেখানে অল্প ব্রাহ্মণের বাস, যেখানে বহু কর্ম্মকারের নিবাস, যেখানে প্রজাগণ অনুরক্ত, যেখানে বহু পুষ্পফল বর্ত্তমান, যাহা পর-সৈন্যের অগম্য, যাহা রম্য, যাহা ব্যাঘ্র-সরীসৃপহীন, যাহা তস্করবর্জ্জিত, নদীমাতৃক এবং করভারে প্রপীড়িত নহে, তাদৃশসুখদুঃখসমন্বিত যথালব্ধ দেশে রাজা স্বকীয় সহায় সহিত বাস করিবেন। বুদ্ধিমান রাজা ঐরূপ দেশে ষড়বিধ দুর্গের যে কোনরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবেন। ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ বৃক্ষ-দুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গ এই ছয় দুর্গ মধ্যে গিরি দুর্গই প্রশস্ত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা, প্রাকার ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইবেন। চতুর্দ্দিকে শতঘ্নী ও অপরাপর যন্ত্র-সকল বহুলরূপে স্থাপন করাইবেন। পুরদ্বার অতিমনোহর কবাট দ্বারা সুশোভিত করিবেন। রাজা পতাকাযুক্ত হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দ্বার দিয়া পুর-প্রবেশ করিবেন। চারিটী আয়ত বীথি (পথ) প্রস্তুত করাইবেন। ঐ সকল বীথির প্রথমটীর অগ্রভাগে দেবগৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। দ্বিতীয় বীথির অগ্রভাগে রাজভবন, তৃতীয় বীথির অগ্রভাগে ধর্ম্মাধিকরণ এবং চতুর্থ বীথির অগ্রভাগে পুরদ্বার নির্ম্মাণ করাইবেন। রাজপুর আয়ত, চতুরস্র, বৃত্তাকার, মুক্তিহীন, ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অথবা বজ্রাকৃতি করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে নদীতীরস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পুরই প্রশস্ত। জ্ঞানবান্ রাজা নদীতীরে অন্যবিধ পুর নির্ম্মাণ করাইবেন না। রাজা সেই সেই স্থানে সারথিদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিবেন। যোদ্ধা, শিল্পী, কালজ্ঞ ও মন্ত্রীদিগের উত্তম বাসস্থান দিবেন। এতদ্ভিন্ন গোবৈদ্য অশ্ববৈদ্য, ও গজবৈদ্যও দুর্গমধ্যে রাখিবেন, কারণ দুর্গে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্গে ব্রাহ্মণ ও চারণগণের বাসস্থান থাকিবে। কার্য্য ব্যতীত দুর্গমধ্যে বহুলোকসমাগম অবিধেয়। সহস্রবীরঘাতী নানা প্রহরণধারী বীরগণ দুর্গরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। দুর্গের কয়েকটী গুপ্তদ্বারও থাকা আবশ্যক। দুর্গমধ্যে ধনু, বাণ, ক্ষেপণীয় ও তোমর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদিরই সংগ্রহ থাকা উচিত। নৃপতি সর্ব্বদা যন্ত্র-

আয়ুধ ও অট্টলচয়যুক্ত, ধান্য-ওষধি প্রভৃতি দ্রব্যপারপূর্ণ এবং বণিকজনে সমাবৃত পুরমধ্যে বাস করিবেন।”

এস্থলে সদুর্গ রাজধানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সৈন্যাবাস ও স্বতন্ত্র দোকানপাট বিশিষ্ট ফোর্টউইলিয়মসমন্বিত কলিকাতা রাজধানীর যথেষ্ট সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি বর্ণিত রাজধানীর ন্যায় কলিকাতাও নদীতীরবর্ত্তিনীই বটে।

আমরা পূর্ব্বে কেবল শাস্ত্রকারের পরিকল্পনারূপেহ নগরের বর্ণনা পাইয়াছি এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষীয় একটী বাস্তব প্রাচীন নগরীর বর্ণনা প্রদান করিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহা রামায়ণে আদিকবি বাল্মীকিকৃত ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন অযোধ্যানগরীর বর্ণনা।

“কোশলোনাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্ট সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ং॥ ৬
আয়তা দশচ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণিবিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯
কপাট-তোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতা মুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥ ১০
সূতমাগধ সম্বাধাং শ্রীমতীমতুল প্রভাম্।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥ ১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবণোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥ ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশ-নিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্॥
প্রাসাদৈরত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥ ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥” ১৮

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫ম সর্গ—বঙ্গবাসীর ছাপা।

“সরযূতীরে নিবিষ্ট প্রমোদান্বিত, প্রচুর ধনধান্যশালী, অতিবৃহৎ ও ক্রমশঃবর্দ্ধমান কোশলনামক দেশে সর্ব্বলোক বিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে; যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে সুশোভিতা, দ্বাদশ যোজনায়তা, ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয় শোভাবতী এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ থাকিত। যেরূপ দেবতা ইন্দ্র স্বর্গলোকের বসতি বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ মহারাষ্ট্রবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরী কবাট-তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত ক্ষুদ্রপথপরিশোভিতা, সমস্ত যন্ত্রসমন্বিতা; অতুল প্রভাবতী, সর্ব্বায়ুধবতী এবং অতি শ্রীমতী। তাহাতে সর্ব্বশিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত শত শতঘ্নী উদ্যান ও আম্রকানন ছিল। তাহার সর্ব্বত্রই সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ছিল। সেই নগরী জলদুর্গম পরিখা পরিব্যাপ্ত থাকা প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্য; বিশেষতঃ শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। সেই নগরীতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী, অনেক গো,

বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজা, নানা দেশাগত বণিকগণ, পর্ব্বততুল্য, অত্যুচ্চ, রত্ননির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগৃহ আছে সেইরূপ নারীগণের অনেক ক্রীড়াগৃহ ছিল। সুবর্ণ মণ্ডিতা, সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণা, সপ্ততলগৃহশোভিতা ও সমভূমি নিবেশিতা সেই অপূর্ব্ব নগরীতে অনেক সুন্দরী রমণী ছিল। গৃহ সকল নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল, তাহার কোন স্থানই বাসগৃহশূন্য ছিল না। সেই নগরী ধান্য ও তণ্ডুলপরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস তুল্য সুস্বাদু জলশালিনী। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল মুহুর্মুহু ধ্বনিত হওয়ায় সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।"

এস্থলে রাজপথ কুসুমাস্তীর্ণ হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। রাজপথে পুষ্প বিক্ষেপে যেমনই শোভা দ্বারা নয়নরঞ্জন হইত, গন্ধের দ্বারা নাসিকা পরিতৃপ্ত হইত, তেমনই দূষিত বায়ুও সংশোধিত হইত। ইহাতে পথ যে বিশেষরূপে সুখ-গম্য ও প্রীতিজনক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান উন্নত পাশ্চাত্য নাগরিক ব্যবস্থায় কিন্তু এই প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যে "Flowery path", "path strewn with flower", "পুষ্পময় পথ", "পুষ্পাবকীর্ণ পথ" প্রভৃতি যে আল-ঙ্কারিক কথা পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তি-মূলে যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্য প্রথার ন্যায় প্রথাই বিদ্যমান তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

দশরথের সরযূতটস্থিত অযোধ্যার পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলে ইহা বহুপথ-সুবিভক্ত নিত্যজলসেকার্দ্ররথ্যা, বহুদেশীয় বাণিজ্যসঙ্কুলা, উদ্যানউপবনপরিশোভিতা, সহস্র প্রহরীবাসিতা, দুর্ভেদ্যদুর্গ-কুলার্ণা, নাট্যশালা প্রমোদশালাযোগে আনন্দময়ী, রাজা মহারাজগণের প্রাসাদশ্রেণীর দ্বারা ঐশ্বর্য্যময়ী, বহুজনসমাকুলা, নিবিড় বসতি, গঙ্গাতটবর্ত্তিনী ব্রিটীশ ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কেবল তাহাই নহে পৃথিবীর বর্ত্তমান যে কোন মহানগরীর বিচিত্র চিত্রের পার্শ্বেই রামায়ণাঙ্কিত অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী প্রাচীন অযোধ্যার চিত্র স্থাপিত হউক্ না কেন তাহা যে বিশেষ ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সন্ধ্যা

পশ্চিমদিগন্তকোলে ম্লান আলোরেখা
নিঃশেষে মিলায়ে গেল; নাহি যায় দেখা
সুদূর মাঠের পারে তরুবীথি আর,—
আকাশ ধরণী সবি লুপ্ত একাকার।
ধীরে ধীরে ঘিরে আসে নীরব নিবিড়
গোপন চরণ-পাতে সন্ধ্যার তিমির
পসারিয়া হিম-বাহু, তারি স্নেহ-চুমে
চপলা ধরণী পড়ে এলাইয়া ঘুমে।

আমার এ ক্ষুদ্র বুকে পরশ তোমার
বুলাইয়া দাও ধীরে,—অন্তর আমার
তোমার তিমির সম পূর্ণ অচপল
নীরবে ঘনায়ে হোক্ সার্থক সফল।
বিছাইয়া দাও তব স্নেহাঞ্চলখানি,
তৃপ্ত কর, স্নিগ্ধ কর, বুকে লয়ে টানি।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

হিন্দু সমাজনীতির বৈষয়িক ভিত্তি*

প্রয়াগের ‘পাণিণি আপিস’ হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ‘অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির’ কীর্ত্তিমান সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসুর অধ্যক্ষতায় এই কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রকাশিত করিয়া এলাহাবাদের পাণিণি কার্য্যালয় দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই। তাহার এক মনোজ্ঞ বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ‘গৃহস্থ’ পত্রিকায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা পাণিণি কার্য্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অক্লিষ্টকর্ম্মা স্বদেশপ্রাণ বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ইতিপূর্ব্বে শুক্রনীতি ইংরেজী ভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। তাহা পাণিণি কার্য্যালয়ের হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাবলী-ভুক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শুক্রনীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিলে হিন্দুদিগের বৈষয়িক জ্ঞান যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাই বিস্তৃত ভাবে সন্নিবদ্ধ করিয়া বিনয়বাবু সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকার নাম রাখিয়াছেন হিন্দু সমাজনীতির বৈষয়িক ভিত্তি (The Positive back ground of Hindu sociology) কিন্তু এই গ্রন্থ উক্ত ভূমিকার প্রথম ভাগ মাত্র। শীঘ্রই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থও পাণিণি কার্য্যালয়ের হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাবলী-ভুক্ত করা হইয়াছে।

শুক্রনীতি পাঠে হিন্দুদিগের নরতত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এই প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুদিগের শিল্প, ধর্ম্মনীতি ও আচার ব্যবহার, শিল্পপ্রণালী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব নীতি, ব্যবস্থা-বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা (International law) বিষয়ক জ্ঞানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

প্রাচীন হিন্দুগণ দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বৈষয়িক জ্ঞানে তাঁহারা নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন ইহাই আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এই ধারণা অমূলক। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এপর্য্যন্ত যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও এই ধারণার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, যশোধর্ম্মদেব হর্ষবর্দ্ধন, রাজেন্দ্র চোল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি নরপতিগণ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বৈষয়িক জ্ঞান হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইলে তাঁহারা এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন বা তাহা শাসন করিতে সমর্থ হইতেন না। এতদ্ভিন্ন, এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড যাঁহাদিগের শাসনাধীনে ছিল রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাঁহারা কোনরূপ সুচিন্তিত মতবাদ বা থিওরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই এরূপ হইতে পারে না। শুক্রনীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যুক্তি-

* The Positive Back ground of Hindu sociology. By Professor Benoy Kumar Sarkar, M. A. Published by Sudhindra Nath Vasu, at the Panini office, Bahadurganj, Allahabad.

কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থরাজি সেই চেষ্টারই ফল। এই সমস্ত গ্রন্থ হিন্দুদিগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ বৈষয়িক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে।

হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কেও আমরা ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছি। হিন্দুরা কখনও বিজ্ঞানালোচনায় পারদর্শী ছিল এ কথা বলিলে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু জাপানের খ্যাতনামা শিল্পী ও লেখক শ্রীযুক্ত কাকাসু ওকাকুরা (Kakasu Okakura) এসম্বন্ধে Ideals of the East (প্রাচ্য আদর্শ) নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি —

India has carried and scattered the data of intellectual progress for the whole world, ever since the pre-Buddhistic period when she produced the Sankkya philosophy and the Atomic theory ; the 5th century, when her mathematics and astronomy find their blossom in Aryabhatta; the 7th, when Brahmagupta uses his highly developed Algebra and make astronomical observations ; the 12th, brilliant with the glory of Bhaskaracharya and his famous daughter, down to the 19th and 20th centuries themselves with Ramchandra (?) the mathematician and Jagadishchandra, the physicist.

(Ideals of the East)

তাৎপর্য্য—বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই সমগ্র জগতের উপকারার্থ ভারতবর্ষ মানসিক উন্নতির মূল সূত্রগুলি ধারাবাহিকরূপে অনুসরণ ও প্রচার করিয়াছে। ঐ সময়েই ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শন ও পরমাণুতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের প্রতিভা পাটীগণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিকশিত হইয়াছিল; সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত স্বীয় উন্নত বীজগণিতের ব্যবহার ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন; দ্বাদশ শতাব্দী ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার কন্যার গৌরবে আলোকিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও গণিতশাস্ত্রবিদ রামচন্দ্র (?) ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্ জগদীশচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছেন।”

হিন্দুদিগের বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কারণ এই যে, ভারতের কাব্য, দর্শন ও পুরাণ প্রভৃতি সাধারণ্যে যতদূর প্রচারিত হইয়াছে, শুক্রনীতি বা লীলাবতীজাতীয় গ্রন্থ ততদূর হয় নাই। ইহার আরও এক কারণ আছে, গ্রন্থকার মুখবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত লোকে সাধারণতঃ পাশ্চাত্যদিগের উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তুলনা করিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত অন্যায়; কারণ ইউরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরমোন্নতি বিগত ১০০ শত বৎসর মধ্যেই হইয়াছে। সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, এই ১০০ শত বর্ষে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বাদ দিলে হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিকট ইউরোপীয় দিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর আসন লাভ করিতে পারে না। *

* The astronomy and mathematics (of the Hindus) were not less advanced than those of Tycho Brahe, Cardan, and Fermat, the anatomy was equal to that of Vesalius, the Hindu logic and methodology were more advanced than those of Ramus and equal on the whole to Bacon's ; the physico-chemical theories as to combustion, heat, chemical affinity, clearer and more rational and more original than those of Von Helmont or Stahl, and the grammar whether of Sanskrit or Prakrit, the most scientific and comprehensive in the world before Bopp, Risk and Grimm. Introduction pp. xvii

বৈষয়িক জ্ঞান ও পরমার্থিক জ্ঞান কতকটা পরস্পর-বিরোধী সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই হিন্দু-সভ্যতার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। সুতরাং হিন্দুসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে কেবল হিন্দুদিগের পরমার্থিক জ্ঞানের আলোচনাই যথেষ্ট নহে, বৈষয়িক জ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিনয় বাবু সে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।

শুক্রনীতির কথাই এই গ্রন্থের প্রধান কথা হইলেও গ্রন্থকার কেবল শুক্রনীতির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। শুক্রনীতিতে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে যতদূর আলোচনা ও অনুশীলন হইয়াছে গ্রন্থকার তাহা উল্লেখ করিয়া তুলনার সমালোচনা করিয়াছেন—যেমন, শুক্রনীতিতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর প্রকৃতি ও ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক সাহিত্য পর্য্যন্ত সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করতঃ হিন্দুদিগের ধাতুজ্ঞানের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্তৃক এবিষয় কিরূপ আলোচনা হইয়াছে তাহারও বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শুক্রনীতির উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনায়ও ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকারকে যে কতদূর গবেষণা করিতে হইয়াছে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ এই পুস্তকখানিকে একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব।

গ্রন্থকারের বিচার-প্রণালীও আমাদের নিকট সুসঙ্গত বোধ হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। কোন বিষয়ের অনুল্লেখ দৃষ্ট হইলেই তাহার অনস্তিত্ব কল্পনা করা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালীর অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ কোন বিষয়ের বর্ত্তমান সময়ে অভাব দৃষ্ট হইলেও সিদ্ধান্ত করা হয় যে প্রাচীন কালে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ছিল। বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগের কোন অট্টালিকা এখন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান নাই। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, অশোকের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না। এ যুক্তি যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা অনাবশ্যক। তর্ক শাস্ত্রে ইহাকে argumentum ad silentio বলা হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ংই এই প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু তথাপি কোন কোন বিষয়ে তিনিই আবার এই প্রথা অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থের পরিশিষ্টও অতিশয় মূল্যবান। উহাতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত উহার তুলনার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহাদের গভীর অধিকার নাই তাহাদের দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আছে। তাঁহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ হইলেও তিনি এক প্রয়োজনীয় বিষয়ের মুখবন্ধ করিয়াছেন। বিনয় বাবু উহা গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থখানাকে অধিকতর মূল্যবান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা আছে, স্থানাভাবে তাহার আলোচনা করা গেল না। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।

গ্রন্থসমালোচনা

মল্লিকা। শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত। মূল্য ।॰ আনা।

প্রকাশক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, এলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও পরিচ্ছদ উত্তম।

এখানি কবিতা গ্রন্থ। লেখিকা হিন্দু ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনী। তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন "মাতৃস্তন্যের সহিত যে ভাষার পরিচয়, সে ভাষার সেবা করা, সে ভাষাকে ভালবাসা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস, এই 'মল্লিকা' তাহারই অতি অক্ষম নিদর্শন।" লেখিকা আরও বলিয়াছেন যে তিনি কবিযশঃপ্রার্থিনী হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। লেখিকার বিনয় প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহার কবিতা রচনাকে কোন ক্রমেই অক্ষমতার নিদর্শন বলা যাইতে পারে না। এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা আছে যাহা কেবল ছন্দোবদ্ধ কথার সমষ্টি মাত্র নহে। বিশেষতঃ কয়েকটি শোকের কবিতার ভাবের আন্তরিকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইবে।

পুষ্পমঞ্জরী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

এখানি গল্পের বই। ১১ এগারটি গল্প সুদৃশ্য মলাটে সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রিয়জনকে উপহার দিবার অনুপযুক্ত নহে।

গ্রন্থকার রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যের পাঠকের অপরিচিত নহেন। রবীন্দ্র বাবুর লেখাতে যে একটি অপূর্ব্ব মিষ্টত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গল্পোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর স্থান-কাল বর্ত্তমান বঙ্গদেশ হইতে দূরবর্ত্তী হওয়াতে উল্লিখিত অপূর্ব্বত্বের রমণীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের সাহিত্য-কৃতত্ব বর্দ্ধিত হইবার আশা আছে বলিয়া আমরা তাঁহার একটি বিষম ত্রুটির কথা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। রবীন্দ্রবাবুর ভাষা স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিলেও সকল স্থানে নির্দ্দোষ নহে। রবীন্দ্রবাবু একেবারে নূতন লেখক নহেন। অতএব তাঁহার ভাষাপ্রয়োগে আকৃতিগত ও আলঙ্কারিক দোষ থাকা আশ্চর্য্য ও পরিতাপ উভয়েরই বিষয়। আশাকরি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন ও এই পুস্তকখানির একটি দোষমুক্ত সংস্করণ করিবেন। ব্যাকরণগত ও আলঙ্কারিক দোষ থাকিলেই যে তাহা সুশ্রাব্য ও ভাবপ্রকাশক হইয়া উঠিবে তাহা নহে। বরং সুমধুর ভাবটি দূষিত ভাষায় প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে রসবোধের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আমরা রবীন্দ্রবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই এত কথা বলিলাম।

সমালোচক

মনে ভাবি গোর্ক নাথে তানে পাঠাইল।
বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাই (১) পাঠাইল॥
তখনে পানাই গাঁয়া ধরিলেক বলে।
আমাএ আসনে তারে ধরিয়া আচলে॥
তাহারে দেখিয়া তবে বলিলেক রোষে।
এমত আসনে যায় কেমত সাহসে॥
গোর্কের বচনে যোগী বহুল কেটাই। (২)
আমার বচন শোন নাকর বড়াই॥
বনমধ্যে তুমি শুতি যে গোর্কাই।
এথাতে রৈয়াছ তোমার গুরু কোন ঠাই॥
বড়াই না ছাড় গোর্ক জিয়ানর কোন ফলে। (৩)
তোমার গুরু পাড়িয়াছে কদলার ভোলে॥
মোর গুরু চাহিতে বেড়ায় ত্রিভুবনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলাম কদলার স্থানে॥
দেখিলাম * * * * নাহি।
* * * * * *
দশন গলিত হৈল পাকা মাথার কেশ।
কামিনার কোলে তার জীবন কৈল শেষ॥
বয়স হৈল তার দিন নাহি আর।
শরীরেত রস নাহি অস্থিচর্ম্ম সার॥
তাহারে দেখিয়া গেল যমের ভোবন।
তথাতে দেখিল (৪) আমি তাহার লিখন॥
তিন দিন বাকী আছে আয়ু হৈল শেষ।
তাহাকে আনিতে যমে করিছে আদেশ॥
যদি বা না চায় গোর্ক কলঙ্কের ডর।
ধরিতে তবে ত গিয়া গুরু রক্ষা কর॥

(১) জুতা; উপানৎ হইতে আসিয়াছে।

(২) কেটকেটাইয়া, বকিয়া।

(৩) বাঁচিয়া থাকার ফল কি?

(৪) উত্তম পুরুষে "দেখিল" "গেল" ইত্যাদি প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ব কথা কহি আমি শুনরে গোর্কাই।
হেন গুরু রক্ষা পায় ঠাকুর মিনাই॥
কানাইর বচনে গোর্কে আ (শ্বাস) বিশেষ।
তোমার গুরুর আম হইতে শুনহ উদ্দেশ॥
বন্দা হৈছে তোমার গুরু মেহারকুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে॥
মেহার কুলেত আছে পড়হি ডাকনি।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘারনী॥
বিধবা রমণী সে যে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা এ সঙ্কে তার ঘর॥
তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল। (৫)
মাটির করিয়া গড় তাহাকে থুইল॥
হস্তি সব বান্ধি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঙ্কে সিদ্ধা তাহার ভিতর॥
দুই শিষ্যে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।
দুইর হইল তবে তেন মত ভেস॥
কোলাকুলি করি তারা একত্রে বসিল।
যার যেই গুরুর যে উদ্দেশে চলিল॥
কালফা চলিয়া গেল মেহার কুলেত।
তত্ক্ষণে গোর্কনাথ চলে কদলিত॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাইল যতি যে গোর্কাই।
যমপুরে গিয়া যে গুরুর লেখা চাই॥
সিদ্ধের খাতা সিদ্ধের ঝুলি তুলিয়া দিল গাএ।
হাতে লাঠি লইল পানাহি দিল পাএ॥
এহি মতে চলিয়া গেল যমের আলএ।
সভা করি বসিয়াছে যম মহাশএ॥
গোর্কেরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।
হাত ধরি বৈসাইল আপনা আসনে॥

(৫) হাড়িফার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীচাঁদ তাহাকে মাটির নীচে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল এই বিবরণ ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে নাই, কিন্তু দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত শুকুর মহম্মদের ময়নামতির পুথিতে আছে।

যমরাজে বলে শোন গোর্ক্ষনাথ যতি।
কি কারণে আগমন এথা মহামতি॥
গোর্ক্ষনাথে বোলে শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
আমার বচন শুন ধর্ম্ম অনুসারি॥
অনাদি নিধন জান মিন মহাশএ।
শুক্রুশাপে কদলিতে পড়িছে নিশ্চএ॥
ভুলিয়া রহিল মিন কদলীর নগরী।
তাহারে তসপ কেনে মৃত্যু অধিকারি॥
যদি তুমি আনিতে চাও আপনা ভবন।
চল তুমি আমি যাই ব্রহ্মার সদন॥
বিষয়ের কালে কেহ না চিনে আপনা।
মনেত ভাবিয়া চাহ তুমি কোন জনা॥
আমার যতেক শল জানহ যখন।
পৃথিবী সহিতে তোরে করিমু গ্রহণ॥
কেবা তোরে দিল বিষয় কহ মোর ঠাই।
কহ কহ করি গোর্ক্ষে উঠিল কেটাই॥
সাক্ষী হৈয় চন্দ্র সূর্য্য তোমরা ত্রিভুবন।
ক্রোধ হইয়া কামবান টানে মহাজন॥
হুঙ্কার করিয়া গোর্ক্ষে কামে (১) কৈল মন।
টলমল কৈল যত যমের ভবন॥
ক্রোধ দেখি গোর্ক্ষনাথের যম কাঁপে ডরে।
যতেক কাগজ আনি দিলেন্ত গোচরে॥
একে একে যত পড়ি চাহে বিচারিয়া।
আপনা শুক্রুর লেখা চাহে মন দিয়া॥
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
মুছিল কাগজ চাহিয়া শুক্রুর লিখন॥
লেখা মুছিয়া গোর্ক্ষনাথ আসিল উঠিয়া।
বকুল বৃক্ষের তলে বসিল আসিয়া॥
যতি নাথে বলে নন্দ মেনন্দ মোর ভাই।
ভাগ্য ফলে রক্ষা পাইল ঠাকুর মিনাই॥

ভাগ্যে আসি কালফাএ মোরে দিল খোটা।
ইঙ্গিতে বান্দিল আমি যমরাজার বাটা॥
শুক্রুর নামে কাটা দিয়া আইলাম যমরাজ পুরী।
এজনমে শমনের ভয় রাখিলাম সম্বার॥
কায়া শুধি খাইলেক ষোলশ কদলি।
যত রস আছিলেক সব নিল হরি॥
সাত পাঁচ ভাবি নাথ মনে কৈল সার।
নিশ্চয় করিমু মুই শুক্রুর উদ্ধার॥
নিজরূপ ধরি যদি কদলিতে জাই।
ভোলেতে পড়িছে শুক্রু দৈবে দেখা পাই॥
গোর্ক্ষনাথে বোলে নন্দ মোহানন্দ ভাই।
আমিত ব্রাহ্মণরূপে শুক্রুরে বুঝাই॥
নন্দ মহানন্দে যদি প্রভুর আজ্ঞা পাই।
আজ্ঞা অনুরূপে কর্ম্ম করিবারে চাই॥
নাথ বোলে ঝাটে যায় বিশ্বকর্ম্মার ঠাই।
আমার সংবাদ তানে কহিবা বুঝাই॥
তাহান স্থানে সংবাদ কহিবা ভালে ভাল।
রত্নময় করি দেউক দুই জোড় তাল॥
কাবা নাম মাদল দেউক বাচিএ জে ছানি।
সুস্বর সুন্দর যেন জগতে বাখানি॥
তার ঠাই মোর যে আছে কএক কথা।
সোবর্ণের গুণ গঠিয়া দেউক যে পেতা॥
সোবর্ণের লাড় দেওক সুবর্ণের ছাতি।
সুবর্ণের গাড়ু দেউক সুবর্ণের জুতি॥
ততক্ষণে বন্দিলেক শুক্রুর চরণ।
প্রভুর আদেশে নন্দ করিল গমন॥
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে নন্দ দিল দরশন।
কহিল নাথের যত সম্বাধ (২) বচন॥
কদলির ভোলে মিন ডুবিয়া রহিল।
তানে উদ্ধারিতে নাথে আপনি চলিল॥

(১) কাম এখানে ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) সংবাদ।

যোগীরূপে যাইতে নারে কদলির দেশ।
দ্বিজরূপে যথা তথা করিব প্রবেশ॥
ব্রাহ্মণের সর্জ্জদিতে করিছে আদেশ।
পথ নিরক্ষিয়া নাথে বসিছে বিশেষ॥
বিশ্বকর্ম্মাএ যাদ পাইল নাথের সংবাদ।
সুবর্ণের সর্জ্জ দিল করিয়া প্রসাদ॥
ভাণ্ড ভরিয়া সর্জ্জ লাইলেক নন্দ।
দেখিয়া সুবর্ণ সর্জ্জ হইলেক রঙ্গ॥
গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা।
মাথেতে আলগা ছাতি নন্দে লইল লোটা॥
আগে পাছে দুই শিষ্য নন্দ মহানন্দ।
হাতে তুলি লইল নাথে সুবর্ণের ভাণ্ড॥
ব্রাহ্মণ হইয়া নাথে কদলিতে যায়।
এক দৃষ্টে কদলির সভাএ রঙ্গ চায়॥
নমস্কার কৈল বোলে হও দীর্ঘজিবী।
সভা আশীর্ব্বাদ কৈল প্রভু থাক সেবি॥ (১)
যতিনাথে বলে নন্দ উঠ ফির যাই।
এহিমতে নাপারিমু আনিতে গোঁসাই॥
দ্বিজরূপে দেখি সবে করে নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ না করিলে লোকে কৈব খাড়॥
পিতার বচন বৃথা না হয় কদাচন।
আশীর্ব্বাদ দীর্ঘজিবী হৈব সর্ব্বজন॥
বলিয়া জতিনাথে আসিল উঠিয়া।
পুনরপি হৈমু জুগি কণ্ঠে কুণ্ডল দিয়া॥
নাথে বোলে শুন কহি মহানন্দ ভাই।
যোগীরূপে আসিবাম গুরুরে বুঝাই॥
ই বলিয়া জতিনাথে আসন তুলিল।
বুঝাইতে মিননাথ গোর্ক্ষে চলিল।
আসন তুলিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাছান (২) উড়য়ে যেন আকাশ উপর॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাথ যায় ধীরে ধীরে।
যেন দেখে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত ফিরে॥ (৩)
চাহিতে চাহিতে দেশ কদলিতে যায়ে।
গগনে থাকিয়া যত দেবগণে চাহে॥
বায়ুভরে যায় যোগী বিদ্যুতের গতি।
ঘরে ঘরে পতাকা দেখয়ে পাতি পাতি॥ (৪)
হেটমুখে চাহে নাথ সৈন্যে কবি ভর।
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির ঘর॥
একে একে গোর্ক্ষ নাথ সর্ব্বরাজ্য চাহে।
স্থানে স্থানে অগরু চন্দন গন্ধ পাএ॥
নাথে বলে এই রাজ্য অতি বড় ভালা।
চারি কড়া বিকি যায় চন্দনের তোলা॥
সকলের গাএ দেখি পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘরে ঘরে দেখ সোণার কুমোর॥
কাহার পুষ্করির জল কেহ নাহি খাএ।
হিরামন মাণিক্য দেখি রৌদ্রেত শুকাএ॥ (৫)
এক রাউলের (৬) ঘরে দেখে দুই তিন নারী।
যোড়শ রমণী লৈয়া মিনে করে কেলি॥
সুবর্ণের গৃহ সব বিচিত্র নগর।
সকল নগরে দেখে বড় বড় ঘর॥
কাঞ্চনে রচিত ঘর রত্নশোভা করে।
সুরম্য পতকা তাথে প্রাচীর উপরে॥
রাজ্যের ভিতরে নাথে দেখে নানারঙ্গ।
মিননাথ রহিয়াছে যুবতীর সংগ॥
ধর্ম্ম রাজ্য গুরুদেব করিল বাখাখানি।
সোনার কলস ভরি লোকে খায় পানি॥

(১) প্রভুর সেবাতে অবস্থান কর।
(২) বোধ হয় একরকম পাখী। (চিল?)
(৩) চন্দ্রসূর্য্য যেমন করিয়া পৃথিবীকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে সেই রকমে।
(৪) সারি সারি।
(৫) ভবানীদাসের ময়নামতীর পুথিতে এই দুই লাইন প্রায় অবিকল ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।
(৬) গৃহস্থ (?) বাউলের বিপরীত।

সর্ব্বরাজ্য দেখে নাথে এক সমসর। (১)
শুক দিছে সরোবর দেখয়ে সত্বর॥
উত্তম যে সরোবর নির্ম্মল যে জল।
হংস চক্রবাক শোভে পদ্ম যে উৎপল॥
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল।
বকুলের তলেদেখে নির্ম্মল আছে স্থল॥
আসন মেলাইয়া বসে বকুলের তলে।
আসন নামাইয়া নাথে হরি হরি বোলে॥
কেমতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ।
সর্ব্ব * * * * * করিল স্মরণ॥
কার ঠাই পুছিমু যে বুলিবাম সার।
কেমতে জানিব মুই রাজ্যের ব্যবহার॥
সাতপাঁচ ভাবি মনে দেখে গোর্ক্ষে চাহি।
কাখে কুম্ভ যাইল এক কদলির মাই॥
তরুতলে বসিয়াছে গোর্ক্ষ মহামুনি।
আচম্বিত মিলিল আসি নগরের জুগিনি॥
জলে ভরি উটে নামে সরোবর কুলে।
নাথে যোগিনীরে দেখে জল ভরি চালে॥
দেখিয়া নাথের রূপ নারী গেল ভোলে।
হানিল মদনরূপ শরীরের দলে॥
চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আসিল।
আপনার যতগুণ কহিতে লাগিল॥
কটিদেশে হাতদিয়া বান্না কহে ছলে।
পয়োধরে বস্ত্রনাহি রত্নহার খোলে॥
কোন দেশে থাক যোগী কোন দেশে ঘর।
কি কারণে আসিয়াছ কদলি নগর॥
আমার রাজ্যের রাজা ঈশ্বর মিনাহ।
সে অবধি নাহি দেখি প্রদেশী (২) যোগাই॥
প্রদেশী যোগীরে পাইলে চরে নেয় ধরি।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া ফালাএন্ত মারি॥

লৈক্ষে লৈক্ষে যোগী সব ফেলিয়াছে মারি।
মরার দুর্গন্ধে পন্থে চলিতে না পারি॥
যত যোগী মরিতেছে আসিয়া কদলী।
মাংস খাইয়া মহাপুষ্ট দুর্ব্বল শ্রীকালি॥
অনেক মরিল যোগী কদলিতে আসি।
আজি কালি মধ্যে তোরে মারে হেন বাসি॥
যত যোগী কদলিতে দিয়া আছে সাল।
রাত্রি দিনে খায় মাংস শুকুন শ্রীকাল॥
মঙ্গলা কমলা আর দুই পাটেশ্বরী।
তাহারে যে সেবা করে ষোলশত নারী॥
বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল।
যুবা যোগী পাইলে তুলিয়া দেয় সাল॥
অধ্যবসের (৩) যোগী পাইলে কমরে তুল কাটে।
পোলা যোগী পাইলে পাটাতে তুল বাটে॥
সুন্দর দেখিয়া তোমা পোড়ে মোর মন।
তে কারণে কহিল আমি ইসব বচন॥
ধন্য ধন্য যোগী তুমি ধন্য মায় বাপ।
কমল শরীর তোর দেখে লাগে তাপ॥
তত্ত্ব না জানিয়া যোগী এথাতে আইলা।
এ দেশে আসিয়া তুমি বিপাকে পড়িলা॥

নাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ॥

দেখিয়া নাথের রঙ্গ: যোগিনী হইল সঙ্গ:
শুন শুন প্রদেশি যোগাই॥
যত কিছু আমি কই: সত্য হেন জানিবা সেই:
আমার বাড়ীতে চল যাহি॥
তোমার সাহস বড়: মনেত নাহিক ডর:
না জান দেশের ব্যবহার॥

---

(১) সংসার।
(২) বিদেশী।
(৩) অর্দ্ধ বয়সের।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ পৌষ ১৩২১ ৯ম সংখ্যা

আহোম-আকবর রুদ্রসিংহ

বঙ্গের লোকসাধারণ এখন আসামের কথা কিছু কিছু জানিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আসাম বলিলেই 'চা-বাগান', 'কালাজ্বর' ইত্যাদির কথাই তাহাদের মনে উদিত হইত। সম্প্রতি আসামের অনেক কথা বাঙ্গালায় আলোচিত হওয়াতে অজ্ঞতা কিছুটা কমিয়াছে। ইংরাজের অধিকারের পূর্ব্বে এই আসাম যে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল, এবং বহু পূর্ব্বেও যে ইহা গৌরবমণ্ডিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের একটা বিশিষ্ট অংশ ছিল, এই কথা এখন শিক্ষিত লোক মাত্রেই অবগত আছেন। তথাপি আহোমগণের পরিচয় এস্থলে সংক্ষেপে দুই চারটি কথায় বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদের কাছ হইতে আসামের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই আহোম জাতীয় ছিলেন। ইঁহাদেরই নাম অনুসারে এই প্রদেশের নাম 'আসাম' হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আহোমগণ ব্রহ্মদেশ হইতে গিরিমালা ও অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্বাংশ অধিকার করেন, এবং ক্রমশঃ চুটিয়া ও কাছাড়ী-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র উপত্যকার অধিকাংশ আপনাদের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইঁহারা মূলতঃ মগ্‌দের সগন্ধ অনার্য্য হইলেও এই উপত্যকায় আসিয়া হিন্দু সভ্যতালোকিত কাছাড়ী, কোচ প্রভৃতির সংস্রবে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যাচার গ্রহণ পূর্ব্বক দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

প্রবল পরাক্রমের সহিত আহোমরাজগণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাপরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যখন আহোমদের সংঘর্ষ ঘটিল, তখন তাঁহারা মোসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক নিজ রাজ্য আক্রমণে প্রবল বাধা দিতে সমর্থ হইলেন, এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যুদ্ধ করিয়া গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার পূর্ব্বক মোহম্মদীয় অনীকিনীর সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতির ব্যাঘাত-প্রাকার রূপে সগৌরবে বিরাজমান হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর এই গৌরবমণ্ডিত শেষ পাদের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ঐ সময়ের সকল কথার এস্থলে আলোচনা করাও সঙ্গত হইবে

[illegible] বিশেষতঃ আহোম-রাজকুল-ললামভূতা সতী [illegible] করুণ রসসিক্ত পবিত্র কাহিনী এখন [illegible] বাঙ্গালা 'পুস্তক' ও 'পত্রিকা'-পাঠক বর্গের [illegible] অবিদিত নাই,—তাহাও এই সময়েরই একটি ঘটনা; [illegible] তাৎকালিক ইতিহাসের বহু কথা সম্প্রতি [illegible] সাহিত্য সেবীর অনেকটা পরিচিত হইয়া পড়ি-[illegible]। আহোম-আকবর রুদ্রসিংহ সতী-শিরোমণি [illegible] [illegible]তীরই গর্ভসম্ভূত।

[illegible] আমরা এই আহোমবংশ-ভাস্কর রুদ্রসিংহকে মোগল কুলরবি আকবরের সঙ্গে তুলিত করিতেছি।

আকবরের পিতা হুমায়ুনকে যেমন পৈতৃক সিংহা-[illegible] হইতে আততায়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দুর্গম [illegible] কান্তারে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, সেই-[illegible] রুদ্রসিংহের জনক গদাধরসিংহও পিতৃরাজ্য [illegible] বঞ্চিত হইয়া অরণ্যগিরিসংকুল অসভ্য জাতি [illegible] অধ্যুষিত ভূ-ভাগে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। উভয়েরই শৈশবাবস্থা দুঃখ কষ্টে নানা [illegible] মধ্যে যাপন করিতে হইয়াছিল—ইহাতেই [illegible]কেই লেখাপড়ার শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। উভয়েরই রাজত্বকালে স্ব স্ব বংশের [illegible] চরম পরিণতি ঘটিয়াছিল। আকবরের [illegible] পরেই যেমন মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির [illegible] হইয়াছিল, রুদ্রসিংহের পরেও তেমনি কিছু [illegible] মধ্যেই আহোম বংশের অধঃপাতের সূচনা [illegible]। *

মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। যে সকল ব্যক্তি মহত্ত্বের রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, সূচনায়ই তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। আহোম-রাজগণের প্রথা ছিল, সর্ব্বপ্রথম সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় স্বহস্তে একটি নরদেহ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া নব ভূপতি স্বীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভের পরিচয় প্রদান করিতেন। রুদ্রসিংহ মানুষের পরিবর্ত্তে একটি মহিষ কাটিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া একটা অতীব নৃশংস প্রথার মূলোচ্ছেদ করেন। অথচ বলবত্তার [illegible]বে মহিষ কাটা মানুষ কাটা অপেক্ষা অধিকতর [illegible]রুষব্যঞ্জক। আকবর যেমন বিশাল ও মনোহর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় পিতা হুমায়ুনের [illegible]তি অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন মহারাজ রুদ্রসিংহও তেমনি পিতা গদাধর সিংহের সমাধিস্থলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দৈনিক [illegible]তার প্রিয় খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পূজা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননী জয়মতী যে স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানে "জয় সাগর" নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়া তাহার তীরে 'জয় দোল' নামক বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। 'জয়সাগরের' ন্যায় বিশাল সরোবর আসামে আর নাই। ইহার পরিমাণ ফল ১৩২ একর হইবে।

আকবর যেমন নানারূপ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী ভূষিত করিয়াছিলেন, রুদ্রসিংহও স্বীয় রাজধানী রংপুর * বিবিধ ইষ্টকালয় দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভাল রাজমিস্ত্রী না থাকাতে তিনি কোচবিহার [illegible] ঘনশ্যাম নামক জনৈক বাঙ্গালী মিস্ত্রীকে আনাইয়া [illegible]

* এস্থলে রুদ্রসিংহ ও আকবরের অব্যবহিত পর-[illegible] সম্বন্ধেও একটা সাদৃশ্যের কথা উল্লেখযোগ্য। [illegible] বাদশাহ যেমন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ক্রীড়নক [illegible] হইয়া পড়িয়াছিলেন, রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ [illegible] রাণী ফুলেশ্বরীর উপর রাজকার্য্য পরিচালনের [illegible] করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। [illegible] হইতে [illegible] যে অবস্থা [illegible] ঘটিয়াছিল।

* ইহা বর্ত্তমান রংপুর নহে, [illegible] শিবসাগর ছিল। [illegible]

[illegible] নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঘনশ্যাম রুদ্রসিংহের প্রদত্ত বহু অর্থ সমভিব্যাহারে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় দেখা গেল যে, উহার নিকটে রাজার আবাসগৃহ প্রভৃতির নক্শা রহিয়াছে। ইহাতে ঘনশ্যামকে বঙ্গের মুসলমান নৃপতির চর মনে করিয়া উহার প্রাণদণ্ড বিহিত হইয়াছিল। *

আকবর শাহ যেমন নানা জাতি ও জনপদে মোগলবাহিনী প্রেরণ পুরঃসর আপন আধিপত্য বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, মহারাজ রুদ্রসিংহও কাছাড় ও জয়ন্তীয়াদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আহোমদের বিজয়নাম শ্রীহট্ট প্রদেশের সুরমা নদীর তীর পর্য্যন্ত সুপরিচিত করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশের চতুঃপার্শ্বে বহু পার্ব্বত্য জাতির অধিবাস। রুদ্রসিংহ সমস্ত জাতিকেই অধীন বশে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামের পার্ব্বত্য জাতিবৃন্দ এরূপ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, আজ ব্রিটিশ শাসনেও এতদপেক্ষা অধিকতর শান্তি আসামে হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মোসলমানদের বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—আজিও উদয়াদিত্য, জয়ধ্বজ প্রভৃতি আহোম রাজগণের যবনবিজয়সূচক প্রশংসা-বাক্য নানাস্থানে প্রাপ্ত কামানের গাত্রে খোদিত লিপিতে পাওয়া যাইতেছে। রুদ্রসিংহেরও প্রবল বাসনা ছিল যে, মোসলমান রাজগণের সহিত এক বার স্বীয় বাহুবলের পরীক্ষা করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ মোসলমানের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়া বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাঁহার অভিলাষ ছিল স্বয়ং মোগল রাজ্য আক্রমণ করিয়া আহোম রাজ্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। তখন বিপুল আয়োজনও হইয়াছিল এবং [illegible] নিমিত্ত তিনি রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌহাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার [illegible] লীলা অকস্মাৎ অবসিত হওয়াতে তদীয় সংকল্প [illegible] পরিণত হইতে পারে নাই।

আকবরের ন্যায় রুদ্রসিংহও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি আপন রাজ্যের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য বহু ছাত্রকে বঙ্গ, বিহার, বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে প্রেরণ পূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া আনাইয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যেও বহু বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক সংশিক্ষার প্রচারার্থ যত্ন বিধান করিয়াছিলেন।

আকবর যেমন ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে যত্নবান্ ছিলেন, রুদ্রসিংহও তদর্থে অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিলেন। সুদূর কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানেও দূত প্রেরণ করিয়া তত্তৎস্থানের নরপতিগণের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক আহোমরাজ্যের নাম দূরদূরান্তরে খ্যাপিত করিয়াছিলেন। এমন কি তিব্বতেও দূত পাঠাইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা তোডরমল্লের সাহায্যে আকবর যেমন রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া রাজ্যের উন্নতি বিধান করেন, রাজা রুদ্রসিংহও সেইরূপ স্বীয় রাজ্যের নানা স্থানে জরীপ করাইয়া রাজস্বের শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে ধর্ম্মবিষয়ক সহায়তায়ও রুদ্রসিংহ আকবরের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য। রুদ্রসিংহের পিতা গদাধর সিংহের সময়ে আসামের বৈষ্ণব গোস্বামিগণ অনেকটা উৎপীড়িত হন অথচ আসাম বৈষ্ণব-প্রধান স্থান। রুদ্রসিংহ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াই বৈষ্ণবগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে যে মাজুলী দ্বীপটি আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট গোস্বামিগণের বসতি স্থান হইয়া তীর্থ প্রায় হইয়া উঠিয়াছে মহারাজ রুদ্রসিংহই তাহার মূল। তিনিই মাজুলীতে বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রধান প্রধান [illegible] স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সর্ব্বপ্রধান [illegible]

* ইতিহাসে কথাটা এইরূপই আছে। ইহার ভিতরে [illegible] মত কোনও কিছু ছিল [illegible]

আউনিআটির গোস্বামীকে তিনি গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদ্যমাংসভোজী আহোম রাজের খাদ্যের সঙ্গে বৈষ্ণব আচারের মিশ খাওয়া অসম্ভব। রুদ্রসিংহ শাক্ত দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি তন্ত্রবিস্তৃত বঙ্গদেশে লোক পাঠাইয়া শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী মালোপাড়া (?) নামক গ্রাম নিবাসী শক্তি-সাধক কাশ্যপ-গোত্রীয় কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে আনয়ন করিলেন। * এই কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, জলাশয়ে নামিয়া স্নানাহ্নিক করিবার সময় শিঙ্গী মাছ তাঁহাকে দংশন করিলে তাঁহার মন্ত্রে জলাশয়ের সমস্ত শিঙ্গী মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে। তদবধি তাহার উপনাম শিঙ্গীমারা ভট্টাচার্য্য হয়। রুদ্রসিংহ কিন্তু কৃষ্ণরাম হইতেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন—ব্রাহ্মণ ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলে রাজ্যে এক ভীষণ ভূকম্প হয়। তখন রুদ্রসিংহ ভীত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং যদিও স্বয়ং মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার পুত্রগণ এবং রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারী কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষালাভ করেন। ৺কামাখ্যাধিষ্ঠিত নীলাচলে রাজগুরুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তাই তাঁহার বংশধরগণ 'পর্ব্বতীয় গোসাই নামেই আসামে পরিচিত ও আজিও সম্মানিত।

খৃ ১৭১০ সালে সাড়ে আঠার বৎসর রাজত্বের পরে রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব* স্বর্গারূঢ় হন। গৌহাটি সহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের অপর পাড়ে তাঁহার শ্মশান ভূমিতে এক বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রুদ্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তদীয় কীর্ত্তিমণ্ডিত নাম স্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূকম্পে ঐ মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া মানবকীর্ত্তির বিনশ্বরত্ব প্রমাণিত করিয়াছে।

আকবর শব্দের অর্থ "শ্রেষ্ঠ" : এই হিসাবেও রুদ্র সিংহ "আহোম-আকবর" নামে সংজ্ঞিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

কবির মৃত্যু

পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণ ঢালি
    অস্তাচলে তপন মিলায়
কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্প ঝরে
    গন্ধ তার বাতাস বিলায়
বিন্দু বিন্দু ঝরে মেঘ
    বসুন্ধরা ফলশস্যে সাজে
কবি যায়—বীণা তাঁর
    সুধী-চিত্তে চিরদিন বাজে

শ্রীকুলচন্দ্র দে

---

* আসামের ইতিহাস লেখক মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব লিখেন যে, রুদ্রসিংহ আপন প্রজা বিশেষের নিকট নতজানু হইতে অনিচ্ছুক হইয়াই বিদেশ হইতে লোক আনিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহ লেখাপড়া না জানিলেও অতিশয় প্রজ্ঞাবান্ এবং দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ বালকোচিত অভিমান অসম্ভব। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবই তদীয় গ্রন্থের অপর স্থানে লিখিয়াছেন—"The Auniati Gosain was specially honoured, as the king not only recalled him from his exile but appointed him his spiritual preceptor". এই গোস্বামী আহোম রাজ্যেরই অধিবাসী ছিলেন ও রুদ্রসিংহের পিতা গদাধর সিংহ কর্ত্তৃক উপদ্রুত বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অন্যতম।

* আহোম-রাজগণ যোগিনী তন্ত্রানুসারে ইন্দ্র বংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং সেই জন্য তাহাদের স্বর্গদেব উপাধি ছিল।

শম্ভুনাথ শর্ম্মা

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

আমরা অত্র সুদূর কাছাড় হইতে একটি আজীবন সাহিত্যসেবীর জীবনী পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। এই মহাত্মা স্বর্গীয় শম্ভুনাথ শর্ম্মা। আজ ৩৮বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পুণ্যময় জীবনী-কথা, সাহিত্য চর্চ্চায় অক্লান্ত সাধনার কথা, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের অপরিজ্ঞাত। তিনি কাছাড় জিলার অন্তঃপাতী পরগণে উধারবন্দের দুর্গানগর গ্রামে, কাছাড় জিলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ভূমিকা

শম্ভুনাথের পিতা ৺ সোনারাম দেশমুখ্য অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ১২টি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺ রসরাজ দেশমুখ্য ও তদীয় অনুজ ৺ শম্ভুনাথ দেশমুখ্যের নামই উল্লেখযোগ্য।

বংশ পরিচয়

শম্ভুনাথের প্রাপিতামহ বসুদেব শর্ম্মা কাছাড়-রাজ হরিশ্চন্দ্রের আশ্রয়ে রাজধানী খাসপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দুর্গানগর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। নিম্নে বংশপত্রিকা প্রদত্ত হইল।

বসুদেব (ইটা দক্ষিণ-শ্রীহট্ট)
|
জয়কৃষ্ণ দেশমুখ্য
|
সোনারাম দেশমুখ্য
|
রসরাজ দেশমুখ্য (১৮১৮—১৯১২ খৃঃ) — শম্ভুনাথ দেশমুখ্য (১৮৩০—১৮৭৬ খৃঃ)
|
রামমাণিক্য,রামকুমার,রামতারক

বসুদেব শ্যামা ও কাঁচা খাত্তি (কাঁচাখাউরী) অর্থাৎ নরশোণিতসেবী তান্ত্রিক দেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ উধারবন্দের দেশমুখ্য অর্থাৎ সামাজিক বিচারপতি পদে কাছাড়রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন; এবং তৎপর জয়কৃষ্ণের পুত্র সোনারাম শর্ম্মাও কাছাড়ের শেষ নৃপতি গোবিন্দনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৮২৪ খৃঃ অব্দে উধারবন্দ ও বাসকান্দি পরগণাদ্বয়ের দেশমুখ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সোনারাম নিকটবর্ত্তী খাসপুর রাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১২৩১ সালে সোনারাম শর্ম্মা, দেশমুখ্য পদে নিযুক্ত হইবার যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে দেশমুখ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য—সামাজিক বিচার ও ব্যবস্থাপত্র—সম্বন্ধে রাজাদেশ ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে এই দলিল হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল —

দফে জায় মোকদ্দমা—
অপালন গোবধ আদি—১
অজ্ঞাত সংসর্গ পশ্চাদ জ্ঞাত—১
শ্রাদ্ধ, পূর্ব্ব বিবাহ ও চতুর্থ বিবাহ পতিত হওয়া—১
পুত্রে মাতা, পিতা, জেঠা, খুড়া ও ভ্রাতা, শশুর আদিকে মন্দ বাক্য বলিলে—১
ক্রোধেতে, মোহেতে স্বামী স্ত্রীকে মাতা, ভগ্নি বলিলে এবং স্ত্রী স্বামীকে পিতা ভ্রাতা বলিলে—১
হিন্দু হইয়া বৃষকে দামা বলদ করিলে—১
ইত্যাদি ইত্যাদি

এই সম্পর্কে দলীলপত্রগুলি সমাজের এক বিচিত্র চিত্র প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক উদ্ধৃত অংশ হইতে শম্ভুনাথের বাল্যজীবন কিরূপ আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল হিন্দু রীতিনীতির মধ্যে কর্ত্তিত হয় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রক্ষণশীল ভাবগুলি উত্তরোত্তর শিশু শম্ভুনাথের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

সোনারাম দেশমুখ্য স্বধর্ম্মনিরত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগ বাল্যকাল হইতেই নিজ পুত্রগণের মধ্যে বিকাশ পাইতে থাকে।

দুইভ্রাতা—রসরাজ ও শম্ভুনাথ

শম্ভুনাথের অগ্রজ রসরাজ দেশমুখ্য ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯১২খৃঃ ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন শম্ভুনাথ তাঁহার ১২ বৎসরের কনিষ্ঠ কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ৪৬ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই পরলোক গমন করেন। এতদ্ব্যতীত দুই সহোদরের চরিত্রেও একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

মামলা মোকদ্দমায় জ্যেষ্ঠের অসাধারণ প্রতিভা দৃষ্ট হইত। তিনি কাঠের কারবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নিজ শক্তি নিয়োজিত করিতে ব্যস্ত থাকিতেন, আর কনিষ্ঠ সাংসারিক সর্ব্বকার্য্য হইতে বিরাম লাভের জন্য ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাদের বৈষম্য দৃষ্ট হইত না। আজীবন উভয় ভ্রাতার মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা বিরাজ করিয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠ শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠের সাহিত্যসেবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

শৈশবে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে শম্ভুনাথকে আজীবন পঙ্গু অবস্থায় কাটাইতে হয়। অঙ্গহানির নিমিত্ত তিনি স্বাধীন ভাবে চলাচল করিতে অপারগ ছিলেন। অপরের সাহায্য ব্যতীত গৃহ হইতে অন্যত্র গমন বা শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি

বাল্যজীবন

চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করেন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রতনিয়মের অনুষ্ঠান, পূজা, অর্চ্চনা, বিদ্যাদান এবং ধর্ম্মগ্রন্থের অনুলিপি প্রণয়ন পূর্ব্বক দুঃসহ জীবনের কষ্ট লাঘব করিতেন। দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী কার্য্যক্ষম ছিল না, তথাপি তিনি বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীমাত্র সাহায্যেই ৩০ খানা গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৺শম্ভুনাথদেশমুখ্যের স্বহস্ত লিখিত পুস্তকাবলীর তালিকা।—

(পুস্তকের নাম, লেখার তারিখ ইত্যাদি সহ)

১নং—রামচন্দ্রের বনবাস (ভূটীয়া কাগজে ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ), "সন ১২৫৭ বাংলা মাহে ১৮ মাঘ মকর রাশৌ স্থিতে সূর্য্যে, সিতপক্ষাষ্টাদশ দিনমেবচ। পূর্ণিমা মন্দবাসরে দ্বাদশদণ্ডে গ্রন্থমেতৎ সমাধীনম্ লিখিত্বা বহুযত্নেন শম্ভুনাথ দ্বিজাতিনা"

২নং—জ্বরাবলী, "১২৭৭ বাংলা মাহে ২শ্রাবণ"

কোন বারে জ্বর হইলে কি কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩নং—প্রবরাধ্যায়—"সন ১২৬১ বাংলা মাহে ২০জ্যৈষ্ঠ; শাক ১৭৮৩"

৪নং—তন্ত্রসার—

৭৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। অবশিষ্ট কীটদষ্ট হইয়াছে। তারিখ নাই।

৫নং - ভারত সাবিত্রী—

"১২৭৭ বাংলা ৩০ ভাদ্র বুধবার শকাব্দা ১৭৯২ বাংলা।
"ইমাং ভারত সাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স ভারত ফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
সুর্পবৎ ত্যজেৎ দোষান্ গুণান্ গৃহ্লাতি সজ্জনঃ।
দোষগ্রাহী গুণগ্রাহী চালনীব তথাবিধ॥"
"স্বাক্ষর শ্রীসম্ভুনাথ শর্ম্মা।"

৬নং—মহাশান্তি—

১২৭২ বাংলা, মাস নাই

৭নং—শ্রীমদ্ভগবতী গীতা—

"শকাব্দা ১৭৮৬ শাকে কুম্ভমাসে অষ্টাদশ দিবসে ভৃগুবাসরে ত্রয়দশ্যাংস্থিথৌ চতুর্দশ দণ্ড সময়ে সমাপ্তশ্চেতি।"

৮নং—নানাবিধ স্তবকবচের বহি (১নং) তারিখ নাই।

৯নং—গুরুগীতা—"শকাব্দা ১৭৮৬ শাকে ত্রিংশত দিবসে গুরুবাসরে সম্পূর্ণ আষাঢ়স্য"

১০নং—স্তব কবচাবলী (২নং) "১২১৬ বাংলা ১৪ আশ্বিন"

১১নং—ককারাদি কালিকার সহস্র নাম (তারিখ নাই)

১২নং—বটুক ভৈরব স্তব "১২৬৮ বাংলা ১৮ কার্ত্তিক শনিবার অমাবস্যা দুই প্রহর মধ্যে।"

১৩নং—যজ্ঞোপবীত লক্ষণ

"১৮৮২ বাংলা ১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দা ১৭৯১"

১৪নং—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় প্রোক্তৈ বিধেরাধিবাস বিধি — তারিখ নাই। সম্পূর্ণ।

১৫নং—গয়াবিধি (পিতৃষোড়শী ও মাতৃষোড়শী সহ)

"শাক ১৭৮৪ মাহে কন্যারাসৌ দ্বাবিংশতি দিবসে ভৌম বাসরে লক্ষ্মীপূর্ণিমাতিথৌ সপ্তদণ্ড সময়ে।"

১৬নং—গয়া প্রয়োগ—সন ১২৬২ বাঙ্গলা ২৪ শ্রাবণ।

১৭নং—কাশীবিধি—

"বেদাষ্ট নগ চন্দ্রাশ্চ শাকে কর্কটগে রবৌ।
সমাপ্তং জায়তে গ্রন্থং দিবায়াং দেবতাগুরৌ॥
শ্রীরসরাজ শর্ম্মণশ্চ পিতৃকার্য্যে সমাগতা
লিখনং কর্ম্ম সমাপ্ত নিজানুজস্য ধীমতা॥
শ্রীশম্ভুনাথ শর্ম্মণশ্চ শুস্ত চ স্বর্গরাজনী।
লিখিতং বহু যত্নেন পিতৃমুক্তি তরঙ্গিনী॥

১৮নং—পদ্মপুরাণ (অসম্পূর্ণ)

১৯নং—ষষ্ঠীপূজা ১২৭৬ বাংলা মাহে আষাঢ়

২০নং—যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি

"নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরী পদযুগং কারুণ্যধীয়প্রদং।
তেন শ্রীরসচণ্ডিকা পদযুগে কোটী প্রণামং মম॥
শাকে শূন্য ধৃতিস্তথা"

২১নং—শ্যামাপূজা

"তত্ত্বজ্ঞান-বিনোদিনী-গিরিসুতা-পাদাশ্রয়াজীবকং।
নত্বা সাগরতত্ত্বয়ে ফণীগজে শাকেহর্কথাশ্রবৌ।
দুর্গাপত্র গতেঽবতার কামতে কাল্যার্চ্চনকালিখেৎ
হৈড়ম্বস্থঃ উধারবন্দ বসতি শ্রীসম্ভুনাথ দ্বিজঃ"

২২নং—অশৌচ মঞ্জরী

বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত (তারিখ নাই)

২৩নং—মাংষোৎসর্গ বিধি

"স্বাক্ষর শ্রীশম্ভুনাথ শর্ম্মা শকাব্দা ১৭৮৫ সাল সৌর জ্যৈষ্ঠস্য দ্বিতীয় দিবসে ভৃগুবাসরে তৃতীয় প্রহর সময়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণং॥"

মাদারকান্দি যাত্রিক চৌধুরীর নৌকানিবাসী শ্রীশ্রীশিবচরণ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থ হইতে বৈকুণ্ঠপুরের পাঠে ঐ পুস্তিকা সংশোধিত হইল।

২৪নং—গায়ত্রী স্বরূপ ১২৮২ বাংলা ২৫ বৈশাখ।

২৫নং—ব্রহ্মগীতা ও গঙ্গাস্তব ১২৮২ বাংলা ২৩ জ্যৈষ্ঠ

২৬নং—দুর্গানাম মাহাত্ম্য ১২১৬ বাংলা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

২৭নং—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধবিধি (রুচী স্তব সহিত)

এই গ্রন্থরাজী ব্যতীত ৫৪ খানা হস্ত লিখিত গ্রন্থ তাঁহার নিজ পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাঙ্গালা পয়ারে অনুদিত "চিকিৎসার্ণব", কাছাড় রাজপরিবারের অত্যুজ্জল কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি প্রণীত বাঙ্গালা পয়ারে অনুদিত "নারদীয় পুরাণ" শত যন্ত্র-চিত্রে উজ্জল "মহা উড্ডীশ তন্ত্র" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যসুহৃদবর্গের দৃষ্টি এ বিষয়ে পতিত হইলে প্রাদেশিক সাহিত্য-লব্ধ এইরূপ বহুগ্রন্থের প্রচার ফলে যে মাতৃভাষার পুষ্টি সাধিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

পিতৃবিয়োগের পর পিতৃভক্ত পুত্রদ্বয় গয়াপিণ্ড প্রদানের জন্য আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, গুরু, নাপিত, ধোপা মোট ৫১ জন লোক সহ নৌকা যোগে ৮ গয়াধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলৎশক্তিহীন শম্ভুনাথ নৌকার অগ্রভাগে লিখিবার সরঞ্জাম সহ বসিতেন আর নদী, খাল, বিল, পরগণা, গ্রাম, দেবালয়, হাট, বাজার, উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং উভয় তীরের উল্লেখযোগ্য বিবরণ এবং বিবিধ চিত্রপূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। ৫৭ হাত দীর্ঘ এই মানচিত্রই কাছাড় হইতে নৌকাযোগে তাঁহাদের ভ্রমণের কাহিনীর স্মৃতি সুদূর ভবিষ্যতে জীবিত রাখিবে। নৌকায় বসিয়া মানচিত্র ব্যতীত গয়াবিধি, কাশীবিধি ও মহিষোৎসর্গ নামক কয়েক খানা পুস্তক তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল ঘটনায় তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যানুরাগের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

তীর্থযাত্রা

নয় মাস অতীত হইলে পর দুই ভ্রাতা তীর্থ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে জনৈক মণিপুরী দস্যুর চক্রান্তে তাহাদের বাড়ী ভস্মীভূত হওয়াতে তাহারা অত্যন্ত বিপদাপন্ন হন। সৌভাগ্যের বিষয় শম্ভুনাথের বড় সাধের পুস্তকাগার এই দুর্ঘটনার সময় রক্ষা পায়। পুস্তকগুলি তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল। নিজ লিখিত ২৭ খানি বহি ছাড়া আরও প্রায় ৪৫ খানা বহি তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও তৎপুত্রগণের চেষ্টায় অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার পিতামাতার শ্রাদ্ধের ব্যয়ের তালিকা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাহার হস্তলিখিত ৬টি কাগজের বস্তাও তাঁহার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ তদ্রূপ শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইতেছে।

বিদ্যাদানেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। শিষ্যগণ তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিত, আর পাঠান্তে তাহার সাধের হরিণ, খরগোশ, ময়নাগুলিকে পুরাকালের মুনিকুমারদের ন্যায় শুশ্রূষা করিত। এইরূপে উধারবন্দের প্রাচীনবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন।

তিনি একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতেন এবং স্মরণার্থ প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে এক খানি একাদশীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আর প্রতিদিন প্রাতে ১০৮ বার করিয়া দুর্গানাম ও কালীনাম লিখিতেন। এক বস্তা দুর্গা ও কালী নামের কাগজ এবং একাদশীর তালিকা অদ্যাপি দেশমুখ্য পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি গুরুপাদোদক বোতলে সঞ্চিত করিয়া বৎসর কাল প্রতিদিন কিছু কিছু ব্যবহার করিতেন।

দুর্গোৎসবের সময় দরিদ্র প্রতিবেশীবর্গকে নূতন বস্ত্র দান করিতে এবং আম কাঠালের সময়ে প্রতিবেশীদিগকে ফলাহার করাইতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন।

বিবিধ কার্য্যে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শনে দাসদাসী এবং প্রতিবেশীবর্গ বিস্মিত হইতেন। বাড়ীর মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য অতি কৌশলে তিনি একটি চারি চাকার গাড়ী প্রস্তুত করেন।

সময় সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হস্তীসহ কাঠের কার্য্যে পাহাড়ে থাকিতেন। এই সময়ে তাহার উপর সাংসারিক কার্য্যের ভার পড়িত। তিনি ক্ষেত্রে যাইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু বাড়ী বসিয়াই কাগজে জমিনের নকসা আঁকিয়া কোন্ জমিতে কি করিতে হইবে ভৃত্যদিগকে দেখাইয়া দিতেন। এই প্রকারে বাড়ী বসিয়া তিনি কৃষির কার্য্য চালাইতেন আর অজ্ঞ চাষাগণ ইহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

পঙ্গু ছিলেন বলিয়া তিনি নিজের মনে সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ণতা অনুভব করিতেন। অঙ্গহানি প্রযুক্ত তিনি নিজ দুঃখময় জীবনে যে সকল অভাব অনুভব করিতেন তৎসমুদয় ব্যক্ত করিয়া তিনি একখানি বারমাসী রচনা করেন। আমরা অতঃপর উহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। এই বারমাসী একখণ্ড ক্ষুদ্র আত্মজীবনী বিশেষ সুতরাং এই বারমাসী

পাঠকগণের নিকট সুখদুঃখময় কবি জীবনী সম্যক পরিস্ফুট করিবে।

শ্রীদুর্গা শিব॥

অথ শম্ভুনাথ শর্ম্মার স্বাক্ষর বারমাসি॥

ভাবে দীন শম্ভু নাথে দিবস রজনী।
বুঝি নিকরুণা হৈলায় হরমনমোহিনী॥
বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন দুর্গা মাই।
এ ভবে আসিয়া মোর কিছু লভ্য নাই॥
হস্ত গেল পদ গেল বসন মলিন।
সকলে ছাড়িয়া গেল মোরে জানি দীনহিন॥
মধু মাস পাইয়া নানা জাতি ফুল ফোটে।
হাটিবা না তুমি পুষ্প বনে ডেউ উঠে॥
পদ সুখে না করিলাম পুষ্প আযোজন। (১)
হস্ত সুখে না করিলাম দেবতা পূজন॥
কেমনে এ দুঃখ ভব সাগরে হৈব পার।
এত মাস গেল দুর্গা না হইলাম উদ্ধার॥
জৈষ্ঠ মাসের দুঃখ শুন গো জননী।
হস্ত পদ নিয়া কেন থুইলা এ পরাণী॥
সুখ নিলায় সম্ম নিলায় আর নিলায় আশা।
হাঠ ফিরা নিয়া মোর ঘরে কৈলায় (২) বাসা॥
নিজ বালক জানি মাগো কিছু কর মায়া।
দয়াময়ী নাম তব বালকে কর দয়া॥
মুক্ত শাস্ত্র করি মাগো ডাকিতে তোমারে।
এত মাস গেল উদ্ধার না কৈলায় আমারে॥
আষাঢ় মাসের দিন দুর্বির ভবন।
পিতায়ে করাইল দুবি আমি থাকিতে শরম॥
এই দুঃখ প্রাণে মোর কত বা সহিমু।
মা গো আর বা কত দিনে যাইমু॥

দয়াময়ী নাম তোমার লেখাছে ভুবনে।
এত মাস গেল ছায়া না দিলায় চরণে॥
শ্রাবণ মাসের দিন ভজু হৈল নাশ।
শ্রাবণী ব্রত আস হৈল পরকাশ॥
ভাল হৈবার মানসেতে পূজিমু ভবানি।
তথাচ কিঞ্চিৎ দয়া না কৈলা দারুণ কাণি (৩)॥
ভাল আর তাকিলাম দুর্গা মহামায়া।
এত মাস গেল তারা না দিলায় তব ছায়া॥
ভাদ্র মাসের দিন বরষার শেষ
আর কত সহিবে দুর্গা এ শরীরে ক্লেশ॥
বসন্ত সময়ে যেমন কোকিলা দুঃখিত।
দুর্গা নাম লৈলে থাম হইতো মত॥
কাতর হইয়া ডাকি দুর্গা তোর গো নয়ানে।
এত মাস গেল দুর্গা না কৈলায় অবসান॥
আশ্বিন মাসের দিন ভাবতে চিন্তিত।
বৃথা ভবে দয়া হৃদয়ে না পারি হটিতে॥
হস্তহীন পদহীন হীন বুদ্ধি মতি।
দশ হাতে আইলে দুর্গা না পারি প্রণতি॥
দেখিয়া দুর্গার উৎসব চক্ষুর গোচরে।
হাটিতাম না পারি আমি পড়িয়ে অন্তরে॥
আপ হীন জানি কর কিঞ্চিৎ করুণা।
এত মাস গেল আমার না পুরিল বাসনা॥
কার্ত্তিক মাসের দুঃখ শুন মহামায়া।
কোথা গেলে পাইমু দুর্গা তোমার চরণ ছায়া॥
দুর্ঘর প্রবাহ (৪) অঙ্গে কৈলা হানবল।
দারুণ কার্ত্তিক মাসে হইলাম অচল॥
এই হইতে নৈরাশ আমি হইলাম নিরানন্দ।
অপাদ (৫) বিনা কাটকেতে মোরে কৈলায় বন্দ।

(১) তিনি একখানা ৪ চাকার গাড়ী প্রস্তুত করেন। উহার সাহায্যে চলা ফিরা করিতেন।

(২) করিলায়।

(৩) মনসা।

(৪) মধ্যে মধ্যে তাহার রক্তবমন হইত। ইহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

(৫) পাদহীন

কায়ে মনে চিত্তে আমি কিছুই না জানি।
বালক জানিয়া হের কিঞ্চিৎ নয়নি ॥
দুঃখি হইয়া ডাকি দুর্গা পাইয়া ভবের ত্রাস।
উদ্ধার না হইলাম আমি গেল এত মাস ॥
অগ্রান মাসের দুঃখ শুন পর্ব্বতের মাইয়া।
সরতের ভয় নরিতে ঘন পড়ে খুয়া * ॥
ছায়াতে থাকিয়া আমি না পাই রৌদ্রের ফাপ। (৬)
অঙ্গে মোর নাহি লাগে আগুনের তাপ ॥
পঞ্চামৃত হস্তে তুলি মিঠা যেমন খাইতে।
তাহা হইতে অধিক পৌষের রৌদ্র পুষাইতে ॥
এত আশা মিঙ্গগুনে তুমি না তরাইলায়।
আশাহীন করি এবে কি লাগিয়া পৈলায় ॥
বিনয়েতে ডাকি দুর্গা হের একবার।
এত মাস গেল আমি না হইলাম উদ্ধার ॥
পৌষ মাসে সর্ব্বলোকে ধান্য কাটে বন্দে (৭)।
হাটিতে না পারি আমি শুইয়া থাকি ঘরে ॥
মনে মনে ইচ্ছা করি যাইতাম বন্দে।
পদ নাহি চলে মোর বিনা বেতে বান্দে ॥
কাতর হইয়া ডাকি দুর্গা ধরিয়া চরণ।
এত মাস গেল আমার না হইল মরণ ॥
মাঘ মাসের দিন শীত অবশেষে।
বসন্ত সময় আসি হইল পরবেশ ॥
চুতপুষ্প আদি নানা পুষ্পের সংবাদ।
কোকিলায় করে দিব্য মধুস্বরে নাদ ॥
আর নানা উপদ্রব জলির (৮) কারন।
তথাপি দারুন প্রাণ না হৈল মরন ॥
ভাগানের উৎপাত শুনি লাগে বড় ত্রাস।
উদ্ধার না কৈল্যায় দুর্গা গেল এত মাস ॥

ফাল্গুন মাসের দুঃখ শুন অগো উমা।
দোল যাত্রা হেতু আইল গোবিন্দি পুর্ণিমা ॥
সকল সংসারে হুলি করয়ে আনন্দে।
দুর্গা দুর্গা ডাকি আমি শুইয়া নিরানন্দে ॥
কত লোক মরি গেলা আমি শয়নে থাকিতে।
বড় দুঃখ লাগে প্রাণ বাহির না হইতে ॥
হায়রে দারুণ প্রাণ ছাড় ভবের মায়া।
পাপে লিপ্ত হইয়া রৈলাম কোন আশার লাগিয়া ॥
অগতি হইয়া দুর্গা ডাকি বারে বার।
এত মাস গেল আমি না হইলাম উদ্ধার ॥
চৈত্র মাসের দিন মনে ধরে মউ। (৯)
পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে মনে উঠে ঢেউ ॥
সুখে দুখে সময় করি পাপে দিলাম ভরা।
হস্তে তুলি না দিলাম মধু নারায়ণে ধারা ॥
প্রচণ্ড ভানুর তাপে প্রাণ মোর জ্বলে।
হাটিয়া না কৈল্যাম স্নান স্রোত নদীর জলে ॥
আর এক বাঞ্ছা মোর আছিল বিশেষ।
এক রাত্রি প্রবাস আমি না কৈলাম বিদেশ ॥
দারুণ চৈত্রের খরা অনলে দহে বন।
তেমি মত চিন্তানলে দহে আমার মন ॥
অয়ে গো কঠিন দুর্গা কেন হেন কৈল্যো।
অনাদরি প্রাণ থুইয়া দেহ কেন নিলে ॥
আবেশে (১০) জানিলাম তুমার হৃদয় কঠিন।
না দিলায় চরণ ছায়া মোরে জানি দীনহীন ॥
গঙ্গার সতিনী তুমি স্বামী দিগম্বর।
কিঞ্চিৎ না কৈল্যায় দয়া গেল এ বৎসর ॥
কাতর হইয়া ডাকি দুর্গা পাইয়া ভবের ত্রাস।
উদ্ধার না কৈল্যায় দুর্গা গেল এত মাস ॥

* কুয়াশা
(৬) উত্তাপ
(৭) মাঠে
(৮) সীপাহী বিদ্রোহ
(৯) মধু
(১০) ভাবে

যার দাসের তের পদ যে করে গায়ন।
কৈলাসেতে গতি হয় শ্রীদুর্গা চরণ॥

শ্রীদুর্গাচরণ তলে শ্রীশম্ভুনাথ শর্ম্মা সাং দুর্গানগর সন ১২৬২ বাংলা মাহে মাঘ।

শম্ভুনাথ অল্পসময়ের মধ্যে যে একনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন কয়জন সাহিত্যসেবী নিজ জীবনে এইরূপ একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ?

৮ রসরাজ দেশমুখ্য মৃত্যুর প্রাক্কালে ৯১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাছাড়ের ইতিহাসের এবং নিজ পরিবারের বহু তথ্য আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত রামতারক শর্ম্মাও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক ন্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রস-নৈয়ায়িক লাভোয়াসিয়ে হীরকের "কঠিন-কোমল" গুণের আবিষ্কার করেন। বহুমূল্য হীরক যে অঙ্গার (Carbon) বিশেষ এবং তাহা যে ভস্মীভূত হইতে পারে; দগ্ধ হীরক, হীরক-ভস্মে (Carbon oxide or oxide of diamond) পরিণত হয় ও সম্পূর্ণ উবায়িত হয় তাহা তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন। হীরকের রাসায়নিক উপাদান যে অঙ্গার, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই জানা গিয়াছিল। এই বিষয়ে ইহার পূর্ব্ব হইতেই অনেকে অনেকটা ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন। হীরক উত্তপ্ত হইলে পুড়িয়া যায় কেন? তাহার কারণ, উহা একটি মৌলিক দাহ্য পদার্থ। উহা স্ফটিকীভূত অঙ্গার ভিন্ন কিছুই নহে। চারকোল (Charcoal) ও গ্র্যাফাইট (graphite) যে উপাদানে প্রস্তুত, হীরকও সেই উপাদানেই প্রস্তুত। একই উপাদানে প্রস্তুত হইয়াও পূর্ব্বোক্ত দুইটী পদার্থ হইতে হীরক এত পৃথক্ হইবার কারণ শুধু উহার বিশেষভাবের স্বচ্ছতা ও উহার অঙ্গার বাষ্প কাবর্ণের উপর নির্ভর করে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানাচার্য্য নিউটনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হীরক একটি দহনশীল-পদার্থ। যে সকল যুক্তির সাহায্যে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা উত্তরকালে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাঁহার আবিষ্কারটি মিথ্যা হয় নাই। ১৬৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে Grand Duke Cosfmos III of Tuscanyর আজ্ঞানুসারে Academia del cimanto of Florenceএ হীরকের রাসায়নিক পরীক্ষা হয়। তাহাতে হীরক একটা ভয়ানক কয়লার আগুনে অথবা একখানি সুবৃহৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাচ ফলকের রশ্মিকেন্দ্রে স্থাপিত করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, হীরক না গলিয়া আয়তনে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং অবশেষে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, কিঞ্চিন্মাত্র অগ্নি-প্রস্তর (Silica) অবশিষ্ট থাকে না; তবে যে, হীরক পুড়িয়া ভস্ম বা ছাই হয়, তাহা নিশ্চয়ই উহার সহিত মিশ্রিত পদার্থের দগ্ধাবশেষ। এই অবিশুদ্ধতার কারণ হীরকের কোন্ অংশে কি পরিমাণে থাকিবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, এস্থলে ইহাও বিশেষ প্রণিধানের বিষয় বটে। এই অবিশুদ্ধতা হীরকে খুব কমই বিদ্যমান থাকে; কারণ, তাহা হইলে তাহার স্ফটিক-শুভ্র-স্বচ্ছতা থাকে না। আর যদিও থাকে, তাহার সাধারণ কারণগুলি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম থাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও সেগুলি সকল স্থলে দেখা যায় না। প্রাগুক্ত পরীক্ষাতে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে, হীরক এমন একটি পদার্থ যাহা উত্তাপ পাইলে বাতাসে মিশিয়া যায়। কিন্তু এই মিশিয়া যাওয়া ব্যাপারটার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না।

এতদিনে রসবৈজ্ঞানিক লাভোয়াসিয়রের বৈশ্লেষিক সংঘাতে তাঁহার শাসনদণ্ডের প্রবল প্রতাপে হেয় বা কৃত্রিম সম্মানের আবরণ সরিয়া গিয়া সব এক শ্রেণী হইল—এক চিরন্তন সত্যে পরিণত হইল—কোন পার্থক্য রহিল না। লোকে উত্তমের তুলনা করিতেই হীরকের সহিত তুলনা করিয়া বলিত যে, "যেন হীরার ধার" "হীরার টুকরা" "হীরার মত চকচকে"। এক্ষণে সেই হীরার আর সমুজ্জ্বল প্রভা রহিল না—কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। হীরক এতদিন অতি কঠিন, অতি উজ্জ্বল ছিল—হীরকের মত কঠিন পদার্থ আর নাই। এখন তাহা 'কঠিন কোমল' এবং 'নিষ্প্রভ' হইল। লাভোয়াসিয়রের এই পরীক্ষা হইতেই প্রকৃত "কঠিন কোমল" শব্দের সৃষ্টি হইল। জগতের পদার্থ নিচয় বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে চরম পরিণতি এইরূপই দাঁড়ায়। ভাবের প্রলেপ সার আবরণ উন্মোচন করিলে অন্তরালে [illegible] বেশীর ভাগ এইরূপই প্রকাশ পায়। সহজে নিজের প্রকৃতি অনেকেই বুঝিতে দেয় না। এই কাপট্য বা দ্বৈধভাব (Duplicity) জগতের একরূপ সাধারণ নিয়ম হইলেও শ্রেষ্ঠ নহে।

পাঠক, বোধ হয়, এখানে বলিবেন, লেখক মহাশয় হীরককে যেন জৈবিকভাবে ধরিয়া তাহার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন। যাহা বলিলেন, তাহা একরূপ ঠিক। হীরককে জৈবিক কি অজৈবিক পদার্থ বলিব, তাহা লইয়া একটু বিপদেই পড়িতে হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বে রসায়নবিদেরা জগতের সকল পদার্থ দুইভাগে বিভক্ত করিতেন। জৈবিক ও অজৈবিক (Organic and inorganic); কিন্তু এখন আর তাহা বলা যায় না—একটা অপরটার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সবেই যেন অদ্বৈত ভাব—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিতেছি। পূর্ব্বে জৈবিক বলিলে বুঝা যাইত—যাহা জীব হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ জন্মমরণশীল পদার্থ। জৈবিক তত্ত্বের সহিত যেন জীবনী শক্তির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর অজৈবিক বলিলে, জৈবিকের বিপরীত অর্থাৎ জন্মমরণরহিত পদার্থ। সুতরাং জৈবিক ব্যতীত অন্যান্য সকল জিনিষ বুঝাইত। এই সংজ্ঞানুসারে "albumen" "urea" ইত্যাদি পদার্থ পূর্ব্বে জৈবিক বই অজৈবিক পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন করা যাইত না; কিন্তু আজকাল তাহাও সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং জৈবিক ও অজৈবিক কথা দুইটি অনেকটা অর্থশূন্য বা 'কথার কথা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল যেন কতকগুলি পারিভাষিক সুবিধার জন্য এই কথা দুইটি রক্ষিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ ও বহির্জগতের বিভেদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পার্থক্য তিরোহিত হইতেছে; জড়বিজ্ঞানের সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি জীববিজ্ঞানে প্রযুক্ত হইতেছে এবং জীববিজ্ঞানের নিয়ম ও ধারা জড়বিজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জড় ও চৈতন্যের ভেদ-বুদ্ধি দূরীকৃত হইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের অদ্বৈত সিদ্ধি "জড়ে চৈতন্য" সংসাধিত হইতেছে। অক্ষয়শীলতা হীরকের একটি সর্ব্ব প্রধান গুণ। হীরককে সংস্কৃতে "অদমন্ত" বলে। ল্যাটিন্ Adamant এবং তাহা হইতে Diamond, Diamont or Diamand হইয়াছে। অপরাপর মণি হীরক হইতে অধিকতর ক্ষয়শীল হইলেও তাহা আগুনে পুড়িয়া যায় না। হীরক অন্যান্য মণি হইতে অক্ষয়শীল হইলেও আগুনে পুড়িয়া যায়। শুধু যে পুড়িয়া যায় তাহা নহে, বিশুদ্ধ হইলে একেবারে পুড়িয়া হাওয়ায় মিশিয়া যায়। নিজের অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। হীরক অদমন্ত (অতিদৃঢ়) হইলেও অক্সিজেনের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে অদমন্তের দমন হয় ইহা স্থির নিশ্চয়। উত্তাপে সকল জিনিষ, সকল মণিমাণিক্যই বিকৃত হইয়া যায়; কিন্তু এমন করিয়া হাওয়ায় মিশিয়া যাওয়া কেবল হীরকেই হয়। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের রাজ্যে কেহই দর্প করিতে পারে

না—স্বয়ং সাধিতে পারেন না। হীরকের সহিত বিশুদ্ধ অক্সিজেনের রাসায়নিক সমবায় হইতে হইলে ৮৪০ ডিগ্রি সণ্টিগ্রেড উত্তাপ আবশ্যক, কিন্তু বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশিতে হইলে অধিকতর উত্তাপের আবশ্যক, কারণ, বাতাসের অক্সিজেনে অন্যান্য অনেক জিনিস মিশ্রিত আছে, যাহাতে উহার সহিত হীরকের মিলনের প্রতিবন্ধক ঘটে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, Saltpetre অথবা Potassium chromate এর সহিত মিশ্রিত করিয়া হীরক উত্তপ্ত করিলে উহা অতি সহজেই পুড়িয়া যায়। হীরক গলিত হয় কি না এবং ছোট ছোট হীরক গলাইয়া বড় হীরক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সম্রাট Francis কর্তৃক নিযুক্ত Berzelius Grssiot, Clarke, Despretz প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী অনেক চেষ্টা করিয়াও হীরককে গলাইতে পারেন নাই।

লাভোয়াসিয়ে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, হীরকের সহিত বায়বীয় অক্সিজেন মিশিয়া অঙ্গার-ভস্ম (oxide of carbon) গঠিত হয়, সুতরাং হীরক কার্বন্ (carbon) ভিন্ন আর কিছুই নহে। Smithson Tennant, Sir Humphrey Davy, Kause, Guyton De Morveau প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকেই পরীক্ষা করিয়া লাভোয়াসিয়ের মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অঙ্গার ও হীরক মৌলিকভাবে এক পদার্থ। Arago ও Biot এর মত ছিল; হীরক একটি আর্দ্র কার্বন্ (Wet Carbon); কিন্তু Davyর পরীক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

নিশাদল উত্তপ্ত হইলে বাতাসে মিশিয়া যায়। কর্পূরের ত কথাই নাই। বিশেষ কোনরূপ উত্তাপ না পাইলেও উহা বাতাসে মিশিয়া যাইতে পারে। হীরকের বাতাসে মিশিয়া যাওয়া অপর দুইটির মত নহে। হীরকের সহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শ না থাকিলে উহাকে যতই উত্তপ্ত করা যাউক না কেন, উহা শুধু উত্তপ্তই হইবে, কিছুতেই উহার ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না; কোন রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটিবে না। হীরককে অক্সিজেন সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে এমন একটা রাসায়নিক সমবায় হয় যে, উহা বর্ণহীন বায়বীয় আকারে বাতাসে মিশিয়া যায়, তখন উহা আর কঠিন হীরক থাকে না এবং তখন উহা আর সংগ্রহ করা যায় না। ইহাই হীরকের বিশেষত্ব। কিন্তু নিশাদল অথবা কর্পূর সম্বন্ধে এইরূপ নহে। বাতাসের সংস্পর্শেই হউক আর অসংস্পর্শেই হউক উত্তপ্ত হইলেই এগুলি উড়িয়া যাইবে। তবে, উত্তাপ অতিরিক্ত হইলে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটিতে পারে, নতুবা শুধু উড়িয়াই যাইবে। ইচ্ছা করিলে, এই নিশাদল অথবা কর্পূরমিশ্রিত বায়ু হইতে পুনরায় কর্পূর ও নিশাদল নিষ্কাশন করা যাইতে পারে।

উপরিউক্ত পরীক্ষানিচয়ে ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রমও প্রকাশ হইয়া পড়িল। কারণ, ফ্লজিষ্টন যদি বাহির হইয়া যায়, তবে, কেমন করিয়া হীরক-ভস্ম ওজনে হীরক অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে? ইহাতেও তাঁহার "অম্লজান" আবিষ্কারের বিশেষ পোষকতা করিতেছে।

এই অম্লজানই জগতের সমস্ত ব্যাপারের নায়ক—সকলের প্রাণস্বরূপ। ইহার সহিত সমস্ত জড় প্রণয়িনীরাই দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ। তাহার প্রভুত্ব স্বামিত্ব সর্বত্রই। সূক্ষ্মদর্শী লাভোয়াসিয়ে এইরূপ অনেক বিষয়েরই মর্মকথা বাহির করিয়া প্রকৃত মরমী হইয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার তুলনামূলক পরিমাণ-জ্ঞাপক বিশ্লেষণ-বিচারে কেহই স্বপদে থাকিতে পারে নাই।

লাভোয়াসিয়ে এইরূপে ফ্লজিষ্টনবাদকে রসায়নশাস্ত্র হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া প্রাচীন রসায়নকে নূতন ভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন। পূর্বে যাবতীয় রাসায়নিক পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের অনুযায়ী ছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিজের মনের মত করিয়া

নব পর্য্যায়ে নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করিলেন। তিনি জড়-পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন —কঠিন তরল ও বায়বীয়; এবং উত্তাপ সহযোগে কঠিন পদার্থ যে তরল ও ক্রমশঃ বায়বীয় আকার ধারণ করিতে পারে, তাহাও দেখাইলেন। তাপর বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে অম্লজান ও যবক্ষারজান (Oxygen and Nitrogen or Azote) এই দুই বায়বীয় পদার্থের (গ্যাসের) সংমিশ্রণ মাত্র। এতদ্ভিন্ন বাতাসে সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল বায়ু (Carbonic acid gas) এবং সামান্য পরিমাণ আর্গন (Argon), নিয়ন (Neon), জিনন্ (Xenon) ক্রিপটন্ (Crypton) আছে। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ জল যে দুই ভাগ আয়তনের দাহ্য বায়ু বা উদজান ও একভাগ আয়তনের অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ইহা, আর অম্ল, ক্ষার, লবণ প্রভৃতির রাসায়নিক বিভাগ ও পরিভাষা বাহির করিলেন। পূর্ব্বকার (Phlogisticated air, Dephlogisticated air) (অনুদ্ভূততেজ বায়ু উদ্ভূত তেজবায়ু বা অনমুদ্ভূততেজ বায়ু) প্রভৃতি কথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। প্রাণিসমূহের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহারও আলোচনা করিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ, দহন ক্রিয়া এবং ধাতুভস্ম প্রস্তুত পদ্ধতি এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন এক রকমের। প্রাণিগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের ভিতর বায়ু গ্রহণ করে; বায়ুর অম্লজান শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অঙ্গারাম্লে পরিণত হয় এবং উহা বায়ুর নাইট্রোজেনের সহিত ও প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসে। দহন ক্রিয়া ও ধাতুভস্ম প্রস্তুত প্রণালী এই অম্লজানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক, এই দহন ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্বন্ধে মনীষী মেও-ও পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মেও ও লাভোয়াসিয়ে উভয়েই এই গৌরবের অধিকারী। লাভোয়াসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণিদেহের ঘর্ম্ম লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লাভোয়াসিয়ের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। কর্ম্ম পরিত্যাগে মানুষের ক্ষমতাও নাই, অধিকারও নাই। কিন্তু, দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহাকে একান্ন বৎসর বয়সেই মানবলীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল। যদিও তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মেই তাঁহাকে 'শতায়ু' করিয়াছিল। কর্ম্মই প্রকৃত জীবন। ঐ সময়ের কর্ম্মসমষ্টি তাঁহাকে জগতের "শতায়ুষ্ম পুরুষ" করিয়াছে।

লাভোয়াসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়নের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান রহস্য হইতেছে যে, তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুলাদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা কেবল বস্তুগত শাস্ত্র ছিল, তাহা পরিমাণাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ এই দ্রব্যের সহিত এই এই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অমুক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উহার কত পরিমাণ অপরাপর দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণীত হইল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রসায়নে বড় একটা ছিল না।

লাভোয়াসিয়ের জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার একাধারেই মঙ্গলের ত্রিশক্তিই বর্ত্তমান ছিল। "কল্পনাশক্তি" "ভাবপ্রবণতা" ও "সূক্ষ্মদৃষ্টি" লাভোয়াসিয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অপরে যেখানে উল্টা দেখিতেছিলেন, সেখানে এই শক্তির বলে তিনিই কেবল সবই সোজা দেখিলেন। অপরের ও নিজের পরীক্ষার মধ্যে "সত্য" যেমত কোন অন্ধকারময়গুহা গহ্বরেই লুকায়িত থাকুক না কেন, তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিকে

কখনও এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানেই দেখা যায়।

লাভোয়াসিয়ে এই ভাবেই নানা বিষয়ের সংস্রবে আসিয়া পরিমাণ জ্ঞাপক ও তুলনা মূলক আলোচনা বা বিশ্লেষণ প্রণালীর ব্যবহারে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা প্রসূত বৈশ্লেষিক-পরীক্ষা-ফল-স্বরূপ প্রবন্ধ গ্রন্থাদির দ্বারা নব-রাসায়নিক সাহিত্য সবিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত সত্য ধরিতে গেলে তিনিই পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলির প্রকৃত কারক। প্রাচীন আধুনিক জগতে বিজ্ঞানবীর তিনি সর্ব্বাপেক্ষাও কর্ম্মশক্তি-পুঞ্জের সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারিলে তাঁহার কর্ম্মজীবন আলোচনা বিজ্ঞান ছাত্রগণের সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার্থিগণের তাঁহার নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর গ্রন্থাদি সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ চিরদিন রসায়ন শাস্ত্রের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট পরম আদরণীয় হইয়া থাকিবে, ইহা নিশ্চয়।

কর্ম্মই মানবের প্রকৃত জীবন। মনুষ্য জীবন একটি ধারাবাহিক কর্ম্মপ্রবাহ। কর্ম্মসমষ্টি লইয়াই মনুষ্য জীবন। এই কর্ম্ম জ্ঞান মূলক—এই কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য মনুষ্যত্ব হীন। কর্ম্মশূন্য জীবন পশু জীবন। কর্ম্মময় জীবনই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন। যাহার জীবনে চিহ্নিত কর্ম্ম নাই, তাহার জীবন নাই।—তাই, আমরা বিশ্ববিশ্রুত কর্ম্মীর বিশিষ্ট কর্ম্ম জীবনই পূর্ব্বে আলোচনা করিলাম, পরে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এবং তদানুসঙ্গিক কর্ম্মপ্রবাহ এবং জীবনের পূর্ণতা—মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি।

এণ্টয়েন লোরাঁ লাভোয়াসিয়ে (Antoin Laurent Lavoisier) ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট তারিখে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা সার আইজাক নিউটনের ঠিক একশত বৎসর পরে লাভোয়াসিয়ের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রকে লালনপালন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক, অনেক বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষেরই বাল্যে এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, অনেকেরই অর্থাভাবে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় নাই; পরে,তাঁহারা স্বকীয় প্রতিভার বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। বড়লোকের আদরের ছেলে হইলেও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উপর পিতার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। লাভোয়াসিয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রসায়নের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রাউয়েল অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টি রসায়ন শাস্ত্রের উপর সমধিক পতিত হয়। রাউয়েল অধ্যাপনা সমস্ত ফরাসী দেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লাভোয়াসিয়ের সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যেও অনেকে রসায়নে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আইন শিক্ষা করেন এবং বাস্তবিক একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রীতি থাকায় তিনি আইন ব্যবসায় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হইল। দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পরবৎসর "বৃহৎনগর আলোকিত করিবার উপায়" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা ফরাসী একাডেমী হইতে একটি স্বর্ণপদক উপহার প্রাপ্ত হন; এবং সেই বৎসরই ঐ সভার সভ্যনির্ব্বাচিত হন। এই ফরাসী একাডেমী

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে গণিত, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাত্রই এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া নবাগত সাধকের মৌলিক অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। সজ্জন-সঙ্গতির ফল বড়ই মঙ্গলাস্পদ—মনুষ্যকে বড়ই উন্নত করে। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বিজ্ঞানের উচ্চ উপাধিধারী যুবক কেবল সুধী-সংসর্গের অভাবে বিজ্ঞানানুশীলনে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া সাধনার মন্দির হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করেন, আবার অনেক ভাগ্যবান্ যুবক অল্পশিক্ষিত হইয়াও সংসর্গগুণে জ্ঞানার্জ্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া সাধনার পথে ক্রমেই দ্রুত অগ্রসর হন। জড়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত সত্যে যাঁহার মন একবার আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি অলসকর্ম্মা হইয়া মৌলিক গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাই, যুবক লাভোয়াসিয়ের সাধনার প্রবৃত্তি স্বতঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি এখন হইতে সুনিপুণভাবে মৌলিক গবেষণাকার্য্য করিতে লাগিলেন।

ফরাসী একাডেমীর সভ্যগণ বৎসর বৎসর নানা বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ করিতেন। লাভোয়াসিয়ের অসাধারণ প্রতিভা ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার উপর ঐ সকল বিবরণী প্রকাশের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কয়েকবৎসরে তিনি দুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী একাডেমীর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোর ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন সমস্ত বিদ্বৎ সমাজ বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। নিজে অর্থব্যয় করিয়া প্রাচীন জরাজীর্ণ বৈজ্ঞানিকগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়া একাডেমীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সজ্জনসঙ্গতিপ্রীতি এতই প্রবল ছিল গুণের আদর তিনি এতই বুঝিতেন। অবশেষে, তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ফরাসী একাডেমীর অস্তিত্ব লোপ পাইল।

লাভোয়াসিয়ের অর্থের কোন দিন অভাব ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণে সকলে আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি অর্থাগমের অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়া অনন্যমনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু ভবিতব্যতা তাহা ঘটিতে দিল না। তিনি যখন বিজ্ঞানের মন্দিরে একপদ স্থাপন করিলেন, তখনই অজ্ঞাতসারে অপর পদ ফাঁসিকাষ্ঠের প্রথম সোপানে স্থাপিত হইল। নির্বিঘ্নে কর্ম্ম করা, বোধ হয়, জগতের অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি ফারমিয়ে-জেনারল (Fermeir General) হইলেন। তাঁহার সময় ফরাসীদেশে যাঁহারা জমীদারী ও বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহ করিতেন তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা খানিকটা তালুক ইজারা করিয়া লইতেন এবং রাজসরকারের সহিত ছয়বৎসরের রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক আগাম দিবার বন্দোবস্ত করিতেন। নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও কিছু মুদ্রা রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গকে উপহার দিতে হইত। ঘুষ, জুয়াচুরী, জুলুম ফারমিয়েরের নিত্য কর্ম্ম ছিল। ফলে দরিদ্র প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও দরিদ্র প্রজাবর্গ সুবিচার প্রাপ্ত হইত না, উপরন্তু নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ফরাসী দেশের উৎপীড়িত প্রজা-সাধারণ এই প্রথাকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ইহাঁদের মধ্যে সৎ

ব্যক্তিও না ছিলেন তাহা নহে। লাভোয়াসিয়ে জমীদারির ভার গ্রহণ করিয়া নিজের এলাকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ভিন্ন দেশ হইতে মেষাদি পশু আনয়ন করিয়া জমীদারির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ সৎকার্য্য ও দয়ালুতার পরিচয় দিয়াও তিনি উৎপীড়িত জন সাধারণের ঘৃণার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পান নাই। ঘৃণিত কার্য্যের ও পদের এমনই দুর্দ্দমনীয় শক্তি ও বিরক্তি। তাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদগুণই শেষের দিনে লোকে ভুলিয়াছিল। সে সময়ে "ফারমিয়ে" বলিয়াই সকলে তাঁহাকে মনে রাখিয়াছিল।

লাভোয়াসিয়ের জীবন দুই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছিল, প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কার্য্য তিনি কেমন সমীচীনতার সহিত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন! দেশের নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ কার্য্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ রাজসরকারে বারুদের কারখানায় তিনি একসময় অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনিও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করিয়াছিলেন। যদি তিনি অনন্যমনে কেবল বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারিতেন, তাঁহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তিনি রসায়নশাস্ত্রের আরও কতদূর উন্নতি করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে। তবে, তাঁহাকে দারিদ্র্য ভীষণ পীড়নে চমকিত করিয়া তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন তিনি ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজনীতির কূটতর্কের কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানাগারের শান্তিময় নির্জ্জন কক্ষ-বক্ষে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় লইবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহাকে সে শান্তি উপভোগ করিতে দেয় নাই। ওহো! মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তি কি এতই প্রবল! কোন অবস্থাতেই শত্রুর ও নিন্দুকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই রূপেই দশচক্রে ভগবান্ ভূত হন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে লাভোয়াসিয়ে ও সাতাইস জন "ফারমিয়ে জেনারল" রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার অজুহাতে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। লাভোয়াসিয়ে যেসকল অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করা তাহার অন্যতম। যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফ্রান্সে স্নেহ, মায়া, মমতার কোন অধিকার ছিল না, কেহ কাহারও মস্তক ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি! আরও, দেখা যায়, জগতে অসৎ সংসর্গের ফল এইরূপই দাঁড়ায়। তাহাদের পাপের পরিমাণ, সমষ্টিতে এত অধিক হয় যে, সৎকেও আবরিত করিয়া ফেলে। পরে অসতের সহিত সতের আত্মাহুতি হইয়া পাপের আবরণ ধ্বংস হইলে, সতের প্রকৃতর বিমল জ্যোতি আরও সমুজ্জ্বল হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিপ্লবকারিগণ নব্য রসায়নের জন্মদাতা এই পূতাত্মা মহাপুরুষেরও প্রাণদণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। বিচারপতি কফিনলের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার হইতেছিল! সেই সময় তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার মুক্তি ভিক্ষা করিয়া দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বিচারপতিকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পক্ষের উকিল তাঁহার পক্ষ হইতে যে আবেদন পত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তাহাতে লাভোয়াসিয়ে তাঁহার আরব্ধ একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা (প্রাণিদেহের ঘর্ম্ম পরীক্ষা) শেষ করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার পতি কফিনাল ফরাসী রাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি সে সমস্ত আবেদনপত্র ঠেলিয়া রাখিয়া পিশাচের ন্যায় কর্কশ স্বরে বলিয়াছিলেন "ফরাসী সাধারণতন্ত্রে পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিকের কোন প্রয়োজন নাই, ন্যায়ের বিচার হইলেই যথেষ্ট হইল"। তিনি তাঁহার ন্যায় আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, জুরির মন্তব্য পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই মনস্বী ব্যক্তিকে গিলটিন্ নামক বধযন্ত্রে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরদিবস প্রাতে এই আটাইশজন বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। লাভোয়াসিয়ে তাঁহার শ্বশুরের মস্তক কর্ত্তিত হইতে দেখিলেন। তাঁহারা সকলেই এমন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তিমকালে কোন অপমানসূচক বাক্য তাঁহদের কর্ণে প্রবেশলাভ করে নাই। আবার, ভবিতব্যের এমনই বিড়ম্বনা যে, কয়েকমাস পরে, যখন এই বিচারপতি কফিনল রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী জুরীর মন্তব্য না লইয়াই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। ধর্ম্মের আইন বড় কড়া, উহা রাজা বাদসাহের খাতির রাখে না। "Every stroke shall be repaid" দুর্ব্বলের প্রতি যত আঘাত করা যায়, প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আছে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, দুই দিন আগে হয়, পরে হয়, হইবেই। প্রজাদিগের প্রতি উৎপীড়ন ফলে "কারবিয়েদের" প্রাণদণ্ড হইল, আবার কারবিয়েদের প্রতি অবিচার ফলে বিচারপতির প্রাণদণ্ড হইল। সূক্ষ্মগতি ধর্ম্মের কি সুন্দর নিরপেক্ষ ব্যবস্থা!

এইরূপে একান্ন বৎসর বয়সে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা লাভোয়াসিয়ে ঘাতকের হস্তে গিলটিন বধ-যন্ত্রে আত্মবলিদান করিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্ম-বলিদানে সমগ্র পৃথিবী চমকিত হইল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইয়ুরোপের সুধী-সমাজ লজ্জিত, দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী, কাউণ্ট রমফোর্ড নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন।

কর্ম্মই মানুষের নিত্যজীবন—কর্ম্মই মানুষকে অমরত্ব প্রদান করে। অষ্টাবিংশতি ব্যক্তিরপ্রাণদণ্ড হইল বটে কিন্তু একমাত্র লাভোয়াসিয়ে ব্যতীত আর কাহারও স্মৃতি আর ইহজগতে নাই। কিছুদিন পরে রোবেস্পিয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের জনসাধারণও নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পর বৎসর লাভোয়াসিয়ের পুণ্য স্মৃতির সম্মান করিবার জন্য রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাপ্রাণ লাভোয়াসিয়ের নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে, বটে কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্কপ্রসূত কার্য্যাবলীর পুণ্যস্মৃতি আজও বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পূজা করিতেছে। যত দিন পৃথিবীতে "রাসায়নিক সাহিত্য" থাকিবে তত দিন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি থাকিবেই থাকিবে।

পাঠক, পরিশেষে, আমরা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া মহাপুরুষ-চরিত কথনের পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া ধন্য হইলাম এবং সাধক কবির উপদেশ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও এই মহাবাক্য বলিব —

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয় ॥”
“কর্ম্ম জীবনের মন্ত্র
কর্ম্ম সাধনার মন্ত্র
কর্ম্ম বেদ, কর্ম্ম তন্ত্র
পুণ্যতীর্থ কর্ম্মক্ষেত্র,
এ মহা সাধন ক্ষেত্রে
পরাণ সঁপিব ॥”

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

বালচরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অঙ্ক

দামোদরের প্রবেশ

দামো। তাই ত, গোপাঙ্গনারাও দেখছি সর্পরাজ কালিয়কে দেখে আমারই পেছনে পেছনে আসছে। মত্ত চকোর-শাবকের নয়নের ন্যায় কি সুন্দর তাদের নয়ন! কি মনোহর তাদের উন্নত স্তন! কি উজ্জ্বল তাদের অধরোষ্ঠের কান্তি! সকলেই ভীত-চিত্তে ও স্খলিত-পদে অগ্রসর হচ্ছে। না জানি আমার কি হয় এই ভয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছে না, কবরী-শোভন মালাগুলি শিথিল হ'য়ে গেছে; আর তাদের গায়ের ওড়নাও এলোথেলো হয়ে খসে পড়ছে।

গোপবালাগণের প্রবেশ

সকলে। প্রভু, প্রভু, এই যমুনা-হ্রদে যাবেন না, যাবেন না। এখানে বড় বড় সাপ আছে!

দামো। তোমরা বিষণ্ণ হ'য়ো না, চেয়ে দেখ আমি কি করি।

তোমরা সকলেই শঙ্কিত হ'য়ে কোমল-মধুর ও প্রিয় বাক্যে আমাকে বারণ কচ্ছ, কিন্তু যে যমুনা-হ্রদ গভীর, সিন্ধুনীর ও সাগর তুল্য, যেখানে একটি পক্ষী উড়ে না, যাহা উরগকুলের আবাস, দূর থেকে যার জল দেখেই করীসমূহ ভীত হ'য়ে পলায়ন করে, আমি সেই জলাশয়ে প্রবেশ করে সলিল-রাশি বিক্ষোভিত করব, আর কালিন্দী-বাসানুরাগী মহাবল কালিয় নাগকে ধর্ষণ করব।

সকলে। প্রভু সঙ্কর্ষণ, প্রভু দামোদরকে নিবারণ করুন, নিবারণ করুন।

সঙ্কর্ষণের প্রবেশ

সঙ্ক। দামোদরের প্রতি তোমাদের অসীম অনুরাগ, তাই তোমরা ভীত ও বিষণ্ণ হচ্ছ; কিন্তু চেয়ে দেখ—

যার মুখনির্গত, অমঙ্গলকর বিষানল-শিখা দ্বারা সমগ্র চক্রবাল কপিশ বর্ণ ধারণ করেছে সেই প্রচণ্ড কালিয় নাগও শঙ্কিত হ'য়ে প্রবল-বেগে ধাবমান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে চক্রচিহ্নিত স্বীয় মস্তক আনত কচ্ছে।

সকলে। একি! প্রভু দামোদরও (?) যে দেখছি সে রকমের!

দামো। লোকহিতের জন্য এই নাগকে শীঘ্রই বশীভূত কত্তে হবে। [হ্রদে প্রবেশ।

সকলে। হায়! হায়! ধূম উঠলো যে!

দামো। অহো! হ্রদটি কি গম্ভীর!

কালিয় নাগের বিষ-ধূমে যমুনা এখন কৃষ্ণ-লোহিত ও বিষাগ্নি-পূর্ণ হ'য়ে আছে; আমি ইহার জলরাশিকে কুঞ্চিত কৃষ্ণ পট্টবাসের মত, আর তরঙ্গগুলিকে গলিত ইন্দ্রনীলের মত করে দেব।

[প্রস্থান।

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ গোপালক। হা প্রভু, গোপকন্যাদের এত বারণ সত্বেও তুমি যমুনা-হ্রদে প্রবেশ কল্লে! এত দুঃসাহস করে। না প্রভু। ব্যাঘ্র, বরাহ এবং হস্তী প্রভৃতি জন্তুগণ এ হ্রদের জল পান করা মাত্রই হ্রদের তীরে পড়ে মরে যায়, এও কি তুমি জান না, প্রভু? এখন কি করি? যাই

কুরুপলাশ গাছটায় আরোহণ করে দেখি প্রভু কি করেন। হায়! হায়! ধূম উঠলো যে!

সঙ্কর্ষণ। ওগো, ঘোষ-সুন্দরীরা, ঐ দেখ ঐ দেখ—

দামোদর নাগটাকে ধরে যমুনা-হ্রদের সমগ্র সলিল তলদেশ পর্য্যন্ত বিক্ষোভিত করে তার বিস্তীর্ণ নীল ফণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাল মেঘে ইন্দ্রকে যেমন সুন্দর দেখায় দামোদরকেও তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছে।

বৃদ্ধ গোপালক। হাঁ—হাঁ; ধন্য প্রভু! ধন্য!

কালিয়কে লইয়া দামোদরের প্রবেশ

দামোদর। বেশ যুদ্ধ করেছে কালিয়। এখন আমি তাকে দমন করে তার বিষ-পরিব্যাপ্ত ফণার উপর দাঁড়িয়ে লীলাভরে রাসকেলি করব। এই মহানাগের বিপুল ফণা আমার এক পায়ের শোভা বর্দ্ধন করবে, আর আমার এক বাহু চঞ্চল ভাবে হেলে দুলে পতাকা হবে।

সকলে। আশ্চর্য্য! প্রভু, আশ্চর্য্য! কালিয়-নাগের পাঁচটা ফণার উপরে দাঁড়িয়েই প্রভু দামোদর রাসকেলি কচ্ছেন।

দামো। আচ্ছা, আমিও এই সুযোগে ফুল তুলে নেই না কেন?

কালিয়। সুবিস্তৃত ভুবন যেরূপ লোকালোক পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত, মহাদেবের ধনুর্গুণ রূপে ব্যবহৃত বাসুকী যে রূপ মহাসমুদ্রে মন্দর পর্ব্বতকে বেষ্টন করেছিল, ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের শুণ্ডের ন্যায় সুবলিত ও সুদৃঢ় আমার এই দেহ দ্বারা সেইরূপে বেষ্টন করে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমিও তোমাকে ত্রিদশাধিবাসে প্রেরণ করব।

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! প্রভু, দেখুন! দেখুন! যমুনা-হ্রদ যেন মহানাগের আকার ধারণ করে উত্থিত হয়েছে, আর প্রভু দামোদর কুসুম-চরণ-পাতে তার মস্তক দলিত করে পুষ্প চয়ন কচ্ছে। ধন্য প্রভু, ধন্য। নাচ, নাচ; আস্ফালন কর আমিও তোমার সহায় হব। কিন্তু প্রভু আমার যে বড় ভয় হচ্ছে! যাই, সমস্ত ব্যাপার নন্দগোপকে জানাই গিয়ে।

[প্রস্থান।

দামোদর। যে পাপিষ্ঠ কালিয় তেজোগর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে দৃঢ়ভাবে শ্বাস ত্যাগ কচ্ছে, যার ফণাসমূহ সুনিস্থিত, এবং যে দুষ্ট সর্প যমুনাহ্রদবাসী মীন-মকরদিগকে বিধ্বস্ত করেছে, বল-প্রয়োগ করে আমি এখনই সেই সর্পাধমকে যমুনা হ'তে স্থলভাগে নিক্ষেপ করব।

কালিয়। রোষ-বশে আমার দেহ হ'তে যে বিষ-ধূম উত্থিত হচ্ছে, সেই ধূমই সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ কর্ত্তে সমর্থ; আমি এখন বিষাগ্নি-শিখা দ্বারা তোমাকে ভস্ম করব। মরুদ্গণ ও লোকপালগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

দামো। কালিয়, যদি তোমার শক্তি থাকে তা' হ'লে আমার একটিমাত্র বাহুকে দগ্ধ কর দেখি।

কালিয়। হা! হা! হা! সপ্ত কুল-পর্ব্বত-সমন্বিত চতুঃ-সাগরান্তা সমগ্র মেদিনীকে দগ্ধ করব, তোমার একটি ভুজ ত অতি তুচ্ছ। একটু স্থির হও এখনই তোমাকে ভস্ম কচ্ছি। (বিষাগ্নি উদ্গীরণ)

দামো। বেশ! তোমার যা শক্তি ছিল তা,ত দেখালে!

কালিয়। ভগবান নারায়ণ, প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন।

দামো। কালিয়, এই শক্তি নিয়েই তোমার এত গর্ব্ব!

কালিয়। ভগবান, প্রসন্ন হ'ন।

হে সুরেশ, আপনি শক্তি-বলে গোবর্দ্ধন ধারণ কর্ত্তে পারেন, আপনার বাহু মন্দর তুল্য সারবান। যে বাহুকে ত্রিভুবনের সমগ্র লোক আশ্রয় করে রয়েছে সেই সুবার্য্য বাহুকে দগ্ধ করার শক্তি আমি কোথায় পাইব?

ভগবান, অজ্ঞানতাবশতঃ আমি আপনার গৌরব লঙ্ঘন করেছি, এখন সপরিবারে আপনার শরণ নিলেম।

দামো। কালিয়, তুমি এই যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করেছিলে কেন?

কালিয়। ভগবান, আপনার বিশিষ্ট বাহন গরুড়ের ভয়ে আমি যমুনায় প্রবেশ করেছি। এখন প্রসন্ন হ'য়ে শরণাগতকে গরুড় হ'তে অভয় দান করুন।

দামো। আচ্ছা কালিয়, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

তোমার শিরে আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত হ'য়েছে। গরুড় এই চিহ্ন দেখে তোমাকে অভয় দান করবে।

কালিয়। প্রভু, অনুগৃহীত হলেম।

দামো। এখন যমুনায় যাও।

কালিয়। যে আজ্ঞা, ভগবান নারায়ণ।

দামো। আচ্ছা, কালিয়, একবার এদিকে এস ত।

কালিয়। ভগবান, শরণাগত উপস্থিত।

দামো। আজ থেকে গো-ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাবর্গের যাতে আর প্রমাদ না ঘটে তাই কত্তে হবে।

কালিয়। ভগবান, এই যমুনার জল আমার বিষে দূষিত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত বিষ সংহরণ করে আমি এখনই এই যমুনা পরিত্যাগ করে চলে যাব।

দামো। বেশ, তা, হ'লে তুমি চলে যাও।

কালিয়। যে আজ্ঞা, ভগবান নারায়ণ।

[পরিজনের সহিত প্রস্থান।

দামো। যাই, আমিও যমুনা-হ্রদ হ'তে যে সকল পুষ্প চয়ন করেছি সেগুলি গোপকুমারীদিগকে দেই গিয়ে।

সকলে। এই যে! প্রভু আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার ক'রে অক্ষত শরীরে এদিক পানেই আসছে। প্রভুর জয়।

সঙ্ক। বড় সৌভাগ্য, তোমা হতে গো-ব্রাহ্মণাদির হিত সম্পন্ন হল।

দামো। তোমরা সকলে এই ফুলগুলি গ্রহণ কর।

সকলে। প্রভু, এই ফুল চয়ন করা দূরে থাক পূর্ব্বে কেহ কখনও স্পর্শ কত্তেও পারে নি; এমনকি এই সকল পুষ্প চন্দ্রাদিত্য-কিরণেও মর্দ্দিত হয় নি। নিতে আমাদের ভয় হয়, প্রভু।

দামো। নিরীহ গোপাঙ্গনাগণ পূর্ব্বে ভয়ের বিশিষ্ট কারণ দেখেছে বলে এখনও ত্রাসিত হচ্ছে। সুন্দরীগণ, আর ভয় নাই। আমার করস্পর্শে সমস্ত দোষ কেটে গিয়েছে—নির্ভয়ে গ্রহণ কর।

সকলে। যে আজ্ঞা, প্রভু।

ভটের প্রবেশ

ভট। ওহে গোপালক, নন্দগোপের পুত্র গেল কোথায়?

গোপালক। কালিয় মহানাগকে দমন করে প্রভু গোপকন্যা পরিবৃত হ'য়ে এখানেই আছেন।

ভট। (অগ্রসর হইয়া) নন্দগোপ-পুত্র, অনুগতার্থ নামক মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র রাজা কংস তোমাকে আদেশ করেছেন--

দামো। কি আদেশ করেছে, বল।

ভট। মথুরায় ধনুর্মহ মহোৎসব হবে। সেই মহোৎসবে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য পরিজনের সঙ্গে তোমাকে যেতে আদেশ করেছেন।

দামো। (সঙ্কর্ষণের প্রতি) আর্য্য, এ যে দেবচক্রের কাল উপস্থিত হল দেখছি।

সঙ্ক। চল শীঘ্রই আমরা সেখানে যাই।

দামো। হাঁ, সর্ব্বাগ্রে ইহাই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকৃত অহঙ্কারের জন্য পশুরাজ যেরূপ হস্তীকে বিনাশ করে, আমিও সেরূপ অদ্য কংসকে পীড়ন করে বিনাশ করব। তার রত্ন-মুকুট মস্তকচ্যুত হবে, কেশজাল ছড়িয়ে পড়বে, গলার হার, কেয়ূর ও লম্বসূত্র ছিন্নভিন্ন হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

রাজার প্রবেশ

রাজা। বিপুল-বিক্রম, মহাবীর্য্যবান দামোদর বলরামের সঙ্গে ব্রজধামে বাস কচ্ছে। দামোদরকে এখানে এনে মল্লগণের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে নিযুক্ত করে কার্ম্মুক সাহায্যে আজ আমি বধ করব।

ধ্রুবসেন, ধ্রুবসেন।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয়।

রাজা। শুনলেন, নন্দগোপ-পুত্র এসেছে ?

ভট। মহারাজ, সমস্ত নিবেদন কচ্ছি, শুনুন। গোপজন দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে সঙ্কর্ষণের সঙ্গে দামোদর মথুরায় এসেই এক রজকের বাড়ী থেকে অনেক পোষাক-পরিচ্ছদ জোর করে কেড়ে নেয়। এই সংবাদ শুনে মন্ত্রী (মহামাত্র) মশায় তাকে বধ করার জন্য উৎপলাপীড় নামক গন্ধ হস্তী প্রেরণ করেন। সেই ভীষণ হস্তীও দামোদরকে ভীষণবেগে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বালক দামোদর সহসা সমবেত গোপগণের মধ্যে একটা ভীষণ হস্তী তাকে আক্রমণ কচ্ছে দেখে সবলে পর্ব্বতকায় সেই গজেন্দ্রের দাঁত ধরে তখনই তাকে বিনাশ কল্লে !

রাজা। কি ! হাতীটাকেই বধ কল্লে ! আবার গিয়ে সব কথা জেনে আস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

মহারাজের জয়।

মহারাজ, উৎসবোপলক্ষে রাজমহাপথ ধ্বজপতাকা ও মালা দ্বারা শোভিত এবং অগুরু-ধূপে সুবাসিত করা হয়েছে। নন্দগোপের পুত্র সেই মহাপথ দিয়ে বরাবর এসে পথ-পার্শ্ববর্ত্তী রাজ-গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হ'ল। তখন গন্ধ-পেটিকা হস্তে কুঁজী মদনিকা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল; শ্রীকৃষ্ণ অমনি তার পেটিকা থেকে চন্দন গ্রহণ করে নিজের গায়ে মাখতে লাগল; পরে—শুনে আশ্চর্য্য হবেন,মহারাজ—নিজের হাতখানি কুঁজীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে তখনই তার কুঁজ দূর করে দিল। তারপরে মালাকারের দোকান থেকে মালা নিয়ে গলায় পরে আয়ুধাগারের দিকে চলে গেল।

রাজা। যাও, যাও, শীঘ্র যাও, আরো না জানি কি কাণ্ড করেছে, শীঘ্র গিয়ে জেনে আস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

মহারাজের জয়। নন্দগোপ-পুত্র প্রথম যখন আয়ুধাগারে প্রবেশ কত্তে উদ্যত হ'য়েছিল তখন রক্ষক সিংহবল তাকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সেই বাধায় কোন ফল হয় নি, কারণ সিংহবল নন্দ-নন্দন কর্ত্তৃক কর্ণমূলে আহত হয়ে তখনই প্রাণত্যাগ করে। তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে নন্দসুত আয়ুধাগার হ'তে একটি ধনু এনে তাহা দ্বারা রক্ষককে দ্বিখণ্ড করে সভাগৃহাভিমুখে প্রস্থান করেছে।

মহারাজ, নন্দ-নন্দনের বেশ বড়ই বিচিত্র। তার গলায় মালা, মাথায় শিখি-পুচ্ছ, অঙ্গে বিবিধ ভূষণ ও পরিধানে পীত বসন; তার দেহকান্তি জলভরা মেঘের ন্যায়। তার রোষ-পরিবৃত্ত বিশাল নেত্র দেখে মনে হয় যেন বলরামের সঙ্গে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় নন্দসুত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয় যেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যাও, পূর্ব্বে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তদনুসারে চাণুর ও মুষ্টিককে নিয়ে এস, আর বৃষ্ণি-কুমারগণকে যুদ্ধ-সজ্জা কত্তে বল।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। যাই আমিও প্রাসাদশিখরে আরোহণ করে চাণুর ও মুষ্টিকের সঙ্গে নন্দ-সুতের মল্ল যুদ্ধ দেখি গে।

(প্রাসাদ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া) মধুরিকা, দরজা খুলে দাও।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা, প্রভু।

[রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

চাণুর ও মুষ্টিকের প্রবেশ

চাণুর। আজ যুদ্ধ-সজ্জা করে এসেছি, বলদৃপ্ত মত্ত হস্তীর ন্যায় রঙ্গভূমিতে বালক দামোদরকে দ্বিখণ্ড করব।

মুষ্টিক। আমার নাম রুষ্ট মুষ্টিক। আমার হাতের মুষ্টি

লোহার ন্যায়। বজ্র যেরূপ গিরিশৃঙ্গ নিপাতিত করে আমিও আজ সেরূপ বলরামকে নিপাতিত করব।

ভট। এই যে মহারাজ! তোমরা এদিকে এস।

উভয়ে। (অগ্রসর হইয়া) প্রভুর জয়।

রাজা। চাণুর, মুষ্টিক, প্রাণপণে চেষ্টা করে আজ আমার ঋণ শোধ কত্তে হবে।

উভয়ে। মহারাজ, বল্‌ছি শুনুন—করণ-সন্ধা-বন্ধ প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করে নিশ্চয়ই কার্য্য সফল করব। আপনি দেখ্‌তে থাকুন।

রাজা। হাঁ, তাই করবে। ধ্রুবসেন, গোপের ছেলে দুটোকে এ বেলা নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

ধ্রুবসেনের সহিত দামোদর ও সঙ্কর্ষণের প্রবেশ

দামো। আর্য্য, জন্মান্তরে অসুর-দেহধারী পাপিষ্ঠ কংসকে যদি যুদ্ধে আজ নিপাতিত করে পরিকর্ষণ কত্তে না পারি তবে মর্ত্ত্যে আমার জন্ম বিফল মনে করব; আর ঘোষ-পল্লীতে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করেছি আজ এই নগরে সেগুলি আমার সন্তোষ বিধান কত্তে পারবে না।

সঙ্কর্ষণ। আজ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে লোহার ন্যায় দৃঢ়-মুষ্টি রুষ্ট মুষ্টিককে মুষ্ট্যাঘাতে বধ করব, এবং বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে লম্বিত মেঘমালার ন্যায় অন্তরীক্ষে বিচরণ করব।

ভট। এই যে মহারাজ,—তোমরা এদিকে এস।

উভয়ে। এঃ! কার মহারাজ?

ভট। সকল জগতের মহারাজ; আর আমাদের মহারাজ।

দামো। কিন্তু, আজ থেকে আর জগতের মহারাজ থাকবে না।

ভট। মহারাজের জয়। এরাই সেই দুই ভাই।

রাজা। (দেখিয়া) এই সেই দামোদর! অহো, কি সুন্দর আকৃতি! মদমত্ত গজের ন্যায় কেমন ধীর-বিলাস-গমন-ভঙ্গী! ইহার বর্ণ শ্যাম, স্কন্ধ ও বাহু দৃঢ়, বক্ষ স্থূল ও প্রশস্ত। পূর্ব্বে ইহার কার্য্যাবলী শুনেছি মাত্র—কিন্তু এখন দেখছি এই বালক সত্যই লোকত্রয়ের পরিবর্ত্তন বিধান কত্তে সমর্থ।

আর পূর্ব্বে মাত্র যার নাম শুনেছি—ললিতগম্ভীরাকৃতি এইটিই ইহার অগ্রজ বলরাম।

ইহার মূর্ত্তিও শশীর ন্যায় সুন্দর; চক্ষু নবীন কমলের ন্যায় আয়ত, পরিধানে উদার নীলবসন, বাহু রজত পরিঘের ন্যায় সুগোল ও দীর্ঘ এবং গলদেশে শ্বেতোৎপল-দলের মালা—বিচিত্র ও চঞ্চল।

দামো। আর্য্য, এরা দুজনই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সঙ্ক। হাঁ, তাই হবে।

রাজা। ধ্রুবসেন, যুদ্ধ আরম্ভ করে দাও

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(মালা নিক্ষেপ)

মল্লগণ। অঙ্গ, যুদ্ধপটহ বাজাও।

চাণুর। দামোদর এস, আজ আমার দুই বাহু দ্বারা তোমার জীবন শেষ করব।

দামো। এই যে আমি এসেছি, আমার গতি-রোধ কর দেখি।

মুষ্টিক। ওহে রাম, আজ আমার মুষ্টি প্রহারে তোমার নিষ্পেষিত দেহ হ'তে রুধির ও মজ্জা বিগলিত হবে।

সঙ্ক। হে মুষ্টিক, আজ তোমাকে যমের নিকট নিবেদন করব।

(সকলের যুদ্ধ)

দামো। (চাণুরকে বধ করিয়া) দুষ্ট তথাপি হ'য়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেছে।

সঙ্ক। আমিও দুষ্টকে বধ করেছি।

দামো। এখন কংসাসুরকে যমালয়ে প্রেরণ কত্তে হবে।

(প্রাসাদে আরোহণ করিয়া কংসের কেশাকর্ষণ ও ভূতলে নিক্ষেপ)

দুরাত্মা কংসের এখন এই দশা! দুষ্টের লোহিত বদন বিস্তীর্ণ, চক্ষু-তারকা পরিবৃত্ত, স্কন্ধ, কণ্ঠ, কটি, জানু, কর, উরু, ও জঙ্ঘা ভগ্ন, হার ছিন্ন, কেয়ূর ও লম্বসূত্র ভূপতিত। বজ্রভগ্ন-শিখর পর্ব্বতের ন্যায় দুষ্ট অসুর এখন-ধরাশায়ী।

নেপথ্যে

হায়, মহারাজ! হায়, মহারাজ!

পুনরায় নেপথ্যে

ওহে বৃষ্ণিযোধগণ, ওহে অনাবৃষ্টি, শিবে, হৃদিক, পৃথুক, সোমদত্ত, অক্রূর প্রভৃতি যোদ্ধাগণ, প্রভুর ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমরা সত্বর এস।

দামো। আর্য্য, সৈন্যগণকে নিবারণ করুন।

সঙ্ক। এই আমি বাধা দিচ্ছি—

যোদ্ধাগণ ভীমনাদে বিচরণ কচ্ছে, তুরঙ্গ, হস্তী ও রথসমূহ সবেগে অগ্রসর হচ্ছে, খড়্গা, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সকলের অত্যুজ্জ্বল কিরণ-ছটায় চক্ষু ঝলসে যাচ্ছে—পবন-বেগ-বিকীর্ণ ফেনজাল ও ঊর্ম্মিসঙ্কুল বিপুল সাগরের ন্যায় এই সৈন্য-শ্রেণীকে আমি বাহু-বলেই বিক্ষোভিত করব।

বসুদেবের প্রবেশ

বসু। ওহে মথুরাবাসিগণ, এ অসম সাহস নিষ্ফল। তোমরা কি জান না যে, এই জ্যেষ্ঠ বালক রোহিণীর গর্ভজাত কিন্তু আমারই পুত্র, আর এইটি দেবকী-নন্দন। আক্রোশ পরিত্যাগ কর, এক্ষেত্রে অস্ত্র-প্রয়োগ করেও ফল নাই, কারণ কংস বিনাশের জন্য বিষ্ণু স্বয়ং এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সঙ্ক। (দেখিয়া) পিতঃ, পিতঃ, সঙ্কর্ষণ আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দামো। তাত, দামোদর আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

বসু। তোমরা অক্ষয়বিজয়ী হও। আজ আমি সৎপুত্র লাভের ফল পেলুম।

উভয়ে। আমরা অনুগৃহীত হলেম।

বসু। কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। আর্য্যপুত্রের জয়।

বসু। শবগুলি সরিয়ে ফেল।

ভট। যে আজ্ঞা, আর্য্যপুত্র।

গোপালকগণ। হী হী—এখন এই রাজ্য গোপালক-গণের হল।

বসু। কে আছ এখানে?

ভট। আর্য্যপুত্রের জয়।

বসু। যাও, দামোদরের আদেশ ক্রমে অনাবৃষ্টিকে বল উগ্রসেনকে শৃঙ্খল মুক্ত করে ও স্নান করিয়ে শীঘ্র নিয়ে আসুক।

ভট। যে আজ্ঞা, আর্য্যপুত্র।

[প্রস্থান।

বসু। একি! দেবতূর্য্য সকল নিনাদিত হচ্ছে, পুষ্প-বৃষ্টি হচ্ছে—আর প্রায় সকল দেবতাই কংস-সূদনের পূজার জন্য সমাগত হয়েছে।

নেপথ্যে

চিচিত্র কনক-খচিত-হর্ম্যমালা-শোভিত, এবং সুবিস্তীর্ণ রাজভবন আপণ-শ্রেণী ও পুরদ্বার সমন্বিত এই মথুরাপুরীকে কমলায়তাক্ষ, ত্রৈলোক্য-বিজয়ী, সুর-শ্রেষ্ঠ শ্রীমান ত্রিদশেন্দ্রাধিপতি পালন করুন।

বসু। ওহে মথুরাবাসী জনগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর—দৈত্যেন্দ্র-পুরের অর্গলোৎপাটনে সমর্থ, সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরাভব-বিধানক্ষম বসুদেব-পুত্র বাসুদেবের প্রসাদে উগ্রসেন পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত

হলেন; এবং তোমরা সকলে এখন তাঁহারই শাসনকাল বলিয়া জানিবে।

সকলে। তা'হ'লে এখন বৃষ্ণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল।

বসু। মহারাণকে সংবাদ দাও।

ভট। যে আজ্ঞা, আর্য্যপুত্র।

[প্রস্থান।

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্র। বিষ্ণুর অনুগ্রহে যেরূপ শতক্রতুর ক্লেশ দূর হয়েছিল সেইরূপ কেশিসূদনের প্রসাদে আমার চির কারাবাস-ক্লেশ দূর হল।

ভগবানের প্রসাদে ব্যসনার্ণব হতে উত্তীর্ণ হলুম।

নারদের প্রবেশ

নারদ। কংসাসুর নিহত হয়েছে তাই দেবগণের আদেশ ক্রমে বিষ্ণুর পূজা করবার জন্য দেবলোক থেকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের সঙ্গে এখানে এসেছি।

দামো। এ যে দেবর্ষি নারদ! দেবর্ষি, আসুন, আসুন। এই অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণ করুন।

নারদ। সমস্তই গ্রহণ ক'চ্ছি। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ গান ক'চ্ছে।

নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার; দেবগণও তোমাকে নমস্কার ক'চ্ছে। আর এই অসুর-নাশে সমগ্র মহী নিরাপদ হ'ল।

দামো। দেবর্ষি, আমি তুষ্ট হলুম। আমি আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য কত্তে পারি!

নারদ। যদি বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তা'হ'লেই আমার সকল শ্রম সার্থক। দেবগণের সহিত আমি এখন দেবলোকে ফিরে যাচ্ছি।

দামো। আচ্ছা আসুন, আবার যেন দেখা পাই।

নারদ। যে আজ্ঞা, ভগবান নারায়ণ।

[প্রস্থান।

(ভরতবাক্য)

যে মহী আসাগরবিস্তৃত, বিন্ধ্যপর্ব্বত যার কুন্তল স্বরূপ আমাদের রাজাসিংহ একচ্ছত্র অধিপতি রূপে সেই মহীমণ্ডলকে শাসন করুন।

শিবমস্তু

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

অমর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কথা বঙ্গবাসী অবিদিত নহেন। বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের সহিত তাঁহার নাম সুবর্ণসূত্রে জড়িত রহিয়াছে। চণ্ডীভক্ত বাঙ্গালী ভক্তিবিগলিত চিত্তে অগ্রে সেই অমর কবির উদ্দেশে প্রণতঃ না হইয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করেন না। কাব্যে জাতীয় চরিত্রের বিকাশ হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য তৎকালীন বঙ্গ সমাজের একখানা নিখুঁত চিত্র। প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর ভূমি হইতে অতিকষ্টে ইতিহাসের অনেক রত্ন উদ্ধার হইয়াছে। আমরা চেষ্টা করিলে চণ্ডীকাব্যের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হইব। কবি সমাজের লোক; তাঁহার নিকট সমাজের আচার ব্যবহার জানিতে পারিব ইহা আমাদের দুরাশা নহে। আর একটি সুখের বিষয়, মুকুন্দরাম দরিদ্র লোক; এজন্য সমাজের সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁহার মেশামিশি ছিল। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট দরিদ্র বাংলা পল্লীর সাধারণের অবস্থা জানিতে পারিব। যিনি লক্ষ্মীর ক্রোড়ে বসিয়া বীণাপাণির সেবা করেন তাঁহার কাব্যে অসার বীর্য্যৈশ্বর্য্যের বর্ণনা স্থান পাইয়া থাকে। এমন কবির নিকট ব্যাধ-পরিবারের চিত্র পাওয়া অসম্ভব। দরিদ্র মুকুন্দরাম ব্যাধগৃহে গিয়া তাহাদের অভাব স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ব্যাধ নিতম্বিনীগণ যখন বাসি মাংসের পসরা লইয়া পল্লীতে বাহির হইয়াছে, নিরীহ কবি তখন পিছু

পিছু পিছু গিয়া তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। ছাগ-রক্ষিণী খুল্লনার দুঃখে কবি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছেন। সহানুভূতিশীল কবি এজন্য খুল্লনা-চরিত্র বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। পল্লীবাসী দরিদ্র কবির নিকট এই চিত্র সুলভ। পল্লীগ্রামের পট-চিত্রকরের নিকট হরগৌরী বিবাহের পট পাইব কিন্তু নাগরিক কোন আলোকচিত্রব্যবসায়ীর নিকট উহা পাইব না। কবি যে আবেষ্টনের মধ্যে বাস করেন তাহার ভাব কাব্যে সংক্রামিত হয়। যাহা হউক আমরা কবিবরের আবির্ভাব কাল আলোচনা করিয়া তাঁহার সময়ের সমাজচিত্র দর্শন করিব।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের জন্ম। কবিকঙ্কন ইঁহার কাব্যশাস্ত্রের উপাধি। সেলিমাবাদে গোপীনাথ নিয়োগী মহাশয়ের তালুকান্তর্গত মুকুন্দরামের একখণ্ড পৈত্রিক বাস্তুভূমি ছিল। সে সময় দেশ মুসলমানের অধীন। সম্রাটগণ দিল্লীর সুরম্য হর্ম্ম্যে মনানন্দে সময় কাটাইতেন। বঙ্গবাসীর দুঃখের আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিত না। বিশেষতঃ এই কালে হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত অভাব ছিল। গুরুতর করভারে প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইত। সম্রাটের উদ্দেশ্য অনেক সময় ভাল হইলেও অর্থগৃধ্নু রাজকর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রজার সুখশান্তি তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। সম্রাটগণ সমস্ত রাজ্য জরিপ করিয়া উহার জমাবন্দী করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, প্রজারা নিজ নিজ দেয় কর জানিতে পারিলে নীচমনা রাজভৃত্যগণের অত্যাচারপথ রুদ্ধ হইবে। কিন্তু সদুদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হইত না। মুকুন্দরাম স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাই শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় প্রতিদিন।
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।

বর্ণনার শেষ চরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় সেকালে টাকার খুব অভাব ছিল। এ সময় রাজভৃত্যগণ অত্যাচারের অবতার ছিল। আমাদের নিরীহ কবির সুখশান্তি এক নীচমনার ক্রোধবহ্নিতে পুড়িয়া গিয়াছিল। সে ডিহিদার মামুদ সরিফ মুকুন্দরাম মামুদ সরিফের অত্যাচারে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া পৈতৃক বাস্তুভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামে পলায়ন করেন। এই পলায়ন সময়ে মুকুন্দরাম একক ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গে স্ত্রীপুত্রাদি সহ একটি ক্ষুদ্র পরিবার ছিল। কপর্দ্দকহীন পলায়নপর পথিকের বিপদের কথা চিন্তা করিলে কা'র না হৃদয় ব্যথিত হয়! পলায়ন-পথে দুঃখহারিণী চণ্ডী মুকুন্দরামকে চণ্ডীকাব্য লিখিতে আদেশ করেন। কবি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল আড়রার ভূস্বামী বীরমাধবের পুত্র রাজা রঘুনাথের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির ভনিতায় কবি লিখিয়াছেন—

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ উহাতে যোগ করিয়া গ্রন্থপ্রচার হইত, ইহা প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিশেষ লক্ষণ। কবির ভনিতাদৃষ্টে বুঝা যায়, রাজা মানসিংহের শাসন সময়ে তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয়। মানসিংহের বঙ্গশাসনকাল ১৫৮৯ খৃঃ—১৬০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত। কবি তাঁহার গ্রন্থপ্রচার জন্য চণ্ডীর আদেশ প্রাপ্তির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,

শকে রসরসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥

রস—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি ৯ ; বেদ—৪ ; শশাঙ্ক —১। অঙ্কের বামাগতি নিবন্ধন ১৪৯৯ শকাব্দ। সুতরাং বুঝা যায় ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবি দামুন্যা ত্যাগ করেন। এই পলায়নের অনুমান ১২।১৩ বৎসর পর, অর্থাৎ ১৫৮৯ কি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের শাসনকালে কাব্য প্রচারিত হয়। কেহ কেহ রস শব্দে কটু তিক্তা দি ছয় রস ধরিয়া উক্ত শ্লোক হইতে ১৪৬৬ শকাব্দ বিজ্ঞাপিত হইতেছে ব্যাখ্যা করেন। এই মতানুসারে গ্রন্থপ্রচারকালে বঙ্গে মানসিংহের শাসনকর্তৃত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রথম প্রকার মতের অনুকূলে আরও যুক্তি এই যে, কবি মুকুন্দরাম রাজা রঘুনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য লিখেন; সেই রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩—১৬০৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং রঘুনাথের সময়ে গ্রন্থ রচিত হইলে তখন বঙ্গে মানসিংহের শাসন কাল ছিল এ বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা মোটামুটি দেখি যে, কবিকঙ্কন-চণ্ডী যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল। তখন মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। পাঠানগৌরবরবির অস্তগমনের পর আকবরের সময় হিন্দুর ভাগ্যাকাশে ক্ষণেকের জন্য সুখতারা উদিত হইয়াছিল।

শাক্ত ও বৈষ্ণব

যে বঙ্গদেশ চৈতন্য প্রভুর প্রেম বন্যায় ডুবুডুবু, সেই বঙ্গে প্রভুর প্রস্থানের পর অনতিবিলম্বে কেন শক্তিপূজার প্রচার হইল তাহা চিন্তার বিষয়। আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রভুর তিরোভাবের পর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাঁহারা মুখপাত্র ছিলেন তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুর সময় সমাজের একদল লোক নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মমত রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিল। যখন বৈষ্ণবের সর্ব্বতঃপ্রসারী প্রেমস্রোত রুদ্ধ হইল তখন সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। ফলকথা বৈষ্ণবের মধ্যে নৈতিক চরিত্রবান নায়কের অভাব হওয়াতে শাক্ত বৈষ্ণবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে শাক্তগণের জয় হইতে লাগিল। শাক্তগণ হরিসংকীর্ত্তনের পার্শ্বেই শ্রীমন্তের মশানের গান গাইতে আরম্ভ করিল। সময় বুঝিয়া অনেক কবি চণ্ডীগানের জয়পতাকা হস্তে আসরে নামিলেন। তন্মধ্যে কবিকঙ্কনের পতাকাই সকলের শীর্ষে স্থান পাইয়াছিল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে

গ্রন্থ পরিচয়

পৌরাণিক দেবতাগণের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে কালকেতু ব্যাধের বিবরণ। ঘটনাটি এই যে, একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর পিতার জন্য শিবপূজার ফুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার আহৃত পুষ্প হইতে একটি কীট বাহির হইয়া শিবের ললাটদেশে দংশন করে। এই অপরাধে শিব নীলাম্বরকে মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপ দেন। নীলাম্বর কালকেতু ব্যধ, এবং তৎপত্নী ছায়া ফুল্লরা রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত কালকেতু ব্যাধের অত্যাচারে বনের পশু অস্থির হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়। দেবী প্রথমে সুবর্ণ-গোধিকা রূপে কালকেতুকে দেখা দেন ও পরে স্বরূপ প্রদর্শন করেন। কালকেতু দেবীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করিলে দেবীর বরে তাহার দারিদ্র্য ঘুচিল। কিছুদিন পর ভাড়ুদত্ত নামক এক ভণ্ডের প্ররোচনায় কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত ও বন্দী হইল। বন্দী কালকেতু কারাগারে দেবীর স্তব পাঠ করে। দেবী কালকেতুর স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহার মুক্তির জন্য কলিঙ্গাধিপতির প্রতি আদেশ করেন। কালকেতু মুক্ত হইল। যুদ্ধে মৃত সৈন্যগণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। কলিঙ্গরাজ দেবীর মাহাত্ম্য দেখিয়া নিজে চণ্ডীপূজা গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীপূজার প্রচার হইল। এই সময় কালকেতু ও ফুল্লরা শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

তৃতীয় ভাগে ধনপতি সওদাগরের বিবরণ—স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা তালভঙ্গ-দোষে মর্ত্ত্যে লক্ষপতি সওদাগরের গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁহার নাম খুল্লনা রাখেন। একদিন উজানী নগরের ধনপতি সওদাগর পারাবত ক্রীড়ার সময় ঘটনাক্রমে খুল্লনার রূপরাশি দর্শন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করেন। এই অভিলাষ পূরণের জন্য ধনপতি প্রথম পত্নী লহনাকে অনেক স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। লহনা অগত্যা পতির পত্ন্যন্তর গ্রহণে অনুমতি দিলেন। ধনপতি সওদাগর খুল্লনাকে বিবাহ করিবার অনতিকাল পরেই রাজাদেশে গৌড়ে গমন করিলেন। সওদাগর সপত্নী লহনার উপর খুল্লনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গেলেন। লহনা প্রথম প্রথম খুল্লনাকে খুব ভাল বাসিতেন কিন্তু শেষে দুর্ব্বলা দাসীর মন্ত্রনায় খুল্লনাকে বিপদে ফেলিলেন। দুর্ব্বলা দাসীর পরামর্শে লহনা এক জাল পত্র দেখাইয়া খুল্লনাকে বলে যে, তুমি অদ্য হইতে খুঞাবস্ত্র পরিয়া বনে বনে ছাগ চরাইবে ও রাত্রে ঢেঁকিশালে নিদ্রা যাইবে। তোমার প্রতি সওদাগরের এই আদেশ। খুল্লনা লহনার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও নীরবে এই আদেশ বহন করিলেন। খুল্লনা বনে বনে ছাগ চরাইতেছেন এমন সময় পঞ্চকন্যা তাঁহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া যান। এই দিন খুল্লনা "সর্ব্বশী" ছাগলটি হারাইয়া লহনার ভয়ে আর বাড়ী গেল না। এই দিন রাত্রেই প্রবাসী ধনপতি খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখেন; তাই তিনি বাড়ী আসেন। খুল্লনার ঈষদুদ্ভিন্ন যৌবন-জালে প্রবাসাগত ধনপতি বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বামী-সোহাগিনী কিন্তু লহনার অত্যাচারের কোন প্রতিকার করিলেন না। কিছুদিন পর সওদাগর বাণিজ্যার্থ সিংহল যাত্রা করিলেন যাত্রার সময় খুল্লনা পতির মঙ্গলকামনায় চণ্ডীপূজা করিতেছিলেন; ধনপতি "ডাকিনী" দেবতা বলিয়া চণ্ডীর ঘট পদপ্রহারে ভগ্ন করিয়া সিংহলে চলিয়া যান। বলা বাহুল্য, ধনপতি একজন গোঁড়া শৈব।

সাধু চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিয়াছেন তাই চণ্ডী তাঁহাকে বিপদে ফেলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। একমাত্র সপ্তম ডিঙ্গা মধুকর লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন। সওদাগর সিংহল গমন সময় কালীদহে কমলে অপূর্ব্ব কামিনী মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়া সিংহল-রাজের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী ব্যক্ত করেন, এবং সিংহলেশ্বরকে কমলে কামিনী দেখাইতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু দৈবতাড়িত ধনপতি সিংহলেশ্বরকে কমলে কামিনী দেখাইতে না পারিয়া কারারুদ্ধ হন। সাধুর সিংহল গমনের পর খুল্লনা শ্রীমন্ত নামক এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করেন। ইনিও পথে বহু বিপদে পতিত হন ও কালীদহে কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখিয়া সিংহলের রাজার নিকট তাহা প্রকাশ করেন। রাজা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বার—কমলে কামিনী দর্শনার্থ কালীদহে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল। এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বধ্য-ভূমিতে শ্রীমন্ত চৌত্রিশ অক্ষরা চণ্ডীর স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। রাজভৃত্যগণ রাজার নিকট এই সংবাদ বহন করিল। রাজা চণ্ডীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্তকে মুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত সিংহল রাজনন্দিনী সুশীলার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া শ্রীমন্ত দেশের রাজা বিক্রমকেশরীকে কমলে কামিনী দেখাইয়া তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করেন। ক্রমে দেশে চণ্ডীপূজা প্রচলিত হইল, এবং শাপভ্রষ্ট জনগণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দেখা যায়, কবি দুই খানা চিত্রে সমাজের দুইটি অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালকেতুর

সমাজ চিত্র প্রদর্শনে কবির কৃতিত্ব

বিবরণে কবি দরিদ্র পরিবারের অবস্থা দেখাইয়া পাঠককে কাঁদাইয়াছেন। ভেরেণ্ডার খুঁটিতে স্থাপিত

তালপত্রের ছাউনিবিশিষ্ট ঘর, ছিন্ন পরিধেয়, কদন্ন আহার—তাহাও সকল দিন মিলে না—সমাজ-বাসীর এই এক অবস্থা; অপর দিকে মধ্য শ্রেণীর একটি বণিকের চিত্র। বিলাস ব্যসনের নিত্য নূতন ঘটা, সন্ধ্যা-সকালে পারাবতের খেলা, চলিবার সময় আগে পাছে পাইক পেয়াদা, কিছুরই অভাব নাই। কবি বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা অধিক, ইহাদের অবস্থাই সমাজের প্রকৃত অবস্থা। ধনী লোক অতি অল্প, বিশেষতঃ ভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে তত সহানুভূতি দেন নাই। ধনীর আনন্দধ্বনির মধ্যে দরিদ্রের দুঃখের উচ্ছ্বাস ডুবিয়া যায়, কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করে না। তৎকালীন বঙ্গসমাজের ধনিগণ স্বার্থান্বেষী ও অত্যাচারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল বাসনা-স্রোতে কত দরিদ্রমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহা হউক, আমরা অতঃপর সমাজের আচারব্যবহারাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ডাইনি, ভূত, প্রেত প্রভৃতির ভয়

সেকালের লোক ডাইনি, ভূত, প্রেত প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভূতুড়ে ওঝার আশ্রয় গ্রহণ করিত। শ্রীমন্তের জন্ম সময় ব্রাহ্মণী বেশে চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দেন। দেবীর জল পড়া পান করিলে পর শ্রীমন্ত প্রসূত হয়। খুল্লনা প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া দেবীকে বলিতেছেন—

"কৃপা করি ঠাকুরাণী যে জান ঔষধ পানি
খুল্লনার রাখহ জীবন।"

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় সেকালের সমাজে ঝাড়া, ফুঁকা প্রভৃতির প্রতি লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। কালকেতুর জন্ম সময় নিদয়া প্রসববেদনায় কাতর হইয়া স্বামীকে বলিতেছেন—

খুঁজিয়া নগরে জানী কয়হ ঔষধ পানি
নিদয়ার রাখহ জীবন।

অভিমন্ত্রিত জলপান করিলে প্রসবে বিলম্ব হইত না।

বিশ্বাসই মুক্তির জনক

যাহা হউক, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে, ওঝা মহাশয়গণ অনন্যোপায় হইয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিতেছেন। সেকালে কুলাঙ্গনাগণ জাতকের মঙ্গলকামনায় অনেকগুলি অনুষ্ঠান করিতেন। শ্রীমন্তের জন্মের পর পুরমহিলাগণ নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করেন—

হরষিতে দুয়াদাসী যায় দ্রুতপদ
দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ॥
কাড়িয়া চালের খড় জালিল আউড়ি।
দ্বারেতে স্থাপিল ষষ্ঠী, স্থাপিল গোমুড়ি॥

কালকেতুর জন্মের পরও সূতিকা-গৃহদ্বারে গোমুণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল। সন্তানের মঙ্গলকামনায় অপত্য-

ষষ্ঠী পূজা

বৎসলা পুরমহিলাগণ ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিতেন। শ্রীমন্ত ও কালকেতু উভয়েরই জন্মের একবিংশ দিবসে ষষ্ঠী পূজা হইয়াছিল। এই পূজার পুরোহিত আমাদের খুঙ্গি-পুথি-ধারী পট্টবস্ত্র পরিহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নহেন। ভূতুড়ে ওঝা মহাশয়ই পুরোহিতের আসন অলঙ্কৃত করিতেন। ষষ্ঠী যে লৌকিক দেবতা ইহা হইতে তাহার অনুমান করা বাতুলতা নহে।

আনরূপ ব্যাধি সুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠী পূজা একুইশা কৈল এক বাসে॥
পূজা করি সোমাই ওঝা দিলা বর দান।
দক্ষিণে ঘোড়াক্ষ দিল বামে ঢোলকান॥

(ঘোড়াক্ষ ও ঢোলকান মৃগ জাতার দুই শ্রেণীর ক্ষুদ্রপ্রাণী)

নামকরণ

মধ্যবিত্ত বণিক হইতে নিঃস্ব ব্যাধ পর্য্যন্ত সকলেই সন্তানের নামকরণ, কর্ণবেধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিত। কালকেতু

ও শ্রীমন্ত উভয়ের ষষ্ঠ মাসে নাম করা হইয়াছিল। এই সমস্ত ক্রিয়া পুরোহিত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইত।

বিবাহ

কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আমরা কালকেতু, ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত এই তিন জনের তিনটি বিবাহ দেখিতে পাই। ইহা হইতে তৎকালীন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী লোকের বিবাহের আচারব্যবহারাদি জানিতে পারি। অবস্থার তারতম্য অনুসারে ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও প্রত্যেক বিবাহেই শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছিল। দরিদ্র কালকেতুর বিবাহে ব্যয়ব্যসনের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে অধিবাসের মাঙ্গলিক দ্রব্যের তালিকা দেখিলে মনে হয় বণিক জাতির অবস্থা ও রুচি উভয়ই উন্নত। রাজকুমারী সুশীলার বিবাহে অধিবাসের ধুমধাম নাই। শ্রীমন্তের বিবাহে যৌতুকমাত্রা অধিক। নিম্ন বর্ণনায় তাহার আভাস আছে।

সিংহলরাজ রথ, ঘোড়া, গজ, দোলা কলধৌতি কণ্ঠমালা
দিয়া জামাতার কৈল মান।

বিবাহে স্ত্রী আচার

সে কালে বিবাহে স্ত্রীলোকগণ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতেন। কালকেতুর বিবাহে স্ত্রী আচারের প্রাচুর্য্য নাই। ব্যাধরমণীগণ বিবাহে মঙ্গল সঙ্গীত গাইয়াছিল। ধনপতির বিবাহে স্ত্রী আচার অত্যন্ত অধিক। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য স্বামীকে স্ত্রীর বশীভূত করা। কন্যা রমণীগণ ক্ষণকালের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিয়া বাসরঘরে তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলী বর-রত্নটিকে যত যাতনা দেয়, তাহা ভুক্তভোগী পাঠক অবগত আছেন। এই স্ত্রী আচারে সকল সময় শ্লীলতার মাত্রা রক্ষিত হইত না। ক্ষণিক স্বাধীনতার পরিণামে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। শাশুড়ী ঠাকুরাণী জামাতা বাবাজিকে স্বীয় দুহিতার বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেন অবশ্য উহাতে শ্লীলতার মাত্রা লঙ্ঘিত হইত না। ধনপতির বিবাহে রম্ভাবতীর বহু স্ত্রী আচার মধ্যে একটি উল্লেখ করা গেল।

আনিল আয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাতফের ফেরাইলা করিয়া বেষ্টিত॥
সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥

শ্রীমন্তের বিবাহে কোন স্ত্রীআচারের উল্লেখ দেখা যায় না।

জ্যোতিষের আদর

ভারতবর্ষ ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির ও খনা-লীলাবতীর জন্মভূমি। এদেশে যে জ্যোতিষের আদর থাকিবে তাহাতে নূতনত্ব নাই। আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি সে সময়ও জ্যোতিষের আদর অত্যন্ত অধিক ছিল। ধনপতির বিবাহের দিননির্ণয় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

গ্রহ বিপ্র আনি ঘরে লগন বিচার করে
জয়ধ্বনি বনিতা বদনে।
কামতিথি ত্রয়োদশী রোহিণী সহিত শশী
শুভযোগ বণিজ করণ॥
লগনে আছয়ে জীব তাহাতে পরম শিব
সায় দেয় সেইত গণনে॥

কালকেতুর বিবাহে কন্যার পিতা সঞ্জয়কেতু ভাল দিন দেখিয়া পরে কন্যাবিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল।

ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি।

পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন—মুদ্রা যন্ত্রের কল্যাণে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ঘরে ঘরে পঞ্জিকার প্রচুর প্রচার না থাকিলেও সেকালে সামান্য কিরাত-গৃহে পর্য্যন্ত জ্যোতিষের কেমন প্রচার।

অল্পদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বিবাহে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা বরকে হস্তগত করিয়া

বর ও কন্যার পক্ষের দাঙ্গা

বরযাত্রীর অযথা প্রভুত্ব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য খণ্ড-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইয়াছে। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে বরযাত্রীদল যখন উজানী নগরী প্রবেশ করে তখন ধনপতি সওদাগরের পুত্র সদল বলে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বরকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। কবি সেই বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

"দুই দলে মিলামিলি গলাগলি চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।
ধূলাতে ঢেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি—
দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে॥

স্বামী বশীকরণ

এইকালে বাংলার নারী সমাজে একটা ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত ছিল। রমণীগণ পতি-সোহাগিনী হইবার জন্য বীভৎস প্রবৃত্তির তাড়নায় নানাপ্রকার বশীকরণের ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ধনপতি সওদা-গরের বিবাহ-রাত্রিতেই খুল্লনার মঙ্গল কামনায় রম্ভাবতী নানাপ্রকার স্বামী-বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রূপহীনা লহনা স্বামী-বশীকরণ জন্য লীলাবতী ব্রাহ্মণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বশীকরণবিদ্যানিপুণা লীলা-বতী লহনাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, আমার নিকট বশীকরণের ভাল ভাল ঔষধ আছে—

ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে স্বামা চিবাইয়া আমি
মুখে তুলি দেই গুয়া॥
ঔষধের বশে প্রকার বিশেষে
স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে
গেলে পিতৃ বাস করে উপবাস
যাবত মোরে না দেখে॥

চণ্ডীকাব্যে দেখা যায় নিম্নলিখিত জিনিষগুলি বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যবহার করিলে স্বামী বশীভূত হয়।

স্বামী বশীকরণের ঔষধ তালিকা

উলঙ্গ অবস্থায় মুক্ত কুন্তলে সংগৃহীত শ্মশান অঙ্গার, সাপের আঠুলী, অশ্বত্থের যোড়পত্র, কালবিড়াল, শুশুকের তৈল, শূকর ও শকুনের হাড়, নেউলের মুণ্ড, শ্মশানের তিল ফুল, শ্বেত কাকের রক্ত, কুকুরের পিত্ত, কচ্ছপের নখ, কুম্ভীরের দাঁত, গোধিকার আঁত, বাদুরের পাখা, সজারুর কাঁটা, শঙ্খের মুখ, বৃষিকের মাথা, কাটা মহিষের নাকের দড়ী ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিষ বিবিধ ঘৃণিত কৌশলে ব্যবহৃত হইত।

লহনা স্বামী বশ করার জন্য অনেক ঔষধ করিয়া-ছিল কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। গৌড়-প্রত্যাগত সওদাগর খুল্লনার রূপ-গুণে তাহার বশীভূত হইয়া পড়েন। লহনা প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বীয় ভুল বুঝিলেন। লহনা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

যৌবন পরম ধন যৌবনে পতির মন
যৌবনের নিছনী ঔষধ।
যৌবন মোহন ফাঁদ ঔষধ বালির বাঁধ
মৃত্যু ভাল যৌবন বিহনে॥

"গুণ দ্বারা স্বামীকে বশ করিবে" এই সদুপদেশ স্থূলবুদ্ধি কোন্দল-প্রিয়া রমণীর নিকট "বান টোনা দ্বারা স্বামী বশ করিবে" এই অর্থ প্রসব করিল। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষ কলঙ্ক। উড়িয়াগণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে "সাধন ভজন নাহি জানেত বাঙ্গালিনী জানে টোনা" এই বলিয়া উপহাস করে। সাপত্ন্য কলহ হইতে প্রেমের অগ্নরোগের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দুঃখিনী খুল্লনাকে পতি-দেবতা বশ করিবার জন্য কখনও ঈদৃশ চেষ্টা করিতে দেখি নাই। সম্ভবতঃ দরিদ্র পরিবারে তখনও এই সমুদয় মূল্যবান ঔষধ প্রচারিত হয় নাই। মধ্যবিত্তের ঘরেই যাবতীয় গোলযোগ। আমাদের কবিকঙ্কন মহাশয়ের ঘরেও যুগল প্রতিমা

বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বশীকরণ ঔষধ প্রসঙ্গের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন—

ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে বশ মোহন ঔষধ॥

এই স্বামী বশীকরণ চেষ্টা যে বর্ত্তমান মহিলা সমাজে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে উহা ষোড়শ শতাব্দীর স্বামী বশীকরণের ন্যায় বীভৎসতাপূর্ণ নহে। সে দিন [?] কপালকুণ্ডলা ননদিনী শ্যামার জন্য মধ্য রজনীতে আলুলায়িত কুন্তলে ঔষধ সংগ্রহ করিতে যাইয়া নবকুমারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন।

বহু বিবাহ ও সাপত্ন্য বিবাদ

সেকালে বঙ্গ সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগরের দুই বিবাহ। পিতার সুপুত্র শ্রীমন্তও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্যের কথা কি? কবি মুকুন্দরাম স্বয়ং দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত নিম্ন ভনিতা হইতে তাহা বুঝা যায়—

এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন তাহা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥

বশীকরণ-বিদ্যানিপুণা লীলাবতী কুলীন-পত্নী। তাঁহার স্বামীর সাতটি বিবাহ।

লীলাবতী লহনাকে বলিতেছেন—

অল্প বয়েস আমার প্রবেশ
ছয় সতীনের ঘরে।

এই বহু বিবাহের যুগে সংসার বড় অশান্তিপূর্ণ ছিল। দরিদ্রগণ বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিল না। চণ্ডী কালকেতুকে প্রতারিত করিবার জন্য স্বীয় রূপ-জাল বিস্তার করিলেও কালকেতু ব্যাধের চরিত্রে যে দেব-বাঞ্ছিত নৈতিক বল দেখা গিয়াছিল ধনপতি সওদাগরের চরিত্রে তাহার কণিকামাত্রও ছিল না। পারাবত ক্রীড়ার সময় খুল্লনার একটি বিলোল চাহনিতে ধনপতি সওদাগরের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। নৈতিক চরিত্র দুর্ব্বল হইলে মানুষের এমন অবস্থা পদে পদে সংঘটিত হয়। গৌড়-প্রবাসী ধনপতির প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ মধ্যে তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতায় চণ্ডী কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

পরস্ত্রীতে লুব্ধ হইয়া পাসরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গউড় নগরে।
* * * *
পাশে দুই জায়া কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
দেখিয়াছি আর সদাগর॥

কুটনী দাসী

কুটনী দাসী বাংলার সোনার সংসারে শ্মশান-বহ্নি জ্বালিয়া দেয়। এরূপ এক দাসীর মন্ত্রণায় রাণী কৈকেয়ী অযোধ্যা-রাজ-সংসারে বিষম বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন যখন সোনার অযোধ্যা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সাপত্ন্য কলহ অবশ্যম্ভাবী হইলেও প্রথম প্রথম খুল্লনা ও লহনার মধ্যে তাহা ছিল না। ইহারা চরিত্র-গৌরবে ধনপতির গৃহে যুগল মণিদীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এসময় অভাগিনী দুর্ব্বলার দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিল। সে মনে মনে ভাবিল—

যেই ঘরে দু' সতীনে না হয় কোন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥
একেরে করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থানে।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥

ক্রূরা দাসীর মন্ত্রণায় সরলা খুল্লনাকে প্রাণান্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কুসুম-কোমলা গৌরাঙ্গী খুল্লনার চৈত্র-রৌদ্র-পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শন করিলে, সেই স্বভাব-সরলার উদ্দেশে চরিত্রহীন কৃষকের ভৎসনা শ্রবণ করিলে, সেই লক্ষপতি-দুহিতা ধনপতি-বনিতার পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র দর্শন করিলে, ভাদ্রের মেঘভরা আকাশতলে সিক্ত-বসনা খুল্লনার অবস্থা চিন্তা করিলে না কাঁদিয়া থাকিতে পারা যায় না। দুর্ব্বলা দাসী খুল্লনার অদৃষ্ট আকাশে ধূমকেতু তুল্য। অনুসন্ধান-

করিলে বঙ্গ-পরিবারে আজও ঈদৃশ বিষবল্লরী দেখিতে পাইবেন।

স্ত্রীশিক্ষা

সে কালের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ লেখাপড়া জানিতেন। লীলা-ঠাকুরাণী জাল পত্র-খানার লেখিকা। লহনা ঐ পত্র খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি বলিলেন—

"শুন দিদি সাধুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেবা পাতি লিখে মোরে করিয়া প্রবন্ধ॥"

যিনি লিপি বিচার করিতে জানেন তিনি যে একটু ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এই অনুমান অমূলক নহে।

স্ত্রীলোকের স্বামীভক্তি ও সতীত্ব

আমরা যে সময়ের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতেছি সে সময় বঙ্গনারী স্বামীর চিতায় সহাস্যে জীবনাহুতি দিতেন। ফুল্লরা, খুল্লনা ইহারা বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী। বঙ্গনারী ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। স্বামীর সুখবিধান-চেষ্টা বঙ্গ-মহিলার চির-স্বভাব। কালকেতু কলিঙ্গরাজের হস্তে বন্দী হইলে ফুল্লরা কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিলেন। খুল্লনা পতির সন্তোষবিধানের জন্য প্রাণপণে যত্নবতী। পূতচরিত্রা খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দিবার জন্য অনলে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হিতার্থিগণ খুল্লনাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিলে,

খুল্লনা বলেন যদি না যাই অনলে।
অভাগির কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে॥

দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে নারীগণের স্বামীভক্তি কমিয়া গিয়াছিল। অন্নদামঙ্গলে দাম্পত্যসুখবঞ্চিতা নারীগণ স্ব স্ব পতিনিন্দা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু কবিকঙ্কন চণ্ডীতে দেখা যায় দাম্পত্য-সুখ-বিরহিতা কামিনীগণ একে অন্যকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—

যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।
পতি সেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥

দুই এক জন রমণীকে পতির নিন্দা করিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা পতির অযথা অত্যাচারের ফল। দশন-বর্জ্জিত-বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

দড় ব্যঞ্জন আমি সই যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি॥

অনর্থক উৎপীড়নে ভক্তি নষ্ট হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

বাজার দর

এই সময় বাজারে কড়ির প্রচলন ছিল। জিনিষপত্র সুলভে বিক্রয় হইত। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। সে কালে পণ্যার্থীকে শূন্যহস্তে মলিনমুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত না। দুর্ব্বলার বেসাতির বৃহৎ ফর্দ্দের একাংশে লিখিত আছে—

চতুরা সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি।

পাশাক্রীড়া

অভাব না থাকিলে মানুষ স্বতঃই বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হইয়া পড়ে। সে কালের গৃহস্থগণ ষোড়শোপচারে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পাশা খেলায় সময় কাটাইতেন। প্রকৃতির আদুরে ছেলে বলিয়াই বাঙ্গালীর এত অধঃপতন। পাশা খেলার প্রাচুর্য্যের প্রমাণাভাব নাই। ধনপতি সওদাগরের বিবাহে পাশা খেলার ধুমধাম। গৌড়-প্রত্যাগত ধনপতি সওদাগর পাঠশালা গৃহে বসিয়া বন্ধুগণের সহিত পাশা খেলিতেছিলেন, এমন সময় পুরোহিত ঠাকুর তথায় গিয়া সদাগরকে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ অসমাপ্ত রহিয়াছে একথা স্মরণ করাইয়া দেন। সে কালে পুর-মহিলাগণ পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলে পাশা খেলায় যোগ দিতেন।

হাঁচি-টিকটিকির ভয়

দুর্ব্বলতা মানুষের মনে অনেক কুসংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয়। আলোচ্য সময় বঙ্গ সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কোন

কার্য্যে বিফল-মনোরথ হইলে দৈবের দোহাই দিতে বাঙ্গালী চির অভ্যস্ত। হাঁচি টিক্‌টিকির ভয়ে বাঙ্গালী অস্থির। কেবল বাঙ্গালী কেন? বাঙ্গালীর দেবতাগণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার ভয় হইতে মুক্ত নহেন। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শঙ্কর পূজার ফুল তোলার ভার পাইবার সময় টিকটিকি তাঁহার ভাবী অমঙ্গল সূচনা করিয়াছিল।

পান নিতে নীলাম্বর যোড় কৈল কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর॥
জ্যেষ্ঠী-রব নীলাম্বর শুনিল শ্রবণে।
দৈবদোষে তাহা না শুনিল অন্য জনে॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
বাধা পড়িল গোসাই মাথার উপর॥

অভিশপ্তা রত্নমালা বিলাপ করিতেছেন—

কেমন দারুন বেলা আইনু তাণ্ডব শালা
হাঁচি জেঠী না মানিয়া বাধ।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরিয়া না গেনু ঘরে
জীবনে রহিল বড় সাধ॥

ধনপতির সিংহল যাত্রার সময় কাক শুক্‌না ডালে বসিয়া ডাকিয়া তাঁহার ভাবী বিপদের সূচনা করিয়াছিল। সংসার ক্লিষ্ট জড় বাঙ্গালী কাকমুখে পর্য্যন্ত স্বকীয় জীবনের শুভাশুভ বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল ও ভয়ে ভীত হইতেন। কল্পিত জ্যোতিষের প্রতি ঈদৃশ ভক্তি দ্বারা জাতীয় উন্নতির পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রা

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীগণ সাগর অতিক্রম করিয়া বাণিজ্যার্থ সিংহল দ্বীপে পর্য্যন্ত গমন করিতেন। আমদানী রপ্তানী উভয় প্রকারে বাণিজ্য চলিত। ধনপতি সদাগর এ দেশের ভাল ভাল জিনিষ সিংহল-বাসীর নিকট বিক্রয় করিতেন এবং তাহার বিনিময়ে তদ্দেশজাত গন্ধদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন। ধনপতির মধুকর ডিঙ্গা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের বাণিজ্য জাহাজ হইতে নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। অধ্যবসায়ী ধনপতি পথে বহু কষ্ট পাইয়াও সিংহল-গমন সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই।

শিক্ষা

সে কালে সকালে বৈকালে বড় লোকের চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বৃক্ষতলায় গুরুমহাশয় ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন। আমাদের শ্রীমন্ত সওদাগর উক্তবিধ এক পাঠশালার ছাত্র। বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেকালের পাঠশালায় ইতিহাস ভূগোলাদির পাঠ হইত কি না সন্দেহ। প্রথমে বর্ণপরিচয় ও অষ্টাদশবিধ কলা শিক্ষা দেওয়া হইত। অতঃপর নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও কাব্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উজানী নগরের অশীতিপর বৃদ্ধ জনার্দ্দন ঠাকুর গুরু মহাশয়ের আসনে বসিয়া শ্রীমন্তকে এই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভাষায় মুসলমানী প্রভাব

মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যে এমন কতগুলি শব্দ দেখা যায় যাহা আমাদের বঙ্গ ভাষার আদিম সম্পত্তি নহে। উহারা বঙ্গভাষার রাজ্যে ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডিহিদার, চৌঁড়ি, সরকার, আউয়াল, দোয়া, নফর, পোদ্দার, তেজাল, মক্তব, খানা, মাজুম, মুনসী, সেয়ানা, সফর, সদাগর ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের পশ্চাদ্ভাগে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ইতিহাস আত্মগোপন করিয়া আছে। আলোচনা করিলে কাব্যে কিরূপে ইতিহাসের প্রভাব বিবৃত হয় তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ দে।

শূন্যপুরাণ

(১৩২১ আশ্বিনের 'সাহিত্য' হইতে সঙ্কলিত)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যমে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের পুরাতন পুথি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত একটি গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সংযুক্ত করিয়া প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বুঝাইয়াছেন—শূন্য-পুরাণোক্ত "ধর্ম্ম পূজা" প্রাচীন বাঙ্গালার "বৌদ্ধ পূজা"। পশ্চিম বঙ্গে এখনও এই ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে।

এই সিদ্ধান্ত বসুজ মহাশয়ের কপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক দিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অবতারণা করেন; এবং তাঁহারই প্রশংসনীয় উদ্যমে পশ্চিম বঙ্গে "ধর্ম্মপূজা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সময় হইতে এই সিদ্ধান্তটি বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া, রামাই পণ্ডিতের নাম, ধর্ম্মপূজার নাম, শূন্যপুরাণের নাম বাঙ্গালী সুধীসমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

শূন্যপুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পাঁচালী প্রবন্ধ। এক সময়ে মনসার ভাসানের ন্যায় শূন্যপুরাণের পাঁচালীও বহু স্থানে বহুভাবে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা "ধর্ম্মপূজার" কথা, কিন্তু "ধর্ম্মপূজা" কাহার পূজা, বসুজ মহাশয় স্বাধীন ভাবে তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তথাপি কতকগুলি কারণে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসাকে শেষ মীমাংসা বলিয়া স্বীকার না করিয়া, এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত করা যাইতে পারে। শূন্যপুরাণের ভূমিকায় (।/০ পৃষ্ঠায়) বসুজ মহাশয় যাত্রাসিদ্ধি রায়ের ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি হইতে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, প্রশ্নটির পুনরুত্থাপনের অবসর দিয়া রাখিয়াছেন। সে পংক্তিটি এই—

"ধাং ধীং ধুং বলি চরণে পড়িল।"

এই শ্লোকার্দ্ধের "ধাং-ধীং-ধুং" অর্থহীন। বসুজ মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা অপপাঠ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। প্রকৃত পাঠ

"ধ্রাং ধ্রীং ধ্রুং"।

তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, "ধর্ম্মপূজা" কাহার পূজা, তাহার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হইত। সে পথে অগ্রসর না হইয়া, বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সৃষ্টিপত্তনে একটি নিজস্ব আছে, যাহা ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছি না।—তাহা উলূক ও বল্লুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ দুইটিকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।" লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয় বসুজ মহাশয় যেন গ্রন্থ খুঁজিতে বাকী রাখেন নাই। সুতরাং তিনি যখন খুঁজিয়া পান নাই, তখন আর খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইবার প্রয়োজন কি? যে কারণেই হউক, অনুসন্ধান কার্য্য এই পর্য্যন্ত শেষ হইয়া রহিয়াছে,—অগত্যা উলূক ও বল্লুকা নদী রামাই পণ্ডিতের নিজস্ব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। "বল্লুকা নদী" এই পাঠটি প্রকৃত পাঠ কি না, তাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিলেও, উলূক সম্বন্ধে সংশয় নাই। তাহা শূন্যপুরাণে অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণের বর্ণনা অনুসারে উলূকের সংখ্যা নিতান্ত পক্ষে পাঁচ। যথা,—

"চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষ উলুকাই॥"

উলূকের এইরূপ বিস্ময়কর উৎপত্তি বিবরণ শূন্যপুরাণের প্রকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে অনুকূল। প্রভুর হাই হইতে উদ্ভূত উলূক কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে "প্রভু" কে, তাহা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক। বসুজ মহাশয় তাহার আলোচনা না করিয়া বুঝাইয়াছেন,—উলূক ধর্ম্ম; তাঁহার পূজাই "ধর্ম্মপূজা"। সুতরাং উলূক কে, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

শূন্যপুরাণে তাহার পরিচয় থাকিলেও, তাহা প্রচ্ছন্ন। তন্ত্রে তাহা সুব্যক্ত। বসুজ মহাশয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করেন নাই। তন্ত্রেও "ধর্ম্মপূজার" কথা আছে; তন্ত্রেও উলূক অপরিচিত নহে। তন্ত্রোক্ত উলূক ধর্ম্ম—তাঁহার নামান্তর নন্দী তিনি মহাদেবের বাহন। তাঁহার পূজা "ধর্ম্মপূজা" নামে পরিচিত;—তাহা শৈবতন্ত্রের অন্তর্গত। "লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে" এই "ধর্ম্মপূজার" বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। "ধর্ম্মপূজার" মন্ত্রোদ্ধার এইরূপ—

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দান্তং বীজং ততঃ প্রিয়ে।
বলবীজযুতং কৃত্বা চূড়াযুতং ততঃ কুরু॥
ধর্ম্মশব্দং চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়া ততঃ পরং।
এষা সপ্তাক্ষরী বিদ্যা চতুর্বর্গফলপ্রদা॥

প্রণব = ওঁ। দান্ত-বীজ = ধ্। বল-বীজ = র্।
চূড়া = ং। চতুর্থ্যন্ত ধর্ম্মশব্দ = ধর্ম্মায়। বহ্নিজায়া = স্বাহা।

অতএব ধর্ম্মপূজার সপ্তাক্ষর মন্ত্র—ওঁ ধ্রং ধর্ম্মায় স্বাহা। এই মন্ত্রে বীজ ধ্রং,—ইহার শক্তি স্বাহা। সুতরাং অঙ্গন্যাস মন্ত্র দীর্ঘস্বর সমাযুক্ত ধ্রাং ধ্রীং ধ্রুং। শিব-লিঙ্গার্চ্চনের পূর্ব্বেই তাহার আধার দেবতা ধর্ম্মের পূজা করিতে হইবে বলিয়া, লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে (২৫৭) উপদেশ আছে। যথা—

প্রথমং পরমেশানি ধর্ম্মং সম্পূজ্য সত্বরং।
ততস্তু পরমেশানি পার্থিব লিঙ্গপূজনং॥

এই পূজা যদি "বৌদ্ধপূজা" হয়, তবে শিবলিঙ্গপূজক মাত্রই বৌদ্ধ। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র এরূপ মীমাংসার পক্ষ-সমর্থন করে না। পূর্ব্ব পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সকল বঙ্গেই লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র বর্ত্তমান আছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। যথাকালে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার আশা আছে।

শূন্যপুরাণের শূন্যবাদ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। প্রথম পটলে মহাদেব লিঙ্গার্চ্চনের প্রয়োজন ও প্রশংসা বিজ্ঞাপিত করিলে, দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোকেই দেবী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন,—শিবের আবার পূজা কি? শিব শূন্যরূপ,—শিব ইন্দ্রিয়রহিত,—শিব ক্রিয়াশূন্য,—তাঁহার আবার পূজা কি?

ইন্দ্রিয়রহিতো দেব শূন্যরূপঃ শিবঃ সদা,
শিবস্য করণং নাস্তি কিং তস্য পূজনং ততঃ॥

দেবীর এই প্রশ্নে সকল তন্ত্র প্রতিপাদ্য শূন্যবাদই সূচিত হইয়াছে। শক্তিশূন্য শিব শবস্বরূপ—শূন্যরূপ। তাহার পূজা চলিতে পারে না। প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাহা মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন,—

শক্তিং বিনা মহেশানি প্রেতত্বং তস্য নিশ্চিতম্।

কিন্তু শিবশক্তি সমাযোগে উভয়ের যে একতা জন্মে, তাহার জ্ঞানই জ্ঞান। শিবলিঙ্গে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহার পূজা আবশ্যক। এই তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, মহাদেব বলিয়াছেন,—শিবের সেই শক্তিরূপিণী কামিনী বৃষ,—তাহারই নামান্তর ধর্ম্ম-নন্দি-উলূক। শক্তি নিজেই এই রহস্য মহেশ্বরকে জানাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—

"বৃষরূপং সমাস্থায় উলুকোঽহং মহেশ্বর।"

শিবলিঙ্গার্চ্চনের অঙ্গীভূত উলূক পূজা বা ধর্ম্মপূজা, তান্ত্রিকী পূজা। দ্বিতীয় পটলে উলূক শব্দের ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও সেই কথা বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

উকারশ্চ মহাদেবী লুকারং কামিনী প্রভো।
লকারং পৃথিবী দেব বিদ্ধি ত্বং গুণসাগর॥
ককারশ্চ মহাদেব সদাতু উগ্রতো জনা।
তত্তত্তেজস্বিনী যা তু পৃথ্বীধারণ কারণং।
অতএব মহেশান্ নাম্না উলূক যোগযুক্॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের তৃতীয় পটলে উলূক পূজার বা ধর্ম্ম পূজার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে ধ্যান এইরূপে উল্লিখিত,—

ধ্যানং শৃণু বরারোহে। সাক্ষাদনঙ্গরূপিণং।
কোটীচন্দ্রপ্রভাকারং শ্বেতসিংহাসনাস্থিতম্॥
চতুর্ভুজং মহাবাহুং পদ্মনেত্রং মনোহরং।
আজানুলম্বিনীমালা-হৃদ্দাম পরিশোভিতম্॥
গঙ্গাতরঙ্গ-কর্পূর-শুভ্রাম্বর-বিভূষিতম্।
হাস্যবক্ত্রং কটাক্ষং তু ভুবনত্রয়মোহনং।
উলুকং ভাবয়েদ্দেবং সাক্ষাদ্ধর্ম্ম স্বরূপিণং॥

ইহার সহিত শূন্যপুরাণের "ধবল মূর্ত্তি"র এবং "ধবল সিংহাসনের" সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং শূন্যপুরাণোক্ত "ধর্ম্মপূজাকে" প্রাচীন বাঙ্গালার "বৌদ্ধপূজা" মনে করিয়া, এই সিদ্ধান্তকে একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করা চলে কি না, তাহাতে স্বভাবতঃই সংশয় উপস্থিত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

ভাটীয়াল গান।

(১)

গাড়ু গাম্ছা তৈলের বাটী রে,
তৈলের বাটী রে সাথে।
স্নান করিতে এলেম একা,
পদ্মা নদী ঘাটে॥
আমি কি করি ? (১)

আগে যদি জানিগো আমি,
মাথম রাজা গো ঘাটে।
আগে পাছে দাসী লইয়া
চল্‌তেম স্নানের ঘাটে॥
আমি কি করি ? (২)

এক ডুব দুইয় ডুবরে
তিন ডুবের গো কালে।
কোথা থেইকা মাথম রাজা
কেশে ধইরা তোলে॥
আমি কি করি ? (৩)

খাটখুট মাথম রাজা গো
মুখে চম্পা গো দাড়ী।
কমলার কেশে ধইরা
নদী দিল পাড়ী॥
আমি কি করি ? (৪)

জাল বাও জালুয়া ভাইরে,
জালের কোনারে ব্যাকা।
তোমার জালেনি উইঠাছেরে,
নারীর হাতের শাখা॥
আমি কি করি ? (৫)

হাল বাও হালুয়া ভাইরে,
হাতের সোনার রে লড়ী।
এইপথে নি দেখ্ছ যাইতে
আমার কমলা সুন্দরী॥
আমি কি করি ? (৬)

আগের নায় ঝামুর ঝুমুর রে
পাছের নায় রে বাত্তি।
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা,
আমি পতির কান্দন শুনি॥
আমি কি করি ? (৭)

কেন্দো না কেন্দো না পতি রে,
আমার মায়া রে ছার।
বাক্স ভইরা থুইছি টাকা
আরেক বিয়া কর॥
আমি কি করি ? (৮)

আম ধরে থোবা থোবা রে
তেতুল রে ব্যাকা।
আপন পতি বৈদেশ হইল,
আর না হইল দেখা॥
আমি কি করি ? (৯)

[থেইকা—হইতে। খাটখুট—বেঁটে। জালুয়া—জেলে। হালুয়া—চাষী। লড়ী—ছড়ি, পাচনী। নায়—নৌকায়। ধীরেসুস্থে—আস্তে ২। বাইও—বাহিও। ছার—পরিত্যাগ কর। বৈদেশ—বিদেশী, পর।]

স্বামীপদপ্রান্তবিচ্যুতা অপহৃতা সরলা অবলা রমণীর কি মর্ম্মস্পর্শী করুণ বিলাপ।

(১) রমণী পদ্মানদীতে একাকী স্নান করিতে আসি-

য়াছে; সঙ্গে স্নানের উপকরণ. গামছা, তৈলের বাটী, এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালীন জল নিবার উদ্দেশ্যে হয়ত গাড়ু।

(২) 'আগে পাছে দাসী, কথায় বুঝা যায় রমণী ধনার গৃহিণী। একা আসিয়া যে নেহায়েৎ অবিবেচনার কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য এখন সে অনুতপ্ত। মাখম রাজা নাকি মগ জাতীয়।

(৩) কখন, কি ভাবে, কে তাহাকে হরণ করিল তাহার সুস্পষ্ট বিলাপোক্তি।

(৪) এখনও রমণীর আশার আলো নিভে নাই; হয়ত স্বামী সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে তাই অপহারকের সঠিক স্বরূপ বর্ণনা করতঃ নাম সহ কি ভাবে কোন্ পথে গেল তাহা নির্দ্দেশ করিল।

(৫) এদিকে রমণীর গৃহে প্রত্যাগমনের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তাহাকে খোঁজ করা স্বাভাবিক। ঘাটে তৈলের বাটী, গাড়ু প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছিল। নিশ্চয়; তদ্দৃষ্টে স্বামীর চিত্তবিভ্রম ঘটা অনিবার্য্য। তাই হতাশ প্রেমিক সম্মুখে যাহা পায় তাহাই আকড়াইয়া ধড়ে। প্রতিকূল অনুকূল চিন্তালোড়িত হতাশ চিত্তে হয়ত মনে হইল, না জানি স্ত্রীকে কুমীরে নিয়াছে। তাই জেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল।

(৬) আবার হয়ত মনে হইল, না কুমীরে নাও বা নিতে পারে, তাই নদীতীরবর্ত্তী চাষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।

(৭) চলন্তি নৌকায় দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দ হইতেছে। আর গানবাদ্যও নৌকায় চলিতেছে; এমন সময় হয়ত স্বামী খোঁজ করিতে করিতে যাইয়া মাখম রাজার নৌকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এত শব্দের ভিতর দিয়াও স্বামীর বিলাপ উৎকণ্ঠিতার শ্রবণোন্মুখ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। রমণী দেখিল, আর মিলনের সম্ভাবনা নাই। হয়ত পতির রোদনধ্বনিই তাহাকে কতক আশ্বস্ত করিতেছে।

(৮) যখন দেখিল উদ্ধারের আশা সুদূর পরাহত, তখন সাধ্বী বুক বাঁধিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া সান্ত্বনা ছলে বাক্যস্থিত টাকা দ্বারা পুনঃ দ্বার পরিগ্রহ করতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ উপদেশ দিতেছে।

(৯) তারপর আশার ক্ষীণরশ্মি একেবারে নিবিয়া গেল। আহা, সাধ্বীর কি মর্ম্মন্তুদ তপ্তশ্বাস!

"আপন পতি বৈদেশ হইল
আর না হইল দেখা।
আমি কি করি?"

রজনী ভোর হয় হয়, এমন সময়ে যখন বিহগ কুল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুষুপ্তিমগ্ন মানবমণ্ডলীর তন্দ্রাঘোর শিথিল করিয়া ফেলে, এহেন সময়ে বিবাহাদি শুভকর্ম্মোপলক্ষে জল আনিতে যাত্রা করিয়া সম্মিলিত রমণীবৃন্দ যখন হঠাৎ বামাকণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তখন সেই করুণ সঙ্গীতধ্বনি পবনহিল্লোলে দুলিতে দুলিতে হৃদয়তন্ত্রীতে এমনি করিয়া আঘাত করে যে, তাহা বর্ণনাতীত। প্রকৃত চিত্রটী যেন মানসপটে সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। গায়িকারা চলিয়া যায়, আবার গায়িতে গায়িতে ফিরিয়া আসে—প্রথমে, আশা ও নৈরাশ্যের তুমুল সংঘর্ষ, তৎপরে কেবলই বুকভরা হা-হুতাশ।

(২)

মন আমার, নিশা খোর।
হরিনাম কৃষ্ণনামে রে,
হয় না কেন তোর নিশি ভোর?
(ওরে) ভাঙ্গের নিশা, গা[illegible] নিশা
কোন্ নিশা তোর [illegible] "ধবল বুড়ি"র
(ওরে) যখন নিশার পরখ হ'বে রে,
একেবারে দিশাহারা হবে তোর॥
(অ তুমি) দিনে কর তাওা বাজি রে,
রাতে ঐ নাম জপ না তোর।

(অ তুই) কখন লইবি শ্রীগুরুর নাম রে,
একটুক অবসর দেখি না তোর ॥
সুদে, মদে মইজে তোরে,
করছে রে বাজী ভোর।
(অ তুই) আপন ঘরে কুড়াল মেরে রে,
শেষে আমারে বানালি চোর ॥

তাণ্ডাবাজী—বৈষয়িক কার্য্যে নানারূপ চেষ্টা।
বাজীভোর—বিভোর, বেহুঁস।
বানালি চোর—চোর রূপে পরিগণিত করিলি।

মূঢ় মন! তুমি প্রতিনিয়ত ভগবানের নামে মত্ত থাক না কেন? তুমি কামিনীকাঞ্চনের মোহে মজিয়া গুরুদত্ত নাম স্মরণ করিতে একটুকুও অবসর পাও না। বৈষয়িক কর্ম্মে ও মায়ামোহাদিতে তুমি দিবারাত্রি বিভোর রহিয়াছ এবং পরকালের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আমাকে উহার নিমিত্তের ভাগী করিতেছ।

(৩)

কোথা ছিলা ওহে গৌর—
(তোমায়) চিন্‌তে পারি না।
তুমি যে ভাবেতে ব্রজে ছিলে
তোমার সে ভাব দেখি না ॥
ছিলা হে রাখালের সখা,
অনেক দিনের পরে দেখা,
দুনয়ন বাঁকা,
তোমার চিহ্ন আছে নয়ন দুটী,
তোমায় ভুল্‌তে পারি না ॥
শিরে নাই মোহন চূড়া,
গলে নাই বনফুলের মালা,
করে নাই বাঁশী,
তুমি কটিতে কৌপীণ পরিলা,
তোমার ভঙ্গী বুঝি না ॥
তুমি ছিলা মূল বিবাদী,
রাই হইল দরখাস্তের বাদী,
এই মোকদ্দমা,
আমি গরমিয়াদী হইয়া থাকি
রাইয়ের প্রেমের জেলখানা ॥
কোথা ছিলা ওহে গৌর
চিন্‌তে পারি না ॥

ভগবৎ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের ভাবে দেখিতে চায়। তাই গৌরাঙ্গকে দেখিয়া বলিতেছে তোমার ব্রজের সেই সখ্যভাব কই? সেই চূড়া বাঁশী ও বনফুলের মালা কই? তুমি যে কৌপীন পরিধান করিয়াছ, ইহা তোমার আবার কিরূপ ভাব? তুমি যে বেশই ধারণ কর না কেন, ঐ যে তোমরে বাঁকা নয়ন দুটীই তোমার চিহ্ন। এসো প্রভো, তোমার সেই যুগল রূপে প্রতিনিয়ত আমার এ হৃদিমন্দিরে বিরাজ কর।

(৪)

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমরূপ, কই, বিশাখা,
আন্ গো তারে।
অহরহ প্রাণ কেমন করে,
তুষের অনলে মত দহে অন্তরে,
আমার জলে গেলে দ্বিগুণ জলে,
কি দিয়ে নিবাব তারে?
অস্ত দিবস অবশেষ কালে,
আচম্বিতে শ্যামের বাঁশী
জয় রাধে বলে,
আমি রব শুনিয়ে চম্‌কে উঠলাম,
গেলাম না কুটীলার ডরে।
মইজাছি এ তিন রসে,
তিন ভাবে তিন দিগে টানে
পাইনা গো দিশে,
আমি স্থির হইয়ে রব কিসে,
দিশা পাই না কই তোমারে ॥

(আমি) কইতে নারি সইতে গো নারি,
যোবার স্বপনের মত
গুমরি গো মরি,
আমার এ যৌবন যায় বিফলে,
বুক ফেটে যায় তারি গো তরে ॥

কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধা কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা হইয়া কৃষ্ণসন্দর্শনের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া প্রিয়সখী বিশাখার নিকট হৃদয়ের তীব্রজ্বালা প্রকাশ করিতেছে। একদিকে প্রাণের কেমন আকুল তিয়াসা আবার অপরদিকে লাঞ্ছনাগঞ্জনাভয়।

(৫)

চলগুরু, দুজন যাই পারে
আমার একা যেতে ভয় করে ॥
পার ঘাটেতে মাল্লা ছয় জনা,
সঙ্গী বিনে তারা আমার
পার ক'রে দেয় না,
মাঝি বলে দেই পার করে,
মাল্লায় যে নিষেধ করে ॥
আমার দেহ ছিল যে শ্মশানের সমান,
গুরু তুমি মন্ত্র দিয়ে কর্‌লা ফুল বাগান,
আমার সে বাগানে ফুল ফুটেছে,
গোসাই অধরচাঁদ বিরাজ করে ॥

ষড় রিপুর আবর্ত্তনে পড়িয়া মন বিপথগামী হইতেছে তাই বলি, ওহে গুরু তুমি আসিয়া আমার সহায় হও। আমার এই শ্মশানসদৃশ অনুর্ব্বর দেহে তুমিই বীজ বপন করিয়া বাগান সাজাইয়াছ, এবং সেই বাগানে এখন ফুল ফুটিয়াছে ও তোমার বাসস্থানোপযোগী হইয়াছে।

(৬)

জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো,
আমার মাথায় গো ডালি।
কেমনে যাইব আমি গো,
হলক জাউলার বাড়ী?
আমার নসিবে ছিল।

বাইট্‌কামারি হলক জাউলা রে,
বোয়ালমারি রে নাও।
তোমরানি দেইখাছ রে আমার
হলক জাউলার নাও ॥
আমার নসিবে ছিল।

সাত ভাইএর বইন্‌ আমি রে
পরমা সুন্দরী।
বড় বউয়ে দিল ডালি রে আমার
জালুয়া ভাতারী ॥
আমার নসিবে ছিল।

ফুল তুলিতে গেলাম আমি গো
ফুল বাগিচার মাঝে।
সেখানে টলিল নসিব রে
হলক জাউলার সাথে ॥
আমার নসিবে ছিল।

বাইট্‌কা মারি—বাইটকা (খল্লা) মৎস্য যে ধরে। বোয়াল মারি রে নাও—বোয়াল ধরিবার নৌকা বিশেষ। বাইন্‌—ভগ্ন। ডালি রে—জলাঞ্জলী।

রমণী সাত ভাইয়ের বোন্‌, তায় পরম সুন্দরী। গ্রহের ফেরে হলক জেলের প্রেমে মজিল; তারপর বড়বৌএর চক্রান্তে ভ্রাতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া এখন অনুতপ্ত চিত্তে হলক জেলের সন্ধানে ফিরিতেছে আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

* বাইটকামারি ও বোয়ালমারি ফরিদপুর জেলায় দুইটি স্থানের নামও আছে বলিয়া গোপীনাথ বাবুর প্রদত্ত এই দুইটী অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই দুইটি শব্দে কি বুঝাইতেছে তদ্বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের অবসর ও আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয়।—প্র, স।

১৬৪। যদি থাকে বন্ধুর মন
গাঙ্ সাতারতে কত ক্ষণ।

১৬৫। কুইড়ায়ে উড়া বাছ,
মইলেও না এক গাছ।
উড়া—শুষ্ক আগাছা।
মইলে—মরিলে।

১৬৬। দেখ দেইখা ছোট,
বাইয়ে করছে খাট।
বাইয়ে—বায়ুরোগে।

১৬৭। ছেলে নষ্ট চাটে—
বউ নষ্ট ঘাটে।

১৬৮। ঘোরে ফিরে আওয়াইল্যা
তার নাম দাওয়াইল্যা।

১৬৯। হরিও বল
পটলও তোল।

১৭০। ঝি জব্দ কীলে,
বউ জব্দ শীলে।
শীলে—বাটনাবাটায়।

১৭১। যারে দেখ্তে নারি,
তার চলন ব্যাকা।

১৭২। আয় কি হলো?
বেল তলা যায়।

১৭৩। আর রাজ্যে বামুন নাই
কাশী ঠাকুর চিড়া খাও।

১৭৪। কামে হয় ভোজনে কারী,
তার বাস ঠাকুর বাড়ী।

১৭৫। কামে হয় ভোজনে কারী,
তার নাম অধিকারী।
কারী—প্রচুর পরিমাণ।

১৭৬। ভাঙ্গা পা খাদে পড়ে।

১৭৭। কিসের মধ্যে কি,
পা[illegible]তে ঘি।

১৭৮। যদি পড়ে প্রেমের দায়,
দাউদা মাগীর চাবা খায়।
দাউদা—দদ্রুরোগবিশিষ্টা।
চাবা—চর্ব্বিত পান।

১৭৯। সাত দিনের বাসী খায়,
সাজ দেইখা উকাল বায়।
উকাল বায়—বমনোদ্রেক হয়।
সাজ—টাট্‌কা)।

১৮০। টাকা, টাকা, টাকা,
গোপাল হইল গোপ্‌লা জ্যেঠা,
মণ্ড্‌লা হইল কাকা।
হায় রে! আমার টাকা।*

* গোপাল ও মঙ্গল নামে দুই ভাই ছিল। গোপাল চিরদিনই পরিশ্রমী, আর মঙ্গল নেহাত কুঁড়ে—কেবলই ঘুড়িয়া খেলিয়া কাল কাটাইত। উভয় ভ্রাতা পৃথক হইয়া গেলে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা গোপাল নিজের অবস্থা বড়ই স্বচ্ছল করিয়া তুলিল—গ্রামে তাহার নাম ডাক পড়িল, গ্রামের ছেলেরাও তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভয়ের চক্ষে দেখিত, কিন্তু নিঃস্ব মঙ্গলকে কেহই বড় লক্ষ্য করিত না—তাহাকে দেখিলে ছেলেরাও 'ঐ মণ্ড্‌লা' যায় বলিয়া পরস্পর আলাপন করিয়া আমোদ পাইত। ঘটনা-চক্রে উত্থান-পতনের নিয়মানুসারে গোপালের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল, পক্ষান্তরে মঙ্গলের সাংসারিক অবস্থায় ক্রমোন্নতি হইল। একদিন গোপাল ছেলেদের কাছ দিয়া যাইতেছে, তখন জনৈক বালক বলিয়া উঠিল 'ওরে, ঐ দেখ্ গোপ্‌লা জ্যেঠা যায়।' এমনি সময়ে ঐ পথ দিয়াই মঙ্গলও আসিতেছিল, তখন ছেলেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে দৌড়িয়া গিয়া—'কাকা মশায়, কোথা-হ'তে আসিলেন' বলিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইল। এই ঘটনাতে গোপাল বড়ই মর্মাহত হইয়া আক্ষেপে উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিল।

১৮১। মঠা কাঠালের আঠা বেশী।

১৮২। নিগুণ্যা মাইন্‌ষের
তিন গুণ্যা আলা।

১৮৩। * নাই চাম,
রাধাকৃষ্ণ নাম।

১৮৪। আউড়া নগে
সুন্দইরের মুগৈর।

১৮৫। কালা পোলার নাম
পদ্মলোচন।

১৮৬। অতি বড় যুবতীর নাহি মিলে ঘর,
অতি বড় গুণবতীর নাহি মিলে বর।

১৮৭। যার ঝি তার জামাই
পাড়াপরসীর কাম কামাই।

১৮৮। আপনা শাশরী সেলাম পায় না,
নানী শাশরী পিড়া বায়।

১৮৯। কাচারী বা কই
কান মলে বা কই।

১৯০। দিন যায় এ্যামে ভ্যামে,
রাইত যায় কোদাল কামে।

১৯১। আগে খায় না রাগে বাগে,
শেষে খায় সবার আগে।

১৯২। দিনে থাকে রাঢ়ে বঙ্গে,
রাইতে আসে কিবা রঙ্গে।
রাইতে—রাত্রিতে।

১৯৩। অসতীর বড় গলা,
শুনতে কান ঝালাপালা।

১৯৪। এক নানী শাশরী কয়
আরেক নানি শাশরীরে
সমান হইয়া বয়।

১৯৫। এক খায় পাইলে,
আর খায় পরখে।

১৯৬। আগে গেলে বাঘে খায়,
শেষে গেলে সোনায় পায়।

১৯৭। মাছের নিষ্টা পোয়া,
ইষ্টের নিষ্টা মৌয়া।
নিষ্টা—নিকৃষ্ট।
ইষ্টের—আত্মীয়ের।
মৌয়া—মেসো।

১৯৮। ছাল নাই কুত্তার
বাঘা নাম।

১৯৯। অরেরেত ডড়াই না,
কাপানিরেই ডড়।

২০০। যাবিন হয় ভরতে,
গাছে ওঠে মরতে।

২০১। কর্ত্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন।
নাড়াবনে গৈর।
গৈর-গড়াগড়ি

২০৩। জোবায় নাইয়া,
বেজোবায় মরে বাইয়া।
জোবায়—সুবিধামতে।
নাইয়া—নৌকাচালক।
বাইয়া—বাহিয়া।

২০৩। পাইছৎ একটা ছুতা,
ভাতারে মারছে গুতা।
ছুতা—অজুহাত।

২০৪। পেটে নাই গাদি,
ভাতে পড়ে লাদি।
গাদি—যায়গা।
লাদি—আরসুলা বা ইঁদুরের বিষ্ঠা।

২০৫। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।

২০৬। আমি যে ভাবিরে ভাই,
তুমি যাওবা কার নায়।
নায়—নৌকায়।

২০৭। জপতপ ভাইরে।
বোঝবা যাবার কালে।

২০৮। পাত কাকের ছাও,
বাসায় করে রাও।
ছাও—বাচ্ছা।
রাও—রব।

২০৯। ফোটা করে ফাটি করে
ঘেটি করে কাইৎ।
দিনে করে সাধুগিরি
চুরি করে রাইৎ।
ঘেটি—ঘাড়।
কাইৎ—হেলান।
রাইৎ—রাত্রিতে।

২১০। রান্ধিতে সয়,
বাড়্তে সয় না।

২১১। জন্ম গেল কর্ম্ম কর্তে।
দুই আটু গেল সেলাম কর্তে।
আটু—হাঁটু।

২১২। নসিবের এমনি খেলা,
যারে কই ভাই, সে কয় শালা।

২১৩। গৃহস্থে কয় দোয়াশীলা,
পাড়া পড়শী কয় বছর বিয়ানা।
দোয়াশীলা—দুইবৎসর অন্তর
যে গাভী বিয়ায়।

২১৪। দুই নায় দুই পাও।
* * * এই বাও।

২১৫। দুই নায় পাও দিলে,
ঝপ কইরা পড়বা জলে।

২১৬। মনের মত খুটী নাটী
এরই নাম দুষ্টি ঘটী।

২১৭। ধান ঘাটতে বাড় সয়,
চুল বাঁধতে মানা।
ধানঘাটনী আর চুল বাঁধে না।

২১৮। শাখার ঝন্ ঝন্,
টাকার কন্ কন,
লেখাপড়া ঠন্ঠন,

২১৯। কালা জগতের আলা,
ধলা ধুতুরা ফুল,
তারে না থোও গাঙের কুল।
না—নিম্ন।

২২০। খাইতে দাইতে খলবল,
দিন দিন যায় * * তল।

২২১। যার পোলায় যত পায়,
তার পোলায় তত চায়।

২২২। খাইতে খাইতে গলা বলে,
হাটতে হাটতে নালা বলে।
বলে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২২৩। এত টাকাই ঋণ,
আর এক পয়সার ঘি কিন্।
কিন—ক্রয় কর।

২২৪। যদি পড়ে সময়ের ফের,
ওল্টা হয় ছুত্তি আধসের।

২২৫। যার গলায় ঘা সে বলে বাচুম।
যার হাটুতে ঘা সে বলে মরুম।

২২৬। পীরিতের পেত্নী।

২২৭। পরের পুত্রে পুত্রবতী,
লোকে বলে ভাগ্যবতী।

২২৮। অদেষ্টের কিল
পুতেও কিলায়।
অদেষ্ট—অদৃষ্ট।
পুতে—পুত্রে।

২২৯। ঘাড়ে নাই লম,
পুথি পড়নের যম।

২৩০। নাক নাই ষাগী
বেসর পড়ে।

২৩১। মোটে নাই মাজা,
ভাইতে পড়েন পাছা।

২৩২। যত কয়,
তত নয়।

২৩৩। আপনা তাপের আকাল নাই,
আবার পরস্তাব।
আকাল—অন্ত

২৩৪। বাঙ্গার পোয় কি
সাধেই আছাড় খায়?

২৩৫। সাধ করে ত লক্ষীন্দরই বিয়াই,
কেবল * * * গুল দেয় না।

২৩৬। পীরিত কর কুরীত কর
কেবল মনঃকষ্ট।
বোন্দা কর হৈয়া কর
কেবল টাকার নষ্ট।
বোন্দা—বন্ধুত্ব।
হৈয়া—সই।

২৩৭। সাজাইলে গোজাইলে
বান্দীর পোলাও রাজা সাজে।

২৩৮। আগে দেয় না একটু দুধ,
শেষে দেয় গাই বাছুর।

২৩৯। খোলার খোলাও গেল,
লোটের খোলাও গেল।

২৪০। যত দেখে কালা কালা
সবই যেন বাপের শালা।

২৪১। এক জোয়ারে কি
জার যায়।

২৪২। কয়েদির আবার
ব্যালাখানা।

২৪৩। বাঘ বুড়া হইলেও
থাপ ভুলে না।

২৪৪। যে রাঢ়ের আছে মা,
তারে ডাকতে হয় মা।

২৪৫। আপনা দোষের আকাল নাই,
পরের দোষে খুরি।

২৪৬। কান কাটা বিড়াল।

২৪৭। ঘর থাকতে
বাবুই ভিজে।

২৪৮। খুটার জোড়ে
মেরা কোঁদে।

২৪৯। নাপ্তের ষোল চুঙ্গা বুদ্ধি।

২৫০। কানা,
মনে মনেই জানা।

২৫১। সে গাধায় সে জল খায়,
আগে আউল্যায়।
আউল্যায়—আলোড়ন করে।

২৫২। কর্ত্তার পাদে গন্ধ নাই।

২৫৩। রাঙ্গায় খায় কি? ঘি,
ঘি না থাকলে।—আঙ্গুলই চাটে।

২৫৪। পেটে পেটে বুদ্ধি।

২৫৫। আগে কয় রাধা কৃষ্ণ,
বিড়ালে ধরলে ট্যাও ট্যাও।

২৫৬। লোক যেন পোক।

২৫৭। সাধ কইরা কানা সাজা,
আর সাধা লক্ষী পায় ঠেলা।

২৫৮। কি খাইতে কি নাই,
বেঙ্গুন খাইতে ঝাল নাই।
বেঙ্গুন—ব্যঞ্জন।

২৫৯। বুলবুলি লো সই,
পরন কথা কই।
আজ খাইলা আমার বাড়ী,
কাইল খাইবা কই?

২৬০। রামাধোপা শ্যামা ধোপা,
সকল বেটারই এক চোপা।

২৬১। কুটাত কুটা,
বাইর বাড়ী গা কুটা।
গা—গিয়া।
বাইর—বাহির।

কোটয়ালে নিব ধার : ভাঙ্গিবেক গাবুরয়াল : (১)
তুলিয়া দিবেক নিয়া শাল ॥
যবে মিন আদি করি : নাহি ৮এ (২) দেশান্তরি :
না আইসএ প্রদেশী যুগীয়া ॥
আর দেশে যায় যোগী : ঘরে ঘরে খায় মাগি :
প্রাণ লৈয়া জাঅ পলাইয়া ॥
আমি তোকে কহি দড় : আমার বচন ধর :
চল ঝাটে আমার আলএ ॥
এথাতে থাকহ জবে : কোন জনে দেখে তবে :
ঝুলি খাঁতা লইবেক কাড়ি ॥
আঁচলে ঢাকিয়া নিমু : মণ্ডবেত বাসা দিমু :
থাল ভ'র দিমু দুগ্দ ভাত ॥
নিতি নিরামিশ্ব খাই : ব্রহ্মানি আচার মুই :
চল যাই আমার বাসাত ॥
কহিলাম তোমারে তবে : পাইলে মিনের হাতে :
প্রাণ লৈব জানিঅ প্রদেশী ॥
চল তুমি আমার বাড়া : পালিমু যে যত্ন করি :
যেন তুমি হৈলা গৃহবাসী ॥
আবলে কহিএ তোকে : কেবা জানি তোমা দেখে :
উঠ যোগী চল জাই ঝাটে ॥
আগে আগে হাট তুমি : পাছে পাছে যাই আমি :
যত কথা কৈমু ভাটে ভাটে ॥
যুবক যুবকির কথা : হেট কেনে কর মাথা :
হাসিয়া না চায় কেনে মুখ ॥
শুনিয়াছি ইতিআস : বএসে নাহিক দোষ :
পাপ নাহি না ভাবিয় দুক্ষ ॥
যোগীর ঘরে যোগী যাইবা : অন্যজন স্থিতি পাইবা :
কার কিছু না হইব ভএ ॥
তুমি আমি জাতিগন : হৈলাম আনি উপাসন :
দোষ নাহি শুন মহাশত্র ॥

(১) শাক্তমত্তা।
(২) সহ্য করে।

যুবক যুগী তুমি : যুবক যোগিণী আমি :
জে থাকে (.) করিমু ব্যবহার ॥
সেবিবাম রাত্র দিনে : ভিন্ন ভিন্ন নাহি মনে :
অদীনেতে পালিমু তোমারে ॥
কাটিমু যে চিকন সুত : দেখিবা যে আদভুত :
অপনি বুনিবা দিব্য ধুতি ॥
তোরে লৈয়া যাইমু হাটে : পথে বাহি রহ যে (২)ঝাটে :
বেচিয়া আসিমু শীঘ্রগতি ॥
তবেত সমাজে যাইবা : . মধুভাণ্ড (৩) আগে পাইবা :
কথা কৈবা দুই হস্ত নাড়ি ॥
জাতি গোত্র সব পাইবা : আনন্দে বসিয়া খাইবা :
দূরে যাইব খাতা আর ঝুলী ॥
শীঘ্রগতি চল যাই : নিয় রে আমার ঠাই :
ঘরে মুদ্রা আছে লক্ষকুটী ॥
জীবন সাফল্য হৈব : সদাএ তোমার দেখা পাইব :
সাতে আসি খাঅ মধুভাত ॥
প্রতিনিতি সেবিব খাটেত বসাইয়া থুইব :
দুইজনে খাইমু এক সাত ॥

খর্পছন্দ পয়ার

হাসিয়া বলিল তবে জতি জে গোর্ক্ষাহি।
ভালকথা যোগিণী শুনিল তোর ঠাই ॥
মাগিয়া খাই যোগী আমি ভ্রমি প্রতিদেশ।
এমত দেশেত কেহ না করে প্রবেশ ॥

(১) কপালে যাহা থাকে।
(২) পথে পসরা বহিয়া তুমি রাস্তার ই দাঁড়াইয়া থাকিও, হাটের গোলমালে আর তোমার যাইতে হইবে না, আমিই তথায় যাইয়া ধুতি বেচিয়া আসিব।
(৩) মদ্যভাণ্ড? তান্ত্রিক চক্রে মদ্যের ব্যবহার খুবই হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননীয় জনকে সর্ব্ব প্রথম মদ্য দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

শুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভএ।
মাগিয়া খাইতে আইলাম জীবন সংশএ॥
কোন দেশে নাহি শুনি এমন প্রমাদ।
কদলির রাজ্যেত নিয়া যুগী করে বদ॥
ভালকথা রাউলানি (১) কহি (যে) অখন।
মিনেরে দেখিতে মোর হইয়াছে মন॥
সরল বচন কহ রাউলের ঝিই।
কিরূপে দেখিমু মুই ঈশ্বর মিনাই॥
কিরূপে যাইতে পারি মিননাথের পুরী।
কেমতে আসিতে পারি আপনে সোন্দরী॥
কেমনে পাইমু আমি মিনের দরশন।
কহরে জুগিনী কৈন্যা স্বরূপ বচন॥
নাথের বচন শুনি যুগীর ঝিয়াই।
আমি কহি শুন দেখা পাইবা মিনাই॥
পুরুষের গতি নাই পুরির ভিতর।
নির্ত্তকি সকল জাইতে আদেশ রাজার॥
আর জন যাইতে নারে মিনের সাক্ষাতে।
ছল করি যাইতে পারে তাহার সভাতে॥
আমার বাড়ীতে আইস অমি নিব তোরে।
নাটোআর ভেসে চল নির্ত্ত করিবারে॥
নাটোয়ার সঙ্গি তোর করি দিব মিতা।
মিনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ছোথা॥
নাথে বলে কহি শুন যুগীর কুমার।
তোমার ভোবনে আমি যাইতে না পারি॥
তোমার বাড়ীতে জদি আমারে দেখীলে।
মোরে তুলি খোটা দিব জত জুগী রাউলে॥
চল চল যাহি তুমি আপনার ঘরে।
মোর বরে হৈবা তুমি পরম সোন্দর॥

আর এক বর দিলাম চলি জায় ঘর।
রত্নসব ভরিয়াছে তোমার ভাণ্ডার॥
সুবর্ণ রজত ঘর্ ভরিয়াছে চাউলে।
হাসিয়া বোলান (১) দেউক জত জুগী রাউলে॥
ধর ধর যায় তুমি অষ্ট অলঙ্কার।
এহারে পরিয়া চল ঘারে আপনার॥
ঝুলি হৈতে খসাইয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার।
এহারে পরিয়া নারি আনন্দ অপার॥
চল চল যুগিনী ঘরেত চল এবে।
নাথের বচন শুনি চলি যায় তবে॥
নাথেরে এড়িয়া যাইতে নাহি লয় মনে।
ধীরে ধীরে যায় নারী অনুজোগমনে॥
মন দুক্ষে জল ভরি ধীরে ধীরে যায়।
যাইতে নাহিক ইচ্ছা ফিরি ফিরি চায়॥
যাইতে নাথেরে এড়ি পাও নাহি চলে।
কথদুর গিয়া ঘাড়া ভাঙ্গিলেক ছলে॥
ঘাড়া ভাঙ্গি কান্দে নারী আসিলেক দাএয়া (২)।
ফিরিয়া আইল কন্যা যোগীর লাগিয়া॥
ভাঙ্গিল আমার ঘাড়া যাইব কেমতে।
কোথায় পাইব মুহি কলসি কিনিতে॥
ভাঙ্গিল কলসি মোর তোমার কারণে।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে প্রাণে॥
তাহাকে শুনিয়া নাথ হৈল মহারোষ।
ঝুলি হতে খসাইয়া দিল সোনার কলস॥
চল চল যোগিনী চলিয়া যায় ঘর।
আপনি ভাঙ্গিলা ঘাড়া পরেরে দেখায় ডর॥
মুখে লজ্জা নাই তোর ফিরি আইস কেনে।
তুমি যেই চায় সেই নাহি মোর মনে॥
জায় জায় বলি নাথে বলে ঘন ঘন।
কান্দিয়া বিধল নারী কেমা নাই মন॥

(১) রাউলানি, রাউলের ঝি, যোগীর ঝি ইত্যাদি সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই গৃহস্থ যোগী দিগকে রাউল বলিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক শ্রেণীর গুজরাটি ব্রাহ্মণদের রাউল উপাধি আছে।

(১) হরিবোল ? জয়ধ্বনি ?
(২) ধাইয়া।

ফিরি ফিরি আইসে আর কত দুর যায়।
কেফোরাইয়া কেফোরাইয়া কান্দে যাইতে না চায়॥
দেখিয়া জে জতীনাথে উপরে ফাফরে।
৩ ভুবন সাক্ষী করি যতী নাথে বলে॥
সাক্ষী হইও রবি শশী মোর দোষ নাই।
ফিরি ২ আইসে কেনে যুগীর ঝিয়াই॥
সাক্ষী হইও দেবধর্ম্ম সাক্ষী হইও তুমি।
বৈরাগী মারিয়া পাও ভাঙ্গিবাম আমি॥
নিঠুর বচন শুনি যোগিনী চলিল।
ততক্ষণে যতিনাথে আসন তুলিল॥
মিনের পুরিতে যাইয়া হৈল উপস্থিত।
গুরু গুরু বলি নাথে চলিল ত্বরিত॥
সিদ্ধা না দেখিয়া নারী তবে ঘরে গেল।
ততক্ষণে গিয়া গোর্ক্ষে পুরীতে মিলিল॥
মিনের পুরীতে গিয়া হৈল উপস্থিত।
রত্নময় পুরী খানি দেখিল শুভিত॥
মনেত ভাবিয়া গোর্ক্ষে সিঙ্গাতে দিল সান।
চমকিত হৈল তবে মিননাথের প্রাণ॥
পুরীর ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি।
ডাহিনে বামে চাহে নাথে নিজ মনে গুনি॥
সিংহনাদ শুনি মিন হইলেক ভোলা।
ডাণ্ডিআ নিবারে পারে মোঙ্গলা কমলা॥
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মোঙ্গলা দুয়ারি।
আসিছে কেমন যোগী তারে আন ধরি॥
মোর দেশে আসি বেটার এত পাবুরাল।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে দেহ শাল॥
রাজার আদেশ পাইয়া দারিএ তখন।
হাতে অস্ত্র করি তবে আইল জনে জনে॥
একে একে চাহে সবে রাজার উয়ারি (১)।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া গোর্ক্ষে বলে হরি হরি॥
একে একে বিচারে কোঠের আসে পাশে।
মুখেত কাপড় দিয়া গোর্ক্ষনাথে হাসে॥
মহাভোলে পড়িয়াছে ঈশ্বর মিনাই।
কিরূপে আনিমু মুই গুরুরে বুঝাই॥
ভোলেত পড়িছে গুরু আপনা পাসরি।
ভার্গ্যে না পাইল মোরে ষোলশত নারী।
যদি সে পাইত মোরে ষোলশত নারী।
ঝুলি খাতা আমার যে সবে নিত কাড়ি॥
বুদ্ধির সাগর নাথ বিচারে পণ্ডিত।
মনেত ভাবিয়া নাথ স্থির কৈল চিত॥
কিরূপে পারিমু মুই মিনেরে দেখিতে।
নাটোয়ার ভেসে যাইমু গুরুর বিধিতে॥
ই বুলিয়া যতিনাথে উঠীয়া আইল।
বকুলের তলে যাইয়া পুনি দাড়াইল॥
নন্দ মহানন্দ তারা দুই ভাই।
আনিয় নাটোয়া রূপে গুরুরে চেতাই॥
বিশ্বকর্ম্মার স্থানে গিয়া কহ মোর কাজ।
শীঘ্র করি দেউক মোরে নাটোয়ার সাজ॥
সুবর্ণ মৃদঙ্গ দেউক সুবর্ণের তাল।
সুবর্ণ ছিকল দেউক যেন লাগে ভাল॥
গোর্ক্ষের বচন নন্দে না করে অন্যথা।
ঝাটে চলি গেল বিশ্বকর্ম্মা আছে যথা॥
বিশ্বকর্ম্মায় শুনিলেক নাথের সংবাদ।
ততক্ষণে গড়ি দিল না করিল ব্যাজ॥
নানা বর্ণে গড়ি দিল রত্ন অলঙ্কার।
নন্দের হাতেত দিল করিয়া বেবার॥

---

(১) উয়ারি শব্দটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। বর্ত্তমান প্রয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে যে রাজবাটির বাহিরের কোন অংশকে উয়ারি বলিত। দেউরি শব্দটির গঠনও উয়ারি শব্দেরই মত। উয়ারি পারস্য বা আরব্য ভাষা হইতে না আসিয়া থাকিলে ইহার একটা অর্থ অনুমিত হইতেছে। ঢাকা নগরের পূর্ব্ব ভাগকে উয়ারি বলে। ইহা হইতে অনুমান করিতেছি যে "উদর দ্বার" শব্দটিই উয়ারি শব্দটির মূল।

মাথের হাতেত নিয়া দিল অলঙ্কার।
একে একে পড়িলেক যত অলঙ্কার ॥
গলাতে দিলেক নিয়া সোল ছড়িহার।
করেত কঙ্কন দিল দেখিতে সুন্দর ॥
কপালে তিলক দিল নয়নে কাজল।
শ্রবনে তুলিয়া দিল বিচিত্র কুণ্ডল ॥
গাএত কাচলি দিল কমরে খিচনি (১)।
করিল বিবিধ সাজ ভুবনমোহনী ॥
থাউক আনের কার্জ্জ লোভে মুনিগন।
কটাক্ষে চাহিতে হরে জুগী দির্ঘার মন ॥
সুবর্ণে রচিত বস্ত্র পড়িলেক টোব (২)।
আছোক আনের কার্জ্জ দেবে করে লোভ ॥
নন্দে মৃদঙ্গ কৈল্ করতাল মহানন্দ।
আচর্জ নাটোয়া হৈয়া চলে তিনজন ॥
মহানন্দ কান্দে মৃদঙ্গ তুলিয়া।
আপনে নাটোয়া গোক্ষে যাহেন চলিয়া ॥
শুভক্ষণ করিয়া কদলি দিল পাও।
নাটোয়ার নগরে গিয়া তুলিলেক গাও ॥
যত সব নাটকের নাটোয়া সুন্দরী।
নাটোয়া সবে মিলি ঝাট আনিল ধরি ॥
এহিরূপ নাটোয়া যদি মিনেরে দেখাই।
সকল দিনের ফল একদিনে পাই ॥
ই বলিয়া নাটোয়া সব একত্রে মিলিল।
নাটোয়ারে আগে করি তখনি চলিল ॥
দারে আসি মিলিয়া মাদলে দিল হাত।
দুই কর্ণ পাতি শুনে রাজা মিননাথ ॥

দারিএ নাটোয়া দেখি পাড় গেল ভুলে।
এমন নাটোয়া না দেখেছি কোন কালে ॥
এমন নাটোয়া যদি মিনএ দেখিল।
মোঙ্গলা তেজয়ে তাহারে যদি পাইল ॥
মহাদেবী স্থানে আমি কহিতে জুআএ।
যেই মতে নাটোয়া সবের দেখা নাহি পাএ ॥
দারিএ কহিল গিয়া মোঙ্গলার ঠাই।
একখানি কথা আমি কহিবারে চাই ॥
কোথা হনে আসিয়াছে নাটোয়া সুন্দরী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সে যে রূপে বিদ্যাধরী ॥
আর যত নাটোয়া দেখছি বার বার।
এমত সুন্দরী নারী না দেখেচি আর ॥
তুমি সব নহে তার দাসী সমতুল।
তব শিষ্যমানে নাহি ... ... ॥
দারির বচন শুনি দেবী আইল ধাইয়া।
নাটোয়া সুন্দরী তবে দেখিলেক যাইয়া ॥
নাটোয়ার রূপ দেখি মহাদেবীর ডর।
মনেত ভাবিয়া ছন্দ করিল প্রচার ॥
কথা হতে আসিয়াছ কি নাম তোমার।
কাহার নাটোয়া তুমি কহ তত্ত্ব সার ॥
তবে সে যে বোলে আমি ইন্দ্রের নাটোয়া।
নাম মোর সুলচনা নিবেদিল তুয়া ॥
প্রিথিবী ভ্রমিয়া আমি আইলাম এথাতে।
নৃত্য গীত করি আমি রাজার সাক্ষ্যাতে ॥
[নৃত্য গীত করিল] আমি শিবের সভাত।
অনেক প্রসাদ পাইল বহু মূল্য তাত ॥
আর নাট কৈল আমি ব্রহ্মার সভাত।
পুণ্যবর......................বিদিত ॥
তথাতে শুনিলাম আমি মিন মহা দাতা।
তে কারণে আসিয়াছি শুন মোর কথা ॥
নাটোয়ার কথা শুনি মঙ্গলা চিন্তিত।
এ নাটোয়া নাছে যদি মিনের বিধিত ॥

---

(১) কোমরবন্ধের পরিবর্ত্তে এই সুন্দর শব্দটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(২) ঠোস্। সমতল ভূমিতে কিঞ্চিন্নিম্ন স্থান। যথা— "সে হাসিলে গালে টোব পড়ে।" "পাথরে লাগিয়া ঘটিটাতে টোব পড়িয়াছে।"

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ মাঘ ১৩২১ ১০ম সংখ্যা

পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি—
গোবিন্দ দাস *

"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদ-তলে
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে!
কত ভূমিপ-আসন-যোগ্য জন
উটজে করিছে দিন যাপন রে।"

সদ্ভাবশতক।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার নিকটে ভাওয়াল পরগণা অবস্থিত। নিবিড়গজারিবনসঙ্কুল, শ্যামলধান্য-ক্ষেত্রবলয়িত, নানাবিহঙ্গমুখরিত, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীসমন্বিত ভাওয়াল প্রদেশ স্বভাব-শোভার লীলাভূমি এবং সুকবির যোগ্যা প্রসূতি।—("Meet nurse for a Poetic child").

কবি গোবিন্দ দাসের লেখনী নিরন্তর ইহার মহিমা-গানে নিয়োজিত, "ভাওয়াল তাঁহার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল তাঁহার প্রাণ।" ভাওয়াল জমিদারের আবাস-স্থল জয়দেবপুরে যে ক্ষুদ্র নদী 'চিলাই' খরবেগে বহিয়া যাইতেছে, উহার প্রতিবিম্ব কবি-হৃদয়ের স্নেহমমতায় অভিষিক্ত। কবির অমর তুলিকায় উদ্ভাসিত ভাওয়ালের দিব্য কান্তি দেবপুরীর মত চিত্ত-বিনোদ করিতেছে—

"দিগ দিগন্ত আছে ব্যাপি
ঊর্দ্ধে উঠছে আকাশ ছাপি
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারাশি।
সিন্ধু যেন শ্যাম তরঙ্গে—
খেল্‌ছে বনের অঙ্গে অঙ্গে
শীত-বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি।
বনভরা সব যত টিলা—
মাথায় আছে আকাশ মিলা
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি।
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা
উড়্‌ছে মায়ের শ্বেত পতাকা
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিগ্‌দিগন্তে ভাসি।
শুক্‌না বিলে শুক্‌না খালে
বন্‌বরাহ পালে পালে
খুঁজ্‌ছে শালুক পদ্মনালে সলিল-পিপাসী।
বৈশাখে চাতকের ডাকে
নবীন জলদ থম্‌কে থাকে
বন-বালা পূজ্‌ছে দিয়ে 'ভাটি' ফুলের রাশি।

বর্ষাকালে 'বেলাই' বিলে
শাপ্‌লা শালুক সুন্দী মিলে
কমল-বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, ৭ মাঘ, ১৩২১ বাঙ্গাব্দ।

ভারতী কি স্নেহের ভরে
বীণা রেখে কবির করে
পদ্ম-সরে হ'য়ে আছেন পদ্মবনবাসী।
ওগো শ্যামা বনভূমি
বিপুলা বিশালা তুমি
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী।
আমি বা বুঝিব কি মা
তোর ও শ্যাম মহিমা
তথাপি সেবিব তোরে, চির অভিলাষী
আমি তাইতে হেথা আসি।" (১)

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জীবিত আছেন। জীবিত কবির জীবনী লেখা রীতিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিব, কারণ তাঁহার দারিদ্র্য নিপীড়িত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি না জানিলে তাঁহার কবিতার উদ্দেশ্য সব সময় পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে ভাওয়াল-জননী এই স্বভাব-লালিত কবি-পুত্রটীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহার দুই চারিটী কথাও উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন হইবে।

(ক) সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৬১ সালে ৪ঠা মাঘ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জয়দেবপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয়। পরিবারে তখন তাঁহার অতি স্থবির পিতামহ, পিতামহী, মাতা ও সূতিকাগারস্থ কনিষ্ঠ সহোদর। এই দুরবস্থায় শিশু ভাইটির দুগ্ধাভাবে জীবন যাওয়ার উপক্রম হইলে বদান্যবর ভাওয়ালরাজ কালী নারায়ণ রায় বাহাদুর দুগ্ধের মূল্য বাবদ ৪৲ মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং কিছুদিন পর এই বৃত্তির পরিবর্ত্তে কতক নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।

গোবিন্দ দাস মহাশয়ের পিতার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার বাড়ী কবির পিত্রালয়ের অদূরেই অবস্থিত ছিল। অনেক সময় গোবিন্দ দাস তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিতেন, এবং উক্ত জ্যেঠা মহাশয়ের শ্যালক নন্দরাম ঘোষের নিকট প্রথম বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। ভাওয়ালরাজ-দুহিতা শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবীকে তখন কালীচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি লেখাপড়া শিখাইতেন। অল্পদিন পরই কৃপাময়ী দেবীর সহিত মিত্র মহাশয়ের নিকট কবি লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। সময় সময় কৃপাময়ী দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় কবিকে হাতে ধরিয়া লেখাইতেন। পরিণত বয়সে কবি সেই স্মৃতি মধুর কবিতায় দেহবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—

"আজিও কি আছে মনে ভোল নি ভগিনি!
দুই জনে এক সাথে, শিখেছি কলার পাতে
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি!
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে
কৃপাময়ি, করুণার তুমি নির্ঝরিণী"।

প্রেম ও ফুল, ১০৭ পৃঃ।

এইরূপে রাজবাড়ী অল্পদিন লেখা পড়া করিয়া জয়দেবপুর বাজারে মঙ্গল পালের দোকানে এক সরকারের নিকট গোবিন্দ দাস প্রথম গণিত ইত্যাদি শিক্ষা করেন।

রাজকুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের যখন লেখাপড়া শিখিবার সময় হইল, তখন রাজা কালীনারায়ণ জয়দেবপুরে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করিলেন। কবির গুরুপুত্র এবং রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের মধ্যম মাতুল ৺ প্যারীমোহন গোস্বামী রাজমাতা শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবীকে অনুরোধ করিয়া গোবিন্দ দাস মহাশয়কে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাজমাতা দয়াপরবশ হইয়া কবির পুস্তকাদি কিনিয়া দিলেন। এইরূপে রাজবাড়ীতে থাকিয়া রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সহিত তিনি একত্র লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন, ও যথাসময়ে "ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন।

(১) নব্যভারত, ১৩১৬ সন, বৈশাখ সংখ্যা, ৭পৃঃ।

রাজা কালীনারায়ণ "ভাওয়াল প্রজা হিতৈষিণী সভা" নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া প্রজার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় গোবিন্দ দাস মহাশয় একদিন একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। তাহা এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে রাজা বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া ঢাকা নর্ম্মালস্কুলে পড়িবার জন্য কবিকে মাসিক ৫৲ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তদনুসারে গোবিন্দ দাস ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ২ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় বৎসর ছুটিতে বাড়ী আসিয়া আর পড়িতে গেলেন না। এখানেই তাঁহার নর্ম্মাল স্কুলের পড়া পরিসমাপ্ত হইল।

তৎপর ভাওয়াল ব্রাহ্মণগ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে প্রায় একবৎসর কাল হেড্‌পণ্ডিতী করিয়া, ঢাকায় তৎকালে নবস্থাপিত মেডিকাল স্কুলে পড়িতে আসেন। রাণী সত্যভামা দেবী তাঁহার ব্যয় বহন করিতেন। কিন্তু এখানেও ২ বৎসরের অধিক পাঠ করা হয় নাই। স্কুল ছাড়িয়া আবার বাড়ী গিয়া বসিলেন। কিছু দিন পর তিনি রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কার্য্য প্রাপ্ত হন।

এই কর্ম্মে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, গোবিন্দ দাস, নানা কারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ভাওয়ালে দুর্ভিক্ষ। অনশনে শীর্ণ, সহায়-সম্পদ-হীন গোবিন্দ দাস ১২৮৬ সনের পৌষ মাসে প্রথম ময়মনসিংহে গমন করেন। তখন রেলপথ হয় নাই, হাঁটিয়া চতুর্থ দিনে ময়মনসিংহে পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে অকৃত্রিম সুহৃৎ, উদার-হৃদয়, দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়দ্দিন বিশ্রাম করিলেন। তখন ময়মনসিংহে "সারস্বত উৎসব" হইতেছিল। সেই উপলক্ষে গোবিন্দ দাস একটী কবিতা পাঠ করেন এবং তাহা স্থানীয় পত্রিকা "ভারতমিহিরে" প্রকাশিত হয়। সে সময় সুষঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহের যত্ন ও উদ্যোগে "আর্য্য প্রদীপ" ও "কৌমুদী" নামে দুই খানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। "ভারতমিহিরে" কবিতা পাঠ করিয়া মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ কবিকে সুষঙ্গে লইয়া যান এবং খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সুষঙ্গের জল বায়ু অসহ্য হওয়ায় মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার ৺কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর নিকট কার্য্য প্রাপ্ত হন। ইঁহার সহিত একদা "ভৈরব" ভ্রমণ কালে কবির প্রসিদ্ধ "বরষার বিল" লিখিত হইয়াছিল। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

অনন্তর কেশব বাবুর কার্য্য হইতে ছুটী লইয়া জয়দেবপুর আসেন এবং কিছুদিন ময়মনসিংহের এক এণ্টান্স্ স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ঐ পদ উঠিয়া গেলে "আত্মোৎসর্গ"-প্রণেতা ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সমিতির" লাইব্রেরিয়ান্ নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করেন। পরে সেরপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে ময়মনসিংহ টাউনে 'চারুবার্ত্তা' ও "চারু প্রেসের" ম্যানেজার হন। তৎপর উক্ত চৌধুরী মহাশয় কবির গুণে আকৃষ্ট হইয়া কবিকে নিজ সন্নিধানে প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বরূপে রাখেন। এখানে তিনি প্রায় ৮।৯ বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতা সেরপুরে লিখিত হইয়াছিল।

১২৯২ সনে তাঁহার প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর লোকান্তর হয়। এই উপলক্ষে কবির বিদীর্ণ হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাসময়ী কবিতাগুলি বঙ্গ সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

বিদেশে চাকুরী করিলেও কবি মধ্যে মধ্যে স্বীয় জন্মভূমি জয়দেবপুর আসিতেন এবং রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময় কবির "প্রেম ও ফুল," "কুঙ্কুম" (১২৯৬ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর তাহা পাঠ করিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, রাজ-সরকার হইতে কবির দ্বিতীয় পরিণয়ের ও ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যয় দিতে প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু হঠাৎ এক দৈব দুর্ঘটনায় কবির প্রতি রাজার রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।———“নবযুগ” নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ তখন কলিকাতা হইতে বাহির হইত। সেই পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে অতি তীব্রভাষায় একটী প্রবন্ধ বাহির হয় এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রতিও সামান্য কটাক্ষ থাকে। ইহাই রাজার রোষের কারণ হইল, এবং গোবিন্দদাস মহাশয়কে এই প্রবন্ধের লেখক সন্দেহে রাজা এত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তে এবং সেই ট্রেনেই গোবিন্দ দাস মহাশয়কে চির দিনের জন্য জয়দেবপুর ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে এই নিদারুণ আদেশবাণী অনুসারে রাজগৃহে প্রতিপালিত কবি প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। বস্তুতঃ গোবিন্দ দাস সেই প্রবন্ধ লেখেন নাই, ইহা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজার নিকট বলিলেও কিছুতেই রাজার বিদ্বেষের ও কোপের শান্তি হইল না। এই সময়কার কবিতাগুলি এরূপ হৃদয়-বিদারক শোকপূর্ণ যে, তাহা যিনি পড়িয়াছেন তিনিই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সেরপুরের চাকুরী ছাড়িয়া কবি কিছুদিন নব্যভারত প্রেসের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। তৎপর জমিদারী কার্য্যের চেষ্টায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল মহাশয়ের সুপারিস সহ প্রার্থী হন এবং রবিবাবুও কাজ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এমন সময় মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্তের ষ্টেটে একটী নায়েবী লইয়া গোবিন্দ দাস মহাশয় পূর্ব্বপরিচিত বহুবন্ধুসম্পন্ন ময়মনসিংহে চলিয়া আসেন। এ কার্য্যে ৫।৬ বৎসর ছিলেন। নায়েবী কার্য্যে প্রজাপীড়ন করিতে হয়, এজন্য ইহা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দয়াশীল বদান্যবর রাজা জগৎকিশোর আচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তদবধি গোবিন্দ দাস মহাশয়কে মাসিক ২০৲ সাহায্য করিতেছেন। ভাওয়ালের মৃত কুমার বাহাদুরত্রয় (রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্রগণ) ভাওয়ালের কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং ৩ জনে মাসিক ৮৲ করিয়া ২৪৲ করিয়া বৃত্তি দিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের লোকান্তর হইবার পর মাত্র বড় কুমারের পত্নী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী মহোদয়া পতিপ্রদত্ত মাসিক বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সদ্বৃত্তা মহিলার নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ মান্যগণ্য সভ্যবৃন্দ কবি গোবিন্দ দাসের বাসস্থান নির্ম্মাণ ও স্বচ্ছলতা বিধায়ক মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার ফল কি হইয়াছে জানি না।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইল তাহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। একে বাঙ্গালী জীবনই সচরাচর বিশেষত্ব বিহীন, তাহাতে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে ভগ্নপঞ্জর কবির জীবনে আর বৈচিত্র্য কি থাকিতে পারে? তবে গ্রীক কবি থিওক্রাইটাসের (Theocritus) কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, বস্তুতঃই “দারিদ্র্য কবিত্বের প্রসূতি।”

(খ) কবিতার আলোচনা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের নিকট ১৩২০ সনের ৩রা পৌষ তারিখে কবি গোবিন্দ দাস একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার কবিতার মূল মন্ত্র ও আদর্শ লিখিতছিল—“আমি কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা বড় ভালবাসিতাম, এখনও বাসি। তাঁহার কবিতাই আমার আদর্শ ছিল। তাঁহার কবিতায় কলকৌশলের কায়দা, কুস্তি-কসরৎ, তেমন না থাকিলেও, সরল ভাবের ও তরল ভাষার তাহা স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ-উৎস। টানিয়া খিঁচিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া, টীকা টীপ্পনি দিয়া নিঙরাইয়া উহার রস বাহির করিতে হয় না, অথবা আঁধার ঘরে হাতরাইয়া উহার উদ্দেশ্য

উদ্ধার করিতে হয় না। তাঁহার কবিতা কুহেলিকায় বা আব্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া কোন ভৌতিক ভীতি প্রদর্শন করে না; কাটখোট্টার মত কট্মটেও নহে। নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিঘ্নে সে মাধুর্য্য উপভোগ করা যায়। এজন্য নবীন বাবুর সেই সরল সরস কবিতা শৈশব জীবনেই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।" গোবিন্দ দাসের পাঠকমাত্রই জানেন, কবি এই মহৎ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার কবিতা স্বচ্ছ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মত অনায়াসে পাঠকের হৃদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, খোলা মাঠে একখানি ফুলের বাগানের মত স্নিগ্ধনির্ম্মল সৌরভে চিত্তকে পুলকিত করিয়া তোলে। চম্পকের গন্ধের মত, চন্দ্রিকার সুষমার মত, যৌবনের সৌন্দর্য্যের মত, রমণীর কমনীয়তার মত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এ গুণ গোবিন্দ দাসের কবিতায় বিরাজ করিতেছে। দুটী একটী উদাহরণই যথেষ্ট হইবে—

"বরষার বিল,
এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল;
পানা, জল, ঘাস, গাছে, কত কি মাধুরী আছে
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল।
ডাকে জলচর পাখী, দামদলে থাকি থাকি
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল?
সুনীল লহরী তুলি, নাচাইছে দুলি দুলি
সন্ধ্যার শীতল এই মলয় অনিল
নূতন সলিলে ভরা বরষার বিল।
সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্দ্ধ চন্দ্র এক
রজত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক
ঘাসের ছায়ায়, গায়, কুমুদী হারায়ে যায়—
সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক!
কি সুন্দর লুকোচুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁরী—
লগে লগে থেকে ধরা দেয় না বারেক!
শু'য়ে থাকে সন্ধ্যারেতে, কৌমুদী কুমুদ পাতে—
ঝোপে ঝাপে ধানক্ষেতে ঠিক নাই এক
এ সামান্য বিছানায়, ও কম কিরণকায়
নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক—
দেখি নি এমন শোভা—দেখেছি অনেক!

গোবিন্দ দাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তিনি সংস্কৃত কি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গোবিন্দ দাস আধুনিক ভাবে ধরিতে গেলে বিদ্বান্ নহেন। নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী তাঁহার বিদ্যার পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাহার সরল তরল ভাষার উৎসের নিকট তেমন বাগ্মিতা পরাভূত—

"পরশুরামের শোণিত তর্পণের" সেই ভীষণ অভিনয়-ভয়ে যেন সমস্ত প্রকৃতি জড়সড় হইয়া আছে—

"অদূরে হিমাদ্রি ভারতপ্রাচীর,
অনন্ত আয়ত মূরতি গম্ভীর,
চেয়ে আছে যেন তুলি উর্দ্ধে শির,
সভয়ে ভূধররাজ!
পারে না চাহিতে নিয়ে ধরাতলে
পঙ্করক্ত হ্রদ গর্জ্জিয়া উছলে
সফেন তরঙ্গ ছুটে মহাবলে
ভীষণ ব্যাপার আজ!
প্রচণ্ড অনল দ্বাদশ মিহির
মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর
অঞ্জলি পূরিয়ে লইয়া রুধির
দাঁড়ায়ে হ্রদের তীরে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত—
ডাকিছে গম্ভীরে পৃথিবী স্তম্ভিত
শত মেঘমন্দ্রে নভঃ বিকম্পিত
সমীর বহিছে ধীরে।"

আমাদের মনে হয় কালিদাসের "নিষ্কম্প বৃক্ষং নিভৃত দ্বিরেফম্, মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্ কাননম্" এর ন্যায়

আর একবার এমনই বিরাট গম্ভীর ভাব দেখিয়াছিলাম।

কেহ কি সহজে বিশ্বাস করিবেন যে, যে লেখনী এই গম্ভীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহাই চতুর্থীর চারু চন্দ্র দর্শনে বঙ্গ গৃহের নিভৃত কোণে বালিকা বঙ্গবধুর মধুর চিত্র অনায়াসে ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

"চতুর্থীর চারু চন্দ্র শারদ আকাশে,
অনন্ত অসীম নীলে একা একা হাসে
গৃহকোণে বঙ্গবধূ, লুকাইয়া হাসে মৃদু
ঈষদ্ ঘোমটা যেন খুলিছে বাতাসে।
সে পবিত্র দেবদেহ, পারে না দেখিতে কেহ
অনিন্দ্য অতুল তনু ঢাকা নীল বাসে।
ফোটে না মুখের কথা, মৌনময়ী সরলতা
কিরণ প্রতিমাখানি কারে না সম্ভাষে।
আপনি আপন প্রাণে, কেবলি হাসিতে জানে
হাসির সরল শিশু একা একা হাসে
চতুর্থীর চারু চন্দ্র শারদ আকাশে।"

প্রেম ও ফুল--নষ্টচন্দ্র—১১০ পৃঃ।

ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের রচনাতে অল্লাধিক পরিমাণে য়ুরোপীয় শিক্ষা বা সভ্যতার ছায়া পড়িয়াছে। অবশ্যই তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য-সম্পদ, ভাব-সম্পদ্ উন্নত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাস বাঙ্গালী গৃহের খাঁটি চিত্র, বাঙ্গালী জীবনের অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, শোকদুঃখ, আধুনিক কবিদিগের মধ্যে যেরূপ অবিমিশ্র ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই—শিশু 'ভোলাকে' লক্ষ্য করিয়া কবি "দিগ্বিজয়ী বীর" ("বৈজয়ন্তী ১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

"এ নহে নাদির শা, এ নহে জঙ্গিস খাঁ
এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,
আসে নি হিমাদ্রি লংঘি, নাহি সৈন্য নাহি সঙ্গী
নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনুতীর
পথে পথে হাহাকারে, আসে নি কাঁদায়ে কারে
আসে নাই দেশে দেশে বহা'য়ে রুধির,
আসিয়াছে পুষ্পরথে, সুমেরুর স্বর্ণপথে
উড়ায়ে কনকরেণু কিরণে মিহির
একাকী এসেছে ভোলা, মমতার হাত খোলা
করুণা গলিয়ে পড়ে আখিনীলে নীর!
এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর॥
বিশ্বয়-লাবণ্য তার, স্নেহ দয়া মমতার
পরাভূত সর্ব্বভূত এই পৃথিবীর
সে যাহার ধরে গলে, হিমাদ্রি হ'লেও গলে
বহে নেত্রে শতধারা সুধা জাহ্নবীর।
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে, সাগর ফোঁপায়ে ওঠে
শিহরে নারীর বুক, স্তনে ঝরে ক্ষীর।
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর।
এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর॥
... ...
সে জানে না জাতিভেদ মানে না কোরাণ বেদ
মানে না আচারধর্ম্ম মুনি-মৌলবীর।
... ...
সে এক সম্রাট্ প্রভু, সে নহে অধীন কভু
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর॥"

এক বারেই বলিয়া রাখা ভাল যে, গোবিন্দ দাস স্কচ্ কবি বার্ণসের (Burns) মত বস্তুতান্ত্রিক (Realistic) কবি। বার্ণসের মতই রমণী-জাতিকে তিনি শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছেন এবং অন্ততঃ প্রেমবিষয়ক কবিতাময় "ফুল রেণু" বার্ণসের মতই (Sensuous) বা ইন্দ্রিয়লালসা-পূর্ণ। বার্ণসের সেই গান

"Green grow the rashes O
Green grow the rashes O
The sweetest hour that e'er I spent
Was spent among the lasses O"

পড়িতে পড়িতে, গোবিন্দ দাসের কবিতা "আমার ভালবাসা" ("কস্তুরী" ২৯ পৃঃ) মনে পড়িবে—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ !
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা
কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্রেমপদ্মফুল ?
আকাশকুসুম সে যে কল্পনা কলহ
... ...
তোমাদের রীতি নীতি
বুঝি না পবিত্র প্রীতি
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?
আমি তাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।"

বার্ণস্ প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

"Her 'prentice hand she tried on man
And then she made the lasses, O".

গোবিন্দ দাসের প্রকৃতির অধীশ্বরী রমণী। রমণীই বিধাতার সৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। রমণী সৌন্দর্য্যের রাণী, পঞ্চভূত তাহারই সেবার জন্য লালায়িত, তাহারই সেবাপ্রসাদে ধন্য, তাহারই চারিদিকে পদ্মদলের মত বিশ্ব যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। কবি স্বভাবসিদ্ধ মধুর সরল ভাষায় "শাওন মাসের" কথা গাহিতেছেন—

"শাওন মাসের লালছা সন্ধ্যার কালছা আকাশখান
নীল সমুদ্রে লোহিত সাগর ডাকছে যেন বান !
বাহির বাড়ীর উঠানেতে শ্যামল ঘাষের দল
নূতন জলে কচ্ছে যেন টলমল টলমল !
শিশুকোলে চন্দ্রমুখী বেড়িয়ে বেড়ায় তার
কল কল কল জোয়ারের জল নাচে রাঙ্গা পায় !
ক্ষীরোদ সিন্ধু হ'তে ইন্দু লইয়ে ইন্দিরা
উজলি দিক্ আসিছে ঠিক আবার যেন ফিরা।
সারা গায়ে উড়িছে চুল—পাগলা পূবাল বায়
অকল চকল হ'য়ে খেলছে দুজনায়।
আমের ডালে চাতক ডাকে খাতক কোথা তার
শাওণ মাসে বিদেশ করে, এমন পাতক কার ?
... ...
থাক্ বিদেশে, যায় কি এসে ? মিলন অন্তঃপুরে
প্রেমের এমন দীঘল হস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য পুড়ে।"

—নব্যভারত, ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা ২৪৬ পৃঃ।

গোবিন্দ দাসের কবিতাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—

(১) প্রেম-সঙ্গীত (২) শোক-সঙ্গীত (৩) ব্যঙ্গ কবিতা (satires) এবং (৪) দেশপ্রীতির কবিতা (৫) সমাজবিষয়ক কবিতা।

আমরা ইহার প্রত্যেক বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। কিন্তু এই সমুদায় কবিতারই ভাব সরল ও প্রাঞ্জল এবং ভাষা নৃত্যশীল গিরিনদীর মত স্বচ্ছ,অনাবিল।

(১)

প্রেম কবিতার প্রধান পুস্তক "ফুলরেণু" সনেট(sonnet) বা চতুর্দ্দশপদী কবিতায় লিখিত। কালিদাসের 'উমার' মত ভগবান্ যেন প্রেমিকের প্রিয়পাত্রীকে জগতের সর্ব্বসৌন্দর্য্য দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন,

"সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
দেকস্থ সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥"

আমাদের কবি গাহিতেছেন—

"বচনে অমৃত তব, অমৃত নয়নে
স্বর্গীয় অমৃত গন্ধে দেহ সুবাসিত,
সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত ক'রে
নয়নে করিব ভোগ ক'রো না বঞ্চিত।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন
এস দেবি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে করি দুই জন।"

আবার, মৃত পত্নী 'সারদার' প্রেম যেন জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সারা বিশ্ব তাহারই স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া আছে—

"মা-মা-মা সে দেবরাণী দেবদেশে গিয়া
আজিও সারদা বুঝি ভোলে নি আমায়
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায়
তাহারি মমতামাখা মিঠা মিঠা চাওয়া,
নিশির শিশিরভরা তাহারি নয়ন,
তাহারি সলাজ আঁখি দিনে দিবে যাওয়া
তারি মান—নব ঘন চুরি করে মন।

এত প্রেম, এত দয়া আর আছে কার
সারা রাত জেগে থাকে শিয়রে আমার।

ইংরেজ কবি চার্লস্ উলফ (Charles Wolfe) এমনই শোকযুক্ত চিত্তে গাহিয়াছিলেন—

"I do not think where'er thou art
Thou hast forgotten me;
And I perhaps may soothe this heart
In thinking too of thee."

কিন্তু কোন্ কবিতাটীতে বেশী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠক স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন। কোথাও বা কবি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্যই সৌন্দর্য্য কবিতানিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান,
নীল নীরদের আঁচল পেতে
শশাঙ্ক ঘোর আঁধার রেতে
তীব্র উগ্র তীক্ষ্ণ তড়িৎ চাউনি খরশান!
অচঞ্চল পদ্ম ফোটা,
পছন্দ নয় আমার ওটা,
হর্ষে যখন, হর্ষে তখন আমার ভাসে প্রাণ
আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান।
'বৈজয়ন্তী' ১১ পৃঃ।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহার মর‍্যাল (moral) কি? উত্তরে বলিব, দর্পণে যে সুন্দর মুখখানি ফুটিয়া উঠে তাহার মর‍্যাল কি? কাননে যে কুসুম হাসে, তাহারই বা মর‍্যাল কি? টেনীসনের কথায়(Tennyson) বলিতে হইলে

"So, Lady Flora, take my lay,
And if you find no moral there,
Go, look in any glass and say,
What moral is in being fair.

Oh, to what uses shall we put
The wild weed flower that simply blows?
And is there any moral shut
Within the bosom of the rose?"

(২)

শোক-সঙ্গীতের প্রধান কবিতা "শ্মশানে সম্ভাষণ"। ইহা "প্রেম ও ফুলের" অন্তর্গত। উহা ১২৯৪ সনের ফাল্গুনে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু এক ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা। গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহে প্রবাসে ছিলেন। পত্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া ত্রস্তব্যস্ত হইয়া জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন, কিন্তু শেষ দেখা হইল শ্মশানের চিতা-অগ্নির মধ্যে। সেই শোকের উচ্ছ্বাস বঙ্গ সাহিত্যে করুণার এক শুভ্র প্রস্রবন—

"সারদা! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
আজি কত দিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
এই যে নিকটে ডাকি আমি দাঁড়াইয়া
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশান শয্যায় হেন
অযতনে ছাই ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?
সরলা! আমারি লাগি, নিশিদিন জাগি জাগি
আছ ঘুমে অচেতন জ্ঞান হারাইয়া
অযতনে ছাই ভস্ম শ্মশানে শুইয়া।
... ...
ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া, ঘরে যাই
লহ জননীর যত্নে পিতার আদরে!
সকলের স্নেহসিন্ধু, উছলিয়া উঠ ইন্দু
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে।
তুমি বিনা কেবা আছে, যাইব কাহার কাছে
ভ্রমিয়া দেখেছি সব দেশ-দেশান্তরে.

সংসারে মমতা নাই, আছে ভস্ম আছে ছাই
আছে রাক্ষসের রাজ্যে ঘৃণা পরস্পরে
নাই অশ্রু দীন-দুঃখী শোকার্ত্তের তরে।

অথবা—

আহা গেল সে কোথায় ?
এই যে আছিল বুকে, হাসি মাখা সোনামুখে
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়!
... ...
দেখি যেন কাছে কাছে, সে মূর্ত্তি এখনো আছে
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়।
... ...
মলয় বাতাসে আসে, চাঁদের কিরণ ভাসে
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায়
হায়! গেল সে কোথায় ?

—"স্মৃতি-সঙ্গীত"।

(৩)

ব্যঙ্গ কবিতা ভাষাময় এক অপূর্ব্ব অস্ত্র। ইহার ইংরাজী নাম স্যাটায়ার (Satire)। বিখ্যাত সমালোচক গোল্ড্‌উইন স্মিথ (Goldwin Smith) বলিয়াছেন—"ব্যঙ্গ রচনা বা স্যাটায়ার (Satire) তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যখন লেখক পাপ ও অন্যায়ের প্রতি বিষদিগ্ধ বাণ নিক্ষেপ করেন; দ্বিতীয়তঃ যখন মানব জাতির প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণায় তাহার সমালোচনা করেন; এবং তৃতীয়তঃ যখন হাসি মুখে মানুষের ত্রুটী বা ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ লাটিন কবি জুভেনাল (Juvenal), দ্বিতীয় শ্রেণীর সুইফ্‌ট্‌ (Dean Swift), এবং তৃতীয় শ্রেণীর লাটিন কবি হরেস (Horace). *

গোবিন্দ দাসের নিকট পাপের, অত্যাচারের, অবিচারের, ব্যভিচারের প্রশ্রয় নাই। তিনি তাহা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। বিদ্রূপেই হউক, রূপকেই হউক, পাপী তাঁহার তীক্ষ্ণ বিষদগ্ধ বাণে আকুলিত। লাটিন কবি জুভেনালের মত তাঁহার কবিতাগুলি রচনা-চাতুর্য্যে বা শিল্পকলায় তেমন মনোহারী না হইলেও উহার ভাব ও প্রকৃতি অসমঞ্জস নহে। উচ্চ পদারূঢ়ের নিকট হীনবীর্য্যসম কৃতাঞ্জলি ধনগর্ব্বিতের পক্ষপাতী স্বজাতির প্রতি কি বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখুন—

"বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী
অনুগ্রহ অভিলাষী
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়।
হ'তে তার কৃপা-পাত্র
কি শিক্ষক কিবা ছাত্র
উকীল ডাক্তার আদি সম্পাদকচয়,
যারা বড় মান্যগণ্য
দেশের উদ্ধার জন্য
"বঙ্গের উজ্জ্বল আশা" যাহাদেরে কয়;
যত তার অবিচার
যত তার ব্যভিচার
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়

* "There are three kinds of Satire corresponding to as many different views of humanity and life ; the Stoical, the Cynical, and the Epicurean. Of stoical Satire, with its strenuous hatred of vice and wrong, the type is Juvenal. Of cynical satire, springing from bitter contempt of humanity, the type is Swift's Gulliver, while its quintessence is embodied in his two lines on the Day of Judgment. Of Epicurean satire, flowing from a contempt of humanity which is not bitter and lightly playing with the weakness and vanity of mankind, Horace is the classical example."--Goldwin Smith.

জানিয়া নাহিক জানে
শুনিয়া শোনে না কানে
তাহার প্রশংসা গানে করে জয় জয়
এমন সাহসহীন
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ
বলিতে উচিত কথা সংকুচিত হয়,
পাপেরেও বলে পুণ্য
হেন মনুষ্যত্বশূন্য
এমন করিয়া করে বিবেক বিক্রয়!
এ নীচ নিরয়গামী
সদা ঘৃণা করি আমি—
দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

—"চন্দন—৩৩ পৃঃ"।

জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কবি স্বীয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। জর্ম্মাণ কবি হাইনে (Heine) বলিয়াছেন "কবিদিগকে খাঁটাইও না তোমার কল্যাণ হইবে না"। সেই অবিচারের প্রতিশোধ নিবার জন্য কবি ১২৯৯ সনে "মগের মুলুক" লিখিয়াছিলেন। তাহা আদালতের আদেশে এক্ষণ আর মুদ্রিত হয় না। যদিও উহা আগাগোড়া অতি তীব্র জনাপবাদ, তথাপি কবিত্ব হিসাবে স্থানে স্থানে তাহার উজ্জ্বল রত্নরাজি উহাতে নিহিত ছিল। ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে আমরা ইহার অধিক আর কিছু বলিতে অসমর্থ।

(৪)

তার পর দেশ-প্রীতির কবিতাগুলি। অমানিশার অন্ধকারের পর উষার আলোকের ন্যায়, বর্ষাকালের নিবিড় মেঘকালিমার অবসানে প্রফুল্ল শারদ সূর্য্যের ন্যায়, ক্লেশগ্লানী বিলোপী, বন-যূথী-সুরভি বসন্ত বায়ু-হিল্লোলের ন্যায়, দীর্ঘ দুর্দ্দিনে, কংস-রাজ্যে অবিচার অত্যাচারের ষোল কলা পূর্ণ হইলে "পরিত্রাণায় হি সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' যখন ভগবান্ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইলেন—কবি "জন্মাষ্টমীতে" তাহার বিষাদ চিত্র দিয়াছেন :—

"অরাজক মথুরায় নানা উপদ্রব,
আতঙ্ক উদ্বেগে ব্যস্ত পৌরজন সব।
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নানা অত্যাচার,
ন্যায়ের শাসনদণ্ড দেশে নাহি আর।
স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার কদাচার কত—
একাচারে অত্যাচারে পশ্বাচারে রত,
অনাসক্ত অবসন্ন অভিশপ্ত জাতি
মোহগ্রস্ত ছিন্নমস্ত ধ্বস্ত আত্মঘাতী।
চারিদিক অন্ধকার : আশার আলোক
নিবায়ে ফেলিছে যেন দুঃখ রোগ শোক,
বহু অশ্রু বিপ্লবের প্লাবনের মত
উড়িছে পাপের ঝড়ে জনপদ কত
কড়মড় গর্জ্জে বজ্র দৈব অসন্তোষ
বিকাসি জ্বলন্ত দণ্ড বিধাতার রোষ;
বসুদেব দৈবকীর চরণে শৃঙ্খল
বৈকুণ্ঠে সে শ্রীকণ্ঠের রোধে কণ্ঠতল।
... ...
বাজিল সে পাঞ্চজন্য মাভৈঃ মাভৈঃ
বিমল বৈকুণ্ঠ ব্যোম কাঁপাইয়া অই।
খুলিল আলোক নীলে স্বর্গের অর্গল
হাসিল আলোক নীলে নীল নভতল।
দেবতা নন্দনে বর্ষে চন্দন কুসুম
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে আনন্দের ধুম।
নারদ পারদ বেশ শারদ বীণায়
ব্যাপিয়া ভূতল ব্যোম হরিনাম গায়।
পুলকিত ভারতের পুণ্য তপোবন
ঋষিবর্গ অর্পে অর্ঘ্য "নমো নারায়ণ",
আজিও সে ঘরে ঘরে অষ্টমী উৎসব
জনমিলা জগন্নাথ জয় জয় রব।

নব্য ভারত, ১৩১৮, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা।

প্রথম কংগ্রেসের সময় মিঃ এ. ও. হিউম্ (Mr. A. O. Hume) জাতীয় উদ্বোধন কল্পে একটী ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছিলেন—

Sons of Ind, why sit you idle
Wait ye for some Deva's aid
Buckle to; be up and doing
Nations by themselves are made." ইত্যাদি।

তখন গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহে। তিনি তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা পড়িলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। সত্যই যে জলন্ত দেশপ্রীতির অঞ্জলি লইয়া কবি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন—

"অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান !
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?
উঠ ত্বরা, সাধ কার্য্য, করহ উত্থান !
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার
ইত্যাদি

ইহা ছাড়া বঙ্গ বিভাগের সময় অগ্নিময়ী ভাষায় "স্বদেশ", "তাড়কার বন", "স্বাধীনতা" প্রভৃতি গুটি কত কবিতা গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন। আমি সভয়ে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র আপনারা ইচ্ছা হইলে তৎকালীন "নব্যভারতে" তাহা পাঠ করিবেন। বিশেষতঃ "স্বদেশ" নামক কবিতায় স্যর ওয়াল্টার স্কটের (Sir Walter Scott) প্রণীত 'লেডি অব দি লেকে' (Lady of the Lake) 'রডারিক ডু'র (Roderick Dhu) খেদোক্তির ন্যায় অনেক কথা আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

(৫)

সামাজিক কবিতা গোবিন্দ দাসের বেশী নাই। উহার মধ্যে "থাকুক আমার বিয়া" শীর্ষক যে কবিতা আমাদের পত্রিকা 'প্রাতভায়' * প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই শ্রেষ্ঠ উহা বরপণ গ্রহণের তীব্র সমালোচনা। স্নেহলতার বহু পূর্ব্বে স্নেহময়ী কন্যা পিতার কন্যাদায় ক্লেশে কাতর হইয়া বলিতেছে—

"বাবা ! থাকুক আমার বিয়া—
চাইনে আমি এম্. এ. বি.এ. কিন্তে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত যাদের কেনো হাটে গিয়া ;
সোণার চেইন্ সোণার দড়ি গর্ব্ব যাদের গলায় পরি
অমন পশু কিন্‌বে নাকো কাণাকড়ি দিয়া।
... ...
থাকুক আমার বিয়া—
চাইনা ভণ্ড দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত বাতাস দিয়া দিয়া
ধিক্ সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক্ ওদের স্বদেশী দীক্ষা
কিনে এরবে এ পরাক্ষা পশুর আত্মা নিয়া ?
... ...
থাকুক আমার বিয়া—
রেখে কোলে কাখে বুকে, পালন কলে কত সুখে
আজো তোমার স্নেহ-দয়ায় র'য়েছি বাঁচিয়া
সেই তোমারে চির দুখে. ফেলবে যেগো পাষাণ বুকে
সে পশুকে পতি বলে পূজব লুটাইয়া ?
ঘৃণা নাই কি নারীর মনে, সিদ্ধি নাই নারীর পণে ?
সংযমে তার সমে ডরায় সরে দাঁড়ায় গিয়া ?
... ...
থাকুক আমার বিয়া—
কার্পেণ্টার, নাইটেঙ্গল, ডোরা, লিটল্ সিষ্টার হবো মোরা
থাকব বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়া,
দেশের হবে সুখসুবিধা, বঙ্গজাতেরা হবে সিধা
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পশুর গৌরব গিয়া
বাঞ্ছা পূরুক্, আশীষ কর চরণ-ধূলি দিয়া ॥

(গ) গোবিন্দ দাসের ছন্দ

গোবিন্দ দাসের ছন্দ প্রধানতঃ একটী, দীর্ঘ ত্রিপদী। আমরা যত দূর জানি, ঐ ছন্দের প্রবর্ত্তক কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রাতভা—১৩১৮। শ্রাবণ সংখ্যা ১৮৪ পৃঃ।

তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কবি উহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

"থারেক এখনো কি রে দেখিবি না চাহিয়া
উন্নত গগনোপরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে
"উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া"

প্রভৃতি মধুষ্যন্দী কবিতাগুলি দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দে লিখিত হইয়াছিল। গোবিন্দ দাস ইহা ব্যতীত চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলি লিখিয়াছেন। তাহা সেকস্‌পিয়ারের (Shakespeare) সনেটের (Sonnet) মত প্রায়ই প্রেমোদ্দিষ্ট। কিন্তু হৃদয়ের আবেগ কথায় ফুটাইতে, মনের গভীর তরঙ্গায়িত বিক্ষোভ ভাষায় প্রকাশ করিতে, শ্রোতৃবর্গের মনপ্রাণ মুগ্ধ করিতে, কখনো বা ভাবের অভিনব সুরায় প্রচণ্ড উন্মাদনায় মত্ত করিতে, গোবিন্দ দাসের কবিত্ব দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দেই দেহবদ্ধ করিয়া অবতীর্ণ হয়।

আমরা কবি গোবিন্দ দাসের আলোচনা শেষ করিলাম। যদি এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে কবির প্রতি কিঞ্চিৎ কুতুহলেরও উদ্রেক হইয়া থাকে, তবে আজিকার প্রভাত কাল বৃথা ব্যয়িত হয় নাই মনে করিব। ভাওয়ালের এ বন্য কুসুম [illegible] প্রাসাদের বিমল বিশাল উপবনে সযত্নে রক্ষিত [illegible] যোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা কেবল ইংরাজ কবি গ্রের (Gray) ভাবে বলিতে পারি—

"সাগর গরভে হায়! পড়িয়া আঁধারে,
বিমল উজল শোভা কত মণি ধরে;
কত ফুল ফুটি হায় গোপনে গোপনে
বৃথায় বিতরে বাস বিজন বিপিনে"।

আজ কাল তথা-কথিত কবি-কোলাহলে বাঙ্গালার সাহিত্য-বন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তার মধ্যে যদি খাঁটি শ্যামার সঙ্গীত দৈবাৎ কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় তবে আর আনন্দের সীমা থাকে না।

যেমন আশ্বিন মাসে সাগরের কলকল হইতে সুদূর পল্লীপ্রান্তে ছিন্ন শুভ্রমেঘবাহী উত্তর-বায়ু পুকুরের কালো জলে সাঁতার দিয়া, হিজোল বনে হাসির লহরী তুলিয়া, অপক শালিশীর্ষ আনত করিয়া, আঙ্গিনার ডালিম গাছের ঈষৎকম্পিত রক্ত অধরে হাসি ফুটাইয়া ক্লান্ত অঙ্গ শীতল করে, গোবিন্দ দাসের কবিতা তেমনই গ্রাম্যকুসুমের গন্ধ বহিয়া, পল্লীকুঞ্জের চিত্র আঁকিয়া, গগনপ্রাবী পাপিয়ার মত খাঁটি বাঙ্গালার গান গাহিয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন করে।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা

কর্ম্ম ও চিন্তা এই দুইটী পৃথক বস্তু। উভয়ের একত্র সমাবেশ প্রায়শঃ দেখা যায় না। বরঞ্চ একটী আরেকটীর অন্তরায়। যিনি সদাই কর্ম্মনিরত, তাঁহার চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? এই সব কর্ম্মীকে কদাচিৎ চিন্তাশীল হইতে দেখা যায়। কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে যেমন, চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্ম্মের স্বাধীনতার মধ্যেও তেমন বিরোধ আছে। যে জাতিতে চিন্তার স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় সে জাতিতে প্রায়ই কর্ম্মের স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপ ও ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতে মানুষের কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে যেরূপ সমাজ-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, চিন্তা-প্রবৃত্তিকে সেরূপ করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। তথায় কর্ম্মের স্বাধীনতা প্রচুর, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা অল্প। স্বাধীনচিন্তকগণ (Freo thinker) সে দেশের সমাজে হেয়; আর এদেশে, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ' বলিয়াও কপিল হিন্দু সমাজে পূজিত,—"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।" গ্যালিলিও যখন বলিলেন যে, পৃথিবী স্থির নয়, চলিতেছে, তখন বাইবেলের অবমাননা করা হইল বলিয়া ধর্ম্ম-যাজকেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। হিন্দুদিগের কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও পৃথিবী স্থির, উহা হস্তীর মস্তকে স্থাপিত, এবংবিধ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্যালিলিওর বহু পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট যখন ভূভ্রমণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল না, বা শূলে চড়াইল না। * কেহ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যীশুখ্রীষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া মানে, বাইবেলকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহার আহারবিহার কাজকর্ম্ম

* এ কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উত্তর কালের ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্য্যভট্টের আবিষ্কৃত ভূভ্রমণবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় তদীয় 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "বোধ হয় তৎকালে (অর্থাৎ আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী সময়ে) পৃথিবীর আবর্ত্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না।" (৭৭ পৃঃ) কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যে সাহস আর্য্যভট্টের সময়ে ছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহার বিলোপ হওয়ার কারণ কি? সাহসের অভাবই যে ভূভ্রমণবাদ অস্বীকারের কারণ নহে, তাহা ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, উহা আধার-বিশেষের উপর রক্ষিত, ইত্যাদি পৌরাণিক মতের খণ্ডন করিতে ভাস্করাচার্য্য কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। আমরা যোগেশ বাবুর গ্রন্থ হইতেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে দূরবর্ত্তী উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে মানুষে কিংবা দেবতারা দেখেন না কেন? যদি বল, স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতই রাত্রির কারণ, তবে উহা তখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে থাকে, অথচ দেখা যায় না কেন? পুরাণকারগণ বলেন যে, মেরুপর্ব্বত পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত, এবং সূর্য্য তাহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে যদি তাই হয়, তবে কিরূপে আমরা সূর্য্যকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখি?' পৌরাণিক মত যেন সিদ্ধ হইল না, তা বলিয়া পৃথিবী গোলাকার বলিব কেন? * * * ভাস্কর বলিতেছেন,

'সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী
নিতরাং তনীয়ান।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য
প্রতিভাত্যতঃ সা॥'

ভিন্নর উপরই সমাজ আর হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই ইউরোপের রীতি। আর, কেহ যদি সামাজিক আচার ব্যবহার মানিয়া চলে, তাহা হইলে সে যাহা কিছু বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাতে তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না ইহাই ভারতীয় সমাজের রীতি। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিব।

অর্থাৎ যেমন পরিধির শত ভাগ (ক্ষুদ্রাংশ) সমান বোধ হয়, বক্র বোধ হয় না, তেমনই এই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর যতটুকু এককালে দৃষ্টিগোচর হয় ততটুকু সমান বোধ হয়। এতদপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত বিরল" (৩৪৩ পৃঃ)। অন্যত্রও ভাস্করের এইরূপ আশ্চর্য্য মানসিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। "পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরম্পরা বর্ণিত আছে, তার কি? ভাস্কর বলিতেছেন,

'মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ ধরিত্র্যাঃ স্ততোঽন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽ
ত্রৈবমত্রানবস্থা।
অন্তে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ
সাষ্ট মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥'

অর্থাৎ, যদি এই পৃথিবীর কোন মূর্ত্তিবিশিষ্ট বস্তু বা প্রাণীরূপ আধার থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটী আধার, সেই আধারের একটী আধার আবশ্যক হইত, সুতরাং এই অনুমানের অনবস্থা দোষ (যাহার শেষ নাই) হইতেছে। কল্পিত শেষ আধারটীই যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে তবে পৃথিবী পারিবে না কেন? না পারিবার কোন কারণ নাই, কারণ (পৌরাণিক মতে) পৃথিবী অষ্টমূর্ত্তি শিবের এক মূর্ত্তি নহে কি? * * * পৃথিবী যদি শূন্যেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া যাইতেছে না কেন?' উত্তরে বলিতেছেন, 'পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিবশতঃ শূন্যস্থিত গুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন আমরা মনে করি, যেন বস্তুটি পড়িতেছে; বাস্তবিক তাহা পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অপরিচিত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের নৈয়ায়িকমণ্ডলীর নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত। তাঁহার নাম প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু সে বেশী দিনের কথা নয়। বিক্রমপুর চিরকাল ন্যায়-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িক বিক্রমপুরেও ইদানীং বেশী জন্মগ্রহণ করে নাই কিন্তু ন্যায়ের কূট তর্কজাল তাঁহার হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া লইয়াছিল। অবিশ্বাস (scepticism) তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। যৌবনে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না; এবং প্রকাশ্যতঃ সে কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না * তিনি বলিতেন "যাহা দেখি না তাহার অস্তিত্বে

পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর যেখানেই যিনি থাকুন, তিনি ইহাকে তলস্থ এবং আপনাকে উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাসের দুই প্রান্তে দুই মনুষ্য, নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ায় ন্যায় অধঃশিরস্ক থাকেন। আমরা এখানে যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অধঃস্থিত মনুষ্যেরাও তেমনই অনাকুল ভাবে স্থির আছেন।" (৩৪২ পৃঃ) ভাস্করের ন্যায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীরাও এই সব যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন। এই সব পাঠ করিলে কি সাহসের অভাব সূচিত হয়! ফলতঃ আর্য্যভট্টের ভূভ্রমণবাদ অস্বীকার করিবার কারণ ইহাই বলিতে হইবে যে, পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা যুক্তি-প্রণালী অনুসরণ করিতে পারেন নাই। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য, কিন্তু তথাপি তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—গুরুর মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।— লেখক

* বলা আবশ্যক যে, পরিণত বয়সে তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শেষ জীবনে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে করিতে মূর্চ্ছা যাইতে আমরা দেখিয়াছি।

বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরকে দেখি না, সুতরাং তিনি যে আছেন তাহাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু সূর্য্যকে প্রতিদিনই দেখি—অতএব 'ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।' কিন্তু এই কারণে তিনি সমাজে নিন্দিত হন নাই। কেহ তাঁহাকে 'একঘরে' করে নাই। কিন্তু তাঁহাকেও সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে কখন? যখন ত্রিপুরারাজ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ত্রিপুরা রাজবাটীতে জলগ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন অনেকানেক পণ্ডিতের সহিত তর্করত্ন মহাশয়ও সে আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি এই কার্য্য করিলেন, তাহার পরদিন হইতেই বিক্রমপুরে তাঁহার হুঁকা বন্ধ হইল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার শিশুজনোচিত সরলতা কিছুই তাঁহাকে সামাজিক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি যে বিক্রমপুরের অলঙ্কার তাহা বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ ভুলিয়া গেল। যতদূর মনে পড়ে, পরিশেষে বোধ হয় তাঁহাকে এই অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই ঘটনা হইতে দেখা গেল যে সামাজিক বিধি ভালই হউক আর মন্দই হউক—তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে হিন্দুসমাজের নিকট ক্ষমা নাই। এবং যে কোনরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস—ভালই হউক বা মন্দই হউক তাহা পোষণ বা প্রচার করিলে হিন্দুসমাজের নিকট দণ্ড নাই। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, 'ইহা কপটতা ও কুসংস্কার। ধর্ম্ম তোমাদের সমাজে কখনও সত্য করিয়া দেখা দেয় নাই, সেই জন্যই যে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করিয়া বা অবিশ্বাস করিয়া সারিয়া যাইতে পারে। তোমাদের সমাজ বহিরাচরণ নিয়া এতই ব্যস্ত যে ভিতরের জিনিষ খুঁজিয়া দেখে না। তাহার ফলে কপটতাই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।" চিন্তার স্বাধীনতা যে কি বস্তু যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের পক্ষে এরূপ বলাই স্বাভাবিক। আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য আমিই দায়ী। আমি যদি অসত্যে বিশ্বাস করি, তবে আমিই তাহার ফল ভোগ করিব—সমাজ করিবে না। সমাজের সহিত আমার কর্ম্মের সম্পর্ক। সমাজ আমার কর্ম্মের ফল ভোগ করে। সুতরাং সে আমার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করুক—আমার বিশ্বাসের উপর, আমার চিন্তার উপর সে যেন হস্তক্ষেপ না করে। কারণ আমার বিশ্বাস বা মতামতের বিচার করিবার অধিকার সমাজের নাই। * ইহাই হিন্দুদিগের কথা।

---

* Cf. Lecky—"The man who with realising earnestness believes the doctrine of exclusive salvation, will habitually place the dogmatic above the moral element of religion, * * * *he will judge men mainly according to their opinions, and not according to their acts.* * * * * * * * * On the other hand, men who have been deeply imbued with the spirit of earnest and impartial enquiry, will invariably come to value such a disposition more than any particular doctrines to which it may lead them; *they will deny the necessity of correct opinions*; they will place the moral far above the dogmatic side of their faith; * * * *they will value men according to their acts, and not at all according to their opinions.* The first of these tendencies is essentially Roman Catholic. The second is essentially rationalistic. —Rationalism in Europe vol. II P. 89, 90. (The italics are ours.) লেকি এখানে কেবল রোমানক্যাথলিকদিগকেই নিন্দা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে সকল খৃষ্টানই সমান দোষী। প্রোটেষ্টাণ্টরাও রোমান ক্যাথলিকদিগের ন্যায় exclusive salvationএ বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'New Testament'এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নাই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরাণ বা ঋষিদের বহুবাক্য দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়।

যাহা হউক, কোন্‌টা ভাল কোনটা মন্দ তাহা বলা সম্প্রতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উভয় আদর্শ যে পৃথক তাহা বুঝানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের এই পার্থক্যবোধই নাই। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। অনেকে মনে করেন যে, সকল বিষয়েই যখন ইউরোপীয়দিগের স্বাধীনতা দেখা যায়, তখন তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতাই বা থাকিবে না কেন? কিন্তু ইহা ভ্রম। আবার অনেকে মনে করেন যে, সকল বিষয়েই যখন হিন্দুদিগের স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়, তখন চিন্তার স্বাধীনতাই বা তাহাদের থাকিবে কেন? ইহাও ভ্রম। অল্পদিন হয়, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ বিচারপতি,—জষ্টিস শঙ্করান নায়ার—হিন্দু সমাজ ও ধর্মের প্রতি এক তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতি কঠোর ভাষায় হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কখনও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। ষড়-দর্শনের দেশে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না, এ কথা একজন শিক্ষিত এবং শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি বলিতে পারে, তাহা ধারণা করাও সহজ নহে। কিন্তু বিদ্বেষ মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি বিদ্বেষবশে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এ উভয়ের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ, ইউরোপের ভলটেয়ার ডারউইন বুকনার, ক্লবারিয়ন, ভিক্টর হুগো, কুল বর্তমান কালে খৃষ্টানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত * * ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটাই খ্রীষ্ট-ধর্মের বিপক্ষে—বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে খৃষ্টানীর শক্তি থাকত, তাহলে 'পাস্তের' এবং 'ককে'র মত বৈজ্ঞানিকদলকে জীবন্তে পোড়াত; এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩০ পৃঃ)।

এই চিন্তার স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের এত মতামত ভেদ, এত ধর্মবিশ্বাসের বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তিনি তাহাই প্রচারিত করিয়াছেন; কেহ তাহাতে বাধা দেয় নাই। এবং এই জন্যই ভারতে সাম্প্রদায়িক কলহ থাকিলেও নির্যাতন (persecution) অতি অল্পই ছিল। Inquisition ইউরোপেরই প্রতিষ্ঠান, ভারতের নহে। ভারতবাসীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। কিন্তু বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরাও ভারতে ধর্মবিশ্বাসের জন্য নির্যাতনের অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।*

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই এক মাত্র মুক্তির অধিকারী, অপরে নয়.—এই মতবাদ (Doctrine of Exclusive salvation) ইউরোপেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইউরোপের প্রবল পরধর্মবিদ্বেষ ও তজ্জনিত নির্যাতনের ইহাই মূলীভূত কারণ। † যে দেশে চিন্তার স্বাধীনতা নাই, সে দেশেই ঐরূপ মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, অন্যত্র পারে না। ভারতবর্ষে কখনও তাহা পারে নাই। পরন্তু

---

* The wonder is that persecutions were so rare and that as a rule the various sects managed to live together in harmony, and in the enjoyment of fairly impartial official favour.—Vincent Smith's *Ancient India* P. 191.

† "If men believe with an intense and realising faith that their own view of a disputed question is true beyond all possibility of mistake, if they further believe that those who adopt other views will be doomed by the Almighty to an eternity of misery, which with the same moral disposition but with a different belief, they would have escaped, then men will sooner or later persecute to the full extent of their power.—Lecky, *Rationalism in Europe* vol II pp. 1-2.

ভারতে অধিকারভেদবাদেরই প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। * উহাই প্রাচীনকালে এ দেশে ধর্ম্মবিদ্বেষের তীব্রতা কমাইয়া দিয়াছিল। ভারতের আশ্চর্য্য পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার মূলে উহাই যে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ভারতে অসংখ্য সম্প্রদায় বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসীর লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

এই দুই ভিন্ন আদর্শের অনুশীলনের ফলও ভিন্নরূপ হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিন্তাবীরের এবং ইউরোপ কর্ম্মবীরের লীলাভূমি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক সামান্য কথারই ব্যভিচার আছে। ভারতবর্ষে চিন্তাবীরের আধিক্য দৃষ্ট হইলেও, সেখানে কর্ম্মবীর একেবারেই জন্মগ্রহণ করে নাই, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। শিল্পলিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে ভারতের ইতিহাস অল্পে অল্পে আবিষ্কৃত হইতেছে। বিদেশীয়েরাই সে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে ভারতবর্ষীয় নেপোলিয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। † নেপোলিয়ানকে কর্ম্মবীর বলিলে, সমুদ্রগুপ্তকেও কর্ম্মবীর বলিতে হইবে; তাহা না হইলে তুলনার সার্থকতা থাকে না। কিন্তু ভারতীয় নরপতিবর্গের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকেই একমাত্র কর্ম্মবীর বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। প্রাচীন ভারতে তত্তুল্য পরাক্রমশালী আরও অনেক দিগ্বিজয়ী নরপতির অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, অশোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল, রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতির নাম সমুদ্রগুপ্তের সহিত একত্র উল্লেখ করিলে দোষ হয় না। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা পাহাড় কাটিয়া অজন্তায় গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমন্বিত হালেবিদের ‡ (Halibid) মন্দির গঠন করিয়াছিলেন, জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মবিমুখ ছিলেন, এ কথা বলাও সঙ্গত হয় না। আজ ইউরোপ সমগ্র জগতের পণ্যসম্ভার যোগাইতেছে। এমন দিন ছিল যখন ভারতবর্ষই ঐ কার্য্য করিত। † ভারতীয় মস্‌লিন, ভারতীয় রঞ্জিতবস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত পণ্যবীথিকায় গৌরবের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এ কথা কেমন করিয়া বলা যায় যে ভারতবর্ষে কর্ম্মবীর কখনও জন্মে নাই। পক্ষান্তরে, ইউরোপে কর্ম্মবীরের আধিক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া সে দেশে চিন্তাবীর একেবারেই জন্মে নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অন্যায়। যে দেশে ক্যাণ্ট, হেগেলের মত দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 'চিন্তা-জগতে সে দেশের স্থান নাই, এ কথা বলাও নিতান্ত দুঃসাহসের কর্ম্ম। আমাদের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, ভারতের বেষ্টনী চিন্তাবীরের এবং ইউরোপের বেষ্টনী কর্ম্মবীরের আবির্ভাবের সহায়তা করে। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী। কিন্তু এ কথার এরূপ অর্থ না যে, রাজপুতানা বঙ্গদেশের মত সুজলা সুফলা নয় বলিয়া তথায় শস্য একেবারেই জন্মে না। ইহার এই মাত্র অর্থ যে, এখানে যাহা অযত্নসুলভ, সেখানে তাহা আয়াসলভ্য।

---

* India has always taught that Truth is absolute, but there are many ways of realising it.—Havell's *Ideals of Indian Art* p. 12.

† See Vincent Smith's *Ancient India*.

‡ Fergusson's History of Indian Architecture Vol. I. 448.

† Broadly speaking, there were three great discoveries in applied chemistry to which India owed her *capture of the world-markets* : (1) the preparation of fast dyes for textile fabrics by the treatment of natural dyes like manjistha with alum and other chemicals ; (2) the extraction of the principle of indigotin from the indigo plant by a process, which, however crude, is essentially an anticipation of modern chemical methods ; and (3) the tempering of steel in a manner worthy of advanced metalling, a process to which the mediaeval world owed its Damascus swords.—R. K. Mookerjee, quoted in Sarkar's "Positive Background of Hindu Sociology". (Panini Office) P. 79

জষ্টিস শভরান্ যাহার চিন্তার স্বাধীনতার অভাব ছিল বলিয়া ভারতের যে নিন্দা করিয়াছেন, সে নিন্দার যদি কোন উপযুক্ত পাত্র থাকে, তবে তাহা ইংলণ্ড। ইউরোপের আর কোন দেশেই এতদূর চিন্তার দৈন্য দেখা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক টেইন (Taine) লিখিয়াছেন—

The English have moralists, psychologists, but no metaphysicians : if there is one—Hamilton, for instance, he is a sceptic in metaphysics, he has only read German philosophers to refute them ; he regards speculative philosophy as an extravagance of visionaries, and is compelled to ask his readers for the strangeness of his matter, when he tries to understand somewhat of Hegel's conceptions. The English, positive and practical men, excellent politicians, administrators, fighters and workers, are no more suited than the ancient Roman for abstractions of subtle dialectics and grand systems. —History of English Literature Vol II. pp. ?

তাৎপর্য্য—ইংলণ্ডে নীতিশাস্ত্রবিদ্ মনস্তত্ত্ববিদ্, আছেন, কিন্তু দার্শনিক নাই। যদি কেহ থাকেন—যেমন হ্যামিল্টন—তিনিও দর্শন শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। তিনি জর্ম্মাণ দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য। দর্শন শাস্ত্রকে তিনি বাস্তবজ্ঞানহীন কল্পনানুরক্ত লোকের উৎকট প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন। তিনি যখন হেগেলের চিন্তা কথঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে পাঠকবর্গের নিকট (আগেই) এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তব্য বিষয় কিছু অদ্ভুত গোছের। ইংরেজেরা বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন কর্ম্মতৎপর লোক ; তাঁহারা উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক, রাজ্যশাসক, যোদ্ধা, এবং কর্ম্মী। সূক্ষ্ম তর্কজাল এবং উচ্চ চিন্তাপ্রণালীর নীরস সূত্রগুলির অনুশীলন করিবার যোগ্যতা রোমানদিগেরও ছিল না, ইংরাজদিগেরও নাই।

একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন চ্ছলে টেইন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দার্শনিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত সমালোচনার ভূমিকায় সেই কল্পিত ইংরাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

You (i. e. the English) lack philosophy,—I mean what the Germans call metaphysicians. You have learned men, but no thinkers. Your God impedes you. He is the supreme Cause, and you dare not reason on causes, out of respect for him. Ibid pp. ?

তাৎপর্য্য—তোমাদের (ইংরাজদের) দর্শন শাস্ত্রের অভাব (নীতিশাস্ত্র নয়, মনস্তত্ত্ব নয়)—জার্ম্মণেরা যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে তাহারই অভাব। তোমাদের মধ্যে সুপণ্ডিত লোক আছেন, কিন্তু দার্শনিক নাই। তোমাদের ঈশ্বরই তোমাদিগকে বাধা দেয়। তিনি আদি কারণ ; সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিতে সাহস কর না।

কয়েক বৎসর হইল এই ঢাকা নগরীতে 'অভেদানন্দ স্বামী' নামধারিণী এক মার্কিন রমণী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি জগৎকারণ ব্রহ্মকে It বলিয়াছিলেন। যিনি আদিকারণ, তাঁহাকে Heও বলা যায় না, Sheও বলা যায় না। তাহাতে সংকীর্ণতা আসে ; অনন্তত্ব খর্ব্ব হয়। তিনি যদি পুরুষ হন, তবে রমণী কি তাঁহার বাহিরে ? আর, তিনি যদি রমণী হন তবে পুরুষ কি তাঁহার বাহিরে ? তিনি নামরূপের অতীত। তবে শব্দ দ্বারা যদি তাহাকে বুঝাইতে হয়, তবে তাঁহাকে It বলাই সঙ্গত। ইহাই তাঁহার যুক্তি। এ যুক্তি এ দেশের লোকের নিকট কিছু নূতন নয়। বৈদান্তিকেরা চিরকাল এই জাতীয় অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছেন। সেই সভায় একজন ইংরাজ পাদ্রি ছিলেন। বক্তৃতান্তে তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, বক্তা ঈশ্বর

কিরূপ ঘোর পাতকের কার্য্য (blasphemy) করিয়াছেন। অতএব তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। এখন দেখুন টেইন যে বলিয়াছিলেন যে দর্শনালোচনায় ঈশ্বরই ইংরাজদিগের প্রধান অন্তরায়, তাহা ঠিক কি না। যাঁহারা ভগবানকে It বলিলেই অস্থির হন, তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিবেন কি রূপে। যদি কেহ করেন তবে তাহাকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়।

ইংলণ্ডে এ দিকে যেরূপ চিন্তার দৈন্য অপর দিকে সেইরূপ অপরিসীম কার্য্যানুরক্তি। কর্ম্ম-জগতে ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দী ইউরোপেও নাই। কি ফরাসী, কি জর্ম্মাণ, কেহই কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরেজদিগের সমকক্ষ নহে। কর্ম্মের স্বাধীনতার প্রসারও ইংলণ্ড অপেক্ষা আর কোথায়ও অধিক দৃষ্ট হয় না। এই স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যই প্রতিবেশী কি করে, কোথায় যায় ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার কৌতূহল প্রদর্শন ইংরাজদিগের নিকট নিতান্ত নিন্দনীয়। ইংরেজেরা অতিশয় মৌনী (taciturn), তাঁহারা কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করিতে ভাল বাসেন না, এই বলিয়া অনেকে তাঁহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একান্ত অনুসরণই যে ইহার কারণ, সকলে তাহা প্রণিধান করেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রকার অনুসন্ধান তাঁহারা তাঁহাদিগের কর্ম্মের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করেন। দুই ব্যক্তি একত্র এক গলিতে স্যারাজীবন বাস করিয়াও একে অন্যের নাম জানে না, এরূপ ঘটনা ইংলণ্ডে বিরল নহে। বিলাত-প্রবাসী অনেক ভারতবাসীও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। রাস্তা ঘাটে দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা ত নিষিদ্ধই, কে কোথায় যায়, তাহাও জিজ্ঞাসা করা রীতি-বিরুদ্ধ। একবার একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী জাহাজে ঢাকা যাইতেছিলেন। একজন ইংরেজও সহযাত্রী ছিলেন। সে দিন ইংরেজ ভদ্রলোকটী স্বীয় জাতীয় পদ্ধতি কিয়ৎ-পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে কতক মন খুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী মনে করিলেন যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনিও কি ঢাকা যাইতেছেন? উত্তরে ইংরেজটি বলিলেন, 'That's my business' 'সে ত আমার কাজ'; তাহা জানিবার তুমি কে! যদি প্রয়োজন হইত, তবে ত আমিই তোমাকে বলিতাম। যখন বলি নাই, তখন তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হইয়াছে। আমার বলিবার বাধা থাকিতে পারে। যে কার্য্য আমি করিতে চাই না, তুমি প্রশ্ন করিয়া আমাকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছ। তুমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ।" ইহাই কি এই প্রথার অন্তর্নিহিত ভাব নহে? এই সঙ্গে আরেকটী দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। একবার একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কলিকাতা যাইতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম। সেই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। পরে জানা গিয়াছিল যে তিনি পাত্রী দেখিতে অথবা কোর্টশিপ করিতেই কলিকাতা যাইতে-ছিলেন। জাহাজে অনেক পরিচিত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথায় যাইতেছেন?' 'কেন যাইতেছেন?' দেখা গেল যে তিনি শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। উত্তরে তিনি সকলকেই বলিতেছিলেন যে, একটু বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কলিকাতা যাইতেছেন। কিন্তু বন্ধুবর্গের কৌতূহল কি তাহাতে থামে? তাহারা 'কি প্রয়োজন' বলিয়া বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এই প্রকার প্রশ্নে বড়ই বিব্রত হইতেছিলেন, কিন্তু তথাপি কেহই নিবৃত্ত হইলেন না অবশেষে, তিনি যখন কিছুতেই উত্তর দিলেন না, তখন সকলেই 'লোকটা বড়ই অসামাজিক' এইরূপ মানসিক টিপ্পনি করিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন। বিলাতেই

বা ঐরূপ কেন আর এখানেই বা এরূপ কেন? সেখানে কর্ম্মের স্বাধীনতার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং এখানে তাহার অত্যন্ত অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ভারতীয় প্রথার স্বপক্ষে যে কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে। ভারতীয় সমাজে যে হৃদ্যতা, যে অনুপ্রাণতা দৃষ্ট হয়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। কাহারও পীড়া হইলে গ্রামশুদ্ধ লোকে তাহার শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হয়। বিলাতে পীড়িতের বন্ধুবর্গ কার্ড রাখিয়া আসে। কাহার বাটীতে উৎসব হইলে সামাজিক লোকেরা অযাচিত ভাবে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা করে। বিলাতে হোটেলে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। ফলতঃ ভারতে সমগ্র সমাজটীই যেন একটী বৃহৎ পরিবার। সম্পদে বিপদে একে অন্যের সাহায্য করাকে সকলেই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মানে। কিন্তু যে উপকার করে সে আবার কিছু আব্দারও করে। সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু গোপনীয় থাকিতে পারে, সমাজের স্বার্থ ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকিতে পারে, ভারতীয় সমাজ তাহা স্বীকার করে না। এই জন্য যাহা সমাজের অনুমোদিত নয়, তাহা ব্যক্তির পক্ষে করা অসম্ভব। কাজেই ভারতে কর্ম্মের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ইংলণ্ডে ব্যক্তিরই প্রাধান্য, বাস্তবিক ব্যক্তিনিষ্ঠ সভ্যতার (individualism) চরমোৎকর্ষ ইংলণ্ডেই দৃষ্ট হয়।* অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক আচার হইতে সুবৃহৎ বিধিব্যবস্থার পশ্চাতেও এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। কাহারও পকেটে হাত না দেওয়া, কাহার চিঠি খুলিয়া না দেখা, কাহারও বিনানুমতিতে গৃহে প্রবেশ না করা, কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা না করা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারের মূলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সুপরিস্ফুট; আবার ব্যবহার-ক্ষেত্রে চুক্তির প্রাধান্য, * সম্পত্তি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার, † চরমপত্র সম্পাদন ক্রমে উত্তরাধিকারের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্তই ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগের ফল। এই দুই ভিন্ন আদর্শের মধ্যে কোনটা ভাল তাহা সবিস্তারে এখানে বিচার করা অসম্ভব। তবে এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, যাঁহারা অন্যের নির্ব্বিরোধে নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মানেন, তাঁহারা ইংলণ্ডীয় প্রথারই পক্ষপাতী হইবেন; এবং যাঁহারা সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন এবং সমাজের স্থায়িত্ব না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা ভারতীয় আদর্শের পক্ষপাতী

* Individualism always found its natural home in England.—Dicey's *Law and opinion in England* P. 174. হিতবাদের (utilitarianism) প্রবর্ত্তক বেন্থামই ঊনবিংশ শতাব্দীতে individualism এর প্রভাব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। "The aim of Benthamite reformers was, in short, to secure to every person as much liberty as is consistent with giving the same amount of liberty to every other citizen." *Ibid* P. 189.

* যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই সেখানে চুক্তির প্রাধান্য থাকিতে পারে না। বেন্থাম এই চুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "Individualistic reformers opposed anything which shook the obligations of contracts, or, what at bottom is the same thing, unlimited contractual freedom of individuals. It is no accident that Bentham very early in his career assailed the usury laws.—Dicey's *Law and opinion* P. 150. বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিনিষ্ঠ সভ্যতার উপাসকেরা চুক্তির প্রভাবকেই সামাজিক উন্নতির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। Sir Henry Maine বলিয়াছেন, "The progress of society is from status to contract." (Maine's *Ancient Law.*) আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বোধ হয় লিখিতেন, 'The progress of society is from individualism to collectivism.'

† এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দায়ভাগে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে

হইবেন। সংঘবাদের (Collectivism) * প্রাদুর্ভাবের সময় হইতে ইংলণ্ডেও এই মত অল্পে অল্পে প্রসার লাভ করিতেছে।

এই অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সমাজের যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই সংঘর্ষের ফলে এক হিসাবে যে আমাদের কর্ম্মের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে। আজকাল অনেকে সমাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া বলে যে, 'সমাজ পারে ত আমাকে শাসিত করুক।' এরূপ বলিবার কারণ এই যে তাহারা জানে যে সমাজের শাসনক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়াছে। সহরে ত উহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। গ্রামেও উহার আধিপত্য কমিয়াছে। গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হয় সেও নিজদলে লোক জোটাইতে পারে। সুতরাং সমাজের অখণ্ড শাসন এখন একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু ইহাকেও প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের স্বাধীনতার বৃদ্ধি বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ একদিকে আমরা যেমন দেশীয় সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি, অপর দিকে আবার ইউরোপীয় রীতিনীতি, ইউরোপীয় আচার ব্যবহার, ইউরোপীয় আদবকায়দা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছি। এক প্রভুর পরিবর্ত্তে অপর প্রভুর প্রতিষ্ঠা করিতেছি মাত্র। যে সমস্ত সমস্যা ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তি প্রকম্পিত করিতেছে, ইউরোপীয় সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করিলে, সেই সব সমস্যা, তাহাদের সমগ্র জটিলতা লইয়া যে একদিন আমাদের সম্মুখেও উপস্থিত হইবে, তাহা আমরা ভ্রমেও বিচার করিয়া দেখিতেছি না। বাস্তবিক, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি চিন্তাক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই আমাদের মানসিক স্বাধীনতার অত্যন্তাভাব দৃষ্ট হয়। ইউরোপের চিন্তারাজ্যে আগষ্ট কম্‌টের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তখন অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী 'পজিটিভিষ্ট' হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় এই মতের পক্ষপাতী একজনও এ দেশে নাই। কম্‌টের দার্শনিক মতের ভ্রান্তি বুঝিয়াই যে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাহা হইলে, স্বাধীন ভাবে তাঁহার মত খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাইতাম। অতএব বুঝিতে হইবে যে ইউরোপে তাঁহার প্রভাব কমিয়া গিয়াছে, এই জন্যই শিক্ষিত ভারতবাসীও তৎপ্রতি হতাদর হইয়াছেন। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহা কিছু ইউরোপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রহণীয়, এই ভাব শিক্ষিত সমাজের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ক্রমশঃ উহা সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহে

বলিয়া ইংরেজ ব্যবহারবিদেরা মিতাক্ষরা অপেক্ষা দায়ভাগের অধিকতর গুণপক্ষপাতী।

* Collectivism curtails as surely as individualism extends the area of contractual freedom. * * * During the latter part of the nineteenth century, the tendency to curtail such freedom becomes clearly apparent. * * * The Landlord and Tenant (Ireland) Act 1870, 33 & 34 Vict. c. 46 and still more the Land Law (Ireland) Act, 1881, 44 & 45. Vict. c. 49 are the negation of free trade in land, and make the rights of Irish landlords and of Irish tenants *dependent upon status, and not upon contract.* (The italics are ours)—Dicey's Law and opinion p. 263. ডাইসী (Dicey) নিজ গ্রন্থে নিম্নলিখিত অর্থে collectivism শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—"By collectivism is here meant the school of opinion often termed (and generally by more or less hostile critics) socialism, which favours the intervention of the state, *even at some sacrifice of individual freedom*, for the purpose of conferring benefit upon the mass of the people. (The italics are ours)—*Ibid* p. 65.

মারে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। বলা আবশ্যক যে, ইউরোপের নিকট ভারতবর্ষের কিছুই গ্রহণীয় নাই, আমরা এরূপ মত পোষণ করি না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ত্যাগ করি, আর গ্রহণই করি, কোন অবস্থাতেই আমাদের মানসিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিসর্জ্জন যে দিয়াছি, তদ্বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন যে, ইউরোপ আমাদের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আমাদের শব্দগুলিও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। *

পরিশেষে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, তবে আমরা নিশ্চই শেষোক্তটীর নাম করিব। কারণ, চিন্তাই মানুষের বিশেষত্ব। উহাই মনুষ্যকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উহাই সভ্যতার মুকুট-মণি। যে সমাজে উহার অভাব, সে সমাজ সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল হইলেও সভ্যতার নিম্নতর স্তরেই তাহার আসন গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এই বিষয়ে পুনরায় টেইনের মত উদ্ধার করিব—

If some dweller in another planet were to come down here to ask us the nature of our race, we should have to shew him the five or six great ideas which we have formed of the mind and the world. That alone would give him the measure of our intelligence.—Taine's *History of English Literature*, vol II, P. 481.

তাৎপর্য্য—যদি অপর কোন গ্রহবাসী লোক আমাদের এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমাদের জাতীয় প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে আমরা প্রকৃতি ও পরমেশ্বর সম্পর্কে যে পাঁচ ছয়টী মত বা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাকে আমাদের তাহাই দেখাইতে হইবে। কেবল মাত্র তাহাই আমাদের মানস-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিবে।

কঠিন সমাজ-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও ভারতীয় মনীষীরা এইরূপ গোটা কয়েক তত্ত্ব জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। * তাহাই ভারতবর্ষকে চিরকাল অমরতা প্রদান করিবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

---

* With the Europeanization of our minds and modes of thinking, even our words have been perceptibly Europeanised—Bepin Chandra Pal's *Soul of India*, pp 145. Quoted by "Arthur Avelon" in his Introduction to the *Principles of Tantra* P. XV.

* Cf. Max Muller. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato or Kant—I should point to India —*India : What can it teach us?* P. 6.

চাউলের কথা

কথিত আছে পুরাকালে গাছে ধান ফলিত না, চাউলই ফলিত। ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর শাপে চাউলের উপর সাতটী পর্দ্দা জন্মিয়া ধান্যের উৎপত্তি হয়। মানব জাতির সৌভাগ্যক্রমে অভিসম্পাতের বাক্য বিন্যাসে বোধ হয় একটু ফাঁক ছিল, তাই ধান হইতে রন্ধনযোগ্য চাউল প্রস্তুত করিতে সাতটী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইলেও চাউলের পর্দ্দা বা আবরণ মাত্র দুইটী; একটী তুষ, অপরটি চাউলের অঙ্গীভূত লাল অথবা সাদা বর্ণের পরদা। ধানের তুষ জীর্ণ করিবার ক্ষমতা মানবের পাকস্থলীতে নাই; গবাদি পশুর পাকস্থলীতে সেই ক্ষমতা আছে তাই তুষ মানবের অখাদ্য ইতর জন্তুর খাদ্য। তুষ ছাড়াইয়া লইলে চাউলের উপর যে দ্বিতীয় আবরণটী থাকে তাহা ধান্যের জাতিবিশেষে কোথাও লাল, কোথাও সাদা; এই আবরণের জন্যই কোনও চাউল লাল এবং কোনও চাউল সাদা হয়। ঢেঁকিতে অথবা উদূখলে চাউল ছাটিয়া লইলে ঐ পর্দ্দাটী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়, ঐ গুঁড়ার চলিত নাম "কুঁড়া"।

সিদ্ধ চাউল :—ধান গরম জলে সিদ্ধ করতঃ শুকাইয়া তাহা হইতে যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম সিদ্ধ চাউল। যদিও পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের এবং এশিয়ার অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য চাউল, তথাপি সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালীটি কিন্তু এক মাত্র ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতিরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান এমন কি ভারতবর্ষের আসাম, মণিপুর প্রভৃতি দেশের মঙ্গোলীয় জাতিদিগের মধ্যেও সিদ্ধ চাউল অপরিজ্ঞাত। বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় আসামে ও মণিপুরে ক্রমে সিদ্ধ চাউলের প্রচলন হইতেছে,

ধান সিদ্ধ করিলে চাউলের সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা (অর্থাৎ সিদ্ধ করিলে) চাউলের স্নেহ ভাগের শতকড়া ৫০ ভাগ. প্রোটিডের ৮ ভাগ, শ্বেতসারের ৮ ভাগ ও লাবণিক পদার্থের প্রায় ১৭॥ ভাগ সিদ্ধজলের সহিত চলিয়া যায়।

গমাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

	(মাংসজনক) প্রোটিড্	শ্বেত-সার	স্নেহ পদার্থ	লবণাদি আঁশ	জল বাষ্পে	খোসা ও পদার্থ
গম——	১২.৪	৬৭.৯	১.৪	১.৮	১৩.৬	২.৫
যব——	১১.১	৬৪.৯	২.২	২.৭	১৩.৮	৫.৮
চাউল—	৭.৯ (সর্ব্বাপেক্ষা কম)	৭৬.৫	০.৯	১.০	১৩.১	০.৬

একে ত চাউল গমাদি হইতে অপেক্ষাকৃত সারহীন এবং প্রায় সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট। ইহা হইতেও যদি পূর্ব্বের লিখিত হিসাবে সার পদার্থ চলিয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে সিদ্ধ করিবার প্রক্রিয়ায় অগ্নির উত্তাপে চাউলের রঙ্গিন পর্দ্দাটী শক্ত হইয়া পড়ে, এবং শক্ত হইয়া পড়ে, বলিয়াই ছাটিবার সময় বেশী ভাঙ্গিতে পারে না। সেই জন্য আতপ চাউলের ন্যায় সিদ্ধ চাউলে তত কুঁড়া হয় না। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আতপ চাউল :——ধান রৌদ্রে শুকাইয়া (অর্থাৎ আতপ) চাউল প্রস্তুত করিলে চাউলের উপরের দ্বিতীয় রঙ্গীন পর্দ্দাটী অত্যধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। তাই আতপ চাউলে অধিক কুঁড়া হয়। কুঁড়া বেশী হইলে চাউলের পরিমাণ কম হয়, এই ক্ষতি নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার আবিষ্কার।

আতপ চাউল যদি কুঁড়া সুদ্ধ রাখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে সারবত্তায় আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল হইতে বহু উচ্চ আসন পাইত। বর্ত্তমানে আমরা চাউলের কুঁড়াকে অতি হেয় বস্তু মনে করিয়া পায়রা, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি পাখিকে খাইতে দেই, নিজের

খাই না। মুসলমান চিকিৎসকেরা দৌর্ব্বল্য রোগে (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যে) চাউলের কুঁড়া অন্নপান ও পথ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুঁড়ার উপাদান :—

শ্বেত সার শতকরা ৪৫ ভাগ।
জল ,, ১১ ভাগ।
লবণাদি ,, ৯ ভাগ।
স্নেহপদার্থ ,, ১৪ ভাগ।
প্রোটিড্ ,, ১৩ ভাগ।
আঁশ ,, ৮ ভাগ।

সুতরাং কুঁড়া ছাড়িয়া দিলে আতপ চাউল একান্তই হীন হইয়া পড়ে।

শুধু ইহাই নহে— আমরা সাধারণতঃ ভাতের ফেন ফেলিয়া দেই। ফেনের সহিতও সারবান পদার্থ বহু পরিমাণে চলিয়া যায়। কঠিন আবরণে আবৃত থাকে বলিয়া সিদ্ধ চাউলের ফেনে সারভাগ বেশী পরিমাণে বাহির হইতে পারে না, তাই সিদ্ধ চাউলের ফেন জলবৎ পাতলা ও প্রায় স্বাদবিহীন হয়। কিন্তু তাহাতেও প্রায় দুই আনা পরিমাণে শ্বেতসার ও আনুষঙ্গিক লবণাদি চলিয়া যায়। আতপ চাউলের আবরণ কোমল ও অনেকটা ভাঙ্গা থাকার দরুণ ফেনে বহু পরিমাণে সার নির্গত হইয়া যায়. তাই আতপের ফেন গাঢ় ও সুমিষ্ট। কোনও কোনও স্থানে ভাতের (বিশেষতঃ আতপ চাউলের) ফেন শিশুদিগকে খাইতে দেওয়া যায়। হোটেলওয়ালারা অনেক সময় ভাতের ফেন মিশাইয়া ডা'লের পরিমাণ বাড়াইয়া লয়; ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথা। ইহাতে "শাপে বর" হয়। ডালে জল অপেক্ষা ফেন মিশান শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও কেবল মাত্র আতপ চাউলই প্রচলিত ছিল। চরক আদি চিকিৎসা গ্রন্থে সিদ্ধ চাউলের নামোল্লেখ নাই। সকল দেশের লোকই প্রাচীনকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমরাও প্রাচীন জিনিষকে বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে করি। কুশাসন, আতপ চাউল, মধু, চন্দন, প্রভৃতি জিনিষ আমাদের চক্ষে যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, আধুনিক আবিষ্কার নানাবিধ আসন, সিদ্ধ চাউল, পরিষ্কৃত চিনি, ও আতর গোলাপ—শ্রেষ্ঠ হইলেও তেমন পবিত্রতা লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুমাত্রই আতপ চাউলকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। দেবতার ভোগে ও নৈবেদ্যে এক মাত্র আতপ ব্যতীত অন্য চাউলের ব্যবহার অশাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য হয়। বিধবা ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের আহারের জন্য এক মাত্র আতপ চাউলই ব্যবহৃত হয়। এক ভাগ চাউল ৫ ভাগ জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। একগুণ চাউলে তিনগুণ ভাত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমরা পাক করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে—৫ ছটাক চাউলে ১৫ ছটাক ভাত ও প্রায় অর্দ্ধসের ফেন হয়। প্রাচীনের প্রতি এই কটাক্ষ পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এত বেশী জল দিয়া পাক করিয়া হীন অন্নকে হীনতর করিবার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জাপানীরা চাউল জলে সিদ্ধ করে না, জলের উপরে সচ্ছিদ্র পাত্রে চাউল রাখিয়া আমাদের দেশের পিষ্টক রন্ধন প্রণালীতে বাষ্পের উত্তাপে ভাত রাঁধিয়া লয়। এই উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিন্দুমাত্রও অপচয় হয় না।

কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশ হইতে ফেন ফেলিয়া দেওয়ার প্রথা উঠিয়া না যায়, এবং আমরা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে ভাত রাঁধিতে না আরম্ভ করি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের সিদ্ধ চাউলই খাওয়া উচিত।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার কলিকাতায় ও বাংলা দেশের নানা স্থানে আবির্ভূত হওয়াতে বেরী বেরী (Beri-Beri) নামক রোগের নাম আজকাল অনেকেই জানেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে যে সকল বেরী বেরী রোগী আসিত, তাহারা সকলেই চীনা। ঐ চীনারা খিদিরপুরের ডকে সুতারের কাজ করিত। চীনারা আমাদেরই মত ডা'ল ভাত মাছ খায়। ঐ ডকে বহু সহস্র বাঙ্গালী কারিগর ও মজুরও কাজ করে। একই স্থানে বাস করিয়া ও প্রায় একই প্রকার খাদ্য খাইয়া কেবল মাত্র চীনারাই ঐ রোগে আক্রান্ত হইত (বাঙ্গালী উড়িয়া প্রভৃতি হইত না ইহা চিকিৎসক সমাজের একটি সমস্যাবিশেষ ছিল। বেরী-বেরী রোগ জাপানে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ও মলয় উপদ্বীপে কুলীমজুর-দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। মলয়ের কুলী-মজুরেরা কতক অন্নভোজী, কতক অন্নভোজী নহে। একবার তথাকার হাসপাতালের হিসাব খতিয়ান করিয়া দেখা গেল যে, ছয় লক্ষ অন্নভোজী কুলীমজুরের মধ্য হইতে ৩০ বৎসরে দেড় লক্ষ বেরী বেরী রোগী আসিয়াছে ; অপর প্রায় ছয় লক্ষ—যাহারা রুটী খাইত—তাহাদিগের মধ্য হইতেও প্রায় দেড়লক্ষ রোগী আসি-য়াছে, কিন্তু তাহারা বেরী-বেরীর জন্য নহে। ছয় লক্ষ অন্নভোজীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক চীন দেশীয়। অপর অর্দ্ধেক জাপানী, তামিল প্রভৃতি জাতি। চীনারা কলের ছাটা আতপ চাউল খাইত ; অপরেরা আতপ চাউল খাইত বটে, কিন্তু তাহা নিজেরা নিজের হাতে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইত। দেখা গেল যে, বেরী-বেরী রোগীর শত কড়া ৯৭॥০ জন কলের চাউল ভোজী চীনা। চাউলের সহিত বেরী-বেরীর কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে. এরূপ সন্দেহে ডাক্তারেরা চাউল লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সালামগুরের (Salamgoor) পাগলা গারদে ফ্লেচার (Fletcher) সাহেব অর্দ্ধেক লোককে কলের ছাটা চাউল ও অর্দ্ধেক লোককে অন্য চাউল খাওয়াইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বেরী-বেরী কেবল কলের ছাটা চাউল ভোজীদিগের মধ্যেই হইতেছে। বাসস্থানের সহিত বেরী-বেরী রোগের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য, লোকদিগকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখিয়া, প্রত্যেক স্থানের অর্দ্ধেক লোককে কলের ছাটা চাউল ও অর্দ্ধেক লোককে অন্য চাউল খাওয়াইয়া দেখিলেন যে, যে স্থানেই থাকুক না কেন যাঁহারা কলের ছাটা চাউল খাইতেছে, বেরী বেরী কেবল তাহাদিগের মধ্যেই হইতেছে। কলের চাউল উঠাইয়া দিয়া ৬ মাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একটী লোকেরও বেরী-বেরী রোগ হয় নাই। তৎপর কতকগুলি লোককে কিছুদিন কলের চাউল ও কিছুদিন অন্য চাউল খাওয়া-ইয়া দেখা গেল যে, তাহারা যখন অন্য চাউল খায় তখন বেশ সুস্থ থাকে, কিন্তু যখন কলের চাউল খায় তখনই তাহাদিগের মধ্যে বেরীবেরী রোগ হইতে থাকে। কলের চাউলের কি দোষে ঐ রোগ উৎপাদনের সাহায্য করে, তাহার বিশেষ অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কলের চাউল অত্যধিক পরিষ্কার বলিয়াই সারহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহাতেই বেরীবেরী রোগ জন্মে।

পূর্ব্বে চাউলের যে রঙ্গিণ আবরণটীর কথা বলা হইয়াছে, তাহারই গায়ে ও অব্যবহিত নীচে চাউলের যাবতীয় লাবণিক পদার্থ, বিশেষতঃ ফসফরাস (Phosphorus) ও ভাইটেমিন্ (Vitamine) নামক বীর্য্যবাণ পদার্থ, অবস্থিত। কুঁড়া ভাঙ্গিয়া দূরীভূত হইলে তৎসঙ্গে ফস্‌ফরাস্ ও ভাইটেমিন্ টুকুও চলিয়া যায়। শোম্যান (Shoman) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সিদ্ধ চাউলে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ শতকড়া ৭৫·৪ ও রেঙ্গুণী (কলের) চাউলে তাহার অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও কম। কলের চাউল দেখিতে সুন্দর করিবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ রঙ্গিণ পর্দ্দাটী সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলা হয় তাহাতেই রেঙ্গুণী চাউল এরূপ হীনবীর্য্য হয়। আমাদের দেশীয় আতপ চাউলে পরিত্যক্ত কুঁড়ার সহিত ফস্‌ফরাস ও ভাইটেমিন বহু পরিমাণে চলিয়া গেলেও একেবারে শেষ হইয়া যাইতে পারে না। কারণ ঢেঁকির ছাটায়

...দিগ পর্দাটি কিছুতেই একেবারে দূর হয় না। ...এগি আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা এই অংশে ...ীন। আতপ চাউলে আর একটু দোষ আছে—প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে তাহাতেও এক প্রকার Fungus জন্মে এবং যেটুকু ফস্‌ফরাস ও ভাইটেমিন ...গুলিই থাকে Fungusএ সেইটুকুও খাইয়া ফেলে। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পুরাতন আতপ চাউল জড়াইয়া ডেলা বাঁধিয়া যায়। Fungusএর উৎপত্তিই ইহার কারণ। আমাদের দেশে গৃহস্থের ঘরে আতপ চাউল সঙ্গে সঙ্গে খরচ হইয়া যায় বলিয়াই জমিতে পারে না, এবং সেই জন্যই Fungusএর উপদ্রব ঘটিতে পারে না। নিয়ত আতপ চাউল ব্যবহার করিয়াও আমাদিগের দেশের লোক যে বেরী-বেরী গ্রস্ত হয় না, ইহাই তাহার কারণ। ঢেঁকীর সাহায্যে যদি আমরা কলের ছাটা চাউলের ন্যায় পরিষ্কার চাউল প্রস্তুত করিতে পারিতাম তাহা হইলে বেরী বেরী আমাদের নিত্য সহচর হইত।

চাউলের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইল। আমাদিগের মত এই যে (১) আমাদের পক্ষে সিদ্ধ চাউলই শ্রেষ্ঠ। (২) আতপ চাউল খাইতে হইলে টাট্‌কা খাওয়া চাই। (৩) আতপ চাউলের মধ্যে যে চাউলে যত বেশী পর্দা থাকিয়া যাইবে তাহাই তত উৎকৃষ্ট। (৪) কোনও চাউলেরই ফেন ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীতারকনাথ দেব।

কবিতার কথা

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ, ৭ই মাঘ, ১৩২১)

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানা-প্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় প্রত্যক্ষ বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন, ভাবুকতাই মনুষ্য-জীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে রীয়েলিজম্ (Realism) ও আইডীয়েলিজম্ Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'স্কাইলার্কের' (Skylark) এর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

> Type of the wise who soar but never roam
> True to the kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায় তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্ম্মে নিযুক্ত হই, সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম্ম করিতে হয় না, সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকমে গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক্ আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে, মাঝে মাঝে দুরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি, এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সে'ই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায়, কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায় কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতা নাই;—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন বাহিরের জীবনের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায় তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্ণ্‌সের 'প্লাউম্যানের' (Ploughman) কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" 'কৃষকের ব্যথা' নামক একটী কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করিতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই।
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি'।

* * * *

শান্তিপুরে', তোমার ডুরে', এ বুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্ত

মুহূর্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের হৃদয়মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি—মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ব্ব, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই. শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ! এই জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোবড়া খায় সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিতলোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করা যায় না, সেইরূপ এই কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলনমন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি!
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি!"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না: আর কি শুনিতে পাইব না?

রাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা মনে করুন।

সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে!
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি। যাঁহারা শুধু বাহিরের দিক্‌টা দেখেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "পূর্ব্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?" আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই সে জীবনের স্বরূপ,—পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই রূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন

করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটী এই—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আন্‌মনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

আর একটি এই,—

ভালবেসে সখি! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে তাহার কি হইল। সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত।
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল।
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে"। আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম ত হবেই। তুমি যে

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস।"

তারপর মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ! শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে? চণ্ডীদাস জানে; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা!

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ গান তাহারি প্রথম সূত্র। এই বিরহ তারপর সম্ভোগে আরও সুন্দর ভাবে, গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুঁহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরোপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহামিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিরহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতাগুলি রীয়েলিষ্টিক্ও (Realistic) নয় আইডীয়েলিষ্টিকও (Idealistic) নয়; আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙ্গালীর কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়!

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গলা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমেরই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু আমি ত কোনও গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন্ (Ibsen) হইতে কাড়া-

কাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটার্‌লিঙ্কের (Maeterlinck) পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙ্গালা কবিতায় সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভূতকিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে

এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছানিয়া বুনিয়া, ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি॥ একটি ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি। এবং সেই রঙ্গিন জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরল ভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম
নয়ন ত মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন ;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল! আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে. পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে করে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।
আমি জান্‌লাম জান্‌লাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে
মৃতদেহে কর্‌লে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধু-বাবুর "তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে", কিম্বা বিহারীলালের—

"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার!

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয়, যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগরাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না। প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধা-স্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধূলা ভাল লাগে না। সংসারে খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষৎ পায় তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে তাহাদের মত দুর্ভাগা আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্য লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্যসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্করমাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ও পারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলনমন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

সভামঙ্গল *

স্বাগত গরীয়ান্
স্বাগত যত বন্দনীয়
সজ্জন মহীয়ান্!
আজি এ পূজার মণ্ডপতলে
ঋত্বিক! বাণী শোনাও সকলে,—
উদাত্ত সামে সভা-মঙ্গল
পূর্ণ করুক প্রাণ;
স্বাগত আজি বন্দনীয়
সজ্জন মহীয়ান্!

এস 'মালঞ্চের' মহামালাকর!
এস সাগরের কবি!
বঙ্গের হেম উদয়াম্বরে
চির ভাস্বর রবি!
সিন্ধুর কলকল্লোল গানে
অসীমের বাণী পশেছে কি প্রাণে?
হেরিয়াছ বুঝি অনন্ত নীলে
চির বাঞ্ছিত ছবি!
পূরবের নব বাণী-মন্দিরে
এস পূরবের কবি!

এই নগরীর ধূলি-কণিকায়
সঞ্চিত কত কথা!
এই তটিনীর স্বচ্ছ ধারায়
কল্লোলে কত গাথা!
লুপ্ত অতীত গৌরব-শিখা
পরায়েছে ভালে হেম-ললাটিকা;
আজিও বঙ্গ-বিভব-লক্ষ্মী
এরি সম্ভ্রম-নতা!
এই নগরীর নিচোলাঞ্চলে
সঞ্চিত কত কথা!

ভাষা-জননীর চরণ-পদ্মে
এরি অঞ্জলি-ভার,
বোধনের নব ফুল পল্লবে
উজ্জ্বল অনিবার;—
'বঙ্কিম' যবে জাহ্নবী-তীরে
বোধন-শঙ্খ বাজাল গভীরে,
বিপুল ছন্দে বুড়ীগঙ্গার
উচ্ছ্বলে স্রোতোধার,—
'কালীপ্রসন্ন' রচিল যতনে,
কনকাঞ্জলি তার।

নাই—নাই আর সে চিরসাধক,
বন্ধ সে বীণা আজ,—
মথিয়া উঠিছে কত ব্যথা আজি
মৌন হিয়ার মাঝ;
বঙ্গ-বাণীর সোনার দেউলে
এই নগরীর দীপারতি জ্বলে,
আজো ঝলমল দীপ্ত বিভায়
এরি দেওয়া মণিসাজ!
নাই—নাই শুধু সে মহাতাপস,
বন্ধ সে বীণা আজ।

আজো শুনি কা'র বীণা-ঝঙ্কার,
কল্লোলময়ী ভাষা?—
আজো 'গোবিন্দ' মোহন ছন্দে
গুঞ্জরে কত আশা:
পল্লীর শত স্বপনের ছায়া
মর্ম্মে মর্ম্মে রচে নব মায়া,

* সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন ঢাকা সাহিত্য পারষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, ৭ মাঘ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

দুঃখসুখের শত কাহিনীতে
কত কাঁদা, কত হাসা।—
আজো শুনি তা'র বীণা-ঝঙ্কার,
কল্লোলময়ী ভাষা।

এস গো বাণীর পুরমন্দিরে
হে সাধক! এস জুটি,'—
'জননী বঙ্গ ভাষা'র চরণে
বিশ্ব পড়িছে লুটি' ;—
'রবির' দীপ্ত মুকুট-বিভায়
নিখিল অর্ঘ্য রচে তা'র পায় ;
জননীর চারু চরণ-সরোজে
মধুকর! এস ছুটি'!
ভাষা-জননীর পূর্ব্ব দেউলে
হে সাধক! এস জুটি'!

স্বাগত গরীয়ান্!
স্বাগত যত বন্দনীয়
সজ্জন মহীয়ান্।
আজি এ পূজার মণ্ডপতলে
ঋত্বিক! বাণী শোনাও সকলে,—
উদাত্ত সামে সভা-মঙ্গল
পূর্ণ করুক প্রাণ ;
স্বাগত আজি বন্দনীয়
সজ্জন মহীয়ান্।

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

মহীপাল প্রসঙ্গ

(আলোচনা)

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত 'মহীপাল প্রসঙ্গ' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে গত মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় নলিনী বাবু ঐ বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

তাঁহার আলোচনার উত্তর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় নলিনী বাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও আলোচনার প্রথমে লাল পতাকা দেখাইয়াছেন, তাই প্রতিভা পত্রিকায় এই আলোচনা পাঠাইলাম। সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা ব্যতীত অন্য পত্রিকায় এই শুষ্ক বিষয়ের আলোচনার জন্য এতটা স্থান দাবী করা যায় না।

নলিনী বাবুর দফাওয়ারী আপত্তিগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একে একে নিম্নে নিবেদন করিলাম—

১। বাঘাউড়া লিপি।

এই লিপির লিখিত মহীপাল কে? নলিনী বাবুর মতে ইনি পালবংশীয় প্রথম মহীপাল। কিন্তু তাঁহার প্রমাণগুলি তত ঘাতসহ নহে।

(১) ২য় বিগ্রহপাল কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি নহেন।

(২) বানগড় লিপি হইতে জানা যায় তিনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সৈন্যসামন্ত সহ পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্লোকটী এই—

(দেশে প্রাচি) প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু।
কৃত্বা (সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং ; শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়া (দ্রে)ঃ কটকমভজয়ং যস্য সেনা গজেন্দ্রাঃ (১)॥ ১১

অর্থাৎ, তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জলপ্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকায় চন্দন বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের

---

(১) গৌড়লেখমালা, বাণগড় লিপি।

জড়তা সম্পাদন করিয়া, মালয়ের কটক দেশ উপভোগ করিয়াছিল।

এই শ্লোকে পূর্ব্বাঞ্চল এবং মলয় পর্ব্বত অর্থাৎ নীলগিরি পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করা বুঝায়। ঐ সমস্ত দেশ জয় করিলে তাহা না লিখা কি স্বাভাবিক বোধ হয়? ইহাতেই বুঝা যায় রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াই বিগ্রহ পাল এই সমস্ত দেশ অনুগত সৈন্যগণ সহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

(৩) ১ম মহীপাল অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য বলিলে সমস্ত রাজ্যটাই বুঝায় বটে, কিন্তু সমস্তটা বোধ হয় তিনি উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন না।

(৪) বাঘাউড়া লিপিতে এমন কোন ইঙ্গিত নাই, যদ্দারা বুঝা যায় যে, ২য় বিগ্রহপাল পূর্ব্বদেশে যে যে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, মহীপালও সেই সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(৫) কুমিল্লার এই লিপি ১ম মহীপালের নহে। পূর্ব্ববঙ্গে ভাওয়ালে শিশুপাল, সাভারে হরিশ্চন্দ্র পাল, যশোপাল প্রভৃতি বহু পাল রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তদ্রূপ মহীপাল নামক একজনও ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন, ধরিতে বাধা কি?

আমি জোর করিয়া কোন তথ্যই প্রচার করি নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি রাজসাহী টাউনের ৭।৮ ক্রোশ দূরে দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর বিগ্রহ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং পদুম সহর নামক দীঘি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্যই ইহা বিজয়সেনের কীর্ত্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি নাই। এই দুইটী চিহ্ন দ্বারা আমি প্রদ্যুম্ন নামক কোন রাজার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছি। এই চিহ্নকে একটী অকাট্য বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক চিহ্ন বলা যাইতে পারে। প্রদ্যুম্নশূর একজন ছিলেন তাহা কুলগ্রন্থে জানা যায়। বরেন্দ্র শূর এবং অনুশূরের অস্তিত্বও জানা যায়। বিজয় সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এই অনুশূরের পরে। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রে রাজা হইয়া থাকিলে, প্রদ্যুম্নশূর বরেন্দ্রশূর এবং অনুশূরের রাজত্ব ২৫ বৎসর হিসাবে ৭৫ বৎসর ধরিলে, আমরা ১০৭২—২৫=৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। এই সময় মহীপাল (১ম) যে গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, অথবা, বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। এই তিন শূর রাজা বাণগড়, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি প্রভৃতিকে লইয়া একটী ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারা যায়। ১৩১৯ সালের ১লা ফাল্গুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে কতক লিখিয়াছি এবং দিনাজপুরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পূর্ণ আলোচনা করিয়াছি।

বিজয় সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর বিগ্রহ স্থাপনকর্ত্তা নহেন। তিনি কেবল মন্দিরনির্ম্মাণকর্ত্তা। তাঁহার লিপিই ইহার প্রমাণ। বাণ রাজার বাড়ী ও অনিরুদ্ধের অস্তিত্বও ইহার একটী প্রমাণ; সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এ কথা বলা চলে না, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আলোচনা করিলেই সমস্ত তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়।

২। সাগর দীঘি।

রাঢ় দেশের সাগর দীঘি যে কোন মহীপালের কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল শকাব্দা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সন্দেহ মাত্র ৩০ বৎসর লইয়া; অর্থাৎ ৭১০ শক হইবে কি ৭৪০ শক হইবে এই সন্দেহ হয়। এই সন্দেহে একটা শিলালিপির প্রমাণ আমি নষ্ট করিতে বলিতে পারি না, বা শিলালিপি নষ্ট করিয়াও এই মহীপালকে পালবংশীয় ১ম মহীপাল বলিতেই হইবে এরূপ জেদ করিতে পারি না। নিখিল বাবু এই পাঠে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত সকলেই সন্দেহ করিবে এমন কোন কথা নাই। কারণ "শাকে সপ্ত" এই দুই শব্দে কোনই সন্দেহ নাই। ৭০০ শক

হইলেই ১ম মহীপাল হইল না, কারণ তিনি দশম খৃষ্ট শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। নলিনী বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে এ সমস্ত বিচার করিয়া দেখিবেন। কোন ধারণা লইয়া বিচার করিবেন না।

৩। দ্বিতীয় মহীপাল।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থ এই দুইটীর মধ্যে কোনটী বেশী প্রামাণিক? যদি একজন রাজা বা রাজপুত্রের কথা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের তাম্রশাসনে একরূপ এবং সমসাময়িক সংস্রবশূন্য কোন কবির লিখিত কাব্যে একরূপ পাওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-লেখক কোনটার কথা গ্রহণ করিবেন? তাম্রশাসনে আত্মপ্রশংসা বা অতিরঞ্জিত কথা থাকে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাম্রশাসন ত্যাগ করা যায়? বিশেষতঃ, দ্বিতীয় মহীপালকে রাজা বলিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের কি বাধা ছিল? তাম্রশাসনে আত্মপক্ষের নিন্দা না থাকিলেও প্রকারান্তরে এমন ভাবে সেই ঘটনা লিখা থাকে যে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে ধরা যায়। মদনপালের তাম্রশাসন, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাতে রামপালের বরেন্দ্র উদ্ধারের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, কিন্তু কখন বরেন্দ্র হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট লিখিত নাই। এরূপ ভাবে লিখিত আছে যে, একটু চিন্তা করিলেই ধরা যায়।

রামচরিতে লিখিত আছে, ২য় মহীপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে এ কথা লিখিতে কি বাধা ছিল? রামচরিতে শূরপালের রাজত্বের কথা লিখা নাই, মদনপালের তাম্রশাসনে তাহা আছে, এই মিথ্যাটুকু তাম্রশাসনে লিখিবার কারণ কি? তাম্রশাসনানুসারে স্পষ্টই বুঝা যায়, ২য় মহীপাল রাজা হন নাই, শূরপাল রাজা হইয়াছিলেন, তখনও দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করে নাই। রামপালের রাজত্বকালে এই কথাটা ইঙ্গিতে লেখা আছে। নিজের পিতার উপর কলঙ্ক না দিয়া জ্যেষ্ঠতাতের উপর তাহা চাপাইয়া দেওয়াই ত স্বাভাবিক। তাহা না করিয়া মদনপাল কেন পিতার স্কন্ধে দিব্যোকের বরেন্দ্রগ্রহ আনিয়া ফেলিলেন? নিজপক্ষের লিখিত শাসনে তিনি এই মিথ্যা কথা লিখিলেন কেন? এই সমস্ত বিষয় অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। আশা করি নলিনী বাবু এ সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—পূর্ব্ব পুরুষের (রায় মহাশয়ের [অর্থাৎ আমার] মতে) কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা চরিত্র চিত্রণে কলঙ্কিত পুস্তক রচনা করিয়া অধস্তন পুরুষের প্রসাদ লাভ করার চেষ্টা একটু অসঙ্গত মনে হয় না কি? এখানে নলিনী বাবু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যুদ্ধটা সত্য, সুতরাং পরাজয়টাও সত্য। পুত্রের কৃপালাভের আশায় এই পরাজয়-ব্যাপার পিতার স্কন্ধ হইতে কেহ যদি জ্যেষ্ঠ তাতের স্কন্ধে চাপায়, তবে তাহা কি বড়ই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়? মদনপালের তাম্রশাসনের কথা নন্দী কবি জানিলে কখনই এরূপ লিখিতেন না। না জানাতেই এরূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন, পালরাজগণের তালিকায় ২য় মহীপালের নাম আছে। যে তালিকা রাম-চরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ২য় মহীপাল নাম থাকিবে, আর যে তালিকা তাম্রশাসন অনুসারে লিখিত তাহাতে ২য় মহীপালের নাম থাকিতে পারে না। ২য় মহীপালের নাম পালরাজগণের তালিকায় বাদ দেওয়া চলে না, এ কথা আমি কোথাও লিখি নাই। নলিনী বাবু আমার স্কন্ধে অনর্থক এই দোষ চাপাইয়াছেন।

আমি লিখিয়াছি—"মহীপাল রাজা না হইলে তাঁহার নাম তাম্রশাসনে বংশতালিকায় লিখিত হইয়াছে কেন?" নলিনী বাবু তাড়াতাড়ি বুঝিতে গিয়া বংশতালিকা স্থলে রাজগণের তালিকা বুঝিয়াছেন।

সে দোষ আমার নহে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তিনি আমার "এ রকম" কেন, কোন রকম "গোঁড়ামি" বা যুক্তিশূন্য মতবাদ দেখিতে পাইতেন না।

নলিনী বাবুর কথা মত তাম্রশাসন অবিশ্বাস করিলে ইতিহাসের উপকরণ কোথায় পাইব? নিজের গরজ মত একখানা অবিশ্বাস, একখানা বিশ্বাস করিলে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার হয় কি? তিনি হয় ত রামচরিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আমি তাহা না করিয়া তাম্রশাসন বিশ্বাস করিয়াছি। এ স্থলে কোনটা প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য তাহার বিচার অবশ্যই হইতে পারে। যে যে কারণে আমি রামচরিতের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা 'গৃহস্থ' পত্রিকায় লিখিয়াছি। আশা করি নলিনী বাবু সেগুলি সুযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচারে খণ্ডন করিতে পারিলে আমি তাহা অবনতমস্তকে মানিয়া লইব, কারণ আমি গোঁড়া নহি। প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করাই আমার ব্রত। আমার পৃথিবীর পুরাতত্ত্বই তাহার প্রমাণ।

নলিনী বাবু রামচরিতকে অভ্রান্ত বিশ্বাস করিয়াছেন; তাই তিনি শূরপালের তাম্রশাসনখানি তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতির পরের লিখিত, বলিয়াছেন। মদনপালের তাম্রশাসনখানি বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, শূরপালের রাজত্বকালে দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করিতে পারে নাই। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও স্পষ্টই বুঝা যায় রামপালের সময় দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করিয়াছিল, আবার রামপালই তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই দুইখানা তাম্রশাসন অবিশ্বাস করিয়া রামচরিতকে বিশ্বাস করিতে বলিলে তাহার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আশা করি নলিনী বাবু সে চেষ্টা করিবেন, কারণ ঐতিহাসিক তথ্য যত নির্দোষ হয় তাহাই প্রার্থনীয়।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—"রামপালের দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয় নাই, কারণ মদনপালের শাসনের ১৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে, দিব্য-প্রজার পক্ষভুক্ত লোক সমূহ আসিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিল।" এ বড় আশ্চর্য্য কথা! দিব্য যুদ্ধ করিল না, তাহার পক্ষভুক্ত লোকে যুদ্ধ করিল, অতএব সে যুদ্ধ দিব্যের করা হইল না! জর্ম্মাণ সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছেন, রুষিয়ার জার যুদ্ধ ক্ষেত্রে নাই, তবে কি এ যুদ্ধ রুষিয়ার জার করিতেছেন না, রুষিয়ার প্রজাবর্গ করিতেছেন? আমি নলিনী বাবুর এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। ১৬ শ্লোক ও বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ৪র্থ শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে রামপাল জনকভূম হারাণ, পরে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করতঃ উদ্ধার করেন।

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত জাতবর্ম্মার দিব্যের ভুজ নিন্দা কোন সময়ের কথা? দিব্য যদি বরেন্দ্র জয় করিয়াই লইল, তবে আর জাতবর্ম্মা দিব্যের ভুজের নিন্দা করিলেন কেমন করিয়া? রামপালকে তিনি সাহায্য করেন নাই, তাহা রামচরিত পাঠে জানা যায়। সুতরাং শূরপালের রাজত্বকালে দিব্যোক আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় জাতবর্ম্মার বাহুবলেই দিব্যোক কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মদন পালের তাম্রশাসন ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন, রামচরিত একত্র করিয়া এই কথা বুঝা যায় না কি?

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের ২৪ শ্লোকের অর্থ এই— "হা ধিক! কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে! রাক্ষসকুলের উৎপাতবিধাতা (অলকাধিপ) রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি? (এই) শঙ্কাকুল অবস্থায় (অয়ং) ভোজবর্ম্মদেব কুশলী হউন।" "এই শঙ্কার সময় অলকাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন" এই অর্থ নলিনী বাবু পাইলেন কোথায়? "রাক্ষসকুলের-উৎপাত বিধাতা রাম" এই উক্তিতে রাক্ষসকুল কোন কুলকে

বুঝাইতেছে? ভোজবর্ম্মার নিজের কুলকে বুঝাইতে না কি? রামের পুনরাগমনে ভোজবর্ম্মা শঙ্কাকুল হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে রামপালের কথা কিছুই নাই। ভোজবর্ম্মার প্রবল শত্রুকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে। রামপাল ভোজবর্ম্মার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। রামচরিতের বর্ম্মরাজা শ্যামলবর্ম্মা হইতে পারেন, হরিবর্ম্মাও হইতে পারেন। নলিনীবাবু ভোজবর্ম্মার সময়টা একটু বিচার করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

দিব্যোক বরেন্দ্র জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজা করিয়াছিল, নিজে রাজা হয় নাই।

৪। বিলাসপুর।

আমি লিখিয়াছিলাম, বিলাসপুর গঙ্গাতীরে হইবে। সন্তোষ আত্রাই নদীতীরে, সুতরাং তাহা বিলাসপুর হইতে পারে না। নলিনীবাবু তদুত্তরে লিখিয়াছেন—"স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান" কথাটা বাঁধি গৎ। নলিনী বাবুর লিখিত মত দুর্ভাগ্যক্রমে নহে, সৌভাগ্যক্রমেই আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পাল রাজার রাজধানী গঙ্গাতীরে ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটনায়, দেবপাল ও নারায়ণপালের রাজধানী মুঙ্গেরে, ১ম মহীপালের রাজধানী বিলাসপুরে এবং মদনপালের রাজধানী রামাবতীতে ছিল। এ সমস্ত স্থানই গঙ্গাতীরে, সুতরাং ইহাকেই বাঁধি গৎ বলিব কিরূপে? ইহা তো প্রকৃত কথা।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও ইটা রাজবংশ

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

(প্রথমার্দ্ধ)

আবুল মুজফর চৌধুরী দক্ষিণ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতি রাজা সুবিদনারায়ণের প্রপৌত্র। পাঠানদিগের আক্রমণে রাজা নিহত এবং চারি রাজপুত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর ইঁহাদের মধ্যে একজন হাজি খাঁ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুজফরের পিতা আব্দুল মজিদ এই হাজি খাঁর পুত্র।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মুজফরের পুত্র আবুল হেকিম প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত সনে আবুল মুজফরের ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল ফজল, পুত্র আবুল হেকিম এবং আবুল ফজলের পুত্র মাহাম্মদ নওয়াজ চৌধুরী নবগঠিত সমসেরনগর পরগণার চৌধুরী পদ লাভ করেন।* এই ঘটনা হইতে আবুল মুজফর চৌধুরীর সময়ের আভাষ পাওয়া যায়।

আবুল মুজফর একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীরূপে সাধারণ্যে পরিচিত; কিন্তু তিনি পারস্যভাষাবিৎরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে তদ্রচিত একটি কবিতার উল্লেখ করিব। দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি আলোচ্য কবিতায় নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা দক্ষিণ শ্রীহট্টে সুপরিচিত। লোক মুখে কয়েক পুরুষ যাবৎ গীত হওয়ায় স্থানে স্থানে ইহার পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কবিতার ভাব সর্ব্বত্রই একরূপ। এই কবিতার মধ্যে শ্রীহট্টের ইতিহাসের বহু

* এতৎসংশ্লিষ্ট সনদের বঙ্গানুবাদ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

অজ্ঞাত-পূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে। বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যে শ্রীহট্ট হইতে যে সকল তথ্য প্রচারিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের সহিত এই কবিতার বিবরণের বহুস্থলে গুরুতর অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। সুতরাং সত্য-নির্দ্ধারণ কল্পে কবিতাটি অতীব মূল্যবান।

আমরা কবিতায় অনুলিপি, মর্ম্ম ও আধুনিক মতবাদের মর্ম্ম উথাপন পূর্ব্বক সত্য নির্দ্ধারণ কল্পে পরিশেষে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক) আবুল মুজফর রচিত কবিতার অনুলিপি

বাচ্য গত্র অজুর্ব্বেদ কর্ম্ম সাখা নিজ—১
কনৌজ হনে আসিলেক নিধিপতি দ্বিজ—২
অগ্নিহত্রি মহাশয় নাম নিধিপতি—৩
মুখ দ্বারে অগ্নি আনি দিলেক আহুতি—৪
পূর্ব্বদেশ শ্রীহট্টে, এক দেশ ইটা—৫
ভোবিউড়া এওলাতলি বান্ধিলেক ভিটা—৬
ভিটা বান্ধিয়া ভট্টে খরর দিলা সুত্র—৭
দৈববলে হইল তান ভোধর নামে পুত্র—৮
ভোধর ভট্টের বংশের নাহি অন্ত—৯
যার বংশে পুরিয়াছে পৃথিবী পর্য্যন্ত—১০
কতেক বান প্রহস্তে গেলা, কতেক কাশীবাসী
—১১
কতেক গৃহস্থ হইলা, কতেক সন্নাসী—১২

ভোধরের ঘরে প্রধান তৃতীয় তনয়—১৩
ভাস্কর, পুস্কর, প্রভাকর মহাশয়—১৪
প্রভাকরের পুত্র হইলা কেশব সীক্দার—১৫
কেশবের তনয় হইলা কামদেব সীক্দার—১৬

কামদেবের পুত্র হইলা সুতরাজ খান—১৭
যাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড় বিদ্যমান—১৮
সাত লক্ষ শ্রীহট্টের বড় সিকদার—১৯
দুষ্ট ডাকাতি মারি করিলা সংহার—২০

ভানুনারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নন্দন—২১
ভানুনারায়ণের পুত্র সুবুদ্ধি নারায়ণ—২২
সিসু বুদ্ধি তথাপিও নানা গুণবন্ত—২৩

বিবাহ করিলা ভট্টে পঞ্চ ব্রাহ্মণি—২৪
সর্ব্ব প্রধান জএে মা কমলাসুন্দরী—২৫
দুই পক্ষে জন্মিলেক বিশেষ সন্ততি—২৬
তিন জন পুত্র বিনা হইলা অপুত্রিনি—২৭

দুই পক্ষে চারি পুত্র হইলা প্রধান—২৮
জামাল খা, কামাল খা পণ্ডিত সুজন—২৯
হাজি খা, ইছা খা আদি বিদ্যমান—৩০
রাম লক্ষণ দুই পুত্র ব্রাহ্মণ প্রধান—৩১

মহন্ত বংশেতে কত জন্মিতে লাগিলা—৩২
লেখিতে না পারি কত জন্মি জন্মি মৈলা—৩৩
এক পক্ষে এক কন্যা নাম রত্নাবতী—৩৪
রঘুদেব ভট্ট আদি তাহান সন্ততি—৩৫

দিলিপের বাদসা আছিল জাজির—৩৬
তার দর্পে পৃথিবীতে ঐরি নাহি স্থির—৩৭
তাহান ভ্রাতা ছিল খআজ উচবান—৩৮
বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত লোহানি পাঠান—৩৯

আবদুল মহজিদের সুত ছএ সহদর—৪০
প্রধান হইল কাছিম মনসুর মুজফর—৪১
আনন্দে আসিলেক জত সব প্রজা—৪২
তৃতীয় পুরুষ পর কন্যা সন্তান হইলা—৪৩

কত দিনে আবদুল মনসুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা—৪৪
সপ্ত দ্বিপ পৃথিবী জুড়ি ভোমিকম্প হইলা—৪৫

কহে মুজফর শুন সর্ব্বজন—৪৬
নিধিপতির সন্তানের হইবে বিড়ম্বন—৪৭

(পূর্ব্ব নকল লেখকের) সাক্ষর শ্রীসর্ব্বানন্দ দেব
সাকিন পং ইটা মৌজে ভোমিউড়া
(বর্ত্তমান) নকল লেখক—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী
তরফদার

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম চৌধুরী দেওয়ান সাহেব প্রদত্ত।

তপছিল—১
নিধিপতি ভট্ট—১
ভোধর ভট্ট—১
প্রভাকর ভট্ট—১
কেসব সিকদার—১
কামদেব সিকদার—১
সুন্তরাজ খান—১
ভানুনারায়ণ ভট্ট—১
উহান দুই পুত্র—
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ভট্ট
সুবুদ্ধি নারায়ণ রাজা—১

৮

কবিতার মর্ম্ম ও আধুনিক মতবাদ— শ্রীহট্ট হইতে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায়, আধুনিক মতবাদগুলি, বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রথমে বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ড গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক সমাজের প্রাচীন ইতিহাস এবং উক্ত সমাজের প্রখ্যাতনামা রাজা সুবিদনারায়ণের বংশ-বিবরণী সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে প্রথমোক্ত দুইখানা গ্রন্থের বিবরণগুলি দুই একটি সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন ব্যতীত যথাযথ ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

যে সকল আধুনিক অমুদ্রিত ও অজ্ঞাত কুলগ্রন্থের সাহায্যে রাজা সুবিদের পরিবার এবং নূতনরূপে সাম্প্রদায়িকগণের পুরাতন ইতিহাস গঠনের চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

(১) ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত পঞ্চখণ্ড লাউতা নিবাসী ৺ হরিশ্চন্দ্র বাহাদুরের প্রযত্নে তদীয় জামাতা ইটা বড়-কাপন নিবাসী ৺ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য বৈদিকসংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-কাণ্ড ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে এই গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান আছেন। মুদ্রিত অংশে অধুনা-লুপ্ত দুইখানা তাম্রশাসনের পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রথম শাসনে ৬৪১ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরারাজ আদি-ধর্ম্মফা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চ মৈথিল বিপ্রকে পঞ্চখণ্ড দান বিবরণ, এবং দ্বিতীয় শাসনে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজ স্বধর্ম্মফা মনুকূলে অবস্থিত চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের অরণ্য, নিধিপতি নামক জনৈক বাৎস্য গোত্রীয় মৈথিল বিপ্রকে দান করার বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

এই সকল বিবরণ সম্পর্কে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক বলেন—

"দানপত্রগুলি বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণবংশীয় এক ব্যক্তি (৺ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিংবদন্তীর সহায়তাতে পারেন, ততটা ইতিহাসরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন * * যজ্ঞ হইয়াছিল ইহা ঠিক; কিন্তু কি জন্য হইয়াছিল, এতকাল পরে স্মরণ না হওয়াতে অপর স্থানের তাদৃশ ঘটনার ছায়াপাত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।" শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

(২) ৺ কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রেতশ্রাদ্ধ বিধি নামক গ্রন্থের শ্রীহট্টে বৈদিকনির্ণয়শীর্ষক অধ্যায়। এই গ্রন্থ ১৩১৭ বাংলার ১লা পৌষ ৺ কাশীধামে মুদ্রিত হয়।

(৩) বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক অমুদ্রিত আধুনিক গ্রন্থ।

নিম্নে জাতীয় ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতে আধুনিক মতবাদের মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। উভয় গ্রন্থের বর্ণনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই, সুতরাং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের নূতন উক্তিগুলি মাত্র উল্লেখ করা হইল; আর উভয় গ্রন্থের যে সকল উক্তি আলোচনা সাপেক্ষ তৎসমুদয় নিম্নেখ করা হইল।

কবিতার মর্ম্ম—ক। ১-৬ পংক্তি।

"বাৎস্য গোত্রীয় কণ্বশাখাধ্যায়ী নিধিপতি নামক কনৌজাগত জনৈক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাঞ্চল শ্রীহট্টে আগমন পূর্ব্বক দক্ষিণ শ্রীহট্টের ইটা পরগণায় এওলাতলি ভূমিউড়া গ্রামে নূতন কল্পে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

আধুনিক মতবাদ—

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—

৬৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ আদিধর্ম্মফা ভানুগাছ পরগণার অন্তর্গত মঙ্গলপুর গ্রামে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রীয় পঞ্চ মৈথিল বিপ্রের সাহায্যে শাকুনিক ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহারা ব্রহ্মত্র দান স্বরূপ প্রাপ্ত যে ভূখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন উহা পঞ্চখণ্ড নামে অভিহিত হয়। স্ত্রীপুত্রাদি আনয়নের জন্য ১ বৎসর পরে তাঁহারা স্বদেশে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার জন্য তাঁহারা কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় ৫টি ব্রাহ্মণ পরিবার পঞ্চখণ্ডে আনয়ন করেন। মুদ্রিত কাত্যায়ন-বংশবিবরণীর মধ্যে ৬৪৩ খৃঃ অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সনে কাত্যায়ন বংশের আগমন ঘটে। এইরূপে ৬৪১-৬৪৩ খৃঃ অব্দ মধ্যে মৈথিল বৈদিক ১০ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ শ্রীহট্টে সংস্থাপিত হয়। শ্রীহট্টে এই সমাজের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচার ও প্রাচীন প্রথানুসারে সম্পন্ন হয়। নিধিপতি প্রথমোক্ত পঞ্চ গোত্রীয়গণের অন্যতম বাৎস্য আনন্দের বংশধর।—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় অংশ, ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা।

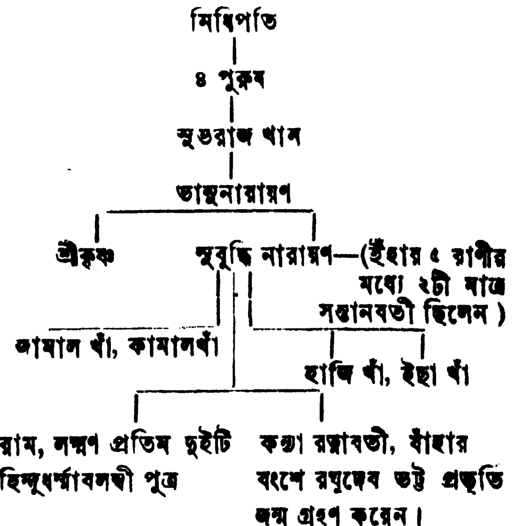
(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

"নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি বিষয়ে কোনও রূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে বৎসাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ মিথিলা হইতে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় স্বসমাজস্থ ৫টি ব্রাহ্মণ সহ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।

খ। ৭—৩১ পংক্তি—

কণৌজ নিবাসী নিধিপতি, শ্রীহট্টের নিধিপতি-বাৎস্যগণের আদিপুরুষ। তাঁহার পুত্র ভূধর। ভূধরের বংশ বহুবিস্তৃত। ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রভাকরের পুত্র কেশব, পৌত্র কামদেব এবং প্রপৌত্র সুভরাজ সকলেই "শিকদার" পদবী লাভ করেন। সুভরাজ "সাতলক্ষ শ্রীহট্টের বড় শিকদার" মধ্যে বিশেষ পরাক্রান্ত হন। তিনি পাঠান রাজত্বের সম্মানিত "খান" উপাধি লাভ করেন এবং কবির কথায়—"যাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড় বিদ্যমান।" নিম্নে কবির বর্ণনা হইতে সুভরাজের বংশ পত্রিকা উদ্ধার করা হইল—



প্রচলিত মতবাদ—

(১) জাতীয় ইতিহাস—নিধিপতি হইতে সুভরাজ সপ্তম পুরুষের ব্যক্তি।

সুভরাজ দিল্লীশ্বর হইতে "খান" উপাধি প্রাপ্ত হন। সুভরাজের পুত্র ভানুনারায়ণ। ভানুনারায়ণের জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুবিদনারায়ণ। হুমায়ুন ও সের সাহের বিরোধ কালে সুবিদ রাজত্ব করেন। ভানুনারায়ণ হইতে ভানুগাছ পরগণার নাম প্রচলিত হয়।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

জাতিভ্রষ্ট রাজপুত্রগণের মুসলমান নাম জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ। ইঁহারা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব কর্ত্তৃক ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন। সুবিদের পলায়িত পুত্রত্রয় ভানুনারায়ণ, ব্রহ্মনারায়ণ এবং ধর্ম্মনারায়ণও স্বধর্ম্মে থাকিয়া শেষে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে ভানুগাছ, বরমচাল এবং ছয়চিড়িতে বসবাস করেন।—২২৩ পৃষ্ঠা।

(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

নিধিপতি ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করিয়া ভূমিউড়া-এওলাতলী গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। সুভরাজ নিধিপতি হইতে ৯ম পুরুষের ব্যক্তি। সুভরাজ খাঁর পুত্র ভানুনারায়ণ ত্রিপুরা-রাজের বিদ্রোহী সামন্ত চন্দ্রসিংহকে পরাজিত করায় ত্রিপুরা হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

গ। ৩২-৩৫ পংক্তি—

এই মহৎ বংশে বহু সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। রাজকন্যা রত্নাবতীর বংশে রঘুদেব ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১। জাতীয় ইতিহাস—

সুবিদনারায়ণ সমাজপতি ছিলেন (১৮৬পৃঃ)। তাঁহার সহিত ভূমিসংক্রান্ত বিরোধের ফলে বৎস, কৃষ্ণাত্রেয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিপ্রগণ ইটা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। তন্মধ্যে কেহ কেহ রাজার মৃত্যুর পরে ইটা অঞ্চলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন (২২পৃঃ) রাজা সুবিদ "ধর্ম্মপাল বংশীয়" জনৈক মহীপাল হইতে মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র এবং রত্নাবতী প্রভৃতি তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে (.৮৭ পৃঃ)। প্রতিগ্রাহী আনন্দের সন্তান ছিলেন বলিয়া রাজা সুবিদ খঞ্জ রত্নাবতীর বিবাহে কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জামাতা কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি ব্রহ্মত্রস্বরূপ ভূমিউড়া গ্রাম প্রাপ্ত হন, কিন্তু রাজার কৌশল ব্যর্থ হইল। জামাতার ভ্রাতা ১৭শ বর্ষীয় রঘুনাথ এই বিবাহে কুল-গৌরব ধ্বংস হওয়ায় দেশ-ত্যাগী হইয়া নবদ্বীপ গমন করেন।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

রাজা সুবিদের সহিত সামাজিক বিরোধে পরাভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ইটা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রঘুপতি যৌতুক স্বরূপ পাচগাউ, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, সুরানন্দ এবং পশ্চিমভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঘ। ৩৭-৩৯ পংক্তি—

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের ভয়ে শত্রুগণ স্থির থাকিতে সমর্থ হইত না। তিনি বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত লোহানী পাঠান ভ্রাতা খাজা উচমানকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

১। জাতীয় ইতিহাস—

খাজা উচমান মুরশিদাবাদের নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তিনি নবাব-তনয়ের নিমিত্ত রাজকন্যা ভানু-মতীকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্য আক্রমণ করেন।

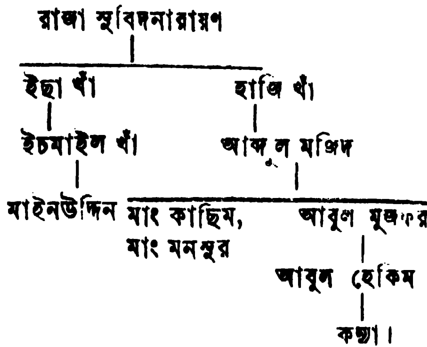
সের সাহ ও হুমায়ুনের বিরোধকালে রাজা সুবিদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

১৫৪৮ খৃঃ অব্দে সের শাহ কর্ত্তৃক লোদী খাঁর হস্তে খোয়াজ ওসমান নিহত হন। রাজা সুবিদের পুত্রগণ দিল্লী গমন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ঙ। ৪০-৪৭ পংক্তি—

কবির বর্ণনা হইতে ইছা খাঁ ও হাজি খাঁর সংক্ষিপ্ত বংশ পত্রিকা প্রদত্ত হইল—



১। জাতীয় ইতিহাস—

সুবিদের রাজ্য-ভ্রষ্ট ইসলামধর্ম্মাচারি পুত্র চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন। সুবিদের পলায়িত পুত্রত্রয়ও স্বধর্ম্মে থাকিয়া শেষে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। (৩য় অংশ, ২২৩ পৃষ্ঠা)।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

ইচমাইল ইছা খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। আব্দুল মজিদ হাজি খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ উভয়ের পরেই ৩ পুরুষ অজ্ঞাত।

চ। ৪৪-৪৯ পংক্তি—

উপসংহার

কহে মুজফর শুন সর্ব্বজন
নিধিপতির্ সন্তানের হইবে বিড়ম্বন

পার্শ্বে তফছিল ও সাক্ষর

১। জাতীয় ইতিহাস—নীরব।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—

মুজফর চৌধুরীর জীবনকালে তাঁহার ভূসম্পত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তিনি ও তাঁহার জ্ঞাতি আবুল ফজল চৌধুরী ত্রিপুরা নুরনগরের কেন্দাই গ্রামের পূর্ব্ব অধিবাসী রাজারাম নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে দূত নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন।

কবিতার প্রামাণিকতা—ইটার দুরদৃষ্ট রাজপরিবারের ভাগ্য বিপর্য্যয়-কাহিনী শ্রীহট্টে সুপরিচিত। মুজফর এই পরিবারেই প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তদ্‌রচিত বংশবিবরণীমূলক গীতি দক্ষিণ শ্রীহট্টে লোকমুখে অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে। কবিতায় প্রদত্ত বিবরণ কৃত্রিমতাপূর্ণ হইলে কবিতাটী কালের কঠোর আক্রমণ হইতে এইরূপে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহের বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য কবিতার অনুলিপি মুজফরের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুন্নত পরিবারে বংশবিবরণী রক্ষিত হয় না। এইরূপ স্থলে বংশবিবরণী বলিতে কয়েকটী অসংলগ্ন জনশ্রুতি এবং দুই চারিটী ব্যক্তির নাম ব্যতীত বিশেষ কিছু উদ্ধার করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু মুজফর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উহা একটী পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী বংশ। সাধারণ বিশিষ্ট পরিবার হইতেও এই বংশের একটু বিশেষত্ব আছে। ইঁহারা দক্ষিণ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতি, সমাজপতি রাজা সুবিদনারায়ণের সন্তান। সমাজে অদ্যাপি ইঁহারা হিন্দুমুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা সমভাবে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ পরিবারে বংশ-পত্রিকা সযত্নে রক্ষিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক, সুতরাং নিজ বংশীয়গণের নাম ও বিবরণী সংগ্রহ কালে মুজফরের পক্ষে তাঁহার পারিবারিক লিখিত-বিবরণী প্রভৃতির সাহায্য লাভ করা দুরূহ ছিল না; বিশেষতঃ মুজফর নিজ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পুরুষ সম্বন্ধে যতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, ভিন্ন সমাজভুক্ত আধুনিক কালের বংশাবলী প্রণেতৃগণের পক্ষে ততদূর অভিজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং মুজফর প্রদত্ত নামের পৌর্ব্বাপর্য্য ইটা দেওয়ান বংশীয়গণের জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র, সনন্দ, কাবিননামা প্রভৃতি হইতে সমর্থিত হইবে।

তৃতীয়তঃ মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর নামগুলি পর পর

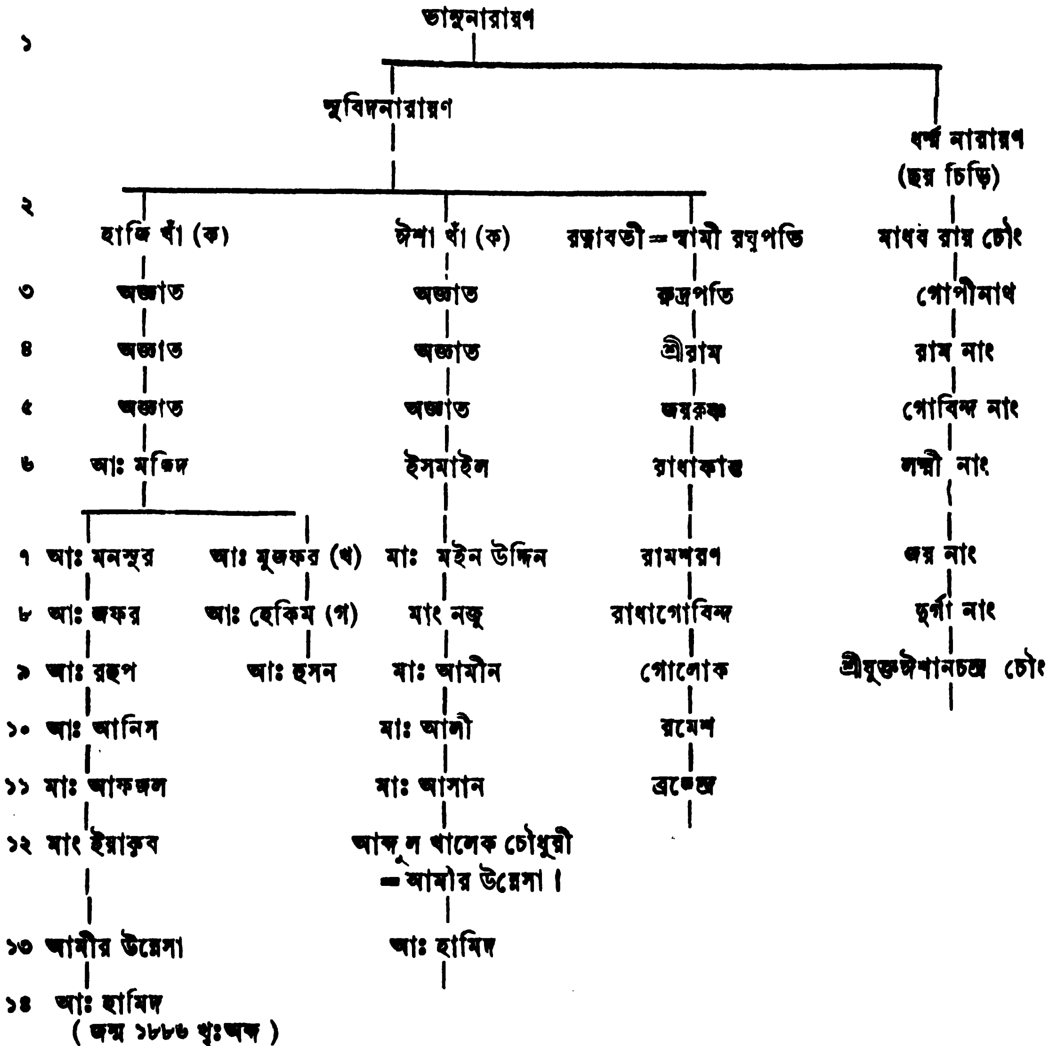
যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রপৌত্র মাহাম্মদ আফজল চৌধুরী (ওরফে গাবরু মিঞা) রচিত পারস্য ভাষায় লিখিত বংশ বিবরণী গ্রন্থও তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মাহাম্মদ আফজল চৌধুরী ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মাহাম্মদ আফজল চৌধুরী যে নিজ বংশবিবরণী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত। ইটার দেওয়ান সাহেবগণের নিকট রক্ষিত উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনেই ইতঃপূর্ব্বে "প্রতিভা" [মাঘ ১৩২০] পত্রিকায় রাজা সুবিদনারায়ণের একখণ্ড সংক্ষিপ্ত বংশ-পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রকাশিত বংশপত্রিকা হইতে অন্যূন ২০ বৎসর পূর্ব্বের এই শেষোক্ত বংশপত্রিকাও মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর সমর্থন করিতেছে।

চতুর্থতঃ কোন ও সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পরিবারে বংশ-বিবরণী সম্বন্ধে উক্ত পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য, ভিন্ন স্থান বা সমাজভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের সংগৃহীত কাহিনী হইতে অধিকতর মূল্যবান। এমত অবস্থায় রাজবংশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে। অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত অবস্থায় আমরা রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত আব্দুল খালেক চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আব্দুলকরিম চৌধুরী দেওয়ান সাহেবগণের সহিত কবিতায় বর্ণিত এবং অপরাপর তথ্যের যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় যে কয়েকখানা রাজবংশাবলী প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিবার পক্ষে উক্ত দেওয়ান গৃহে রক্ষিত লিখিত প্রমাণাবলী এবং তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে; যাহা হউক আমরা অন্তবিধ প্রমাণও উল্লেখ করিতেছি।

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, জাতীয় ইতিহাস 'এবং' শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, গ্রন্থে প্রদত্ত আধুনিক বংশপত্রিকাগুলি যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রণীত হইয়াছে * এইরূপ সংস্কার একটু অনুধাবন পূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে পাঠকের মনে স্বতঃই বদ্ধমূল হইবে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রাজপুত্র হাজি খাঁ এবং ঈশা খাঁ উভয়ের পরেই "৩ পুরুষ অজ্ঞাত" রূপে দেখান হইয়াছে; অতঃপর হাজিখাঁর বংশে মজিদ ও তৎপুত্র মুজফরের নাম এবং ঈশাখাঁর বংশে ইচমাইল ও তৎপুত্র মইনউদ্দিন প্রভৃতির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মুজফর নিজকে মজিদের পুত্র এবং হাজিখাঁর পৌত্ররূপে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রদত্ত বিবরণ প্রকৃত হইলে বলিতে হইবে যে, আবুল ফজল এবং মুজফরের বর্ত্তমান বংশধরগণ, মুজফরের পিতামহের নাম জানিতে পারেন নাই, এমন কি মুজফরও নিজ পিতামহের প্রকৃত নাম অবগত ছিলেন না; অথবা তিনি এ সম্বন্ধে অপ্রকৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, এবং ইটাবাসী জনসাধারণও ৫।৬ পুরুষ যাবৎ মুজফরের অপ্রকৃত বিবরণই সত্য বলিয়া লোক মুখে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আধুনিক বংশ পত্রিকা প্রচারকগণের নিকট হইতে যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের সাহায্যেই তাহাদের প্রচারিত বংশ-পত্রিকার কৃত্রিমতা এবং মুজফর প্রদত্ত বিবরণের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হয়। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজপুত্র হাজি খাঁর বংশধর মুজফর এবং তৎপুত্র হেকিমের অধীন রাজারাম নামক জনৈক কর্ম্মচারী, রাজকন্যা রত্নাবতীর বংশধর জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের নিকট হইতে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবিধ দলিলপত্র হইতেও প্রমাণিত হয় যে,

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা আধুনিক রাজবংশাবলী প্রচারকগণের অন্যতমরূপে বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরীর নাম ও উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজার নাম, আব্দুল হেকিম চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী নগিনা বিবির অধীনে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; সুতরাং রাজারাম জয়কৃষ্ণ এবং আব্দুল হেকিম উভয়েরই সমসাময়িক। নিম্নে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বংশ-পত্রিকা হইতে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক প্রদর্শিত হইবে—



উপরি-উক্ত বংশ-পত্রিকা মধ্যে রাজপুত্র হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁর দুইটী শাখার বংশপত্রিকা, শ্রীহট্টের রাজকন্যা রত্নাবতীর বংশপত্রিকা, জাতীয় ইতিহাস, ৩য়ভাগ, ১৯৩পৃষ্ঠা হইতে এবং ধর্ম্মনারায়ণের বংশপত্রিকা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল আধুনিক বংশপত্রিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, একই পরিবারের দুইটি হিন্দুশাখায় ৯ হইতে ১১ পুরুষ মাত্র এবং মুসলমান দুইটি শাখায় ১৩ হইতে ১৪ পুরুষ

চলিতেছে! এতন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ এবং আব্দুল হেকিম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, জয়কৃষ্ণ রাজা সুবিদ হইতে পঞ্চম পুরুষের ব্যক্তি, পক্ষান্তরে হেকিম ৮ম পুরুষের ব্যক্তি; অর্থাৎ একই বংশীয় সমসাময়িক হেকিম ও জয়কৃষ্ণের মধ্যে, ৩ তিন পুরুষ ব্যবধান! অতিরিক্ত "অজ্ঞাত" তিন পুরুষ সংযোগ করা হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ এক বংশীয় সমসাময়িক দুই ব্যক্তির মধ্যে এক অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এমতাবস্থায় মুজফর নিজকে যে সুবিদ হইতে ৪র্থ পুরুষের ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন উহাই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইবে। দুইটি মুসলমান রাজপুত্রের পরে তদ্‌বংশীয়গণের অজ্ঞাতসারে কৃত্রিম উপায়ে রাজার সময় দীর্ঘ এবং রাজজামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে শিরোমণি রঘুনাথের অবতারণা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দু শাখাদ্বয়েও তদ্রূপ ৩ পুরুষ যোজনা না করাতে এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থ এবং মুজফর প্রদত্ত বিবরণীর প্রামাণিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমরা অতঃপর কবিতায় বর্ণিত ঘটনাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

(ক) ১৬২৮ খৃঃ অব্দে হাজি খাঁ এবং ঈশা খাঁ 'চৌধুরী' পদ লাভ করেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে আব্দুল হেকিম চৌধুরী। পদ লাভ করেন।

তুমি

[প্রকাশিতব্য গীতিকাব্য 'মর্ম্ম' হইতে]

তুমি,
ছাড়িয়া গিয়াছ মোরে?
আমার হৃদয়-সাধনা-কুঞ্জে
ফুল্ল নিখিল-কুসুম-পুঞ্জে
নয়নে আঁকিয়া তোমার মূরতি
আকুল নয়নলোরে

জনম জনম জনমান্তর
বসি একাসনে সারা অন্তর
স'পিয়া তোমারে, টেনেছি তোমারে
বাঁধিয়া প্রাণের ডোরে।

তুমি, ছাড়িয়া গিয়াছে মোরে?
এসেছিলে তুমি হেন মনে লয়,
দিয়াছিলে বর, শান্তি, অভয়,
কুসুম-নূপুর-ঝড়া ফুল-কুল
এখনো পড়িয়া দোরে;

সুখ দিবালোক নিভা'য়ে আমার
গিয়াছ কোথায়, আসিবে না আর?
পাগল করিয়া দিবে না আবার
এ দুখ-রজনী ভোরে?

তুমি, ছাড়িয়া গিয়াছ মোরে?

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী

২৬২। হইল পোলা দিলাম মাটী,
কিসের ডাইলের কান্দাকাটী।

২৬৩। পঞ্চাশ হাত কাপড়েও মাইয়ার কাঙ্গে কাছা।

২৬৪। ভিক্ষার চাউল
কাড়া আর আকাড়া।

২৬৫। উপুকাইয়া কাকড়া।

২৬৬। যার পেটে ছাও হয়,
তারে আবার ছোট কয়।

২৬৭। লেখা পড়া ছালি ভুরা
কপালের নাম গোড়া,
চণ্ডীচরণ ঘৈটা টোকায়
রামায় দৌরায় ঘোড়া। *
চালিভুরা—ছাই ভষ্ম।
ঘৈটা—ঘুঁটে।

২৬৮। উনাভাতে দুনা বল,
অতি ভাতে রসাতল।
দুনা—দ্বিগুণ।

২৬৯। স্তিরিময়ে শিরী চড়ে
নয় নাগের ঘরে খোকার পড়ে।
স্তিরি—স্ত্রী। শিরী—শ্রী।
চড়ে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

* চণ্ডীচরণ ও রামচরণ দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়া কবিরাজী করিত, আর কনিষ্ঠ রামচরণ ছিল নিরক্ষর,—দাদার গলগ্রহ। পূর্ব্বে মাঠে কবিরাজ মহাশয়েরা ঘুটে সংগ্রহ করিয়া ঔষধাদি জাল দিতেন তাই চণ্ডীচরণ মাঠে গিয়াছে,—মূর্খ রামচরণ বাড়ী বসিয়া। এদিকে রাজবাড়ীতে রাণীর অসুখ; চণ্ডীচরণের নিমিত্ত পাইক আসিয়া হাজির। রামচরণ ভাবিল, দাদা ত বাড়ী নাই, আচ্ছা, আমিই যাই না কেন? সুযোগে একবার রাজবাড়ীটা দেখিয়া আসিতে পারিব। সাহসে ভর করিয়া সাজিয়া গুজিয়া রামচরণ দাদার ঔষধের পুঁটলি হইতে নানাপ্রকার গোটা কয়েক বড়ী সঙ্গে লইল। রামচরণ রাণীর মহলে উপস্থিত হইয়া ভানপূর্ব্বক দাদার ন্যায় শিরাতে হাত দিয়া কিছুক্ষণ চোক বুজিয়া ভাবিল, 'এক্ষণ কি করি?' তারপর বলিল 'রোগ বড়ই শক্ত, কিন্তু এই আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি ইহাতেই রোগ সারিবে'। এই বলিয়া সব কয়টা বড়ী হইতেই কিছু কিছু করিয়া লইয়া একত্র করিয়া খাওয়াইয়া দিয়া বাটী চলিয়া আসিল। সারাদিন রাত্রি রামচরণ ভয়ে ভয়ে কাটাইল। পরদিন চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়াইতে গিয়াছে, এমন সময় রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া রামচরণকে খোঁজ করিল দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে রাণী ভাল হইয়াছেন, রাজা তাহাকে পুরস্কার দিবেন, তখন তার আনন্দ দেখে কে? রাজবাটীতে উপনীত হইলে পর রাজা তাহাকে প্রশংসা পূর্ব্বক পুরস্কার দিতে চাহিয়া বলিলেন 'তুমি ইচ্ছামত পুরস্কার চাহিতে পার।' তখন রামচরণ বলিল "ঐ যে আস্তাবলে বড় কাল ঘোড়াটা আছে উহা আমাকে দিন।" আসিবার সময় ঐ কাল ঘোড়াটা বড় তার মনে লাগিয়াছিল। রাজা তাহাই করিলেন। রামচরণ বড়ই খুসী, তার ইচ্ছা ঘোড়া ছুটাইয়া একবার দাদার কাছে যায়, কিন্তু সে যে কখনও ঘোড়ায় উঠে নাই! চাকরকে বলিয়া তাহার সাহায্যে ঘোড়ায় চড়িলে। সে তখন বলিল "আমাকে বাঁধিয়া দেও, দেখিও যেন পড়িয়া না যাই।" চাকর তাহাই করিয়া দিলে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করাতেই ঘোড়া ছুটিয়া চলিল—রামচরণ কোনওরূপে ঘোড়ার পিঠে রহিল। মাঠে পৌছিতেই দুর হইতে চণ্ডীচরণ ইহা দেখিতে পাইয়া ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ। এ যে দেখিতেছি রাজার ঘোড়া! দেখ, বোকার কাণ্ড—রাজা জানিলে আর রক্ষা নাই।" তাই দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল "আরে, রামা একি?" তখন আহ্লাদে আটখানা রামচরণ ঐ কথা বলিয়াছিল।

২৭০। সুন্দর মুখের জয়,
চিরকালই হয়।

২৭১। বনের বাঘে খায় না,
মনের বাঘে খায়।

২৭২। কয়জন বড় না,
সয়জন বড়।

২৭৩। কি করলাম রে ভাই,
রামায়ণ গাইয়া;
বার আনা কামাইলাম
তিন টাকা খাইয়া।
কামাইলাম—উপার্জ্জন করিলাম।

২৭৪। জুয়ানে জুয়ানে কথা প্রতি কথায় হাস,
বুড়ায় বুড়ায় কথা প্রতি কথায় কাশ।

২৭৫। অকালে বাড়ে সকালে মরতে।

২৭৬। অদৃষ্টে আছে বিয়া
কান্দলে হইব কি?

২৭৭। হীরার ভিতর ক্ষীরের ছুরি।

২৭৮। পেটের ভিতর বিষের হাড়ি,
কথা কয়, হাসে।
কথা দিয়া কথা নেয়,
পরাণে মারে শেষে॥

২৭৯। দুষ্ট মাইনষের মিষ্টি কথা,
ঘনাইয়া বসে কাছে।
কথা দিয়া কথা নিয়া
পরাণে বধে শেষে॥

২৮০। মাথাও নাই,
ব্যথাও নাই।

২৮১। কাইন্দা মোকর্দ্দমা জিত।
কাইন্দা—কাঁদিয়া।

২৮২। ভাগের মায় গঙ্গা পায় না।

২৮৩। শেষ ঘরে হয় পুত,
সংসারে লাগে ভুত।
শেষ ঘরে হয় মাইয়া,
ঘি পড়ে ছিকা বাইয়া বাইয়া॥
ছিকা—শিকা।

২৮৪। যদ্দিন থাকে হেইযে মুত,
তদ্দিন কেবল মা'র পুত।
হেইযে—শয্যায়।
মুত—মুত্রত্যাগ।

২৮৫। ভাসুরে যে পুরুষ
ঠমকেই বুঝা যায়।

২৮৬। টাকা দিয়া কিন্যা আনলাম
জুইড়া রইল ঘর।
আমার পুত্র আমার ক্ষেত্রে
আমিই হইলাম পর॥
কিন্যা—কিনিয়া।
জুইড়া—জুড়িয়া।

২৮৭। ঝি মাইরা বউর শিক্ষা,
বউ মারলে নাই রক্ষা।
মাইরা—মারিয়া।

২৮৮। কিবা মাইয়ার মাইয়া,
রূপে পড়ে বাইয়া।

২৮৯। সাপের ভেচ্কী বাস্তায় চিনে।
বাস্তায়—বেদিয়ায়।

২৯০। যার হয় যক্ষা,
তার নাই রক্ষা।

২৯১। কামের নামে যোগ্যতা নাই,
* ভরা রাগ।
যোগ্যতা—ক্ষমতা।

২৯২। সন্দে বাইয়ে যারে ধরে,
তিলে তিলে জ্বালাইয়া মারে।
সন্দে—সন্দেহ।
বাইয়ে—বায়ুরোগে।

২৯৩। জাতের স্বভাব মৃগী বাই,

এ রোগে আর অষুদ নাই।

বাই—বায়ু।

২৯৪। ধারায় নাড়া টানে,
গোদে সাত পুরুষ টানে।

২৯৫। গায়েন, গাও কি ?
ঠেক্‌ছি আর করি কি ?

২৯৬। নামে ডাকে গুরু মশায়,
শির লেঙ্গুর জ্ঞান নাই।

লেঙ্গুর—লেজ।

২৯৭। মানুষ যদি নদীতে পড়ে,
খ্যাড় কুটা আইক্‌ড়া ধরে।

খ্যাড়—খড়।

২৯৮। খায় না, ছোয় না, করে পুজি পাটা।
তার কপালে মারি ঝাটা।

ঝাটা—ঝাঁটা।

২৯৯। দেশের ফকির সেকের মত।

৩০০। বাড়ীর গরু—কোলার ঘাস খায় না।

কোলা—মাঠ।

৩০১। যার হয় না নয় এ,
তার হয় না নব্বই এ।

৩০২। চুন খাইয়া মুখ তাৎলে, দই দেখতে ডর করে।

৩০৩। সাপ স্বপন পনা,
যে না কয় সে এক জনা।

পনা—মৎস্যশাবক।

৩০৪। জাম্বুবাম্বা পুতি
কামের নামে দেখা নাই
বুক্তির গুতাগুতি।

পুতি—খুল্লতাত (সাদর বচনে)।

৩০৫। তেলা মাথায় তেল দিতে
সকলেই চায়।
রুক্ষ মাথা দেখলে পরে
পলাইয়া যায়॥

৩০৬। জন্ম কাটাইলাম হোগলাকান্দি, পথ চিন্‌লাম না।

৩০৭। কানের লগে খোজ নাই, চিলের পাছে দৌড়।

৩০৮। মাইয়া বাচলে জামাইর আদর।

৩০৯। ছেঁচে ইন্দুর ভাঙ্গে মাথা,
তয় না ছাড়ে বড়াই কথা।

তয়—তবুও।

৩১০। এক কাঠি বাজে না।

৩১১। বেহায়াক্ষণে জন্ম নিয়া
লাজ খাইছে ভাতে দিয়া।

৩১২। আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়,
যত বাড়ায় ততই হয়।

৩১৩। খাইতে ভাল চাউল ভাজা,
দেখতে ভাল মুরি,
রসিক ভাল এক ছেলের মা,
দেখতে ভাল ছুরি।

মুরি—মুড়ি। ছুরি—ছুঁড়ী।

৩১৪। খায় দায় করে বড়াই,
সে কুটুমে কাজ নাই।

৩১৫। এক কড়ার মুরাদ নাই,
ভাত মারায় গোসাই।

মুরাদ—সম্পত্তি।

১১৬। পরেরটা পাইয়া, উকাল করে খাইয়া।

উকাল—বমন।

৩১৭। প্যাদার আবার শশুর বাড়ী।

৩১৮। ভাগেরটা খাই বা না খাই,
খুতাইয়া ফেলাই।

৩১৯। মধ্যে থাকতে গাজী, পারে গেলে মাঝী।

৩২০। কথার যত হাটিবাটী।

* * পরিপাটী

৩২১। কলিকাল্যা পোলাপান,
বাপেরে কয় তামুক আন।

পোলাপান—ছেলেপেলে।

৩২২। লাভ নাই বানিজ্যে কেচকেচি সার

৩২৩। যেমনি দেবা, তেমনী দেবী।

৩২৪। কাচা তেতুলের অম্বল,
শীতকালের কম্বল।

৩২৫। কাচা তেতুল যেমন তেমন,
পুরান তেতুল বিকারে।

৩২৬। মাউগ নাই বেটা শ্বশুরবাড়ী যায়।

৩২৭। বিয়ার লগে দেখা নাই,
ছেইলার খারু গড়ায়।
খারু—পার মল।

৩২৮। চোরের মন ক্ষিরাই ক্ষেতে।

৩২৯। দিয়া ধন বোঝে মন,
কাইড়া নিতে কতক্ষণ।

৩৩০। গুণের আর সীমা নাই,
ওরে আমার ভাইগ্না কানাই।

৩৩১। আকালে কি না খায়,
পাগলে কি না গায়।

৩৩২। চোরা থুইয়া নিচোরা বান্ধে,
চোরা নাচে সভার মাঝে।

৩৩৩। আপনে বাচলে বাপের নাম।

৩৩৪। পাগলামীতে গোমর নাই,
চলার বাড়ি সার।

৩৩৫। আগে গেলেও নির্ব্বংশ্যা।
পাছে গেলেও নির্ব্বংশ্যা।

৩৩৬। ভ্রমিয়া বার, ঘরে বইয়া তের,
যদি কর্‌তে পার।
বইয়া—বসিয়া।

৩৩৭। ঘরজামাইয়ের অনেক দোষ,
সদাই মনে তার আপশোষ।
গুষ্ঠীর নামের লেশ নাই,
লোকে বলে ফলনীর জামাই।

৩৩৮। পাগলের গোবধে আনন্দ।

৩৩৯। কই বা রাজা ভোজ,
আর কই গঙ্গারাম তেলী।

৩৪০। বিশ্বামিত্রও ঋষি,
আর পদির মায়ও পিসি।

৩৪১। অযোধ্যার রঘু,
আর সুন্দরবনের ঘুঘু।

৩৪২। হাতী ঘোড়া যায় তল,
মেড়ায় বলে কত জল।

৩৪৩। কইলে মায় মাইর খায়,
না কইলে বাপে উচ্ছিষ্ট খায়।

৩৪৪। কাজের বেলা কাজী,
কাম ফুরাইলে পাজী।

৩৪৫। গোয়ালের দই বাখনায় গোয়ালেই।
বাখনায়—ব্যাখ্যান (প্রশংসা) করে।

৩৪৬। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস।

৩৪৭। ধান ছড়াইলে কাকের আকাল।
আকাল—অভাব।

৩৪৮। সারা ঘরে নাই যত,
কান বেচোরে তত।
কানবেচোর—ক্ষুদ্র বেড়াবিশেষ।

৩৪৯। যারে না দেখছি সে বড় সুন্দরী,
আর যার কথা না শুন্‌ছি
সে বড় কথরী।
কথরী—বক্তা।

৩৫০। বিষ্যার তলীতলী বর্ষা।

৩৫১। চাচা, আপন পরাণ বাচা।

৩৫২। নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

৩৫৩। সন্ন্যাসী ত চোর না, দৈবে ঘটায়।

৩৫৪। সকল পথ লড়ালড়ি,
খেওয়া ঘাটে গড়াগড়ি।

৩৫৫। ইত্তিপিত্তি পুইড়া দিছে লাউ গাছের গোড়ে।

৩৫৬। ভাল ত ভাল, বাড়ী পোড়া ভাল।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২১ | ১১শ সংখ্যা

উদাত্ত স্বর, টোন্ বা Accent.

ইংরেজী শব্দ শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentগুলিও শুদ্ধরূপে শিখিতে হয়, প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ অভ্যাস করিতেও তদীয় উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent শিখিতে হইত। উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent এর দূর প্রভাব ছিল বলিয়াই, প্রাচীনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ পাণিনিতে স্বর সংক্রান্ত ৩২৮টী সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ প্রমুখ মনীষিগণ সংস্কৃতভাষার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentএর অস্তিত্বকে, উহা যে কদাপি কথিত ভাষা ছিল তাহার অন্যতম প্রকৃষ্টপ্রমাণ স্বরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য উদাত্ত গুণগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতপূর্ব্ব প্রভাবশালী উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent বঙ্গভাষা-ভাষী জনতা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথিত ভাষার উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent এর প্রতি লক্ষ্য রাখা দূরের কথা, প্রচলিত কলাপ মুগ্ধবোধ প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বরপ্রকরণঘটিত কোনও কথাই পরিলক্ষিত হয় না। স্বরের অনুশীলন হইতে এত দূরে আমরা সরিয়া পড়িয়াছি যে, স্বর প্রকরণ বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা আধুনিক কোন সংস্কৃত ব্যাকরণেও স্থান পাইবে না। দিলীপের রাজ্যে "শ্রুতৌ তস্করতা" ছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্যে স্বরবিষয়িণী বিদ্যা পুস্তকস্থা হইয়াও থাকিতে পারিবে না। স্বর-প্রকরণ যেন তস্করতা অপেক্ষাও ঘোরতর পাপ। গতানুগতিক ন্যায়ে টীকাকার বঙ্গ-কুলতিলক পুরুষোত্তমদেবও স্বকীয় ভাষাবৃত্তি হইতে পাণিনি স্বরসূত্রগুলিকে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশ অপেক্ষা বোম্বাই বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চ্চার গাঢ়তা ও বিশালতা অধিকতর, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বঙ্গদেশের এই অপ-বাদের কারণ কি, তাহা অন্বেষ্টব্য বটে। একটা কথা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তৎতদ্ অঞ্চলে মূল পাণিনি ব্যাকরণেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইয়া থাকে, এবং সংস্কৃতশব্দের প্রকৃত উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accent যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেক বঙ্গীয় লেখক ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ, জ য, ণ ন র ব শ ষ স ইহাদের মধ্যগত হ্রস্ব দীর্ঘ, বর্গীয় অন্তঃস্থ, মূর্দ্ধন্য দন্ত্য, বর্গীয় অন্তঃস্থ, তালব্য মূর্দ্ধন্য দন্ত্যকে অভিন্ন ভাবে উচ্চারিত ও লিখিত দেখিতে ইচ্ছুক। বঙ্গভাষায় দু'টী , দু'টী উ, দু'টী ঋ, দু'টী জ, দু'টী ন, দু'টী ব, [illegible] শ না থাকিয়া একটী ইকার (?) একটী উকার (?) একটী ঋকার (?) একটী জকার (?) একটী ন কার (?) একটী বকার (?) ও একটী শকার (?) থাকুক, ইহাও অনেকের আকাঙ্ক্ষিত

বটে। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশে উদাত্ত স্বর টোন্ বা Accentএর অধ্যায়ন-অধ্যাপনার চেষ্টা করিয়া আগন্তুক একটা বৈষম্যের আনয়ন করা যে অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণসমূহে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই কয়েকটী অক্ষর স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বরবর্ণের এই গণপাঠ বা তালিকাতে স্বরবর্ণগুলির হ্রস্বদীর্ঘভেদ মাত্র দেখান হইয়াছে। প্লুতভেদ দেখান হয় নাই। সুতরাং এই গণপাঠ সুসঙ্গত নহে। স্বরবর্ণের গণপাঠে, হয় হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুত * এই ভেদত্রয় দেখান উচিত, নতুবা মাহেশ্বসূত্রের মত অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ এইরূপ উল্লেখ করা উচিত।

আ ঈ ঊ ৠ এ ও ঐ ঔ ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ অপেক্ষা দ্বিগুণ সময় লাগে বলিয়া ইহারা দীর্ঘ নামে পরিচিত। এরূপ, আ৩ ঈ৩ ঊ৩ ইত্যাদির প্রত্যেকের উচ্চারণে হ্রস্ব অপেক্ষা ত্রিগুণ সময়ের আবশ্যকতা হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্লুত স্বর কহে। প্রত্যেকটী ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে যে সময়টুকুর প্রয়োজন হয় সে সময়কে অর্দ্ধমাত্রা কহে। অর্থাৎ, মনে করুন, হ্রস্ব অ ই উ ঋ ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে এক এক সেকেণ্ড সময় লাগে। তাহা হইলে, আ ঈ ঊ ৠ এ ও ঐ ঔ কারের উচ্চারণে দুই দুই সেকেণ্ড লাগিবে, এবং আ৩ ঈ৩ ঊ৩ ৠ৩ এ৩ ও৩ ঐ৩ ঔ৩ † ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে তিন তিন সেকেণ্ডের প্রয়োজন হইবে। একই স্বরবর্ণ হ্রস্বদীর্ঘ প্লুত এই তিন রকমে উচ্চারিত হইতে পারে। তাহা উ—ঊ—ঊ৩ ‡ এই কুক্কুটধ্বনিতে স্পষ্ট উচ্চারিত শুনিতে পাওয়া যায় ††।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একই স্বরবর্ণের উচ্চারণে এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ড ও তিন সেকেণ্ড সময় লাগিতে পারে, এবং ঐ সময়ের দীর্ঘতার তারতম্য অনুসারে ঐ স্বরবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভেদ স্বরবর্ণের উচ্চারণ সময়ের বিশালতার (amplitude) উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। উচ্চারণসময়ের বিশালতার তারতম্য অনুসারে নিরূপিত হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতের প্রত্যেকের উচ্চারণগাম্ভীর্য্য অনুসারে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তিন তিন প্রকারের ভেদ আছে। অকারের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, ইকারের উচ্চারণ স্থান তালু, ঋকারের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা, এইরূপে এক একটী স্বরবর্ণ বাগ্‌যন্ত্রের এক একটী স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থান উচ্চ অধঃ ও মধ্যভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। স্বরবর্ণের যেরূপ উচ্চারণে উচ্চারণ স্থানের উর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হয় সেই উচ্চারণকে উদাত্ত উচ্চারণ (Full Accent), যেরূপ উচ্চারণে উচ্চারণস্থানের অধোভাগে আক্রান্ত হয় তাহাকে অনুদাত্ত উচ্চারণ (No Accent) এবং যে উচ্চারণে উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ আক্রান্ত হয় তাহাকে স্বরিত উচ্চারণ (Half Accent) কহে।

স্বরিত স্বরের উচ্চারণে উহার আদ্যংশ উদাত্ত ও শেষাংশ অনুদাত্ত বলিয়া স্বরিত স্বরকে অর্দ্ধোদাত্ত বলা যায়। সুতরাং উদাত্ত দ্বিবিধ, পূর্ণোদাত্ত (বা উদাত্ত) এবং অর্দ্ধোদাত্ত। অর্দ্ধোদাত্তই হউক, আর পূর্ণোদাত্তই হউক, একটী শব্দে সাধারণতঃ একটী মাত্র স্বর উদাত্ত থাকে; অর্থাৎ ইংরেজী শব্দের মত সংস্কৃত

* অমাত্রস্বরো হ্রস্বঃ। মাত্রা চ। শুক্ল যজুঃ প্রতিশাখ্য ১।৫৪-৫৫। দ্বি স্তাবান্ দীর্ঘঃ। প্লুতস্ত্রিঃ। ঐ ৫৭-৫৮। ব্যঞ্জনম্ অর্দ্ধমাত্রা ঐ ৫৯।

† কোন দীর্ঘ স্বরের পরে ৩ লিখিয়া উহারই প্লুত স্বর নির্দ্দেশ করা যায়।

‡ কংস-রে-সার্, তোরে-নিতে আসুছে-কৃষ্ণ অবতার্।

†† উকালোজ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ।

শব্দের একটী মাত্র স্বরবর্ণে উদাত্ত বা Accent পড়ে। অন্য স্বরবর্ণ অনুদাত্ত হয় না। সমাসে এই উদাত্ত টোন্ টা সাধারণতঃ অন্ত্যস্বরের উপরে পড়ে কিন্তু বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের উদাত্ত টোন্ ই বজায় থাকে *। এমনও হইতে পারে যে, শব্দটীর মধ্যে কোন অক্ষরে টোন্ ই দেওয়া হইল না, তখন শব্দটীর প্রত্যেকটীর অক্ষরের গাম্ভীর্য্য এক রকমেরই শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া এইরূপ উচ্চারণকে একশ্রুতি উচ্চারণ কহে। কোনও দুরস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে এই উচ্চারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় †।

ইংরেজী ভাষার ন্যায়, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় দ্ব্যক্ষর (Dissyllabic) ত্র্যক্ষর (TriSyllabic) প্রভৃতি কোন কোন শব্দের উদাত্তের (Accentএর) অবস্থান অনুসারে শব্দটীর অর্থের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। যেমন 'ইন্দ্র শত্রু' এই সমাসটীতে দুইটী শব্দ আছে—'ইন্দ্র' এবং 'শত্রু'। বেদে শত্রু শব্দের অর্থ 'শাতয়িতা' 'শময়িতা' বা 'প্রশমনকারী' ছিল; পরে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় উহা 'অরি' অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং বহুব্রীহি ও তত্পুরুষ সমাস নির্ব্বিশেষে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দদ্বারা বৃত্রাসুরকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু, বৈদিক 'শাতয়িতা' অর্থ ধরিলে, বহুব্রীহি ও তৎপুরুষে বিপরীত অর্থের প্রতীতি হয়, এবং উদাত্ত উচ্চারণের বৈষম্য দৃষ্ট হয়। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের বহুব্রীহি সমাসের অর্থ —'ইন্দ্রই' হইয়াছে দমনকারী যাহার এমন বৃত্রাসুর; তৎপুরুষ সমাসে ঐ শব্দেরই অর্থ—'ইন্দ্রের শাতয়িতা বা দমনকারী বৃত্রাসুর। আবার 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটীকে বহুব্রীহি সমাস বলিয়া গণ্য করিলে এই শব্দের উদাত্তস্বর (Accent) আদ্য অক্ষর ইকারে পড়িবে এবং তৎপুরুষ বলিলে উদাত্ত উচ্চারণ অন্ত্যস্বর উকারের হইবে।

* পাণিনিঃ ৬।১।২২৩, ৬।১।১৫৮। ৬।২।১।

† যেমন, আগচ্ছ, ভো মাণবক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'ইন্দ্রশত্রুর্ভব' এই একটী মাত্র বাক্যের উচ্চারণ ভেদে দুইটী বিপরীত অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। বহুব্রীহি অর্থ—'ইন্দ্র তোমাকে বধ করুন এবং তৎপুরুষ পক্ষে অর্থ 'তুমি ইন্দ্রকে বধ কর' (!)।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা কোনও ঋত্বিক্ পুরোহিত 'ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রের উচ্চারণ কালে কালে ইকারের উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া অথচ উকারের উদাত্ত উচ্চারণ করিয়া যজমানের বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছিলেন। তাই স্বর ও বর্ণের যথার্থ উচ্চারণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগবজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

অর্থাৎ কোনও শব্দকে স্বরদুষ্ট বা বর্ণদুষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিলে, মনে করিতে হইবে যে, ঐ শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইল; উহা অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে কেবল অসমর্থ হইল এমন নহে। পরন্তু 'ইন্দ্র শত্রু' শব্দের আদ্য অক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া অন্য অক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণ করিবার অপরাধে যজমানের যেরূপ মহৎ অনিষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ প্রত্যেক অপপ্রযুক্ত স্বরই বাগ্বজ্র হইয়া যজমানের ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

বাঙ্গলা ভাষায় একশ্রুতি 'বাজা' শব্দের অর্থ 'বাদ্যযন্ত্র' এবং অন্তোদাত্ত 'বাজা' * শব্দের অর্থ 'বন্ধ্যা'। কোনও দোকানের কপালে লেখা ছিল, "এই দোকানে বাজা মেরামত হয়", তাহা দেখিয়া কোনও পথিক 'বাজা' শব্দকে অন্তোদাত্ত পাঠ করিয়া বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতমাতৃক বঙ্গভাষাতেও শব্দের উদাত্তের স্থান

* পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

ভেদে অর্থের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। বঙ্গভাষাতেও উদাত্ত টোন্ যে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ নহে, তাহা নিম্নলিখিত শব্দমিথুনসমূহে প্রতীয়মান হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যঙ্কর শব্দমিথুনসমূহের প্রথম শব্দটীর একশ্রুতি ও দ্বিতীয়টীর উচ্চারণ উদাত্ত। *

খাল (hide) খা´ল (canal)

ঘুড়ি (kite) ঘু´ড়ি (I wandar)

খানা (dish) খা´না (why don't you eat ?)

চড়া (island) চড়া´ (চড়ুই পাখী, থাপর মার, বা তীক্ষ্ণ। যথা চড়া কথা, চড়া মেজাজ, চড়া আওয়াজ ইত্যাদি)।

চাই (মৎস্য ধরিবার ফাঁদ বিশেষ) চা´ই (do you want ?)

চিনি (sugar), চিনি´ (I know)

ছাড়া (except, তা'ছাড়া) ছাড়া´ (get rid of)

জান্ (know) জা´ন (life)

জানা (to know) যা´না (why don't you go ?)

তার (wire) তা´র (his)

তারা (star) তারা´ (they)

তোলা (tola) তোলা´ (to life)

দাড়ি (oarsman) দাড়ি´ (beard)

পাণি (hand) পানি´ (water)

পালা (tame) এক পালা´ (one course)

নাম (Name) না´ম্ (get down)

মার (Scum) মা´র (beat)

মুড়ি (the terminus) মুড়ি´ (common Indian Biscuit)

রবে (at the sound) রবে´ (will stay on)

লাগা (to stick) লাগা´ (to be at)

বলা (to say) বলা´ (Name of বলা´ই)

বান (flood) বা´ন্ (tie down)

বামন (dwart) বা´মন (a, Brahmin)

বার (week day) বা´র্ (to turn out, বা´র করা)

বালি (the name of a station) বালি´ (barley)

শরা (a cup) সরা´ (remove)

শব (dead body) স´ব (all)

শালা (house) শালা´ (a term of abuse)

শোনা (heard) শো´না (why don't you lie down)

সর (Seam) স´র (move down)

সবে (just now) সবে´ (all)

নিম্নলিখিত ত্র্যক্ষর শব্দগুলির মধ্যোদাত্ত অবস্থায় এক রূপ অর্থ, একশ্রুতি অবস্থায় অন্য অর্থ—

আম´রা (we) আমরা (a kind of fruit)

পড়ি´য়া (reading, wearing) পড়িয়া (falling)

গড়া´ন (to build) গড়ান (to roll)

কুম´ার (potter) কুমার (a bachelor)

নিম্নলিখিত কথাগুলির আদ্যোদাত্ত অবস্থায় একরূপ অর্থ, এবং একশ্রুতি ও অন্ত্যোদাত্ত অবস্থায় অন্যরূপ অর্থ—

ডা´ইন (right) ডাইন (a false friend)

গা´য় না (does not sing) গায় না´ (not in the body)

আ´য় না (why don't you come) আয়না (looking glass)

মা´য়না (Salary) মায় না´ (not the mother)

উপর্য্যুক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যে, হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণও উদাত্ত হইতে পারে, এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণও উদাত্ত হইতে পারে।

মধ্যোদাত্ত উনা´ন (hearth, to melt) ও জানা´লা (window) শব্দে দীর্ঘ উদাত্ত বটে। কিন্তু, ভিক্ষা গ্রাহ´ক, প্রতিদি´ন, সক´ল, জনর´ব, ও শ্রব´ণ শব্দে হ্রস্ব স্বরই উদাত্ত।

অকারান্ত বাঙ্গলা শব্দের অন্ত্য অকার প্রায়ই উদাত্ত

* মুদ্রণ সৌকর্য্যার্থ উদাত্ত Accentকে (´) দ্বারা দেখান হইবে।

(accented) হয় না। ফলে ঐ অন্ত্য অকারটি আদৌ উচ্চারিত হয় না, শব্দটী হলন্ত শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,

সু´খ, মু´খ, পা´ন, দা´ন, হা´ম, শ্যা´ম, বা´ম, না´ম, পা´ক, ত্যা´গ, রা´গ, দা´য়, জ´প ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে উভয়ত্রই নিম্নলিখিত শব্দগুলি আদ্যোদাত্ত—

বৃ´ষ, জ´ন, জ্ব´র, গ্র´হ, হ´য়, ম´য়, বে´দ, ম´ন্ত্র, যা´ম, ধা´রা, পা´দ, ক´ম্প, গু´প্ত, বু´দ্ধ, দ´ন্ত, ক´ণ্ঠ্য, ও´ষ্ঠ্য, ব´ন্দ্য, শ´স্ত, অ´ল, ব´ঙ্গ, কু´শ, কা´শ, না´ব, তি´ল, কা´ল, বৃ´ক, হ´রিণ, গ্রা´ম, কৃ´ত্তিকা, শ´রীর, হৃ´দয়।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে উভয়ত্রই নিম্নলিখিত শব্দগুলি মধ্যোদাত্ত—

সাগ´র, কন্দু´ক, কক্কু´ট, ললা´ট, কপো´ল, মল´য়, পাদ´প, আত´প, অমু´ত, শৈবা´ল, অজ´র, অম´র, অমৃ´ত, সুর´থ, কুলা´য়।

বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি অন্তোদাত্ত :—

অম্বা´ মাতা´ মঘা´ অনুরাধা´, রাজকুমারী´ অশ্লেষা´ ধনিষ্ঠা´

বহুস্থলে উপর্য্যুক্ত উদাত্ত টোন্ শব্দের এক অক্ষরে না পাড়িয়া বক্তার সুবিধানুসারে বিকল্পে অন্য অক্ষরেও প´ড়িয়া থাকে। যথা,

ই´ক্ষু ইক্ষু´, ক´লা কলা´, উ´মা, উমা´, কা´ষ্ঠা কাষ্ঠা´, উ´দক, উদ´ক, গা´ন্ধারি গান্ধা´রি, উদু´ম্বর উদুম্ব´র, বলী´বর্দ্দ, বলীব´র্দ্দ, ক´ল্যাণ কল্যা´ণ, কো´লাহল কোলা´হল, মু´খ মুখ´।

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

"শিক্ষা" ও তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা

মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের অর্দ্ধাংশ সেরপুরে ও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কলিকাতা নগরীতে অতিবাহিত হয়। তিনি স্বদেশে সেরপুরে থাকিয়া যতদিন স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করিয়াছেন, ততদিন কেবল অধ্যাপনা দ্বারা উপযুক্ত শিষ্যগণের বিদ্যাবুদ্ধির মার্জ্জনা কার্য্যেই সম্পূর্ণ ব্যাপৃত ছিলেন না। ৪০।৫০টী ছাত্রকে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে বিদ্যাদান করিয়াও দিবারাত্র আহারের পর বিশ্রাম অবকাশে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সংসারের বহুবিধ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী গতি অবলম্বন করিয়া আমাদের জন্য অনেক অমূল্য বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরে অবস্থিতি কালে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ সংস্কৃত বিদ্যারত্ন ভাণ্ডারের এক একটি কোহিনুর তুল্য। তাহার সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল গ্রন্থের বিবরণ আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিবার চেষ্টা পাইব। কিন্তু যে সময়ে বাঙ্গলার দুই চারিজন সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা, শুধু আলোচনা নহে বর্ত্তমান যুগের কঠিনতর সমস্যার সুমীমাংসাকল্পে বাঙ্গলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনা অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইবার কথা, আমরা দেখিতে পাই, ঠিক সেই সময়েই ভাষা জননীর সুযোগ্য সন্তান তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকীয় সমাজের মঙ্গলময়ী শিক্ষাবিবয়িণী চিন্তা, বঙ্গভাষার সাহায্যে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আজি যে বঙ্গভাষা-জননীর রত্নমণ্ডিতকিরীটপ্রভায় সমগ্র সভ্য জগৎ আলোকিত ও চমৎকৃত, যাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীপাদপদ্মবন্দনা করিয়া ধন্য হইবার আগ্রহ, বর্ত্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত দেশবাসীর একান্ত প্রাণের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনকার দিনে ঠিক এমনটী ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিত-দিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামগতি ন্যায়রত্ন, ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিতেন। আমরা যাহা শুনিতে পাই তাহাতে মনে হয় পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের বঙ্গভাষার আলোচনার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় চিরকাল স্বাধীনতার পক্ষপাতী, নিজের বিবেক ও শক্তির উপর তাঁহার যথেষ্ট নির্ভর ছিল, সুতরাং তিনি তাঁহার স্বাধীনচিন্তালব্ধ, শিক্ষাবিষয়ক মতামত প্রথমতঃ স্থানীয় সংবাদ-পত্র "চারুবার্ত্তায়" প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই সকল প্রবন্ধ "শিক্ষা" নামক গ্রন্থরূপে ১৮০৪ শকাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা তাঁহার রচিত 'শিক্ষা' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের কতকটা পরিচয় আমাদের প্রিয় পাঠক-গণের সমীপে উপস্থাপিত করিব। আমরা বলিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষা নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি ১৮০৪ শকে (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) প্রথম মুদ্রিত হয়, তৎপর ইহার কোনও সংস্করণ হয় নাই। এই পুস্তকখানি তৎকালের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি, এমন কি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবারও কথা হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ যে তৎকালে বাঙ্গলা ভাষার বর্ণাবলী ইংরাজী অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করিবার একটা প্রস্তাব কোনও খ্যাতনামা ভারতবাসী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও উক্তি শিক্ষা নামক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে বলিয়া নাকি বইখানি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইতে পারে নাই; কারণ তখনকার দিনে সেই প্রস্তাবকারী মহাত্মার প্রতিপত্তি প্রায় সর্ব্বতোমুখী ছিল। সে যাহা হউক, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পুস্তকখানি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বর্ত্তমান গৌহাটী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম, এ মহাশয় আমার নিকট গল্প করিয়াছেন, তাঁহারা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন, তখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্লাসে বলিয়াছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত আরও একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন; তাঁহার নাম চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইনি ইদানীং নিজের অতুল প্রতিভা সংস্কৃত লিখিয়া একরূপ নষ্ট করিতেছেন (?) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তর্কলঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষানামক পুস্তকখানি "বেইন" (Bain) এবং "স্পেনসারের" (Spencer) পুস্তকের সমকক্ষ"। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত নিরপেক্ষ সুশিক্ষিত সুসমালোচকের মতামত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আজি যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 'শিক্ষা' পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনুশীলিত হইবার সুবিধা থাকিত তবে বোধহয় আমাদিগকেও তাঁহার পুস্তকের কথা এত করিয়া বলিতে হইত না। বাঙ্গালার পাঠকমণ্ডলী তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার ঝিঙ্কারে এবং উন্নত ভাবসমূহের বিশ্লেষণ-বিন্যাসে একান্ত মুগ্ধ হইতেন সন্দেহ নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয় 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি ৮টী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে তাঁহার নিজের উক্তি—"শিক্ষা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে

প্রস্তাব; ছাত্র-জীবন, ব্যায়াম, এবং স্ত্রীশিক্ষা সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। ছাত্রমণ্ডলীকে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ণী নীতির আভাস প্রদান করা শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য।" ইত্যাদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রস্তাবই চলিয়াছে, এই সুবিস্তৃত সমালোচনা অশেষ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার ফল, তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ তেজস্বিতার সহিত এই চারিটী পরিচ্ছেদে তাঁহার নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন; যেরূপ ধীরতা ও বিচারের সাহায্যে নব্যশিক্ষিত, ইংরাজী শিক্ষার একনিষ্ঠ ভক্তদিগের যুক্তি-তর্কের খণ্ডন ও স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কেবল মাত্র ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার সেবা ও অন্ধ অনুকরণে ভবিষ্যতে ভারতের শোচনীয় পরিণামের আলেখ্য যেরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতির ক্রম পরিবর্তন ও তাহার নিদান অনুসন্ধান কল্পে দেশ ও বিদেশের ক্রমাগত ইতিহাসের ধারা প্রভৃতির আলোচনায় যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়াবহ। একজন সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিত দেশের মর্ম্মানুসন্ধান করিবার জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারেন বলিয়া হয়তঃ ইতঃপূর্ব্বে কেহ ধারণাই করিতে পারেন নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয় দেখাইয়াছেন, দেশ সমাজ জাতি ও ব্যক্তির আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি রুচি ও সংস্কার বিজাতীয় শিক্ষার বাহুল্যে নূতন রকম হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শিক্ষার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। দেশের জাতীয় ভাব রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধ পরিকর—তাঁহাদের প্রতি জাতীয় শিক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের উপদেশ তর্কালঙ্কার মহাশয় এমন সুন্দর যুক্তি ও তেজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহা পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে বিদ্যুৎ ও নয়নে অশ্রু আবির্ভূত হয়।

তর্কালঙ্কার মহাশয় জাতীয় শিক্ষার উপসংহারে বলিতেছেন—

"যে শিক্ষা এত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় তাহার প্রতি আদর ও যত্ন সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য মহাপাপ। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বর্ত্তমান কালে ভারতে সমাজ এই মহাপাপে অত্যন্ত কলুষিত, অধুনা রাজার অনুগ্রহে ভারত-সমাজের যে কিছু শিক্ষা লাভ হয়। প্রজার কল্যাণ সাধন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা স্বকর্ত্তব্য পালন করেন বলিয়া কি প্রজা স্বকল্যাণ সাধনে উদাসীন থাকিবে? প্রজার কল্যাণ সাধন জন্য প্রজারই সমধিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত। ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ স্বকর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন, এবং তৎপথে অগ্রসর হইয়াছেন, সুখের বিষয়। তাই বলিয়া প্রজার ঔদাসীন্য শোভা পাইবে কেন? রাজার ন্যায় প্রজাকেও স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে ও তৎপথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রজার ঔদাসীন্য থাকিলে কেবল রাজার যত্নে অভিলষিত ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। যে প্রজা স্বকল্যাণ সাধনে উদাসীন, সে প্রকারান্তরে রাজার সদভি-প্রায়সিদ্ধির প্রতিকূল। তাহার প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ, সমাজের মঙ্গলকর। পরপিণ্ডোপজীবীর দৈহিক উন্নতি যেমন অসম্ভব, পরদত্তশিক্ষোপজীবীর মানসিক উন্নতি তেমনি অসম্ভব। প্রার্থনীয় রাজানুগ্রহ ভারতের অযত্ন-লব্ধ হইয়াছে, এখন রাজানুকূল্য ও প্রজার যত্ন মিলিত হইলে সুদুর্লভ 'মণিকাঞ্চনযোগ' সম্পন্ন হইবে। আজি এত দিন পরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর পরে ভারতের রাজাপ্রজা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে ইংরাজী শিক্ষার নিকট ভারতবর্ষ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, ইংরাজ জাতির বিদ্যানুরাগ ও গুণগ্রাহিতার মহিমা তিনি

শত মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত বিদ্যার বিস্তার ও প্রচারকল্পে 'সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্' প্রভৃতি মনস্বীদিগের যত্নে 'এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সংস্থাপনা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট রাজপক্ষের অতি বড় মহনীয় কীর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, ইংরাজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তন করিলেও তাহার অপরিহার্য্য দোষগুলি প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তৎকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল নব্য-সম্প্রদায়ের প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয় যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন এবং যে সকল আক্ষেপপূর্ণ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ সৎসাহস ও স্বাধীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩য় পরিচ্ছেদের উপসংহারে তিনি যাহা লিখিয়াছেন আমরা অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিলাম, ভাল মন্দ পাঠকগণ বিচার করিবেন—"হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে সিন্ধুনদের পবিত্র-সলিল-ধৌত পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত তারস্বরে উচ্চারিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি" এই শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু কি যে সেই সভ্যতা, কিরূপ যে সেই উন্নতি, তদ্বিষয়ে কেহই দুই দণ্ড কাল চিন্তা করিবার আবশ্যক বোধ করেন না। সকলেই গতানুগতিক ন্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির পক্ষপাতী। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি ভারত সমাজের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের অনিবার্য্য ঘোরতর অত্যাচার চলিতেছে। আমরা স্বাধীনতার অভিমানে বক্ষঃ স্ফীত করি, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করিতে জানি না, কেবল গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিই। এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা? এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি। মিলের দর্শনের কৃপায় নিরীশ্বরবাদ সমাজের প্রধান আলোচ্য বিষয় অথবা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। যিনি নিরীশ্বরবাদের পক্ষপাতী নহেন, অনেকের মতে তিনি অশিক্ষিত। কপিলেব নিরীশ্বরবাদ প্রাচীন; তাহা সমাজের অনিষ্টকারী হয় নাই, কিন্তু মিলের নিরীশ্বরবাদ সমাজে কি ভয়ানক আন্দোলনই তুলিয়াছে, কি শোচনীয় বিপর্য্যয়ই আনয়ন করিয়াছে। * * * ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্মোপদেষ্টা। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত বা বিলুপ্ত, ভারতবর্ষ তৎসমস্তের উৎস, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্মোপদেষ্টা অনেকের মতে সেই ভারতবর্ষ আজ কি না ধর্ম্মবিষয়ে থিওডোর পার্কারের শিষ্য ও মিলের অন্তেবাসী। থিওডোর পার্কারের আত্ম-প্রত্যয় ও মিলের নিরীশ্বরবাদ ইংরাজী ছাত্রগণের পক্ষে নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতাধ্যায়ীদিগের পক্ষে উহা বহুতর প্রাচীন। উহা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নূতন নয়। ফলতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাধান্য সার্ব্বজনীন হইলেও নব্য-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে ভারতবর্ষ আজ তজ্জন্য মিলের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি? ইংরাজী শিক্ষা যে সকল অনিষ্ট সাধন করিতেছে অন্যান্য বিষয়ে কালে তাহার প্রতীকার হইলেও ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রতিকার সম্ভবপর কি না, তাহা বুদ্ধিমানদিগের চিন্তনীয়। * * * পরিবর্ত্তন-প্রিয়তা সমাজের দুরপণেয় রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নব্য-সমাজ সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কীদৃশ পরিবর্ত্তন সমাজের মঙ্গলকর, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সমস্তই কুসংস্কারময় উহা রহিত করিতে হইবে; আর ইংরাজের সমস্তই মার্জ্জিত ও নির্দ্দোষ, উহা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। কি ভয়ানক সংস্কার! তাঁহাদের মতে হিন্দুজাতি একটী জাতি বলিয়াই গণ্য নয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন উহাদের নিজের বলিবার কিছু নাই। ইঁহারা এককালে হিন্দুসমাজের

আচার ব্যবহার রীতিনীতির মূলোৎপাটন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। কিছুদিন হইল দেশীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইংরাজী বর্ণমালার প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত হয়, সম্প্রতি উহা কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ এ প্রস্তাব করিলে আমাদের কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় বা বলিবার ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অনেক উন্নত-মনা মহাত্মাও দেশীয় বর্ণমালার নাস্তিত্ব আবশ্যক মনে করেন। অতঃপর ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইবে। কি নূতন অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! * * * আমাদের কৃতবিদ্যগণ দেশের এই মহোপকার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কি বলিব যে, ইংরেজী শিক্ষা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়স্করী। ইংরেজী শিক্ষা-প্রভাবে অনেক উন্নতমনা শিক্ষিত ব্যক্তি আপনার গৃহলক্ষ্মীকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ভাবিতে দুঃখ হয় যে, সমাজ যাদৃশ ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইতেছে, কি যে ইহার পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা অনাগত কালের কুক্ষিনিবিষ্ট। আমাদের কৃতবিদ্যগণ শর্ম্মা স্থানে স্কোয়ার, সাটী স্থানে গাউন, ও যজ্ঞোপবীতচ্ছেদন উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, আবার য়ুরোপের দিকে নেত্রপাত কর অন্যরূপ চিত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় স্কোয়ারের পরিবর্ত্তে শর্ম্মা ও ভট্ট, মেকস্মুলারের পরিবর্ত্তে মোক্ষমূলর, জর্ম্মণির পরিবর্ত্তে শর্ম্মণ্যদেশ, গাউনের পরিবর্ত্তে সাটী, শব-সমাধির পরিবর্ত্তে শবদাহ প্রভৃতি প্রচলিত হইতেছে। এখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কোন্‌টি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বুঝিব? বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞোপবীত ছেদন করিয়া দেশে উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিলেন, কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইলেন, বাহবার একশেষ হইল। আবার শুনিলাম, তিনি ইংলণ্ডে মহাত্মা গোলড ষ্টুকার কর্ত্তৃক তন্নিমিত্ত ভর্ৎসিত হইলেন। এখন কোন্‌টি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া জানিব? বিধাতার এ বিড়ম্বনা কেন? কৃতবিদ্যগণের এ চপলতা কেন? কি বলিব!

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ মদিরা মুন্মত্তভূতং জগৎ"? আমাদের সমাজের তাই ঘটিয়াছে, কেন এরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করিতে চাহেন না, এ রোগের কি কোন ঔষধ নাই?"

কি মর্ম্মভেদী আক্ষেপ, কি প্রাণস্পর্শী আত্মমুখীনতা! প্রিয় পাঠক, এই সঙ্গে একবার ভাষা স্রোতস্বতীর তরঙ্গ-চঞ্চল গতিটীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজেরই পক্ষে জ্ঞান ও জাতীয় ভাবের পরিপোষক। ভারত-বাসীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় সুলভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাহাদের জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইতে পারে না। জাতীয় ভাবের পরি-পুষ্টিকল্পে দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষা যাহাতে অধিক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত, হয় দেশহিতৈষীদিগের তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহার মতে জাতীয় আচারব্যবহার ও রীতিনীতি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ভাবের প্রধান অঙ্গ। এই সকল আচারব্যবহারাদির উপদেশ কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ, সুতরাং ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষার সংমিশ্রণ ব্যতীত জাতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি শিক্ষা হইতেই পারে না, তাহা না হইলে জাতীয়তাপ্রভৃতি আকাশ কুসুমবৎ অলীক হইয়া পড়ে। এই সকল কথা অতি সুন্দর যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয় অনুরাগ বংশানুগত; তাহা হইলেও, সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা এখনকার দিনে বোধ হয় অস্বীকৃত হইতে পারিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপেই তাহার 'শিক্ষার' কিয়দংশের আলোচনা করিলাম, বারান্তরে ইহার অপর অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

ডালিম ফুল

আমার প্রিয়ার হাসিমাখা রাঙ্গা দু'টী ঠোঁট
দেখছি আজ ওই ডালিম ফুলে,
উদাস পাগল মনটী রে। ছোট্ রে ওরে ছোট্
এবার ঠাঁই পাবি অকূল-কূলে !

শ্যামল পাতার আড়ালে রে দেখ রে দেখ চেয়ে
অলক-ঢাকা সেই অধরখানি,—
তেম্নি মধুর সুধা নিয়ে সুষমাময়ী মেয়ে
লুকিয়ে কোথা আছে ঘোমটা টানি' !

এমন সুযোগ হবে না রে ওরে আমার মন,
ওরে আমার আপনা-হারা সাথী,
হাজার যুগের পরে আজি মিলন অতুলন
আকুল তৃষা রাখবি বুকে গাঁথি' ?

আজকে সফল ভাল করে কর্‌তে হবে সব
সরিয়ে দে রে সকল ব্যবধান ;—
প্রিয়ার অধর-সুধা পিয়ে ঘুচবে হা হা রব
ডালিম ফুল দিবে নূতন প্রাণ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

——

অন্ধ্র শাসন কালে দেশের অবস্থা

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি, আর্, এস্, মহাশয় অন্ধ্র নৃপতিগণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রতিভা পত্রিকায় এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্ধ্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য আরম্ভ করেন তখন হইতে তাঁহাদের রাজত্বের অন্ধ্রশাসনকাল শেষকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব-পরিমাণ ৪৫৭ বৎসর ; এবং যখন তাঁহারা মগধ বিজয় করেন তখন হইতে তাঁহাদের রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত রাজত্বকালের পরিমাণ প্রায় ৩০০ বৎসর ; সুতরাং অন্ধ্রগণের কাল লইয়া পুরাণে যে অসামঞ্জস্য আপাতত লক্ষিত হয় বাস্তবিক তাহা অসামঞ্জস্য নহে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে অন্ধ্রগণ খৃঃ পূঃ ৭২ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, সুতরাং তিনি ইঁহাদের রাজত্ব কালের পরিমাণ মাত্র ৩০০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, পুরাণের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয়ের এই মতবাদ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

আমরা অশোকের অনুশাসন হইতে দেখিতে পাই যে, খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে অন্ধ্রগণ মহারাজ অশোকের অধীনতা স্বীকার করিতেন। পরে মৌর্য্যবংশের পতন হইলে, অর্থাৎ ১৮৪ খৃঃ পূর্ব্বে অন্যান্য সামন্ত রাজ্যের ন্যায় অন্ধ্রগণও অন্ধ্রনরপতি সিমুকের অধীনে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৪ খৃঃ পূর্ব্বে সুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পরিশেষে সুঙ্গ ও কাণ্ববংশের পতন হইলে, অর্থাৎ সুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠার ১৫৭ বৎসর পরে, অর্থাৎ, খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে, অন্ধ্র বা সাতবাহন-বংশীয় জনৈক

নরপতি শেষ কাণ্বরাজকে নিহত করিয়া মগধ অধিকার করেন, এবং খৃষ্টীয় ২৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব অব্যাহত রাখেন। আমরা এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। অধ্যাপক মজুমদার ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; সুতরাং, আশা করি, এই ক্ষেত্রে আমার এই সামান্য চেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অন্ধ্র, সাতবাহন ও শালিবাহন নামত্রয় অভিন্ন। অন্ধ্র-রাজগণের প্রাচীনতম মুদ্রায় 'সাত' নামের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ, একটি তামিল কবিতায় মগধরাজ সাতকর্ণির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, * এবং অনেক অন্ধ্রনৃপতিই সাতকর্ণি এই

রাজনৈতিক অবস্থা

উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শালিবাহন কোন রাজার নাম নহে, ইহা একটি রাজবংশের নাম। অধ্যাপক মজুমদারও তদীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র তদীয় দেশীকোষ গ্রন্থে শালিবাহন, সালন, হাল, কুন্তল এই চারি নামে মাত্র একজন নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ উভয়েই শালিবাহন-বংশীয় হইলেও শেষোক্ত দুই রাজাই দুই বিভিন্ন নরপতির বংশধর। আবার তিনি তদীয় প্রাকৃত ব্যাকরণে শালিবাহন শব্দটি সাতবাহনের অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে শকাব্দকে শালিবাহন-প্রবর্ত্তিত অব্দ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোন সময় হইতে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বলা কঠিন, কিন্তু ভূমিদান সম্পর্কীয় যাবতীয় তাম্রশাসনেই একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অব্দকে শক-নৃপকাল (শক-রাজগণের প্রবর্ত্তিত অব্দ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং বাদামিতে প্রাপ্ত একটি লিপিখণ্ডেও (inscription) এই অব্দ শক-রাজের রাজ্যাভিষেক হইতে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'শক'-নৃপকাল 'শকে' (শক সংবৎসর) পরিণত হইয়াছে। এবং একটা অব্দ হইলেই যেমন ইহাকে কোনও সুবিখ্যাত রাজার নামের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ শালিবাহনকেও একজন বিখ্যাত রাজা মনে করিয়া ইঁহাকেই শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা প্রতিভা পত্রিকায় (২৪০ পৃষ্ঠা) 'শক ক্ষত্রপ চষ্টন' সম্বন্ধে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি কতিপয় শিলালিপির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, শকক্ষত্রপ রুদ্রদমন ৫২ শকাব্দে, বা ১৩০ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তিনি শক-ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র। চষ্টন ৭৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন (প্রতিভা ২৪২ পৃঃ)। তিনিই মালবীয় শকরাজগণের আদিপুরুষ, এবং তিনিই ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহার বংশীয়গণ ৭৮ খৃঃ অব্দের এই স্মরণীয় ঘটনা হইতে যে অব্দ গণনা করিতেন তাহাই শকাব্দ।* বিশেষতঃ বাদামিতে প্রাপ্ত লিপিখণ্ডের সহিতও এই মতের সামঞ্জস্য হইতেছে।

শালিবাহন সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি আছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর সে সকল জনশ্রুতি তৎকৃত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক জনশ্রুতি মতে

* ভিনসেণ্ট স্মিথের ভারতের ইতিহাস, ১৯৩ পৃঃ পাদটীকা।

* ১৩১১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা "নারায়ণ" পত্রিকায় অধ্যাপক মজুমদার শকাব্দ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ আছে; বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

শালিবাহন এক অনূঢ়া ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মানবরূপধারী শেষনাগ ইঁহার পিতা তিনি উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের বিনাশ সাধন করেন। ভাণ্ডারকর এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই শালিবাহন অন্ধ্ররাজ পুলোমায়ী। এই পুলোমায়ীই শকগণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। † তিনি পুলোমায়ীই হউন বা অন্য কেহ হউন ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই জনশ্রুতি হইতে আমরা মাত্র এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, অন্ধ্ররাজগণ উজ্জয়িনী-রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পুলোমায়ী রুদ্রদমনের কন্যা দক্ষমিত্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রুদ্রদমন মালব-শাখার শক-ক্ষত্রপগণের স্থাপয়িতা চষ্টনের পৌত্র। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রুদ্রদমন জামাতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই সত্য, কিন্তু স্বীয় তনয়ার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পুলোমায়ীর রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন নাই (ভিনসেণ্ট স্মিথ, ২০০ পৃষ্ঠা)।

সাহিত্যেও শালিবাহনের জনশ্রুতি স্থান পাইয়াছে।

বৃহৎকথা ও সাতবাহন

দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে পৈশাচিক প্রাকৃতে লিখিত বৃহৎকথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগর নেতা সোমদেব এবং বৃহৎকথানামক অন্য আর একখানি গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা ক্ষেমেন্দ্র উভয়েই তাঁহাদের গ্রন্থ-নিবদ্ধ গল্পাবলীর জন্য পৈশাচিক ভাষায় লিখিত বৃহৎকথার লেখক গুণাঢ্যের নিকট ঋণী। কথিত আছে, তিনি কিছুকাল 'সাতবাহনের' মন্ত্রী ছিলেন এবং কাণভূতি নামক জনৈক পিশাচ প্রথমতঃ তাঁহাকে এই সকল গল্প বলিয়াছিল। গুণাঢ্য গল্পগুলি রক্তে লিখিয়া 'সাতবাহনকে' প্রদান করেন। কিন্তু রক্তলিখিত পিশাচের গল্প রাজা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে গুণাঢ্য দুঃখিত হইয়া গল্পগুলি পুড়িয়া ফেলিলেন। ভাগ্যক্রমে সপ্তখণ্ড গল্পের মধ্যে মাত্র একখণ্ড রক্ষা পাইল। পরিশেষে 'সাতবাহন' এই সকল গল্পের মনোহারিত্ব অবগত হইয়া গুণাঢ্যের সম্মতিক্রমে তদীয় জনৈক শিষ্য হইতে সপ্তম খণ্ড প্রাপ্ত হন।

বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিতের উপোদ্ঘাতে সপ্তশতী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থেও সপ্তশতীর শ্লোকের উল্লেখ আছে। বলিতে কি সপ্তশতীর শ্লোকেই গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ইঁহার নাম "হাল"। সাধারণ কথায় তাঁহাকে শালিবাহন বলা হয়। অন্ধ্রবংশে হাল নামক একজন রাজা ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, হয়ত তিনিই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা কেহ তাঁহারই নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।

কাতন্ত্রের প্রণয়ন ব্যাপারেও একটা জনশ্রুতি আছে। রাণী স্নান করিতে করিতে হাল নৃপতিকে বলিয়াছিলেন "মোদকং দেহি"। রাজা সত্য সত্যই মোদক লইয়া আসিলেন। নরপতির অজ্ঞানতার ফলে কাতন্ত্রের প্রণয়ন হইল।

উল্লিখিত জনশ্রুতি হইতে এই ঐতিহাসিক সত্য গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, অন্ধ্রগণের রাজত্ব কালে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগেরই রাজত্ব সময়ে পৈশাচী বা কথিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল।

বাৎসায়নের কামসূত্রেও শালিবাহনের নামের উল্লেখ দেখা যায়। কুন্তল সাতকর্ণি মহাদেবী মলয়াবতীকে কোনও প্রেমকেলির উপলক্ষে কাঁচি দ্বারা হত্যা

† আমরা জানি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি মালবদেশ জয় করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ১২৬ খৃঃ)। ২য় পুলোমায়ী গৌতমীপুত্রের পুত্র ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী। পুলোমায়ী রুদ্রদমন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, ফলে অনেক দেশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পুলোমায়ীর পরবর্ত্তী যজ্ঞশ্রী নষ্ট রাজ্যের অনেক অংশ উদ্ধার করেন (ভিনসেণ্ট স্মিথ, ১৯৯-২০১ পৃঃ)।

করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

অন্ধ্রগণের শাসন-কালে আমরা সাহিত্যের যে অবস্থা দেখিতে পাই তাহা শিলালিপি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক নহে—কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক কিংবা ধর্মবিষয়ক অবস্থা তৎকালীন শিলালিপি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক, সুতরাং ইতিহাসের দিক হইতে ইহাদের মূল্য যথেষ্ট। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের যে অবস্থা সমগ্র ভারতেরও ঠিক সেই অবস্থা, তবে শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণ ভারতের অবস্থা সম্যক সমর্থিত হয়, কিন্তু উত্তর ভারতে তাহা হয় না, এইমাত্র প্রভেদ।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের অবস্থা মহাভোজ (রাজা), মহারথি (সামন্ত রাজা), নৈগম (বণিক), স্বর্ণকার, বর্দ্ধক (সূত্রধার), ধান্যকশ্রেণী (ধান্যব্যবসায়ী), গান্ধিক (ঔষধ ব্যবসায়ী), ও গৃহস্থগণ অর্থব্যয় করিয়া শিলাগাত্রে বৌদ্ধগণের জন্য গুহা-মন্দিরাদি খুদিয়া দিতেন। অন্ধ্ররাজত্বের প্রথম ভাগে (খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে) বাকট্রিয়ান, শক ও পহ্লবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ভারতেই বসতি স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। শিলাগাত্রে খোদিত গুহা-মন্দিরাদির প্রাচীর-পৃষ্ঠে বহু অর্থদাতা যবন (বাকট্রিয়ান), শক প্রভৃতির নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাই তাঁহাদের ধর্মান্তর গ্রহণের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল পর্ব্বত-গুহায় চৈত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইত, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীও নির্ম্মিত হইত।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৎসর ধরিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করিতেন এবং বর্ষার চারি মাস এই সকল মন্দিরাদিতে বিশ্রাম করিতেন। ভিক্ষুগণ সমুদ্রপথেও ভারতের বাহিরে গমন করিতেন, সুতরাং শিলাগাত্র-খোদিত তাঁহাদের বাসোপযোগী গুহা-মন্দিরাদি কঙ্কণ প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী প্রণালী সমূহের উপকূলে নির্ম্মিত হইত। লোকে ইহাদিগকে ধর্ম্মশালা বা বিশ্রামশালা বলিত। চিপলুণ, মহাড় এবং কুড়েম নামক স্থানে অদ্যাপি এরূপ ধর্ম্মশালা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সেই সময়ে এক এক ব্যবসায়ী এক এক সমিতি (guild) গঠন করিত, এবং ধনিগণ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সেই সকল সমিতিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন। কেহ ধান্যকশ্রেণী-সমিতিতে, কেহ তন্তুবায়-সমিতিতে কেহ বা তৈলব্যবসায়ীর সমিতিতে অর্থদান করিয়া রাখিতেন. গচ্ছিত অর্থের সুদ দ্বারা ভিক্ষুগণের জন্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রীত হইত। শ্রাবণ মাসে (বস্‌স সময়ে) ভিক্ষুগণ নূতন পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেন, তন্তুবায় সমিতি হইতে তখন তাঁহাদের পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

কাঠিয়াবার শাখার শক-ক্ষত্রপগণের আদিপুরুষ নহপনের জামাতা উসবদাত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্য একটি চৈত্য (cave temple) শিলাগাত্রে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন নগরের (নাসিক) তন্তুবায় সমিতির হস্তে দুই সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়া এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এই অর্থের বার্ষিক সুদ (১০০ কার্ষাপণ) দ্বারা বস্‌স সময়ে (বর্ষাকালে) তাঁহার খোদিত চৈত্যমন্দিরে যে ২০ জন ভিক্ষু থাকিবেন তাঁহাদের নূতন পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যাহাতে এই কার্য্যের ব্যতিক্রম না ঘটে তজ্জন্য গোবর্দ্ধন নগরের নিগম সভায় (town corporation) উসবদাতের এই নির্দ্দেশ লিপি-বদ্ধ ছিল, এবং তৎকৃত গুহামন্দিরের প্রাচীর-গাত্রেও তাঁহার অভিপ্রায় ও দানের মর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। উসবদাত অপর এক সমিতিতে এক সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই অর্থের বার্ষিক সুদ (৭৫ কার্ষাপণ) হইতে ভিক্ষুগণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। নাসিকের

শিলালিপি সমূহ হইতে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে।

কারলীর গুহা চৈত্যের শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, উসবদাত বালুরকের চৈত্যবাসী (cave-monastery) ভিক্ষুগণের ভরণপোষণের জন্য কর্জিক গ্রামটি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উসবদাতের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান-কার্য্যের শিলালিপিও বর্ত্তমান আছে।

উসবদাতের পত্নী দক্ষমিত্রাও যে তাঁহার স্বামীর ন্যায় ভিক্ষুগণের বাসের ও অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণমূলক শিলালিপিরও অভাব নাই।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মাতা (গৌতমী) পুলোমায়ীর রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে নাসিকের প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতে একটি গুহা-মন্দির ভদ্রায়নীয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের বাসের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিতে গৌতমীকে মহারাজ-মাতা ও মহারাজ-মাতামহী বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থাও হীন ছিল না। নাসিকের একটি গুহা-মন্দিরের হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গোবর্দ্ধন জেলায় দানশীল উসবদাত কর্ত্তৃক এই গুহা-মন্দির খোদিত হইয়াছে। উসবদাত দেবতা-ব্রাহ্মণকে ৩০০০০০ ধেনু ও ১৬টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী নদীতে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন, এবং সোমনাথের আট জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিবাহের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। উসবদাত ভারুকচ্ছে (বরোচ) বিশ্রামাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বাগান প্রস্তুত, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, নদীতে খেয়ার নৌকা প্রতিষ্ঠা, পথিকের জলপানের জন্য স্থানে স্থানে জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নাসিকের আর একটি শিলা-লিপি হইতে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। নহপনের বৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী অযম একটি পুষ্করিণী খনন ও একটি বিস্তৃত গৃহ (hall) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জুন্নারের শিলালিপি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

নাসিকের প্রান্তবর্ত্তী গুহা-গাত্রে খোদিত শিলা-লিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির এক বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—গৌতমীপুত্র একচ্ছত্র রাজা (King of Kings) অসিক, অশ্মক, মূলক, সৌরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনুপ, বিদর্ভ এবং অকরাবন্তী প্রদেশের অধিপতি এবং বিন্ধ্য, মলয়, মহেন্দ্র প্রভৃতি পর্ব্বতের অধীশ্বর। অসংখ্য রাজা তাঁহার চরণ পূজা করিতেন, এবং তদীয় অশ্বগজ প্রভৃতি তিন সমুদ্রের জল পান করিত। এই সকল বর্ণনা হইতে গৌতমীপুত্রের রাজ্যের বিস্তৃতি ও তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রজাগণের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন, এবং কর্ত্তব্য, ঐহিক উন্নতি ও স্ব-কাম (desire) সিদ্ধির জন্য সমভাবে চেষ্টা করিতেন। গৌতমীপুত্র বিদ্যার আধার, সৎলোকের আশ্রয়, কীর্ত্তির আবাস, শিষ্টাচারের নিলয় ও ব্রাহ্মণপালক ছিলেন। নৈপুণ্যে, শরচালনায় ও বীরত্বে অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ জাতির প্রসার ও বর্ণধর্ম্মের রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বীরকর্ম্মে তিনি রাম, কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমকক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহার বীরত্ব নভাগ, নহুষ, জন্মেজয়, সগর, যযাতি, রাম ও অম্বরীষ অপেক্ষা হীন ছিল না। তিনি শক ও পহ্লবগণকে ধ্বংস করিয়া সাতবাহন বংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই শিলালিপির শেষ পংক্তিতে লিখিত আছে যে, গৌতমীপুত্র গুহা-মন্দিরাদির রক্ষা-কল্পে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হইলেও গৌতমীপুত্র বৌদ্ধগণকে নির্য্যাতন

করিতেন না, বরং তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষেই দর্শন করিতেন। নাসিক-গুহা-গাত্রে আর একটি শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে গৌতমীপুত্র ২০০ 'নিবরতন' পরিমিত ভূমি দান করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে বুঝা যায় যে, এটি গোবর্দ্ধনের শাসনকর্ত্তা বিষ্ণুপালিতের নিকট ধনকটকরাজ গৌতমীপুত্রের আদেশ লিপি। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, ধনকটক গৌতমী-পুত্রের রাজধানী ছিল। এরূপ আর কটি লিপিতে দৃষ্ট হয় যে, গৌতমীপুত্রের মহিষীও ১০০ নিবরতন পরিমিত ভূমি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে দান করিয়াছেন।

নাসিক-গুহা-গাত্রে পুলোমায়ীর শিলা-লিপিও দৃষ্ট হয়। তাঁহার একটি আদেশ লিপি গোবর্দ্ধনের শাসনকর্ত্তা সর্ব্বাক্ষদলনের নামে শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই উৎকীর্ণ আদেশ-লিপির মর্ম্ম এই যে, গৌতমীপুত্রের দত্ত গ্রাম ভদ্রায়নীয়গণের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নহে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আর একটি গ্রাম দান করিলেন।

সাধারণ ব্যক্তিবর্গও বৌদ্ধভিক্ষুগণের সাহায্য-কল্পে ভূমি দান করিতেন। এইরূপ শিলালিপিও নাসিকে বিদ্যমান আছে, এবং এই সকল শিলালিপিতে অন্ধ্ররাজ পুলোমায়ীর নাম দৃষ্ট হয়।

কোলাপুরে বৌদ্ধ স্তূপ হইতে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের গাত্রে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়, এবং গৌতমীপুত্র ও পুলোমায়ী ব্যতীত সিমুক, কৃষ্ণ প্রভৃতি বহুরাজার নামও শিলালিপি প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পেরিপ্লাস (Periplus) প্রণেতা * কুমারিকা অন্তরীপে পার্ব্বতী দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস ১ম খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বেই আর্য্য-দেবদেবীর পূজা দক্ষিণভারতের সুদূর প্রান্তেও প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই সকল লিপিমূলক নিদর্শন হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রগণের সময়ে ধর্ম্মদ্বেষ ছিল না, রাজগণ সমভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং এই দুই ধর্ম্মই পাশা-পাশি থাকিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল।

ব্যবসায়ী সমিতি বা ব্যাঙ্ক প্রথা।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, তখন দক্ষিণ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর ভিন্ন ভিন্ন সমিতি ছিল। এই সকল সমিতিতে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য অর্থ গচ্ছিত থাকিত, এবং বার্ষিক সুদ দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত। বংশ-পরম্পরা-ক্রমে এই সকল সমিতি সুদ আদায় করিত, সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যে সুদৃঢ় ছিল, এবং ইহাদের কার্য্যপ্রণালী যে সুন্দররূপে চলিত ইহা বলাই বাহুল্য।

গ্রাম্য সমিতি এবং ব্যবসায়ী-সমিতিগুলি দেশের শাসন-প্রণালীর যে অঙ্গ বিশেষ ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। উসবদাতের নাসিক শিলালিপিতে নিগম সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল নিগম সভা (town corporation) বর্ত্তমান মিউনিসিপাল শাসন-সমিতির অনুরূপ ছিল। সুতরাং ভারতে যে অতি প্রাচীনকালেও স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত ছিল তাহা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

---

* গ্রন্থের নাম পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি (The Periplus of the Erythrean sea). লোহিত সাগরের প্রণালীর নাম এরিথ্রিয়া। আফ্রিকার উপকূল ভাগ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূল, সিংহল ও পূর্ব্ব উপকূল ভাগের মধ্যবর্ত্তী সাগরকে এরিথ্রিয়াম সি (Erythrean sea) বলা হইত। পেরিপ্লাস গ্রন্থের (Periplus) লেখক জনৈক গ্রীক বণিক। তিনি এই পুস্তকে এই সকল উপকূল ভাগের তৎকালীন বাণিজ্য-কেন্দ্র সমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বার্ষিক সুদের যে হার লিখিত হইয়াছে (১০০০ কার্ষাপণের বার্ষিক সুদ ৫০ বা ৭৫ কার্ষাপণ) তাহাতে দেখা যায় যে, শতকরা বার্ষিক সুদের হার তখন ৫ ও ৭½ কার্ষাপণের মধ্যে ছিল। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ ৫ ও ৭½ কার্ষাপণের মধ্যেই সুদের হার সীমাবদ্ধ ছিল। যদি ধরা যায় যে, দেশের অশান্তি বা অরাজকতার উপর সুদের হার নির্ভর করে, এবং দেশের শাসন যত উৎকৃষ্ট হয়, সুদের হারও তত কম হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যেও তখন দেশের সুশাসনের বন্দোবস্ত ছিল। এবং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তখন দেশ সুন্দররূপে শাসিত হইত তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্থানীয় শাসন-সমিতির গঠন-প্রণালী ও শাসন-নীতি উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই রাজবংশের পরিবর্ত্তনের সময়েও দেশে শাসন-বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, মিউনিসিপাল স্বায়ত্ত শাসন এবং ব্যাঙ্ক প্রথা ভারতবর্ষে নূতন নহে। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল।

অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য

এই সময়ে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ভারতে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশ হইতে অর্ণবযান ভারুকচ্ছে ও অন্যান্য বন্দরে আগমন করিত এই কথা পেরিপ্লাসে (Periplus) লিখিত আছে। অর্ণব পোতে আনীত পণ্যাদি পারশেষে বরোচ (ভারুকচ্ছ) হইতে বিভিন্ন নগরে নীত হইত। সেইরূপ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মসলিন, তুলা, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতিও বরোচে আনীত হইত, এবং সেখান হইতে অর্ণবপোত যোগেই ঐ সকল পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইত। পেরিপ্লাসে (Periplus) ভারতের মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে বহু বন্দরের উল্লেখ আছে।

কারলী-চৈত্যের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গোয়ার নিকটবর্ত্তী বৈজয়ন্তী-বাসী জনৈক সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী এই চৈত্য নির্ম্মাণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কঙ্কণ-প্রদেশে কাণেড়ীতে এই প্রকার বিপুল দানের বহু বিবরণ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে বণিক সম্প্রদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। পেরিপ্লাসপ্রণেতা ও টলেমি (The author of the Periplus and Ptolemy) খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর লোক, উভয়েই এই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছেন।

গমনাগমনের উপায়

সেই সময়ে বাষ্পরথের আবিষ্কার হয় নাই বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের বাধা ছিল এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। যে সকল লোক ধর্ম্মার্থ অর্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন চৈত্য মন্দিরাদির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে তাঁহাদের নাম অবগত হওয়া যায়। বৈজয়ন্তীবাসী শ্রেষ্ঠীর নাম কারলী চৈত্যের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। নাসিকের জনৈক বণিকের নাম বিদিসার স্তূপ-গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ভারুকচ্ছ ও কল্যাণবাসী কতিপয় ব্যক্তির নাম জুনার শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয় উত্তর ভারতবাসী বহু অর্থদাতার নাম নাসিকের পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের অনেক ধনী ব্যক্তির নাম উত্তর ভারতের গুহা-মন্দিরাদির গাত্রে খোদিত আছে। বাহুৎ স্তূপে নাসিকনিবাসী ধনিগণের অর্থদানের বিবরণ উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। *

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এবং বিভিন্ন স্থান সমূহে সদাসর্ব্বদা গমনাগমনের উপায় না থাকিলে এক দেশের লোক অপরিজ্ঞাত প্রদেশে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য অর্থ দান করিত না এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

* বাহুৎ জব্বলপুর ও এলাহাবাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অপরিচিত নহেন। উপস্থিত প্রবন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদর্শিত হইল।

পাঠান শাসনকালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় চৌলসমাজের সিংহ বংশীয় লালা রঘুপ্রসাদ সিংহ সপ্তগ্রামে কাননগুই দপ্তরে কার্য্য করিতেন। মোগল পাঠানের বিরোধারম্ভে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র লালা চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ নিরাশ্রয় অবস্থায় চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫০৫ শকে (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) ভীষণ জলপ্লাবনে চন্দ্রদ্বীপ প্লাবিত হয়। নদীর জল ২৫।৩০ হস্ত উচ্চ হইয়া মনুষ্যের গৃহাদি ভাসাইয়া নেয়। সেই জলপ্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ মানব কালকবলিত হয়। ভগবৎ কৃপায় এই শোচনীয় ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়া চণ্ডীপ্রসাদের পুত্র লালা সুন্দররাম সিংহ জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে উপনীত হন। সরাইল পরগণার তদানীন্তন জমীদার মহাশয়ের কৃপায় কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ৩২৯ বৎসর গত হইল, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেইস্থানে বাস করিতেছেন।

লালা রঘুপ্রসাদের ১২শ উত্তরপুরুষ ৺সোণারাম সিংহ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় ত্রিপুরাধিপতির রাজস্বসচীব ছিলেন। তৎকালে রায় মহাশয়ের সুখ্যাতি জনসমাজে পরিব্যাপ্ত ছিল। যদিও তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্য্যে কি সামরিক, কি শাসন, কি মন্ত্রণা প্রায় সমুদয় বিভাগেরই পরিচালক ছিলেন। ৺গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয়ই আমাদের কৈলাসবাবুর পিতৃদেব। রায় মহাশয়ের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ শরচ্চন্দ্র, কনিষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র। শরচ্চন্দ্র শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতে জনকজননী শোকাকুল হইয়া দ্বিতীয় পুত্রের লাভাকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রী৺জগজ্জননীর সেবা করিতে থাকেন। এরূপে সাত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র কৈলাসচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় অপরাহ্নে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিবস রথযাত্রা ছিল।

পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আদরের সীমা ছিল না। যখন তিনি দেড় বৎসর বয়স্ক তখন তাঁহার পিতৃদেব সপরিবারে ৺কাশীধাম যাত্রা করেন। সুতরাং তিনি অতি শৈশবেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। ৫ম বৎসর বয়সে কৈলাস বাবুর বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে কুমিল্লার জিলা স্কুল ব্যতীত ত্রিপুরা জিলায় অন্য কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামে সাধক ৺বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বামী), ৺গোলোকচন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়েই তাঁহার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কৈলাসবাবুর বাল্যসহচরদিগের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিত বাবু দ্বিজদাস দত্ত এম, এ, এবং ৺গগণ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী অন্যতম। তাঁহারা তিনজনে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে অশ্ব ধরিয়া আনিয়া দৌড়াইতেন। কালে কৈলাসচন্দ্র অশ্বচালনে বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। কালীকচ্ছে স্কুল খোলার কিছুদিন পরেই ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা উত্তরাভিমুখে যাত্রা করার সংবাদ গ্রামে প্রচারিত হইলে গ্রামবাসিগণ নিতান্ত ভয়াতুর হইয়া পড়ে। লুটপাটের ভয়ই বিশেষ প্রবল হইল। কৈলাসচন্দ্র তখন বালক। তিনি সহচরগণকে লইয়া ঔৎসুক্যবশে অথচ শঙ্কিত মনে মাঠে যাইয়া বৃক্ষারোহণে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিতেন। বিদ্রোহ নিবারিত হইল—দেশে শান্তি আসিল। তখন লোকে নিশ্চিন্ত মনে সিপাহী বিদ্রোহের নানারূপ গল্প গুজব করিত। কৈলাসচন্দ্র

সে সকল গল্প নিবিষ্ট মনে শুনিতেন এবং বাল্যসুলভ কল্পনায় বিদ্রোহানল দর্শন করিয়া ক্ষণে ভীত, ক্ষণে বিস্মিত ক্ষণে আমোদিত হইতেন।

স্কুল খোলার ২।৩ বৎসর পরই স্কুলটি ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং কৈলাসবাবুকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অল্প বয়সেই স্থানান্তরে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল। তিনি যখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করেন তখন পরিবারস্থ প্রিয়জনকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পড়িতে গমন করেন। সেখানে দেড় বৎসর অধ্যয়নের পর অবশেষে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জিলা স্কুলে প্রেরিত হন। কিন্তু অধিক দিন পড়িতে পারিলেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রায় দেড় বৎসর প্লীহা জ্বরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃদেব (বাং ১২৭৩, ৭ আষাঢ়) স্বর্গারোহণ করেন। তখন তিনি এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এখানেই পিতৃহীন কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন হয়। তিনি যখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি, এ ন্যায়বাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। কৈলাসচন্দ্রের সহোদর ছিল না, সুতরাং প্রকাশ বাবুর প্রতিই তাঁহার সোদর স্নেহ জন্মিয়াছিল। কৈলাসবাবু আজীবন সোদর-প্রতিম প্রকাশবাবুকে আন্তরিক ভালবাসিয়া গিয়াছেন এবং প্রকাশ বাবু ও তাঁহাকে অগ্রজ জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছেন।

১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে কৈলাসচন্দ্র দারপরিগ্রহ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার অপর ভ্রাতা ছিল না, এজন্য অল্প বয়সেই তিনি একটি সংসার পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ৺ গোলোকচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় জীবনে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। নানা প্রকারে সদনুষ্ঠানে অর্থরাশি মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং কৈলাস বাবুকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুর রাজসরকারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যদিও তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি বিদ্যার্জ্জনের পিপাসা পরিহার করিতে পারিলেন না। সরকারী কার্য্যের অবকাশে তিনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। কোন নূতন গ্রন্থ পাইলেই সকল কার্য্য ভুলিয়া গ্রন্থপাঠে রত থাকিতেন। যখন কোন নূতন গ্রন্থ না পাইতেন, তখন কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বক্ষে ধারণ করিয়া শয্যাশায়ী হইতেন। এরূপে রামায়ণ মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ নিত্যপাঠ্য ছিল—নাম "দুর্গাভক্তি চিন্তামণি" (?)। এই গ্রন্থ এক্ষণ দুষ্প্রাপ্য। সর্ব্বদা অধ্যয়নে রত থাকাতে কৈলাসচন্দ্রের হৃদয়ে গ্রন্থরচনার বাসনা জাগরিত হয়। তৎকালে ঢাকা নগরী হইতে "হিন্দুহিতৈষিণী" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৈলাসচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সেই পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতেন। সম্পাদক আগ্রহের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ হিন্দুহিতৈষিণীতে "প্রেরিত পত্র" নামে মুদ্রিত হয়। সেই হইতেই কৈলাস বাবু বঙ্গীয় পাঠকসমাজে লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। ১৮ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি একখানি উপখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহা আর মুদ্রিত হইতে পারিল না। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি আগড়তলা পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপার অতি বিস্ময়কর এবং ত্রিপুরা ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট এ জন্য এস্থলে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পর মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ মহারাজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্বর্গারোহণের অত্যল্পকাল পরই তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কুমার পরলোকগমন করেন। ত্রিপুরবাসী সর্ব্বসাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু মহারাজা ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যুবরাজপদে বরণ করেন। এরূপে কুমার নবদ্বীপচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আশা ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। মধ্যমকুমার নবদ্বীপচন্দ্র ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসে স্বীয় জননীসহ কুমিল্লা নগরীতে উপনীত হইলেন। এই ঘটনায় বিংশতি বর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি মনের ক্ষোভে স্বীয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথিমধ্যে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং বৃটিশ আদালতে বিচার প্রার্থী হইলেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের বিরুদ্ধে কেহই প্রকাশ্যে যোগদান করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং কৈলাস বাবুকেই সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল তাঁহার অপর সহকারী কেহই ছিল না। মোকদ্দমা পরিচালন অর্থসাপেক্ষ। নিরাশ্রয় রাজকুমার কোথায় অর্থ পাইবেন? কৈলাস বাবু মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক জনৈক মারোয়ারীকে অর্থপ্রদানে স্বীকৃত করান। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী মহারাজা ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে বরণ করিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্ম্মন বাহাদুর সামান্য বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন। মোকদ্দমার পরিণামফল আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বিংশতি বর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্র এই ঘটনায় জড়িত হইয়া যেরূপ নির্ভীকতা, কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কি স্বপক্ষের কি বিপক্ষের ব্যারীষ্টারগণ তাঁহার প্রতিভায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কুমার বাহাদুরের পক্ষে প্রধান ব্যারিষ্টার মিঃ মনট্রো তাঁহাকে বিলাতে যাইয়া বারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মাঝে মাঝে বিলাত গমনে সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই।

কৈলাস বাবু বাল্যকাল হইতে সাহিত্যে অনুরক্ত ছিলেন। মোকদ্দমায় জড়িত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যসেবায় বিরত হন নাই। মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের বহুল পুরাতন দলিলপত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। সে সকল উপকরণ অবলম্বনে কৈলাস বাবু "ত্রিপুর ইতিবৃত্ত" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহাই বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রথম জিলার ইতিহাস। তৎকালীন সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ইহার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাত্মা ৺ শিশিরকুমার ঘোষ এই পুস্তিকার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা নবীন লেখক বিশেষ রূপে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত মোকর্দ্দমা পরিচালন সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র, হাইকোর্টের উকিল ৺ পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতীর সহিত কৈলাস বাবুর পরিচয় স্থাপিত হয়। সরস্বতী মহাশয় ত্রিপুর ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে সমধিক উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালীশিক্ষা দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৈলাসবাবু চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ত্রিপুরা ইতিবৃত্ত প্রকাশের পর গ্রন্থকার ফরাসী বীরললনা জোয়ানের জীবন চরিত বঙ্গীয় পাঠ-কসমাজে উপস্থিত করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকগণ গ্রন্থকর্ত্তাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলিকাতা গেজেট, বোম্বে গেজেট, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায় ইহার ভাষা সম্পর্কে অতি সুন্দর প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, অতি মধুর ও মনঃপ্রাণমুগ্ধকরী।

জোয়ান চরিত প্রণয়ন করিয়া কৈলাস বাবু ভারত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। প্রথমই সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে মণিপুর বিবরণ শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন অতঃপর তিনি গৃহে বসিয়া পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হইলে পরে "হিউয়েন্থসাঙের" বাঙ্গালা ভ্রমণশীর্ষক প্রবন্ধ সুবিখ্যাত "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। সম্পাদক প্রাপ্তিমাত্রই ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়াই তিনি ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতে থাকেন। কয়েক মাস গত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আহ্বানমতে কৈলাস বাবু পল্লী ছাড়িয়া কলিকাতায় গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি ঢাকা নগরীতে উপনীত হইলে, বান্ধব-সম্পাদক রায়বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। সম্পাদকের ঐকান্তিক অনুরোধে ঢাকা বসিয়াই "দিনাজপুর স্তম্ভলিপি" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। তৎপর কলিকাতা আসিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবু ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতা গমনের তিন মাস পরে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু কৈলাস বাবুকে তাঁহাদের উড়িষ্যাস্থিত জমীদারীর শাসনভার প্রদান করিয়া কটক জিলার অন্তর্গত "অরছিলি" নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় যাইয়া "উড়িষ্যা যাত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশ করেন। ইহার পর তাঁহার "উড়িষ্যার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। জমীদারীর শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াও কৈলাস বাবু ভারতী ও বান্ধব পত্রিকায় নিয়মিত লেখকের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে ও কৈলাসবাবু সহকারীসম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এক সময়ে সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত সহকারী সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর একটি সামান্য পুস্তকও তাঁহার অনধীত ছিল না। তিনি সমস্ত গ্রন্থই মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে 'পুরাতত্ত্বদর্শী' নামে অভিহিত করিতেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে কৈলাসচন্দ্র গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। তৎকালে এ দেশে গীতার বহুল প্রচার ছিল না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের লোক ইচ্ছাসত্বেও গীতাপাঠের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। কৈলাসবাবু দেশের লোকের সেই অভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং গীতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। ভগবৎকৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবতগীতার এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচার করেন। তন্মধ্যে কৈলাস বাবু যে এক সুচিন্ত্য সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছেন। গীতার এই অভিনব সংস্করণের ভূমিকা পাঠ করিয়াই দেশের বহুল লোক গীতাগ্রন্থে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। "বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় প্রবন্ধ-

লেখককে বলিয়াছেন ;—তৎকালে কৈলাস বাবুর গীতায় যুবকগণের যেরূপ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ইহার কিছুকাল পর কৈলাসবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "দারুব্রহ্ম" নামক পুস্তিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইতিহাস প্রদান করেন। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করেন এবং অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনচিত্র অঙ্কিত করেন। অনন্তর ৺কৈলাসচন্দ্রের মোহমুদ্গর, হস্তামলক, পরাশর সংহিতা ও সেনরাজগণ গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

অতঃপর কৈলাসবাবু বাঙ্গালার বিখ্যাত সাধকগণের সঙ্গীতমালা সংগ্রহ করিয়া 'সাধক সঙ্গীত' (১ম ও ২য় খণ্ড) নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশময় একটি ভ্রম প্রচলিত ছিল যে, "রামপ্রসাদী সঙ্গীত" সমস্তই পশ্চিম বঙ্গবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের বিরচিত।* কিন্তু তিনি বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, রাম প্রসাদী সঙ্গীতগুলি সাধক রামপ্রসাদ সেন, সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচিত সঙ্গীতে সংমিশ্রিত। গ্রন্থের (৫৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী) অবতরণিকায় বহু প্রয়োজনীয় নূতন বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে।

স্বদেশ-প্রাণ কৈলাসচন্দ্র অবতরণিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—"পুণ্যভূমি ভারত অন্য বিষয়ে দরিদ্রা হইলেও তাহার একটী গৌরবের জিনিস আছে। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে, তাহার বনপ্রান্তরে, তাহার গ্রামে নগরে, যেখানে যাও সেখানেই স্বর্গীয় পারমার্থিক সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারিবে। ভারত একদিকে যেমন রম্য কানন অন্য দিকে সাধনার মনোজ্ঞ তপোবন। এই রম্য কাননে, এই তপোবনে, কত কবির, কত সাধকের জীবন স্রোত নীরবে মিশিয়াছে কে বলিতে পারে ?"

কৈলাসচন্দ্র অবতরণিকা মধ্যে চানিসপুর স্থিত শ্রীশ্রীকালীবাটীর সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর ও কুমারহট্টের সুপ্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জনের সঙ্গীতমালা সমালোচনা দ্বারা উভয়ের সাধন রাজ্যের বিভিন্ন স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈলাসবাবু গুরুতর পরিশ্রমের পর সাধক সঙ্গীত প্রণয়নে কৃতকার্য্য হন। এই সফলতাই, তাঁহাকে ভবিষ্যতে দুরূহ কার্য্যসম্পাদনে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সহকারী সম্পাদকের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া কৈলাসচন্দ্র পুনর্ব্বার জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। * এরূপে প্রায় ১০ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ৪০ বৎসর বয়সে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিবার পূর্ব্বে কৈলাসবাবু এক বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। "তিনি সঙ্কল্প করিলেন বাঙ্গালায় একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিতে হইবে। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, ঘটনার প্রতিঘাতে এই কার্য্যটী তিনি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। উপক্রমণিকাখানা মাত্র লেখা এবং মুদ্রিত হইয়াছিল। দপ্তরীর গৃহদাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও

* 'প্রতিভা' "দ্বিজ রামপ্রসাদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন ;—এই সময় তিনি সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত থাকেন। তবে তৎসময় "ঠাকুর বাড়ীর" জমীদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ গোল উপস্থিত হওয়া, কৈলাসবাবু সময় সময় জমীদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন মাত্র। জমীদারী কার্য্যে কৈলাসবাবুর প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াই "ঠাকুর বাড়ীর" কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে সময় সময় সাহায্য করিতে নিয়োজিত করেন।—কিন্তু লেখক কৈলাসবাবুর নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন যে, সেই সময় তিনি কলিকাতা অবস্থান করিয়াই ঠাকুর বাড়ীর জমীদারীকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তখন সহকারী সম্পাদকের কার্য্য অপর এক ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয়।

লোপ হইয়া যায়। কেবল একখানি কপি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। উপক্রমণিকাখানাই ৩০০ পৃষ্ঠার অধিক। ইহাতে এত বিষয় আছে যে, বঙ্গদেশে কি ইংরাজী কি বাঙ্গালার এমন কোন ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই যাহা হইতে এই সকল জানা যাইতে পারে। কিরূপ ইতিহাস লিখিবেন তাহার নমুনা স্বরূপ 'সেন-রাজগণ' নামক একটী অধ্যায় ১২৯১ সনের ভারতীতে প্রকাশ করিয়া কবিকুলভূষণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন। তাহার উপহার এক অংশে লিখিয়াছিলেন।—

'যে দিবস স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিতে করিতে পারিব সেই দিবস আমার মহাপূজা শেষ হইবে। অদ্য প্রথম অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।' কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দৈবদুর্বিপাকে এই সময় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাড়ী আসিয়াই সাধারণের মঙ্গলজনক অন্য এক গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।"*

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এক্ষণকার মত আলোচনা ছিল না। রজনী বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর ২।১ খানা গ্রন্থমাত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কৈলাসবাবু সেই সময় ভারতী, বান্ধব, নব্যভারত, তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তত্ত্ব লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি "দক্ষমাশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় পাঠককে অবগত করেন যে, গ্রীক বীর আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালেও পুণ্যভূমি ভারতে তেজস্বী ও আত্মত্যাগী ঋষি বিরল ছিলেন না। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধাবলীতে বঙ্গভাষার কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের নিকট অবিদিত নহে। ডাক্তার ৺ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রীজ এণ্ড রাইয়ত" ("Reis & Rayyut") পত্রিকায় ও ৺ নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার মিরার (Mirror) পত্রিকায় তৎকালে কৈলাস বাবুকে "মৌলিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তৎসমুদয় একত্র হইলে গ্রথিত এক সুবৃহৎ গ্রন্থে পরিগণিত হইবে। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ সংগ্রহে নিযুক্ত আছি।

ত্রিপুরা প্রত্যাবর্ত্তনের পর কৈলাস বাবু "রাজমালা" বা ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। ত্রিপুর রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। থাকিলেও তাহা জনসাধারণের গোচর হইত না। কৈলাস বাবু রাজমালা প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি প্রাচীন রাজ্যের সুবৃহৎ ইতিহাস রাখিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কলিকাতা গেজেট বলিতেছেন—

It contains a mass of interesting information and is a valuable contribution to the historical literature of Bengal.

(Calcutta Gazette, June 30, 1897).

সাহিত্য ক্ষেত্রে কৈলাস বাবু কিরূপে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপতা আলোচিত হইল। এখন আমরা তাঁহার শেষ জীবনের দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কৈলাসবাবুর কোন ধর্ম্মেই বড় আস্থা ছিল না। তিনি ন্যায় পথে জীবনযাপন করাই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ মনে করিতেন। তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়, তিনি কৌলাচারী সাধকদিগকে তান্ত্রিক মাতাল বলিয়া তীব্র উপহাস করিয়াছেন। তিনি কখন বেদান্ত চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, কখন বা ব্রহ্মোপাসনায় নিরত থাকিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মেই তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "রাজমালা" প্রকা-

* ত্রিপুরাহিতৈষী—৬ই মাঘ, ১৩২১ বাং।

শের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, গ্রন্থকার শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হইতেই তিনি একনিষ্ঠ শক্তির উপাসক হইলেন। কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রী৺ শ্যামার অর্চ্চনা করিতে থাকেন। কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের পরও কৈলাসচন্দ্রের পরিতৃপ্তি হইল না। প্রথম বয়সে তিনি গুরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু পরিশেষে হৃদয়ঙ্গম করেন মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে সময় তিনি সদ্‌গুরু লাভেচ্ছায় আকুলপ্রাণে হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থানে কতবার যে ছুটাছুটী করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। অবশেষে তিনি কোন এক মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া চিত্তে শান্তি আনয়ন করেন। অধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করিয়াও কৈলাসচন্দ্র সাহিত্য সেবায় বিরত হন নাই। এ সময় তিনি, ভারতীর চরণে "কাঙ্গালের গীত" (সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট বা ৪র্থ ভাগ), ও "কাঙ্গালগীতা" নামক দুইটি পুষ্প উৎসর্গ করেন।

কাঙ্গালের গীত বা সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট কৈলাসচন্দ্রের স্বরচিত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীত গ্রন্থে বিশেষত্ব আছে। সঙ্গীতগুলি উদার ভাবে পরিপূর্ণ। দশমহাবিদ্যা ও দশাবতার অভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাতে কৈলাসচন্দ্র ১৪৫টী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতগুলি ভক্তির উৎস। তিনি মা-হারা হইয়া কাঙ্গালের মত মা-মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তিনি একস্থানে গাহিয়াছেন——

"হয়েছে আমার মাগো ধূলা খেলা অবসান।
তব দরশন বিনে হয়েছে আকুল প্রাণ॥"

কাঙ্গাল গীতা অতি উপাদেয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা। তুলসীদাস, কবির ও মীরাবাইর ধূয়াবলীর ন্যায় কোন গ্রন্থই বঙ্গভাষায় ছিল না। কৈলাস বাবুর কাঙ্গাল গীতা দ্বারা বঙ্গভাষার সেই অভাব দূরীভূত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া চিন্তাশীল সমালোচক ৺ চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন, "কাঙ্গালগীতা অতি ক্ষুদ্র পুস্তক কিন্তু অতি গুরুতর কথায় পরিপূর্ণ। সকল কথাই অমূল্য। জীবন উন্নত ও পবিত্র করিতে হইলে এই সকল কথা জপমালার স্বরূপ হৃদয়ে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেরূপ সহজ ও সরল ছন্দে কবিতাটি লিখিত হইয়াছে তাহাতে এগুলি বিনা আয়াসে কণ্ঠস্থ হইয়া পড়িবে। এ সব কথা কণ্ঠস্থ থাকাই উচিত। কণ্ঠস্থ হইলে এই সকল কথা হৃদ্গত হইয়া যাইবে। হৃদ্গত কথায় হৃদয় সংস্কৃত হয়। সেইরূপ হইলেই কাঙ্গালগীতার সুন্দর কাজ হইবে।"

কৈলাস বাবু শেষ জীবনে ধর্ম্মচর্চ্চায়ই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু তথাপি মাতৃভাষার সেবায় একেবারে বিরত ছিলেন না তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়াও লেখনী সঞ্চালন করিতেন। সময় সময় ঢাকা রিভিউ, সাহিত্য, সৌরভ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় কিছু কিছু পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন দারুণ রোগে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত শয্যা হইতে উঠিতে অসমর্থ হইলেন, তখনও তিনি গ্রন্থালোচনায় ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার বন্ধুগণ এ সময় তাঁহাকে গ্রন্থপাঠ হইতে নিবারণ করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার চির অভ্যস্ত গ্রন্থপাঠে বিরত হইতে পারিতেন না। তিনি যখন যে পুস্তক দেখিতে পাইতেন তখনই তাহা পড়িবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িতেন। তাহার শয্যাপ্রান্তে স্তূপাকারে গ্রন্থরাজি, মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্র সমূহ সর্ব্বদাই রক্ষিত থাকিত। পুস্তক পাঠের সময় তিনি যেন সমস্ত রোগ-যাতনা বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। কৈলাস বাবু আজীবন এরূপে দিবসের অধিকাংশ সময়ই বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি কোন রজনীতেই পার্য্যমানে লেখনী ধারণ কিংবা

পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন না। বাঙ্গলা সাধকগণের জীবন-চরিত সঙ্কলনের জন্য তাঁহার তীব্র বাসনা জন্মিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি সৌরভ পত্রিকায় সাধক ৺ভুবনচন্দ্র রায় ও কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে প্রচারিত শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকায় সাধক শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত মহাশয়ের জীবনী লিখেন। * মাতৃভাষার পাদপদ্মে রামলাল বাবুর জীবনীই কৈলাস চন্দ্রের শেষ অর্ঘ্য। বিগত আশ্বিন মাসে উহা মুদ্রিত হয়। কৈলাস চন্দ্র সংস্কৃত স্তোত্রের মত বাঙ্গালা কবিতায় কতকগুলি স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এইসকল স্তব "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি উহার মুদ্রাঙ্কন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কৈলাস বাবু সাধক সঙ্গীত তৃতীয় ভাগ সংগ্রহ করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন বি, এল মহাশয়ের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থাভাব প্রযুক্তই তাহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি কৈলাস বাবুর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ "সাধক সঙ্গীত তৃতীয় ভাগ" মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর প্রীতিভাজন হইবেন।

কৈলাস বাবুর আর্থিক অবস্থা কোন দিনই বড় স্বচ্ছল ছিল না। তথাপি তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কতিপয় মাস পূর্ব্বে, তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর প্রায় অধিকাংশ মূল্যবান ইংরেজী গ্রন্থ কলিকাতা সাহিত্য পারিষদে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যসেবক উপযুক্ত স্থানেই তাঁহার উপযুক্ত গ্রন্থরাজি দান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কৈলাসবাবু চিরদিনই নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তিনি আর্থিক বশতঃ সময় সময় অপরের চাকুরী গ্রহণ করিতেন বটে কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। সে জন্য তাঁহাকে বহুবার পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিরূপে পরের অধীনে চাকুরী না করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কৈলাস বাবু বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "স্বাধীন-জীবিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করেন। বস্তুতঃ তিনি অপরের চাকুরী করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন না। কৈলাস বাবু জননী জন্মভূমির প্রতি যে কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার যে কোন প্রবন্ধ পাঠেই প্রতীয়মান হয়।

এখন আমরা কৈলাসচন্দ্রের শেষ ঘটনা বিবৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ শুক্রবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় কৈলাসচন্দ্র নির্ভীক ও প্রশান্ত চিত্তে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বন্ধুগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বলিতে থাকেন, "তোমরা দেখিতে পাইতেছ না আমার গুরুদেব—আমার মা ৺শ্যামা যে আমার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।" তাঁহার পরিবারবর্গ তখনই তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত বিবেচনা করিলেন। কতক্ষণ পর তিনি সুস্থ মনে ও সদানন্দে মা মা বলিতে বলিতে অমরধামে শ্রীশ্রী৺ শ্যামার কোলে চলিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল তাঁহার গুরুদেব "দেহরক্ষা" করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছেন। পূজ্যপাদ ৺মহাপুরুষ কৈলাসচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, যে "শেষকালে আমার দেখা পাইবে। ঘটনাও তাহাই ঘটিল। কৈলাসচন্দ্র অন্তিম সময় তাঁহার পরম দয়াল ভগবান শ্রীশ্রী৺ গুরুদেবের দর্শনলাভ

---

* বঙ্গবাসীর সুপরিচিত, "বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা। সকলই সে দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা", সঙ্গীত রামলালবাবুর বিরচিত।

করিলেন। হিন্দুর পক্ষে—ভক্তের পক্ষে—ততোধিক আর কি আনন্দ হইতে পারে? কৈলাসচন্দ্র যেমনই মহাপুরুষের কৃপার জন্য আকুল হইয়াছিলেন, তেমনই অন্তিম কালে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে হাতে লইয়া ত্রিদিব-দ্বারে লইয়া গেলেন।

আমরা কৈলাসচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিলাম। কৈলাস বাবুর জীবনী আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও আজীবন বিদ্যাচর্চ্চায় তৎপর থাকিয়া এবং মাতৃভাষার সেবা করিয়া যে, দেশের কল্যাণসাধনে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আমাদের জানিবার বিষয় বটে। তাঁহার জীবনচরিত আলোচনায় অনেক যুবক হয় ত কর্ম্মক্ষেত্রে আশায় উৎফুল্ল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারিবেন।

কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুতে মাতৃভাষা যে একটি সুসন্তান হারাইলেন তাহার স্থান কতদিনে পূর্ণ হইবে কে বলিতে পারে? ভক্ত কৈলাসচন্দ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি মর্ত্ত্যধাম হইতে অদৃশ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পারমার্থিক সত্তা ভ্রাতৃগণের হৃদয়পটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। *

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

---

* ইতঃপূর্ব্বে কৈলাসবাবুর এক সংক্ষিপ্ত জীবনী সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। স্থানীয় কয়েকজন সাহিত্যিক মহোদয়ের অনুরোধে, উপস্থিত প্রবন্ধে কৈলাসবাবুর জীবনী কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ ছিল তাহা এখন সংশোধিত হইল।—লেখক

খঞ্জন

যার চলন সুন্দর—দ্রুত এবং নৃত্যশীল—আমরা তাহাকে খঞ্জনের চলনের সহিত উপমা দিয়া থাকি। খঞ্জন নৃত্যের জন্যই বিশেষ ভাবে আমাদের নিকট পরিচিত। খঞ্জন সংস্কৃত শাস্ত্রে খঞ্জরীট নামেও কথিত।

খঞ্জন জাতীয় নানা শ্রেণীর পাখী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকলই আমাদের দেশে খঞ্জন নামে পরিচিত নহে।

খঞ্জন একহারা ছিপছিপে লম্বা চেহারা বিশিষ্ট। ইহারা ৭—৯ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। খঞ্জন বড়ই চঞ্চল পাখী। ইহারা এত দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া যায় যে তখন তাহাদের পা দুইটী যেন লক্ষ্যই হয় না। ইহাদের পা অত্যন্ত সরু, কৃষ্ণাভ, এবং প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা; প্রতি পায়ে চারিটী আঙ্গুল। নখ ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ। পায়ের তলা কোমল এবং ঈষৎ চেপ্টা। এজন্য ইহারা সামান্য কাদার উপরেও অনায়াসে দৌড়িতে সমর্থ হয়। খঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গ সাদা। খুব ধবধবে সাদা নয়। ডানা দুটী ধূসর। তাহার মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কালো রেখা টানা আছে। মস্তকের পশ্চাদ্দিক ঘনকৃষ্ণ। ঠোঁটের নিম্নভাগ সাদা। গলায় ঘনকৃষ্ণ পালকরাজি এমন সুন্দর ভাবে সাজানো যে তাহা দেখিয়া আমাদের দেশে একটী প্রবাদেরই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

প্রবাদটী এই—খঞ্জন এক সময় ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। সে মার নিকট খাবার চাহিয়া কাঁদিত, মা রোজই বলিতেন, "ঠাকুরের খাওয়া না হইলে কি খাইতে আছে?" বালক মার কথায় বড় কষ্টে ক্ষুধা দমন করিত; অবশেষে একদিন ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সকল গোলযোগের আধার 'শালগ্রাম' ঠাকুরটীকেই গিলিয়া ফেলিল। ঠাকুরও বালকের গলায় গিয়া আটকাইয়া রহিলেন। এমন সময় তাহার মা আসিয়া সমুদয় বিষয় জাত হইয়া বালককে

কৃত পাপের জন্য পাখী হইতে অভিশাপ প্রদান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল— শালগ্রাম তাহার গলায় আটকাইয়াই রহিলেন। বিষপানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মত ঠাকুর ভক্ষণে খঞ্জনও কৃষ্ণকণ্ঠ হইয়া রহিল। শালগ্রাম গলায় থাকায় খঞ্জনের সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়াছে।

খঞ্জনের ঠোঁট প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এবং তীক্ষ্ণাগ্র। ডানা হালকা ও মজবুত। সজোরে পাখার ঝাপটা মারিয়া পাখা গুটাইয়া ইহারা উড়িয়া যায়। খঞ্জন খুব দ্রুত উড়িতে পারে। ইহাদের পুচ্ছ লম্বা এবং অত্যন্ত সুন্দর। চলিবার সময় নৃত্যশীল খঞ্জনের মাথা হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই দুলিতে থাকে। খঞ্জনের চক্ষু দুটী অতি ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল কাল, অতিশয় মনোরম এবং সর্ব্বদা অতিমাত্রায় চঞ্চল। চক্ষুর চারিদিকে পাতলা কাল রঙের একটী সরু বেষ্টনী। বেষ্টনীর নীচে মেটে রঙের একখানি খুব পাতলা পরদা। 'খঞ্জন-নয়না' রমণীগণ সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা বলিয়া অন্ততঃ কবি-প্রসিদ্ধি আছে।

খঞ্জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। জলাশয়ের সিকতাময় ভূমির ধারেই অনেক সময় খঞ্জন বিচরণ করিয়া থাকে এবং আহারের সন্ধান লয়। খঞ্জন অত্যন্ত তীব্রগতিতে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। শিকার ধরিবার সময় ইহারা প্রায়ই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না, এবং যথেষ্ট তৎপরতার সহিত শূন্যে থাকিয়াই একটী পতঙ্গকে গলাধঃকরণ করিয়া পর মুহূর্ত্তেই গতি পরিবর্ত্তন করতঃ অপর পতঙ্গের উপর পতিত হয়। মাঠে, জলের ধারে, উঠানের পার্শ্বে বা গোবর-গাদার কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ধরিবার জন্য খঞ্জন দ্রুত পদসঞ্চারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে।

খঞ্জন সাধারণতঃ নিম্নবঙ্গেরই অধিবাসী। আমরা বার মাস খঞ্জন দেখিতে পাই না। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নাকি ইহারা আমাদের দেশে শুভাগমন করে। বিজয়া দশমীদিনে খঞ্জন দর্শনের বিভিন্ন ফল আছে, এরূপ প্রবাদ বঙ্গপল্লীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিভিন্ন দিকে খঞ্জন দর্শন করিলে বিভিন্ন ফল লাভ হয়। বঙ্গপল্লীর বৃদ্ধা মহিলাগণও এই অত্যাবশ্যক জ্যোতিষ শাস্ত্রটী অবগত আছেন। তবে শিক্ষিত সমাজ অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখীর অতবড় কর্ত্তৃত্বও মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই পঞ্জিকাকারগণও জ্যোতিষের এই অনাবশ্যক (?) শ্লোকটী গ্রহণ করেন নাই। আমরা আবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিব।—

বিত্তংব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশেভয়ং
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিষিকলির্ভিঃসমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধ সলিলং দিব্যাঙ্গনাচোত্তরে—
ঐশান্যাং মরণংধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণংখঞ্জনে।

অর্থাৎ—ঊর্দ্ধদিকে খঞ্জন দেখিলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণ দিকে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতে কলহ, পশ্চিমে লাভ, বায়ু কোণে উত্তম বস্ত্র গন্ধ ইত্যাদি লাভ, উত্তরে উত্তমা পত্নী লাভ এবং ঈশান কোণে মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বিজয়া দশমী হইতে লক্ষ্মী পূর্ণিমা, কেহ বা দশদিন পর্য্যন্ত উক্ত বিধান মানিয়া থাকেন।

খঞ্জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে—অত্যন্ত নিরালায় খড় কুটা দ্বারা বাসা তৈয়ার করে। কখন কখন নিবিড় ঝোপ মধ্যস্থ কোনও গাছের শিকড়ের বেষ্টনীর মধ্যে শুষ্ক শেওলা, পালক, ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া লয় এবং তাহাতে ৩.৪টী ডিম্ব প্রসব করে। কেহ কেহ বলেন খঞ্জন বৎসরে ৩।৪ বার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু আমি বিশেষ অনুসন্ধানেও তেমন প্রমাণ পাই নাই। খঞ্জন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে একবার এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ডিম্ব প্রসব করে। ডিমগুলি ছোট কুলের মত। খঞ্জন কয়েক দিন পর্য্যন্ত ডিমের উপর কোমল পালক বা তুলা, সূতা বা তেমন কোনও পদার্থ ঢাকা দিয়া তাহার উপরে স্বয়ং পড়িয়া

ডিমে তা দেয়। সাপ, বেজী, কাক প্রভৃতি ইহার বাসার সন্ধান পাইলে শাবকগুলি আর জগতে বাহির হইবার অবসর পায় না।

প্রবাদ, বর্ষাগমে খঞ্জন পালকপরিবর্ত্তন করে।

খঞ্জন মিহিস্বরে অস্বচ্ছ রাগিণীতে গান গায়। উষা সমাগমে উঠানেও খঞ্জনের আগমন হয়, এবং উঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাগুলি ধরিয়া আহার করে এবং মিষ্টস্বরে গান করিয়া থাকে। তখনও গৃহস্থের নিদ্রালস-বিজড়িত নয়নে উষা-সুষমা-সন্দর্শের সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। তখন উঠানের কোণায় দাঁড়াইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া মাসকীর্ত্তনের * বাবাজী গান গায়—

"উঠ উঠ——
রাধেজী গো খঞ্জনে আঙ্গিনা বেড়ায়"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

——

কুলের মাগনের ছড়া

যখন শস্য-শ্যামলা বঙ্গপল্লীর প্রান্তরে প্রান্তরে সরলপ্রাণ রাখাল বালকগণ কৃষকের প্রধান সম্বল গোসকল নিয়া, সরল ভাষায় রচিত গ্রাম্য গান সকল গাহিয়া বেড়াইত, যেই সময় গোসকল হিন্দুর অন্যতম দেব বলিয়া পূজিত হইত; হিন্দুগণ গোক্ষুরে জল না দিয়া, গোকে খাদ্য না দিয়া, জলগ্রহণ করিত না: সেই সময় গোর মঙ্গলের জন্য নানাবিধ পূজার বিধান ছিল। তাহার এক প্রকার পূজার জন্য পৌষমাসের প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ দলে দলে বাহির হইয়া একপ্রকারের "ছড়া" গান করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিত। সেই ভিক্ষালব্ধ চাউল ও পয়সা দ্বারা পৌষ সংক্রান্তির দিন, মাঠে গোসকলের মঙ্গলের জন্য পূজা দিত। পূজান্তে সেই পূজার প্রসাদ পরম আহ্লাদ সহকারে সকলে গ্রহণ করিত। আজও বঙ্গের অনেক পল্লীতে সেই সকল প্রাচীন রীতি-নীতির খানিকটা বিদ্যমান আছে। এইগুলি আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত। আবহমানকাল যাবৎ নিরক্ষর কৃষকগণ সেই প্রাচীন রীতি-নীতির স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করিয়া আসিতেছে; দুঃখের বিষয়, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। কয়জন শিক্ষিত লোক এই নিরক্ষর কৃষককুলের এই উৎসবে যোগদান করিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন? এই আড়ম্বরহীন গ্রাম্য পূজাও যে আমাদের প্রাচীন সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র। যাউক সে কথা। এই ক্ষুদ্র লেখক প্রাচীন গান সংগ্রহ করিতে যাইয়া ইহার দুই চারিটি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছে। কোন্ সময়ে কে ইহাদের রচনা করিয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। তবে ভাষা দৃষ্টে ইহা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই দেশে এইগুলিকে "কুলের মাগন" বলিয়া থাকে। ঢাকা জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে ইহার বহুল প্রচার। গোসকলকে বাঘের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই পূজা বা সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই ইহার প্রচলন আছে। হিন্দুগণ বাঘের মূর্ত্তি

* "মাসকীর্ত্তন" সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল—লেখক।

বিয়া—২৪ গণ্ডা; কোন স্থানে ৩২ গণ্ডা।

গুয়া—সুপারি।

না—নিষেধার্থক নহে। ৺ স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "ছুইত না মাগো তাদের দেশ" প্রয়োগ করিয়াছেন।

নি—কি।

গোট—সকল।

বাথান—গোচারণ ভূমি।

পুজির ভাই—গালি—দেশজ ভাষা।

প্রস্তুত করিয়া পূজা দিয়া থাকেন। মুসলমানগণ বাঘের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া থাকেন। কৃষক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই এই প্রথার আধিক্য দেখা যায়।

(১)

বড় বাড়ীর বড় ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
বাইর কইরা দে বিবি পান বাটা ভরা গুয়া॥
বাটা ভরা গুয়া না রে পাঁচ পীরে খায়।
পাঁচ পীরে খাইয়া না রে গোয়ালবাড়ী যায়॥
গোয়াল-ঝি, গোয়াল-ঝি, দৈ নি আছে ঘরে।
গোট গরু পাথানে গেছে, দৈ নাই আমার ঘরে॥
থাক্ থাক্ গোয়ালের ঝি তোর নি লাগাল পাই।
এমন কইরা দিবে গাইল ঠাকুর কানাই॥
ঘারে মরব গোয়াল রে বাথানে মরব গাই।
অয়বান্ পাথারে মরব রাখাল পুঙ্গির ভাই॥

এই ছড়াটীতে আমরা "কুলের মাগনের" বিষয়ের কতকটা আভাস পাইয়াছি। ছড়াটীতে মুসলমানের পাঁচ পীর এক বড় বাড়ীতে যাইয়া পান খাইয়া কোনও গোয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দধি চাহিয়াছেন। গোয়ালিনী দধি-না দেওয়ায় পাঁচ পীর অসন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর কানাইর সহযোগিতায় গোয়ালিনীকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা গরুবাছুরের ও নিজেদের অনিষ্ট হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গরু-বাছুরের হিতার্থে ভিক্ষা করিয়া পূজা করিত। ভিক্ষা করাটা বোধ করি পূজার একটী অঙ্গ। সেই জন্যই আজ পর্য্যন্তও ভিক্ষা করার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(২)

আইলাম রে অরণে, লক্ষীবিবির চরণে।
লক্ষী বিবি দিল বর, চাইল কড়ি বাইর কর॥
চাইল দিয়া না দেয় কড়ি, বার মাস তার লড়িগড়ি।
লড়িগড়ি স্তাব রে, সোনা বান্ধা থাম রে।
সোনার হালুকা বাঁশ, আগ দুয়ারে থুইলাম হাঁস।
হাঁস ফালাইয়া দিলাম লড়, পায়রা পাইলাম বত্রিশ জোড়।
পায়রার নাম ডাকসুয়া, বাঘমারারা খায় গুয়া॥
গুয়া খায় আর কড়মড়ায়, দুই দাঁত তার ফরফরায়।
দুই দাঁত না রে দুই মূলা, ধান বাইর কর চাইর কুলা॥
ধান নয় রে টাকা-কড়ি, পাইলে সে নড়ি।
এক টাকা পাব রে, বাইণা বাড়ী যাব রে।
বাইণা বাড়ী ঘুঘুরের বাসা, লবণ বিকায় পয়সা পয়সা।
হিয় রে, হিয় রে, চারিটা পয়সা দিয় রে।*

এই ছড়াটিতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। যাহারা ভিক্ষা করে তাহাদের ভিক্ষা প্রাপ্তির পক্ষে দুই চারিটা কথা আছে। এইটী বোধ করি শুধু এই জন্যই রচিত হইয়াছে।

(৩)

হটু রে বাঁশ পাতা, মিঞা সায়বের সাত বেটা॥
সাত বেটা না সদাগর, সোনার টুপি মাথার ধর॥
ভিক দেও পলানের বেটি, চইলা যাই আরেক বাড়ী॥
আরেক বাড়ী মথুরার কুল, হাইটা যাই সমুদ্দুর।
হাতে বইটা ঘাটে নাও, সমুদ্দুর পার হৈয়া যাও।
সমুদ্দুরে বিন্ধিল কাঁটা, এই বাড়ীর বুড়ির গলায় সোনার পাটা। †
হিয় রে, হিয় রে, চারিটা পয়সা দিয় রে।

---

* অরণে=অরণ্যে।
বাইর=বাহির।
লড়িগড়ি=বিপদ।
হালুকা=নরম।
লড়=দৌড়।
জোড়=দুটাতে একজোড়।
কড়মড়ায়=কটমট্ শব্দ করে।
ফরফরায়=আড়ম্বর দেখায়।

† হটুরে—অর্থশূন্য। ভিক্=ভিক্ষা। পলান=মুসলমানদের উপাধি, হিন্দুদের মধ্যেও আছে; পাটা=অলঙ্কার বিশেষ।

এইটীও ভিক্ষার সহায়তা করিতেছে। গৃহস্থকে একটু বড় বানাইয়া ভিক্ষুকমাত্রেই বর্ণনা করিয়া থাকে।

(৪)

আইল রে সোনার ঠাকুর আইল আর একবার।
হস্তী ঘোড়া লইয়া দরিয়া হৈল পার।
পার হইয়া দরিয়া অরণে করল থানা।
নল খাগড় ভাজিয়া সাজাইল পাটের বেনা।
পাটের বেনা পাটের বেনা পাটের কি বা দোষ।
কুচ-বরণ কন্যা, চাঁদ-বরণ মুখ।
তাই দেখাইয়া সোনা রায় গাও হেলাইয়াছে।
দেবপুরীর চারি কন্যা বাও দিতেছে।
হাউলার দিব হাল লড়ি গোয়ালেরে দিব গাই।
নিধনের ধন দিব তার ত সীমা নাই॥ *

এটা দ্বারা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে এই প্রকার অনুমিত হয় যে, কোনও কবিতারচক রাখাল বালকদিগকে এই কবিতাটী রচনা করিয়া দিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে রচিত হইল তাহা কবিতা পাঠে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

(৫)

ছিকা লড়ে ছিকা লড়ে ঝরঝরাইয়া টাকা পড়ে।
একটা টাকা পাইলাম রে বাইণা বাড়ী গেলাম রে।
বাইণা বাড়ী ঘুঘুর বাসা মুন খায় মালসা মালসা।
সেই মুন কিনিয়া খায়।
সবে বাঘের বয়ান গায়।
বাঘায় গেল নাগালপুর,
কিনা আনল চাম্পাফুল।
চাম্পাফুল মস্ত মান।
হাইসা গিন্নী কর দান
দান না পয়সা কড়ি;
তাই পাইলে সে ঘোরা লড়ি।
লড়িগড়ি শ্যামরে,
সোনার বান্ধা খাম রে।
সোনার হালুকা বাঁশ।
দুই দুয়ারে দুইটী হাঁস
হাঁস দেইখা দিলাম লড়।
পায়রা পাইলাম বত্রিশ জোড়;
পায়রার নাম ডাকসুরা।
বাঘমারারা খায় গুয়া।
গুয়া খাইতে কিবা গুণ
পান্থা ভাতে ছটাক মুন।
ছটাক মুন না ছলবলা।
দুই দাঁত তার খলখলা।
দুই দাঁত না দুই মূলা
ধান বাইর কর চাইর কুলা
যে দিবে কুলার আগে
তারে খাবে বনের বাঘে। †

পূর্ব্বোক্তগুলির মত এটীও ভিক্ষার জন্যই রচিত হইয়াছে। তবে বাঘ মারার কথায় বুঝাইতেছে যে নিজেদের পালিত পশু বাঘের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঘমারারা গুয়া খায় উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি কুলার আগে (অর্থাৎ অল্প) ভিক্ষা দিবে তাহাকে বাঘে খাবে। স্ত্রীলোকগণ সরলপ্রাণ রাখাল বালকদের এইসকল তানলয়যুক্ত ছড়া গান শুনিয়া বাস্তবিকই ধানচাউল বেশী দিয়া থাকেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

---

* দরিয়া—সমুদ্র। অরণে—অরণ্যে। বেনা—কতকগুলি পাট একত্র পাকাইয়া বেণীর মত করা হয়। কুচ—এক প্রকার লাল গোটা। বাও—বাতাস। হাউলা—কৃষক।

† মালসা—এক প্রকার মাটির বাসন বিশেষ। বয়ান—গীত, বাক্য।

ভোঁওরের শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী

ভোঁওরের ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা বহুদিন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, মূর্ত্তিখানি দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই ছিল, এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যে বরেন্দ্র ভূমির পল্লীতে পল্লীতে দেবমন্দিরের ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়, সেই বরেন্দ্র ভূমির ৩।৪ স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ও এক স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তিকে কালী বলিয়া পূজা করিতে আমি নিজে দেখিয়াছি। সুতরাং ভুবনেশ্বরীর কথা শুনিয়া সময় সময় মনে হইত যে, এ স্থানেও বোধ হয় শক্তি মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বিষ্ণু মূর্ত্তিই দেখিতে পাইব।

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আমরা সন্ধ্যার সময় ভোঁওরে পহুঁছিলাম। রাত্রিতেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমাদিগের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। আমাদিগের তাম্বুর অতি নিকটস্থ ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, সুতরাং প্রাতে উঠিয়াই শ্রীমূর্ত্তি দেখিব ইহাই স্থির করিয়া রাখিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মন্দিরের নিকট যাইয়া দেখি, মন্দির-প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ, মন্দিরের খিলান ভগ্ন ও পতনোন্মুখ। মা যে কবে এই মন্দিরে সমাহিতা হইবেন তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, দেবী খুব জাগ্রতা; সুতরাং অস্নাত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, এবং চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে মূর্ত্তিখানি ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। স্থানীয় হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহারা শ্রীমূর্ত্তির নিকট যাইতে ভয় পায়। কতক্ষণ পরে স্নান করিয়া মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলাম। মন্দির-দ্বার মন্দিরভগ্ন ইষ্টকে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আমাদিগের সঙ্গের লোকেরা এই সব পরিষ্কার করিয়া দিলে ভিতরে যাইয়া দেখি, শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গের অধিকাংশ স্থানই একখানি কাপড়ে আবৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে মায়ের প্রত্যহ পূজা হইত, এখন এই বরেন্দ্র ভূমিতে পূজক ব্রাহ্মণের অভাবে মায়ের পূজা বৎসরের মধ্যে একবার দেওয়াও কঠিন হইয়াছে। এই ভোঁওরের অতিনিকট দেবগ্রাম, বামনপাড়া, জম্বিহার প্রভৃতি গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এখন এখানে ২।৩ ঘর ব্যতীত আর ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণ-বাসের স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে লইয়া এই সব গ্রাম শ্মশান হইয়াছে। দেবগ্রাম বামনপাড়া কালের প্রভাবে এখন সাঁওতাল পাড়ায় পরিণত হইয়াছে। গত চৈত্র মাসে বান-ব্রতের সময় এই শ্রীমূর্ত্তির পূজা হইয়াছিল। এখাকার পূজার প্রথা অনুসারে সেই সময় পূজক ব্রাহ্মণ এই কাপড়খানি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমি নিজে এই কাপড় সরাইবার অধিকারী নহি, সঙ্গে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ছিল, কি জানি কেন তাহাদিগকেও শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দিতে ইচ্ছা হইল না। সৌভাগ্যক্রমে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সংবাদ পাওয়া গেল। তিনি আমাদিগের কথা শুনিয়া স্নান করিয়া আসিয়া কাপড়খানি সরাইয়া মূর্ত্তিখানি দেখার সুবিধা করিয়া দিলেন।

আমি নানাস্থানে পাষাণময়ী বহু প্রাচীন শক্তি মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন প্রসন্নবদনা হাস্যমুখী শান্তিমূর্ত্তি আর দেখিয়াছি এমন মনে হয় না। প্রথম দর্শনে মায়ের হাতে ত্রিশূল দেখিয়া আতঙ্ক উপস্থিত উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই অভয়ার হাস্যময়ী মুখ দেখিলে তদণ্ডেই আতঙ্ক অন্তর্হিত হয়। এই কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না। আমি ভক্ত নহি, তথাপি শ্রীমূর্ত্তির প্রথম দর্শনে আমার মনে এই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল।

মূর্ত্তিখানি উচ্চতায় প্রায় ২½ হাত, প্রস্থে প্রায় ১ হাত।

মূর্ত্তির উপরের চালিখানি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে প্রবাদ এই যে, দেবীর মস্তকে মাণিক্য ছিল। সেই মাণিক্যখানি খুলিয়া লইবার জন্য শ্রীমূর্ত্তির এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইহা কালাপাহাড় বা তৎপরবর্ত্তী কোন ছোট কালাপাহাড়ের কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

মূলমূর্ত্তি চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা দণ্ডায়মানা। বামদিগের নীচের হস্তে একটী মঙ্গল-ঘট, উপরের হস্তে করমালা. দক্ষিণ দিকের উপরের হস্তে ত্রিশূল, আর নীচের হস্তে মা আমার অভয় মুদ্রা দেখাইয়া জনগণকে অভয় দিতেছেন। মস্তকের কেশদাম খোঁপার আকারে উপরি উপরি দুই থাকে বাঁধা। গলায় হাঁশা ও মালা. কর্ণে কড়ি, হাতে তার বলয় ইত্যাদি অলঙ্কার. নাভির উপরে পদক. পরণে কাপড় পদ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে. পরণও নূতন ধরণে। বক্ষ উন্মুক্ত, কাঁচুলি নাই, পায়ে নূপুর ও অন্যান্য অলঙ্কার আছে। বামদিকে একটী উলঙ্গ নর মায়ের হস্তধৃত মঙ্গল-ঘটের নীচে এক হাত তুলিয়া দণ্ডায়মান. দক্ষিণ দিকে একটী প্রকাণ্ড শিবা, সন্নিকটে সাধক যুক্তকরে একনিষ্ঠ ভাবে অৰ্দ্ধোপবেশনে ধ্যানে মগ্ন। সাধক সাধনার উপযুক্ত স্থানই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। মা এক হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া সাধকের বিভীষিকা দূর করিতেছেন, অপর হস্তে সাধককে অভয় দিতেছেন। একটি স্বতন্ত্র প্রস্তরের পদ্মাসনের উপরে মূর্ত্তিখানি অবস্থিত রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে ৩।৪টী বড় বড় শিবলিঙ্গ রহিয়াছে, একখানিরও গৌরীপাট নাই।

কলিকাতার আর্টষ্টুডিও কর্ত্তৃক প্রকাশিত দশমহাবিদ্যার ছবিতে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, সেই মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। অভিজ্ঞদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম, দশমহাবিদ্যার ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আর্টষ্টুডিওর ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে এই মূর্ত্তির পূজক ছিলেন বলিয়া এখাতে প্রকাশ, তাঁহাদিগের বংশ এখন প্রায় নির্ব্বংশ। দুই একটী বালক ভিন্ন কেহ নাই। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সেই গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ আছেন, ইনি একজন তান্ত্রিক বলিয়া এখাতে খ্যাত। তিনি অনেক দিন এখাতে পূজাও করিয়াছেন। তাঁহাকে আনাইয়া আমি এই মূর্ত্তির ধ্যান ও পূজার মন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, যে মন্ত্রে এবং যে ধ্যানে ইঁহার পূজা হয় এই মূর্ত্তির সহিত সেই ধ্যানের বা মন্ত্রের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

মন্দিরের বাহিরে কয়েকখানি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির অংশ ও ৩।৪ খানি বড় বড় কৃষ্ণপ্রস্তরের চৌকাট পড়িয়া রহিয়াছে। আর আছে একটী শ্বেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড উদুখল। প্রবাদ যে ইহাতে শিবের ভাঙ্গ ঘোটা হইত।

মন্দিরটীর বয়স একশত বৎসরের কম বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিখানি অতি প্রাচীন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিখানি নিকটেই বোধ হয় কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বহুকাল পরে বর্ত্তমান মন্দিরে মূর্ত্তিখানি আনীত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির পূজার ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে জমিদার-প্রদত্ত বার্ষিক প্রায় ৫০৲ আয়ের জায়গির জমি এখনও রহিয়াছে। এই মহালের তহশীলদার শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সিংহ রায়ের যত্নে এখনও বৎসরে একবার মায় পূজা হয়।

এই ভোঁওর গ্রামখানি অতি বৃহৎ। থাক ম্যাপে দেখিয়াছি, ইহার পরিমাণ প্রায় ৪০০০৲ বিঘা। বর্ত্তমানে ইহা কুমারগঞ্জ থানার অধীনে। গ্রামের পূর্ব্ব সীমানায় আত্রেয়ী নদী প্রবাহিতা, দক্ষিণে নদীতুল্য দিস নগরের খাড়ী। এই খাড়ীতে পূর্ব্বে নৌকা চলিত। গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে আর একটী ছোট খাড়ী রহিয়াছে। গ্রামখানি পুরাকালে কতদূর সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া বুঝান সম্ভবপর নহে। গ্রামের প্রতি পল্লী ইষ্টক ও স্তূপে পরিপূর্ণ, গ্রামের

পথগুলি কোন কালে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল। বরেন্দ্র ভূমির অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুষ্করিণীবহুল বহু গ্রাম দেখিয়াছি, কিন্তু শ্রেণীবদ্ধভাবে এত পুষ্করিণীর সমাবেশ কোনও গ্রামে দেখি নাই। গ্রামের প্রাচীনত্বের আরও প্রমাণ এই যে, এই পুষ্করিণীগুলির মধ্যে অনেক-গুলি ভরাট হইয়া আবাদ হইতেছে। লাল মাটির দেশে, বিশেষতঃ যে স্থানে পলি পড়িবার সম্ভাবনা নাই সেই দেশে, একটী পুষ্করিণী ভরাট হইয়া জমি হইতে কত দীর্ঘ কালের আবশ্যক, সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন।

গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১০ হাত প্রস্থ ও প্রায় ৪ হাত উচ্চ একটী রাজপথ ছিল। অনেক স্থানে পথটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর রহিয়াছে পরিখাবেষ্টিত বহু ছোট ও বড় বাড়ীর চিহ্ন। পরিখা-বেষ্টিত এত বাড়ী যোগীর ঘোপার নিকটবর্ত্তী আমইর গ্রাম ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্ব পারে ভোঁওর হইতে এক ক্রোশ মধ্যে মহিপুর নামে গ্রাম মহীপালের স্মৃতি বহন করিতেছে। যে নদীর এক পারে মহীপালের প্রতিষ্ঠিত মহিপুর, মহিমগর, মহিসন্তোষ, সেই নদীর অপর পারে এই ভোঁওর। ভ্রামরি নামে কোন দেবী আছেন কি না জানি না। এই ভ্রামরি নাম হইতে এই ভোমর, বা ভোঁওর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা ভুবনেশ্বরী নাম হইতেই ভোঁওরি বা ভোঁওর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার বিচার ঐতিহাসিকগণই করিবেন।

বর্ত্তমানে গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে মুসলমানই বেশী। তৎব্যতীত কয়েক ঘর কর্ম্মকার মাহিষ্য ও বৈরাগী আছে। ইহারা ৩।৪ পুরুষের বাসিন্দা। এতৎব্যতীত বহু সাঁওতাল এই স্থানে বসত করিতেছে।

একদিন যে স্থানের প্রতি পল্লীতে দেবালয় হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় পবিত্র শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি উত্থিত হইত, এখন সেই স্থানেই সেই সন্ধ্যায় সাঁওতালগণের মাদোলের ধ্বনি উত্থিত হয়। যিনি অন্ধকারের পর আলো ও আলোর পর অন্ধকার আনেন, তাঁহার বিচারে না কি ইহা নূতন নয়। তাঁহার না কি ইহাই নিয়ম।

শ্রীদেবেন্দ্রপতি রায়।

আসিবে *

মোরে

ছাড়িলে কি দোষে কহ!
তুমি যে আমার কাঙ্গালের ধন;
পূজিবে তোমারে কে আর এমন?
সাধিবে তোমারে আমার মতন
কে বা এত অহরহ?

কাঁদিবে কে আর এত আঁখিজলে?—
ডাকিবে এমন 'এসো' 'এসো' বলে?
দহিবে এমন পলে পলে পলে
বিরহেতে দুঃসহ?

ভেবে গো না পাই পরাণের সাথী!
বিফলে কেমনে মালা গাঁথি 'গাঁথি'
কাটিব দীর্ঘ এ জীবন রাতি
সহি আজি এ বিরহ!

করি নাই দোষ মনে জানি ঠিক,
চেয়ে আছি আজো আঁখি অনিমিখ,—
আসিবে আবার উজলিয়া দিক
পাষাণী ত তুমি নহ!

শ্রীদুর্গামোহন কুশারি।

---

* প্রকাশিতব্য গীতি-কাব্য "মর্ম্ম" হইতে।

এহারে দেখিয়া ভোলে পড়িবেক মিন।
একে দেখ ষোলশত আমার সতীন॥
হের গো নাটুয়া তোমারে আমি বলি।
যাটাভরি ধন দিব তুমি যায় চলি॥
প্রসাদ দিবাম আমি বসন ভূষণ।
এথা হতে তাজি তুমি করহ গমন॥
তোমাকে যে বলি তুমি মুখ্য পাটেশ্বরী।
বিনে নাট গীতে দান লইতে না পারি॥
শুনিয়া আইল এথা মিন বড় দাতা।
নাট গীতে.....................কথা॥
ইন্দ্রের নাটোয়া আমি ধনের নাই অন্ত।
কি করিব ধন আমি হই কীর্ত্তিবন্ত॥
বিনে দরশনে আমি ঈশ্বর মিনাই।
.........করি আমি ঘরে চলি যাই॥
ক্রোধ হইয়া ষোলশতএ দিলেক উত্তর।
ধেকা মারিয়া করিব তোরে পুরির অন্তর॥
ষোলশ বলিল যদি এতেক বচন।
জয় জয় করিয়া বলিল সর্ব্বজন॥
কেহ কেহ হাতে ধরে কেহ ঠেলা মারে।
ততক্ষণে নিল তারে পুরীর অন্তরে॥
যতীনাথে বলে দারী তুমি মোর ভাই।
আমুকার নাট গীতে যত ধন পাই॥
তাহার অর্দ্ধেক ধন তোরে দিব আমি।
মীন দরশন করি যদি দেও তুমি॥
দারি বলে আমি নাহি চাই তোমার ধন।
ষোলশর প্রসাদে নাহি দরিদ্র জীবন॥
ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি যায় চলি।
সইশ্চাএ না গেলে খাইবা দড় বাড়ি॥
ক্রোধ হইয়া যতিনাথে বলিল বচন।
এমত অনর্থ নাহি দেখি কদাচন॥
গাহনা গাহিয়া নানা দেশেতে বেড়াই।
এমন অধার্ম্মিক দেশে কবু নাই যাই॥

মিনের সভাতে আইলাম নাট করিবার।
ঢেকা মারি কৈল মোরে পুরীর বাহির॥
ক্রোধ হইয়া যতিনাথে মাদল দিল সান।
শুন শুন মিননাথ হইয়া সাবধান॥

দীর্ঘছন্দ নাচাড়ি

দিলাম মৃদঙ্গে হাত: শুন গুরু মিননাথ:
অএ বাপু কর অবধান॥
পড়িলা কদলির ভোলে: রহিলা কামিনীর কোলে:
হাড়াইলা জ্ঞান আর ধ্যান॥
মাদলে কহেন্ত কথা: কেনে গুরু রৈলা এথা:
অএ বাপু চিননি আমারে॥
তুমি গুরু মৈচ্যান্দর: যমের মাহিন্দর:
পারনি যে চেলা চিনিবার॥
শিষ্য পুত্র হই আমি: গুরু মিননাথ তুমি:
আমি ফিরে তোমারে বুঝাই॥
তিন দিন আউ আছে: যাইবা যমের কাছে:
অকারণে ঘরে আছ বসি॥
রাজরাজেশ্বর তুমি: কড়ার ভিকারি আমি:
নবদণ্ড ছত্র ধরি মাথে॥
রাজ্যসুখ হবিলাস: আপনা করিলা নাশ:
ডুবিয়া রহিলা মিন নাথে॥
না বুঝ দেশের বোল: নারীরসে হৈলা ভোল:
নিরবধি কর কেলি কলা॥
তোমার নাহি বিচার: রাজ্য হৈল ছারখার:
বিস্মরিয়া ঘরেতে রহিলা॥
তিনগুন মহাদেবা: তুমি কৈলা তান সেবা:
সব যুগী পৃথিবীতে লই॥
কদলির হৈলা রাজা: ত্রিভুবনে বড় তেজা:
নাম যশ তোমার কিছু নাহি॥
তোমার মাহমা শুনি: আইসএ যে গাইন গুনি:
দরশন করিতে তোমারে॥

তোমার সভাতে আসি : নাট করি দেখ বসি :
প্রসাদ পাইলে যাইমু ঘরে: ॥
কীর্ত্তি করি সর্ব্বদেশ : দেখহ আমার ভেশ :
তোমার সভার সম নাই ॥
ইন্দ্রের নাটোয়া যারে : অপমান পাইয়া ফিরে :
হইব কেনে তোমার বড়াই ॥
বড় দাতা তুমি মিনে : আইসে গাইন শুনিনে :
কলঙ্ক করিয়া যাইমু ঘরে ॥
যাহা রাজা মিন নাথ : আইল তোমার সভাত :
না পারিল নিত্য করিবার ॥
এমত মাদলে কহে : ছন্দে বন্দে নাথে বাহে (১) :
সর্ব্বজনে হৈল আনন্দিত ॥
পুরীমধ্যে যতজন : সব হৈল একমন :
সব আইল দেখিতে ত্বরিত ॥
শুনিয়া মাদলের ধ্বনি : মিন পুলকিত পুনি :
নাটোয়া আসিছে কোনজন ॥
চিনিতে না পারি তারে : মাদলেত কিবা বোলে :
শুনিবার বলে সর্ব্বজন ॥
নিবেদন পুনি পুনি : মাদলেত কিবা শুনি :
নাটোয়ায় চায় দরশন ॥
কমলা মোঙ্গলাএ কহে : শোন রাজা মহাশহে :
নাটোয়া আন এই তিন জন ॥

খর্পচ্ছন্দ

শুনিয়া মাদলের ধ্বনি ঈশ্বর মিনাই ॥
আম আন নাটোয়ারে দেখিবারে চাই ॥
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মোঙ্গলা কুমারী।
নাটোয়া কেমত তারে আন গিয়া ধরি ॥
রাজার মনের কথা দ্বারিএ জানিয়া।
রাজার সাক্ষাতে দ্বারি দিলেক আনিয়া ॥

গোর্ক্ষনাথ গেল যদি মিন আছে যথা।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া নামাইল মাথা ॥
গুরুয়ে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার।
আগুবাড়ি গুরু মিনে করএ হুস্কার ॥
প্রণাম করিয়া নাথে তালে দিল হাত।
রোমাঞ্চিত হৈয়া বৈসে রাজা মিন নাথ ॥
টিম্ টিম্ করিয়া দক্ষিণে দিল সান।
অম্রেত সঞ্চরিল যেন কর্ণে কৈল পান ॥
বাম হাতে যত্তিনাথে মাদলে দিল ঘাত।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্ক্ষনাথ ॥
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল।
ঝমকে ঝমকে তাল উঠে শব্দতাল ॥
নাচে ভাল গোর্ক্ষনাথ আলগ উপর।
মৃত্তিকাএ নাছোয় পাও দেখিতে সুন্দর ॥
নাচন্তি যে গোর্ক্ষনাথে মাদলের তালে।
শুনিতে সুন্দর বোলে খাগরের রোলে ॥
হাতের ঠমকে নাচে গায় নাহি লড়ে।
আপনি ডুবাইল ভগ্না গুরু আপনারে ॥
অবধান কর গুরু নোয়াইবাম মাথা।
মুখের উত্তর নাহি মাদলে কহে কথা ॥
গোর্ক্ষনাতে নাচন্তি নুপুরে ঝুনু ঝুনু।
দেখিতে দেখিতে মিন পুলকিত তনু ॥
মিনের সভাতে নাহি পুরুষের গতি।
কদলি সহিতে আছে যেন নিশাপতি ॥
মিন নাথে বলে মোর যত আছে সখি।
এমন নাটোয়া আমি কভু নাহি দেখি ॥
নাটোয়ার রূপ দেখে জগত মোহনি।
মধুর বচনে মিনে পুছে পুনি পুনি ॥
তুমি হেন সুন্দরী নাহিক ত্রিভোবন।
নিরান্তর নাটবির্ত্তি কর কি কারণ ॥
প্রথম বএস তোমার নতুন যৌবন।
হেন বৈসে স্বামী নাই কিসের কারণ ॥

(১) বাজায়।

সকলের রস তুমি নহে সতন্তর।
নাচিয়া গাইয়া খাও কিসের অন্তর॥
নাচিয়া গাহিয়া খাও কেমত পৌরুষ।
নাটোয়া হইয়া থাক তুমি সভার বশ॥
রাজপাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত।
নাটগীত এড় তুমি বড়ই কুৎসিত।
মোর ঘরে থাক তুমি হইয়া পাটেশ্বরী।
যোগলা কমলা সম তোমারে আদরি॥
ইরূপ যৌবন তোমার না কর নিষ্ফল।
আমাকে ভজিয়া রূপ করহ সাফল॥
আমি হেন রাজা নাই গুনের সাগর।
ষোলশ কদলির মাঝে আমি সে নাগর॥
ষোলশত নারী লৈয়া আপনার গুণে।
তোমারে পালিব আমি আপনার মনে॥
হাসিয়া বলিল তবে যতি যে গোর্ক্ষাই।
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই॥
কায়াঁসাধ কায়াঁসাধ (১) মাদলে সে বলে।
সর্ব্বধন হাড়াইলা কামিনীর কোলে॥
গুরু হইয়া না বুঝিলা আপনার বোল।
কায়াঁসুধা কৈলা গুরু সুখাহিলা খোল॥
অভয়ার ঘর যার অভয় ভাণ্ডার।
তাহাতে নাদিলা গুরু চৈতন্যভাণ্ডার॥
অভয়ার ভাণ্ড নিল নির্ভয় ভরিয়া।
সুধাঘর খালি তুমি আছয়ে জুড়িয়া॥ (২)

নাচয়ে যে গোর্ক্ষনাথ মুক্তে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পায় দেখিতে সুন্দর॥
মাদলে কহেন্ত কথা শুন মিন রাএ।
মাটির মাদলে কেনে মোরে গুরু কহে॥
নাট কর নাটোয়া তুমি তাল বাহ ছলে।
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বলে॥
একশিষ্য আছে মোর যতি যে গোর্ক্ষাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাবুর সিদ্ধাই॥
দুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভালে।
তুমি কেন গুরু হেন মোরে বল ছলে॥
বুড়া দেখি তুমি মোরে গুরু হেন বলি।
এমত বলিয়া মোরে যাইতে চাহ ছলি॥
বুড়া নহে দেখ মোরে তরুণা সে লাগে।
শতেক তরুণা আমি নহে মোর আগে॥
বুঝিবা বুড়ায় তেসে ধরিমু যে বলে।
দুই কুচ মৰ্দ্দিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে॥
মিনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে।
না বুঝ আমার গুণ ধরিমু যে বলে॥
কাচুলি ফারিয়া তোর খসাইমু কবরি।
আমার বাড়ীতে আসি যাইতে নারে ফিরি
আচল ধরিয়া নিমু মিনাইর পুরী।
তবে সে জানিবা তুমি বিদ্ধের গাবুরালি॥
গোর্ক্ষে বলিল তবে বুকে মারি ঘাত।
না বল না বল বাপু গুরু মিননাথ॥
(মোর) স্বামী গোর্ক্ষনাথে মোরে কৈল বিহা।
বিহা করি নাথে মোরে গেলেন ছাড়িয়া॥
বিহা করি প্রভু মোরে না করিল ঘর।
তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তর॥
শুনিয়াছি তান গুরু তুমি মচ্যান্দর।
হেন বাক্য বল তুমি কিসের অন্তর॥
জির্ব্বাতে কামড় মারি মাথা কৈল হেট।
না চিনিয়া পাপ কৈল বচন প্রকট॥

---

(১) কায়ের সিদ্ধতা সম্পাদন কর; শব্দটি মাদলের ধ্বনির অনুকরণ কিন্তু গূঢ় অর্থ যুক্ত।

(২) এই চারিছত্রে কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দেহ ভগবানের গৃহ এবং অভয়প্রদ জ্ঞানের ভাণ্ডার। অতীঃ মন্ত্রের সাধকগণ সেই ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানধন সংগ্রহ করার পরিবর্ত্তে তুমি সেই ভাণ্ডারকে কাম সেবা দ্বারা একেবারে খালি করিয়া ফেলিতেছ এবং শূন্য ঘর খানি লইয়া বসিয়া আছ।

কহ কহ মায় মোর গোর্ক্ষ কোন ঠাই।
কথাতে আছয়ে পুত্র দরশন নাই॥
অতিনাথে বলে বাপু চিন বা না চিন।
মুই যদি ডাকম গোর্ক্ষ আসিব অখন॥
নাছএ যে গোর্ক্ষনাথে মিনের দিকে চাই।
হাতে সান দিয়া বলে গুরুরে বুঝাই॥
মাদলে কএন্ত কথা শুন মিননাথ।
নানা ছলে বাএ নাথে মাদলে দিয়া হাত॥
চিন যদি চিন নাথ না চিন যে নাহি।
হেন বিস্মরণ হৈল ঈশ্বর মিনাই॥
জানিলাম গুরুদেব নিজ মনে ভাসি।
সকল হারাইলা গুরু কদলিতে আসি॥
তা শুনিয়া যুক্তি করে কদলির সনে।
নির্ভকি না হএ এহি গোর্ক্ষ লয় মনে॥
মায়া করি আসিয়াছে যতী যে গোর্ক্ষাই।
ইহারে রাখিলে প্রভু লৈ জাইব ছলাই॥
যতেক কদলি কহে এক যে হইয়া।
নাটোয়া বিদায় কর প্রসাদ যে দিয়া॥
কমলায় বলে ভৈন নাটোয়া সুন্দরী।
নাটভঙ্গ করি যাঅ আপনার পুরী॥
যতিনাথে বলে তুমি মূর্খ (১) পাটেশ্বরী।
অধ্য (২) তালে নাট ভঙ্গ করিতে না পারি॥
নাচন্তি গোর্ক্ষনাথে মাদলে দিয়া ঘাত।
শিষ্যপুত্র চিন বাপু রাজা মিন নাথ॥
মিননাথে বলে যদি আমার গোর্ক্ষাই।
সৈম্নে (৩) ভর করি নাচ দেখিবারে চাই॥
মিনের শুনিয়া হেন স্বরূপ বচন।
আলগ আসনে নাচ করে ততক্ষণ॥
দেখিয়া যে মিননাথে চিনে বা না চিনে।
মোর গোর্ক্ষ হৈলে জলে নাচহ অখনে॥
জলেত রাখিয়া থাল নাচ কর তুমি।
তবে এ সে গোর্ক্ষ নহন (৪) জানিবাম আমি॥
মিনের বচন শুনি গোর্ক্ষে ততক্ষণ।
জলের উপরে নাচে যেমন খঞ্জন॥
এবে সে জানিল পুত্র তুমি সে গোর্ক্ষাই।
পড়েছি কামিনীর হাতে কেমনে ছাড়াই॥
না কর না কর পুত্র আমার জর্জন।
পশ্চাতে সাধিমু কায়া যেই লয় মন॥
অতিনাথে বলে বাপু ভাবে দেয় মন।
তোমার দাড়ুকা (৫) কাটি করিয়া যতন॥
মায়াবদ্ধ হৈয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান।
শরীর খাইলা প্রভু হারাইলা প্রাণ॥
কড়ার ভিখারী ছত্রধর হইয়া গেল।
ষোলশত যুবতী লৈয়া হইলা পাগল॥
মাগিয়া খাইব যুগী ঘরে ঘরে গিয়া।
আপনি করিলা নষ্ট আপনার কায়া॥
আপনি ডুবিলা গুরু আপনা পাসরি।
তোমার সকল বস্তু নারী লয় হরি॥
ডুবিল তোমার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি।
বালুচড়ে ঠেকে গুরু বাহ গড়গড়ি॥ (৬)
হরের বচন তোমার মনে নাই ভাএ। (৭)
যতেক সম্পদ তোমার তুলি দিলা নায়ে॥
ষোলশ রমণী লৈয়া কর রস কেলি।
আপনার তত্ত্বজ্ঞান মনে চাহ বলি॥
প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে।
আইল বন্দিয়া কিবা ফল আগে জল গেলে॥ (৮)
মূল কাটা গেলে গুরু না জিয়য়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে শুনিছ জিয়ে মাছ॥
শিকর কাটিলে গাছ ততক্ষণে মরে।
বিনি জলে নাহি জিয়ে জলের মাছ মরে॥
চলিতে খেলিতে গুরু নাহিক শকতি।
যার থান যুক্ত থুইয়া করিছ বসতি॥

---

(১) মুখ্য, প্রধান।

(২) অর্দ্ধ, এই পদটি হইতেই শেষে আধ, আধা আসিয়াছে।

(৩) শূন্যে। য় ঠিক ন্ন এরমত করিয়া পুথিতে লেখা হইয়াছে। দশম একাদশ শতাব্দীর খোদিত লিপিতে ন্ন ণ এর এই রূপই দেখা যায়। আর, একশত বৎসর পূর্ব্বেও এই রূপই প্রচলিত ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে প্রায় ১০ শতাব্দী ব্যাপিয়া য় এর রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(৪) হও কিনা হও! ভারী অদ্ভুত প্রয়োগ।

(৫) গ্রন্থি? দড়ি শব্দ হইতে।

(৬) তাড়াতাড়ি। দরবরি।

(৭) ঠিক ভাবে; ভাব হইতে আসিয়াছে।

(৮) এই দুই লাইন প্রায় অবিকল ভাবে ভবানী দাসের ময়নামতীর গানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৫৭। ঘর পোড়া আলো দান।

৩৫৮। মূল দেবতার পূজা নাই
সুবচনীর কুৎকুতানী।

৩৫৯। ভাত নাই ঘরে,
ছালুম চালুম করে।
ছালুম—ব্যঞ্জন।

৩৬০। জন্ম কালে ক্ষয় নাই,
মরণকালে অষুধ নাই।

৩৬১। শরীরের নাম মশয়,
যা সওয়ায় তাই সয়।

৩৬২। বরের পিসি কন্যার মাসী।

৩৬৩। কতগণ্ডা আইল গেল,
বাকী রইছে ধনা।

৩৬৪। কাপড়ের দাগ যায় ধুইলে,
মনের দাগ যায় মইলে।
মইলে—মরিলে।

৩৬৫। তাম্বুরের নাম কে না জানে,
কেবল লাজে কয় না।

৩৬৬। মিথ্যাকথার হারি,
ঘোরে বাড়ী বাড়ী।
হারি—হাঁড়ি।

৩৬৭। সুহৃদে এক থালে খায় নব্বই জন,
আসুহৃদে নয় থালে ও খায় না নয় জন।

৩৬৮। বুড়ার পো কান্দ কেন ?
বইয়া বইয়া আর কার * *,

৩৬৯। এক কান কাটা যায় গ্রামের বাইর দিয়া,
দুই কান কাটা যায় সভার মাঝ দিয়া।

৩৭০। আগে গরু অষুধ খায় না,
মরণ কালে জিহ্বা মেলে।

৩৭১। খায় না,
কেবল নাকের তলে গোজে।

৩৭২। আপনা পোলা, পরের ধন,
কে দেখে কম।

৩৭৩। যে খাইছে তারে খাওয়া,
যে না খাইছে তারে শোওয়া।

৩৭৪। যেম্নি বাপ, তেম্নি বেটা।

৩৭৫। গোবরে পদ্মফুল।

৩৭৬। পোলা কি ? যেন আটাসে,
বুড়া হইছে যেন বাতাসে।

৩৭৭। তর মনা ত বাচব না রে,
লেখতে পড়তে কইবি তুই,
ঘাড় মুচরাইয়া খাব মুই।
খেলাইব বেড়াইব দিব ফাল,
বাইচ্যা থাকব চিরকাল।*
মুই—আমি। বাইচ্যা—বাঁচিয়া।
ফাল—লম্ফ।

*এক বাপের এক ছেলে—নাম ছিল তার মনোমোহন, ডাকিত তারে 'মনা'। মনার লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ শৈথিল্য। এ দিকে বাপমার তাড়না ও গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত মনার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। একটা মাঠ পার হইয়া মনাকে পাঠশালায় যাইতে হইত। সেই মাঠের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; সকলেই উহাকে বলিত 'ভূতুরে গাছ'। রাত্রিতে ভয়ে কেহই ও পথে যাইতে স্বীকার করিত না। এক দিন খাওয়া দাওয়া করিয়া মনা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইল, কিন্তু স্কুলে না যাইয়া একটী রাত সেই বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইতে বাকী নাই, তবু মনা বাড়ী আসিল না দেখিয়া তাহার বাপ অধীর হইয়া উঠিল। মনার বাপ গুরুমহাশয়ের নিকট যাইয়া যখন শুনিল, মনা আজ স্কুলে আসে নাই, সে আরও অধীর হইল। তাই ভাবিতে ভাবিতে যখন ঐ গাছটার পাশ দিয়া চলিয়াছে তখন মনা হাঁড়ির ভিতর মুখ

৩৭৮। গাই বাছুরে ভাব থাকলে
দুধের ভাবনা কি ?

৩৭৯। পড় ত পড়,
নয় খাচা আজাইর কর।
নয়—নতুবা।
আজাইর—খালি।

৩৮০। ধান নষ্ট কইরা খই,
দুধ নষ্ট কইরা দই।

৩৮১। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩৮২। বড় নাম যার,
* ফাটে তার।

৩৮৩। ভাল্ না বাস্।
আমার মাথাই খাস্।

৩৮৪। কইলে অশ্লীক না কইলে বেল্লিক।

৩৮৫। লাই কুত্তার পাতে ভাত।
লাই—প্রশ্রয়প্রাপ্ত।

৩৮৬। প্যেটে ক্ষুধা মুখে লাজ,
সে কুটুমে নাই কাজ।

৩৮৭। পাতের ভাতে পালে কুকুর,
কুকুর উঠে কান্ধের উপুর।

৩৮৮। আর শাল * বয়।

৩৮৯। বিষকোট, তুমি কেন ছোট ?
আমার মুখখান এট্টু খোট।
এট্টু—একটু।

রাখিয়া ঐ শ্লোক আওড়াইতেই মনার বাপের বড় ভয় হইল। সন্ধ্যার আঁধারে গাছের পাতার আড়ালে মনাকে দেখিতে পায় নাই—ভীত ভাবে সে বলিল 'আমি আর তাহাকে স্কুলে পাঠাব না।' এই বলিয়া বাটী আসিল। পেছনে পেছনে মনাও অলক্ষ্য পথে বাটী আসিলে তার বাপ মা হারানিধিকে পাইয়া বড় খুশী হইয়া পুনঃ স্কুলে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

৩৯০। যার * যত গু, সে-ই করে তত থুথু।

৩৯১। আগে সংবাদ পাছে লাজ,
এমন কর্ম্মের নাই কাজ।

৩৯২। দেখা দেখি গেকা নাচে।

৩৯৩। আধা লেখার তন ধোপাও ভাল।

৩৯৪। তপ্ত চুকা কাল্ দুধ, তারে খায় নির্ব্বোধ।
চুকা—অম্ল।
কাল্—ঠাণ্ডা

৩৯৫। শেষ যার বেশ তার।

৩৯৬। হাটের আগ দরবারের পাছ।

৩৯৭। আপনা হাত জগন্নাথ।

৩৯৮। সুন্দর মাউগে দাদারেও শোভে।
দাদা—পিতামহ।

৩৯৯। কাম কর যত পার,
ভাত খাও ত আমারে মার।

৪০০। যেম্নি গাবর তেম্নি গাপর।

৪০১। বাইঙ্গার কাছে বইঙ্গা চুরি।

৪০২। খান্‌কি,
তার আবার মান কি ?
খানকি—বেশ্যা।

৪০৩। মামাগ পালে বিয়াইল গাই,
সে সম্পর্কে মামাত ভাই।

৪০৪। মোটে শনির পাওা।

৪০৫। এমন কুটুম কই বা পাই
কাটাখান থুইয়া ল্যাজাখান খাই।

৪০৬। বিয়া বাকী যদ্দিন লেখাপড়া তদ্দিন।

৪০৭। আপনের বেল্‌য় লীলাখেলা,
যত দোষ মাইন্‌ষের বেলা।

৪০৮। হাকিমও কাচারীর তন নাম্‌ল
আমারও মুখ ছুটল।
তন (থন)—হইতে।

৪০৯। মরুম বইলা করুম না, জীলে খাইমু কি ?
মরুম—মৃত্যু হইবে।
জীলে—জীবিত থাকিলে।

৪১০। বাপ বয়সে ঘোড়া নাই,
* ভরা লাগাম।

৪১১। রাজার অক্যে রাণী,
কানার অক্যে কানী।
অক্যে—হকে।

৪১২। ঘুম্‌টার ভিতর খেমটা নাচ।

৪১৩। না পাইছি নাই
কুচকুচি ত নাই।

৪১৪। বুদ্ধিমানের *
কাটা খাওয়নের যম।

৪১৫। দুষ্টেরে দেও বড় পিড়ি।

৪১৬। লেবু কচলাইলে হয় তিতা,
তাল ঘসলে শঙ্খের ঘটা।

৪১৭। নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

৪১৮। বলদে চিনে সালু আর ঘেচু।

৪১৯। কথাখান মন্দ নয়,
শুনলেই গায়ে জ্বর হয়।

৪২০। মাছ খায়েন না, যেন বিড়াল তপসী।

৪২১। সুবুদ্ধি রাজা মরণে পৃথিবী হইছে হান,
ঘুণে খাইয়া ফেলছে পূর্ণিমার চান।
চান—চাঁদ।

৪২২। যে ছাও উড়ে বাসায়ই উড়ে।

৪২৩। ডুব দিয়া জল খায়,
একাদশীর বাপেও জানে না।

৪২৪। বক 'আর ছক' তুমি কানে দিছি তুলা।
মার আর ধর তুমি পিঠে বান্ধছি কুলা।

৪২৫। চাউলেই যত আউল।

৪২৬। মাগীরা দেয় জোতা পায়,
ভাত বেগুন পইচ্যা যায়।
পইচ্যা—পচিয়া।

৪২৭। হাগার নামে বাঘের ডর নাই।

৪২৮। বইতে পারলেই শুইতে জাগা।
বইতে—বসিতে। জাগা—জায়গা (স্থান)।

৪২৯। চোরে চোরে মৌসাত ভাই।
মৌসাত—মেসোতুত।

৪৩০। মাইগ্যা আইনা বিলাইয়া খায়।
হাতে হাতে স্বর্গে যায়।

৪৩১। যে জীবের ল্যাজ নাই।
তার উপকার করতে নাই।

৪৩২। মুত্‌তে মুত্‌তে ফেনাইয়া যায়।

৪৩৩। বোকা রাম।

৪৩৪। হাতী যদি লেঁাদে পড়ে,
চামচাড়ায় তার * *

৪৩৫। চোরার পো চোরা। কিছু কইলাম না।
কইলাও না, বাকীও থুইলা না।

৪৩৬। শিং মাছ কিন্যা, এখন খাইলেও জাত যায়,
ফেললেও পয়সা যায়।

৪৩৭। দিনে বাত্তি যার ঘরে,
তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

৪৩৮। সমুখ দিয়া মশা যাইতেও সয় না,
পাছ দিয়া হাতী গেলেও চায় না।

৪৩৯। কয়লা, ধুইলেও যায় না ময়লা।

৪৪০। কয়লার খনিতে কাজ কর্ম্মে,
ময়লা আচ আছেই আছে।

৪৪১। আইতে জ্বালা যাইতে জ্বালা,
তার নাম বীমাওয়ালা।

৪৪২। কইছিলা ত এই ই,
মুখের সে ভঙ্গিখান কই ?

৪৪৩। বড় কইরা পাত পাতলে হবে কি ?
দেয়ইয়ার ওজন আছে।

৪৪৪। প্যাদার মার আর প্যাদা বিয়ায় না,
পইড়া নিতে হয়।

৪৪৫। প্যায়ান চোরে করে চুরি,
মা'গ থুইয়া নেয় খুড়ী।

৪৪৬। হাচই নাকি বউরে মারে,
গামছার বারি দিয়া তামসা করে।
হাচই—সত্যই।

৪৪৭। নাকে যেন দুধ গলে।

৪৪৮। গোড়া কাইট্টা আগায় জল।

৪৪৯। ছাই ফেলতে ভাঙ্গার কুলার আদর।

৪৫০। চিনা বামনের পৈতার দরকার কি?

৪৫১। মাকড় মারলে ধোকর হয়,
টুকটুকি মারলে গোবধ হয়।

৪৫২। ঘরপোড়া গরু সিন্দুইরা মেঘ দেখলে ভয় পায়।

৪৫৩। লম্বা লগ্‌গী কাট।*

৪৫৪। চ্যাং উজায় ব্যাং উজায়,
খল্‌সা পুটি ধরফড়ায়।

৪৫৫। যে মাছটা পলায়,
সেইটা বড় বড়।

৪৫৬। সন্ন্যাসীরে যদি অলক্ষীয়ে পায়,
ঝুল্লাকাথা নিজে লাইথ্যায়।

৪৫৭। টাকার নাও পাহাড় দিয়া চলে।

৪৫৮। ভাত না পায়,
পিঠা পায়াস খায়।

৪৫৯। বিক্রমপুরের এম্নি গুণ
একই গাছে পানগুপারী
একই গাছে চুণ।

৪৬০। কাচা বাশে ঘুণে ধল্লে,
রক্ষা নাই তার কোন কালে।

৪৬১। আঠর নাই নৌকার
ঠাঠর বেশী।

৪৬২। আকাঠার নায়ের তিনটা গলই।

৪৬৩। ছিনালের বড় গলা
শুনতে কান ঝালাপালা।
ছিনালের—কুলটার।

৪৬৪। কুইড়া মানুষ শয়তানের হাড়ি।

৪৬৫। এক পয়সার প্রস্তাব,
আবার দালান বালাখানা।

৪৬৬। আল্‌গা বেতের বান্ধ
লড়ে চড়ে, খয় না।
খয়—খসে।

৪৬৭। পালে গ বাড়ী হাতাসা,
একখান একখান বাতাসা;
এক বার চাইলাম দিল না,
আবার চাইলাম দিল না,
আমরা অত ছোচা না।
হাতাসা—সপ্তামৃত।

৪৬৮। এক মুখ ভরণ যায় সোনা দিয়াও,
পাচ মুখ ভরে না ছালি দিয়াও।
ছালি—ছাই।

৪৬৯। চোরের সাক্ষী গাইট কাটা

৪৭০। বান্দইরারে হরি,
এমন কথায় বালাই লইয়া
গলায় দড়ি দিয়া মরি।

---

* এক চাষা এক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিল 'ঠাকুর এবার জল হবে কেমন?' জ্যোতিষী অম্লান বদনে উত্তর করিল 'লম্বা লগ্‌গী কাট'। চাষা বাটী আসিয়া জল হইবে মনে করিয়া লম্বা একটা লগ্‌গী কাটিল, কিন্তু সে বৎসর আর জল হইল না। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী ঠাকুরের নাগাল পাইয়া চাষা বলিল, 'কি ঠাকুর! এবার ত জল হইল না—তোমার কথা মিথ্যা।" জ্যোতিষী বলিল, 'কিসে? আমি কি বলিয়াছিলাম?" চাষার বাক্য শুনিয়া জ্যোতিষী রাগিয়া বলিল, "আমার কথা মিথ্যা রে বোকা? আমি যে লম্বা লগ্‌গী কাটিয়া খাট করিতে বলিয়াছিলাম।"

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ

নিয়মাবলী

১। সভার নাম ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ। নানা উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতির জন্য প্রযত্নই এই সভার উদ্দেশ্য।

সভার নাম ও উদ্দেশ্য — রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার বিষয়ে এই পরিষৎ কোনও প্রকারে লিপ্ত থাকিবেন না।

২। পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "প্রতিভা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করা হইবে।

সভার কার্য্য — সভার অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য বিষয়ে নানারূপ গবেষণা ও সঙ্কলনের চেষ্টা করা যাইবে। পরিষদের কার্য্যবিবরণ উক্ত "প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৩। পরিষদের অধিবেশন ২নং সদরঘাট রোড স্থিত পরিষদের কার্য্যালয়ে অথবা প্রয়োজনানুসারে অন্যত্রও হইতে পারিবে।

পরিষদের অধিবেশন — প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবারে কিম্বা আবশ্যক হইলে অন্য দিনেও অপরাহ্নে সম্পাদকের আহ্বানে পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অথবা অন্ততঃ সাতজন সভ্য হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সম্পাদক যে কোনও উপযুক্ত দিনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। নয় জন সভ্য উপস্থিত হইলেই পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৪। পরিষদের সাধারণ অধিবেশনের কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে। সভাপতি পরিষদের কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করিলে

অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী — ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন, সভ্য-নির্ব্বাচন এবং সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য ও নির্দ্ধারিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে। অনাবশ্যক বোধ করিলে এই সকল কাজের যে কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইতে পারিবে।

৫। কোনও বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে কোন সভ্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার এবং প্রস্তাবক দুইবারের অধিক বক্তব্য প্রকাশ

আলোচনার পদ্ধতি — করিতে পারিবেন না; তবে অধিকাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির অনুমতি পাইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

৬। বিশিষ্ট সদস্য, আজীবন সদস্য, সহায়ক সদস্য, ও সাধারণ সদস্য এই চারিশ্রেণীর সদস্য লইয়া ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই পরিষদের "সাধারণ সভ্য", খ্যাতনামা লেখকগণ "বিশিষ্ট সভ্য", ও অর্থ সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে পরিষদের উপকারক্ষম ব্যক্তিগণ

সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়ম — "সহায়ক সভ্য" নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। সাধারণ, বিশিষ্ট, বা সহায়ক সভ্যরূপে গণ্য হইতে হইলে পরিষদের অধিবেশনে একজন সভ্য কর্ত্তৃক তাঁহার নির্ব্বাচন প্রস্তাবিত, অপর সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হইবে। আবশ্যক হইলে সভার অনুমোদন "ব্যালট" দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। বিশিষ্ট সভ্যের নির্ব্বাচন পরিষদের সভ্যগণের ত্রিচতুর্থাংশের সম্মতিক্রমে হইবে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ছয়জনের অধিক হইবে না। সহায়ক সদস্যের সংখ্যা ১০ জনের অধিক হইবে না, এবং তাঁহারা এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তৎপরে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

পরিষদের উন্নতিকল্পে যিনি সাধারণ তহবিলে এককালে অন্যূন ১০০৲ টাকা

আজীবন সভ্য — প্রদান করিবেন তিনি আজীবন-কাল পরিষদের সভ্যরূপে গণ্য হইবেন; কিন্তু বিশেষ কার্য্যের জন্য পরিষদের স্থাপিত

স্বতন্ত্র কোনও তহবিলে এইরূপ এককালীন দানে কেহ উক্ত সভ্যপদের অধিকারী হইতে পারিবেন না।

৭। সাধারণ সভ্যগণের প্রবেশিকা ॥• আট আনা ও মাসিক অন্ততঃ ।• চারি আনা চাঁদা অগ্রিম দিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য পরিষৎ প্রকাশিত পত্রিকা একখণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; পত্রিকার পুরাতন সংখ্যার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা উহার প্রতি সংখ্যা অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিতে পারিবেন; সম্পাদকের নিকট প্রশ্ন করিয়া সভার অবস্থা, বিধি-ব্যবস্থা ও অন্য আবশ্যক সংবাদ জানিতে পারিবেন; এবং সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও গ্রন্থাদি দেখিতে পারিবেন।

সভ্যের কর্ত্তব্য ও অধিকার

কোনও সভ্যের দেয় টাকা চারি মাস কাল অদত্ত থাকিলে তিনি সভ্যের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন; এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোনও সভ্যের চাঁদা তিন মাস কাল বাকী থাকিলে তিনি সমিতির সভ্যপদ হইতে অপসৃত হইবেন ও তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অপর একজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

৮। ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশিকা বা তত্তুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের "ছাত্র সভ্য" রূপে গণ্য হইতে পারিবেন। "ছাত্র সভ্য"গণকে প্রবেশিকা ।• চারি আনা এবং মাসিক অন্যূন ৵• দুই আনা চাঁদা দিতে হইবে। "ছাত্র সভ্য"গণ "প্রতিভা" বিনামূল্যে পাইবেন; পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দেশ অনুসারে, পরিষদের বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

ছাত্র সভ্য

এতদ্ভিন্ন "ছাত্র সভ্যগণের" পরিষদ সম্পর্কে অন্য কোনও কর্ত্তব্য বা অধিকার থাকিবে না।

৯। নূতন সভ্যগণ নির্ব্বাচনের পর হইতে সভ্যের সকল অধিকার প্রাপ্ত হইবেন এবং উক্ত সময়ের পরবর্ত্তী মাসের সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাইবেন।

নূতন সভ্য

১০। পরিষৎ, ইচ্ছানুযায়ী, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরিপোষক মনোনীত করিতে পারিবেন।

সভার পরিপোষক

১১। (ক) পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ প্রতি বৎসরান্তে বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যশ্রেণী হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তৎপরবর্ত্তী বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষ বা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যের পদ বৎসরের মধ্যে শূন্য হইলে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে ঐ পদ পূরণ করিতে হইবে।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ

কর্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা:—

সভাপতি	...	...	...	১ জন
সহকারী সভাপতি	...	...	...	৫ ,,
সম্পাদক	...	...	...	১ ,,
সহকারী সম্পাদক	...	...	...	৪ ,,
পত্রিকা সম্পাদক	...	...	...	১ ,,
ধনরক্ষক	...	...	...	১ ,,
ছাত্রসভ্যগণের পরিদর্শক		...	...	১ ,,
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য		...	...	১০ ,,
আয়ব্যয় পরীক্ষক	...	...	...	২ ,,

(খ) আয়ব্যয়পরীক্ষক ভিন্ন পরিষদের সকল কর্ম্মাধ্যক্ষই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সকল কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সেই সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন। কোনও অধিবেশনে সভাপতি বা সম্পাদক

অনুপস্থিত হইলে সেই দিবসের জন্য উপস্থিত অন্য কোনও সভ্য তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত হইল।

সভাপতির অধিকার — ১৩। কোনও বিষয়ের মত গ্রহণ কালে দুই পক্ষের সভ্যসংখ্যা সমান হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য ও অধিকার — ১৪। সম্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মত অনুসারে, পরিষদের পক্ষে পত্রাদি প্রেরণ, অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ ও জ্ঞাপন, আয় সংগ্রহ, আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ ও অন্য উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত সম্পাদক পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় নিজে করিতে পারিবেন, এবং অনিবার্য্য কারণে সমিতির মত না লইয়া আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন ; কিন্তু পরে উক্ত ব্যয় ও কর্ম্ম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইবেন। পরিষদের নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

সম্পাদক, প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সহরের সভ্যগণকে অন্ততঃ দুই দিন ও মফঃস্বলের সভ্যগণকে অন্ততঃ চারিদিন পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিবেন ; প্রতি মাসে পরিষদের আয়ব্যয়বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে অর্পণ করিবেন। বাৎসরিক আয়-ব্যয় তালিকা, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতির ও নিজের স্বাক্ষর এবং আয়ব্যয়পরীক্ষকদিগের মন্তব্য সহ, চৈত্রমাসের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন ; সেই সঙ্গে উক্ত সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীও দিবেন।

ধনরক্ষকের কর্ত্তব্য ও অধিকার — ১৫। পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ সমস্তই ধনরক্ষকের নিকট পরিষদের তহবিলে জমা হইবে। মাসিক খরচ বাদে ১০০৲ একশত টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহা তিনি নিজ নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখায় জমা রাখিবেন।

পরিষদের সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্র (ভাউচার) ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

আয় ব্যয় পরীক্ষকের কর্ত্তব্য ও অধিকার — ১৫। আয়ব্যয়পরীক্ষক মহাশয়দ্বয় প্রতি চারি মাস অন্তর এবং প্রতি বৎসরের শেষে আয়-ব্যয় বিবরণী পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন ; প্রথমোক্ত মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এবং শেষোক্তটী বার্ষিক অধিবেশনে আয়ব্যয়ের হিসাব সহ উপস্থাপিত করা হইবে।

১৬। পরিষদের সমস্ত কর্ম্ম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ ও কর্ত্তৃত্বে সম্পাদিত হইবে। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার উক্ত সমিতির অধিবেশন হইবে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কর্ত্তব্য ও অধিকার — সম্পাদক আবশ্যক মনে করিলে অথবা উক্ত সমিতির দুইজন মাত্র সভ্য হেতু-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে ইহার অতিরিক্ত অধিবেশনও হইতে পারিবে। পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলেই সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

শাখা সমিতির নিয়ম। — ১৭। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ সময়ে সময়ে অস্থায়ী শাখা সমিতি গঠন করিতে পারিবেন অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনও কার্য্য সাধনের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। শাখা সমিতির কর্ম্মচারিবর্গ পরিষদের অধিবেশনে নিযুক্ত হইবেন এবং উহার কার্য্যফল ও কার্য্যবিবরণ উক্ত শাখা সমিতির অনুমোদনের পর, উহার সম্পাদক প্রতি তিনমাস অন্তর পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

সন ১৩২০ (চতুর্থ বর্ষ)

পরিপোষকগণ

নবাব খাজে সার সলিমুল্লা বাহাদুর (ঢাকা)

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)

,, ,, গিরিজানাথ রায় (দীনাজপুর)

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)

আজীবন সভ্যগণ

মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাসিম বাজার)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল (মালদহ)

,, মহেন্দ্রলাল রায় বি এল (ঢাকা)

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (ধানকোরা)

,, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরাপাড়া)

(ভাওয়ালের পরলোকগত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ও পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন ।)

কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী, এম্, এ, বিদ্যাসুধি ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস, এম্, এ, বি, এস, সি, (লণ্ডন) ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় এম্. এ, বিদ্যারত্ন ।

„ শরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এল্ ।

„ খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন ।

সম্পাদক—শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম্, এ, বি, এল্, ।

সহ সম্পাদক—শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত ।

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর এস্ ।

„ নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম্. এ ।

পত্রিকা সম্পাদক— শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, এম্, এ, বি, এল্,

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্, এ,

ধনরক্ষক— শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

ছাত্রসভ্য পরিদর্শক--শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

আয়ব্যয় পরিক্ষক —শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল ।

„ শ্যামাশঙ্কর দাস গুপ্ত বি এল ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্য—

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল্ ।

„ বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতা ।

অধ্যাপক—„ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ ।

„ ফণিভূষণ লাহিড়ী এম্. এ ।

„ কামিনীকুমার সেন এম. এ, বি, এল্ ।

„ নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি. এল্ ।

„ সত্যেন্দ্রকুমার সেন ।

„ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্, এ, পি, আর, এস, এফ, সি, এস ।

„ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ, বি, টি ।

„ গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, বি, এল ।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

তৃতীয় সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

(সন ১৩২০)

উপক্রমণিকা

ভগবানের অনুগ্রহে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্র সৃষ্টি করতঃ মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই এক্ষণে স্বীকার করেন। সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই ১৩১৮ সনে কতিপয় মাতৃভাষানুরক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিগত তিন বৎসর যাবৎ এই পরিষদ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত যথাশক্তি মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছে। পরিষদের এই তিন বৎসরব্যাপী উদ্যমের ফলে ঢাকাবাসীর সাহিত্যানুরক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যদি কোন নূতন কর্ম্মীকে মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, তবেই মনে করিতে হইবে যে পরিষদের ক্ষুদ্র চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

সভ্য-সংখ্যা

দিন দিনই এই পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ৩১ জন সভ্য লইয়া এই সভা ১৩১৮ সনে প্রথম সংস্থাপিত হয়। ঐ সনের শেষ ভাগেই সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৯ জনে পরিণত হইয়াছিল। ১৩১৯ সনের সভ্য-সংখ্যা ৩৬০ জন; আলোচ্য বর্ষের (১৩২০) সংখ্যা ৪৩২ জন যথা.—

আজীবন সভ্য............	৬	জন
সাধারণ সভ্য.........	৩৭৫	,,
ছাত্র সভ্য............	৪৭	,,
পরিপোষক	৪	,,
মোট	৪৩২	,,

এতন্মধ্যে

সহরের সভ্য-সংখ্যা.........	২৪৯	জন
মফঃস্বলের সভ্য-সংখ্যা.........	১৮৩	জন
মোট	৪৩২	জন

১৩১৯ সনের ন্যায় ১৩২০ সনেও মফঃস্বলস্থ সভ্যমধ্যে অনেকেই আমাদের পত্রিকা গ্রহণকরতঃ পরিশেষে ভি পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। যাহাতে পরিষৎকে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তজ্জন্য আলোচ্য (১৩২০) বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর পত্রিকা ভি পি ডাকে পাঠাইয়া মফঃস্বলস্থ সভ্যগণের চাঁদা অগ্রিম আদায় করা হইবে। কিন্তু কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ও তাঁহাদের অনুপস্থিতির দরুণ সেই নির্দ্ধারণ যথোপযুক্ত রূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। ১৩২১ সনের শেষ ভাগের চাঁদার সহিতই ১৩২২ সনের প্রথম তিন মাসের চাঁদা আদায়ের জন্য পত্রিকা ভি পি ডাকে প্রেরিত হইবে। ভরসা করি সহৃদয় সভ্যমহোদয়গণ পরিষদের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেয় চাঁদা প্রেরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সহরস্থ সভ্যগণের চাঁদা গতবৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক আদায় হইয়াছে। ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়। যাঁহাদের নিকট বাকী পড়িয়াছে, ভরসা করি, তাঁহারা সত্বর তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

আজীবন সভ্য।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদ ভাণ্ডারে এক কালীন ১০০৲ টাকা দান করিয়া আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)

(২) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরাপাড়া)

(৩) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (ধামরাই)।

এইরূপ উৎসাহ প্রদানের জন্য ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ উক্ত মহোদয়গণকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর পরিষদের পরিপোষকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মত বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী লোকের অভাব পরিষদের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

"প্রতিভা" নামক মাসিক পত্র পরিষদের মুখপত্র। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত ও অন্যান্য সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পত্রিকা প্রকাশের ও তদর্থে ব্যয়ের ভার শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আলোচ্য বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত করিয়া প্রতিভা প্রকাশকের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে চাহেন। কাজেই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পত্রিকা পরিচালন ও প্রকাশিত করিবার কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সতেন্দ্রবাবুর কর্ত্তৃত্ব সময়ের শেষ ভাগে 'প্রতিভা' নিতান্ত অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কয়েকখানা যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত করিতে বাধ্য হন। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে 'প্রতিভা' পুনরায় নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশন।

গতবর্ষে পরিষদের ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল, যথা :—

তারিখ	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
২০শে বৈশাখ... ...	...শ্রীহট্টের ওসমান ও বঙ্গের ওসমান খাঁ...	...শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ বি টি।
২২শে জ্যৈষ্ঠ... ...	...বঙ্গ সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল	...শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত এম এ, বি এল।
১৮ই শ্রাবণ... ...	...পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত দেশ কোথায়	,, আনন্দচন্দ্র সেন।
১লা ভাদ্র	...ব্রণবিজ্ঞান ও অস্ত্র-চিকিৎসা	,, কবিরাজ কেশবচন্দ্র দাস।
২১শে ভাদ্র... ...	...চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা...	...শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ভাওয়াল বি, এল।
৫ই আশ্বিন... ... (দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন)	...(১) নাটকীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালার নাটক...	,, কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি এল
	(২) শক ক্ষত্রপ চষ্টন	,, রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি। আর এস।
১৫ই আশ্বিন	...(১) ধামরাইর পুরাকীর্ত্তি	,, বীরেন্দ্রনাথ বসু।
	(২) ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তন...	,, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম্ এ।
১৬ই কার্ত্তিক... ...	...আনন্দী কবি...	,, অশ্বিনী কুমার শর্ম্মা।
২৭শে অগ্রহায়ণ ...	...গত ৪০ বৎসরের ঢাকা জিলার স্বাস্থ্যবিবরণী...	,, বিলাসচন্দ্র দাস।
৭ই মাঘ	...বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীহট্টের রঘুনাথ...	,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি।
১৬ই ফাল্গুন	...রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস	...শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ, পি, আর, এস।
২১শে চৈত্র... ...	...অন্ধ্র রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	,, রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ পি, আর এস।

এতদ্ভিন্ন ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা বার এসোসিয়েশন গৃহে পরিষদের একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। পরলোকগত নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর জি, সি, আই, ই, মহাশয় উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ বি, এল মহাশয় রবিবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে এক সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয় উক্ত কবির প্রতিভার বিশ্লেষণ করতঃ এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত বিবিধ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্য ও চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধামরাই ও সাভার অঞ্চলের অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের আলোক-চিত্র, সেই অঞ্চলে প্রাপ্ত মুদ্রাদি এবং দশাবতার প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আয়ব্যয়।

সহরস্থ সভ্যগণের চাঁদা অপেক্ষাকৃত রীতিমত আদায় হওয়াতে গতবৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসর পরিষদের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে যথা:—

মোট আয়,	মোট খরচ,
১৩১৯ সনে...৬৬৩৸/৩ পাই	৬৫৪৶২ পাই
১৩২০ " ...১২৬৬৷৯ "	১১৪৩৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় আয়ব্যয়ের হিসাব যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্ব সমিতি।

প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ স্থানীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের উদ্ধারের জন্য গতবৎসরে যে পুরাতত্ত্ব সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইয়াছে।

ভাওয়াল ও সাভার অঞ্চল পরিদর্শন করতঃ তত্রত্য স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। তাহা 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের আলোচনায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি শক ক্ষত্রপ চষ্টন ও অন্ধ্র রাজ-বংশের সময় নিরূপণে স্বীয় মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলির ঐতিহাসিকতা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দুই প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য।

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ও বিক্রমপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি, মহাশয় অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ "বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীহট্টের রঘুনাথ" শীর্ষক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও মৌলিক তথ্যপূর্ণ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি, মহাশয় ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালী সংগ্রহ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় মেয়েলী ছড়া ও ভাটিয়াল গান প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার ও অন্যান্যের সংগৃহীত মেয়েলী ছড়াগুলি শীঘ্রই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিষদের গ্রন্থাবলী ভুক্ত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

জীব জগতের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পর্য্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার

"পারক পাখীর" বিবরণ বঙ্গ সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

পরিষদের প্রাচীন পুথি সংগ্রহের মধ্যে প্রকাশযোগ্য গ্রন্থগুলি যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে তজ্জন্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ বি এল্‌ ও অপরাপর মহোদয়গণ সেগুলি উপযুক্তরূপে সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

দশাবতার প্রস্তর ও অন্যান্য পুরাকীর্ত্তির চিহ্নাদি এ বৎসরও কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এ বৎসর এ বিষয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির চিত্র সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় সেইকার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহাদিগের যত্নের ফল সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের তালিকা সংগ্রহের কার্য্যও পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত এম, এ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ক্রমোন্নতির বিবরণ প্রকাশিত করিবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে ছিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শীঘ্রই উহা পরিসমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক বিভাগে শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সরকার এম, এ, এফ সি, এস্, কবিরাজ কেশবচন্দ্র দাস, ও বিলাস চন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের গবেষণার ফল 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনুকূল বাবুর তদীয় "রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস" প্রবন্ধে প্রচুর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

দার্শনিক বিভাগে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় কার্য্য করিতেছেন। তদ্‌রচিত বার্গসঁ দর্শনের বিবরণের অবশিষ্টাংশ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম, এ মহাশয়ের "ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তন" শীর্ষক প্রবন্ধও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
সম্পাদক।

প্রতিভা

৪র্থ বর্ষ চৈত্র ১৩২১ ১২শ সংখ্যা

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

'শিক্ষা' ও তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা

(৭)

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান

যে বাঙ্গালা ভাষার 'উপাদানগত তর্ক' বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রধান আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে তাহা আলোচনার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং তৎকালেও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতবহুল হওয়া উচিত কি না তাহা নিয়া বোধ হয় মতভেদ প্রচলিত ছিল। 'শিক্ষা'র বিজ্ঞাপনে তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রীতি অবলম্বন করিয়াছি, কারণ বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও ভাষান্তর হইতে উপাদান আহরণ করিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিবার আবশ্যক আছে। চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, যদিও বাঙ্গালা একটী স্বতন্ত্র ভাষা তথাপি উহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে এত শব্দ গৃহীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বঙ্গভাষাকে একপ্রকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষামূলক বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সংস্কৃত শব্দ অবিকল বা আংশিক বিকল হইয়া বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষায় নীত এবং প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে যথোচিত বিকার প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বিকৃত শব্দটী অবিকল বাঙ্গালা ভাষায় নীত হইয়াছে। কোন কোন শব্দ আবার সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে নীত হইবার কালে রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা ইহার প্রমাণ করা যাইতেছে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
গৃহ	ঘর	গৃহ, ঘর
ত্বং	তুমং	তুমি
বধূ	বহু	বধূ, বউ
দ্বাদশ	বারহ	বার
ত্রয়োদশ	তেরহ	তের
অষ্টাদশ	অঠ্ঠারহ	আঠার
শ্মশান	মশান	শ্মশান, মশান
স্নান	সিনান	স্নান
হস্ত	হথ	হস্ত, হাত
হরিদ্রা	হলদ্দা	হরিদ্রা, হলুদ
যৌবন	জোব্বন	যৌবন
দেবর	দি অর, দে অর	দেবর, দে অর
হৃদয়	হি অ অ	হৃদয়
পুরুষ	পুরিস	পুরুষ
নিদ্রা	নিদ্দা	নিদ্রা

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধৃত হইল না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষামূলক। প্রাকৃত আবার সংস্কৃতমূলক, অতএব সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ মূল হইতেছে। যখন বঙ্গভাষায় ভাষান্তর হইতে শব্দ গ্রহণের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষায় প্রাকৃত ভাষার শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বিবেচনায় সে রীতি অবলম্বিত হয় নাই। জানি না, অবলম্বিত রীতি পাঠকদিগের কতদূর প্রীতিকর হইবে। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও বর্ত্তমানে গ্রহণীয় উপাদান সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মন্তব্য আমরা দীর্ঘকাল পরে আবার শিক্ষিত সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

ছাত্র-জীবন—'শিক্ষা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদটী ভারতীয় আর্য্য ছাত্র-জীবনের আদর্শ ও নিয়ম প্রণালীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। তর্কালঙ্কার মহাশয় ভারতীয় ছাত্রজীবন সম্বন্ধে প্রথম আলোচনার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা ভারতবাসী, ভারতীয় ছাত্রজীবন আমাদের প্রথম আলোচ্য, কারণ দেশান্তরীয় ছাত্র-জীবনের আলোচক ও নিয়ন্তার অভাব নাই। ভারতীয় ছাত্র-জীবনের নিয়ন্তা দূরে থাকুক আলোচকও অতি বিরল। তাই আমরা ভারতীয় ছাত্র-জীবনের আলোচনা করিতে ব্যগ্র। ভারতীয় ছাত্র-জীবনের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্য্য ভারতের ছাত্র-জীবনের আলোচনা আবশ্যক, যেহেতু অনেকের সংস্কার যে বর্ত্তমান ভারতীয় ছাত্র-জীবন উন্নতির উচ্চতর সোপানে সমারূঢ়, সুতরাং তাহার আলোচনাই আদৌ নিষ্ফল। আর্য্য ভারতের ছাত্র-জীবনের স্থূল স্থূল বিষয়ের সমালোচনা করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন ভারতীয় ছাত্র-জীবনে কত প্রভেদ।

আমরা বিজাতীয় বা বিদেশীয় বলিয়া কোনও উপাদেয় বিষয়ের বিদ্বেষী নহি, কিন্তু দেখিতে হইবে যে আমাদের যাহা ছিল, তাহা এবং যাহা বিজাতীয় ও বিদেশীয় তাহাতে কতদূর তারতম্য। এই পর্য্যন্ত সমালোচনা করিলে যেটি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেটি বিজাতীয় হউক বা বিদেশীয় হউক তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই।

আপাতমধুর ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন জাতীয় ভাবের পরিগ্রহ ও পরিণাম, সমুৎকৃষ্ট দেশীয় ও জাতীয় ভাবের পরিত্যাগ আমাদের একান্ত অসহনীয়। তাই বলিতেছিলাম বর্ত্তমান ভারতীয় ছাত্র-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আর্য্য ভারতীয় ছাত্র-জীবন কিরূপ ছিল তাহা একবার সমালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।" ইতঃপর প্রাচীন আর্য্য ছাত্র-জীবনের নিয়ম-প্রণালী, সংযম, কঠোর ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয় অতি বিশদ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সে কি সুন্দর ভাষা, কি বা সন্নিবেশ-শৃঙ্খলা, পড়িতে পড়িতে তৃপ্তি হয় না, আমার ইচ্ছা হইতেছে পুস্তকখানা আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রিয় পাঠক ও ছাত্রগণকে উপহার দেই, কিন্তু স্থানাভাব!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমাদেরও মনে হয় ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম সর্ব্বদেশের সকল ছাত্রের উন্নতির মূল। তাৎকালিক ছাত্রগণের বিলাস ব্যসন ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষতঃ শিক্ষা-সম্পাদক ও অভিভাবকগণের তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অনুভব করিয়া তিনি যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষেই মর্ম্মস্পর্শী! আজি এতদিন পরে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-

সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল হেতুবাদে মনোযোগ প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া যথাসম্ভব প্রতীকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীর শান্ত শীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগ, বিষয়-স্পৃহাশূন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই সকল হেতুবাদ লক্ষ্য করিয়া তারস্বরে তাহার সংস্কার-প্রস্তাব শিক্ষিত সমাজের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। আমরা তাহার 'শিক্ষা' হইতে আরও একটী স্থান এই প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যদিও বর্ত্তমান সময়ে এ সকল কথার অনেক বার আলোচনা হইয়া গিয়াছে তথাপি "শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে" নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। এ সকল কথার আলোচনা দ্বারা যদি আমাদের একটী ছাত্রের জীবন স্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হয় তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

" * * ইদানীন্তন ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমরা কেবল তাঁহাদিগকে (ছাত্রদিগকে) দায়ী করিতেছি না, শিক্ষা-প্রণালীর দোষ ইহার নিদান। অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ হওয়াই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। শিক্ষা-বিধাতৃগণও এই মারাত্মক সংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। যাহাতে ছাত্রগণ মানুষ হইতে পারে তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুই দণ্ড চিন্তা করা কেহই আবশ্যক বোধ করে না। আর্য্য ভারতীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নের পূর্ব্ব হইতে (উপনীত হইয়া অবধি) ধর্ম্ম-সাধন ও নীতি-শিক্ষায় নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অনুদ্ধত, মার্জ্জিত ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। আর বর্ত্তমান কালে—বর্ত্তমান কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনুরোধে ছাত্রদিগের ধর্ম্ম-সাধনা বা নীতিশিক্ষা কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত! কি ভয়ানক কুসংস্কার! আজকাল কোন কোন ছাত্র ইংরাজের দুই চারিখানা পুস্তক মুখস্থ করিয়া বা তাঁহাদের সহিত দুই চারিটি বাক্যালাপ করিয়া তাঁহারা স্বয়ং একটি শুক্রাচার্য্য বা চাণক্য হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন কুসংস্কারজাল সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য ভারতে তাঁহাদের আবির্ভাব! আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও আর্য্যদিগের নীতি সভ্যতার অননুমোদিত, উহা সভ্য মনুষ্যের পক্ষে নহে, কি ভয়ানক আস্পর্দ্ধা! তাঁহাদের মতে যে কিছু সত্য য়ুরোপীয় শাস্ত্রে, য়ুরোপীয় ধর্ম্মে—য়ুরোপীয় নীতিতে। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। বৈদিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণিকতার জন্য ইংরাজ দার্শনিক ও ধর্ম্ম-প্রণেতৃদিগের সূত্র সকলের উপন্যাস তোমার সংশয় দূর করিবে। যাঁহাদের মতে য়ুরোপীয় শাস্ত্রাদিই সভ্যতার অনুমোদিত তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন যে উহার মূল কোথায়? নিরপেক্ষ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অম্লান বদনে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের অনেক বিজ্ঞালতার মূল ভারতবর্ষে। ভারতীয় নীতি প্রভৃতি—প্রথমতঃ মিশরে তথা হইতে রোমে নীত হয়, রোমরাজ্য ধ্বংসের পরে আরব হইতে অনেক বিষয় গ্রীসে নীত ও তথা হইতে উহা য়ুরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। আরব যে ঐ সকল বিষয়ে ভারতের শিষ্য তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত।

তবে অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে উহা রূপান্তর হইয়াছে মাত্র। প্রিয় ছাত্রগণ, তোমরা রত্নাকরবাসী হইয়া রত্ন চিনিলেন না, তোমরা তোমাদের রত্ন অন্যের রঞ্জনে অনুরঞ্জিত না হইলে গ্রহণ করিতে চাও না, কিন্তু য়ুরোপের বিচক্ষণাগ্রগণ্য মহাত্মাগণ তোমাদের খাঁটি রত্ন অন্বেষণ করিবার জন্য কতই না পরিশ্রম করিতেছেন ইহাতেও কি তোমাদের চৈতন্য হইবে না?"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। তর্কালঙ্কার মহাশয় একস্থলে আমাদের ছাত্রগণকে তাৎকালিক মারাত্মক সভ্যতার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ডাক্তার রামদাস সেনের নামে লিখিত ভট্ট মোক্ষমূলরে

একখানা পত্রের কিয়দংশে অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, "যদিও আমি ভারতবর্ষ কখন দেখি নাই, কিন্তু ভারতের সাহিত্য ও প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নে আমার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করায় আমি একরূপ ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইচ্ছা ভারতবাসী আপনার অতীত ইতিহাস ও সাহিত্যের গৌরব বুঝিতে পারিয়া জাতীয় ভাব পোষণ করেন।

তোমরা স্বর্ণভূমির সন্তান, মনুর বংশধর, য়ুরোপে যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু য়ুরোপীয় হইতে চেষ্টা করিও না।"

একদিন প্রতিভাশালী সাহিত্যগুরু বঙ্কিম বাবুও তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বে ইউরোপের বহির্বিজ্ঞান মাত্রের অনুসরণ করিবার উপদেশই আমাদিগকে দিয়াছিলেন।

মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার এই গ্রন্থে আমাদিগকে সেই উপদেশই বার বার দিয়াছেন।

এইবার আমরা 'শিক্ষার' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রাচীন আর্য্য রীতির ব্যত্যয় ও পাশ্চাত্য রীতির সম্যক্ প্রতিষ্ঠার তুলনায় সমালোচনা করিয়া উভয়ের তারতম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। ছাত্রগণ বর্ত্তমান সভ্যতা-নীতির অনুসরণে নিতান্ত উদ্ধত ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় মনে করেন, এবং ধর্ম্মশিক্ষাশূন্য শিক্ষাব্যবস্থার দোষও ইহার আংশিক হেতু বলিয়া তাঁহার ধারণা। আগেকার ছাত্রগণ গুরুর আয়ত্ত ছিলেন, এখনকার ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিপরীত; বরং গুরুই ছাত্রগণের সম্পূর্ণ মুঠার ভিতরে। তর্কালঙ্কার মহাশয় আরও বলেন যে, ছাত্রগণ যেমন শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য, গুরুগণও তেমনি ছাত্রগণের প্রতি তথাবিধ স্নেহশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল ভাববিপর্য্যয়ের পরিণাম যে কি হইবে তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া ছিলেন। যদিও এসকল বিষয়ের আলোচনা ছাত্র বা শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই তিনি জানিতেন, তথাপি সমাজের মঙ্গল কামনায় তিনি নির্ভীক চিত্তে এসকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম ও ছাত্রগণকে বড় ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই তাঁহার এত প্রয়াস। এই কৈফিয়ৎটী তিনি নিজেই দিয়াছেন তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব। কিন্তু তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অসম্যক্ ব্যবহার দর্শনে যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই আমরা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—পাঠকগণ এই উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলে দেখিবেন ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাধারণের নিকট বিদ্যা অপেক্ষা অর্থের সম্মান যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল এবং আজি পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মত না হোক্ অন্ততঃ অনেকটা তাহারই আদর্শে ভারতবাসীর বৃত্তিসাংকর্য্য নিবন্ধন সমাজের মধ্যে যে একটা প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার আভাস সূক্ষ্মদর্শী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, তাই তিনি অতি আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন:—

"বর্ত্তমান ছাত্রদিগের শিক্ষকের প্রতি তথাবিধ অসঙ্গত ও উদ্ধত ব্যবহার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেয় যে, বর্ত্তমান ভারতে বিদ্যার মূল্য যৎপরোনাস্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে অর্থের মূল্য অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র বিবেচনা করেন আমি যে উচ্চ মূল্যে শিক্ষা ক্রয় করিতেছি, তাহাতে শিক্ষকের আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং আমি তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে অধিকারী। তিনি মনে ভাবেন না যে, তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হন তাহার মূল্যের তুলনায় তাঁহার প্রদত্ত নিষ্ক্রয় অতি যৎসামান্য। ইহার পরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা আসিবে, কারণ যুক্তি

অবসন্ন হইলে উহাই আজকাল অকাট্য প্রমাণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু আমরা সাহস সহকারে বলিব, একবার নয় শতবার বলিব, যে সভ্যতা ছাত্রের তথাবিধ ঔদ্ধত্য অনুমোদন করে তাহা সভ্যতা নহে, সভ্যতার অপব্যবহার মাত্র।" * * *

"যে ভারতে বিদ্যার অভাবে অভিজাত ব্যক্তি সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে অবনত ও বিদ্যা প্রভাবে হীন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন যে ভারতের বিদ্যাবিষয়ি অনন্যসামান্য যশোরাশি জলনিধির উত্তাল তরঙ্গ-মালা লঙ্ঘন করিয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত—আজিও দেশান্তরিত খ্যাতনামা মনীষিগণ যে ভারতের সেকেলে বিদ্যার মাধুর্য্যে পরিমুগ্ধ,—

"যোনুচানঃ স নো মহান্"—

যিনি বিদ্বান তিনিই আমাদিগের মহান্ এই উদার নীতি সূত্র যে ভারতে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া পরিগৃহীত, সেই ভারত আজ কি না বিদ্যার মূল্য বুঝিতে পারে না, বিদ্যার আদর করিতে জানে না, বিদ্বানের পূজা করা নীচতা মনে করে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে! * * * ভাল, যাহারা শুশ্রূষাপরতাকে নীচতা জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা উহাকে বিনয়, নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি শব্দে কেন নির্দ্দেশ করেন না? উহাকে বিনয়াদি শব্দে অভিহিত করিয়া প্রাচীন ভারতীয়দিগের সভ্যতা বজায় রাখিতে যাঁহারা হৃদয়ে আঘাত পান, প্রত্যুত উপাদেয় বস্তুর জঘন্য আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোরতর অসভ্য বলিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাঁহাদিগকে কি বলিব? তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভারতীয় রক্তমাংসে তাঁহাদিগের শরীর, ভারতের গৌরবে তাঁহাদেরই গৌরব। এ মারাত্মক রোগের ঔষধ নাই, কেবল জাতীয় উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তনা ইহার একমাত্র প্রতিকার, জাতীয় বিদ্যার উচ্চ মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহার উপায়। অহো! ভারতীয় আর্য্যগণ যে অর্থকে কল্যগর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন লোষ্ট্রের সহিত যাহার উপমা, ক্ষণিক আশু উপকার যাহার প্রয়োজন, বিদ্যা আজ সেই অর্থের পদতলস্থ ধূলি বিলেহন করিতেছে, হায় এ দুঃখ কাহাকে বলিব? কে ইহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন?"

আর কত উদ্ধৃত করিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখিতে পাই সুন্দর যুক্তি ও চিন্তাপূর্ণ বাক্যাবলী সজ্জিত, কি সুন্দর নিরপেক্ষ স্বাধীন সমালোচনা। অবশ্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপস্থাপিত প্রস্তাব সর্ব্বাংশে সর্ব্বসম্মত না হইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহার উপন্যস্ত প্রস্তাবের সমর্থন শক্তি, দেশের একনিষ্ঠ কল্যাণ-কামনা, বিবেকানুবর্ত্তিতা ও সুস্পষ্টবাদিতা শতকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য।

ছাত্রজীবনের আদর্শ—বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন আমরা এ স্থানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিব।

"প্রিয়বস্তুর সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষা এবং তদীয় গুণোৎকর্ষ সম্পাদন ও দোষোৎসারণের ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। এই জন্য বর্ত্তমান ছাত্র-চরিত্রের সৌন্দর্য্য, গুণোৎকর্ষ ও নির্দ্দোষতা সমধিক অভিলষণীয়। সুতরাং আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবন আদর্শ করিয়া বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের সংগঠন একান্ত বাঞ্ছনীয়। 'আদর্শ করিয়া' বলিতেছি যেহেতু দেশকাল পাত্রানুসারে নিয়মের অবশ্যম্ভাবি পরিবর্ত্তনের প্রতিকূলে বাগ্জাল বিস্তার নিষ্ফল। ইদানীন্তন ছাত্রদিগকে পূর্ব্ববৎ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণের উপদেশ দিলে চলিবে কেন? বর্ত্তমান শিক্ষক-মণ্ডলী আয়োদধৌম্যের ন্যায় ছাত্রদিগের উপর অসঙ্গত প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন, এবং ছাত্রগণ আরুণি ও উপমন্যুর ন্যায় উপাধ্যায়ের কেদারখণ্ড বন্ধন ও গোরক্ষণ করিবে অধুনা এতাদৃশ অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইবার আশা অন্যায়। পক্ষান্তরে ইদানীন্তন ছাত্রদিগের স্বচ্ছন্দ

ব্যবহারও স্পৃহনীয় নহে। তাই বলিতেছিলাম আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবন আদর্শ করিয়া বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের সংগঠন হওয়া উচিত। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সময়োপযোগী বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন তথাপি সংক্ষেপে আবশ্যকীয় কতিপয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান ছাত্রগণের গুর্ব্বায়ত্ততা একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহাদিগকে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, পাদ-প্রক্ষালন, স্নাপনাদি করিতে বলিতেছি না, তাঁহারা গুরুর সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি। গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন অসঙ্গত। নীচাসন নীচশয্যা ব্যবহার ছাত্রের কর্ত্তব্য। গুরুর নিন্দা বা পরীবাদের সংশ্রব পর্য্যন্ত তাঁহার পরিহার্য্য। গুরুর সম্ভাষণাদি কালে প্রাচীন নিয়মাবলীর অনুসরণ অতীব উপাদেয়। গুরুর শুশ্রূষা সর্ব্বথা বিধেয়। ফলতঃ বর্ত্তমান ছাত্রগণ যতদূর সম্ভব গুর্ব্বায়ত্ত হন ইহা স্পৃহনীয়। আর্য্য ভারতীয় ছাত্রদিগের ভোগ্য বস্তুর নিয়মাবলীর অধিকাংশ প্রতিপালন আবশ্যক। বর্ত্তমান ছাত্রগণ হাবষ্যান্ন ভক্ষণের উপদেশ শুনিলে হাস্য করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যথেচ্ছ অভ্যবহার কোনও রূপে অনুমোদনীয় হইতে পারে না। মদ্য বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার তাঁহাদের অবশ্য বর্জ্জনীয়। উত্তেজক দ্রব্যের বহুলোপযোগও অসঙ্গত। পরিমিতাহার একান্ত আবশ্যক। অপরিমিতাহার অধ্যয়নের বিরোধী ও ধাতুবৈষম্যের নিদান। ভোগ বিলাস স্পৃহা উন্মূলন তাঁহাদের শ্রেয়স্কর ও অবশ্যাবলম্বনীয়। কারণ আশুচিত্তাকর্ষক বিষয়ে মনের অভিনিবেশ হইলে কঠোর অধ্যয়নে মনঃসংযোগের শিথিলতা একান্ত অপরিহার্য্য। ছাত্রগণ মনে রাখিবেন অধ্যয়ন ক্রীড়া-বিশেষ নহে উহা কঠোর তপস্যা। তপস্যা স্বভাবতঃ ক্লেশজনক সুতরাং তপস্যা ও সুখাভিলাষ ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পরবিরোধী।" * * * ইতঃপর সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই উপদেশটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। পৃথিবীর যে কোনও দূরদর্শী সভ্য সমাজ এই উপদেশ প্রতিপালনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা এই—

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে,
গীতংচ স্ত্রীবিলাসেন, স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া।"

ইহার পর ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই এক মাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব দেশের সর্ব্ববিধ অনিষ্টের মূল। যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ছাত্র সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচার্য্যের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিলে ভাবী মঙ্গল সুনিশ্চিত। আমরা 'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতামত যথাশক্তি আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিলাম, বারান্তরে 'শিক্ষা'র শেষ অংশ ব্যায়াম ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব। প্রতিভা কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের নিতান্ত নিজস্ব নহে, উহা জন্ম জন্মান্তর বা ইহ জন্মের কঠোর তপস্যালব্ধ ফল। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতুল প্রতিভালোকে যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কালের তুলাদণ্ডে সেই সকল সত্যের সার পরিমাণ ও মূল্য কতটুকু যে নির্দ্ধারিত হইবে তাহা মাদৃশ ব্যক্তির ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য ও তাহার কবি *

আজ আমি যে পুঁথির বিষয়ে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহার নাম 'নৈষধ চরিত্র'; কবির নাম মধুসূদন বা মধুকণ্ঠশীল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবির জীবনী সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রবন্ধান্তরে কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বারান্তরে প্রকাশের বাসনা রহিল।

কবিকে ভাল করিয়া না বুঝিলে কাব্য বুঝা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য ভারতীয় কবির ন্যায় মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধেও অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচনা এবং জনশ্রুতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যতটুকু সম্ভব আমরা কবির জীবনী ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে নৈষধ চরিত্রের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে যে পুঁথি আছে তাহার নাম সম্ভবতঃ 'নল দময়ন্তী'। ইহা গৌরকিশোর ধর নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তলিখিত পুঁথি। ১৭৩১ শকে অর্থাৎ ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ইহা লিখিত হইয়াছিল। আমাদের নিকট যে দুইখানা পুঁথি আছে, তাহার প্রথমখানার লিপিকার রামমোহন শীল। ১২১৫ সনের ৭ই চৈত্র উহার লেখা শেষ হইয়াছে। সুতরাং উহা ইংরেজি ১৮০৮ সনে লিখিত হইয়াছিল। অপর পুঁথিখানা রামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ১৬১৬ শকে বা ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। সময় হিসাবে দীনেশ বাবুর পুঁথি হইতে আমাদের দ্বিতীয় পুঁথি ১৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন——"কবি স্বীয় পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—

'ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলে ত উদ্ভব।
যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥

---

* বহু অনুসন্ধানের পর কয়েক মাস হইল 'নৈষধ চরিত্র' নামে একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার বিষয়ে 'প্রতিভা' পত্রিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তৎপ্রতি সুধী সমাজের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিব এরূপ একটা কল্পনা কতদিন যাবৎই আমার মনে জাগিয়াছে। এ বিষয়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের দুই একজন সভ্য মহোদয়ের সহিতও আলাপ হইয়াছে। কিন্তু আত্ম-শক্তির উপর তাদৃশী আস্থা নাই বলিয়াই এ যাবৎ উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাই নাই। সম্প্রতি কলিকাতা 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত "পুঁথির কথা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত বোধ হইতেছে না। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় দেশবাসীকে যেরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে যাঁহারা একটু আলোচনা করিতে ভালবাসেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জড়তা ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িবেন। প্রাচীন কবিতা ও গান সংরক্ষণ এবং প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ এই দুই বিষয়ে আমার ন্যায় একজন পল্লীবাসী সামান্য ব্যক্তিও একটু একটু চেষ্টা করিতেছে; সুধী-সমাজে ইহার পরিচয় নিতান্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একান্ত ভয়ের সহিতই এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি। আশা করি 'প্রতিভার' সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।—লেখক।

তাহার তনয় বানীনাথ মহাশয়।
পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয় ॥
তাহার তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন।
শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লাসত মন ॥'

সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া লব্ধযশা হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; নাপিত কবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃত-কার্য্যতায় কেহ বিদ্রূপ করিবার সুবিধা পাইবেন না—"
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ ৪১ পৃষ্ঠা)

অনন্তর দীনেশবাবু কবির সভাব বর্ণনা সম্বন্ধে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন ; জীবনী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই।

আমাদের প্রথম পুঁথির লিপিকারের নিবাস ঢাকা-জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন পাঁচরুখি গ্রাম। দ্বিতীয় পুঁথির লিপিকারের নিবাস উক্ত মহকুমার অন্তর্গত কাঞ্চন্ গ্রাম। প্রথম পুস্তকে কবির পরিচয় স্থলে এরূপ লিখা অছে—

'শ্রীমধুসূদন কহে শুন দেবরাজ।
দেখ গ্রাম বন্দিলাম পুস্তকের মাঝ ॥
তপে কাঠারব সহর দৌলতপুর।
পূর্ব্বভাগে লৌহিত্য পশ্চিমে অন্তসপুর ॥
লৌহিত্য পশ্চিমভাগে নানাখির গ্রাম।
এগায় পুরুষ ভট্টাচার্য্য শিবরাম ॥
স্মৃতি শাস্ত্রে পারগ ব্যাসের সম আভা।
পণ্ডিত মণ্ডলি স্থান শ্রীমন্ত যে সভা ॥
তাহার পশ্চিম পথ ক্রোশেক প্রমাণ।
চেঙ্গান চৌখণ্ড ভূমি বিচিত্র নির্ম্মান ॥
তথা বৈসে মধুকণ্ঠ কবিষে পণ্ডিত।
উপজীব্য বৈদ্যবৃত্তি আশ্রমে নাপিত ॥
তাহান রচিত গীত নৈষধ চরিত্র।
শুনিতে আনন্দ হয় অত্যন্ত বিচিত্র ॥'

দ্বিতীয় পুঁথিতে কবির পরিচয় এরূপ লিখিত আছে—

"ভণিত পুস্তক শ্রীমধুসূদন রাজ।
দেশগ্রাম বন্দিলাম পুস্তকের মাঝ।
তপে কাঠারব সহর দৌলতপুর।
পূর্ব্বভাগে লৌহিত্য আশ্রম কতদুর ॥
লৌহিত্য পশ্চিম তীরে নানাখির গ্রাম।
এগার পুরুষ ভট্টাচার্য্য শিবরাম ॥
সর্ব্বশাস্ত্র সমারূপি ব্যাস সম আভা
পণ্ডিত মণ্ডলি স্থানে শ্রীকণ্ঠের সভা ॥
তাহার পশ্চিম পথ ক্রোশেক প্রমাণ।
চেঙ্গান চৌখণ্ড স্থান বিচিত্র নির্ম্মান ॥
তথা বৈসে মধুকণ্ঠ কবিষে পণ্ডিত।
উপজীব্য বৈদ্যবৃত্তি আশ্রমে নাপিত ॥
তাহান রচিত গীত নৈষধ চরিত্র।
শুনিতে সুশ্রাব্য যেন রামায়ন গীত ॥

ইহাতে নিশ্চতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মধুসূদনের বাসভূমি 'চেঙ্গান' গ্রামে ছিল। ইনি ভিষগবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নানাখী গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয় তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। তপে 'কাঠারব' দ্বারা মোগল শাসনের একটী পরগণা সূচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জ সবডিভিসনের অনেক স্থান তপে কাঠারব পরগণার অন্তর্ভূত। সহর দৌলতপুর কোথায় ছিল এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিনাই।*

বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এই সহর বা রাজস্ব সংগ্রহের স্থান ছিল।

*সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় ও ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর (curator) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী M. A., মহাশয়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাঁহারা কোনও নিশ্চিত উত্তর দিতে পারেন নাই।

'লৌহিত্য' ব্রহ্মপুত্রেরই অন্ত নাম। বর্ত্তমান সময়ে অষ্টমী স্নান উপলক্ষে লাঙ্গলবন্ধ নামক যে স্থানে দেশ বিদেশ হইতে তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়, উহা ঐ লৌহিত্যের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সুবিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র-নদের এক শাখা এক সময়ে ঐ পথে প্রবাহিত হইত। অধুনা উহা স্বল্পপরিসর ও শুষ্কপ্রায়। লাঙ্গলবন্ধ হইতে তিন চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে নানাখী নামক গ্রাম। মধুসূদনের অধ্যাপক শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ এখন ঐ স্থানের অল্প দক্ষিণে পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে বাস করিতেছেন। নানাখী হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিম দিকে চেঙ্গান গ্রাম এখনও বিদ্যমান, কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায় মধুসূদনের বাস্তুভিটার চিহ্নমাত্রও নাই।

মধুসূদন কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন। ভট্টাচার্য্য পরিবারের বংশতালিকা হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে মধুসূদন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। মধুসূদনের পাঁচ পুরুষ অধস্তন বংশধর দাণ্ডবৈদ্য প্রায় ১০০ বৎসর হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই হিসাবেও মধুসূদনকে ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে। তাঁহার বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাণীনাথ
|
মধুসূদন বা মধুকণ্ঠ
|
ফকির চাঁদ
|
অপস্তারাম
|
সোনারাম
|
দাণ্ডবৈদ্য — (কন্যা) চন্দ্রকলা

দাণ্ডবৈদ্যের তিনটী কন্যা ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। সুতরাং তাহার পর হইতেই মধুসূদনের বংশ লোপ হয়। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বংশধর এখনও বিদ্যমান আছেন। দাণ্ডবৈদ্যের দৌহিত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। মধুসূদনের পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণ প্রায় সকলেই চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং দাণ্ডশীল মহাশয় এদেশে দাণ্ডবৈদ্য নামে পরিচিত ছিলেন। চেঙ্গান গ্রামে দাণ্ডবৈদ্যের বাস্তুভিটা এখনও বর্ত্তমান আছে। সেখানে এখনও একজন 'নাথ' জাতীয় গৃহস্থ বাস করেন।

চেঙ্গানের নিকটবর্ত্তী দেওয়ানবাগ নামক স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিছুদিন হইল ঢাকা বিভাগের সুযোগ্য স্কুল ইন্‌সপেক্টর মিঃ ষ্টেপলটন সাহেব মহোদয় (Mr. Stapleton) দেওয়ানবাগে ঈশাখাঁ মসনদ আলীর কয়েকটী কামান আবিষ্কার করিয়াছেন। দেওয়ানবাগে ঈশাখাঁর বংশ-ধর মানোয়ার খাঁর রাজধানী ছিল। দাণ্ডবৈদ্যের পূর্ব্ব পুরুষগণ মানোয়ার খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সম্রাট আরংজেবের রাজত্ব সময়ে মনোয়ার খাঁ জীবিত ছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নানাখীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াই মধুসূদন ও তদ্বংশীয়গণ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে যদি আরও অধিক কিছু জানিয়া থাকেন, অথবা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয় থাকে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। কথিত আছে যে, মধুসূদন, তাঁহার পিতা অথবা পিতামহ 'নৈষধ বিজয়' 'জগন্নাথ বিজয়' 'ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য' ও 'মাধব সুলোচনা

কাব্য' ইত্যাদি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকটেই আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, ঐ সকল পুস্তক সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরণ করিলে আমরা নিতান্ত বাধিত হইব।

কবিরাজ শ্রীমদনমোহন শীল দাস
কবিরঞ্জন।

৺লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রত

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন যখন কার্ত্তিকেয়ের পূজা হয় তখন ২১ ছড়া আমন ধান (শাইল ধানও দেওয়া যায়) আর পাঁচটা খুচিমুচি (ছোট ঘট, ছিরিঘটিও বলে) কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তির নিয়ে রাখিতে হয়। তাহার পর যে হাঁড়িতে উক্ত কার্ত্তিকেয়ের পূজার আতপ চাউল দেওয়া হয় তাহা শূন্য করিয়া তাহাতে উক্ত ২১ ছড়া ধান ও পাঁচটি খুচিমুচি রাখিতে হয়। তৎপর অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবার ২১ গাছ দূর্ব্বা হাতে লইয়া, উক্ত পাত্রটীর নিকট বসিয়া, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রতের কথা কহিতে হয়। শেষে মাঘ মাসে বা বৈশাখ মাসে পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় পূর্ব্বের সংগৃহীত ধান ও হাঁড়ির আবশ্যক হয়। ঢাকা জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে এই পূজার বেশী প্রচলন।

ব্রতের কথা

এক ভিক্ষুৎ গিরস্থ বামন আছিল। দুইটা মাইয়া থুইয়া বউটা মৈরা গেল। মা মৈরা যাওনে কন্যা দুইটা করে কি; ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া আওলা খায় আলুনি খায় ঢগর ঢগর পানি খায়। কেচ্‌রা ফুল, কল্‌মি ফুল দিয়া ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে। সেই কন্যা দুইটার মধ্যে একটার নাম রমুনা, আর একটার নাম যমুনা। রমুনা বড়, যমুনা ছোট। রমুনা যে, সে বড় আব্বর (বোকা, বুদ্ধিশূন্য)। যমুনা যে, সে বড় চালাক। তারা বাপের কষ্ট দেখিয়া বড় দুঃখী ছিল। যমুনা রমুনারে কইল, "দিদি ল পরে নিলেও নিব, যমে নিলেও নিব। লও বাবার আধসের চাউলের থিত (স্থিতি) কৈরা থুইয়া যাই। রাজা যে সত্য করছে যার মুখ দেখবে তার নিকটেই কন্যা দান করবে, লও বাবারে হেই খানে পাঠাই।" তখন তারা বাবারে কইল, "বাবা তুমি ফোটাফাটি কইরা রাজ-বাড়ী যাও না?" তখন ভিক্ষুৎ বামন কইল, "মাগো আমার তিন কাল গেছে আর এক কাল আছে আমি আর বিয়া করুম না।" মাইয়াগ কথায় শেষে রাজবাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত হইল। বামন রাজবাড়ী যাইয়া ভিক্ষা চাইল। ভাণ্ডারিরা ভিক্ষা আনবার জন্য রাজার কাছে গেল। রাজা মশয় ভাণ্ডারিগরে কইল, "বামনরে বসবার দেগা।" তারপরে রাজা মশয় আইয়া কইল, "ভিক্ষুৎ বামন তুই বিয়া করস্ না? আমার মাইয়া বিয়া কর।" বামন কইল, "না আমি বিয়া করুম না; আমি বুড়া।" রাজা কইল, "না, তুই বুড়া না, পর্ব্বতের চূড়া। এ কথা কে শুনে কে জানে—তোর বিয়া করতেই হইব।" রাজার কথায় বামন বিয়া করল। বিয়া কইরা দুঃখের মধ্যে সুখ পাইল। তার সেয়ানা (যুবতী) মাইয়া দুইটার কথা একেবারে ভুইলা গেল। মাইয়া দুইটায়

আওলা খায় আলুনি খায়।
ঢগর ঢগর পানি খায়॥

কেচ্‌রা ফুল কল্‌মি ফুল দিয়া পূজা করে। তারপর ৺লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বামনেরে বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া-দিল। তখন ভিক্ষুৎ বামন রাজার কাছে কইল, "আমার দুইটা মাইয়া থুইয়া আইছি আমি বাড়ী যামু।" রাজা মশয় কইল, "হাপ (সাপ) যথায় বেঙ্গুরও তথায়।" বামন পাল্কী কইরা বাড়ী আইল। সঙ্গে অনেক লোক-জন আইল। দেশের লোকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "রমুনা যমুনা ল তোর বাপ বিয়া কইর্‌যা বউ লইয়া

বাড়ীতে আইবার লইছে।" তারা কইল, "অনেক দিন থইরা বাবা বাড়ীত থেনে গেছে, রাজা কি কাইটাই মারল, না কি করল বুঝলাম না। বাবা আমাগ ফালাইয়া এক দিনও কোনখানে থাকে না; সেই বাবা ১২ বছর থইরা রইছে—আমাগ কথা একবার মনেও করে না।" তারপর বাড়ী আইলে তারা বলল, "বাবা তুমি এতদিন থইরা আমাগ ছাইড়া রইছ, আইজ একরাত্র বাড়ী থাক।" বামন কইল, "মাগ, আমি সেই সময় ত কইছিলাম আর বিয়া করুম না।" কন্যাগ কথায় বামন বাড়ী থাইকা রাজার বাড়ী থেনে যে লোকজন আইছে তার খাওয়ার যোগার করল। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রতের ফলে রমুনা যমুনা একজনের পাতে ভাত দিতে একশ জনের পাতে পড়ত। এক জনের পাতে ডাইল দিতে একশ জনের পাতে ডাইল পড়ত। রাজার লোকজন বেশ পরিতুষ্ট হৈয়া খাইয়া রাজবাড়ী চইলা গেল। রাজা মশয় জিজ্ঞাস করল, "মানুষজন, তোরা ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী কেমন খাইলি।" তারা কইল, "রাজা মশয় ডরাইয়াও কমু না, না ডড়াইয়াও কমু না। নির্ভয়ে নির্ভয়ে কমু; "তোমার রাজ-সরকারেও এত খাই নাই।" তারপর একমাসে কানাকানি, সাতমাসে জানাজানি। বামনের এক সুন্দর ছাওয়াল হৈল। মাইয়া দুইটা ভাইডারে লইয়া পূজা করে। এখন হাম্‌কুড়া হিক্‌ছে (শিখছে) বেবাক (সকল) ফেইলা দেয়। কন্যারা কইল, "ওগো সতাই ভাইয়েরে টান দেও, আমরা পূজার সকল কাম করমু।" "কি! আমার বাপে পূজা করে কত হাতী দান করে, কত ঘোরাদান করে। এগুলা কি লো, আওলা খায় আলুন খায়, ঢগর ঢগর পানি খায়" রাজ-কন্যা পোলারে মাইরা থইরা বাপের বাড়ী খবর দিল। সেইখান থিকা পান্ধী আইয়া পোলারে লইয়া গেল। যায় কতদিন বামনের, আর ভাল লাগে না। নিত্যি ভিক্ষা করে। এই দিন বামন পোলা আনবার গেল। রাজা কইল, "তর মাইয়া দুইটা বনে দে। তবে সে তুই পোলা নিতে পারবি।" বামন মাইয়াগ কাছে রাজার কথা কৈল। মাইয়ারা কৈল, "পরে নিলেও নিব বনে নিলেও নিব। ভাইয়েরে বাড়ী আন। আমাগ বনে দেও।"

তারপর বামন পোলা বাড়ীতে আনল। বামন মাইয়া দুইটারে কৈল, "মাগো তোগ কি খাইবার মনে লয়।" তারা কৈল, "ভাল মাছের ঝোল খাই না, পিঠা পরমান্ন কি তা জানি না।" বামন ভিক্ষা করিয়া একটা বড় চিতল মাছ আনল। ধান শুকাইয়া পরমান্ন করিল। সতাই দুই মাইয়ারে বিছানা কৈরা শোয়াইয়া থুইল। মনে ভাবতে লাগল, "ভিক্ষুৎ বামন বাড়ী আইতে আইতে তারাত উঠব অনে (উঠিবে)। উইঠা পোড়াটা দেও ছেচরাটা দেও এই কইবে। যেইর লাইগা এত কৈরা খাওয়াইলাম, এত কৈরা দিলাম, ছাইকপালীরা এত খাইলেও উঠব অনে" কন্যারা কৈল, "তুমি সতাই এত গাইল পার কে (কে=কেন)। যে পর্যন্ত আছি করমুই। শেষে তুমি যা মন লয় কইর।" তারপর ভিক্ষুৎ বামন বাড়ী আইল। রমুনা বাপেরে সন্ধ্যা করবার জল দিপ কোষা দিল। সতাই দেইখা কয়, "কিলো. ছাইকপালীরা দেখি উঠছে।" বামন কইল, "মা তোমরা শুইও না।" বামন দুই কন্যারে হাটুর উপর বসাইয়া আর না আর না করিয়া খাওয়াইল, কইল, "কা'ল মাসী পিসীর বাড়ী যাইও।" তারা কইল, যামু। "মার কালে আছিল না মাসী পিসী, সতাইর কালে দেখি মাসীপিসী।" তারপর রাইৎ থাকতে উঠল। বাপেরে ডাক দিল। "বাবা লও যাই মাসী পিসীর বাড়ী।" তারপর ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা না কইরাই তাড়া-তাড়ি চলিয়া গেল। ইহাতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ তাগরে অভিশাপ দিল। সেই শাপে তাগ এই হইল—যে জিনিস লইতে চায় তাই এক রকমে না এক রকমে নষ্ট হইয়া যায়। তারা পথে যাইতে নল ভাঙ্গে জল খায়, খাগর ভাঙ্গে শাস খায়। কন্যা দুইটা বাবারে কইল, "আর ত হাটবার পারি না।" বামন কইল, "ঐ যে গুয়া গাছ (সুপারি গাছ) দেখা যায় ঐ তোগ মাসীর বাড়ী, ঐ যে

তালগাছ দেখা যায় ঐ তোগ পিসীর বাড়ী।” “আর বড় বেলা নাই আমাগ ঘুম আসে।” ইহা শুইনা ভিক্ষুৎ বামন সেই জঙ্গলে বইসা দুই হাটু পাইতা দিল তার মধ্যে কন্যারা ঘুমাইল। বামন দুইটা ইটার চাকা তাগ মাথার তলে দিয়া বাড়ী চইলা গেল। হাপে (সাপে) সোষায়, বাঘে ডাকে, তা হুইনা মাইয়া দুইটার ঘুম ভাঙ্গল। রমুনা কইল, “উঠ ছে রে যমুনা—দেখ ছে বাবারে সাপে খাইল না বাঘে খাইল।” যমুনা কইল, “হাপেও খায় নাই বাঘেও খায় নাই। বাবা সতাইর বুদ্ধে আমাগ বনে দিছে।” রাইত পোয়াইল। আইলারা (কৃষকগণ) ধান কাটবার লইছে; মাইয়া দুইটা কইল, “ভাই আমাগ ২১ ছড়া ধান দিবা।” এই কথা কইবার পর তাগ খেত (ক্ষেত্র) আগুনে পুইড়া গেল। তারা তাগরে মাইরা, ধইরা, কিলাইয়া, গুতাইয়া খেদাইয়া দিল। একজন তেঁতুল পারবার লইছিল, তার কাছে গিয়া কইল, “ভাই আমাগ কয়েক ছড়া তেঁতুল দিবা? আমরা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করমু।” এই কথা কইবার পর তার সকল তেঁতুল কাপারা কুনারা (নষ্ট) হইয়া গেল। সেখানেও কিল গুতা খাইল। তার পর কুমার বাড়ী গিয়া ৫টী খুচিমুচি চাইল। কুমারের পুইন (পাতিল কলস যেখানে পোড়া দেয়) ফুইট্যা গেল। কুমারও মাইরা ধইরা খেদাইয়া দিল। তারপর গেল কেচরা ফুল ও কলমী ফুল তুল্‌তে। যে ছিল আটু (হাটু) জলে সে গেল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে সে গেল অথাই জলে (সাঁতার জলে)—অতিকষ্টে তুল্‌ল। ফুল তুইলা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করল। তারপর আইলার কাছে গেল। আইলারা কইল, “মা আইছ, ধন আইছ, যত পার হেত (তত) নেও।” তারা কইল, “নিবার আইছি না; দিবার আইছি, কাইল যে দিছ, তা (তাহা) শোধ দিবার আইছি।” তারা একুশ ছড়া ধান দিল। আইলারা সমস্ত ধান নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী দিল। ভিক্ষুৎ বামন মনে মনে কইল—“আমার যে দুইটা বউমা (বড়) মাইয়া আছে তারা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করবার লইছে, এইতে (এইজন্য) এত ধান আমার বাড়ী আস্‌ছে।” তারপর তেঁতুল আলার কাছে গেল সেও কইল, “মা আইছ না ধন আইছ, যত পার হেত নেও।” তারা কইল, “নিতে আইছি না, দিতে আইছি, কাইল যে দিছিলা তা শোধ দিবার আইছি।” এই কইয়া তারা কয়েক ছড়া নিল। সেই সমস্ত তেঁতুল নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী দিয়া আইল। এইমত কুমার বাড়ীতেও গেল। একটা চাইয়া শতটা ঘটি পাইল। শেষে গেল কেঁচরা কলমী ফুল তুল্‌তে; যে ছিল অথাই জলে সে আইল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে সে আইল আটু জলে। তারা অনেক ফুল তুল্‌ল। সেইখানে দেখল কি মোহরের মাইট (মট্‌কী) আছে। তারা সেইটা লইয়া বাপের কাছে গেল। বল্‌ল কি—“বাবা আমাগ সোণার ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি বানাইয়া দেও। সোনার খুচিমুচি বানাইয়া দেও। একটা ভিন্ন কুইড়া (কুটীর) ঘর বানাইয়া দেও। আমরা এইটাতে থাকমু।” তখন সতাই দেইখা কইল, “ও মা এই কিলো। এইগুলারে হাপেও খায় নাই, বাঘেও খায় নাই।” তখন তারা কইল, “কি সতাই বক কে (কেন)? আমরা থাকবারও আসি নাই, খাইবারও আসি নাই। বাবার কাছে দুইটা কথা কইবার আইছি।” তারপর তারা আবার বনে চইলা গেল। সেখানে গিয়া রাখাল পোলাপানেরে কইল, “আমরা একটা টাকা দিবনে আমাগ একটা কুইড়া ঘর বানাইয়া দেও।” তারা দেখাদেখি ঘর বানাইয়া দিল। কয়েকদিন গেলে পর তারা নল ভাঙ্গে জল খায়, খাগর ভাঙ্গে শাস খায়। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে। এই ভাবে তাগ দিন যায়। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মনে ভাবল “আমি এই তাগরে কতদিন পহর (পাহাড়া) দিমু।” তখন এক দেশের একরাজারে শিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হেই (সেই) রাজার পাটরাণী ছিল সাত জন। তাগর জালায় রাজা সব সময় অস্থির থাকত। রাজা কইলেন,

"সন্ধিকারী (বোধকরি মন্ত্রী) চল আমরা শিকারে যাই।" সন্ধিকারী বিয়া করে নাই। রাজার লগে শিকারে আইল। শিকারও হৈল না শুকারও হৈল না। অখন (এখন) তারা জল পিপাসায় প্রাণে মরে। রাজা সঙ্গের লোকজনরে কইল, "দেখ মানুষ জন, আমাগ দুইটা ঘোরা নিয়া তোমরা দেখ কৈ জল আছে। আম্‌রা দুই জন এই জাগায় থাকি।" লোকজনে দেখল অনেক দূরে চিল কাউয়া উড়তেছে। হেখানে গিয়া দেখে যে সাম্‌নে দীঘি পাছে দীঘি, তার উপর দুই ঠ্যাং (দুইপদ) থুইয়া সোনার ডাং (লাঠি) হাতে নিয়া ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বইসা আছেন। লোকজন জল আনতে গইছে এমন সময় ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর বলল, "এই জাগায় জল পাবি না।" লোকজন কইল "আমাগ রাজা ও সন্ধিকারী জল পিপাসায় মরতেছে।" ঠাকুর কইল, "মরুক আর বাচুক তাতে আমার কি? ঐ যে দেখ দুইটী কন্যা ব'ইসা আছে যারা মাথা চাওয়াচাওয়ী (পরস্পরের মাথা হইতে উকুন আনা) করিতেছে তাগর কাছে যাও। তারা তোমাগ জল দিবে।" তারা কন্যার কাছে গেল। মাইয়ারা জিজ্ঞসা করল, "তোমরা আচরণী না অ-আচরণী (যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় তাহারা আচরণী, যাহাদের জল পান করা যায় না তাহারা অ-আচরণী)।" তারা কইল, "আম্‌রা আচরণী। মেয়েরা ২॥• আড়াই হাত চুল মাইপা জল ভইরা দিল। ঐ জল রাজা খাইল, সন্ধিকারী খাইল, পাইক পাইক (সিপাহী) সকলে খাইল। যে জল গারু (ঝারি) সেই জল গারুই রইল। যে জায়গায় সেই জল গারু পড়ল সেখানে পুষ্করণী হৈয়া গেল। রাজাও সন্ধিকারী কইল "ঐ মানুষজন তোরা কি জানস।" তারা কইল, "আম্‌রা কিছু জানি না। দুইটা কন্যায় আমাগ জল দিছে।" রাজা সন্ধিকারী লোক জনের লগে সেই কন্যার কাছে গিয়া হাজির হইল। গিয়া দেখে তারা মাথা চাওয়াচাওয়ি করতেছে। তারা (রাজা ও সন্ধিকারী) তাগর চুল ধইরা কইল, "তোরা ভূত না প্রেত?" তারা কইল, "আম্‌রা ভূতও না প্রেতও না।" ইয়া (ইহা) শুইনা (অর্থাৎ পরিচয় পাইয়া) রাজা ও সন্ধিকারী জিকুৎ বামন্‌রে দুই বাটী ভইরা টাকা দিয়া রাজা যমুনারে, সন্ধিকারী যমুনারে বিয়া করল। কয়েক দিন পর রমুনার পোলাপান হইল। রমুনা যা কর্‌ত সতীনগ জ্বালায় তা সামাই (সামলান, ঠিক রাখা) হইত না। সন্ধিকারীর বউ (যমুনা) যা করত তা সামাই হইত। একদিন রমুনা ৺লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করবার লাইগা পোলা সতীনগ কাছে থুইয়া পূজার বেবাক (সকল) আয়োজন কইরা লইছে, এমন সময় সাত সতীনে যুক্তি কইরা পোলা ছাইড়া দিল। পোলা পূজার জিনিস লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। তখন রমুনা পোলারে মধম থামে (ঘরের মধ্যে একটী থামকে স্ত্রীলোকগণ সময় সময় পূজা দিয়া থাকেন। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সেই থামকে প্রণাম করিতে হয়, কোন স্থানে যাইতে হইলে সেই থামকে প্রণাম্ করারও প্রথা আছে) বাইন্ধা পূজা করতে লাগল। রাজা আইসা দেইখা রাগে লাথি দিয়া পূজার জিনিস সকল ফালাইয়া দিল। এর লাইগা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের কোপে রাজার সকল রাজ্যসম্পদ নষ্ট হইয়া গেল। রাজা সন্ধি-কারীরে জিজ্ঞাস করল, "আমিও বোনা কন্যা বিয়া করছি তুমিও বোনা কন্যা বিয়া করছ, তবে আমার কেন এত দুখ তোমার কেন এত সুখ।" এই বইলা রাজা সন্ধিকারীকে কইল, "তুমি আমার বোনা স্ত্রী আর তার পোলাটারে কাট, আমি তাগর রক্ত দিয়া স্নান করমু।" এই হুইনা সন্ধিকারী মহা বিপদে পড়ল। রাজা স্ত্রীরে ও পোলারে কাটবার জন্য সন্ধিকারীর হাতে দিল। স্ত্রী কইল, "এখন যা রাজা মতিচ্ছন্ন হইছে, পরে আপশোষ করব। এখন বিলাই কুত্তা কাইটা তার রক্ত দিয়া রাজারে স্নান করাও।" সন্ধিকারী তাই করল। রাজা মনে করল—"তার স্ত্রী পুত্র গেছে।" এই দিকে বহু কষ্টে

রাজার স্ত্রী ভিক্ষা কইরা খাইতে লাগল। একদিন তার পোলা দিয়া মাসীর সঙ্গে (যমুনার সঙ্গে) দেখা করল। মাসী বৈন্ পোয়ে চিনতে পাইরা পরম যত্ন করতে লাগল। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর, পথে, ঘাটে, মাঠে রাজা যেখানেই যায়, তার নানা বিঘ্ন বিপদ ঘটাইতে লাগল প্রাণে মারল না।

রাজা তখন মনে মনে ভাবতে লাগল, "যে দিন আমি ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা নষ্ট করছি। সেই দিন থেইকা আমার কপাল ভাঙ্গছে আমি আবার ঠাকুরের পূজা করমু।" এই বইলা যখন রাজার সুমতি হইল, তখন ঠাকুরের কোপ গেল। রাজারও স্ত্রীপুত্রের কথা মনে হৈল। শেষে রাজা ভক্তিভরে ঠাকুরের পূজা কইরা হারাধন সকল পাইল।

অখন রাজা পূর্ব্ব সম্পদ পাইয়া মহা ধূমধামে পূজা করল। দেখাদেখি দেশময় পূজা প্রচার হৈল। এই পূজার ফলে সন্তানাদির মঙ্গল ও লক্ষ্মীর কৃপা হইয়া থাকে।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

লক্ষ্মী-চরিত্র

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

লক্ষ্মী হিন্দু জাতির সুখ-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এজন্য লক্ষ্মীর রূপকল্পনায় ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। তিনি গজশুণ্ডধৃত হেমকুম্ভনিঃসৃত স্নিগ্ধ সলিলস্নাতা; সুপ্রফুল্ল কমল সকল তাঁহার হস্তে শোভা পায়; বহুমূল্য রত্ন সকল তাঁহারই অধিকারে—তজ্জন্য ঐশ্বর্য্যবান মানব সতত কমলার কৃপা ভিখারী। বঙ্গ সমাজে ঐশ্বর্য্যবান লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও বাঙ্গালীর চির অশান্তিময় জীবন মরুপথে একটি সুখশীতল পান্থশালা আছে। সেইপান্থশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মঙ্গল, হস্তের স্পর্শে বাঙ্গালী জীবন-সংগ্রামের সমস্ত আঘাতের কথা বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব শান্তিসাগরে ডুবিয়া যায়। বঙ্গবাসী বিশ্ব খুঁজিয়া এ শান্তির উপমা পায় না। এত প্রেম—এত ভালবাসা—এত আত্মদান বাঙ্গলার কুটীরবাসিনী জননীগণ ব্যতীত আর কার হৃদয়ে সম্ভবে! এজন্যই বাঙ্গালী গৃহশান্তি-বিধায়িনী জননীগণকে ভক্তির চক্ষে দর্শন করেন। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রান্তদেহে গৃহপ্রত্যাগত বাঙ্গালী শ্রমজীবী যখন দেখে তাহার জন্য সুখাদ্য অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া এক দেবী পথ-পানে চাহিয়া আছেন, তখন তাহার সমস্ত অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়। রোগশয্যাশায়ী বাঙ্গালী যখন দেখেন, তাহার পার্শ্বস্থিতা এক দয়াময়ী দেবী অনন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, দৃষ্টিতে অনন্ত কল্যাণ-কামনার ভাব ব্যক্ত—দারিদ্র্যের ঘোর নিষ্পেষণে আত্মহারা বাঙ্গালী যখন বুঝেন তাঁহার দুঃখের সম-ভাগী বর্ত্তমান আছে, তখন বাঙ্গালী সর্ব্বমঙ্গলা জননী-জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মস্তক নত করেন।

বঙ্গদেশে তথা ভারতে নারী জাতির প্রতি যত সম্মান জগতের আর কোথাও তেমন নাই। ভারতবাসী সেবাধর্ম্ম ভালবাসেন, ও স্ত্রীজাতির সম্মান জানেন এজন্য ভারত-সন্তান সতী জননীগণের পবিত্র নাম স্মরণান্তর প্রভাতে শয্যাত্যাগ করেন। বঙ্গ দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা অতীতকাল হইতে দ্বারে দ্বারে স্ত্রীজাতির চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। এই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া মহিলাগণ তাঁহাদের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লন। তাহারা যখন সুর তুলিয়া গান করিতে আরম্ভ করে, কুলবালাগণ হস্তের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তখন বাঁশরীতানমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই গান "লক্ষ্মীচরিত্র গান" নামে খ্যাত। কখন কখন বৃদ্ধা পিতামহী নাতিনী দিগকে লইয়া সন্ধ্যায় সকালে এই গানের আলোচনা করিয়া থাকেন। যে রমণী নারায়ণপদসেবিকা কমলার ন্যায় স্বীয় স্বামীর সেবা সম্পাদন করেন, জননী স্বয়ং তাঁহাকে নিজতুল্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রায় ১২৫ বৎসরের পূর্ব্বে হস্তলিখিত একখানা "লক্ষ্মী-চরিত্র" পুথির আলোচনা সহকারে সমাজে লক্ষ্মী-চরিত্রের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এই পুস্তকখানা কখন রচিত হইয়াছে ঠিক জানা যায় না। কারণ উহাতে গ্রন্থ রচনার কাল ও গ্রন্থকারের পরিচায়ক কোন বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থশেষে লিপিকার "জথা দিষ্টং তথা লিখিতং" এই উক্তির পর—"নামাক্ষর শ্রীরাম শরণ সর্ম্মন। ইতি সন ১২০৪" ইহা লিখিয়া স্বকীয় পরিচয় ও অনুলিপি কাল জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নারায়ণ কৌতুকভরে কমলার নিকট নারী জাতির চরিত্র জানিবার জন্য প্রশ্ন কারয়াছেন সেই প্রশ্নোত্তরে লক্ষ্মী সুচরিত্রা ও কুচরিত্রা উভয়বিধ নারীর স্বভাব নারায়ণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রন্থসূচনা

জননীর প্রতি নারায়ণের প্রশ্নে গ্রন্থ সূচিত এবং লক্ষ্মীর সুদীর্ঘ উত্তরে উহা পরিসমাপ্ত। কোন কোন গ্রন্থকার দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ বর্ণনা সহকারেও গ্রন্থ সূচনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য লক্ষ্মী-চরিত্রের গ্রন্থকার নিম্ন ভণিতায় গ্রন্থ সূচনা করিয়াছেন।

"ময়ূর পুচ্ছ সিঙ্গাসনে য়াছএ বসীয়া।
নারী তরে পুছএ হরী কতুক করিয়া॥
কোন কোন ঘরে তুম্মি বেড়াও ভ্রমিয়া।
কোন দোসে জাও তুম্মি পুরুষ ছাড়ীয়া॥
তাহার বীধান কিছু কহ মোর স্থানে।
তোমার চরিত্র আম্মি শুনিব শ্রবনে॥"

নারায়ণের প্রশ্ন শুনিয়া চঞ্চলা দেবী হাসিতে হাসিতে আগে পুরুষ-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, "জনার্দ্দন, আমি কথিত দুর্লক্ষণ সম্বলিত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যবানকে আশ্রয় করি। যে পুরুষ—

"চিন্তাযুক্ত সর্ব্বক্ষণ থাকএ বসীয়া।
গাএ গাএ (১) ঘরীসন নিশিতে উঠিয়া॥
গাএ গাএ (২) ঘুশে জেবা গুরুর নিন্দন।
তাহাকে ছাড়িএ আম্মি শুন নারায়ণ॥
বাসি পুচ্প (৩) পৈরে জেবা উষাতে নিদ্রা জাএ॥
ভগ্ন য়াসনে বসি জেবা অন্ন খাএ॥
অন্ন মারি হাড়ী (৪) জেবা করএ লঙ্গন।
তাহারে ছাড়িএ আমি সুন নারায়ণ॥
মায় সতমায় জেবা করে অনাদর।
পুনি ২ ছাড়ি আম্মি শুন দামুদর॥
উ'চষ্ট ছুইয়া জেবা করএ ভোজন।
স্নান করী তৈল মাথে তেজি সেই জন॥
অন্দকারে ভোজন করে ত্রেন (৫) ছিড়ে নখে॥
আপনে কুভেস করি আঙ্গুলে ভূমী লেখে॥
আপনার য়ঙ্গে জেবা আঙ্গুলে বাজাএ।
সঞ্চিত তাহার ধন সব হরি জাএ॥
পামর পুরুস জেবা স্ত্রিরী সেবা করে।
কোন দীন না জাই আম্মি সেই ছারের ঘরে॥
অভক্ষন ভক্ষন করে অগম্য গমন।
বিবসন হইয়া জেবা করএ সয়ন॥
প্রদিপের তৈল মাথে তেজি সেই জন।
তাহারে ছাড়িএ আম্মি শুন নারায়ণ॥
ভাল মন্দ না বাছিয়া ভোজন জেবা করে।
সৈন্দাকালে জেই জন নিদ্রা জায় ঘরে॥

(১) গাএ, গাএ—গাত্রে গাত্রে
(২) গাএ, গাএ—গ্রামে গ্রামে
(৩) পুচ্প—পুষ্প
(৪) হারী—হাঁড়ি
(৫) ত্রেণ—তৃণ

(১) তীতা পিঁড়িতে বসী ভোজন করএ।
তাহারে ছাড়ি আমি শুন দয়াময়॥
আপনে তুলিয়া পুচপ মালা গাঁথি পরে।
সৈন্ধাকালে প্রদীপ না দেখি জার ঘরে॥
আপনি পিসিয়া চন্দন পরে জেই জন।
তাহারে ছাড়িএ আমি শুন নারায়ণ॥"

অতঃপর লক্ষ্মী নারায়ণ সমীপে স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ বর্ণন করিলেন: এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে লক্ষ্মী সুচরিত্রা রমণীগণকে নিজের তুল্যা বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছেন।

"নিজ স্বামী পরিচর্য্যে করে জেই জন।
সেই নারী পতিব্রতা শুন নারায়ণ॥
পতিব্রতা নারীর কথা শুন নারায়ণ।
সকল কহিব য়াম্মি সংক্ষেপ করিয়া॥
দেবতা সমান জানি করিয়া সেবন।
পতি বীনে অন্ত ভাব আর নাই মন॥
গো ধেনুর গৃহ জেবা পরিচর্য্যে করে।
ধন ধান্তে পুত্রে পৌত্রে বর দিব তারে॥
নিজ স্বামী পরিচর্য্যে করে জেই জন।
তাহার সরিরে য়াম্মি থাকী সর্ব্বক্ষণ॥
স্বামীর বচন জেবা পালে সর্ব্বক্ষণ।
সেই নারী পতিব্রতা শুন নারায়ণ॥
দেবতা অধিক পূযা করে সত গুণ।
দয়া করি স্বামীরে রাখিব সর্ব্বক্ষণ॥
নানা প্রকারে দেব পূজীব জেই মত।
স্বামীকে সেবিব নারী একমন চিত্তে॥
বিবীধ প্রকারে দেব পূজিলে জেবা হএ।
তাহা হতে অধিক ফল স্বামিক সেবএ॥
স্বামী বিনে নারীর নাহিক দেবতা।
স্বরূপে তোমাতে আম্মি কহিলাম কথা॥
সর্ব্বক্ষণ হাস্তমুখে থাকে স্বামীর সংগে।
কটাক্ষে ইষৎ হাস্ত থাকিবে নানা রঙ্গে॥
ভাগ্যবতি স্বর্গগতী শেসব রমণি।
স্বামীর আজ্ঞাএ সর্গগতী স্বামী-পরায়ণি॥
চিকন দশন যার চিকন ছুই স্তন।
তাহারে প্রসন্ন হই শুন নারায়ণ॥
হস্ত পদ্মসম দীপসমা জেই নারি।
উমাপদে ভাবে ভক্তি তাহারে না ছাড়ি॥
নাভি গম্ভির জার পঙ্কজো লচন।
শ্যাম বর্ণ গাও যার ধীর গমন॥
সর্ব্বক্ষণ থাকি আমি তাহার শরীরে।
... ...
নিত্য জেবা স্নান করে পবিত্র কলেবর।
তাহার অঙ্গেতঃ আমি থাকি নিরন্তর॥
ভক্তি ভাবে স্বামী সেবা ভোজন করাএ।
শ্রধা যুক্ত হইয়া জেবা তোমার নাম লএ॥
এসব লক্ষন তবে যে নারীয়ে ধরে।
সর্ব্বক্ষন থাকী য়াম্মি তাহার শরিরে॥
যে নারী সুভার্য্যা পুণি স্বামী সেবা করে।
সসুর সাসুরী সেবা নিরান্তর করে॥
এমত লক্ষণ করএ জেই জন।
সর্ব্বক্ষণ থাকি য়াম্মি তাহার ভবন॥"

অতঃপর দুর্লক্ষণা রমণীগণের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থানে কেমন সুন্দরভাবে কুচরিত্রার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

পিঙ্গল খড়ম পায় (১) চিকুন রাজুলী।
সেই নারি অলক্ষিনী শুন চক্রপাণি॥

---

(১) তীতা—ভিজা, আর্দ্র। এই শব্দটি তিতিল শব্দ হইতে আগত—বলিয়া মনে হয়। "তিতিল বসন তার নয়নের নীরে।" মাইকেল

(১) চলিবার সময় যে রমণীর পদতল সম্যক্ ভূমি স্পর্শ করে না খড়মের তলার ন্যায় মধ্যাংশ উচ্চ থাকে তাহাদের "খড়ম পাও" নারী বলে। বর্ত্তমান সময়ও বিবাহের পাত্রী নির্ব্বাচন সময় বরপক্ষ সাবধানতার সহিত এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকে।

উচ্চ কপাল যার ... ... ছুই সারি।
সরির অধিক জার সেই দুষ্ট নারী (২) ॥
পিঙ্গল লোচন যার ডাগর নয়ণ।
সেই নারী অলক্ষিনী শুন নারায়ণ ॥
যেই নারী স্বামী যঙ্গ ভ্রমে নিত নিত।
নিজ স্বামী তেজি জার নষ্ট হয় চিত ॥
নানা য়লঙ্কারে য়ঙ্গ ভূষিত করিয়া।
পথে পথে ফিরে নারী নষ্ট চিত্ত হৈয়া ॥
স্বোয়ামী নিন্দা করে জেই পর লাগে ভাল।
সে ছারের ঘরে আস্মি না জাই কোন কাল ॥
স্বোয়ামী বাক্য অন্য স্থানে কহে জেই জন।
সেই নারি য়লক্ষিনী শুন নারায়ণ ॥
স্বামীর বাক্য না পালএ সেই দুষ্ট গামী।
সে ছারের ঘরে কভো নাই জাই আস্মি ॥
স্বামীকে পাড়এ গালি গুরুজনে দোশে।
তিল মাত্র না জাই আস্মি সে নারীর পাশে।
সেই নারী সম পাপি ত্রিভুবনে নাই।
অলক্ষিন সে নারি কহি তোম্মার ঠাঁই ॥

লক্ষ্মীর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রদর্শিত হইল। বাংলার নানাস্থানে এই লক্ষ্মী-চরিত্র নানাভাবে রচিত ও গীত হইয়া থাকে। যশোহরের ডোমগণ যেমন দেশে দেশে শীতলা মঙ্গল গাহিয়া বেড়ায়, ফরিদপুরের দরিদ্র মুসলমানগণ তদ্রূপ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অদ্যাপি লক্ষ্মীচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকে। গায়ক পারিশ্রমিক স্বরূপ খাদ্যদ্রব্য অথবা কোথাও দুই একটি পয়সা পাইয়া থাকে। এই স্বল্পতুষ্ট ভিখারীর দল দেশের যে মহা উপকার করিয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে কেহই চিন্তা করেন না। আমাদের দেশে সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কোন উচ্চ অঙ্গের ব্যবস্থা নাই। অথচ স্ত্রীজাতির উপর আমাদের গৃহস্থালীর সুখ শান্তি সম্যক নির্ভর করে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের নবীনারা প্রায়ই বৃদ্ধাদের আদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্মী-চরিত্র-গায়ক ভিক্ষুকদল স্ত্রীলোককে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম চলাফেরা কথা বার্ত্তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়া থাকে। লক্ষ্মীচরিত্রগায়কের বাক্যকে কুলকামিনীরা দেবদূতের বাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন।

স্বামীসেবা সম্বন্ধে লক্ষ্মী-চরিত্রে যে মনোহর উপদেশ আছে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্মী-চরিত্র-গায়কগণ সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে অনেক কথা লক্ষ্মী-চরিত্রের সঙ্গে যোগ করিয়া সমাজে প্রচার করিত। নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থ হইতে খাদ্য বিচার সম্বন্ধে মাত্র চারি পংক্তি উপদেশ উল্লেখ করিলাম—

"আর এক কথা শুন দিয়া মন।
যেই দিনে যেই দিব্য খাইতে নিষেদন ॥
প্রতিপদেরে কুষ্মাণ্ড না করএ ভোজন।
দ্বিতীয়াবে নিম্বে খাইতে নিষেদন।" ইত্যাদি

এই প্রকার তিথি বিশেষে খাদ্য বিচার ও অন্য বহু গার্হস্থ্য বিধি লক্ষ্মী-চরিত্রে স্থান পাইয়াছে।

লক্ষ্মী চরিত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অঙ্কপাত করিয়া কোন সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। লক্ষ্মী-চরিত্রের উৎপত্তি কাল সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা তাহা আশাও করিতে পারি না; তবে রচনার প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এই লক্ষ্মী-চরিত্রকে বঙ্গভাষার প্রথম যুগের (কেহ কেহ বলেন খৃঃ ৮০০—খৃঃ ১২০০) বলিয়া মনে হয়। যেদিন বাংলা সাহিত্যে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ লাভ করে নাই সেদিনে বাঙ্গালী গৃহস্থালী কার্য্য সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা কবিতার আকারে প্রকাশ করিতেন। এই কবিতাগুলি সমাজের সকলেরই কণ্ঠস্থ থাকিত। খনার বচন, ডাকের বচন, লক্ষ্মীচরিত্র ইত্যাদির মূল বর্ণনীয় বিষয় এক, অর্থাৎ

(২) সম্ভবতঃ হস্তিনী নারীকে লক্ষ্য করিয়া একথা বর্ণিত হইবে।

উহাতে সমাজবাসীর অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ডাকের-বচন ও লক্ষ্মীচরিত্রের বর্ণনায় স্থলে স্থলে এমন সুন্দর মিল দৃষ্ট হয় যেন উভয় প্রকার "গাথা" একই ব্যক্তির উক্তি।

আমরা ডাকের বচন হইতে তিনটি অংশ উল্লেখ করিলাম। উহা হইতে লক্ষ্মীচরিত্র ও ডাক বচনের প্রকৃতি স্পষ্ট হইবে।

(১)

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্পকেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে নারী ঘর উজাড়॥

(২)

নিকট পুকুর দূরে যায়।
পথিক দেখিলে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাসে ঘাটে থিকে।
ডাক বলে নারী ঘরে না টিকে॥

(৩)

সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভক্তি॥
রৌদ্রে (১) কাঁটা কুটার রাঁধে।
খড় কাঠ বর্ষাকে বাঁধে॥
কাখে কলসী পানীকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাকহো না চায়॥
যেন যায় তেন আইসে।
ডাক বলে গৃহিণী সেই সে॥

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে লক্ষ্মীচরিত্র ও ডাক বচনের সাদৃশ্য প্রমাণীকৃত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত, "এই কবিতাগুলি প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ ছিল না, যুগে যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।" এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা সে বিষয়ের বিচার করা আমার ইচ্ছা ও শক্তির বহির্ভূত। গঙ্গার পূত সলিলে অবগাহন করিয়া দেহমন শীতল করিব; উহার তরঙ্গ গণিয়া লাভ কি? *

শ্রীচিন্তাহরণ দে।

(১) গ্রীষ্মকালে

* আলোচ্য পুথিখানি ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে।—লেখক

ভাসকৃত পঞ্চরাত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

দুর্য্যোধন, হস্তিনার রাজা।
ভীষ্ম, দুর্য্যোধনাদির পিতামহ।
দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রগুরু।
কর্ণ, দুর্য্যোধনের সখা—অঙ্গদেশের রাজা।
শকুনি, দুর্য্যোধনের মাতুল—গান্ধার দেশের রাজা।
বৃদ্ধ গোপালক, গো-রক্ষক।
গোমিত্রক, জনৈক গোপাল।
বিরাট দেশের রাজা।
ভগবান, ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
ভীমসেন, ধর্ম্মপুত্রের কনিষ্ঠ সহোদর (দ্বিতীয় পাণ্ডব)
অর্জ্জুন, ঐ (তৃতীয় পাণ্ডব)
বৃহন্নলা, নারীবেশী অর্জ্জুন।
অভিমন্যু, অর্জ্জুনের পুত্র।
উত্তর, বিরাট-রাজ-কুমার।
কাঞ্চুকীয়, দূত, সারথি, ভট প্রভৃতি।

পঞ্চরাত্র

স্থাপনা

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্র। যিনি কৃষ্ণবর্ণ, পৃথিবীতে যিনি অর্জ্জুন ও ভীমের দূত হয়েছিলেন, যিনি শকুনীশ্বর গরুড়ের ঈশ্বর,

যিনি যুদ্ধে শত্রুগণের অনভিগম্য, ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্থির, যিনি প্রশস্তকর্ম্মা, যিনি যজ্ঞে আহুত হয়ে থাকেন, সেই বিরাট শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন। *

(পরিভ্রমণ করিয়া) সমবেত আর্য্যগণকে এরূপই বলব। একি! আমি একান্ত উৎসুক হয়ে বলতে যাচ্ছি সত্য, কিন্তু একটা শব্দ যেন শুনছি। তাইত, আচ্ছা দেখছি।

(নেপথ্যে) আহা, এই যজ্ঞ কুরুপতির বিপুল সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক বটে!

সূত্র। হয়েছে, বুঝেছি;

কুরুরাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞ কচ্ছেন, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ দেখবার জন্য পত্নীবর্গের সহিত প্রফুল্লচিত্তে এখানে সমাগত হয়েছেন। [প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক

তিন জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ

সকলে। অহো! কুরুরাজের যজ্ঞের কি বিপুল সমারোহই হয়েছে!

প্রথম। চতুর্দ্দিকে দ্বিজোচ্ছিষ্ট অন্ন, যেন সর্ব্বত্র কাশ-কুসুম ফুটে আছে। ধূম-গন্ধে তরুগণের কুসুম-গন্ধকে নষ্ট করে দিয়েছে। ব্যাঘ্রগণ পর্ব্বত প্রদেশে মৃগের ন্যায় বিচরণ কচ্ছে, এবং সিংহসমূহও হিংসা-পরাঙ্মুখ হয়েছে। মহারাজ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত জগৎও দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়। তুমি ঠিক বলেছ।

অগ্নি দেবগণের মুখ স্বরূপ।* তিনি হবি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেছেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ধনলাভে তৃপ্ত হয়েছেন, গোকুলের সহিত পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করেছে, এবং সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গও সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলকথা, সমগ্র জগৎ হৃষ্ট হয়ে মহারাজের গুণকীর্ত্তন কচ্ছে, এবং এইরূপে তাঁহার সদ্‌গুণাবলী † পৃথিবী অতিক্রম করে দেবালয়ে (স্বর্গে) পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয়। সমাগত ব্রাহ্মণগণ, দেখুন, দেখুন—

মহারাজের পট্টবেষ্টিত মস্তকে দ্বিজগণের স্থাপিত চরণ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! ইঁহারা সকলেই শ্লাঘ্য ও সুবিখ্যাত এবং স্বাধ্যায়-গুরগণের অগ্রণী। বৃদ্ধকালে ইঁহাদের তপোনিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। বৃদ্ধ গজ-গুলি যেমন বলবান হস্তীর স্কন্ধদেশে শুণ্ড স্থাপন ক'রে অগ্রসর হয়, সেরূপ বর্ষাতিশয়ে শিথিল-চরণ বিপ্রগণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধরে অগ্রসর হচ্ছেন, আবার একটি যষ্টি ইঁহাদের তৃতীয় চরণের পংক্তি-স্থানীয় হয়েছে।

সকলে। ওহে যজ্ঞ-ব্রতী পুরোহিতগণ, মহারাজের যজ্ঞান্ত-স্নান না হলে আপনারা যজ্ঞাগ্নি পরিত্যাগ করে যাবেন না।

প্রথম। ধিক্, ধিক্, তুমি যে ব্রাহ্মণসুলভ চপলতা দেখালে দেখছি!

কনকময় এই সুন্দর যূপটি দেখে বোধ হচ্ছে যেন দেবী বসুধা একটি সুবর্ণময় ভুজ তুলে রেখেছেন। দ্বিজ যেমন স্বীয় পার্শ্বে শূদ্রের ‡ উপস্থিতি সহ্য কত্তে পারেন না, তদ্রূপ যজ্ঞবেদিকার অগ্নিও পার্শ্বে লৌকিকাগ্নি সহ্য কত্তে

---

* দ্রোণঃ, পৃথিব্যর্জ্জুন-ভীম-দূতো,
যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য।
দুর্য্যোধনো, ভীষ্মযুধিষ্ঠিরঃ স
পায়াদ্ বিরাড়ুত্তরগোঽভিমন্যুঃ॥

---

* মূলে "অমরোত্তমমুখং" পাঠ আছে। আমি 'অমরোত্তমমুখঃ' পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

† মূলে 'তদ্‌গুণৈঃ, পাঠ আছে, কিন্তু 'তদ্‌গুণঃ' পাঠ ধরিলেই অর্থপ্রতিপত্তি সহজ হয়।

‡ "পার্শ্বে বৃষলং ন সহতে"—বৃষল শব্দ ঐতিহাসিকের পক্ষে এ স্থলে বড়ই মূল্যবান।

পারে না। ঐ দেখ হরিত কুশে আস্তীর্ণ থাকাতে যজ্ঞ-বেদীর পৃষ্ঠদেশ সমধিক দগ্ধ হতে পারে নাই। আর গজ যেমন প্রফুল্ল পদ্মবনে (সরোবরে) প্রবেশ করে, এই ধূমও সেইরূপ যজ্ঞগৃহের পুরোবর্ত্তী গৃহে প্রবেশ কচ্ছে।

দ্বিতীয়। কুল কলঙ্কিত হলে জ্ঞাতি যেমন জ্ঞাতি-ভয়ে স্থানান্তরিত হয়, সেরূপ অগ্নিতাপে নিপীড়িত দ্বিজগণ অগ্নি-ভয়েই অগ্নিকে স্থানান্তরিত কচ্ছেন। *

তৃতীয়। অপত্যনাশে শোকার্ত্তা নারী যেরূপ পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃ শোকানলে দগ্ধ হয়, সেরূপ ঘৃতপরিপূর্ণ (যজ্ঞীয়) ক্ষুদ্র শকটখানিতে জল সিঞ্চন করা সত্ত্বেও সদ্য ঘৃতে (স্নেহ) আগুন ধরেছে বলে জ্বলে যাচ্ছে।

প্রথম। তুমি বেশ বলেছ—

শুষ্ক দণ্ড আশ্রয় করে অগ্নি যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত দুর্য্যোধনের এই ক্ষুদ্র শকটটি দগ্ধ কত্তে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু নূতন তৃণে ঢাকা রয়েছে বলে থেকে থেকে খর্ব্ব হয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ,বায়ু-তাড়িত হয়ে শিখাবিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশঃ শকটের চক্র পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ঐ যে, দেখতে দেখতে, নেমীতে আগুন ধরে গেল, এবং মণ্ডলাকার অগ্নিরাশি সূর্য্যের ন্যায় গোলাকার হয়ে উঠল।

দ্বিতীয়। আর একটা ব্যাপার দেখ—

অগ্নিতাপে ভীত হয়ে বল্মীকমূলের কোটর থেকে এক সময়েই পাঁচটা সাপ মৃত ব্যক্তির দেহ হতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বেরিয়ে গেল।

তৃতীয়। আবার এ দিকে চেয়ে দেখ—

বায়ুসহায় যজ্ঞাগ্নি-দগ্ধ গাছটার কোটর থেকে পাখীগুলি উড়ে গেল, বোধ হল যেন ইহার শরীরের ভিতর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

প্রথম। তোমাদের কথা যথার্থ বটে। আমার কিন্তু বোধ হচ্ছে দূষিত-চরিত্র একটা লোকের দোষে যেমন সমস্ত বংশ নষ্ট হয়, তেমনি একটা মাত্র শুষ্ক বৃক্ষের জন্যও পুষ্পিত-পাদপ সমগ্র উপবন দগ্ধ হয়।

ঐ দেখ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম পরিপূরিত সমগ্র উপবনটি ভোজ্য বস্তুর ন্যায় নিঃশেষে ভক্ষণ ক'রে, আচমন করার জন্যই যেন অগ্নিদেব এখন কুশমাত্র অনুসরণ করে নদীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ,তরু-লম্বিত কুশ ও বল্কলের সাহায্যে অগ্নি বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন কচ্ছে, এবং পাকা ফলের ন্যায় পোড়া কলাগুলি কলাগাছ থেকে নীচে পড়ছে। আবার ঐ দেখ, সম্মুখে তালগাছটার আগায় একটা প্রকাণ্ড মৌচাক—অনেকক্ষণ ধরে গোড়া জ্বলে জ্বলে এখন মৌচাকটা শুদ্ধ মহাদেবের পরশুর ন্যায় গাছটা পড়ে গেল।

তৃতীয়। বাঁচা গেল। সাধু ব্যক্তির রোষের ন্যায় ভগবান হুতাশন এখন প্রশান্ত হয়েছেন।

বিভব ক্ষীণ হলে উন্নতমনা ব্যক্তির যেমন দানশক্তি কমে যায়, সেইরূপ ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়াতে অগ্নির তেজও কমে গিয়েছে।

প্রথম। অমিত ব্যয়ের ফলে দরিদ্র হয়ে লোক যেমন পরিশেষে স্বীয় পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে জীবন ধারণ করে (খায়), তদ্রূপ হুতাশনও এখন স্রুক, ভাণ্ড, অরণী ও দণ্ড ভক্ষণ কচ্ছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দেখ, বৃক্ষটার পত্র-বহুল শাখাগুলি নুয়ে পড়ে নদীর জল স্পর্শ কচ্ছে, এবং বায়ুসঞ্চালনে পাতাগুলি আন্দোলিত হওয়াতে জল ছিটে উঠছে; বোধ হচ্ছে যেন দাবাগ্নি-পীড়িত পাদপ-সমূহের জীবন রক্ষার জন্য বৃক্ষটি স্বীয় পর্ণরূপ হস্তে ইহাদের গায় জলসিঞ্চন কচ্ছে।

তৃতীয়। আচ্ছা এস, যাই আমরাও আচমন করি গিয়ে।

উভয়ে। হাঁ, এস।

* "জ্ঞাতি জ্ঞাতিভয়াদিব" পাঠ আছে। 'জ্ঞাতি-ভয়' শব্দের গূঢ় অর্থ আছে—সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ।

(সকলের আচমন)

প্রথম। ঐ যে, কুরুপতি দুর্য্যোধন এই দিকেই আসছেন। তাঁহার অগ্রে ভীষ্ম ও দ্রোণ এবং পশ্চাতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণ।

ইঁহারা সকলেই মহারাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে উপস্থিত প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে* মধুর আলাপ কচ্ছেন। বলছেন, যজ্ঞ ক'রে সমগ্র পৃথিবী ভোজন করাও, পরাক্রমে পৃথিবী জয় কর, রোষ পরিত্যাগ কর, স্বজনকে স্নেহ কর; সুতরাং ইহাদের কথা শুনে মনে হয় যেন পৌরবর্গ পাণ্ডবগণেরই পক্ষাবলম্বন করেছে।

এস যাই, আমরাও গিয়ে কুরুরাজকে অভিবাদন করি।

প্রথম অঙ্ক

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। ধর্ম্মাচরণতৎপর দুর্য্যোধন আমার প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শন কচ্ছেন—তা হবে, কারণ শিষ্যের দোষ বন্ধু বা মিত্রকে স্পর্শ করে না, আচার্য্যকেই আশ্রয় করে থাকে। গুরুর হাতে বালককে একবার সমর্পণ করে দিলে মাতাপিতার আর কোনও অপরাধের (পাপের) ভয় থাকে না।

ভীষ্ম। এই যে দুর্য্যোধন এ দিকেই আসছে। এই দুর্য্যোধনই অর্থ গ্রহণ ক'রে সুসমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং রণপ্রিয় বলে বিস্তর অযশের ভাগীও হয়েছিল;† কিন্তু এখন যজ্ঞ ক'রে পুণ্যলাভ করেছে, সুতরাং তাহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও দেহকান্তি এখন আবার তাহার শোভাই বর্দ্ধন কচ্ছে।

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ

দুর্য্যো। আমার আত্মা এখন সন্তোষ-তৃপ্ত, গুরুজন পরিতুষ্ট, আমি এখন জগৎবাসীর বিশ্বাসের পাত্র, আমার অযশ দূর হয়েছে এবং ধার্ম্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকে বলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয়: কিন্তু এটা মিথ্যা কথা, কারণ স্বর্গ পরোক্ষ বস্তু নহে—পুণ্যের ফলে পৃথিবীতেই স্বর্গলাভ হয়।

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, ন্যায়-পথে অর্জ্জিত ধন দান ক'রে আপনি উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন, কারণ—

ক্ষত্রিয়গণের সমৃদ্ধি বাণ-সাপেক্ষ। যে ক্ষত্রিয় পুত্রাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করে সে স্বয়ং বঞ্চিত হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, বিপ্রগণকে সমস্ত বিত্ত দান ক'রে, পুত্রের জন্য ধনু মাত্র রেখে যাওয়াই উচিত।

শকুনি। অঙ্গরাজ, তুমি গঙ্গা-তীরবাসী সুতরাং গঙ্গা-সংস্পর্শে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে। এই বাক্য তোমার মুখেই শোভা পায় বটে।

কর্ণ। ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি, যযাতি, রাম, মান্ধাতা, নাভ, অগ, নৃপ, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজগণের অতুল রাজ-কোষ ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। এখন সেই রাজগণ নাই, তাহাদের ধন-ভাণ্ডারও নাই, এবং রাজ্যও নাই। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য (যজ্ঞ) করেছিলেন বলে এখনও তাঁদের নাম লুপ্ত হয় নাই।

সকলে। গান্ধারী-তনয়, যজ্ঞ সম্পন্ন করে আপনি মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভ করেছেন।

দুর্য্যো। আমি অনুগৃহীত হলেম। আচার্য্য, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দ্রোণ। পুত্র, এস। কিন্তু প্রথমে আমাকে অভিবাদন করা তোমার অন্যায়। *

দুর্য্যো। তবে কাকে প্রথমে অভিবাদন করব?

দ্রোণ। কেন, তুমি কি দেখছ না, সম্মুখে ভীষ্ম রয়েছেন। তিনি দেবতা ও মানুষ হতে জন্মলাভ করেছেন, তাঁহাকেই প্রথমে নমস্কার কর। ভীষ্মকে

---

* মূলে 'আগত কথা' পাঠ আছে।

† 'অযশো নিপীতবান'—মূলে এই বাক্যটি আছে—ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব অযশ লাভ করেছিলেন।

* মূলে "অয়মক্রমঃ" এই পাঠ আছে—এটা অভিবাদনের ক্রম নহে। "অথ কঃ ক্রমঃ।"

পরিত্যাগ ক'রে অন্ত ব্যক্তিকে প্রথম নমস্কার করে অন্যায় হয়।

ভীষ্ম। মহাশয়, এরূপ বলবেন না। অনেক বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে অপকৃষ্ট।

আমি মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি, আপনি স্বয়ম্ভূ। আমার বৃত্তি যুদ্ধ—ইহা আপনার পক্ষে গর্হিত। আপনি দ্বিজ, আমি ক্ষত্রিয়াত্মজ। আপনি গুরু, আমি মাত্র আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দ্রোণ। হাঁ, মহাত্মারা নিজদের অপ্রশংসা ক'রে থাকেন ; ইহা কিন্তু ভাল নয়। পুত্র, এস, তা'হলে আমাকেই অগ্রে অভিবাদন কর।

দুর্য্যো। আচার্য্য, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

দ্রোণ। পুত্র, এস। আশীর্ব্বাদ করি, যেন এরূপে যজ্ঞ ক'রে ক'রেই তুমি খিন্ন হও।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। পিতামহ, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

ভীষ্ম। পৌত্র, এস। এরূপেই তোমার বুদ্ধিপ্রশমন হউক।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। মাতুল, দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

শকুনি। বৎস, দক্ষিণা দান করে এরূপে সমস্ত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কর, এবং নৃপতিবৃন্দকে জয় ক'রে জরাসন্ধের * ন্যায় রাজসূয়ে মিলিত কর।

দ্রোণ। কি আশ্চর্য্য, শকুনির আশীর্ব্বাদ-বাক্যেও দেখছি উত্তেজনা আছে। এই ক্ষত্রিয়-তনয় বিরোধ-প্রিয়ই বটে।

দুর্য্যো। বয়স্য কর্ণ, গুরুজনকে প্রণাম করা হয়েছে, এখন বন্ধুবর্গের সঙ্গে যথাক্রমে মিলন-সুখ উপভোগ কর।

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, যজ্ঞের নিয়ম পালন করায় আপনার শরীর কৃশ হয়েছে। তথাপি আপনার কর-মর্দ্দন কচ্ছি। আশা করি, এখনও এই কর-মর্দ্দন সহ্য করার মত বল আপনার আছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না ক'রে আমি আর কোনও প্রগল্ভ বাক্য উচ্চারণ করব না। কারণ, এখন রাজ-যূ'চিত আপনার ধীরগম্ভীর বাক্য শুনে আমার ভয় হয়।

দুর্য্যো। তুমি এরূপ ভাবেই (বন্ধুর ন্যায়) আমার সঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ ক'রো।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, মহেন্দ্রের প্রিয়সখা রাজা ভীষ্মক তোমার সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। আর্য্য, আসুন। আপনাকে অভিবাদন কচ্ছি।

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, দক্ষিণাপথের পরিষতুল্য রাজা ভূরিশ্রবা তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। আর্য্য, আসুন।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, বসুভদ্র তোমার যজ্ঞ সম্বর্দ্ধনা করেছেন, এবং তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য অভিমন্যুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শকুনি। পুত্র দুর্য্যোধন, ইনি জরাসন্ধের পুত্র সহদেব—তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। বৎস, এস। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হও।

সকলে। সমাগত রাজন্যবর্গ সকলেই মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছেন।

দুর্য্যো। অনুগৃহীত হলেম। রাজগণ, আপনারা সকলেই সমাগত হয়েছেন, কিন্তু রাজা বিরাট ত আসেন নি!

শকুনি। আমি বিরাটের নিকট দূত পাঠিয়েছি। আমার মনে হয়, এঁরা পথে আছেন।

দুর্য্যো। গুরুদেব, আপনি এই ধর্ম্মকার্য্যে গুরু, অস্ত্রবিদ্যায়ও আমার গুরু, দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

* এ স্থলে পৌরাণিক কথার আভাস আছে।

দ্রোণ। দক্ষিণা ! বেশ ! বেশ ! প্রথম তোমার শ্রম দূর করাই ; তারপর দক্ষিণা।

দুর্য্যো। কি ! আচার্য্য আমাকে বিগতশ্রম করাবেন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

বসন্তের ডালি

(১) মলয়

মুক্ত হয়ে গেল ধীরে নিসর্গ-লক্ষ্মীর
দক্ষিণ দুয়ারখানি, গভীর তৃপ্তির
নিবিড় নিশ্বাস হেন মৃদুল মলয়
আকুল আবেগভরে নিখিল হৃদয়
জাগাইয়ে মাতাইয়ে করিয়ে অধীর
ছুটে এল—শিহরিল চির-বিরহীর
তৃষিত অন্তর হায় ! এ কি প্রেয়সীর
মধুময় মোহময় পরশ মদির
অমৃত-প্রলেপ সম কায়মনপ্রাণে
আলিঙ্গিছে বারংবার ! কোথায় কে জানে
ঘটেছে মিলন কার, সব আকাঙ্ক্ষার
হয়ে গেছে সমাপন ! তা'রি সমাচার
মলয় এনেছে বহি' সন্তাপিত জনে
আশ্বাসিতে শুধু আজি অজ্ঞাতে গোপনে !

(২) মুকুল

রসালের রসটুকু শতমুখে আজ
উঠিয়াছে উচ্ছ্বসিয়া বসুন্ধরা মাঝ
অপূর্ব্ব শোভায় গন্ধে, পীযূষ-মধুর
মলয়-চুম্বনে বুঝি ! নবোঢ়া বধূর
নিভৃত প্রাণের আশা-সাধ-আকিঞ্চন
প্রেমময় দয়িতের সোহাগে প্রথম
বিকশি উঠিল যেন ! অন্তরে বাহিরে
উৎসবের আয়োজন, নিকুঞ্জ কুটীরে
আমন্ত্রণ বসুধার ! সৌরভ-সুধার
মহামেলা নন্দনের, দিব্য উপহার
দেব-বালা প্রকৃতির ! মত্ত মধুকর
মুগ্ধ-চিত্তে অনুক্ষণ গুঞ্জন-মুখর
প্রেম-সম্ভাষণ হেন ! প্রতিদ্বন্দ্বী বায়
মুকুল অবনী-অঙ্কে লুকাইতে চায় !

(৩) কোকিল

চূত মুকুলের গন্ধে হইয়ে ব্যাকুল
কোকিল আসিল ধেয়ে মুখরি অতুল
ধরণীর হৃদিখানি, উঠিল উথলি
বিশ্বের পিপাসা-সিন্ধু মথিয়া কেবলি
অপূর্ব্ব সঙ্গীত এ কি ! কত বিরহীর
কত জনমের যেন গুপ্ত আঁখি-নীর
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-সাধ ভালবাসা সনে
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কবে মিশিয়া গোপনে
বসন্ত-সুহৃদ-কণ্ঠে মধু "কুহু" স্বরে
হইল গো মূর্ত্তিমান ! নিভৃত অন্তরে
অতীতের কত কথা কত অভিলাষ
ক্ষণে ক্ষণে জাগি তাই করিছে উদাস
কি-যেন-কি-চাই আজ ! রাধিকা-রমণ
আবার বাজায় বুঝি মুরলী মোহন !

(৪) কিশলয়

কোকিলের "কুহু"স্বরে তরু-লতিকার
শিশির-বিশীর্ণ প্রাণে যৌবন-জোয়ার
ফিরে এল অকস্মাৎ, উঠিল মুঞ্জরি
গুঞ্জরি আশার সম শ্যামল লহরী
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে হায় ! রাখিতে চরণ
মাধবী-বান্ধব সুখে কোমল আসন
বিছাইয়ে দিল যেন ! বাসর-শয়ন
রচি হর্ষে বনদেবী করে আবাহন
নবীন দম্পতিগণে ! সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
আজি শুধু মধুৎসব হিয়ায় হিয়ায়

বিচিত্র আবেশ-লাস্তে, মর্ম্মের সঙ্গীত
পল্লবে পল্লবে যেন হয় গো ঝঙ্কৃত
মর্ম্মরিয়া তালে তালে! প্রেম-অমরার
শিঞ্জনী-শিঞ্জিত একি পরি-বালিকার!

৫ কবি-কুঞ্জ

মলয় মুকুল পিক কিশলয় মিলি
অজস্র আনন্দভরে একান্তে কেবলি
রচিয়াছে কবি-কুঞ্জ, দিয়েছে সন্দেশ
বসন্ত এসেছে ফিরে! করিয়া নিঃশেষ
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি মাধবী অশোক
নিঃশব্দে উঠেছে ফুটি, গলি' চন্দ্রলোক
দিকে দিকে শতধারে পড়িছে ঝরিয়া
অমিয়-নিষিক্ত করি! গেল কি খুলিয়া
নন্দনের রুদ্ধদ্বার! সবি বৃথা হায়,—
সার্থক সফল করি সকল শোভায়
কে বাঁধিবে সুর আজি কবির বীণায়
হাসি-মুখে বসি পাশে, বিশাল ধরায়
কেহ নাই আপনার! শূন্য কুঞ্জখানি
বহে শুধু অদৃষ্টের অভিশাপ-বাণী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আবুল মুজফর রচিত কবিতা ও ইটা রাজবংশ

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ)*

ইটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতির সময় নির্দ্ধারণ—নিধিপতি ও সুবিদ, এবং সুবিদ ও তাহার-বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে পুরুষ গণনা করিয়া তৎসাহায্যে নিধিপতির আনুমানিক সময় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

মুজফর প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে নিধিপতি হইতে সুবিদ ৮ম পুরুষের ব্যক্তি। জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে ইহা হইতে ১ পুরুষ এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ২ পুরুষ অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। এইরূপ সময় বৃদ্ধির চেষ্টা "অজ্ঞাত তিনপুরুষ" আবিষ্কারের ন্যায় প্রহেলিকাময়।

সুবিদ ও তাহার বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে সময়ের ব্যবধান নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

১। জাতীয় ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত এই উভয় গ্রন্থ অনুসারেই সুবিদের কন্যাবংশে সুবিদ হইতে বর্ত্তমানে ১১ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি এই বংশ-পরিচয়ের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্। অথচ সুবিদ ও তাহার বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে ৯ পুরুষ মাত্র ব্যবধান সত্বেও তাহারা রাজা সুবিদকে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সেরশাহ ও বেহলুল লোদীর সমসাময়িকরূপে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সাধারণ অশিক্ষিত লোক এইরূপ সময় নির্দ্ধারণ করিলে আক্ষেপের কোনও কারণ ঘটিত না।

২। সুবিদের পুত্রগণের পর তদ্বংশীয়গণের অজ্ঞাতসারে 'অজ্ঞাত তিনপুরুষ' যোজনা ক্রমে রাজা সুবিদকে প্রাচীনতর কালবর্ত্তী প্রমাণিত করার অসাধু চেষ্টা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই বিবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। [প্রতিভা, ১৩২০] এই কৃত্রিমতা দূর করিলে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতেও হাজিখাঁর বংশে সুবিদ হইতে বর্ত্তমান ১১শ পুরুষ এবং ঈশাখাঁর বংশে সুবিদ হইতে ১০ পুরুষ পাওয়া যায়। রাজা সুবিদের ইসলাম ধর্ম্মী পুত্রগণের বিভিন্ন শাখার বংশ-পত্রিকা হইতেও প্রমাণিত হয় যে সুবিদ বর্ত্তমানকাল হইতে ১১পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি এবং সুবিদ ও তাহার বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে ৯ পুরুষ মাত্র ব্যবধান।

৩। মুজফর প্রদত্ত বর্ণনায় রাজা সুবিদ হইতে তিনি ৪র্থ পুরুষের ব্যক্তি। তাঁহার পর তদ্বংশে আব্দুল হামিদ (জন্ম ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) মুজফর হইতে ৭ম পুরুষের ব্যক্তি। এই হিসাবেও সুবিদ হইতে বর্ত্তমানে

* প্রথমার্দ্ধ প্রতিভা, মাঘ, ১৩২১, সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ পুরুষ চলিতেছে, এবং ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ পুরুষ বা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেই সুবিদের আনুমানিক জন্মকাল।

৪। মাং আফজল চৌধুরী (জন্ম ১৭৯৮ খৃঃ অব্দ) প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে তিনি সুবিদ হইতে ৮ম পুরুষের ব্যক্তি, সুতরাং ১৭৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে ৭ পুরুষ বা ২১০ বৎসর পূর্ব্বে সুবিদের আনুমানিক জন্মকাল।

বংশ-পত্রিকা লব্ধ উপরি উক্ত প্রমাণাবলীই সুবিদের আনুমানিক সময় নির্দ্ধারণকল্পে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। নিম্নে সুবিদের সময় নির্দ্ধারণকল্পে অপর কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইল—

রাজা সুবিদ বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমান কর্ত্তৃক নিহত হন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে ওসমান ভাওয়াল হইতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওসমানের নিহত হইবার প্রমাণ সম্বলিত সনন্দের অনুলিপি পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইল।

১৬০৩ হইতে ১৬১২ খৃঃ অব্দ মধ্যে সুবিদ নিহত হন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ওসমানের কতিপয় বৎসর রাজত্ব করার প্রমাণ বিদ্যমান থাকাতে, তাহার ভাওয়াল হইতে পলায়নের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৬০৪ খৃঃ অব্দে, সুবিদের মৃত্যুকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

মৃত্যুকালে সুবিদের আনুমানিক বয়স বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে তিনি বহু সন্তানের পিতা, এবং তৎপূর্ব্বেই তাঁহার কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়ক্রম ৪০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল আনুমানিক ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ।

এক্ষণে, নিধিপতি পরিণত বয়সে শ্রীহট্টে আগমন করেন, এবং নিধিপতি হইতে সুবিদ ৮ম পুরুষের ব্যক্তি, আর সুবিদের জন্মকাল আনুমানিক ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ; সুতরাং নিধিপতির শ্রীহট্টে আগমন কাল আনুমানিক ১৩৮৪ খৃঃ অব্দ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে নিধিপতি শ্রীহট্টে আসিয়া থাকিবেন।

সাম্প্রদায়িক সমাজ ও ইটা রাজবংশ—

মুজফরের বর্ণনা অনুসারে নিধিপতি নামক জনৈক কণৌজ নিবাসী ব্রাহ্মণ ইটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে নিধিপতি শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হইবার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আধুনিক মতবাদ অনুসারে ইটা রাজবংশের আদি-পুরুষ, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে শ্রীহট্টে আগত দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ। নিধিপতি আনন্দের (?) প্রায় ৭ শত বৎসর পরে শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হইয়া একটী পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তদ্বংশ শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ফলে আধুনিক কুল-গ্রন্থ নিধিপতির সহিত আনন্দের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিধিপতি বংশ ও সাম্প্রদায়িক সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ মতবাদের অনুকূলে কোনও নিরপেক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং মুজফরের বর্ণনার প্রতিকূল উক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করা যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বাস্তবিকই শ্রীহট্টের দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ প্রায় ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন কি না। সুদূর সপ্তম শতাব্দীর বহু পরেও বহু পরিবার সাম্প্রদায়িক সমাজে প্রবিষ্ট হইবার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও বহু পরিবার উক্ত সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার প্রমাণ দুর্ল্লভ নহে।

এই উপলক্ষে বুরুঙ্গার বৎসগোত্রীয় চৌধুরী ও ভট্টাচার্য্য এবং দস্তরালীর বৎসগোত্রীয় মিশ্রগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুরুঙ্গা নিবাসী রামরত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী গ্রন্থে ও 'জাতীয়

ইতিহাসে' এই সমুদয় পরিবার শ্রীচৈতন্ত বংশের দুই শাখারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।*

বর্ত্তমানে বুরুঙ্গার বৎসগণ সাম্প্রদায়িক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দত্তরালীর বৎসগণ জাতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইলেও, তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে সাধারণ্যে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যদেবের বংশীয় হইলে ইহারা কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িক সমাজে প্রবিষ্ট হন নাই? সাম্প্রদায়িক সমাজের একাধিক পরিবারে খোট্টা, পশ্চিমা, বিরিগাইয়া, ঠেকা প্রভৃতি নূতনত্বজ্ঞাপক খ্যাতিও উপরি উক্ত মতবাদের পোষকতা করিবে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক সমাজ মধ্যে কয়েকটী প্রাচীন মৈথিল আচারের প্রচলন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মৈথিল উপনিবেশের প্রমাণস্বরূপ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, মৈথিল ব্যবহার "মিতাক্ষরা", সাম্প্রদায়িক সমাজে সুদূর অতীতেও কস্মিনকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনন্দনের পূর্ব্বকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র ও মিথিলায় স্মৃতি-ব্যবস্থার যে সাদৃশ্য ছিল তাহা রঘুনন্দনের প্রভাবে বঙ্গদেশে বহুল পরিবর্ত্তিত হইলেও বঙ্গের পূর্ব্বসীমান্তে শ্রীহট্টে দীর্ঘকাল আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারে। এমতাবস্থায় অধুনা বঙ্গদেশে লুপ্ত দুই একটি প্রাচীন ব্যবস্থার শ্রীহট্টে প্রচলন দেখিয়া সাম্প্রদায়িক সমাজের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রমাণিত হয় না। দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজ মধ্যে অন্তর্ব্বিরোধের ফলে কাত্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণ কিছু কাল যাবৎ বৎসাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণের প্রতি প্রতিগ্রাহী অপবাদের আরোপ করিতেছেন। প্রতিগ্রাহী ৭ বলিয়া ৬৪৩ খৃঃ অব্দ হইতে বাৎস্যগোত্রীয় নিধিপতি বংশীয়েরা ও বৎস ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রীয়গণের পূর্ব্বপুরুষগণ কাত্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণ কর্ত্তৃক রাজা সুবিদের সময় পর্য্যন্ত সামাজিক আদানপ্রদানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং সুবিদনারায়ণের খঞ্জ কন্যাই সর্ব্বপ্রথমে এই সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রমে কাত্যায়ন রঘুপতির সহিত পরিণীতা হয়, এইরূপ উক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা আমরা অন্যত্র * আলোচনা করিয়াছি। তর্কস্থলে আনন্দ প্রতিগ্রাহী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট নিধিপতি-বাৎস্যগণের স্কন্ধে এইরূপ অপবাদের আরোপ করা যায় না।

নিধিপতি বংশ ও শ্রীহট্টে পাঠান রাজত্ব—

আমরা আনুমানিক ১১০০ খৃঃ অব্দ নিধিপতির জন্মকালরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। নিধিপতির পুত্র ভূধর, এবং রাজা সুবিদের পিতা ভানুনারায়ণ। ভূধর ও ভানুনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী পুরুষগণের নাম সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস একমত হইতে পারেন নাই, সুতরাং নিধিপতিবংশীয়গণের বিবরণই নির্ভরযোগ্য। মুজফরের বর্ণনায় ভূধরের ভাস্কর, পুষ্কর এবং প্রভাকর নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ তিনটী নাম দেখিয়া, পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল এই অনুমানে ১ পুরুষের পরিবর্ত্তে তিন পুরুষ কল্পনা করিয়া থাকিবেন। প্রভাকরের পুত্র কেশব শিকদার নিধিপতির প্রপৌত্র। নিধিপতিবংশে কেশবই সর্ব্বপ্রথম পাঠান রাজগণ প্রদত্ত শিকদার উপাধি প্রাপ্ত হন। কেশবের পুত্র কামদেব এবং পৌত্র শুভরাজও শিকদার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শুভরাজ শিকদার উপাধি অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত "খান" উপাধি লাভ করেন। তৎকালে শিক-

* মিশ্রগণ শাক্ত গুরুর শিষ্য এবং বুরুঙ্গার সহিত ইহাদের স্নানাশৌচ প্রথা প্রচলিত নাই, ইত্যাকার বিরুদ্ধ মতবাদও কেহ কেহ প্রচার করিয়া থাকেন।

৭ রাজার নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণে পাতিত্য জন্মে কি না সন্দেহস্থল।

* প্রতিভা, ১৩২০, শ্রীহট্টের রঘুনাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দারগণের উচ্চ পদবী ছিল। কবির কথায় তৎকালে "সাত লক্ষ শ্রীহট্টের বড় শিকদার" নিযুক্ত থাকিতেন। শুভরাজ পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। গৌড়ের পাঠান রাজধানীতে তাঁহার সম্মান লাভ সম্বন্ধে কবি মুজফর বলিতেছেন—'যাহার প্রতিষ্ঠা ছিল গৌড় বিদ্যমান'। তাঁহার কীর্ত্তি, সুরাজ খাঁর দীঘি।* তাহার বসত ভূমি রাজথলা গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নিম্নে নিধিপতি বংশীয়গণের আনুমানিক জন্মকাল নির্দ্ধারিত হইল—

	সময়
নিধিপতির আগমন ও ভূধরের জন্ম	১৩৮৪ খৃঃ অব্দ।
প্রভাকর ভাস্কর ও পুষ্করের জন্ম	১৪১১ ,,
কেশব শিকদার ,,	১৪৪৪ ,,
কামদেব ,, ,,	১৪৭৪ ,,
শুভরাজ খান ,,	১৫০৪ ,,
ভানুনারায়ণ ,,	১৫৩৪ ,,
সুবিদনারায়ণ ,,	১৫৬৪ ,,

নিধিপতিবংশীয়গণের মধ্যে শুভরাজ খানের পুত্র ভানুনারায়ণ পাঠান রাজগণ প্রদত্ত পৈত্রিক 'খান্' উপাধি ধারণ না করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত 'নারায়ণ' উপাধি সর্ব্বপ্রথম ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গে পাঠানগণের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবার আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা দক্ষিণ শ্রীহট্টে বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভানুগাছ‡ অঞ্চলে ভানুনারায়ণ ত্রিপুরা-রাজের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ভানুনারায়ণের পরে সুবিদও ত্রিপুরা রাজের সাহায্যে রাজত্ব করেন। সুবিদের পরে দক্ষিণ শ্রীহট্টে ত্রিপুরার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অঞ্চলে ত্রিপুরার প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই সাময়িক প্রাধান্য বিদ্রোহী পাঠান দলপতি ওসমানের প্রভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। ওসমান ১৬১২ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হন, এবং তৎসঙ্গে পাঠান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে ওসমান ভাওয়ালে পরাজিত হইয়া প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম পূর্ব্বক পলায়ন করেন। এমত অবস্থায় বঙ্গে পাঠানগণের পরাভব (১৫৭৬ খৃঃ অব্দ) ও ওসমানের পরাভব (১৬১২ খৃঃ অব্দ) কালের মধ্যভাগে ভানুনারায়ণ প্রভাব বিস্তার করেন ও তৎপুত্র সুবিদ রাজত্ব করেন।

ভানুনারায়ণের পুত্রবর্গ— মুজফর শ্রীকৃষ্ণ নামে রাজা সুবিদের একটি মাত্র ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে রূপচন্দ্র, বীর-নারায়ণ, ধর্ম্মনারায়ণ, ও ব্রহ্মনারায়ণ এই চারি ভ্রাতার নাম স্থান পাইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইহাদের একটিও যে রাজভ্রাতা ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে ভূমিউড়া গ্রামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে ধরা যাউক রূপচন্দ্রের কথা। রাজা সুবিদের হিন্দু শাখা সমূহ নিধিপতির সময় হইতে শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত; কিন্তু বনভাগের চৌধুরীগণ (যাঁহারা সম্প্রতি রূপচন্দ্রের বংশধর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন) কস্মিন কালেও সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। অতঃপর বীরনারায়ণের কথা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে "সন ৯০৬ বঙ্গাব্দের অব্যবহিত পরে' (অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃঃ অব্দের

* এই দীঘি সাগর দীঘির উত্তরে। ইহারই তীরে বর্ত্তমান রাজানগর থানা অবস্থিত। শুভরাজের প্রপৌত্র জামাল খাঁর নামেও এই দীঘি পরিচিত হইয়া থাকে।

‡ কেহ কেহ ভানুনারায়ণের নামানুসারে ভানুগাছ নামের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের স্ত্রী ভানুমতি এবং ভানাই কুকীর নামানুসারে স্থানের নামকরণ সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ["চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর" প্রবন্ধ—প্রতিভা, মাঘ ১৩১৯]

অব্যবহিত পরে) এমন রাজবংশীয় সকি শালামৎ নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর লোদী বংশীয় সম্রাট হইতে শ্রীহট্টে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পৃথিমপাশায় বাস করেন এবং বীর নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ৪১৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বর্ত্তমান হইতে ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী পাত্রীর বিবাহ কাহিনী অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। পরিশেষে অপর দুই রাজভ্রাতা ধর্ম্মনারায়ণ ও ব্রহ্মনারায়ণের কথা। আমরা ধর্ম্মনারায়ণের বংশ-পত্রিকা তদ্বংশীয়গণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে উহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—

১ ১৬১৮ ধর্ম্মনারায়ণ (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাস অনুসারে রাজা সুবিদের ভ্রাতা।)
|
২ ১৬৪৮ মাধব রায় চৌধুরী (ইনি সর্ব্বপ্রথম চৌধুরী পদ লাভ করেন)
|
৩ ১৬৭৮ গোপীনাথ চৌধুরী
|
৪ ১৭০৮ রামনারায়ণ চৌধুরী
|
৫ ১৭৩৮ গোবিন্দনারায়ণ চৌধুরী
|
৬ ১৭৬৮ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী
|
৭ ১৭৯৮ জয়নারায়ণ চৌধুরী
|
৮ ১৮২৮ দুর্গানারায়ণ চৌধুরী (জন্ম ১৮২৮ খৃঃ অব্দ)
|
৯ —— শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চৌধুরী জন্ম (১৮৬৫) খৃঃ অব্দ
|
অপুত্রক।

বর্ত্তমান হইতে ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মনারায়ণের আবির্ভাবের কাল বংশপত্রিকা হইতে আনুমানিক ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ব্রহ্মনারায়ণ তাহার ভ্রাতা হইলে ইহার পরেই দুই ভ্রাতা দুইটী পৃথক বংশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। উভয় পরিবারের বাসভূমির মধ্যে ৫ ক্রোশের অধিক ব্যবধান নহে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় পরিবার মধ্যে এতাবৎ কাল জ্ঞাতিত্বের পরিচয়, জন্ম-নাম জানা ছিল না। ফলে, বড়মচালের দৌহিত্রগণ ছয়-চিড়িতে এবং ছয়চিড়ির দৌহিত্রগণ বরমচালে বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। এই দুইটী সম্মানিত পরিবারে নিকট জ্ঞাতিত্বের পরিচয় থাকিলে ঈদৃশ বিবাহ নিশ্চয়ই অনুমোদিত হইত না। আমরা ইটার দেওয়ান সাহেব-গণের নিকট তাহাদের পরিবারের সহিত ছয়চিড়ি এবং বড়মচালের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি যে, রাজপুত্র হাজি খাঁ হইতে সপ্তম মাং আফজল চৌধুরী, এবং রাজপুত্র ঈশা খাঁ হইতে সপ্তম, মাং আহছাম চৌধুরী এই উভয়ের মৃত্যু সংবাদ ছয়চিড়িতে প্রচারিত হইলে, তত্রত্য গুরু প্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি জ্ঞাতির মরণ অশৌচের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত মৃদ্‌-ভাণ্ডাদি বর্জ্জন করেন, এবং ইহাদের সময় পর্য্যন্ত ছয়-চিড় হইতে মৃত্যু সংবাদ আসিলে দেওয়ান গৃহেও তদ্রূপ অশৌচাদি আচরিত হইত। ইহার পর পুরুষে অর্থাৎ আব্দুল খালেক চৌধুরীর সময়ে সাত পুরুষ উত্তীর্ণ বলিয়া উক্ত সামাজিক প্রথা রহিত হয়। বড়মচালের চৌধুরীর সহিত দেওয়ান পরিবারের জ্ঞাতিত্বের পরিচয় তাহারা জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এই দুই পরিবারে উপরি উক্ত সামাজিক প্রথা প্রচলিত থাকিবার কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। মুজফর "রামলক্ষ্মণ" প্রতিম যে দুই হিন্দু-রাজপুত্রের কথা বলিয়াছেন, ধর্ম্মনারায়ণ ইহাদের অন্যতম হইবেন ; আর ব্রহ্মনারায়ণ নিধিপতি বংশীয় হইলেও দূর-বর্ত্তী জ্ঞাতি হইবেন। ইহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা রূপে, অথবা ইহাদের কেহই সুবিদ নারায়ণের সহোদর ভ্রাতারূপে, গণ্য হইবেন না।

রাজা সুবিদনারায়ণ—(১) রাজার পারিবারিক জীবন—ইটা রাজ-সমাজ-পতি সুবিদ-নারায়ণের রত্নাবতী ব্যতীত অপর কোনও

কন্যার কথা মুগাফর উল্লেখ করেন নাই। এই কন্যা খঞ্জ হওয়ায় রাজাকে বহু অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অবশেষে বহুকষ্টে বিড়িগ্রাম বাসী কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয়ের সহিত রত্নাবতীর বিবাহ হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় রঘুপতির রঘুনাথ নামক এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার আবিষ্কার করেন। আমরা এই রঘুনাথের নাম বিভিন্ন কাত্যায়ন বংশপত্রিকায় প্রাপ্ত হই নাই। অনেকে রঘুপতিকে গৃহজামাতারূপে অভিহিত করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রাজার একাধিক উপযুক্ত পুত্র-সন্তান বর্ত্তমানে তাঁহার কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না। বর্ত্তমানে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির অঙ্গহীনা কন্যা বিবাহ করিয়া অনেক দরিদ্র যুবক জীবন ধারণের সুবিধা করিয়া থাকেন। যাহারা এইরূপ "অচল কন্যা" বিবাহ করিয়া থাকেন তাহাদের সকলেই গৃহজামাতা পদবাচ্য নহেন। আর এই বিবাহে রঘুপতি যে ভূমিউড়া প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন,এই উক্তির অসারতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভূমিউড়া রাজার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতিবর্গের বাসস্থান, আর এই গ্রামেরই একাংশ বিদ্যাবিনোদবংশীয় রাজপুরোহিত ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় রঘুপতিকে ভূমিউড়া গ্রামদানে নিষ্ঠাবান্ পরিবারে পুনঃ-দানদোষ সূচিত হয়। রাজকন্যার শাখায় রাজা সুবিদ হইতে ৮।৯ পুরুষ চলিতেছে।

(২) রাজার চরিত্র ও সামাজিক জীবন—সুবিদ-নারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে ইটারাজ্য তাঁহার খাস তহশীলে ছিল না। ইটা জনপদে কয়েকটী ভূঁইয়া ছিল। ইহারা প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিত এবং ইচ্ছানুরূপ রাজ-কোষে রাজস্ব প্রদান করিত। রাজা নিজে রাজস্ব সংগ্রহের মানস করিলে ভূঁইয়াগণ বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজা এই সময়ে একটী কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি ভুইয়াদিগকে সুরাজ খাঁর দীঘির উত্তর তীরে একস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করতঃ নিহত করেন। তদবধি এইস্থান শত্রুমর্দ্দন নামে অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ভূঁইয়া-দিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মনুসর নগরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত লামুয়া নিবাসী শেখ দমরৎ উল্লা, আক্তার উদ্দিন প্রভৃতি এবং তারাপাশার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মশাজান গ্রাম নিবাসী উর্ফ মিঞা প্রভৃতি ভূঁইয়াদিগের বংশধররূপে ইটা অঞ্চলে পরিচিত।

সামাজিক অথবা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ ফলে ইটার বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগী হইবার কাহিনী প্রকৃত কি না ?

(৩) ওসমান অভিযান—সুবিদনারায়ণ রাজত্বের প্রারম্ভে যে ভাবে শত্রুদমন করেন নিয়তি তাঁহার ভাগ্যে সেইরূপ অপমৃত্যুই রাখিয়াছিলেন। ওসমান কাহিনী আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।* ওসমানের পরাক্রম স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবল পাঠান সৈন্যগণের প্রতিরোধ করা রাজা সুবিদের সাধ্যাতীত ছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধের পর যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্রাট আকবর পাঠান রাজশক্তি পরাভূত করিলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন পাঠান দলপতি বঙ্গের সীমান্ত ভাগে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ১৬০৩ খৃঃ অব্দে পাঠান দলপতির বঙ্গের পূর্ব্বসীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যাগড়ে ওসমান শক্তিসঞ্চয় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। স্থানীয় লোকের নিকট শ্রীসূর্য্য "ছিড়ি-উজি" এবং ওসমান "খজাজ উচমান" রূপে পরিচিত।

---

* প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, "বঙ্গে ওসমান খাঁ" প্রবন্ধ।

(৪) সুবিদের মৃত্যু ও পাঠান প্রভাব—সুবিদনারায়ণের রাজ্য অধিকৃত হইলে পর রাজধানী রাজনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই প্রহরের রাস্তা দূরবর্ত্তী শ্রীসূর্য্যগড়ে ওসমান নিজবাস পরিবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি এই দুর্গ সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত হইলেন। রাজা ওসমান কর্ত্তৃক আনুমানিক ১৬০৪ খৃঃ অব্দে নিহত হইবার সময় তিনি বহু সন্তানের পিতা; ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার এক পক্ষের দুই পুত্র জামাল খাঁ এবং কামাল খাঁ নামে এবং অপর পক্ষের দুই পুত্র হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ নামে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। "রাম লক্ষ্মণ" প্রতিম অপর দুই পুত্র পলায়ন পূর্ব্বক জাতি রক্ষায় সমর্থ হন। চারিটী মুসলমান রাজকুমার রাজনগরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীসূর্য্য দুর্গে ওসমান স্বাধীন পাঠান রাজত্বের সূচনা করিলেন। ওসমান রাজনগর পরিত্যাগ কালে * এই স্থানের ও রাজপুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে সকল পাঠান রাজনগরে স্থাপিত করেন, তাহাদের কয়েক জনের বংশ পাঠান টোলা, খারপারা, ঝাঝর, বেতিতপুর, কম্বিগাও এবং পদুমাপুর গ্রামে এখনও রহিয়াছে। মোগল রাজত্বে ইহারা 'খুসবাস' খ্যাতি লাভ করে এবং রাজপুত্রগণের উপর ইহাদের ভরণপোষণের ভার অর্পিত হয়।

রাজা সুবিদের পরাভবকারী ওসমান ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে নিহত হন কি না? ওসমান মুরসিদাবাদের নবাবের সেনাপতি হইতে পারেন কি না?

* ওসমান কর্ত্তৃক কাটা মনু বা ভটর খাল খনন এবং ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। [প্রতিভা, ১৩২০, আমার রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

ভটর খাল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, বহু ব্রাহ্মণকে খাল খননে বাধ্য করা হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারও উল্লেখ যোগ্য। বহু মালী এবং ভুখলা (ঢুলী) এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ভুখলা দিগের সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে সমাজে ঘৃণ্য হওয়াতে ইহাদের কয়েকটী নেতা ওসমানের কৃপায় সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মোগল রাজত্ব এবং ইটারাজবংশীয়গণ—১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক প্রেরিত সেনাপতি সুজায়াৎ খাঁ কর্ত্তৃক ওসমান পরাভূত হইলে পর তাঁহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে একে একে অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ভদ্র সন্তান স্বীয় আবাসভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজপুত্রগণ ইহার পরেও প্রায় ১৫ বৎসর কাল হীনাবস্থায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৬২৮ খৃঃ (অব্দে ১০৩৫ সনে) তাহাদের পৈতৃক রাজ্যের একাংশ ইটা, ইন্দেশ্বর, পালপুর, উয়াসা এই চারি জুয়ারে বিভক্ত করিয়া তাহাদের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। মিরজা মহম্মদ তকী ও দেওয়ান ভাইয়া ভৈরব দাসের আদেশে আমিন মুর্জা মহম্মদসরিপ হইতে তরপ মোকামে রূপ রায়, শিব রায়, রতি রায় ও ভবানন্দ রায় নামে রাজপুত্র-

লোকমুখে এবং প্রাচীন দলীল পত্রে ওসমানের পুত্র মমরেজ এবং তাহার ভ্রাতা আলীরও কয়েকটী কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

(১) মমরেজের জাঙ্গাল ও কেল্লা—জাঙ্গালটি পূর্ব্বে একটী প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল, এখনও স্থানে স্থানে ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রাজনগরের অদূরবর্ত্তী মনু নদীর বাম তীর হইতে ভানুগাছ পরগণার আদমপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেল্লা আলিনগর চা বাগানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ।

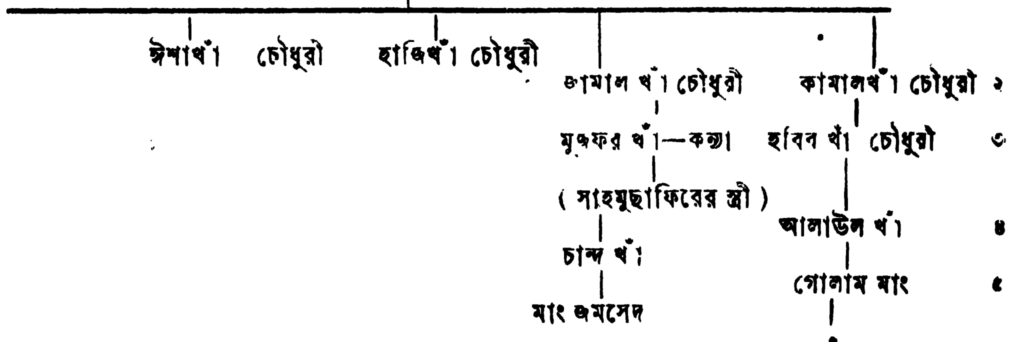
(২) অলি মহম্মদের কাটারা—মনুর উত্তর তীরে কোণাগাউ গ্রামের একটী জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বহুকাল যাবৎ এই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

গণের কর্ম্মচারী চারি রাজপুত্রের পক্ষে ৯৩৯৬৪ মিস্তান জমায় ৩৭৫টী মৌজা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্ত সংক্রান্ত দলিল তজকিরা চৌধুরাই নামে পরিচিত। রাজবংশীয় ইটার দেওয়ান গৃহে এই দলিল অদ্যাপি রক্ষিত আছে। কালের প্রভাবে জীর্ণ এবং স্থানে স্থানে পাঠের অযোগ্য হইলেও ইহা এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। এই সময় হইতে রাজবংশীয় ৪ ঘর চৌধুরী (জমিদার) এবং কর্ম্মচারীগণের কাননগো ও পাটওয়ারী কার্য্য, তদবধি ইহাদের দস্তখৎ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।

জাতীয় ইতিহাস (৩য় অংশ ২২৩ পৃঃ) অনুসারে "সুবিদের রাজ্যভ্রষ্ট যবনধর্ম্মী চারিপুত্র চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব কর্ত্তৃক ভূম্যধিকারী পদে নিযুক্ত হন"। সুতরাং এই মত অনুসারেও তজকিরার বিবরণ সমর্থিত হয়।

জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে অতঃপর লিখিত হইয়াছে, "সুবিদের পলায়িত পুত্রত্রয়ও স্বধর্ম্মে থাকিয়া শেষে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন"। সুবিদের পলাতক পুত্রগণের সম্বন্ধে মুজফর কিছুই উল্লেখ করেন নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে এবং জাতীয় ইতিহাসে অন্যত্র "রাজপুত্র" না লিখিয়া "রাজভ্রাতা" লিখা হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভুয়াচাঁড় ও বরমচালার শাখার আদিপুরুষের পরস্পর ভ্রাতা হওয়া সম্ভবপর নহে।

রাজপুত্রগণ—রাজপুত্র হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ এই উভয়েরই পরে ৩ পুরুষ অজ্ঞাতরূপে যোজনার কথা এবং অপর দুই রাজপুত্র জামাল খাঁ ও কামাল খাঁর উভয়েরই পরে অপুত্রক দেখাইবার কথা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। * আমরা এখন দেখাইব যে জামাল খাঁ ও কামাল খাঁর কেহই অপুত্রক ছিলেন না। সম্প্রতি তাহাদের বংশলোপ হইয়াছে মাত্র।



ইংরেজ রাজত্বে রাজবংশীয়গণের অবস্থা।—সুবিদ নারায়ণ ইটা জনপদের রাজা এবং সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণবর্গ জাতিনাশ ভয়ে এবং ওসমানের অত্যাচারে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হন। রাজপুত্রগণের জাতি নষ্ট হয় এবং তাহারা একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। মোগল শাসন স্থাপিত হইবার ১২বৎসর পরে তাহারা পৈতৃক রাজ্যের একাংশের বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকল শাখার পক্ষে দীর্ঘকাল সম্পত্তি ভোগ হইল না। নানা কারণে অনেক শাখা ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে। কবি ইহা লক্ষ্য করিয়া মনোদুঃখে লিখিয়াছেন—

"কহে মুজফর শুন সর্ব্বজন,
নিধিপতির সন্তানের দৈবে বিড়ম্বন॥"

মুজফরের কথা বহু পরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত

* ১৩২০ সনের প্রতিভায় মৎপ্রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি নিলাম খরিদ সূত্রে কতিপয় বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীর অধিকৃত। ইংরেজী ভাষার চর্চ্চার অভাবে রাজসন্ততিগণ মধ্যে কেহ উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন নাই। দেওয়ান আবদুল খালেক চৌধুরী সাহেবের শাখা মাত্র এই বংশের পূর্ব্ব গৌরব এখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা ইটা অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান অধিবাসীবর্গের মধ্যে এইরূপ অকৃত্রিম সদ্ভাব, প্রীতি, ও সৌজন্যের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারসমূহের সহিত বিবাহোপলক্ষে সিউলী আদান প্রদান, শুভকর্ম্ম উপলক্ষে যোগদান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও গৃহে কোনও শুভকর্ম্ম উপস্থিত হইলে পান-সুপারী পরিপূর্ণ একটী থালা সহ "জানানী" লইয়া দেওয়ান গৃহে আগমনের প্রথা ইটা অঞ্চলে একটী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণ লোকে অর্দ্ধকুরি * পান ও অর্দ্ধ "বী" † সুপারী উপহার লইয়া আসিয়া থাকে। কেহই যথা আবশ্যক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয় না।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ

---

* ২২টী পান = ১ হালা, ২০ হালা = ১ কুরি, ২৫ হালা = ১ পাই, ৪ কুরি = ১ পিত্রি,

† ১০টী সুপারী = ১ খা, ৩৩ খা = ১ বী।

পরিশিষ্ট

১। নাসিরুদ্দিনের সনন্দ—

Seal—Abul Mujaffar Nooruddin Jahangir Badsha Gazi office of Md. Islam khan 1024 Hizri

True copy of translation from Persian into English.

Superior government officials of the present and the future Chowdries and Kanangoes of Sircar, Sylhet be informed. It appears obvious that Nasiruddin Chowdry of Parganah Kanihaty is an agent of goverment and loyal to the throne and in the battle with Usman the rebel tried his best exerting himself to the best of his abilities and readily afforded all possible help and assistance to the Goverment. So for the loyalty he showed the Goverment is pleased to grant as his subsistence allowance a plot of waste land 30 Kulbas (hals) rent-free from the villages of Matabpur and Paboi of the said Parganah from the next harvest season.

It is ordered that the land noted above should be made over to his possession and that no one should present any obstacle to this and this is to be treated as urgent.

21st Safar, 9th year of his Imperial Majesty's coronation.

২। কুৎবুল আউলিয়ার বংশপত্রিকা।

(ছৈয়দ খলিল উদ্দিনের এবং মহম্মদ আফজল চৌধুরীর পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে)

১ কুৎবুল আউলিয়া (ইনি রাজা সুবিদের সুহৃৎ ছিলেন।) মুড়ারবন্দ নামক স্থানে তাহার দরগা অবস্থিত। সাগরদাঘির দক্ষিণ তীরে যে স্থানে তাহার সহিত রাজা সুবিদের মিলন হইত, একটী উচ্চ মাটীর ঢীবী উক্ত মাজার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

২ সৈয়দ সাহ ইলিয়াছ উং কাজি খন্দকার (ইনি প্রতাবগড়ের জমসের কন্যা বিবাহ করেন)

৩ ছৈয়দ সাহ আলমাছ

৪ " " মুছাফির, (উং ছৈয়দ মনির। ইনি রাজপুত্র জামাল খাঁর কন্যা বিবাহ ক্রমে রাজখলা গ্রামে বাস স্থাপন করেন)

৫ " " আলী আজগর

৬ " " ফেরদওছ (মৃত্যু ১১৪৩ পরগণাতি সনে, ৮ জমাদিছ ছানি। ইনি আবদুল হেকিমের কন্যা নজাই বিবিকে বিবাহ করেন)

৭ ছৈয়দ মাং বাকির (ইহার মাজার সাগর দীঘির পশ্চিম তীরে।) — ছৈয়দ সাহ সমছউদ্দিন (মৃত্যু ১১৯৪ পরগণাতি সনের ৩রা সফর।)

৮ ছৈয়দ সাহ আক্তর উদ্দিন (উং জিতু মিঞা। ইনি মাং নওয়াজ চৌধুরীর কন্যা আয়না বিবিকে বিবাহ করেন।)

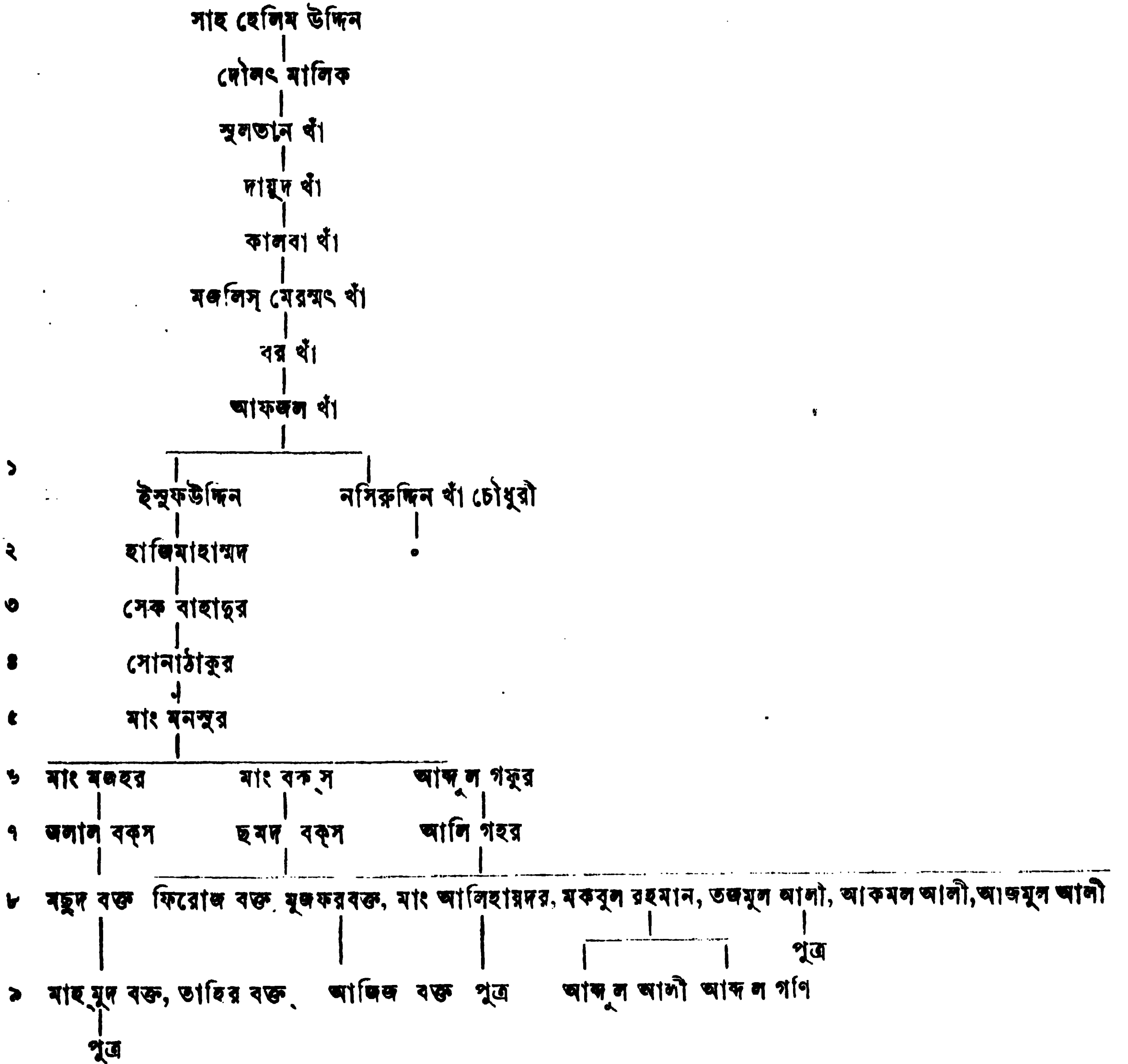
৯ " " ফরজন্দ আলী

১০ " " আকবর আলী (উং আলীজান মিঞা) — হামিদা বানু (স্বামী মছুদ আলী)

১১ ০ — ইছা গাজী

১২ ইব্রাহিম গাজী (জিনারপুর)

৩। নসিরুদ্দিন খাঁর বংশ পত্রিকা



খেলা

(ষ্টানলী হল্ প্রণীত গ্রন্থাবলম্বনে)

বালকগণ খেলাতে যে সময় অতিবাহিত করে, তাহা নিতান্ত অপব্যয়িত হয় বলিয়াই আমাদের দেশের অনেকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বালকের ক্রীড়া তাহার চরিত্রের গঠনে সহায়তা করে। জাতীয় উন্নতি ও অবনতির সহিত ও খেলার অতি নিকট সম্পর্ক। ইংরাজদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই ওয়াটার্লু-বিজয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ইহা কিছুমাত্র কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে।

বস্তুতঃ খেলাই মানুষের স্বভাব। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু খেলিতে থাকে। শিশুর খেলায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই। কেহ কেহ বলেন যে, শরীরকে ভবিষ্যৎ-কর্ম্মোপযোগী করিয়া লওয়াই শিশুর খেলার মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু এই মত তাদৃশ সমীচিন বোধ হয় না। ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন যে, আমাদের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেমন পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট হইতে লব্ধ, সেইরূপ বংশানুক্রম হিসাবে তাঁহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি ও মনোবৃত্তিও আমাদের দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শিশুগণ ক্রীড়াচ্ছলে এই বংশপরম্পরালব্ধ কর্ম্মশক্তি ও মনোবৃত্তির পুনরভিনয় করিয়া থাকে মাত্র। ইঁহারা বলেন, যাহা জাতিহিসাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা নূতন, শিশুর খেলাতে এমন কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না। পূর্ব্বগামিগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে যে ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, শিশুগণ খেলার সময়ে ঠিক সেই ভাব বা প্রণালীরই অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া থাকে; এবং উহাদের স্বাভাবিক ক্রীড়া-পদ্ধতি বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতে পূর্ব্ব-পুরুষগণের কার্য্যপদ্ধতি ও মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশবাদিগণ আরও বলেন যে, হঠাৎ এক দিনে মানুষের যাবতীয় কার্য্য-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও, শিশুর খেলার মূল প্রকৃতির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। সে ঠিক পূর্ব্বের মতই খেলিতে থাকিবে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে যতই সে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের অধীনে আসিবে, ততই তাহার খেলার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইবে।

পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত কার্য্যপদ্ধতি বা মনোবৃত্তির পরিচয়ই যে শিশুক্রীড়াতে দেখা যায়, তাহা নহে। অনেকগুলি হয় ত অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—কতকগুলি হয়ত তাদৃশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে একটী বিশেষ ক্রম বা ধারা লক্ষিত হয়,—জাতির হিসাবে যাহা যত প্রাচীন, শিশু জীবনে তাহা তত প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্ব-জন্মের সুখস্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে বলিয়াই বোধ হয়, শিশুগণ এত প্রাণমন খুলিয়া খেলিতে পারে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Man is whole only when he plays—একমাত্র খেলাতেই মানুষের পূর্ণত্ব প্রকটিত হয়। কথাটা খাঁটী সত্য। বাস্তবিক সেই খেলাই প্রকৃত খেলা যাহাতে শরীর ও মন যুগপৎ সমভাবে নিয়োজিত হয়। শুধু শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিলে উহার মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং অতিরিক্ত ভাবে কেবল মাত্র মানবৃত্তির অনুশীলন করিলে উহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই হিসাবে খেলাই শিশুর পক্ষে আদর্শ ব্যায়াম—ইহাতে শরীর ও মন. যুগপৎ উভয়েরই উন্নতি সাধিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে যুগপৎ শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন করা হইত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato) মতে দুর্ব্বলতা অসচ্চরিত্রতারই পরিচায়ক এবং অঙ্গবৈকল্য পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত পাপের ফল মাত্র। প্লেটো বলিতেন, এমন ভাবে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত যে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই এককালে সাধিত হইতে পারে। কেন না সুস্থ ও সবল শরীরই উন্নত মনের আধার। গ্রীসের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে

ক্রমে এই ধারণা এতই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে উত্তর কালে গ্রীসে সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিমাত্রই দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইত। (Valere est philosophari —to be well and strong is to be a philosopher.) শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার মধ্যে যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিতে পারে, প্রাচীন গ্রীকগণ তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারে নাই। একের অবহেলা করিয়াও অন্যের উন্নতি করা সম্ভব ইহা তাহাদের নিকট নিতান্ত প্রহেলিকাবৎ বোধ হইত। শারীরিক মাংসপেশীসমূহের সম্যক পরিচালনা দ্বারাই মস্তিষ্কেরও উন্নতি হইয়া থাকে, কোমলহস্তপদবিশিষ্ট ও অনবরতোপবেশনবশতঃ স্থূলকায় রক্তশূন্য, সর্ব্বদা অধ্যয়ননিরত মানুষ প্রাচীন গ্রীকদিকের চক্ষে অত্যদ্ভুত জানোয়ার বলিয়াই বোধ হইত। নির্দ্দোষ ক্রীড়া নৈতিক শিক্ষালয়বিশেষ। এখানে শুধু শারীরিক শক্তির চর্চ্চা হয় না,—পরন্তু সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস শক্তিরও উন্মেষসাধন হয়। নির্দ্দোষ ক্রীড়াতে জীবনের জটিলতাপূর্ণ পথ সরলীকৃত হয়, মনে উৎসাহ জন্মে, এবং ক্ষিপ্রতা অথচ দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করিবার শক্তির বিকাশ হয়। ইহা আমাদিগকে বিপদে ধৈর্য্য প্রদান করে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। যাহা নিজকে ভাল করে ও ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে, গ্রীক দর্শন শাস্ত্রে তাহাই জ্ঞান নামে উক্ত হইয়াছে। জেনোফন্ (Xenophon) বলেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মোৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব, এবং যে বুঝিতে পারে যে, তাহার উন্নতি হইতেছে সেই সকলের অপেক্ষা সুখী। সুপ্রসিদ্ধ সক্রেটিশের (Socrates) মতে জ্ঞানে ও কার্য্যশক্তিতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। (Kennen und kunen—to know and have the power to do). বস্তুতঃ শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি পরস্পর অবিভেদ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বতঃ প্রণোদিত স্বাভাবিক ক্রীড়াই আমাদের বংশানুক্রম-প্রভাবের পূর্ণ প্রকাশক। শুধু তাহাই নহে। কর্ম্মশক্তির দ্বারা আমরা যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, তাহারও মূল কারণ এই বংশানুক্রম প্রভাব। প্রাণীমাত্রই তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্যক ব্যবহার করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার ক্রমাবনতি ও পরিণামে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুর্ব্বলতার অপেক্ষা দুঃখপ্রদ আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। উৎসাহশীল, কর্ম্মক্ষম, ও সবলকায় হওয়া অপেক্ষা যুবকগণের প্রার্থিতব্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। মানুষের মূল প্রকৃতি ও অতীত ইতিহাস ক্রমে তাহাকে এমনই করিয়া গড়িয়াছে যে, এতদ্দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রবৃত্তিসমূহ যুগপৎ উত্তেজিত হয়, শরীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থসমূহ অম্লজান সহযোগে পুনর্গঠিত, বা অন্তবিধ উপায়ে শরীর হইতে নিষ্কাসিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অলসতা দূরীভূত হয়। খেলাতে আমাদের কর্ম্মশক্তি ও ইন্দ্রিয়নিচয় নিয়ন্ত্রিত ও সুপথগামী হয় উপযুক্ত সময়ে চিত্তবৃত্তির স্থিতিস্থাপকতা জন্মে। ইহাতে মানুষ সংযমপরায়ণ হয়, তাহার স্বাধীনতার বিকাশ ও হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার লীলা নিকেতন হয়।

শৈশব ও কৈশোরেই বংশানুক্রম-প্রভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই আমাদের প্রত্যেকটী মাংসপেশী বংশানুক্রম প্রভাবে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর হস্তপদ সঞ্চালনের প্রকৃত মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্টীকৃত হইতে থাকে, এবং বাল্যাবস্থা ও কৈশোরে ইহা সুস্পষ্টাকার ধারণ করে। যে কার্য্য আমাদের এই বংশানুক্রম প্রভাবের যত নিকটবর্ত্তী ও অনুকূল, তাহা আমাদিগকে তত অধিক আনন্দ প্রদানে সমর্থ হয়। এই হিসাবে ক্রীড়া হইতেই আমরা যথার্থ পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই। পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে,

খেলাতে তাহার যে ক্রমাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াই থাকে। সে কালের প্রাণী খেলিত ও খেলিতে ভালবাসিত। তাহারই চিহ্ন আমাদিগেতে বর্ত্তিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ক্রমবিকাশ বা ক্রমাবনতি সূত্রে খেলা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু পুরুষপরম্পরাক্রমে মানুষের যৌবন-কালের স্থায়িত্ব যেমন ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়, মানুষের ক্রীড়াক্ষেত্রও তেমনই বিস্তৃততরই হইতে থাকে। এই হিসাবে মানুষের যৌবন ও ক্রীড়া একার্থবাচক। একমাত্র খেলিবার সময়েই মানুষ যুবত্ব প্রাপ্ত হয়,—মাত্র তখনই আমরা প্রকৃত শিশু, যখন আমরা আত্মহারা হইয়া খেলাতে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া থাকি, এবং যাহার এরূপ খেলিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ।

পুরাকালে জীবন-ধারণের জন্য মানুষকে সর্ব্বদাই নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হইত। শত্রুবিজয় ও পশু-হননের জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই গুরুভার দ্রব্য সজোরে ও লক্ষ্য সহকারে নিক্ষেপ করিতে হইত। যে জাতি ইহা পারে নাই, তাহা ক্রমে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মৃগয়াযুগে মানুষকে সর্ব্বদাই দণ্ডহস্তে শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে এই সকল কার্য্যের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরুষপরম্পরালব্ধ ইন্দ্রিয়াদির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি-সাধনের জন্য তৎসমুদয়ের অনুরূপ ব্যাপারের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের দৈহিক যন্ত্রাদি ও মনোভাব পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং যে খেলা বা আমোদ আমাদের এই বংশপরম্পরালব্ধ কর্ম্ম-শক্তি বা মনোবৃত্তির যতটা অনুরূপ, আমরা তাহা হইতে তত অধিক আনন্দলাভে সমর্থ হই। এই জন্যই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক এক প্রকার খেলা এক এক জাতির কাছে অধিকতর প্রিয় হয়।

সুতরাং, আমাদের উপযোগী খেলার যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, শুধু ব্যক্তিগত খামখেয়ালির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, যাহাতে জাতিগত মূল প্রকৃতি ও বংশপরম্পরালব্ধ কার্য্যশক্তির সম্যক উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, উহার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন কাজ নহে। শিশুদের স্বতঃ প্রণোদিত ও অকৃত্রিম খেলার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা ইহা জানিতে পারিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বংশানুক্রম-প্রভাবের একটা বিশেষ ক্রম বা ধারা আছে। এই ধারানুসারে এক এক সময়ে এক এক ইন্দ্রিয়ের বিকাশাবস্থা উপস্থিত হয়। ঠিক সেই সময়ে তাহার সম্যক পরিচালনা দ্বারা যত ফল বা উপকার পাওয়া যায়, উহার পূর্ব্বে বা পরে তত পাওয়া যায় না। জিমনাষ্টিক দ্বারা ফুসফুসের পরিণতি সাধিত হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে জিমনাষ্টিক ব্যায়াম দ্বারা ফুসফুস্ যন্ত্রের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয় না।

আজকাল প্রায় যাবতীয় খেলাকেই নিয়মের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিবার একটা প্রবৃত্তি দেখা যায়। শিশু জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির পক্ষে ইহা মঙ্গলদায়ক নহে। সকল প্রকার ক্রীড়ার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই পূর্ণতা-বিকাশ কার্য্যে ইহা বিশেষ বাধা উৎপাদন করিয়া থাকে। শিশু জীবনের কর্ম্মপ্রিয়তা ও আদিম মানুষের শ্রমশীলতা,—এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ একটী সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। আদিম মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে পারে না। এক সময়ে হয় ত বিপুল অধ্যবসায় সহকারে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত, কিন্তু হয় ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িত। সভ্য ও অসভ্য জাতির পার্থক্যই এই স্থানে। অসভ্য জাতির নিকট সভ্য সমাজের

বৈচিত্রহীন জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ ও অসহ্য বোধ হয়। শিশুগণও ঠিক সেইরূপ দীর্ঘকাল একই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না—সে স্বাধীনতা উপভোগের জন্য শীঘ্রই লালায়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং শিশুক্রীড়াকে কোনও প্রকার দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে।

অল্প বয়সেই খেলা ও কর্ম্মে কোনও রূপ পার্থক্য সাধন করাও উচিত নহে। খেলাচ্ছলেই বালকের শিক্ষারম্ভ হওয়া উচিত। আমোদহীন শিক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার জননী। ব্রিণ্টন্ (Brinton) বলেন, আমাদের কার্য্যের মধ্যে যতটুকু খেলা আছে, সেই টুকুই মূল্যবান, এবং খেলারও সেইটুকুই মূল্যবান, তাহার মধ্যে যতটুকু কার্য্য আছে। *

জনসন্ (Johnson) বলেন, খেলিবার সময়ে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক উৎসাহ জন্মে, সেইরূপ উৎসাহ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কেহ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ খেলা ও কর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য বিদ্যমান নাই। আমরা অনেক দুরূহ কার্য্যও খেলাচ্ছলে অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকি। দৈনন্দিন আহারাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে পরিমাণে শক্তির (Energy) আবশ্যক, তদতিরিক্ত শক্তিই খেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে যে সমস্ত বালকবালিকা সুবিধাসত্বেও মনপ্রাণ খুলিয়া খেলায় যোগ দিতে পারে না, তাহারা কখনও শারীরিক ও মানসিক গুরুতর অনিষ্ট সাধন না করিয়া অধ্যয়নাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। খেলা ও উৎসাহ এক ও অভিন্ন পদার্থ। পূর্ণ মাত্রায় উৎসাহ না থাকিলে প্রকৃত কর্ত্তব্যপ্রিয়তার উন্মেষ হয় না।

আগ্রহ ও উৎসাহশূন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই অবসাদ উপস্থিত হয়—আমাদের কর্ম্ম-শক্তির হ্রাস হইতে থাকে ও পদে পদে নানা প্রকার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ঘটে। উৎসাহ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না,—সহজেই বিরক্তির উদ্রেক হয় ও মেজাজ খিট্‌খিটে হয়। প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভ অনেকটা সহজ ও সরল, কিন্তু কার্য্যসম্পাদনে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই উহাতে জটিলতা ও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। এই সমস্তের দুরীকরণেই আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশিত হয়—ইহাতেই মানুষ অপর মানুষ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই অধ্যবসায় ও অভিনিবেশ শক্তির সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দুইটী গুণ হারাইলে জাতির ক্রমাবনতি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত খেলাতেই এই দুই শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য খেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মনে রাখা উচিত, ইচ্ছা ও কার্য্যে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই—কার্য্য ইচ্ছা শক্তিরই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। (The purest thought is only action repressed.) মানসিক শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য পৈশিক শক্তির পরিচালনা আবশ্যক, এবং কর্ম্ম-শক্তির বিকাশের জন্য ইচ্ছা-শক্তির বিকাশের প্রয়োজন।

গ্রস্ (Gross) বলেন, একমাত্র খেলাতেই বালকের বালকত্ব ; যে বালক মনঃপ্রাণ খুলিয়া খেলিতে পারে না, বয়সে নবীন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে সে জরাপ্রাপ্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের খেলিবার প্রবৃত্তির হ্রাস হয়—এই জন্যই সে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার তাহা না হয়, পরিণত বয়সেও যাহার পূর্ণ মাত্রায় খেলিবার উৎসাহ থাকে, বয়সে প্রবীণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবক। যতদিন আমাদের এই খেলিবার শক্তি অক্ষুন্ন থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই আমাদের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর। এই যুবকত্বের বিকাশ ও উন্নতি সাধনই যাবতীয় শিক্ষালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠী। এই যুবত্ব-বিকাশের পথ রুদ্ধ হইলেই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের আরম্ভ হয়।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

* The measure of value of work is the amount of play in it, and the measure of value of play is the amount of work there is in it.

পল্লী *

এই গ্রন্থে কবির পল্লীসম্পর্কিত কবিতাগুলি ছাপা হইয়াছে বলিয়া "নিবেদনে" উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কবিতার সঙ্গে "পল্লীর" বিশেষ সম্পর্ক নাই। এগুলি বাদ না দেওয়াতে নির্ব্বাচন-শক্তির ত্রুটি লক্ষিত হয়। আর কতকগুলি কবিতা বস্তু ছাড়িয়া গুণবিশেষের ধারণাকে বিষয়ীভূত করিয়া রচিত হওয়াতে গ্রন্থকলেবরের অধিকাংশের বস্তুমূলক প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলির অধিকাংশের মধ্যে কেবল কবি-হৃদয়ে অনুভূত রস উছলিয়া উঠিয়াছে, সংসারের সহস্র জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিহিত নাই। তরুণ কবির প্রথম গ্রন্থে ইহাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কেবল রসানুভূতির প্রকাশময় পরস্পর অসংশ্লিষ্ট কবিতার সমষ্টিমাত্র মনে করিলে পুস্তকখানির ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। যে কবিতাগুলিকে প্রকৃতই পল্লীসম্পর্কিত বলা যাইতে পারে, সেগুলি একটি বিশেষ সম্বন্ধের বন্ধনে একতাবদ্ধ। যে কয়েকটি কবিতাতে এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই, উহারা 'পল্লীর' কলেবরের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, বাস্তবিক পল্লীর কিছুই নহে; 'পল্লীর' কবি যাহা বলিতে চান, তাহার সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

পল্লীর কবিতাগুলির একতাবিধায়ক এই ভাবটি কি, কবি তাহা নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতার জন্মমৃত্যুর নিদানভূত বিরাট প্রতিষ্ঠানসমূহাধিকৃত নগর-জীবনকে লোক-কল্যাণের প্রতিকূল বিবেচনা করিয়া বহুকাল অবজ্ঞাত পল্লীতে পুনরাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা আজ দেশে বিদেশে উচ্চারিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের এই তরুণ কবিও সেই আকাঙ্ক্ষার বার্ত্তাই প্রচারিত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পল্লী-অনুরাগ কোন বৈষয়িক প্রয়োজনে সঞ্জাত হয় নাই। আর একটি চিরন্তন প্রেরণা তাঁহার পল্লীপ্রেমের মূল। পল্লীতে কবি হৃদয়ে রসানুভূতি জাগাইয়া তুলিবার উপযুক্ত কি আছে, তাঁহার পল্লীর কথায় আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার কি অধিকার আছে, কবি নিজেই তাহা প্রচারিত করিয়াছেন।

কবি কহিতেছেন, "প্রকৃতির বুকে অতীব গোপন স্বর্গের স্বপ্নের মত মনোরম কি যে সত্য রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিতে কবিহৃদয় যুগযুগান্ত ছুটিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। কেবল এইটুকু বুঝিয়াছে যে, সৃষ্টি মহা আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দের বিষয় আরও একটু বুঝিয়াছে যে, 'আত্মার সনে দৃঢ় বন্ধনে জানি সে কেমনে বদ্ধ।' এই বন্ধনের হেতুতে এই আনন্দ দেহের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আত্মার কানে অধীর ছন্দে যাহা গাহিয়া যায়, তাহার বিশিষ্ট অর্থ কিছু বুঝি না; শুধু তাহা যে আনন্দ এইটুকু বুঝি।

এই সৃষ্ট জগতের পল্লীদৃশ্যের প্রত্যেকটিতে এই আনন্দ থৈ থৈ প্রকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু তবু (ভ্রান্ত) লোকে তাহা দেখিতে না পাইয়া কহে, সুখশান্তি কিছু নাই।

এই ভ্রান্তির কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, সাধারণ মানব কেবল (অধীর) মনের দ্বারা বিচার করে, তাই এইরূপ দুঃখের কথা বলে। যদি অধীর মনকে শান্ত রাখিয়া আত্মাকে ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেওয়া যায়,

"তখন দেখিবে প্রকৃতি ঐ
আনন্দেরি সে মুরতি
দেখিবে যাহাই, করিবে যাহাই
আনন্দ বিনে কোথা কিছু নাই।"

তাহা হইলে কবির বাণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণা করিতে হয়। সাধারণ মানুষ মন দিয়া জগতের যাহা গ্রহণ করে তাহাতে তাহার জগৎ সম্বন্ধে ধারণাতে সঙ্কীর্ণতা ঢুকিয়া পড়ে, জগতে সুখশান্তি দেখিতে পায় না। কবি প্রথম দৃষ্টিতেই জগৎপ্রকৃতির বুকে আনন্দ দেখিতে পান। কিন্তু কবি তখন মনহারা হন নাই। মনের ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া তখনও প্রকৃতি একেবারে আনন্দময় হয় নাই।

* শ্রীদুর্গামোহন কুশারী প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা।

মনের ক্রিয়াই প্রায় সর্ব্বদা চলিতে থাকিলেও কবির স্বতঃ জাগরূক আত্মা মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া জগতে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। ইহার পর কবির উন্নতি। ক্রমশঃ যখন মনের ক্রিয়া একেবারে 'শীতল শান্ত' হইয়া বন্ধ হইবে, কেবল আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবে, তখন আত্মা ও প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হইতে অনুভূত হইবে যে, প্রকৃতি কেবল আনন্দময়।"

এই মতের সহিত পল্লীর সম্পর্ক কি? কবি বোধ হয় বলিতে চান যে, পল্লীর সহজতা ও সরলতার মধ্যেই কবির আত্মা প্রথম আনন্দের সন্ধান পায়।

"বসন্তেরি রাঙা সুপ্রভাতে
চরাচর উঠলে তুমি ফুটি!
পঞ্চভূতে তোমার পেয়ে সাড়া
ঘরের বাহির হলেম আমি ছুটি।
পল্লি! ওগো আনন্দেরি খনি!
* * * *
আত্মা তব মুক্ত হয়ে আজি
মলয় হাওয়া দিচ্ছে দশ দিকে!
শিথিল ক'রে দিচ্ছে যেন ক্রমে
জড় জীবের মর্ত্ত্য বাঁধনটীকে!
আজকে তোমার স্নেহ-পরশ খানি
সবার মাঝে স্বর্গ দিছে আনি:"

নগরের কৃত্রিম জীবনের মধ্যে মানসিক আবরণ আরও দুশ্ছেদ্য হইয়া পড়ে। নাগরিক প্রতিবেশের অন্তরগোপনকারী কৃত্রিমতার আবরণের সঙ্গেই সর্ব্বদা পরিচয় ঘটে বলিয়া মনের আবরণও আত্মার স্বরূপকে ক্রমশঃ গাঢ়তর ভাবে ঢাকিয়া ফেলে।

'নিবেদনের' লেখক 'পল্লীর' কবির 'শব্দ-সম্পদ, ছন্দের উপর আশ্চর্য্য দখল, তাহার কবিতার সাবলীল অনায়াস প্রবাহ' ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রশংসোক্তিতে মাঝে মাঝে 'কিন্তু' সংযোগ করিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। হয়ত ছন্দের খেলা, শব্দ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কবি এখনও শিক্ষানবীস। হয়ত বহু স্থলে কবিতা-প্রবাহে আবর্ত্ত ও বাঁধ পড়িয়া উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, বিভিন্ন ধারার একত্র সংযোগে সামঞ্জস্যের অভাবে রসবোধের ব্যাঘাতও ঘটিয়াছে। কিন্তু "পল্লী" গ্রন্থের এই সমস্ত খুটি নাটি আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই। পল্লী-প্রকৃতির রূপের যে প্রকাশ "পল্লীতে" স্থান পাইয়াছে উহাই পল্লীর বিশেষত্ব। অনেক লব্ধযশা কবি পল্লী-প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে বর্ণনায় কোন জীবন্ত প্রত্যক্ষের পরিচয় নাই,—যেন শোনা কথার বর্ণনা, অথবা সহরের ধনীর আবাসে সুবিন্যস্ত, কিন্তু শিল্পী-গঠিত, পল্লী-প্রকৃতির নকল মকসা। এই সকল প্রকৃতি-বর্ণনায় বাস্তব রূপের সম্পূর্ণ অভাব না হইলেও, যাহা থাকে তাহাতে দৃশ্য-'সামান্যের'ই পরিচয় পাওয়া যায়, পরন্তু কোন দৃশ্য-বিশেষ বা বস্তুবিশেষের বিশিষ্টতা পাওয়া যায় না। এই সকল বর্ণনায় স্থান-কাল-পাত্রোচিত নিজস্ব লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না। যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থের কবিপ্রসিদ্ধি আছে সেগুলিই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়, ভাষা-প্রয়োগে বা বস্তু-নির্দ্দেশে কাব্যসভার পূর্ব্বাচরিত ভব্যতা লঙ্ঘিত হয় না। গ্রামের প্রকৃতির 'গ্রাম্য'তা যথাসম্ভব কাটিয়া ছাটিয়া নাগরিকের ফ্যাশন-দুরস্ত ভদ্রতায় পরিণত করা হয়। দুর্গামোহনের কবিত্বের বিশেষত্ব এই যে, তাহার কবিতায় পল্লী-প্রকৃতি কাটা কাগজের সাজান দৃশ্য মাত্র নহে, তাহার পল্লী-দৃশ্যে বাস্তব মূলক বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ নির্ব্বিশেষে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-দৃশ্যাবলীর যথাযথ প্রকাশ স্থান পাইয়া থাকে। "পল্লী" গ্রন্থের "পল্লীপথ", "শীত প্রভাতে," "নারায়ণ সেবা," "পল্লীপুকুর," "প্রকাশিতা," "প্রবাস যাত্রা," "পল্লীস্মৃতি" প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্যের উপলব্ধি হইবে।

পল্লীর কোন কবিতায় পূর্ব্ব কবির রচনা স্মরণ করাইয়া দেয় না, ইহা বলিতে চাহি না। এরূপ দুই একটি কবিতা

বাদ দিলে "পল্লী" নিখুঁত হইত ও সমুচিত নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত, এ কথাও বলা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু এই শ্রেণীর দুই একটি কবিতার উল্লেখ করিলেই 'পল্লীর' সমালোচনা শেষ হইবে না। "পল্লীতে" যাহা আছে তাহা আর কোথাও পাই না, তাই "পল্লীর" কথা দশজনকে জানাইতে বসিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "পল্লীর" বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নকল নকসা নহে, নিসর্গনিয়মে উদ্ভূত আসল, ইহাদের বর্ণনায় কবি কাব্যপ্রসিদ্ধির দাসত্ব স্বীকার করেন নাই—যেমন দেখিয়াছেন, সরস ভাষায় হৃদয়ের অনুভূতি মাখাইয়া তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ব্যতীত আর কাহারও বর্ণনায় প্রাকৃতের অপূর্ব্ব বৈ চিত্র-পূর্ণ প্রত্যক্ষের এরূপ পরিচয় বিরল। 'আম্র মুকুলের গন্ধ', ঘনচ্ছায়াপূর্ণতরু', 'প্রচ্ছন্ন কুটীর', 'জীর্ণ অশথের মর্ম্মর', এমন কি 'চীলের সুতীব্র ধ্বনি' 'আখের ক্ষেত', 'কদলী সুপারি নিবিড় বাঁশের বন' পর্য্যন্ত খ্যাতনামা কবিগণ অগ্রসর হইয়াছেন। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই একবার একটী কচ্ছপ দেখিয়াছি। কোন কোন নবীন কবির রচনায় দু একটি বাস্তবদৃশ্য না আছে এমন নহে—

"মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়া ঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি
শিল কুড়ায়ে বাঁধব 'মোয়া'
লাঙ্গল দেব ভুয়ে,
কড়্ কড়্ কড় ডাকবে 'দেয়া'
আসব আমন রুয়ে।
আকাশ ভাঙ্গা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়বে নুয়ে' নুয়ে'।"

এই কবিতায় বুঝি যে কবি প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন এবং সুন্দর ভাষায় একটি বাস্তব দৃশ্যের বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে এমন কিছু নাই যাহা পল্লী-প্রকৃতির একটি দৃশ্য-'সামান্যের' ধারণাতে আসে না। কিন্তু

"ওরে মোদের পাড়ার প্রান্ত হতে পথটি আঁকা বাঁকা
কোথা কালো ছায়ায় মিশিয়ে গেছে যায় না বড় দেখা—
কেমন নীরব অচল ছুটাছুটি বনের মাঝটা দিয়ে,
শেষে হাঁপ ছাড়িয়ে লুকয় খোলাখানের মাঠে গিয়ে;
কোথা পুষ্পউজল বৃদ্ধ হিজল দাঁড়িয়ে ধারে ধারে,
ঐ ঘাসের আঁচল নুইয়ে গেছে রাঙ্গা ফুলের ভারে;
ঐ দুই ধারেতে মাঝে মাঝে ভস্ম মেখে গায়,
কত যোগমগ্ন লক্ষ বরুণ তপোবনের ছায়।
ওরে আজকে ও সব পল্লীপথের পাগল ছবি যত,
আমার মনে পড়ছে থেকে থেকে স্বপন ছায়ার মত।
কোথা মাঁদার গাছের ফাঁক দিয়ে সে কালো ডোবার জল,
সেথা আপন মনে করছে খেলা বনবিহগের দল;
কোথা ডাহুক পাখীর ছেলেমেয়ে বেড়ায় নেচে নেচে,
ছুটে মাতা ওদের সাথে, সাথে, পিতা ওদের পিছে;
কোথা নলের বনে পাখীযুগল করছে প্রেমালাপ
দুটি কোঁড়াল বসে তরুর শিরে করছে রে বিলাপ।
কোথা টুনটুনেরা ঝোপে ঝাড়ে করছে ফিসফিস্
কোথা দোয়েলেরা গাবের শাখায় দিচ্ছে বসে শিষ্
ওরে আজকে ওসব পল্লীপথের মধুর ছবি কত
আমার মনে পড়ছে থেকে থেকে স্বপন ছায়ার মত।"

এই কবিতা পাঠ করিয়া বুঝি যে দুর্গামোহনের পল্লীপ্রকৃতি পল্লীবাসে থাকিয়া নিজের চক্ষের প্রত্যক্ষ। আবার,

"অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূর আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর—
রৌদ্র পোহাইছে; হোথা ভাঙ্গা উচ্চ তীর;
ঘনচ্ছায়া পূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;

বক্র, শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত ; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ * * *"

ইত্যাদি কবিতায় নিপুণ শিল্পী গঠিত প্রকৃতির সুন্দর নকল ও তাহার কাব্যোচিত পোষাকী ভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু এরূপ মনে করা বিচিত্র নহে যে, কোনও সহৃদয় আরোহী চলন্ত পদ্মাষ্টীমারে বা তরণী-বক্ষে আসীন থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন, ইহা যেন তাহারই বর্ণনা —দূরস্থিত ও স্বল্পকালস্থায়ী দর্শনে যেন প্রাকৃতের অসংখ্য খুঁটিনাটি চক্ষে পড়ে নাই, তাই একটা সামান্য ধারণামাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু দুর্গামোহনের কবিতায় স্বতোজাত প্রাকৃতিক দৃশ্যের 'বিশেষ' বৈচিত্র ও তাহার বর্ণনায় প্রত্যক্ষ-নির্দ্দেশক সহজ ভাবের পরিচয় ইতস্ততঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিশেষত্বের দাবী একদিন পূর্ব্ববঙ্গের প্রবীণ কবি গোবিন্দচন্দ্রও করিয়াছিলেন, কিন্তু এতগুলি কবিতায় এবং এত অধিক পরিমাণে এই বিশেষত্ব দুর্গামোহনেই প্রথম দেখিতে পাই। এই বিশেষত্ব বিশিষ্ট একটি কবিতা তুলিয়া দিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব।

নারায়ণ সেবা

বেলা আছে দণ্ড চারি, একটু খানি আগে,
এক ফসলা বৃষ্টি হ'লো একটা উড় মেঘে।
সিনান করে উঠলো রবি কোন সাগরের তীরে,
তারেই দেখে ধরা-মেয়ে হেসে উঠলো কি রে ?

গোময় দিয়ে সদ্য লেপা মস্ত উঠান পারে,
নন্দদুলাল ফুলের বাগান সঘনে বেড়ার ধারে,
লালবর্ণ ফুল ফুটেছে, গন্ধ যাচ্ছে বয়ে
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে ছুটছে পাগল হয়ে।

ফুলের গাছের গায়ে গায়ে দূর্ব্বাঘাসের লতা,
ফুটে উঠছে কুলে কুলে শ্যামল সজলতা।
পূজার লাগি পল্লীমেয়ে দূর্ব্বা তোলে নিজে,
পিছন দিকে ময়নামতির সুনীল শাড়ি ভিজে।

টপটপিয়ে পড়ছে পিঠে সঘনে গাছের জল—
দূর্ব্বা গোছা হাতে মেয়ে টানিছে অঞ্চল,
উড়ে এসে বসল গাছে কোন বিদেশের কাক,
ঝরঝরিয়ে জল ঝড়িল, মেয়ের হল রাগ !

আঙ্গিনাতে কাঁসর ঘণ্টা, পূজার ভাণ্ড বাটী,
চাকর এসে রেখে গেল কলার পাতা কাটি ;
পাড়ায় আজি কি আনন্দ, বলতে পারে কেবা,
আজ বাড়ীতে সন্ধ্যা হতে সত্যনারাণ সেবা।

সুরে. পূজার পরে উদর ভরে সিন্নি প্রসাদ পায়,
গিন্নিরা সব লেগে গেছেন চালের গুঁড়ায় :
করে, ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মী বৌয়ে সেবার আয়োজন,
ঢেঁকিশালায় সধবারা, মেয়েরা কয়জন।

তুলসী তলায় জায়গা লেপে বিধবা সুন্দরী,
দাড়িম ফুলের পাপড়ী ঝরে মুক্ত কেশোপরি।
লক্ষ্মী পেঁচার কিচিমিচি আম্রবৃক্ষ থেকে,
মেয়ের হাতের কাঁকন ধ্বনি চালের গুঁড়ি টেকে।

সন্ধ্যা হ'ল, পুরুত এলেন, পুথি হবে পড়া
সবাই মিলে পুথি পেয়ো, থাক না গলা ধরা।
অতিথ বলে যাত্রা নাটক সব শুনেছি ভাই—
নারাণ সেবার পুথির মত এমনি কিছু নাই।

ভাটিয়াল গান

(৮)

জান রে মন পঞ্চতত্ত্ব,
ব্রজগোপীর ভাব নিয়ে বসে থাক রে।
আমার মন গুরু ভজ রে॥
গুরুর জ্যোতে জ্যোত মিশাইয়ে,
থাকরে মন ঐ রূপ ধইরে,
গুরুরূপে গৌরহরি দেখা দেবে রে।
আমার মন, গুরু ভজ রে॥
শোন মন, বলি তোরে,
তীর্থে যাওয়ার কাজ কি ওরে,
সর্ব্বতীর্থ আছে গুরুর চরণকমলে রে।
আমার মন গুরু ভজ রে॥

(৯)

ও নাগরী হেরবি গো সদায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।
এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে হরি বলে নৃত্য করে
শ্রীবাস আঙ্গিনায়॥
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়,
এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে নগর দিয়ে হেটে বেড়ায়,
সোনার নুপুর বাজে রাঙ্গা পায়।
তোরা দেখবি যদি আয়,
এমন গৌরাঙ্গ রূপ।
সে যে রথের শোভা মদনমোহন,
মদনমোহন বাশরী বাজায়।
তোরা হেরবি যদি আয়।
এমন গৌরাঙ্গ রূপ।

(১০)

একদিন দেইখাছি যারে,
তারে ভোলন না যায় গো।
সবাই বলে মেঘ মেঘ,
মেঘ নয় গো আস্তা;
তোমরা নি দেইখাছ সই,
মেঘের আড়ে জবা গো।
একদিন ... ... যায় গো॥
চরণে নুপুর বাজে, হাতে মোহন বাঁশী,
(অ) তার গলে শোভে বনমালা,
মুখে মৃদু হাসি গো।
চূড়ায়ে ময়ুরের পাখা
করে ঝিকিমিকি,
তারে মনে বলে প্রাণ সই,
একবার দেখে আসি গো॥
একদিন ... ... যায় গো॥
পীরিতি পীরিতি যতন,
পীরিতি গলার হার গো।
এমন পীরিতি যে জন করে,
সফল জনম তার গো॥
একদিন ... ... যায় গো॥
আমার নয়ন নিল কালরূপে,
মন নিল বাঁশী গো।
যারে শুইলে স্বপনে দেখি,
জাগিয়া না দেখি গো॥
একদিন ... ... যায় গো॥

কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রাধা নীরদবরণ শ্যামসুন্দরকে সদাই চোকে চোকে রাখিতে চায়। এমনই তাঁর রূপ যে একবার দেখিলে উহা আর ভুলিতে পারা যায় না, প্রতিনিয়ত ঐ রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। যে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়াছে তার জীবন ধন্য; কৃষ্ণপ্রেম-হীন জীবনধারণ বৃথা।

(১১)

আমি দেখে এলেম গঙ্গার ঘাটে
মহাভাবের ইষ্টিমার।
হরিদাস কেরাণী আর্
দয়াল নিতাইচাঁদ টিকেট মাষ্টার॥

অদ্বৈত সিটি দিলে পরে,
অরি এসে জাহাজ ভিড়ে,
কেরাণী কয় কে নিবি রে,
হরিনামের টিকেট চমৎকার॥
আড়কাটী গৌরিদাস সুজন,
চৌষট্টি খালাসী (মোহন্ত) যোজন,
রামানন্দ সারেং নিপুণ,
জগাষাধা পেছেন্দার॥
জাহাজখানা দেখতে ভাল,
কোন্ কারিকর গড়েছিল,
গদাধর তার বিদ্যুৎ আলো,
বিরাগ ভক্তি ইঞ্জিন্ তার॥
জাহাজখানা দেখতে নিপুণ,
জাহাজের কি জাহাজী গুণ,
রাধা প্রেমবিকারের আগুণ,
জল্‌তেছে তায় অনিবার॥
গোসাই রামচন্দ্র কয় সুজন যারা,
টিকেট পেয়ে যাচ্ছে তারা,
অধীন চণ্ডী হ'ল টিকেটহারা,
কেমনে হইবে পার॥

গানটীর রচয়িতার নাম—চণ্ডী. রামচন্দ্র ইহার গুরু; কিন্তু ইহারা যে কে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উক্ত গানটীতে প্রকৃত ভাবুকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকৃত ভক্তের প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাস সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

(১২)

সুজন কাণ্ডারী ধা'রে,
চিন্নাল' মন ভাল কি বাও।
মনমাঝি তুই কেমনে বা'বি
পচা নাও॥
যে জন জাত-পাট্‌নী হয়,
(অ) তার তুফানে কি ভয়,
মতে সতে ঢেউ কাটিয়ে
টের পলুইতে হয়।
সে বাতাস বুইঝা নৌকা ছাড়ে,
ভাটী ছাইড়া উজান ধরে,
বাইয়া যায় প্রেম-পাথারে,
তার কি লাগুর পাওয়া যায়॥
ঐ নাও বাইছের নামে চলে উড়ে,
আর আমার নাও যে থাকে কুইড়ে,
সারানিশি তার জল ফালায়॥
আমার নাও হইয়াছে বুড়া।
ও নায়ের লাইগাছে গুড়া,
অনেক দিনে হইল বুড়া,
ভাই পুরাণ মাস্তলায়॥

মন. সৎসঙ্গ অনুসরণ করিয়া ঠিক পথ চিনিয়া লও, যেন সংসারের বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ ঝঞ্ঝার ভিতরে পড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে উহাকে অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পার।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

৪৭১। আমরা ফেরাজি,
সেলাম করতে হাত তুলি,
জুইত পাইলে ঘাড়ে ধরি।
জুইত—সুযোগ।

৪৭২। ঝাঝইরে কয় কুড়ালেরে,
তোর * একটা ছেদা।
ছেদা—ছিদ্র।

৪৭৩। খায় দায় বনের পাখী
বনের দিকেই চায়।

৪৭৪। দাসীর কথা বাসী হইলে
লাগে বড় ভাল।

৪৭৫। ঘরের ইন্দুরে কাটলে বান্
দিয়া কি আর যায় কুলান।
বান্—বান্ধন।

৪৭৬। পুত্ গা বিয়া করাইলাম
বউগা বড় ভাল,
গিরস্তিখান সইপা দিলাম
কর্ত্তাস্তিখান গেল।

৪৭৭। খায় মাগীর গলা বেশী।
মাথায় মাগীর কোপা'নি বেশী।

৪৭৮। ঘর করবে কুইড়া
সারাবাড়ী জুইড়া।

৪৭৯। কাচায় না নোয়াইলে বাঁশ,
পাকলে করে টাস্ টাস্।
কাচায়—কাঁচাকালে।

৪৮০। ডাউকের তেল অইলে
মোল্লা বাড়ী হয় বাসা।

৪৮১। ভাত হইতে যত ক্ষণ,
আয়াস আছে তত ক্ষণ।

৪৮২। যত ক্ষণ খাস,
তত ক্ষণ আশ।

৪৮৩। লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

৪৮৪। আউলার পচা পাণ্ডে ভাসে,
বারইর পচা পানে হাসে।

৪৮৫। হাগা নাই *
ধ্যাড়ারিই বেশী।

৪৮৬। অইছে পোলার বাপ ডাকে না,
অইব পোলার আশা।
অইছে—(যে) হইয়াছে যে।

৪৮৭। জামাই আনছে এক সের,
ঐ আমার পাচ সের। *
জামাই আনছে এক সের,
ঐ আমায় পাচ সের।

---

* এক রমণীর দুইটী মেয়ে,—মেয়ে দুটীর বিবাহ হইয়াছে। এক জামাই চাকুরী করে—অপরটীর অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। চাকুরে জামাই মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ী আসে, আর আসিবার সময় যা'কিছু খাবার দ্রব্য কি'নিয়া আনে। অপর জামাই কিন্তু তা'করে না। গত কল্য চাকুরে জামাই আসিয়াছিল,—প্রগল্‌ভা শাশুড়ী আজ স্নানের ঘাটে জামায়ের গল্প বলিতে বলিতে বলিয়া উঠিল, 'এই দেখ আমার এ জামাই কি মানুষ। যখন আসে, তখনই কত কি নিয়া আসে—আর ঐ যে আটকুড়ীর বেটার হাতে আমার এই মেয়েটা দিয়াছি (বলা বাহুল্য যে ঐ মেয়েটা তাহার সঙ্গেই ছিল) সেটা কি একটা মানুষ? কাল আমার চাকুরে জামাই /৫ সের খাবার আ'নিয়াছিল। বয়স্কা মেয়ে নিজের স্বামীর প্রতি কটূক্তি শুনিয়া বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিল; বিশেষ তাহার ভগ্নীপতি যে মাত্র /১ সের জিনিষ আনিয়াছিল! তাই অভিমানিনী মনের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া উপস্থিত রমণী বৃন্দের নিকট বলিয়া ফেলিল "হঁ, /১ সের জিনিষ আনিল, হ'ল /৫ সের?" মা'এর দম্ভে আঘাত লাগিল—রমণীগণ একে অন্যের মুখ চাইতে লাগিল—তাই—তখন ঐ রমণী বলিয়া উঠিল, 'তাতে তোর কি লো?'

৪৮৮। কিঞ্চিৎ লিখনং।
বিবাহের কারণং।

৪৮৯। দারুন হুকুম,
আক্কেল গুরুম্।

৪৯০। আভরা কলসীর
চক্‌চকানীই বেশী।

৪৯১। বেশী কথা কয় যে,
কাজে কম জানা সে।

৪৯২। কানা কড়ির কেনা গোলাম।

৪৯৩। কাজ করবে গোপনে,
তবে অন্তে যেন না শোনে।
যদি না পার কর্ত্তে একা,
দুইএ মিলে কর তা।
দুইএর বেশী শুন্‌লে কানে,
সে কথা না রবে গোপনে।

৪৯৪। ভোরের ভাতে পেট না ভরলে,
বৈকাল্যা ভাতে কি পেট ভরে?

৪৯৫। আমি রাধা তুমি শ্যাম,
আর আমি আছি কান্ধে বাড়ি বলরাম।

৪৯৬। কাজের নামে কাজী নাই,
আকামের সারথি।

৪৯৭। দাঁত থাক্‌তে কে কামার বাড়ী যায়?
আমার কলমে নি কালী পায়।

৪৯৮। ভিজ পোর কর কি?
ঘরে বসে ঠাকুরঝি।

৪৯৯। কাইল বয়ে, ধরে কালে।

৫০০। রথ দেখা আর কলা বেচা।

৫০১। কামের নামে যোগ্যতা নাই,
মাউগ কিলানের যম।

৫০২। * দিয়া না কুটা চলে,
দুই হাতে বন্দুক ঠেলে।

৫০৩। গুজার অ চায় চিৎ হইয়া শুইতে।
গুজার—কুজ। অ—ও।

৫০৪। জামাইর বড় কোচার ফের,
দু'বুড়ী কড়ি সুতার সের।

৫০৫। আসলের লগে দেখা নাই,
সুদের ফুটাফুটি।

৫০৬। পরের কান্ধে বন্দুক থুইয়া
ফুটাইতে আর কি?

৫০৭। পরের মাথায় কিরাই ভাজা।

৫০৮। বার লাউ তের দাইড়্যা
কেউ নিল আমার আগইল কাইড়্যা।
দাইড়্যা—যাহারা হাটে বাজারে তোলা তোলে।

৫০৯। ধান নাই যোটে কালে
গোলা ভরা ইন্দুর।

৫১০। গোয়াল গরু ভইস,
তার লগে না পথ বইস্,
যদিও কখন পথ বইস্,
হাতে একখান লড়ি লইস্।
বইস—বহিস।

৫১১। চোরা বন্ধুর বাও,
মুখে কয় রও রও,
পায় ঠেলে নাও।

৫১২। গাঙের মধ্যে ঢেউ দেইখ্যা
নৌকা ডুবায় কুজে?

৫১৩। রাগের ঘরে বার দেবতা খাটে।

৫১৪। হস্ কাছায় * বাড়ে।

৫১৫। আইগ্যা পাইছে হর,
আগে আগ্‌ত বাইরে,
এখন আগে ঘরে।
আইগ্যা—হাগিয়া।
আগ্‌ত—হাগিত।

বাইরে—বাহিরে।
আগে—হাগে।

৫১৬। আউস থাকলে
বাতী জ্বালাইয়াও পাদে
আউস—হাউস।
আলাইয়া—আলাইয়া।

৫১৭। দু-দিল বান্দা কলমা চোর,
না পায় ভিস্তি, না পায় দোজোগ।

৫১৮। হিন্দু যদি মুসলমান হয়,
মুরগী খাইতে যম হয়।

৫১৯। চোরে চোরে আলি,
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের হালী।
হালী—শালী।

৫২০। শুষ্ঠী শুদ্ধ * নাই,
বৌট্টার মত *।

৫২১। দাদায় যে মরুল
তা ত ভাবি না,
তবে যমে যে বাড়ী চিন্‌ল।

৫২২। দাদায় অইছে দারোগা,
ফৌজদারী ত ঘরেই।
অইছে—হইয়াছে।

৫২৩। ন্যাংটা গদা পিতাম্বর,
মুগীর মাইয়া বিয়া কর।

৫২৪। বোবার শত্রু নাই।

৫২৫। আভাগ্যায় যদি চায়,
সাগর শুকাইয়া যায়।
আভাগ্যা—অভাগা।

৫২৬। ঘোয়াভা গাছের কাঁঠাল পাইয়া
নিত্যিই আসে ছালা লইয়া।

৫২৭। সাপ মর্‌লেও
দেয় এক ঘোড়া।

৫২৮। শালগেরামের
শোয়া বসা সমান।

৫২৯। ফাকি দিয়া
ছাগী বিয়ান।

৫৩০। মোল্লার দৌড়
মজিদ পর্য্যন্ত।

৫৩১। গেছে গেছে টাকাটা
শিখ্‌লাম ত টোকাটা।

৫৩২। টাকার কুমৈর।
কুমৈর—কুমীর।

৫৩৩। হয় যদি তিলটা।
কয় তবে তালটা।

৫৩৪। পাগলারে। শাক জ্বালিছ না।
ভাল কথা মনে করছ।

৫৩৫। বৃক্ষ তোমার নাম কি?
ফলে পরিচয়।

৫৩৬। ধোপা নাপিত কামার কুমার,
যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।

৫৩৭। একে ত বুড়ী নাচনী,
তায় আবার তার নাতিনের বিয়া।

৫৩৮। ক্ষেতে গেলে কৃষাণের বুদ্ধি।

৫৩৯। কইয়া বইয়া প্রেম,
আর ঘইসা মাইজা রূপ,
দুদিন পরে চুপ।

৫৪০। জলেও লাম্‌ন নাই,
সাতরও শিখন নাই।

৫৪১। বাজারে নাম লেখাইলে
জাতের ভয় কি?

৫৪২। যার নাম লয়,
খাটের গোড়া হয়।

৫৪৩। জ্বরের অষুধ কুইনাইনের বড়ী,
খাইয়া ফালা তাড়াতাড়ি।

৫৪৪। আঃ, রাধা[illegible] গায় রে ? *

৫৪৫। টাকা [illegible] বের দুধও মিলে।

৫৪৬। বাপক[illegible] টা সিপাই কা ঘোড়া।

৫৪৭। যা পাই তা খাই
দুঃখদরাশ কিছুই নাই।

৫৪৮। গাইও বুড়া, বিয়ানেরও শেষ।

৫৪৯। ঠেকছি যথায়, শিখছি তথায়।

৫৫০। বাতাসাও পাইলাম,
তম একটা ঠেলা খাইলাম।
তম—তবুও

৫৫১। হয় কথা নয় করে, গুতাগুতি সার করে।

৫৫২। পোলায় দিছে * * ছিইর‍্যা
বাকী রইছে নাতি।

৫৫৩। পাপে বাপেরেও ছাড় না।

৫৫৪। য্যাস্‌কে ত্যাস্‌কে মিলে,
ছোচ্‌কে দাড়ীকে মিলে।
য্যাস্‌কে—যেমনে।
ত্যাস্‌কে—তেমনে।
ছোচ্‌কে—অপরের প্রাপ্য যে পরিশোধ করে না।
দাড়ী—নির্লজ্জ।

৫৫৫। বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

* কোনও এক ব্যক্তির জানা ছিল যে রাধানাথ বড় গায়ক। রাধানাথ গান করিতেছে শুনিয়া তথায় যাইয়া গান শুনিয়া বাটী রওনা হইয়াছে। রাস্তায় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কি হে গান কেমন শুনিলে ?' সে ব্যক্তি গানের কিছু বুঝিয়া থাকুক বা না থাকুক—গায়ক ত রাধানাথ। তাই সে ভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'আঃ, রাধানাথ কি গায় রে !' অমনি এই অপর ব্যক্তি বলিল 'না, হে, ও ত রাধানাথ নয়।' তদুত্তরে প্রথম ব্যক্তি বলিল 'এঁ্যা রাধানাথ নয় ? তবে কেন আমি কাঁদি ?'

৫৫৬। কিবা বিয়ার বিয়া,
সাতটা আন্‌ছে দিয়া,

৫৫৭। শকুনের শাপে কোন্ গরু মরে।

৫৫৮। যে করে পাপ,
সে হয় সাত পোলার বাপ।
যে করে পূণ্যি, তার হয় শূণ্যি।

৫৫৯। টাকার নামে কাঠের পুৎলাও হাঁ করে।
পুৎলা—পুতুল।

৫৬০। অদেষ্টে থাক্‌লে হাগে বাইজ্জাও গু আসে।
অদেষ্টে—অদৃষ্টে।
হাগে—শাকে।
বাইজ্জা—বাঝিয়া, লাগিয়া।

৫৬১। কান কথায়, মন যায়।

৫৬২। বাকী থুইয়া যে লাভ গণে।
গু খায় সে তার বাপের সনে।

৫৬৩। একে ত ফোঁস্ মনসা,
তার আবার ধুনার গন্ধ।

৫৬৪। পুরুষের দশ দশা,
মাইয়ামাইন্‌ষের এক দশা।
মাইয়ামাইন্‌ষের—স্ত্রীলোকের।
একদশা—প্রসবকালীন অবস্থা।

৫৬৫। মুখটা যদি না থাকৃত,
পাতিশিয়ালেই টাইন্না নিত।
টাইন্না—টানিয়া।

৫৬৬। কিবা বিয়ার বিয়া,
তার আবার চিৎবাত।

৫৬৭। হোয়া অইছে কি, দুই লাখের কম না।
আলো মা ! দুই কুড়ি অ খাইলাম না।
হোয়া—শঁসা।

৫৬৮। হাগতে লাজ না দেখতে লাজ।

৫৬৯। বাহুরের নাম কে না জানে ?
কেবল লাজে কয় না।
বাহুরের—ভাসুরের।